অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

সম্পাদনা
ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

অন্নদাশঙ্কর রায়
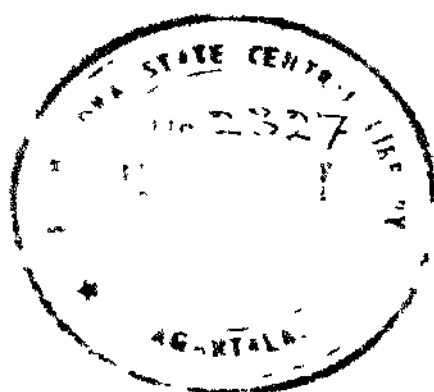
প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪ এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অক্ষর-বিন্যাস
অতনু পাল
কম্পিউটার টুডে
৭৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৫

মুদ্রাকর
অরিজিৎ কুমার
দ্য ক্রিয়েশন
২৪ বি/১বি ডা. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

একশো সত্তর টাকা

প্রাসঙ্গিক

সত্যাসত্য এবং রত্ন ও শ্রীমতীর পর অন্নদাশঙ্করের তৃতীয় ও সর্বশেষ বৃহৎ উপন্যাস হলো চার খণ্ডে সমাপ্ত ক্রান্তদর্শী। সত্যাসত্য যদি হয় অন্নদাশঙ্করের ওয়র অ্যাণ্ড পীস আর রত্ন ও শ্রীমতী তাঁর আনা কারেনিনা, তাহলে ক্রান্তদর্শীকে হয় তো বলা যেতে পারে তাঁর রেজারেকশন। এই উপন্যাসমালা নিয়ে লেখক দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছেন, চিন্তান্বিত থেকেছেন, লিখবো কি লিখবো না এই দোটানায় ভুগেছেন। উদাহরণ দিচ্ছি —

'ভারতের জাতীয় সংগ্রামকে মহাভারতে রূপায়িত করার যে কল্পনা ছিল আমার আমি সেটা যোগ্যতরের জন্যে রেখে যাবো।' (১৯৫১)

'(এখন) গল্পের চেয়ে উপন্যাস নিয়েই আমার চিন্তা। ত্রিশ বছর ধরে যে বই লিখব বলে তৈরি হচ্ছি সেটা এখনো শুরু হয়নি। জীবনের একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে যাচ্ছে।' (১৯৭৫)

'(আমাদের কালের যুগান্তকারী ঘটনা হলো) স্বাধীনতা প্রাপ্তি। আমরা কোনদিন ভাবিনি আমাদের জীবদ্দশায় স্বাধীনতা আসবে। দেশটা চোখের সামনে ভেঙে গেল। এর জন্য আমরাও দায়ী। এসব কথা আর কেউ লিখবে ভেবেছিলাম — যারা এর মধ্যে involved নয়। একটা দূরত্ব চাই একথা লেখার জন্য। কিন্তু দেখলাম, আমি যদি না লিখি তাহলে আর কেউ লিখবে না। আর কারও অভিজ্ঞতা নেই। যে সব সরকারি সার্কুলারে দেশের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে, নানা টানাপোড়েন হয়েছে সে সব আর কে দেখেছে আমি ছাড়া ? ১৯৩৯ - ৪৮ এই কয়েক বছরে যা দেখেছি, যা শুনেছি তা ক্রান্তদর্শীর মধ্যে রয়েছে'। (১৯৮৭)

চেনা-জানা অনেক চরিত্র এসেছে এই মহোপন্যাসে। তখনকার দিনের রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা এরা। যে দেশ, দেশভাগের ফলে বরাবরের মতো হারিয়ে গেছে, তা রূপ পেয়েছে ক্রান্তদর্শীতে। ভারতের জাতীয় সংগ্রাম যার বিষয়বস্তু। বহিরঙ্গের দিক থেকে।

অন্তরঙ্গের দিক থেকে 'আমার এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইংরেজীতে যাকে বলে রিনিউয়াল। পুনর্নবীকরণ। টলস্টয়ের ধ্যানের রেজারেকশন আর আমার ধ্যানের রিনিউয়াল অবশ্য একই জিনিস নয়। তবু পুনরুত্থান ও পুনর্নবীকরণ দুটোই পুনঃ।'

'গত শতাব্দীর ভাবুকরা এদেশের রেনেসাঁস নিয়ে ভাবিত ছিলেন। এই শতকে আমরা কেউ কেউ তেমনি রিনিউয়াল নিয়ে ভাবিত।'

কিন্তু উপন্যাসের নাম পুনর্নবীকরণ তো ভালো শোনায় না, তাই দীর্ঘ অন্বেষণের পর নাম ঠিক হয় ক্রান্তদর্শী। শঙ্করভাষ্যে কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত বিবৃতিতে ক্রান্তদর্শীর ইংরেজী করেছেন একবার The Seer, আরেকবার The Watcher of Transition. ক্রান্তদর্শী শব্দটার মধ্যেই একটা দর্শনের কথা আছে। ইংরেজিতে যাকে বলে ভিশন। এই উপন্যাসের আড়ালে আছে একটা বিশেষ দৃষ্টি।

'Krantadarshi surveys the history of this century from an Indian perspective Its

protagonist has seen the two world wars, struggle for independence, the famine of Bengal in the 40s, the Hindu - Muslim riots culminating in the partition of India, and India's gaining of independence. I have scattered myself among various characters in this novel and have tried to look at this history from different angles. It is a record of my personal impressions on certain very important events of this country, which I feel impelled to preserve for posterity'.

'This story of the last years of the British rule needed an epilogue and an epitaph. So Krantadarshi was carried forward to the point of the Mahatma's death and cremation. What could be more tragic than this unhappy ending of a great drama ? Greater love hath no man than this, that he lay down his life for his friends : I quote this from the Bible '

আরম্ভের সময় ক্রান্তদর্শীর থিম ছিল রিনিউয়াল । কিন্তু চারখণ্ড লিখতে লিখতে লেখক তার থেকে সরে আসেন। উপন্যাসের চলার তো একটা নিজস্ব নিয়মও আছে। লেখককে সে নিয়ম মানতে হয়। উপন্যাস একজনের সৃষ্টি একথা যেমন ঠিক তেমনি একথাও ঠিক যে উপন্যাস শুধুই একজনের সৃষ্টি নয়। কারণ উপন্যাসের বিষয়বস্তু মাত্র একজনের ভাবনা চিন্তা নয়, অনেকগুলি মানুষের বহমান জীবনধারা। তাই ক্রান্তদর্শী যখন শেষ হলো তখন তা লেখকের পরিকল্পিত রিনিউয়াল বা পুনর্নবায়ন নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী থিসিস লেখা যায়, কিন্তু উপন্যাস নয়। যদিও ক্রান্তদর্শী চারখণ্ডের সমস্তটা একত্র করলে যা দাঁড়ায় তাও একপ্রকার রিনিউয়ালই বটে, লেখকের পরিকল্পনামতো নয় যদিও। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

আর সেই সূত্রেই আসে রচনারীতির কথা। বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির পর শৈলীর কথা। এই উপন্যাস জাতে সাবজেকটিভ। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের পটভূমিকায় বিভিন্ন চরিত্রের উপাখ্যান তথা জীবনদর্শন। জীবন বলতে অন্তর্জীবনও বোঝায়। 'আমার এই উপন্যাসে অন্তর্জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে। একে নভেল্‌স অভ্‌ আইডিয়াজ্‌ বললে আমি আপত্তি করব না। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন ইন্টেলেকচুয়াল উপন্যাস।' লেখকের মতে এই উপন্যাস ইতিহাসভিত্তিক হলেও ঐতিহাসিক উপনাস নয়। রাজনীতিনির্ভর হলেও রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। বলতে পারা যায় বিশ্লেষণধর্মী মানবিক স্টেটমেণ্ট।

লেখক একবার লিখেছিলেন, 'দুনিয়ায় যেসব জোরালো বই লেখা হয়েছে সেসব বই লেখকদের বল বয়স থাকতে', মোটামুটি ভাবে পঞ্চাশের পূর্বে। সাধারণভাবে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানকর্মের ক্ষেত্রেও তাই। বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা যে কাজের জন্য ষাট বা সত্তর বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সেই গবেষণা বা আবিষ্কারটি তারা করে ফেলেছিলেন ত্রিশ বা চল্লিশ বছর বয়সেই।

অন্নদাশঙ্কর কিন্তু ছিয়াত্তর বছর বয়সে ভাঙা শরীর নিয়ে ক্রান্তদর্শী আরম্ভ করেন আর তা যখন শেষ হয় তখন তাঁর বিরাশি বছর পূর্ণ হয়েছে, এই উপন্যাস লিখতে ও সংশোধন করতে লেগে গেছে সাত বছর। বৃদ্ধ বয়সের লেখা হলেও ক্রান্তদর্শী খুবই বলবান ও রূপবান। একটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে লেখক আমাকে বলেছেন এটি তাঁর সবচেয়ে ম্যাচিওর লেখা, গুণমানের দিক থেকে সব চাইতে উঁচু দরের। সেই সাক্ষাৎকারের কথা পরে আসবে।

১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত দু'বছর কালসীমার সত্যাসত্যের জন্য ছয় খণ্ড লেগেছিল। সেই অনুসারে ক্রান্তদর্শী লিখতে আরো বেশি খণ্ড লাগাই সমীচীন। কেননা এই কাহিনীর কালসীমা হলো ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি। হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণ থেকে মহাত্মা গান্ধীর চিতারোহণ পর্যন্ত। কিন্তু লেখক বয়সের কথা ভেবে, বার্ধ্যকের কথা মনে রেখে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লেখেন ও চার খণ্ডে সারেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত পাঁচ পর্বে লিখতে পারলে তৃপ্তি হতো।

এ গেলো কালের কথা। স্থানের কথায় বলতে হয় কাহিনীর প্রয়োজনে ঘটনাস্থল কখনো কলকাতা, কখনো পূর্ববঙ্গ, কখনো পশ্চিমবঙ্গ, আর সবশেষে দিল্লী।

পাত্রপাত্রী বলতে একদিকে সৌম্য-জুলি, মানস-যূথিকা, স্বপনদা-দীপিকাদির মতো একরাশ কাল্পনিক চরিত্রাবলী, অন্যদিকে জবাহরলাল, জিন্না, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সুহরাবর্দির মতো অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। একদিকে কাল্পনিক পাত্রপাত্রীরাও যেমন লেখকের কাছে জীবন্ত মানুষ ও আপনজন, অন্যদিকে তেমনি ঐতিহাসিক নেতাদের সংলাপে ও চরিত্রায়ণেও আছে কল্পনার অংশ। সেই প্রসঙ্গটি নিচে আলোচিত হয়েছে।

আমি এখনো গান্ধীর নামোল্লেখ করিনি, কেননা আমি মনে করি গান্ধী এ উপন্যাসের নিছক কোনো চরিত্র নন, বরং এই গ্রন্থমালার গাইডিং ফোর্স বা চালকশক্তিই তিনি। ক্রান্তদর্শীর প্রকৃত নায়ক। লেখকের সঙ্গে আমার ১৯৮৩-তে নেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত করছি—

আমার প্রশ্নের বিষয় ঃ আপনার সাম্প্রতিক উপন্যাস ক্রান্তদর্শী। ৩৫ বছর ধরে এই বই লিখবেন বলে তৈরি হয়েছেন, চারখণ্ডে লেখা হবে, জীবনের বড় একটা কাজ। প্রথম খণ্ড শেষ করেছেন, তা পড়েওছি। বক্তব্য ও বিবরণ প্রধান। বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে একটা দেশের সন্ধিকালকে ধরতে গেলে বক্তব্যের কিছুটা প্রাধান্য ঘটবেই। সার্ত্রর রোডস টু ফ্রীডম উপন্যাসমালাতেও তা ঘটেছে, এতে কোনো ক্ষতি নেই। ক্রান্তদর্শীর যতটা পড়েছি তা পড়ে একটা অদ্ভুত মননশীল তৃপ্তি পাওয়া যায়। তা আমাদের মতো তরুণ পাঠকদের কাছে, ভারতের জাতীয় সংগ্রাম সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তাদের কাছে, দূরবীনে দূরের জগৎ দেখার মতো উত্তেজনাময় ও স্পন্দনশীল এক অনুভূতি। বারাব্বাস উপন্যাসের নায়ক যেমন অদৃশ্য নায়ক যীশুখ্রীস্ট — the invisible hero, ক্রান্তদর্শীর নায়ক তেমনি গান্ধী। চার খণ্ড লিখে শেষ করতে ও প্রকাশ পেতে সময় লাগবে। তার আগে এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও কাঠামো সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে ইচ্ছে হয়।

লেখকের উত্তর ঃ সত্য, প্রেম, সৌন্দর্য ঃ এ ছাড়াও আর একটা থিম বহুদিন ধরে আমাকে নাড়া দিচ্ছিল, তা হলো রিনিউয়াল। একটা দেশের, একটা জাতির রিনিউয়াল। যা একটা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বলতে হবে। যতদিন পারি এই থিমকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষে দেখলাম আমি ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, কেননা আমার কাছে যত তথ্য আছে তেমন আর কারুর কাছে নেই, তখন লেখায় হাত দিলুম। একদিক দিয়ে দেখলে একে সত্যাসত্য-এর সিকোয়েল বলতে পারো। তবে এতে মহাত্মাজীকে এনেছি। তাঁকে indirectly রেখেছি এ বইয়ে, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে আঁকার শক্তি আমার নেই, কারও আছে কিনা সন্দেহ। তেমন করে আঁকতে বহুকাল লেগে যাবে। পরোক্ষভাবে তাঁকে এনেছি, তাঁর উপস্থিতি নানাভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই বইয়ের পথ খুব কঠিন পথ। অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনা। বহু বাস্তব ও কাল্পনিক চরিত্র। তার মধ্যে কোন্ কোন্‌টাকে রাখবো ভেবে বার করতে হচ্ছে। কীভাবে রাখবো তাও ভাবতে হচ্ছে। প্রথম খণ্ড শেষ করে যে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট তা নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালোভাবে আর করা গেল না। মানুষ যা ভাবে সবসময় তা হয় না। তবে যেটা হয় সেটাও কিন্তু কম নয়। এ আমি আমার নিজের জীবনেই দেখেছি। জীবনের কোনো ঘটনা বা নিজের কোনো সৃষ্টি হয়তো best হলো না, কিন্তু next to the best হতে পারে। ক্রান্তদর্শী যতটা লিখেছি হয়তো খুব ভালো হয়নি, তবে খারাপও হয়নি। লিখতে লিখতে অনেক আন্‌ফোরসীন, আন্‌প্রেডিক্টেব্‌ল্ জিনিস আসছে, ফলে গল্পের ধারা বদলে যাচ্ছে, অনেক ঘটনাকে রিইণ্টারপ্রেট করার সুযোগ পাচ্ছি। তবে সাধারণভাবে দেশের স্বাধীনতাই মূল বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে। দেখা যাক। বইটা শেষ করার তাগিদটা বড় কেননা তাহলে একটা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই।

প্রথম খণ্ড সম্পর্কে প্রদত্ত এই বক্তব্য ক্রান্তদর্শীর চারটি খণ্ড সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হতে পারে। ক্রান্তদর্শীতে গান্ধীর ভূমিকা ও ক্রান্তদর্শীর মধ্য দিয়ে লেখকের গান্ধীমূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়, ত্রয়োদশ খণ্ডের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

ক্রান্তদর্শীকে সত্যাসত্য-এর সিকোয়েল বলা যেতে পারে শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, চরিত্র-সৃচির দিক থেকেও। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলেছিলাম, সত্যাসত্যের অন্যতর নায়ক সুধীকে আমরা অপেক্ষাকৃত ভিন্ন রূপে ফের ফিরে পাব ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালায়। সুধী এখানে সৌম্য হয়েছে। সৌম্য সুধীই, তবু সুধী নয়। লেখক তাঁকে নিজের মতো করে বাঁচবার ও বাড়বার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সৌম্যর ভূমিকাকে ঘিরেই ক্রান্তদর্শী দানা বেঁধেছে। তবে ঘটনার আবর্তে পড়ে সৌম্য সুধীর স্থিতপ্রজ্ঞ স্বরূপ বজায় রাখতে পারেনি। উজ্জয়িনীও এখানে ফিরে এসেছে, জুলি নাম নিয়ে। সে বিধবা হয়েছিল, পরে সৌম্য যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন তার জন্য অপেক্ষা করেছে ও অবশেষে সৌম্যর পত্নী হয়েছে। সৌম্য একনিষ্ঠ গান্ধীপন্থী, জুলি প্রথমে ছিল সন্ত্রাসবাদী, পরে সৌম্যর প্রভাবে পড়ে গান্ধীবাদের দিকে ঝুঁকেছে।

উজ্জয়িনী ফিরে এলে দে সরকারকেও ফিরে আসতে হয়, সে আসে সুকুমার দত্তবিশ্বাস হয়ে। জুলির দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে জুলির বান্ধবী মিলিকে বিয়ে করে। এই তিনটি পুরোনো চরিত্র ছাড়া আর সব চরিত্রই নতুন। মানস বাদল নয়, যদিও সৌম্যর পুরাতন বন্ধু। মানস চরিত্রে লেখকের বিশেষ আত্মপ্রক্ষেপও ঘটেছে। তবে 'মানসের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলেও আমি মানস নই বা মানস আমি নয়। তার যূথিকাও আমার স্ত্রী লীলা নয়।' সৌম্য ছাড়া এই উপন্যাসের আর দুই অন্যতম নায়ক মানস ও স্বপনদা।

'অনেকগুলি চরিত্রই জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আস্তভাবে নয়। তারা যে যার নিজের মতো করে বেঁচেছে ও বেড়েছে। আমার শাসন মানেনি। নায়িকা যে কোন্ জন তাও আমি জানিনে। জুলি ও যূথিকার মতো দীপিকাদিও তিনজনের একজন। তিনটি পরিবারকেই এই উপন্যাসে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো একটিকে বিশেষ গুরুত্ব নয়।'

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো একটি চরিত্রের মডেল বিশেষ কোনো একজন নয়। প্রতিটি চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে তিল তিল করে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিকায় একটি উপন্যাস লেখার আগে ডিকেন্স কার্লাইলকে চিঠি লিখে জানতে চান কোন্ কোন্ বই পড়বেন। উত্তরে কার্লাইল একগাড়ি বই পাঠিয়ে দেন। ডিকেন্স অবশ্য অত পড়েননি। 'একগাড়ি না হোক, বেশ কিছু বই আমাকেও পড়তে হয়েছে। . . . . ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরো যাঁরা লিখবেন তাঁরা আমার চেয়ে ভাগ্যবান, তাঁরা এক গাড়ি কি দু'গাড়ি বই পড়ে লিখবেন। তাঁদের লেখা হবে অবজেকটিভ। যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য। নভেল লিখলে তার আদল হবে টলস্টয়ের সমর ও শান্তি। কিন্তু তাঁরা আমার মতো প্রত্যক্ষদর্শী হবেন না। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি, আমি ভুগেছি, আমি শিখেছি, আমি যে আদৌ অংশ নিইনি তা নয়। এমন সুযোগ ও দুর্ভোগ আমার উত্তরসূরীদের হবে না। আমার মধ্যে প্যাশন প্রবল, আমার বিচার ডিস্প্যাশনেট নয়। আমি একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, সেই সঙ্গে গান্ধীভক্ত, সেই সঙ্গে পশ্চিমের অনুরাগী, সেই সঙ্গে ইংরেজদের সহযোগী, সেই সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধু, সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের সেবক।' ক্রান্তদর্শী এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেখা।

যে সমস্ত গ্রন্থ লেখক পড়েছেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ব্রিটিশ সরকার প্রকাশিত বারো খণ্ডে সমাপ্ত মহাগ্রন্থ 'ট্রান্সফার অভ্ পাওয়ার', যার প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা বড় মাপের হাজারের মতো। এককালের অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়বস্তু। নেতারা কে কী বলেছেন, কে কী চেয়েছেন এসব তো আছেই, সরকার পক্ষে কে কী বলেছেন বা লিখেছেন তাও আছে। 'এই বইগুলি না পড়লে আমার চোখ ফুটত না। আমি একতরফা বিচার করতুম। জিন্না সাহেবের দিক থেকেও যথেষ্ট বলবার

আছে। লর্ড ওয়েভেলের দিক থেকেও। .... আমাকে আমার অনেক ধারণা সংশোধন করতে হয়েছে।'

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো লেখক জানতেন। কিন্তু ব্যক্তির জীবনের ক্রমপরিণতি জানতেন না। লিখতে লিখতে জানতে পারলেন। উপন্যাস লেখাও একটা নিরুদ্দেশ যাত্রা। 'যেসব তথ্য ত্রিশ বছর আগে কেউ জানত না সেসব আমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা জানত কী করে? আর সকলের মতো তারাও ভুল ধারণার দ্বারা চালিত হয়েছিল। ভুল ধারণা থেকে কত কী ঘটে! ঔপন্যাসিক কী করে তাকে অঘটিত করবে? ঔপন্যাসিক তার যুগকে অতিক্রম করতে পারে না।'

রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন উক্তি এই গ্রন্থে কখনো ইতিহাসসম্মত আর কখনো কাল্পনিক। লেখক যেখানে পেরেছেন সেখানে লিপিবদ্ধ উক্তি উদ্ধার করেছেন, যাতে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়। অন্যত্র উক্তি রচনা করেছেন, তা কাল্পনিক হলেও তাঁদের চরিত্রবিরুদ্ধ নয়। সেই ধরনের উক্তি তাঁদের মুখে যদি কেউ শুনে থাকেন তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। 'উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রদের একেবারে অনুপস্থিত রাখা যায় না। টলস্টয়ও কি নেপোলিয়নকে তাঁর 'সমর ও শান্তি'র মধ্যে উপস্থাপিত করেননি? নেপোলিয়নের উক্তিগুলিও কি সর্বতোভাবে ঐতিহাসিক? কোনো অংশেই কল্পিত নয়? উপন্যাসের অনুরোধে আমাকেও কিছু কিছু বানাতে হয়েছে।' তবে সেক্ষেত্রেও লেখক যথাসম্ভব ইতিহাসেরই অনুসরণ করেছেন। আরো বেশি অনুসরণ করলে উপন্যাস হতো না, ইতিহাস হতো। কিন্তু লেখক তো উপন্যাসের ছলে ইতিহাস লিখতে বসেননি। তাই এই উপন্যাসে তথ্যের ও ধারাবাহিকতার কিছু ফাঁকও রয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যাঁরা ইতিহাস লিখবেন তাঁরা সে ফাঁক পূরণ করবেন। লেখক উপন্যাস লিখেছেন। ইতিহাসভিত্তিক, রাজনীতিনির্ভর, বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস। ক্রান্তদর্শীতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিশ্বের ইতিহাসের, ভারতের ইতিহাসের, বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিকে। 'সে রকম যুগসন্ধি আগেও আসেনি, পরেও আসবে না! ওই একবারই এল আর গেল। দেশ দেশান্তরে কত পরিবর্তনই না ঘটে গেল! সমস্তটাকে একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা কি একপ্রকার রিনিউয়াল নয়? আমার পরিকল্পনামতো নয় যদিও।'

লেখকের পরিকল্পিত উপন্যাস প্রায় চল্লিশ বছর আগে তিনি 'নতুন করে বাঁচা' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেই রচনার রূপান্তর হতো। লেখকের পরিকল্পনায় ছিল টলস্টয়, থোরো, রাস্কিন, গান্ধী প্রভৃতির ধ্যানের জগৎ, ধ্যানের দেশ। এঁদের কেউ স্বদেশে সিদ্ধিলাভ করেননি, একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধী। তাঁকেও ঘটনাচক্রে আপাত ব্যর্থ হতে হলো। দেশ ও প্রদেশ ভেঙে গেল। শুধু এই দিক থেকে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও গান্ধীপন্থীদের পক্ষে তা ছিল একটা সেট-ব্যাক। 'এক হিসাবে সেট-ব্যাক, আরেক হিসাবে ফরওয়ার্ড স্টেপ। পদ্মা এককূল ভাঙে, আরেক কূল গড়ে।' দেশের ইতিহাসের বেলাও তাই। ক্রান্তদর্শীতে তারই প্রতিফলন ও রূপারোপ ঘটেছে।

ক্রান্তদর্শীর বিস্তৃত ও জটিল প্রেক্ষাপটটি এই ভূমিকায় বর্ণিত হলো। এই পটভূমির ওপর যে ইমারতটি গড়া হয়েছে তার দার্ঢ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ত্রয়োদশ খণ্ডের ভূমিকায়। তার আগে আপাতত এখানে বলা দরকার, যদিও এই ভূমিকার সূচনায় ক্রান্তদর্শী প্রসঙ্গে আমরা টলস্টয়ের রেজারেকশনের নামোল্লেখ করেছিলাম, তবু ঘরানার দিক দিয়ে দেখলে ক্রান্তদর্শী বোধহয় টলস্টয়ের ওয়র অ্যাণ্ড পীসেরই সহযাত্রী। বিশেষত জনগণমনঅধিনায়কতার প্রসঙ্গে। এই বিষয়ে এখানে যৎসামান্য আলোচনা করে রাখলে ত্রয়োদশ খণ্ডের ভূমিকায় আমাদের বিশেষ সুবিধা হবে।

ওয়র অ্যাণ্ড পীস সাধারণ উপন্যাসের মতো এক জোড়া নায়ক নায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক-নায়িকা হচ্ছে, বলা যায়, স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণ মন সম্মান। 'অথবা দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে

ইতিহাসের ভগ্নাংশ। এর বিষয় এর দেশকালরহিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্রপাত্রী হচ্ছে মানব - করতলরেখা।'

সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্রপাত্রীদের দিয়ে বড় বড় কাজ করাতেন। অথবা যারা বড় বড় কাজ করেছে তাদেরই করতেন পাত্রপাত্রী। সাধারণ ঐতিহাসিক হলে ঘটনার পেছনে দেখতে পেতেন মানুষের ইচ্ছা, মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে জাতীয় গৌরবের রঙে সমস্ত ঘটনাকে করতেন অতিরঞ্জিত। কিন্তু টলস্টয় ঋষি। তাই তিনি দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঘটনা কেমন করে ঘটলো, কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। রাশিয়ার জনগণকেই তিনি দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি। তারা অন্তরে উপলব্ধি করেছিল নিয়তির অভিপ্রায় ও সেই অনুসারে কাজ করেছিল। শেষ জীবনে টলস্টয় যে জনগণের স্বভাব বিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন, অপ্রতিরোধতত্ত্বের গোস্বামী হবেন, তার পূর্বাভাষ তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেই লক্ষ করা যায়।

যদিও ক্রান্তদর্শী ততটা অবজেকটিভ লেখা নয়, তবু টলস্টয়ের নীতি — সাধারণ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি নয়, সাধারণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নয়, জাতীয় ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নয় — অন্নদাশঙ্কর ক্রান্তদর্শীতে অনেকটা অনুসরণ করেছেন এবং এই উপন্যাসের শক্তির এক বড় অংশ সেখান থেকেই উদ্ভূত। টলস্টয়ের অপ্রতিরোধতত্ত্ব দেশান্তরে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে। গান্ধীজীর জীবনাদর্শে। এবং ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালা সেই স্পিরিটের দ্বারা চালিত : ওয়র অ্যাণ্ড পীসের সঙ্গে ক্রান্তদর্শীর সবচেয়ে বড় মিল এইখানে। নামপরিচয়হীন নির্বিশেষ জনতা কর্ম করে নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, খেয়ালী নয়, তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। সমর থেকে যেমন ওঠে নিয়তির কথা, তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতির সহজ বিকাশ ও বিশুদ্ধ অস্তিত্বের। অর্থাৎ মুক্তপ্রাণ জীবনের। 'জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্বভূতের আছে গতি। সেই গতিই ভগবান। জীবনকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালোবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসা।' গান্ধীর জীবনে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালাতেও সেই কথাই এসেছে। সেই অন্তর্নিহিত অর্থে, কল্পনার পরিব্যাপ্তিতে ও সহানুভূতির প্রসারে ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যকর্মের মধ্যে অনন্য।

ধীমান দাশগুপ্ত

ক্রান্তদর্শী

প্রথম পর্ব

ভূমিকা

বারো বছর ধরে 'সত্যাসত্য' লিখে আমি সম্পূর্ণ শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিঃশেষিত হয়ে পড়ি। আরো বারো তেরো বছর অপেক্ষা না করে বড়ো মাপের উপন্যাস লেখার মতো দম পাইনে। বড়ো মাপের উপন্যাস রচনা যেন একটা দীর্ঘ পদযাত্রা। 'রত্ন ও শ্রীমতী' তো পাঁচবছরের মধ্যেই পাঁচখণ্ডে সারা হবে ভেবেছিলুম। কিন্তু শেষ করতে চোদ্দ বছর লাগল।

সুতরাং বড়ো মাপের আরো একখানা উপন্যাস লিখতে আমার আর বল বয়স বা উৎসাহ ছিল না। কিন্তু যা নিয়ে আমি চল্লিশ বছর ধরে চিন্তান্বিত তা আমি না লিখলে আর কে লিখবে? সে সব অভিজ্ঞতাই বা আর কার আছে ? এটা আমার অন্তরের নির্দেশ। খুব কম সময়ের মধ্যে লিখলেও অন্তত চার বছর লাগবে। চার খণ্ডে সমাপ্ত হবে । এ হলো দমের কাজ। দম রাখতে না পারলে মাঝপথে হাল ছেড়ে দিতে হবে। কিংবা আয়ু যদি ফুরিয়ে যায়। আমার ন যযৌ ন তস্থৌ দশা দেখে এক বন্ধু আমাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দৃষ্টান্ত স্মরণ করতে বলেন। তিনি নাকি আশি বছর বয়সে জরাজীর্ণ শরীর নিয়ে 'চৈতন্য চরিতামৃত' লিখতে আরম্ভ করেন। যথাকালে সমাপ্তও করেন। তেমন ভাগ্য ক'জনের হয়? বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অসমাপ্ত সৃষ্টির সংখ্যা কম নয়।

ছিয়াত্তর বছর বয়সে ভাঙা শরীর নিয়ে 'ক্রান্তদর্শী'র যাত্রারম্ভ। এর নাম রাখা উচিত ছিল 'পুনর্নবীকরণ'। ইংরেজীতে যাকে বলে 'রিনিউয়াল'। গত শতাব্দীর ভাবুকরা এদেশের 'রেনেসাঁস' নিয়ে ভাবিত ছিলেন। এই শতকে আমরা কেউ কেউ তেমনি 'রিনিউয়াল' নিয়ে ভাবিত। কিন্তু উপন্যাসের নাম 'পুনর্নবীকরণ' আমার অপছন্দ। উপযুক্ত নামের অন্বেষণে মাসের পর মাস যায়। আমার স্বভাব আগে নাম নির্বাচন, তার পর লেখনী ধারণ। আমার পরম প্রীতিভাজন বন্ধু স্বামী নচিকেতসানন্দ আমাকে বলেন 'ক্রান্তদর্শী' নাম রাখতে। উপনিষদের শঙ্করভাষ্যে 'কবি' হচ্ছেন 'ক্রান্তদর্শী'। আমি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করি ।

প্রথম পর্ব ছাপা সমাপ্ত। দ্বিতীয় পর্ব লেখা চলেছে । 'দৈনিক বসুমতী'র শারদীয় সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা ভগ্নাংশমাত্র। সেটুকু পড়ে এক বন্ধু জানতে চেয়েছেন, আমি কি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছি? না, ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের পটভূমিকায় বিভিন্ন চরিত্রের উপাখ্যান তথা জীবনদর্শন।

অন্নদাশঙ্কর রায়

।। এক ।।

সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে গিয়ে মধুমালতীর সঙ্গে আলাপ। সে-ই গাইড হয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়। মানসকে।

একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলে, "বাবা আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আর ফিরে যেতে দেবেন না বলে নতুন এক বন্দিশালা বানিয়েছেন। এখানে আমার মতো আরো কয়েকজন রাজবন্দিনীকে সম্মানের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছেন। আমরা খাটি, খাই, খেলি, গান গাই, সেবা করি। কিন্তু রাজনীতি একদম বারণ। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। কিন্তু কী করি? পাঁচবছর ডেটিনিউ হয়ে থাকার পর এমনিতেই ক্লান্তি এসেছে। তবে যক্ষ্মা নয়। ওটা বাবার ডাক্তার বন্ধুদের ছল।"

ওদিকে ক্যাপটেন মুস্তাফী বলছিলেন যূথিকাকে, "অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! অদৃষ্টের পরিহাস। মেসোপোটেমিয়ায় তুর্কদের হাতে বন্দী হই আমি। আর বাংলাদেশে ইংরেজদের হাতে বন্দী হয় আমার মেয়ে। কৌতুকটা হোম মেম্বরকে বুঝিয়ে বলতেই তিনি বলেন, আপনি যদি ওর বিয়ে দেন আমরা ওকে বিনা শর্তে মুক্তি দেব। তা শুনে আমার মেয়ে বলে, ওইটেই তো শর্ত। শর্তাধীন মুক্তি আমি চাইনে। ইংরেজকে ও মেয়ে জ্বালিয়েছে, মিসেস মল্লিক। শেষে ওরাই মরীয়া হয়ে ওঠে ওকে ছাড়তে। কিন্তু বিনা শর্তে ছাড়তে ওদেরও তো প্রেস্টিজে বাধে। তা ছাড়া আবার যে ও-রকম কাজ করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? এমন সময় একটা সমাধান পাওয়া গেল। যক্ষ্মা। না, সীরিয়াস কিছু নয়। তবু রোগটা ছোঁয়াচে। মেডিকাল বোর্ড সুপারিশ করতে না করতেই বেকসুর খালাস। তার পর আমি ওকে ভাওয়ালিতে পাঠাই। বছর খানেক বাদে এখানে নিয়ে এসে সেবাপ্রতিষ্ঠানের ভার দিই। একে একে ওর সাথীরাও এসে যোগ দিয়েছে। সরকার আমাকে বিশ্বাস করে। আমিও বিশ্বাস রক্ষা করি।"

"এখন মুশকিলে পড়েছি জুলিকে নিয়ে।" মধুমালতী বলে মানসকে। "ওর ভালো নাম মঞ্জুলিকা সোম। বিয়ের আগে সিন্‌হা। চেনেন বোধ হয়।"

"চিনতুম। দশবছর আগে বিলেতে শেষ দেখা। ওর বর দুলাল ছিল আমার বন্ধু। আহা, বেচারা হঠাৎ মারা যায়। তা জুলি এখন কোথায়? অনেকদিন খোঁজ খবর রাখিনি।" মানস বলে।

"জুলি এখন ওর মায়ের কাছে কলকাতায়। ডেটিনিউ ছিল আমার সঙ্গে। বছর না ঘুরতেই ছাড়া পায় লেডী হ্যারিংটন না কার সুপারিশে। বিলেতে ফিরে গিয়ে পড়াশুনা করার শর্ত ছিল। বম্বে অবধি গিয়ে থেমে যায়। আপনি কি সৌম্য চৌধুরীকেও চিনতেন?" মধুমালতী সুধায়।

"চিনব না? ও যে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কিন্তু কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়। ও তো এখন এই শহরেই থাকে।" মানস উত্তর দেয়।

"থাকেন আর কোথায়? মাসের মধ্যে চব্বিশ পঁচিশ দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। চরকা কাটতে দিয়ে কাটুনিদের মজুরি দেন, সুতো থেকে কাপড় বুনিয়ে তাঁতীদের মজুরি দেন, গ্রামে তো কেউ কিনবে না, শহরে এনে ভাণ্ডারে জমা দেন। দেশ সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত কি না তার মাপকাঠি নাকি খদ্দরের

চাহিদা। পড়েছেন গান্ধীর পাল্লায়।'' মধুমালতী আফসোস করে।

''সেটা তো আজকে নয়। সেই অসহযোগের আমল থেকে। বিলেতেও ওকে খাদি পরতে দেখেছি। তা খাদির চাহিদা কেমন দেখছেন?'' প্রশ্ন করে মানস।

''মন্দ নয়। বাবা পরেন, মা পরেন,আমরা সবাই পরি। কিন্তু এই হারে প্রগতি হলে দেশকে স্বাধীন করতে আরো পঞ্চাশ বছর লাগবে।'' মধুমালতী হাসে।

''যা বলেছেন।'' মানস স্বীকার করে। ''কিন্তু জুলির কথা হচ্ছিল।''

''জুলি বম্বে অবধি গিয়েও জাহাজ ধরে না, সৌম্যদার সঙ্গে পুণা যায় ও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। উনি তখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধীজীর নির্দেশে হরিজন সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ওঁর প্রভাবে পড়ে জুলি সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে। অথচ গান্ধীবাদ গ্রহণ করে না। ও এখন ওর মায়ের সঙ্গে একটা নার্সারী স্কুল চালায়। এখনো একটা বিপ্লবী গোষ্ঠীর সদস্য। ওরা চায় গণ অভ্যুত্থান। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছে। আমার অত বুদ্ধি নেই, মিস্টার মল্লিক, আমি বুঝতে পারিনে গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের নৌকায় এক পা রেখে কেমন করে মার্কস কথিত বিপ্লবের নৌকায় আরেক পা রাখা যায়।'' মধুমালতী চিবুকে হাত দেয়।

''ওঃ এই নিয়ে মুশকিল! এটা শুধু জুলিকে নিয়ে কেন, শত শত কর্মীকে নিয়ে। কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীনতা, বিপ্লব নয়। ওদের লক্ষ্য বিপ্লব, ওটাই ওদের মতে স্বাধীনতা। লক্ষ্যে পৌঁছবার পন্থা নিয়েও তেমনি গভীর মতভেদ। গান্ধীকে ছেড়ে কংগ্রেস একাই একটা কিছু করতে পারে না, অথচ এরা কিনা গান্ধীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসে বিপরীত নেতৃত্ব খাড়া করবে।'' মানস বিস্ময়ের সঙ্গে বলে।

''কিন্তু মুশকিলটা তা নিয়ে নয়।'' মধুমালতী বলে, ''জুলি এখানে আসছে ওদের গোষ্ঠীর বৈঠকে উপস্থিত হতে। উঠতে চায় আমাদের বাড়ীতে। কী করি, বলুন দেখি! ওর বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। দু'জনেই যুদ্ধফেরৎ ডাক্তার ও পরে সিভিল সার্জন। জুলি আর আমি দু'জনেই এক শিবিরে বন্দী হয়েছি। আমি থাকতে ও কি আর কারো বাড়ী উঠতে পারে? ভাবা যায় না, মিস্টার মল্লিক। কিন্তু বাড়ীটা তো আমার নয়, আমার বাবার। প্রাইভেট প্র্যাকটিসে তিনি হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন, পেনসনের জন্য কেয়ার করেন না। বার বার বদলীর পর আর বদলী হতে চান না, এক জায়গায় বসতে চান বলে তিনি অকালে অবসর নিয়েছেন। এই জায়গাটার উপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে, নইলে তাঁর মতো ডাক্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র তো কলকাতা। সরকারকে যদিও তিনি কথা দেননি তবু সরকার আশা করে যে তিনি তাঁর মেয়েকে সেবাকর্মেই ব্যাপৃত রাখবেন, বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশতে দেবেন না। আর আমি নিজেও তো ওদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিনে। যতদিন ওরা জাতীয়তাবাদী ছিল ততদিন আমিও ওদের একজন ছিলুম, কিন্তু ওদের বেশির ভাগই এখন সমাজতন্ত্রবাদী, জাতির একটা অঙ্গকেও ওরা উৎখাত করবে, শুধু ইংরেজদের নয়। এমন অবস্থায় জুলিকে আমি ঘরে ঠাঁই দিই কী করে?'' মধুমালতী চিন্তাক্লিষ্ট।

মানস এর উত্তর খুঁজে পায় না। বলে, ''তা হলে ওকে আমার ওখানেই চালান দিন। তবে তার আগে একবার ওর বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। উনি তো ওকে চোখেও দেখেননি। শুধু নাম শুনেছেন। আর ও-ই বা ওঁর সম্বন্ধে কতটুকু জানে। জুলি এলে পরে আপনি ওকে আমাদের কথা বলবেন। ও বিপ্লবী নায়িকা। আমাদের ওখানে উঠলে ওর হয়তো জাত যাবে। তা সত্ত্বে যদি ও রাজী হয় তবে আমি ওর বৌদিকে বোঝাব।''

''কিন্তু আপনি না উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী?'' মধুমালতী অবাক হন। ''জুলির জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না?''

''চাকরি আর আমার ভালো লাগছে না, মিস মুস্তাফী। যত বড়োই হোক না কেন, চাকর তো!

কিন্তু আমার তো আপনার বাবার মতো প্রাইভেট প্র্যাকটিস জুটবে না। দোটানায় পড়েছি। তা বলে আমি ভয়ে জড়সড় নই। আমার বন্ধুপত্নী আমার বাড়ীতে উঠলে আমার জাত যাবে না। তবে এটাও ঠিক যে ও তো এখানে বেড়াতে আসছে না, আসছে একটা বৈঠকে অংশ নিতে, তাতে গরম গরম বক্তৃতাও শোনা যাবে। বক্তৃতা যদি রাজদ্রোহের পর্যায়ে পৌছয় মামলা মোকদ্দমাও রুজু হতে পারে। আমিই হতে পারি তার বিচারক। জুলিকে আমি জেলেও পাঠাতে পারি।'' মানস বলে শুষ্ক কণ্ঠে।

মধুমালতী চমকে উঠে বলেন, ''তাহলে কাজ নেই ওকে আপনার ওখানে চালান দিয়ে। বাবাকে বুঝিয়ে বলব, মাকে বুঝিয়ে বলব। আর ওকেও সচেতন করব। আমি যতদূর জানি ওরা একত্র হচ্ছে যুদ্ধকালে ওদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে। ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে যারা চায় তারা কি হিটলারকে জিতিয়ে দিতে চায়? স্টালিনের সঙ্গে হিটলারের একটা চুক্তি হয়েছে বলে হিটলারকে জিতিয়ে দিতে হবে, এটা কি একটা সুযুক্তি? জুলি যেন কখনো অমন কথা মুখে না আনে। শুনলে যেন তীব্র প্রতিবাদ করে।''

মানস জানতে চায় জুলি কি একলা আসছে না তার সঙ্গে কেউ আসছে। গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর স্টীমারযাত্রা, স্টীমারে ওঠা নামা কি ও একা ম্যানেজ করতে পারবে? যদি সঙ্গে মালপত্র থাকে।

''ওঃ আপনাকে বলিনি বুঝি!'' মধুমালতী এক গাল হাসে। ''সহযাত্রী হবেন সুকুমার দত্তবিশ্বাস। উনিই ওর মুশকিল আসান। বিলেতে লেডী হ্যারিংটনের কাছে ধর্না দিয়ে সুপারিশ আদায় করেছিলেন। বিলেতেই বসবাস করেন। মাঝে মাঝে দেশে এসে জুলির আপদে বিপদে পাশে দাঁড়ান। চেনেন নাকি!''

''বিলক্ষণ। বিলেতে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। দশ বছর দেখা হয়নি। তবে ওর বইয়ের দোকান থেকে বই আনিয়েছি।'' মানস স্মরণ করে।

''আমার সঙ্গে আলাপ নেই। তাই ওঁকে আমি বাড়ীতে থাকার আমন্ত্রণ জানাতে পারব না। ওঁকে সৌম্যদার আশ্রমে পাঠাব। কিন্তু তিনি তো বিলিতী খাবারে অভ্যস্ত। পারবেন কি আশ্রমিকদের মতো আকাঁড়া চালের ভাত খেতে? তার সঙ্গে অড়হরের ডাল, খোসাসুদ্ধ আলু সিদ্ধ, কাঁচা পেঁয়াজ আর শশার সালাড। নাঃ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই। তিনি আসছেন আমার বান্ধবীর রক্ষী হয়ে। আচ্ছা, সারকিট হাউসে কি কর্তারা অনুমতি দেবেন?'' মধুমালতী সুধায়।

''জায়গা থাকলে দিতে পারেন। আমি সুপারিশ করতে পারি। কিন্তু আমারই তো উচিত দত্তবিশ্বাসকে আমার হাউস গেস্ট করা। মিসেস মল্লিকের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাব। কই, উনি গেলেন কোথায়?''

সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে যূথিকা ততক্ষণে ক্যাপ্টেন মুস্তাফীর বাসভবনে মিসেস মুস্তাফীর সঙ্গে চায়ের পেয়ালা হাতে গল্প করছে। মেয়ের জন্যে একটি পাত্র ছাড়া বিধাতার কাছে তাঁর আর কোনো প্রার্থনা নেই। রাজবন্দিনী বলে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বিয়ে করতে কেউ সাহস পায় না। পুলিশ লাগবে পেছনে অথচ সরকার থেকেই বিবাহের প্রস্তাব উঠেছিল।

''বিয়ে করতে কেউ সাহস পায় না? বিপ্লবীরাও না?'' অবাক হয় যূথিকা।

''ওমা! তা কখন বললুম! বিপ্লবীদের সাহস আছে বইকি, কিন্তু কোনো মা বাপ কি তাদের একমাত্র মেয়েকে প্রাণ ধরে বিপ্লবীর হাতে তুলে দিতে পারে? কবে কী করে বসবে! ফলে ফাঁসী কি আন্দামান! না, আমিই সাহস পাইনে।'' ভদ্রমহিলা কথা ঘুরিয়ে নেন। ভীতির লক্ষণ তাঁর চোখে মুখে।

বলতে বলতে মধুমালতী এসে পড়ে। পিছু পিছু মানস।

''এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, মা? মিস্টার এম. এম. মল্লিক আই. সি. এস।'' মধুমালতী পরিচয় করিয়ে দেন।

''বোসো, বাবা। তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না। এতক্ষণ বৌমার সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প

করছিলুম। কেমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো বৌ পেয়েছ। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মিলি, তোর সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই, আয়। ওর ভালো নাম মধুমালতী, তা তো দেশের বেবাক লোক জানে। কিন্তু ওর ডাক নাম মিলি। মিলি আর জুলি। ওরা দুই বন্ধু। জুলিকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। জুলিকে কোথায় রাখি সেই হয়েছে সমস্যা। জুলি আমাদের পর নয়, ওর বাবা ক্যাপ্টেন সিন্‌হা মিলির বাবার বন্ধু ছিলেন। অকালে মনের দুঃখে মারা যান। যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সে স্বামী নয়, স্বামীজী। সেও মারা যায় অকালে। নিয়তি! নিয়তি! একেই বলে নিয়তি।" ভদ্রমহিলা চা তৈরি করে মানসের দিকে বাড়িয়ে দেন।

ক্যাপ্টেন মুস্তাফী কোথায় ছিলেন, চায়ের আসরে জাঁকিয়ে বসলেন।

"সমস্যা না কী যেন বলছিলে। ওঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলুম। কিসের সমস্যা? মিলি, তোমার মুখেই শুনতে চাই।" তিনি আদেশ করেন।

"শোন, বাবা। জুলি আমার বন্ধু, ও চায় আমার সঙ্গে দু'দিন কাটাতে। আমি যদি কলকাতা যাই আমিও তো চাইব ওর সঙ্গে দু'দিন কাটাতে। কিন্তু ও তো এমনি বেড়াতে আসছে না। আসছে বিপ্লবী গোষ্ঠীর বৈঠকে যোগ দিতে। ওদের সঙ্গে আমার মনের মিল নেই। তবু আমাকেও সন্দেহ করা হবে। তার জন্যে তুমিও বিব্রত হবে। মিস্টার মল্লিক নাকি জুলির স্বামীর বন্ধু। তিনি তাঁর স্ত্রীর সম্মতি পেলে জুলিকে তাঁদের ওখানে রাখার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। জুলি তো বিলেতের সেই জুলি নয় যাকে তিনি চিনতেন। সে বন্দীশিবিরে থেকেছে। ক্যাম্প কমাণ্ডান্টের মুখের উপর বলেছে, তোমরা একদিন আমাদের হৃদয় জয় করেছিলে, তাই তোমাদের জন্য মেসোপোটেমিয়ায় আমাদের ছেলেরা রক্ত দান করেছে। তার পুরস্কার হলো কিনা জালিয়ানওয়ালাবাগ। তোমরা আমাদের হৃদয় হারিয়েছ। শরীরটা দখল করে কদ্দিন রাখতে পারবে! আবার যদি যুদ্ধ বাধে কেউ কি তোমাদের জন্যে লড়তে যাবে? না একও জওয়ান, না একও রুপেয়া। এইসব কথা উচ্চারণ করেছিল কতকাল আগে। আবার হয়তো করবে তার গোষ্ঠীর বৈঠকে। তখন মল্লিকরা পড়বেন অথৈ জলে।" মধুমালতী বলে যায়।

"কাজ কী ওঁদের ঘাঁটিয়ে। জুলি এই বাড়ীতেই উঠবে। আমি ওর পিতৃবন্ধু। আমিই ওকে শাসিয়ে দেব ওসব যেন মুখে না আনে। যদিও তা আমারও মনের কথা। মা বদ সত্যমপ্রিয়ম্।" ক্যাপ্টেন সমস্যার সমাধান করেন।

"বাবা, তুমি বাঁচালে। নইলে হয়তো বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে যেত। কিন্তু এতই যখন করলে তো বাকীটুকুও করবে কি?" মধুমালতী দত্তবিশ্বাসের জন্য আশ্রয় চায়।

"দত্তবিশ্বাস! কে তিনি। কী তাঁর অভিপ্রায়।" ক্যাপ্টেন সন্দিগ্ধ হন।

"জুলির স্বামীর বন্ধু। জুলিকে বন্দীশিবির থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। লেডী হ্যাবিংটনের সেই চিঠি তিনিই বহন করে নিয়ে আসেন।" মধুমালতী মনে করিয়ে দেয়।

"ওঃ! তা হলে তো আমরাও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। একযাত্রায় পৃথক ফল কেন? দত্তবিশ্বাসও আমাদের এখানেই উঠবেন।" ক্যাপ্টেন স্ত্রীর দিকে তাকান।

মিসেস মুস্তাফী সায় দেন। মধুমালতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"আমি তো ভেবেছিলুম আমার পুরাতন বন্ধুকে আমাদের ওখানেই রাখব।" মানস যূথিকার দিকে তাকায়। "আচ্ছা তোমার মত নিয়ে।"

"তা আপনারা ওকে সাহেবী খানা খাওয়াবার দায় নিতে পারেন। অন্তত রাতের ডিনারটা।" মধুমালতী অনুরোধ করে।

"খুশি হয়ে।" মানস বলে, "কী বলো, জুঁই?"

"রাজী। কিন্তু আপনাদেরকেও ডিনারে আসতে হবে।" যূথিকা প্রস্তাব করে।

"আমার ওসব সহ্য হয় না, বাছা।" মিসেস মুস্তাফী বলেন।

"আমি ডায়েটে আছি।" ক্যাপ্টেন ওজর দেখান।

শেষপর্যন্ত এই স্থির হয় যে মধুমালতী তাঁর দুই অতিথিকে নিয়ে মল্লিকদের ওখানে ডিনারে আসবে। যতদিন ওঁরা থাকবেন।

যূথিকা বলে, "আমাদের ডিনার টেবিলে আরো একজনের ঠাঁই হবে। আরো একজন পুরুষের। কাকে ডাকব?"

মানস উত্তর দেয়, "সৌম্যদাকে। ও যদি শহরে থাকে। দশবছর বাদে আমরা চারজন একত্র হব। সৌম্যদা আর আমি, জুলি আর দত্তবিশ্বাস।"

"মিসেস মল্লিক," মধুমালতী বলে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে, "পারেন তো কিছু আকাঁড়া চাল, অড়হর ডাল, পালং শাক আর রসুন জোগাড় করে রাখুন। একজনকে সাহেবী খানা খাওয়াতে গিয়ে আরেকজনকে অভুক্ত রাখবেন না। আমার কথা যদি বলেন, আপনারা যা খান আমিও তাই খাব।"

"আমরা আজকাল নিরামিষ খাই, মিস মুস্তাফী। মাছমাংস ছেড়ে দিয়েছি। তবে রান্নাটা হয় ইউরোপীয় ধরনে। রাঁধে মগ বাবুর্চি। আর সার্ভ করে মুসলমান খানসামা। আপত্তি নেই তো?" যূথিকা প্রশ্ন করে।

"আপত্তি? কিসের আপত্তি? ওরাও তো মানুষ। ওরাও তো ভারতীয়। আমার অত শুচিবাই নেই। যেটুকু ছিল ডিটেনশন ক্যাম্পে সেটুকুও গেছে। মগের রান্নার কি তুলনা আছে? মগের মুলুক যদিও কাম্য নয়। আর মুসলমান বাবুর্চিরাই তো আমাদের কোর্মা কালিয়া কোপ্তা কাবাব রেঁধে খাওয়াত। হিন্দু মুসলিম একতা কি নিরামিষ খেয়ে হয়?" মধুমালতী সহাস্যে বলে।

"আচ্ছা, জেনে নিলুম আপনি কী খেতে ভালোবাসেন। তবে আমরা নিরামিষ ধরলেও ডিমটা ছাড়িনি। বাচ্চারা পুডিং খেতে ভালোবাসে। আমরাও। আশা করি আপনিও।" যূথিকা আশ্বাস দেয়।

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। আমিও মাঝে মাঝে মুখ বদল করতে ভালোবাসি, কিন্তু আমার জন্যে মাছমাংস রাঁধতে হবে না। শুধু মিস্টার দত্তবিশ্বাসের জন্যেই রাঁধতে বলবেন।" মধুমালতী চিন্তা দূর করে।

"কেন জুলি আমিষ খাবে না?" মানস আশ্চর্য হয়।

"মল্লিক সাহেব, আপনি কি ভুলে গেছেন যে জুলি বিধবা?" মধুমালতী বলে।

"জুলি কোনোকালেই সধবা ছিল না। ওটা একরাতের ব্যাপার। পরের দিনই ওর স্বামী বিলেত চলে যায়। স্বামীর সন্ধানে জুলিও অবশেষে বিলেতে হাজির হয়। কিন্তু ভাঙা হৃদয় আর জোড়া লাগে না। না, জুলি সধবাও নয়, বিধবাও নয়। সে কুমারী।" মানস জোর দিয়ে বলে।

"তা কি আমি জানিনে?" মধুমালতী দৃঢ়স্বরে বলে, "তবু এটাও জানি যে ওর মনের ভিতর বৈধব্যের সংস্কার নিহিত রয়েছে। সেইজন্যেই ওর মা ওর বিয়ে দিতে পারছেন না।"

"মেয়েদের বিয়ে ক'বার হয়!" ফোঁস করে ওঠেন মিসেস মুস্তাফী। "আবার বিয়ে দিলে সেই পাপে আবার বিধবা হতেও পারে। কাজ কী ওকে আবার দুঃখ দিয়ে?"

ক্যাপ্টেন মুস্তাফী এতক্ষণ নীরবে শুনছিলেন। বলেন, "সুখেরও তো অন্য পথ নেই। মেয়েটা সারাজীবন দুঃখ পাবে এই বা কেমন কথা! যেক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রী সম্পর্ক পাকা হয়নি সেক্ষেত্রে বিবাহটা এমনিতে অসিদ্ধ। জুলিকে অভয় দিয়ে বলিস, মিলি, যে বয়স থাকতে ও যেন আবার বিয়ে করে ও মা হয়। নয়তো পরে পশতাবে।"

"আচ্ছা, বাবা, তোমার মনের কথাটা তো এই যে, বিপ্লব মেয়েদের দিয়ে হবার নয়। শ্বশুরবাড়ীর ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক থাকাই ওদের ভাগ্য। অথবা বাপের বাড়ীর।" মধুমালতীর কণ্ঠস্বরে বিদ্রোহ।

"মল্লিক সাহেব, আমি আপনার কোর্টে আপীল করছি," ক্যাপ্টেন মুস্তাফী করযোড়ে বলেন,

"আপনি অনেক পড়াশুনা করেছেন, অনেক দেশবিদেশেও ঘুরেছেন, আপনি এই অবুঝ মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিন দেখি যে, যাদের দেশে রুশো জন্মাননি, ভলতেয়ার জন্মাননি, বিপ্লবের জন্যে মাটি তৈরি হয়নি, বীজ বোনা হয়নি সেদেশে বিপ্লবের ফল ফলতে পারে না। তরুণ প্রাণের অপচয় দেখে কষ্ট হয়।"

মানস কী বলতে যাচ্ছিল, মধুমালতীর মুখের ভাব লক্ষ করে থেমে যায়। ওরও কষ্ট হয় তরুণীর জীবনের অপচয় দেখে।

"কেন, বাবা, রুশো ভলতেয়ার যেদেশে জন্মাননি সেদেশেও কি বিপ্লব হয়নি? রাশিয়ার দিকে তাকাও।" মধুমালতী উত্তাপের সঙ্গে বলে।

"সেদেশেও শতাব্দীকাল ধরে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছিল। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল মার্কসবাদী চিন্তাধারা। ওরাও কর্ষণ করেছিল ইনটেলেকটের। তোদের মতো খালি ইমোশনের নয়। শুধু রক্ত দিলেই বিপ্লব হয় না। দিতে হয় কঠোর মানসিক শ্রম। মার্কস বলো, লেনিন বলো, কী প্রচণ্ড এঁদের মানসিক সাধনা!" ক্যাপ্টেন মুস্তাফী ও ঘরে যান।

"বাবার কথা সত্য হলে আরো একশো বছর। আমরা কেউ দেখে যেতে পারব না ভারতের বিপ্লব।" মধুমালতী হতাশায় ভেঙে পড়ে।

ওর মা অত শত বোঝেন না। বলেন, "একশো বছর লাগে লাগবে। বিপ্লব তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ভারতও পালিয়ে যাচ্ছে না। পালিয়ে যাচ্ছে তোর আর তোর বান্ধবীদের জীবন যৌবন। বিয়ে থা কর, ঘরসংসার কর, আমরা আর ক'টা দিন আছি, আমাদের শেষবয়সে একটু শান্তি দে। জুলির মার জন্যে অবশ্য তেমন কোনো সান্ত্বনা নেই। ও মেয়ের বিয়ে আর হবার নয়।"

মানস ও যূথিকা বিদায় নেয়। মধুমালতী এগিয়ে দেয়।

বাড়ী ফেরার পর যূথিকা মন খোলে। "তুমি যাঁদের ডিনারে ডেকেছ তাঁদের মধ্যে দু'জন হচ্ছেন ডিটেনশন ক্যাম্পের প্রাক্তন বন্দিনী। আরেকজন গান্ধীজীর সঙ্গে যেরওয়াদা জেলের প্রাক্তন বন্দী। এর জন্যে তোমাকে সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না?"

"হতে পারে। তা বলে আমি আমার যৌবনের বন্ধুদের সঙ্গে সেকালের মতো মিশতে পারব না? হারানো যৌবনকে একদিন কি দু'দিনের জন্যে ফিরে পাব না? চাকরি করছি বলে কি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি।" মানস ফেটে পড়ে।

"আহা, অত বিরক্ত হচ্ছ কেন? পুলিশের সঙ্গে তোমার যেমন মধুর সম্পর্ক মধুমালতীর জন্যে সেটা মধুরতর হবে না তো?" কটাক্ষ করে যূথিকা।

"জুলিকে নিমন্ত্রণ করলে মধুমালতীকেও নিমন্ত্রণ করতে হয়। জুলি হচ্ছে মধুমালতীর অতিথি। খুবই খারাপ দেখাত যদি মধুমালতীকে বাদ দিতুম। তুমি নিজেই তো ওঁদের সবাইকে ডাকছিলে।" মানস তর্ক করে।

"সবাইকে ডাকলে কথা ওঠে না। ক্যাপ্টেন মুস্তাফী এখানকার সেরা ডাক্তার। পুলিশ সাহেবের কুঠিতেও তাঁর ডাক পড়ে।" যূথিকাও যুক্তি দেখায়।

"তা হলে দেখো, পুলিশ থেকে কেউ আমার নামে লাগাবে না। লাগালে লাগাবে বিপ্লবীরাই। কেন মধুমালতীর এত খাতির? কিন্তু জুলিকে ডাকলে ওর বান্ধবী মিলিকেও ডাকতে হয়? আরে, জুলি হলো আমার বন্ধুজায়া। জুলি বিপ্লবী হবে আমি এটা কল্পনাও করতে পারিনি। ওর নিজের মুখেই জানতে ইচ্ছে করে কেন ওর এই পরিবর্তন হলো।" মানস কৌতূহল প্রকাশ করে।

"ওর শুভানুধ্যায়ী নাকি ইংরেজদের মধ্যেও ছিলেন। লেডী হ্যারিংটন না থাকলে ও ছাড়া পেত না বোধহয়।" যূথিকা বলে।

"লেডী হ্যারিংটন ভারতীয়দের সকালের বন্ধু। লণ্ডনে ওঁদের একটা সমিতি ছিল। তাঁর কাজ ছিল

ভারতীয়দের বিপথে যেতে দেখলে সুপথে ফিরিয়ে আনা। বিশেষ করে তরুণ তরুণীদের। আমিও ওঁর সঙ্গে চা খেয়েছি। জুলিকে উনি স্নেহের চোখে দেখতেন। জুলির মা ওঁরই পরামর্শে বিধবা মেয়েকে নিয়ে বিলেতেই থেকে যান ও নিজে মন্টেসরি ট্রেনিং নেন। মেয়েকেও কোথায় যেন ভর্তি করে দেন। আমার ফিরে আসার বছর দুই বাদে ওঁরাও ফেরেন। কলকাতায় মন্টেসরি স্কুল স্থাপন করেন। এমন সময় হঠাৎ খবর পাই জুলিকে ধরে নিয়ে গেছে। ওর ঘরে নাকি চোরাই রিভলভার পাওয়া যায়। জুলির বক্তব্য হলো ওর ঘর সব সময় তালাবন্ধ থাকে না। নিচের তলায় স্কুল। কে কখন জল খেতে উপরে উঠে আসে। ঘরে ঢোকে। বাথরুমে যায়। জুলি কি পাহারা দিচ্ছে নাকি? রিভলভারটা বাইরের কেউ এসে লুকিয়ে রেখে গেছে। সন্দেহের অবকাশ থাকলে মামলা আইনের ধোপে টেকে না। তাই ওকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক করা হয়।" মানস যতটুকু জানে জানায়।

"কিন্তু বিলেত ফিরে না গিয়ে ও বম্বেতে যাত্রাভঙ্গ করে কেন? সরকার টের পেলে আবার ধরে এনে ডিটেন করত না?" যূথিকা প্রশ্ন করে।

"যাত্রাভঙ্গ করে সৌম্যদার সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগের ফলে। সৌম্যদাকে ও ভক্তি করত। স্বামীর বন্ধুদের মধ্যে ওকেই ও মানত। সৌম্যদা ওকে বোঝায় যে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ওকে বাংলাদেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় পুণাতে থাকলেও। পরে ওর মা সরকারকে লিখে অনুমতি আনিয়ে নেন। পুণায় সৌম্যদা য়েরওয়াদা জেলে বন্দী থাকতেই হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ছাড়া পেয়ে বম্বে গিয়ে কিছু রসদও জোগাড় করে। মহাত্মার একজন কাছের মানুষ সৌম্যদা পরে মহাত্মার আহ্বানে সেগাঁওতেও যায়। জুলিকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে থাকতেই ও সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে। কিন্তু গান্ধীজীর কর্মপন্থা ওর মনে ধরে না। সৌম্যদা সেগাঁওতে যেতেই জুলি ওর মায়ের কাছে ফিরে আসে। ততদিনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেমেছে। জুলি স্কুল চালানোর কাজে মাকে সাহায্য করে।" মানস বলে যায়।

"তা হলে ও আর বিপ্লবী নয়?" যূথিকা আশ্বস্ত হয়।

"সন্ত্রাসবাদী নয়। কিন্তু বিপ্লবী কথাটার অর্থ আরো ব্যাপক। যারা সরকার ওলটপালট করে তারাও বিপ্লবী, যারা সমাজ ওলটপালট করে তারাও বিপ্লবী। যারা বোমা রিভলভার দিয়ে খুন খারাপী করে তারাও বিপ্লবী। যারা বিদ্রোহী জনতাকে দিয়ে জেলখানা উড়িয়ে দেয় তারাও বিপ্লবী। জুলি শুনছি একটা বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। জানিনে ওরা কী রকম বিপ্লবী। সৌম্যদাকে ও মানে। ভক্তি করে। নতুন করে যোগাযোগ হলে সৌম্যদার প্রভাবে জুলি বিপ্লবী মতবাদ ত্যাগ করতেও পারে।" মানস আশা প্রকাশ করে।

"সৌম্যদার উপরে তোমার অগাধ বিশ্বাস। এটা কি সেই বিলেত প্রবাসের সময় থেকে?" যূথিকা বলে পরিহাসের সুরে।

"আরো আগে থেকে। তুমি বোধহয় জানো না যে আমিও একদা অসহযোগী ছিলুম। সৌম্যদা আমাদের ফ্রেণ্ড, ফিলসফার, গাইড। ও জেলে যায়, আমি যাইনে। তার থেকে ছাড়াছাড়ি। বিলেতে আবার বন্ধুমিলন। দেশে ফিরে ও এবার জেলে যায়, আমি ওর মতো সত্যাগ্রহীদের জেলে দিই। কী করি, বলো? অপ্রিয় কর্তব্য। এমন চাকরি কি কারো ভালো লাগে? একদিন হয়তো জুলিকেও জেলে পাঠাতে হবে। সৌম্যদাকেও।" মানস করুণ স্বরে জানায়।

"এড়াবার জন্যে তুমি চাকরি ছাড়তে চাও। এই তো?" যূথিকা গম্ভীর।

"যা বলেছ। কিন্তু এখনো মনঃস্থির করতে পারিনি। কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের বোঝাপড়ার সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধকালে সত্যাগ্রহ নাও হতে পারে। কংগ্রেস নেতারাই দিল্লীর মসনদে বসতে পারেন।" মানস দোদুল্যমান।

"যাক, এখন সৌম্যদাকে নিমন্ত্রণ কর। উনি এই শহরে থাকেন, অথচ একদিনও আসেন না। সেই যে কলকাতায় একবার দেখা হয়েছিল সেই শেষ দেখা। আমার সঙ্গে প্রথম দেখাও বটে। আশা করি নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন এই বন্ধুজায়ার খাতিরে নয়, আরেক বন্ধুজায়ার খাতিরে।" যূথিকার কণ্ঠে অভিমান।

"সৌম্যদাও তো বলতে পারে, ছ'মাস হলো বদলী হয়ে এসেছি, ওর সঙ্গে দেখা করতে ওর আশ্রমে যাইনি। আমার দিক থেকে গাফিলতি হয়নি তা নয়।" মানস দোষী বোধ করে। বন্ধুকে বাঁচায়। চিঠি লিখে মাফ চায়।

ওদিকে মধুমালতীও ওকে খবর পাঠিয়েছিল। সৌম্য শহরের বাইরে ছিল। ফিরে এসে খবর পায়। সঙ্গে সঙ্গে মানসকে চিঠি লেখে। দু'জনের দুই চিঠি দু'জনের হাতে একই সময়ে পৌছয়। সৌম্যও মাফ চেয়েছে। আসি আসি করে আসা হয়ে ওঠে না। হাতে এনতার কাজ। যূথিকাকে ও বাচ্চাদেরকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল। জুলির সঙ্গে দেখা হবে শুনে খুশি। দত্তবিশ্বাসের কথাও ওর মনে আছে।

।। দুই ।।

ডিনার তো রাত আটটায়। তার তিন ঘণ্টা আগেই ছিমছাম বিলিতী পোশাকপরা একজন সমুপস্থিত। চাপরাশি তাঁকে সেলাম করে বলে, "সাহেব গেছেন ক্লাবে টেনিস খেলতে। ফিরতে দেরি হবে। মেমসাহেব আছেন।"

"তাঁকে সেলাম দিয়ে বল মিস্টার দত্তবিশ্বাস।" আগন্তুক ড্রইং রুমে বসেন।

"স্বাগতম্। স্বাগতম্।" বলে ছুটে বেরিয়ে আসে যূথিকা। এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কই, আর দু'জনা কোথায়?"

"ওরা আসবেন যখন ডিনারের সময় হবে। ওঁদের জন্যে অপেক্ষা না করে আমি চলে এসেছি মল্লিকের সঙ্গে আমার পুরনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিতে। আপনি তখন ছিলেন না। আপনার সঙ্গেও আলাপ জমাতে চাই। প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে আমি সামনের মাসের গোড়ার দিকেই বিলেত ফিরে যাচ্ছি। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, কনভয়ের অভাবে আর যাত্রী জাহাজ চলাচল করবে না। আমারটাই শেষ যাত্রী জাহাজ। বেঁচে থাকলে ফের দেখা হবে, কিন্তু সে যে কবে তা কেউ ভবিষ্যদ্ বাণী করতে পারে না। যুদ্ধ যদি ছড়ায় তবে হার জিৎ হয়তো সাত বছর বাদে। আমার তো এদেশে কাজ নেই, কর্ম নেই, বৌ নেই, বাচ্চা নেই। আমার প্রাণটার এমন কি দাম যে সেটাকে বাঁচানোর জন্যে এদেশে পড়ে থাকতে হবে! যখন জানি যে কেউ আমাকে চিনবে না, কেউ আমাকে পুছবে না। আমার পক্ষে ওদেশই ভালো। আমার নিজের একটা আস্তানা আছে। আর আছে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বুকশপ। তবে ভাবনার কথা এই যে, আমার খদ্দেররা বেশীর ভাগ ভারতে থাকে। যুদ্ধের হিড়িকে তাদের মেল অর্ডার সরবরাহ করা সম্ভব হবে না।" দত্তবিশ্বাসকে উদ্বিগ্ন দেখায়।

"তা হলে ফিরে গিয়ে কাজ কী? তার চেয়ে এইখানেই একটা দোকান টোকান দিয়ে বসে যান।" যূথিকা পরামর্শ দেয়।

"না, মিসেস মল্লিক। এখানে আমার তেমন কনটাক্টস নেই। ওখানে যেমন আছে। লর্ড ও লেডীদের থেকে শুরু করে কে না চেনে আমাকে! কন্টিনেন্টের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ আছে। তবে তাতে ছেদ পড়বে হিটলার যদি পোলাণ্ড থেকে ঘুরে হলাণ্ড আক্রমণ করে। যুদ্ধে এবার সব যুবককে কন্‌স্ক্রিপট করে ইংরেজরাও নানান কাজে লাগিয়ে দেবে। আমাকেও যদি ধরে নিয়ে যায় তো আমিও একটা কাজ পেয়ে যাব। হতে পারে দমকল বাহিনীর কি হোম গার্ডের কাজ। বড়ো বড়ো বইয়ের দোকানের কর্মচারীরা যুদ্ধে চালান গেলে তাদের পদও তো খালি হবে। আমি বারো বছর ওদেশের

বাসিন্দা হয়ে ওদেশের পাশপোর্ট পেয়ে গেছি। কিছু না হোক বেকার ভাতা তো আমি পাবই। প্রাণের ভয় আছে, জীবিকার ভয় নেই। এদেশে ঠিক বিপরীত। কেন থাকব? কার আকর্ষণে থাকব?'' দত্তবিশ্বাস বিলাপ করে।

''বুঝেছি। যাকে বিয়ে করতে চান তিনি রাজী নন। আমি কি তাঁকে চিনি? চিনলে ঘটকালি করতে পারি।'' যূথিকা সকৌতুকে বলে।

''চেনেন বইকি। আজকেই তো ডিনারে ডেকেছেন।'' দত্তবিশ্বাস আভাস দেয়।

'' কোন্‌জন বলুন তো! মধুমালতী?'' যূথিকা একটু খেলায়।

''বলেন কী। মধুমালতী। দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। ওঁর উপযুক্ত বর কোনো এক মহান নেতা। আমি অতি সামান্য মানুষ।'' দত্তবিশ্বাসের চোখে ভীতি।

''তাহলে কি মঞ্জুলিকা? সেও তো বিপ্লবী নায়িকা।'' যূথিকা বলে।

''ওর জননীর ইচ্ছা আমি ওকে বিপ্লবের বিপথ থেকে নিবৃত্ত করি। ওঁর কথাতেই দু' দু'বার প্রস্তাব করেছি, দু' দু'বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। কাল স্টীমারেও আরো একবার প্রস্তাব করেছি। এবার প্রত্যাখ্যাত হলে চিরবিদায়।'' গোপন কথাটি ফাঁস করে দেয় দত্তবিশ্বাস।

যূথিকা অনুমান করেছিল যে দত্তবিশ্বাসের আকর্ষণের চুম্বক আর কেউ নয়, জুলি। ওই চুম্বকই ওকে বিলেত থেকে দেশে টেনে নিয়ে এসেছে। কলকাতা থেকে সুদূর পূর্ববঙ্গে। যেখানে তেমন কোনো দ্রষ্টব্য নেই সেখানে শুধু শুধু এস্‌কর্ট হতে কে রাজী হয়। স্টীমারই বিবাহপ্রস্তাবের মনের মতো স্থান।

যূথিকা একটু ভেবে নিয়ে বলে, ''আমার সহযোগিতা স্বচ্ছন্দেই প্রত্যাশা করতে পারেন, মিস্টার দত্তবিশ্বাস। ফল কী হবে জানিনে, তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে, মিস্টার দত্তবিশ্বাস।''

''অতবার মিস্টার দত্তবিশ্বাস বলে লজ্জা দেন কেন? আমি মানসের পুরনো বন্ধু, সেই সূত্রে আপনারও। সুকুমার বলতে কি বাধবে? যদি বাধে তবে সুকুমারদা বলবেন।'' দত্তবিশ্বাস অনুরোধ জানায়।

''তা হলে আপনিও আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না।'' যূথিকা অনুনয় করে।

''অল রাইট। যূথি, তুমি কী শর্ত আরোপ করতে চাও?'' দত্তবিশ্বাস জানতে চায় বিশেষ আগ্রহভরে।

''শর্তটা—'' যূথিকা ইতস্তত করে।

''বলো, বলো, বলেই ফ্যালো।'' দত্তবিশ্বাস পীড়াপীড়ি করে।

''জুলি যদি তার বৈধব্যের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে না পারে তা হলে আপনি ওকে আরো সময় দেবেন। চাইকি আরো সাতবছর। সেটা যদি আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়—পুরুষমানুষের পক্ষে হবেই তো—তা হলে আমার দ্বিতীয় শর্ত আপনি আর কালবিলম্ব না করে মধুমালতীর কাছে প্রস্তাব পেশ করুন। মনে করুন এটা একটা জুয়ার দান। লেগে যায় তো ভালো, না লাগে তো উত্তম। আর ওই যে আপনার মহাবিদ্যাভীতি ওটা অমূলক। মধুমালতী কবে বিপ্লবী ছিলেন, এখন অন্য মানুষ। আপনার ও ধারণা এককালে ঠিক ছিল, এখন ভুল।'' যূথিকা ঘটকালি করে।

শক কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগে। ''বৈধব্যের সংস্কার। ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। বিলেতে পড়াশুনা করেছে। বিপ্লবী নায়িকা। তারও কিনা শুনি বৈধব্যের সংস্কার! দ্যাট বীটস মী! আমি হেরে গেছি। দাও, দাও, বোন, একটু বিষ টিষ থাকলে দাও। এ প্রাণ আমি আর রাখব না।'' দত্তবিশ্বাস কাতরোক্তি করে।

''অ্যালকোহল বলছেন? না, হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, জিন ইত্যাদি এ বাড়ীতে পাবেন না। লেমন স্কোয়াশ, অরেঞ্জ স্কোয়াশ, জিঞ্জার এল দিতে পারি। লেমন বার্লি খাবেন?'' যূথিকা খানসামাকে ডাকে।

"না, না, ওসব কিছু না। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। ওঃ আমার মাথা ঘুরছে। বৈধব্যের সংস্কার! জানো, যূথি? ওর জন্যেই আমি এতদিন বিয়ে করিনি। নইলে ওদেশেই আমার বিয়ে হয়ে যেত। গার্ল ফ্রেণ্ডদের একজনের না একজনের সঙ্গে। দেখতে আমি বোধহয় কুপুরুষ নই?" দত্তবিশ্বাস একটু গর্বের সঙ্গে বলে।

"কে বলে কুপুরুষ? দস্তুরমতো সুপুরুষ।" যূথিকা মনে মনে হাসে।

"বৈধব্যের সংস্কার মুছে যেতে আরো সাতবছর লাগবে। ততদিনে বানপ্রস্থের বয়স হয়ে থাকবে। আমি আর অপেক্ষা করব না, যূথি। কিন্তু যাঁকে বিয়ে করতে বলছ তিনি কি আমার মতো একটা নগণ্য পুরুষকে বরণ করতে ঘৃণা বোধ করবেন না? তিনি কি আমার সঙ্গে বিলেতে গিয়ে ঘর বাঁধতে রাজী হবেন? সামনের মাসেই আমার শেষ জাহাজ। তিনি কি সেই জাহাজে আমার সহযাত্রিণী হতে প্রস্তুত হবেন? কী দরকার এ জুয়াখেলার? হার যেখানে ধ্রুব।" দত্তবিশ্বাস গ্লাসে চুমুক দেয়।

যূথিকা অভয় দিয়ে বলে, "ওসব আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন, দাদা। আপনি শুধু একটিবার জানতে দিন যে মধুমালতীকে আপনার পছন্দ হয়েছে।"

"তার আগে আমি একবার জুলির সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে চাই। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে জুলির ওটা বৈধব্যের সংস্কার। পুত্রশোকে কাতর হয়ে ওর শ্বশুর মশায় লম্বা ছুটি নেন ও অকালে রিটায়ার করেন। তার পরে সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে বৃন্দাবনবাসী হন। জুলির নামে তাঁর এস্টেট থেকে মোটা মাসোহারা আসে। সেটা কিন্তু ততদিন ওর পাওনা যতদিন ও তাঁর পুত্রবধূ। জুলির বাবাও ওর নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। ওর কিসের অভাব! অভাবটা ওর বিপ্লবী গোষ্ঠীর। ওব মাসোহারার টাকা ওদেরই ব্যবহারে লাগে। ওরাই বোধহয় ওকে আবার বিয়ে করতে দিচ্ছে না।" দত্তবিশ্বাসের অনুমান।

"বেশ তো। জুলির সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্যে সময় নিন। কলকাতা ফিরে যাবার আগে আমাকে কিন্তু জানিয়ে যাবেন কী স্থির হলো।" যূথিকা বলে।

"না, না, ওকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে না দিয়ে চূড়ান্ত বোঝাপড়া নয়। আমি এসেছি ওর এস্কর্ট হয়ে। ফিরে যাব এস্কর্ট হয়ে। কলকাতা থেকে মানসকে আমি টেলিগ্রাম করে জানাব জুলি না মিলি কাকে আমি বিয়ে করতে চাই। তার আগে কাউকেই কোনো আভাস দিয়ো না। খাবার টেবিলে আজ আমাকে বসাবে দু'জনের মাঝখানে?" দত্তবিশ্বাস অনুরোধ জানায়।

"তা কী করে সম্ভব, সুকুমারদা? ছ'জনের টেবিল ওভাবে সাজানো যায় না। আমি মনে মনে ঠিক করেছি মানস আর আমি বসব মুখোমুখি দুই প্রান্তে। মানসের ডান দিকে জুলি, বাঁ দিকে মধুমালতী। আমার ডান দিকে আপনি, বাঁ দিকে সৌম্যদা। আপনার বাঁ দিকে জুলিকে বসালে আমি বসব কোথায়? মানসের ডান দিকে? স্বামী আর স্ত্রী পাশাপাশি বসে না। সেটা বিয়ের বেদীতে মানায়, কিন্তু খাবার টেবিলে বেমানান।" যূথিকা হেসে উড়িয়ে দেয়।

"আচ্ছা, এমন তো হতে পারে। আমি বসব মানসের জায়গায়, মানস বসবে আমার জায়গায়।" বিকল্প প্রস্তাব করে দত্তবিশ্বাস।

"একই কথা। স্বামীস্ত্রী পাশাপাশি। আপনি বিলেতে বসবাস করেন। আপনাকে এটিকেট শেখাতে যাব আমি! আমি তো ওদেশে যাইনি।" যূথিকা হাসে।

"না, ওটাও বেমানান। আমার মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে। আচ্ছা, যূথিকা, মানসদের ক্লাবে বিয়র টিয়র রাখে?" দত্তবিশ্বাস প্রশ্ন করে।

"রাখে বই কি। ওটা ইউরোপীয়ান ক্লাব।" উত্তর দেয় যূথিকা।

"তা হলে আমাকে অনুমতি দাও, আমি মানসেব সন্ধানে যাই। ও নিজে না থাক, আমাকে

খাওয়াবে। ওটাই এটিকেট।'' দণ্ডিশ্বাস ছুটি নেয়।

যূথিকা চাপরাশিকে বলে সাহেবকে ক্লাবে পৌঁছে দিতে।

বাচ্চা দুটি বাইরে খেলা করছিল। ওদের সঙ্গে ছিল বেয়ারা আর আয়া। দূর থেকে দেখা গেল পায়ে হেঁটে আসছেন কম্পাউণ্ডের ভিতরকার রাস্তা দিয়ে এক সাদা খদ্দরের ধুতী ও হাতকাটা জামা পরা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। কাঁধ থেকে নেমেছে পাট দিয়ে তৈরি এক ঝোলা। মাথায় গান্ধী টুপী।

খবর পেয়ে যূথিকা বেরিয়ে আসে। ''সৌম্যদা নাকি? এতদিন পরে মনে পড়ল। সেটা কি জুলির গুণে না আমাদের গুণে?''

''জুলি না এলেও আমি আসতুম। কই, তোমার বাচ্চারা কোথায়? আয়, দ্যাখ, কী এনেছি তোদের জন্যে। বাঘ, ভালুক, হাতী, সিংহ, বাজপাখী।'' সৌম্য তার ঝোলা উজাড় করে দেয়। সব গ্রাম্য কারিগরের তৈরি কাঠের খেলনা। দেশী রঙে ছোপানো।

''সাপ! সাপ নেই কেন?'' জিজ্ঞাসা করে সাতবছরের ছেলে দীপক।

''তাই তো। আনতে ভুলে গেছি। আবার যখন আসব সাপ নিয়ে আসব। সাপ খেলাবার বাঁশিও আনব তার সঙ্গে।'' সৌম্য তাকে কাছে টেনে নেয়। আর তার বোন মণিকাকে তুলে নিয়ে কাঁধে বসায়।

''এই! তোমরা প্রণাম করলে না কেন! করো, করো। ইনি কে জানো? জ্যাঠামশায়। গান্ধী মহারাজের শিষ্য।'' যূথিকা ওদের প্রণাম করায়।

''এসব ফিউডাল প্রথা তুলে দেওয়াই ভালো। ছোট বড়ো সবাই সবাইকে প্রণাম করতে পারে না। যেটা সবাই সবাইকে করতে পারে সেটা ওদের ওই গুড মর্নিং বা গুড ইভনিং। কিন্তু ওর বাংলা করতে গেলে কৃত্রিম শোনায়। এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।'' সৌম্য তার সঙ্গে জুড়ে দেয়, ''মেয়েদেরও।''

''শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম না করে 'সুপ্রভাত' বলে অভিবাদন করবে কোন্ বৌমা! দেখবে, তোমার স্বরাজের পরেও কারো সাহসে কুলোবে না। এমন কি, ওদের বিপ্লবের পরেও না।'' যূথিকার ইঙ্গিতটা জুলি ও মধুমালতীর প্রতি।

''না, ওদেরও অত সাহস হবে না। সব চেয়ে কঠিন প্রাত্যহিক ব্যবহারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফরাসীরা চাকরকে বলে, 'মঁসিয়ে', ঝিকে বলে, 'মাদাম', তাদের তুই তোকারি করে না। বলে, 'আপনি'। ফরাসী বিপ্লব অনেক দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এদিক থেকে নয়। জুলিকে দিয়ে তুমি তোমার বেয়ারাকে 'মশাই' বলিয়ে নিতে পারবে? আর মধুমালতীকে দিয়ে তোমার আয়াকে 'ঠাকরুণ'? দাঁড়াও, আমিই ওটা শুদ্ধ করে দেব।'' সৌম্য মজা দেখতে চায়।

''এখন নয়। এই মুহূর্তে নয়।'' যূথিকা শশব্যস্ত হয়ে বলে। ''ওরা হয়তো ঠাওরাবে আস্ত পাগল। এমনিতেই তো দাড়িগোঁফে ঢাকা পড়েছে মুখ। দেখলে মনে হয় আদিম গুহামানব।''

''আমি বিলিতী ক্ষুর বর্জন করেছি। দেশী ক্ষুর দিয়ে কামালে ছালশুদ্ধ উঠে আসে। তা ছাড়া এতে কতকটা মুনি ঋষির মতো দেখায়। গ্রামের লোক কথা শোনে। মৌলানা মৌলবীর সঙ্গেও মিল আছে। মুসলমানদের শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। আমার তো পূর্ববঙ্গে আসার কথা ছিল না। আমার স্থান বিহারে। গান্ধীজী আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস উজ্জীবিত করতে। দুই পক্ষেই সাম্প্রদায়িক শক্তি অবিশ্বাসের বীজ বুনে চলেছে। আমি যেখানেই যাই হিন্দুদের বলি মুসলমানরা তোমাদের শত্রু নয়। মুসলমানদের বলি হিন্দুরা তোমাদের শত্রু নয়।'' সৌম্য ব্যাখ্যা করে তার মৈত্রীতত্ত্বের।

''ওতে কিছু হবে না, সৌম্যদা। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। কেউ কারো হাতে জল খাবে না। ছোঁওয়া লাগলে স্নান করবে। মানুষকে যতরকমে পারে অপমান করবে। এ কি আজকের সমস্যা না সাত শতকের? এ ভেদবুদ্ধি ইংরেজের সৃষ্টি নয়। এর সুযোগ নিচ্ছে ইংরেজ। তোমরা ইংরেজকে তাড়াতে পারো, কিন্তু নিজেদের অতীতের ভূতকে তাড়াতে পারবে না। সে তার ভুতুড়ে কাণ্ড করে যাবেই।

আমরাও চেষ্টা করছি মেলাতে মিলতে। আজকের ডিনারেই দেখবে বৌদ্ধ বাবুর্চি ও মুসলমান খানসামা হিন্দু ও ব্রাহ্মর আহার জোগাচ্ছে।'' যূথিকা নিবেদন করে।

''আমার কথা যদি বলো আমি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান ব্রাহ্মণ হরিজন ইতর ভদ্র সকলের হাতেই খাই। কিন্তু সব কিছু খাইনে। আমিষ চলে কিন্তু তেল ঘি চলে না, ময়দা চলে না।'' সৌম্য তার খাদ্যের কথা বলে।

''মধুমালতীর কাছে শুনেছি। তবে আমার ধারণা ছিল আপনি যখন গান্ধীজীর শিষ্য তখন মাছমাংস খান না। আমরাও খাইনে, তবে তার কারণ অন্য।'' যূথিকার চোখ ছলছল করে।

''আগে তো খেতে।'' সৌম্যর মনে পড়ে।

''আপনি জানেন না বুঝি?'' যূথিকা ধরা গলায় বলে, ''এখানে বদলী হয়ে আসার মুখেই একজনকে হারাই। জীবনযাত্রাকে শুদ্ধ করতে হবে, সরল করতে হবে, সেকথা ভেবে আমিষ ত্যাগ করি। তবে প্রোটিনের জন্যে ডিমটা ছাড়া হয় না। সুরা ও সিগারেট বর্জন করেছি, কিন্তু চা কফির নেশা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কমিয়ে দিয়েছি।''

সৌম্য সমবেদনা জানায়। তার পরে বলে, ''মাছমাংস ছাড়লেই যে জীবনযাত্রা শুদ্ধ হয় এটা কেমন করে বিশ্বাস করব, যখন দেখি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরাও আমিষ খান? এক্ষেত্রে আমি বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। গান্ধীজীও অনুমতি দিয়েছেন। তবে সুরা ও সিগারেট ছেড়ে ভালোই করেছ। চা কফি তত খারাপ নয়। কিন্তু নেশা হলে খারাপ।''

মণিকাকে নিয়ে ওর মা অন্য ঘরে যান। সে সকাল সকাল খেয়ে শুতে যাবে। দীপকের সঙ্গে গল্প করতে থাকে সৌম্য। সাপ থেকে ওরা যখন শজারুতে পৌঁছেছে তখন বাইরে থেকে শোনা যায় হৈ হল্লা। ঝড়ের মতো ভিতরে ঢোকে জুলি। মন্থর গতিতে মধুমালতী। স্টীমার আর গাধাবোট।

''হ্যালো, মাস্টার মালিক। হাউ ডু ইউ ডু?'' বলে জুলি দীপকের কবজিতে এমন চাপ দেয় যে বেচারা ত্রাহি ত্রাহি করে। কিন্তু ওকে ছাড়ছে কে? দুই গালে সশব্দে চুমু খেয়ে জুলি ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে। ''ওয়েল, সানি, আই অ্যাম ইয়োর আন্টি জুলি।''

মানস আর যূথিকা ওদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শেখায়নি। সাতবছর বয়স হলো দীপকের। কিন্তু ও ছেলে ইংরেজী না পারে পড়তে না পারে বুঝতে, না পারে বলতে। জুলির সেটা জানবার কথা নয়। সে মহা বিরক্ত হয়ে সৌম্যদাকে বলে, ''রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।''

আওয়াজ শুনে যূথিকা বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে মণিকা। আড়াই বছরের সেই বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয় জুলি। তারপর আকাশে ছুঁড়ে লোফালুফি করে। যেন রবারের বল। তা দেখে ওর মা তটস্থ। এখনো আলাপ হয়নি। তবে ও যে জুলি ছাড়া আর কেউ নয় এটা অনুমান করতে সময় লাগে না যূথির।

''এ বেবীর ইংরেজী শেখার বয়স হয়নি। এই খুকু, আমি তোর মাসী। জুলি মাসী।'' যূথিকার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, ''মিসেস মালিক, আই প্রিজিউম।''

আফ্রিকার অরণ্যে একমাত্র শ্বেতাঙ্গকে আবিষ্কার করে স্ট্যানলি যেমন বলেছিলেন ''ডকটর লিভিংস্টোন, আই প্রিজিউম?''

যূথিকা ওর হাতে হাত রেখে বলে, ''আসুন, মিসেস সোম, মণিকে ঘুম পাড়াবেন। ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যা।''

মধুমালতীকে অভ্যর্থনা করে যূথিকা সৌম্যদাকে বলে ওর ভার নিতে। দীপকও প্রণাম করে ওর পড়ার ঘরে চলে যায়। তার গৃহশিক্ষক অপেক্ষারত। পড়া সেরে ও সাতটার সময় খাবে।

''জুলির কাণ্ডকারখানা দেখলেন, সৌম্যদা?'' মধুমালতী বলে, ''বাচ্চারা যেন ওর খেলার পুতুল। ওর স্বামী বেঁচে থাকলে এতদিনে ওরও দু'তিনটি খোকাখুকু হতো। যে মা হওয়ার জন্যে জন্মেছে সে

কেন যে বিধবা হয়? বিধাতার কি অন্যায়!"

"কথাটা কিন্তু বিপ্লবীর মুখে শোভা পায় না, মিলি। যে বিপ্লবী হওয়ার জন্যে জন্মেছে সে কেমন করে মা হয়?" সৌম্য পরিহাস করে।

"জুলিকে আমি বিপ্লবীর মধ্যে গণ্য করিনে। ওর এক বান্ধবী ওর ঘরে একটা রিভলভার রেখে যায়। ও তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে। জানত না যে রিভলভার রাখাটা মস্ত বড়ো একটা অপরাধ। পুলিশ এসে হানা দেয়। বান্ধবীর নাম জানতে চাইলে ও নীরব থাকে। এর জন্যে ওকে ঢের নির্যাতন সইতে হয়। শেষে ওকে ওরা বন্দী শিবিরে পাঠায়। সেইখানেই ওর বিপ্লবের দীক্ষা। ওকে না ধরলে ও কোনোদিন বিপ্লবী হতো না। মন্টেসরি ক্লাস নিয়েই আনন্দ পেতো আর দিত।" মধুমালতী জুলির পূর্বকথা বলে।

"শুনেছি ওর মুখে। কিন্তু বন্দী শিবিরে বাস করার সময় সন্ত্রাসের তপ্ত হাওয়া ওর গায়ে লাগে। ইংরেজরাই ওকে সন্ত্রাসবাদী বানায়। অনেক কষ্টে আমি ওকে সন্ত্রাসবাদ ছাড়াই। কিন্তু বীরত্বের যেসব দৃষ্টান্ত ও দেখেছিল সেসব ওর অন্তরে দেগে গেছে। ও বিশ্বাসই করতে পারে না যে বীরত্বের আরো একটা আদর্শ আছে, আরো সব দৃষ্টান্ত আছে। ধরাসনায় তো যায়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া সে দেখেনি। গুলীর সামনে বুক পেতে দেওয়া ও কল্পনা করতে পারে না। মরব, তবু মারব না, এই হচ্ছে আমাদের মতে বীরত্ব। ওদের মতে কাপুরুষতা। ওকে আমি দোষ দিইনে। আমরা একটা নতুন পথের পথিক। আমরা নিজেরাই নিজেদের আদর্শে স্থির থাকতে পারছিনে। তবে জুলি ঘুরে ফিরে আমাদের পথেই আসবে। যদি না আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হই।" সৌম্যের কণ্ঠে গভীর প্রত্যয়।

মধুমালতী বলে, "কেন আপনি ওকে বীরাঙ্গনা করতে চান, সৌম্যদা? দেখছেন না সাত সমুদ্র পার হয়ে এক রাজপুত্র এসেছে ওর সন্ধানে? বৈধব্যের সংস্কার না থাকলে এখনি ওর বিয়ে হয়ে যেত। ওই যূথিকার মতো ওরও সুখের সংসার হতো।"

"যূথিকার সংসার নিছক সুখের নয়, মিলি। দীপক আর মণিকার মাঝখানে বয়সের ব্যবধান লক্ষ করেছ? আরো একজন ছিল মাঝখানে। সে আর নেই। আমি ওকে দেখেছি। কী সুন্দর ছেলে!" সৌম্য ওকে দেখেছিল বছর তিনেক আগে।

"আহা রে!" মধুমালতী ব্যথিত হয়।

ওদিকে মাতে আর মাসীতে মিলে মণিকাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নাজেহাল। ও মেয়ে কেমন করে টের পেয়েছে যে বাড়ীতে আজ পার্টি আছে। তাতে ওরও পার্ট আছে। যতরকমের রঙ্গ ওর জানা সব একে একে দেখাবে।

"ওর উপরে জোর জবরদস্তি করতে যেয়ো না, বৌদি। ওর যখন খিদে পাবে তখন ও খাবে। ওর যখন ঘুম পাবে তখন ঘুমোবে। ওটাই ওর পক্ষে সুসময়। আর তুমি যে ওকে ঘড়ির কাঁটা ধরে খাওয়াতে আর শোওয়াতে চাও সেটাই ওর পক্ষে অসময়। আয়, মণি, আমরা বাজনা বাজাই।" এই বলে জুলি ওকে নিয়ে গিয়ে পিয়ানো বাজাতে বসে। মণিকাও ওর কচি আঙুল নিয়ে টুং টাং করে।

"ওর নিজের ছেলেমেয়ে না হলে ওর শিক্ষা হবে না।" যূথিকা বলে মধুমালতীর পাশে আসন নিয়ে।

"বৈধব্যের সংস্কার না কাটলে এ জন্মে নয়।" মিলি মন্তব্য করে।

"সৌম্যদা, তুমি অমন চুপ করে বসে কেন? কী ভাবছ? সত্যাগ্রহ কবে শুরু হবে।" যূথিকা ওর মনের কথা আঁচ করে বলে।

"ওটা তো আমার চিরদিনের ভাবনা। কিন্তু জোর জবরদস্তি করে যেমন কোলের মেয়েকে ঘুম পাড়ানো যায় না তেমনি দেশের জনগণের ঘুম ভাঙানো যায় না। তারও সময় অসময় আছে। আমরা

চেষ্টা করতে পারি, ব্যর্থ হয়ে পিয়ানো বাজাতে পারি, কিন্তু সময়কে এগিয়ে আনতে পারিনে।'' সৌম্য মৌনভঙ্গ করে।

জুলি হঠাৎ পিয়ানো থামিয়ে উল্টো দিকে ফিরে তর্ক জুড়ে দেয়। ''সময় আসবে কী? সময় এসে গেছে। তাকে বয়ে যেতে দিলে চিরতরে হারাবে। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না।''

''তুমি কী বলতে চাও খোলসা করে বল, জুলি।'' মিলি উস্কে দেয়।

''সরকারী আমলার বাংলোয় বসে আর কত খোলসা করব, মিলি? কেউ আড়ি পেতে শুনছে কি না কে জানে!'' জুলি যূথিকার দিকে তাকায়।

দীপকের গৃহশিক্ষক ছিল পড়ার ঘরে। যূথিকা উঠে গিয়ে দেখে সে যুবকটি কখন একসময় চলে গেছে। বুঝতে পেরেছে যে ছাত্রের মন উড়ু উড়ু। বাড়ীতে লোকজন আসছেন। পার্টি হবে।

''তুমি অসঙ্কোচে বলতে পারো, জুলি।'' যূথিকা ইতিমধ্যে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমেছে। আর 'মিসেস সোম' থেকে 'জুলি'তে।

জুলি এবার নির্ভয়ে বলে, ''ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ। দেশ প্রস্তুত, নেতারা প্রস্তুত নন।''

''ওঃ! তোমাদের গোষ্ঠীর বৈঠকে গিয়ে এই সব শুনেছ বুঝি! যা শুনেছ তারই প্রতিধ্বনি করছ।'' সৌম্য মুখ টিপে হাসে।

''কেন? আমার কি স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা নেই?'' জুলি রেগে যায়। ''কার না বুঝতে বাকী আছে যে হিটলারের আক্রমণে ইংরেজ নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত থাকবে, সাম্রাজ্য সামলাবার অবকাশ পাবে না?''

''জুলি, তুমি তো ইংলণ্ডে বাস করেছ, ওদের খুব কাছে থেকে দেখেছ। তোমার কি বিশ্বাস যে ইংরেজরা সহজে কাৎ হবে? কাৎ যদি না হয় তো আবার সাম্রাজ্য ফিরে পেতে কতক্ষণ! যদি না আমরা ওদের চেয়ে আরো বলবান হতে পারি।'' সৌম্য ওকে শান্ত করে।

এমন সময় মণিকা বলে ওঠে, ''বাবার কাছে যাব।'' ও কান পেতে শুনতে পেয়েছে বাবার পায়ের শব্দ।

''ও কে? সৌম্যদা নাকি? ডুমুরের ফুল! আর উনি? মধুমালতী দেবী! যাঁর এত মধুর নাম তিনি সাক্ষাৎ রণচণ্ডী।'' মানস ঘরে ঢুকে সবাইকে বাউ করে। ''আর এই সেই আগুনের ফুলকি! জুলি নয়, জুলকি। তোমরা যে সময়ের আগেই আসবে তা জানলে আমি দত্তবিশ্বাসকে ড্রিঙ্কস অফার করতুম না। আর সেও আমাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাত না।''

মানসের পেছনে দাঁড়িয়ে দত্তবিশ্বাসও সবাইকে বাউ করে।

মণিকা এর মধ্যেই বাবার কোলে উঠেছিল। মানস ওকে কৌতুক করে কোলান্তরিত করতে গেলে দত্তবিশ্বাস এক কদম পেছিয়ে যায়। পোশাকের ভাঁজ নিয়ে ও বিষম খুঁতখুঁতে। ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবার ভয়।

''দত্তবিশ্বাস,'' মানস বলে সৌম্যকে, ''সেইরকমই আছে। শরীরের চেয়ে পোশাক ওর কাছে প্রিয়। ইংরেজরা মানুষ চেনে কী দেখে? মুখ দেখে নয়, সুট দেখে। ওটা যদি হয় সাভিল রোর সুট বা বণ্ড স্ট্রীটের সুট তা হলে তুমি অভিজাত কুলের। ওর মাথায় চাঁটি মারলে ও ততটা ব্যথা পাবে না যতটা পাবে ওর কোট বা ট্রাউজার্স কুঁচকে গেলে। এত বয়স হলো, এখনো ঘর বাঁধল না। তার মূলে ওই একই ভয়।''

''চৌধুরী,'' দত্তবিশ্বাস বলে, ''তুমি সাধুসন্ত মানুষ তখনো ছিলে, এখনো আছো। কিন্তু মল্লিকের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন দেখছি। ও এখন অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব। আমাকে এক পেগ

হুইস্কি ধরিয়ে দিয়ে নিজে খায় পাইনেপল জুস।"

মণি ততক্ষণে কোল থেকে কোলে বিহার করছে। অবশেষে উঠেছে মধুমালতীর কোলে। আর দীপক এক কোণে লাজুক ছেলের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছে। এগোবে না পেছোবে বুঝতে পারছে না।

সৌম্য বলে, "ওহে মানস, তোমার আসার আগে আমাদের কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, শুনবে? ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ। বৈঠকে গিয়ে জুলি এই সূত্র শিখে আসুক বা নিজেই উদ্‌ভাবন করুক আমরা এ নিয়ে তর্করত ।"

"এমন সুযোগ পঁচিশ বছর পরে আরো একবার এসেছে। সেবার আমরা ট্রেন ফেল করেছি। এবারেও যদি করি তবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এই হলো বৈঠকের আলাপ আলোচনার সারমর্ম।" জুলি ঘুরিয়ে বলে।

"ট্রেন ফেল করেছি বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও, জুলি?" দত্তবিশ্বাস উত্তেজিত হয়। "সুযোগই বা কিসের? ইংলণ্ডের দুর্যোগ ভারতেরও দুর্যোগ। ইংরেজ যদি সাম্রাজ্য হারায় তো সে সাম্রাজ্য জার্মানরাই সন্ধিসূত্রে পাবে। নাৎসীদের হাতে পড়োনি তো কখনো। পড়লে টের পেতে কী নৃশংস। এটা অবশ্য রাম রাবণের যুদ্ধ নয়, ইংরেজেরও দোষ আছে, তবু দুটো মন্দের মধ্যে ইংরেজরাই কম মন্দ। ওদের হটালে বেশী মন্দের কবলে পড়বে।"

"আমি গভীরভাবে চিন্তিত।" মানস বলে। "এই সুযোগে স্বাধীন হয়েই বা আমরা করব কী? একপক্ষ না একপক্ষের শিবিরে যোগ দিয়ে লড়ব। নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। কোন্ পক্ষে যোগ দেব? জার্মান পক্ষে যোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, যোগ দিতে হলে ইংরেজ পক্ষেই যোগ দিতে হয়। কিন্তু দাস হিসাবে নয়, মিত্র হিসাবে। ওরা যদি আমাদের দাসত্বের শিকল খুলে দেয় আমরা ওদের দিকেই ঝুঁকব? যদি না দেয়—যদি না দেয়—"

"তা হলে আমরা কোনো দিকেই ঝুঁকব না। সত্যাগ্রহের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করব। উপযুক্ত লগ্নের জন্যে অপেক্ষা করব।" সৌম্য তার বন্ধুর বাক্য পূরণ করে।

যূথিকার মনে পড়ে দীপকের খাবার সময় হয়েছে। সে সাতটার সময় খায়। আটটার সময় শুতে যায়। তাই যূথিকা উঠে যায়। তর্ক চলতে থাকে।

মণি হঠাৎ বলে, "মার কাছে যাব।" তার ঘুম পেয়েছে।

।। তিন ।।

জুলি এবার মণির সঙ্গে যায় না। পিয়ানোর টুল থেকে নেমে এসে সোফায় বসে। মিলির পাশে। বলে, "সৌম্যদা, তোমার গান্ধীপন্থীরা কি বুঝতে পারছে না যে এবার ট্রেন ফেল করলে তোমরা বরাবরের জন্যে ফেল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যখন বাধবে তখন দেখবে তোমাদের দিন গেছে। তোমাদের গুরু তার আগেই দেহত্যাগ করে থাকবেন। সত্তর বছর বয়স হলো। আর কদ্দিন বাঁচবেন!"

"এমনও তো হতে পারে যে ট্রেন আমাদের জন্যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা যতক্ষণ না তৈরি হচ্ছি ততক্ষণ ছাড়বে না।" সৌম্য হেঁয়ালীর ভাষায় বলে।

"মিলি, তুমি কি এর মর্ম কিছু বুঝলে?" জুলি মিলির মুখের দিকে তাকায়।

"এর মর্ম যুদ্ধ একদিনে খতম হচ্ছে না। গোড়ার দিকে সত্যাগ্রহ না করে পরে একসময় করলেও চলবে। সেবারকার যুদ্ধ চারবছর ধরে চলেছিল। এবারকার যুদ্ধ কদ্দিন চলবে বলতে পারেন, মিস্টার দত্তবিশ্বাস?" মিলি সুকুমারের হাতে খেই ধরিয়ে দেয়। সে সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে।

"সেবারকার যুদ্ধে," দত্তবিশ্বাস বলে, "রাশিয়া ঝাঁপ দিয়েছিল, আমেরিকা ঝাঁপ দিয়েছিল। এবার ওরা এখনো ঝাঁপ দেয়নি, পরে দেবে কিনা বলা যায় না। রাশিয়া তো জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করে সরে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র যদি এর চেয়ে বিস্তৃত না হয় তবে যুদ্ধকালও বিস্তৃত হবে না। কাজেই চৌধুরীর ওই অয়েট অ্যাণ্ড সী পলিসি খুব একটা ভুল নয়। যুদ্ধ যদি সীমাবদ্ধ থাকে তা হলে বছর দুই ওর স্থিতিকাল। যদি রাশিয়া আমেরিকা জাপান জড়িয়ে পড়ে তবে চার বছর তো মিনিমাম।"

"পাঁচবছরও লাগতে পারে।" মানস মন্তব্য করে।

"হ্যাঁ, কিন্তু জানবে কী করে যে পরে ওই সব শক্তি জড়িয়ে পড়বে? রাশিয়ার গরজটা কিসের? বিনা যুদ্ধেই কেমন অর্ধেক পোলাণ্ড হাতিয়ে নিয়েছে। হিটলার হেরে গেলে অর্ধেক জার্মানীও দখল করতে পারে। বাধা দেবে কে? আর হিটলার যদি জেতে তবে লড়তে লড়তে বলক্ষয় করে থাকবে। রাশিয়া যা চাইবে তাই পাবে। বলকান কী বলটিক রাজ্য। আমার মনে হয় না রাশিয়া এবার নামবে। আর আমেরিকা? হ্যাঁ, আমেরিকা নামতে পারে, ইংলণ্ড ফ্রান্সকে রক্ষা করতে। তা হলে ওই চারবছরই আমার এস্টিমেট।" দত্তবিশ্বাস মিলির দিকে চেয়ে বলে।

"হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্টালিন যে অপকর্ম করেছেন তাতে আমার বিশ্বাস টলে গেছে কমিউনিস্টদের উপর। গত বছর যেমন টলেছিল ইংলণ্ডের রক্ষণশীলদের উপর। ওরা করেছিল মিউনিক চুক্তি। এরা করেছে অনাক্রমণ চুক্তি। কার্যত পোলাণ্ড ভাগ করার ফন্দী। আর আমি মরছি পোলাণ্ডকে বাঁচানোর কথা ভেবে। গতবছর যেমন পীড়িত হয়েছিলুম চেকোস্লোভাকিয়াকে বাঁচানো গেল না দেখে। মনে মনে শাপান্ত করেছিলুম ইংরেজ ফরাসীদের। কী কাপুরুষ ওরা। চেকদের বলি দিয়ে নিরাপদ হলো! এবার ওরা পোলাণ্ডের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই আমি ওদের সাধুবাদ দিচ্ছি। আমার মতে ওরা যাতে জয়ী হয় তার জন্যে সর্বপ্রকার সাহায্য জোগানো উচিত আমাদের। এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য।" মানস বলে যায় আবেগের সঙ্গে।

জুলি তেড়ে আসে। "কী বললে! সর্বপ্রকার সাহায্য! না একো জওয়ান, না একো রুপেয়া। সেবার দিয়েছি, দিয়ে ঠকেছি। এবার দেব না, ঠকব না। ওরা আগে তো আমাদের স্বাধীনতা আমাদের ফিরিয়ে দিক। তারপর আমরা ভেবে দেখব ওদের সাহায্য করব কি করব না।"

"তা হলে পোলাণ্ড ডুববে, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।" মানস আকুল হয়।

"আমি মানসের সঙ্গে একমত।" দত্তবিশ্বাস বলে। "মিউনিক চুক্তির সময় আমি বিলেতের জনমতের বিস্ফোরণ দেখেছি। ইংরেজরা কেউ যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল না। সকলেই চেয়েছিল শান্তিতে বাস করতে। কিন্তু হিটলারের দিগ্বিজয় অব্যাহত চলতে থাকলে ওরাই বা কদ্দিন নীরব সাক্ষী হয়ে শান্তিতে বাস করতে পারবে? ইংলণ্ড ফ্রান্সের পর আসবে ভারতেরও পালা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা দিন দিন দুষ্কর হবে। মানস ঘরে বসে মন খারাপ করবে। আমি কিন্তু চললুম লণ্ডনে ফিরে। ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমিও লড়ব।"

মধুমালতী শিউরে ওঠে। "সে কী! আপনি এই সেদিন বিলেত থেকে ফিরলেন। আবার যাবেন ওদেশে! যুদ্ধের মাঝখানে! আপনার কি প্রাণের মায়া নেই?"

"প্রাণের চাইতেও মূল্যবান জিনিস আছে, মিস মুস্তাফী। তা নইলে আপনিই বা আগুন নিয়ে খেলতে গেলেন কেন? ইংরেজরা নাৎসী নয় বলেই আপনি বেঁচে গেলেন। নইলে আপনার চিতাভস্ম একটি বোতলে পুরে আপনার মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দিত। দেশ আপনার কাছে প্রাণের চেয়েও মূল্যবান। তেমনি আমার কাছে মূল্যবান ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক জীবনধারা। আমি নির্ভয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারি। কথা বলতে পারি। চিন্তা করতে পারি। বিশ্বাস করতে পারি। চলুন না একবার ওদেশে। দেখবেন গণতান্ত্রিক জীবনধারা কত মূল্যবান।" দত্তবিশ্বাস মধুমালতীকে প্রবর্তনা দেয়।

"বলেন কী! আমি যাব আমার প্রভুদের দেশে গণতান্ত্রিক জীবনধারা দেখতে! সে কী রকম গণতন্ত্র যার জন্য অপর একটি জাতির পিঠে সিন্ধুবাদের বুড়োর মতো চেপে থাকতে হয়? একটি দাসজাতি না থাকলে তাদের মতো প্রভুজাতির সে রকম গণতন্ত্র সম্ভব হতো না। আপনি প্রাণ দিতে যাচ্ছেন আপনার প্রভুজাতির প্রভুত্বের জন্য। আমি যদি প্রাণ দিই তো দেব আমার দাসজাতির মুক্তির জন্যে।" মধুমালতী বলে।

দত্তবিশ্বাস আর তিনজন বিলেতফের্তার কাছে আপীল করে। "চৌধুরী, মল্লিক, জুলি, তোমরাও তো ওদেশে বাস করেছ। ওদের গণতান্ত্রিক জীবনধারা কেমন মূল্যবান তোমরাও কি উপলব্ধি করোনি? সাম্রাজ্য থাকা না থাকার উপরেই কি নির্ভর করে ওদের গণতান্ত্রিক জীবনধারা?"

"গণতান্ত্রিক বিবর্তন এখনো পূর্ণতা পায়নি। পাবে যখন শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসবে ও তাদের দুর্গতি দূর হবে।" মানস বলে, "তা হলে ইংলণ্ডে যা আছে তা অপূর্ণতা সত্ত্বেও মহামূল্য। রাজনৈতিক শরণার্থীদের আর কোন্ দেশ অমন অবাধে শরণ দেয়? মার্কস তো ইংলণ্ডে বসেই বিপ্লবের শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। শাস্ত্র না হলে শুধু কি শস্ত্রের দ্বারাই বিপ্লব হয়? লেনিনও তো ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়াশুনা করে বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি পাকা করেছিলেন। গণতন্ত্রের দেশ না হলে আর কোথায় আশ্রয় নিয়ে এঁরা ধনতন্ত্রের মৃত্যুবাণ নির্মাণ করতেন?"

"গণতন্ত্রের মাপকাঠি যদি এই হয় যে সাধাবণ লোক পুলিশের ভয়ে ভীত নয় তবে ইংলণ্ডে গণতন্ত্র আছে। কিন্তু ওটা হলো একটা নেতিবাচক সংজ্ঞা। সাধারণ লোকের ক্ষমতা তো ঐ ভোট দেওয়া পর্যন্ত। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মন্ত্রীর হাতে। তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। রাজনৈতিক ক্ষমতার মতো অর্থনৈতিক ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত। মুষ্টিমেয় ধনপতিই পলিসি পরিচালনা করেন। তাঁদের পরিচালনায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়। বেকারদের সৈনিকে পরিণত করলে সমস্যার একপ্রকার সমাধান হয় বটে, কিন্তু তার জন্যে চাই বিশ পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর যুদ্ধবিগ্রহ। যুদ্ধে বহু লোক মরবে, সেটাও একপ্রকার সমাধান। আমি তো মনে করি না যে যুদ্ধ বিনা ওদের গণতন্ত্র নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।" সৌম্য অভিমত দেয়।

এর পরে জুলির পালা। "ভারত যখন স্বাধীন হবে তখন সে চাইবে সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা, তার সঙ্গে যতটা খাপ খায় ততটা গণতান্ত্রিক জীবনধারা। সেদিক থেকে ব্রিটেন আমাদের আদর্শ নয়। ব্রিটেনের ওই পার্লামেনটারি ডেমোক্রাসীর জীবনমরণ সমস্যা আমাদের জীবনমরণ সমস্যা নয়। ইংলণ্ডের এই দুর্যোগে আমরা দুঃখিত কিন্তু আমরা কেন আমাদের এই সুযোগ হেলায় হারাব?"

দশবছর আগে ওরা চারজনেই লণ্ডনে ছিল। দশবছর পরে আবার মিলিত হয়েছে। এ মিলন কি তর্ক বিতর্কেই কণ্টকিত হবে? দীপকের আহার সারা হলে যূথিকা ফিরে এসে বলে, "চার বন্ধুর এই সম্মিলন বার বার ঘুরে আসুক এটাই আমার অন্তরের কামনা।"

"আমাদের চারজনেরই।" মানস সুর মেলায়।

"আমার কথা যদি বলো, আমি বোধহয় আর এদেশে ফিরব না। বেঁচে থাকলে ওই দেশেই ঘর বাঁধব।" দত্তবিশ্বাসের কণ্ঠে বিষাদ।

"সে কী হে!" সৌম্য বিস্মিত হয়। "এদেশ কী অপরাধ করল?"

"না, দেশের কোনো অপরাধ নেই। আমারই নিয়তি। এমন কেউ নেই যে এদেশে আমাকে টেনে রাখতে পারে বা চায়।" দত্তবিশ্বাস কৈফিয়ৎ দেয়।

"কেন, আপনার মা বাবা ভাই বোন?" মধুমালতী সুধায়।

"মা অনেকদিন আগে দেহরক্ষা করেছেন। বাবা দ্বিতীয় সংসার নিয়ে সুখে আছেন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। সোদর ভাই যেটি ছিল সেটি নিরুদ্দেশ। আমার তেমন কোনো বন্ধন নেই এদেশে।

ওদেশেই আমার দানাপানি। তা ছাড়া এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বেঁচে থাকার যে উন্মাদনা সে তো ওই দেশেই। ওখানে আমি একজন দর্শক নই, আমি একজন অভিনেতা।" দত্তবিশ্বাস বুক ফুলিয়ে বলে।

"কেন, সুকুমারদা, তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে এই যুদ্ধের কল্যাণেই ভারতের মাটিতেও একটা বিপ্লব ঘটবে? যেমন ঘটেছিল সেবার রাশিয়ায়। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে স্বদেশে উপস্থিত থাকাই তো সুবুদ্ধি।" জুলি হাসিমুখে বলে।

"আমিও তাই মনে করি।" জুলির সমর্থক মিলি। "তবে সেটা বিপ্লব না গণসত্যাগ্রহ না সিপাই-বিদ্রোহ তা কেমন করে বলব?"

"অমন একটা অনিশ্চিত অঘটনের জন্যে পায়চারি করতে আমি নারাজ। হতাশ হয়ে জাহাজ ধরতে চাইলেও আর জাহাজ পাব না। শেষ যাত্রীজাহাজ ছাড়ছে অক্টোবরের গোড়ার দিকে।" দত্তবিশ্বাস ঘোষণা করে।

মানস চমকে ওঠে। "তুমি তা হলে দেশ ছেড়ে চিরকালের মতো চললে আর তিন সপ্তাহের মধ্যে!"

"চললুম ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্টে। সেবারেও তো বাঙালী সৈনিকেরা গেছল ওয়েস্ট এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে। বাঙালীরা যদি ঘরে বসেই বিপ্লব ইত্যাদি করে তবে তাদের ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতা মহাজীবনের অভিজ্ঞতা হবে না। কী করে ওরা কেউ লিখবে টলস্টয়ের মতো 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'? একা নজরুল বাঙালীর মান রেখেছেন কয়েকটি কবিতা লিখে। তাও করাচীর ওধারে না গিয়ে।" দত্তবিশ্বাস বলে।

"আমার তো খুবই ইচ্ছে করে ফ্রণ্টে যেতে,বন্দুক হাতে নয়, কলম হাতে। কিন্তু যেতে দিচ্ছে কে? সেবারকার মতো এবারেও সিভিলিয়ানদের অনেকে সরকারের অনুমতি চেয়েছিলেন ফ্রণ্টে যেতে। বড়লাট সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে এবার কাউকেই অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রধান সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এ পত্র পাঠিয়েছেন। মনে হয় তিনি অনুমান করছেন যে এই দেশটাই ফ্রণ্ট হবে। কিংবা তিনিও প্রতীক্ষা করছেন বিপ্লবের বা গণসত্যাগ্রহের বা সিপাই-বিদ্রোহের। কাজেই আমার ইচ্ছা থাকলেও তোমার সঙ্গে একই জাহাজে পশ্চিমযাত্রা হয়ে উঠছে না, ভাই দত্তবিশ্বাস। না হতে পারছি টলস্টয়, না নজরুল।" আক্ষেপ করে মানস।

যূথিকা তার স্বামীকে শাসায়। "তোমার মনে মনে এই মতলব! তুমি যুদ্ধ দেখতে ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্টে যেতে। পারলে না বলে আফসোস করছ।"

"আমার একটুও ভালো লাগছে না ইতিহাসের এই ক্রান্তিকারী লগ্নে নীরব দর্শক হতে। এত বড়ো একটা ঘনঘটা হবে তাতে আমি থাকব না। ভাই দত্তবিশ্বাস, তোমার মতো আমি স্বাধীন নই। একে চাকুরে তার উপর সংসারী। তাই আমি বোট মিস করছি। ঘটনাস্রোতের পোত।" মানসের খেদোক্তি।

"তোমাকে তো আমি আমার জাহাজের সহযাত্রী হতে বলিনি। আমার আশা ছিল একজন সাহসিকা আমার সহযাত্রিণী হবেন। সেই আশায় এদেশে আসা। 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা।' তোমার মতো নীরব দর্শক আমি হব না, তা ঠিক। কিন্তু বোমা যখন বর্ষণ হবে তখন দর্শনেরও সুযোগ পাবে না, আমাকে গর্তে ঢুকে গা বাঁচাতে হবে। না, কাউকে সহযাত্রিণী হতে না বলাই ভালো। জাহাজটাই না টর্পেডোর ঘা লেগে ঘায়েল হয়। তখন হয়তো লাইফবোয় ধরে ভাসতে হবে। আমার ধারণা ছিল না যে লড়াইটা এত তাড়াতাড়ি বাধবে। যেদিন বাধে তার দু'দিন আগেও সার হীরেন তাঁর স্ত্রী লেডি মিটারকে বলেছিলেন, যে সবাই মিলে শান্তির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, যুদ্ধ যদি একটা মাসও পেছিয়ে যায় তবে শীত এসে পড়বে, তখন কেউ যুদ্ধে নামবে না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হিটলার ঘটায় আরেক।" দত্তবিশ্বাস একটু রসিকতার চেষ্টা করে।

বসবার ঘরেই সুপ পরিবেশন করা হলো। যে যার নিজের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তারিফ করে

খেতে লাগল। তারপর গেল খাবার ঘরে ও যে যার নির্দিষ্ট স্থানে।

যূথিকার ডান পাশে দত্তবিশ্বাস ও বাঁ পাশে সৌম্য। মানসের ডান পাশে মঞ্জুলিকা ও বাঁ পাশে মধুমালতী। আপাতত বন্দুক বেয়োনেট নিয়ে লড়াই নয়, কাঁটা চামচ নিয়ে লড়াই। সৌম্যর মতো গান্ধীপন্থীও তাতে অনভ্যস্ত নয়। মগ বাবুর্চি ওর জন্যে আরো অনেক রকম পদ রেঁধেছিল, যা যূথিকার দেওয়া ফর্দের বাইরে। দেখা গেল তাতেই ওর তৃপ্তি।

এই নিয়ে মধুমালতী কটাক্ষ করলে সৌম্য বলে, "তোমার জানা উচিত মিলি, যে আমরা গান্ধীপন্থীরা কেউ হঠযোগী নই। আমরা কর্মযোগী। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কারাগার। সেইজন্যে আমরা প্রিজন ডায়েট খেতে অভ্যাস করি। বন্দী হলে আমরা আহার নিয়ে খুঁতখুঁত করব না। তা যদি করি তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।"

"কিন্তু এ যে অতি পরিপাটি আহার।" মধুমালতী মন্তব্য করে।

"হ্যাঁ। অনেকদিন পরে এর আস্বাদন নিচ্ছি। কিন্তু এতে আসক্ত হচ্ছিনে। আমাদের যোগ অনাসক্তি যোগ।" সৌম্য হাসে।

"আচ্ছা, হিটলার তো নিরামিষভোজী?" জানতে চায় মধুমালতী।

"হ্যাঁ, হিটলারও সেদিক থেকে অহিংসাবাদী। মদও স্পর্শ করেন না। শোনা যায় উর্বশী মেনকারাও তাঁকে ভোলাতে পারে না। অর্জুনের মতো ব্রহ্মচর্যব্রতধারী। অথচ হিংসার অবতার। কী করে এই প্যারাডক্স সম্ভব হলো?" সৌম্যই জিজ্ঞাসু।

কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। মধুমালতী বলে, "হিটলারকে রাক্ষস বলে চিত্রণ করে কোনো ফল হবে না এদেশে। রাক্ষসরা কেউ নিরামিষভোজী সুরাত্যাগী ব্রহ্মচারী ছিল না। দেবতারাও না। পুরাণে ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব চরিত্র। জার্মানরা যে ওকে এত মানে তার মূল কারণ রাজনৈতিক নয়, নৈতিক।"

"এদেশে দেখছি হিটলারের অগণ্য ভক্ত। অনেকের বিশ্বাস হিটলার আসলে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তার প্রমাণ হিন্দুদের স্বস্তিক হিটলার তাঁর বাহুতে ধারণ করেন। স্বস্তিক তাঁর নাৎসী দলেরও প্রতীক। ওরাও নাকি আসলে হিন্দু। এমন কথাও শুনতে পাই যে হিন্দু আর জার্মান এরাই আসলে আর্য। আর্যত্বের উপর জার্মানরা তাই এত জোর দেয়। জার্মানরা জিতলে আর্যরা আবার ভারতে আসবে। এদেশের আর্যদের সঙ্গে হাত মেলাবে। যখন জানতে চাই, কী করে বুঝলে যে ওরা জিতবে তখন উত্তর পাই, যে-মানুষ কামরিপুকে জয় করতে পারে সে-মানুষ জগৎ জয় করতে পারে। হিটলার নাকি সেই মানুষ। 'হাইল হিটলার' বলে জয়ধ্বনি করার জন্যে এদেশের বহু লোক উন্মুখ হয়ে রয়েছে। এদের যা কিছু আক্রোশ তা ইংরেজের বিরুদ্ধে।" দত্তবিশ্বাস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

"সেই যে একটা কথা আছে, আমার শত্রুর যে শত্রু সে আমার মিত্র। ইংরেজ যদি আমাদের শত্রু না হতো হিটলারকে বা তার নাৎসীদের কেউ মিত্র ভাবত না। ইংরেজ যদি আমাদের মিত্রতা চায় তো আমাদের স্বাধীনতার দাবী মিটিয়ে দিক। তা হলে আমরাও ইংরেজদের দাসহিসাবে নয় মিত্রহিসাবে লড়ব।" মধুমালতী বলে।

জুলি তার উক্তির সংশোধন করে। "ওটা কিন্তু আমাদের পার্টির লাইন নয়, মিলি। আমরা বলি, আগে তো ইংরেজ আমাদের ঘাড় থেকে নামুক। তারপরে আমরা ভেবে দেখব এ যুদ্ধে আমরা আদৌ পক্ষ নেব কি নেব না। নিলে কাদের পক্ষ নেব। কার্যত ইংরেজ ফরাসীর পক্ষই নেব। ফাসিস্টদের পক্ষ নয়।"

"কিন্তু কারো কারো কথাবার্তা শুনে মনে হতে পারে তারা ফাসিস্টদের পক্ষও নিতে পারে, যদি সেই উপায়ে স্বাধীনতা লাভ হয়।" মিলিও সংশোধন করে।

"উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে কোনো উপায় অবলম্বনীয়, তাই যদি হয় এটাও তো একটা উপায়। গোঁড়া কমিউনিস্ট স্টালিন যদি গোঁড়া ফাসিস্ট হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন তবে গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধীরা কেন গোঁড়া গণতন্ত্রবিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারবে না? উদ্দেশ্যটাই সব, উপায়টা কিছু নয়।" জুলির বক্তব্য। অর্থাৎ তার গোষ্ঠীর।

"জুলি, তুমি ওদের সংসর্গ ত্যাগ করো। ওরা কোনোদিনই সফল হবে না। মাঝখান থেকে বিপদ ডেকে আনবে তোমার মতো সরলা বালিকাদের উপরে। হ্যাঁ, তুমিও একটি সরল বালিকা।" মানস ওকে হুঁশিয়ারি দেয়।

"আমি কি এখনো তেমনি বালিকা আছি? লণ্ডনে যেমনটি দেখেছিলে, মানসদা। এই দশ বছরে আমি কত দেখেছি, কত শিখেছি।" জুলি আত্মসমর্থন করে।

"এই তো মিস মুস্তাফী এখানে রয়েছেন। তিনি তো উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে বিশ্বের গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিত্রয়ের সঙ্গে সমঝোতা করবেন না।" মানস আন্দাজ করে।

"কী, মিলি? এটাই কি তোমাদের পার্টি লাইন?" জুলি বাজিয়ে দেখে।

"আমি এখন কোনো পার্টিতেই নেই। বাবার বারণ। দেশকে ভালোবাসি। তার মুক্তি চাই। এই পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু যে-কোনো উপায় অবলম্বনীয় এতদূর যেতে আমি অনিচ্ছুক। স্বচক্ষে দেখলুম তো সন্ত্রাসবাদী উপায়ের পরিণাম। ইংরেজ এখন বসিয়ে দিয়েছে মুসলমানকে তার পুরনো মসনদে। লড়তে হলে লড়তে হবে মুসলমানদের সঙ্গে। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ খাটবে না। বিপ্লববাদও খাটবে কি? আমি এখন অতটা নিশ্চিত নই, জুলি। আমি সেবা দিয়ে চিত্তজয়ের পথ অবলম্বন করেছি। দেখা যাক এ পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যায়। কয়েকটি বান্ধবীকে পেয়েছি আমার সহকর্মীরূপে। আমরা এখন আমাদের নিজেদের জীবনকে পুনর্গঠিত করার কাজে মন দিচ্ছি। তবে দেশের সামনে যদি ঘোরতর সঙ্কট ঘনিয়ে আসে কোনো দিন, আমরাও সেদিন প্রাণ দিতে এগিয়ে যাব।" মধুমালতী অঙ্গীকার করে।

মানস বলে, "দুটো আলাদা আলাদা ইস্যুকে আমরা একাকার করে ফেলছি। একটা হলো ভারতের স্বাধীনতা। আর একটা ইউরোপের যুদ্ধ। স্বাধীনতা আজও হতে পারে, একযুগ পরেও হতে পারে, আমাদের জীবনে নাও হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, দাবানলের মতো এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ছড়াতে পারে, ছড়াতে ছড়াতে আমাদের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছতে পারে। ভারতও নিরাপদ নয়। এ দুর্যোগ ভারতেরও দুর্যোগ। সুতরাং কে কার দুর্যোগের সুযোগ নেবে? সেইজন্যে আমি গভীরভাবে চিন্তিত। ইংরেজকে বেকায়দায় পড়তে দেখে তার কাছ থেকে যারা স্বাধীনতা আদায় করে নেবার কথা ভাবছে তাদের কাছ থেকেও ইংরেজ কিছু আদায় করে নেবে। সেটা কখনো নিঃশর্ত স্বাধীনতা হতে পারে না। শর্তটা এই যে সৈন্য জোগাতে হবে, অর্থ জোগাতে হবে, উপকরণ জোগাতে হবে। যত লাগে, যতদিন লাগে। স্বাধীনতার জন্যে দেশটাই বিকিয়ে যেতে পারে।"

"সেইজন্যেই আমরা চাই নিঃশর্ত স্বাধীনতা।" জুলি বলে।

"সেটা শুধু ইংরেজকে বেকায়দায় পড়তে দেখে। কিন্তু ধরো যদি ওরা আমেরিকার কাছে ভারতকে বন্ধক রাখে?" মানস সুধায়।

"তা হলে অর্থ পাবে, মালমশলা পাবে, কিন্তু গুর্খা, শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমানদের মতো সৈনিক পাবে কোথায়! এদের না পেলে যুদ্ধে হারবে। হারজিৎ নির্ভর ভারতের সহযোগিতার উপরে। ঠিক বলেছি কি না।" জুলি তাকায় মিলির দিকে।

"ঠিকই বলেছ। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। ওরা হলো পেশাদার সৈনিক। যার নিমক খাবে তার জন্যে জান দেবে। নিমক এতকাল ইংরেজ দিয়ে এসেছে, দিতে পারে, দিতে রাজী। কেন শুবে ওরা

যুদ্ধে যাবে না? ওদের উপর তোমাদের এমন কী প্রভাব আছে যে ওরা বেঁকে দাঁড়াবে? সৌম্যদা, তোমাদেরই বা কতটুকু প্রভাব?" মিলি প্রশ্ন করে।

"আমাদের প্রভাব আরো কম। আমরা তো সৈনিকের জীবিকা দিতে পারব না। কৃষকের জীবিকা দিতে পারি। তলোয়ারকে ভেঙে আমরা লাঙল বানাব। আমরা শান্তিবাদী।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"তা হলেও ইংরেজরা ভারত থেকে সৈনিক পাবেই। উপকরণও পাবে। তাতে ব্যবসাদার শ্রেণীর লাভ। বাকী থাকে অর্থ। সেইখানেই টান পড়বে। জোর করে আদায় করতে গেলে দেশসুদ্ধ লোক রুখে দাঁড়াবে। এইটেই কংগ্রেসের একমাত্র তুরুপের তাস। কংগ্রেসের মানে গান্ধীজীর।" মানস বলে।

"কংগ্রেস আর গান্ধীজী অভিন্ন এটা তোমার ভুল ধারণা, মানস। কংগ্রেস যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী হবে, যদি যোগ দেওয়া না দেওয়ার স্বাধীনতা ভারতকে দেওয়া হয়। যে-কোনো দেশের পক্ষে যুদ্ধ ও শান্তির সিদ্ধান্তই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর গান্ধীজী হলেন শান্তিবাদী। যোদ্ধাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের শান্ত করাই তাঁর মিশন। গতবারে তাঁর মিশন সম্বন্ধে তিনি তেমন সচেতন হননি। মানবজাতি তাঁর কাছে যা প্রত্যাশা করে তা যুদ্ধে যোগদান নয়, শান্তির খাতিরে অসহযোগ। স্বাধীনতা বলতে যদি রাজক্ষমতা বোঝায় তবে সেটা আপাতত না হলেও চলে। যদি বোঝায় শান্তিস্থাপনের অধিকার তবে তিনি পরীক্ষা করতে রাজী।" সৌম্য বিশদ করে।

"গান্ধীজী তো দক্ষিণপন্থীদের দিকে। নইলে সুভাষদাকে সরাতেন কেন? তুমি দেখবে উনি দক্ষিণপন্থীদের রাজক্ষমতালাভ সমর্থন করবেন, যদি বড়লাটের সঙ্গে কথাবার্তা সফল হয়। সফল হবেই। কারণ ওরাও বুর্জোয়া, এরাও বুর্জোয়া।" জুলি যেন সব জানে।

"আর বামপন্থীরা বুর্জোয়া নয়? ক'জন তার কাস্তে বা হাতুড়ি ধরে? দক্ষিণপন্থীরাই বরং চক্রধর।" মানস বক্রোক্তি করে।

"বামপন্থীরা চায় সমাজের ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন। দক্ষিণপন্থীরা চায় শুধুমাত্র সরকার বদল। সেইসঙ্গে ছোটখাটো রিফর্ম। ওরা রিফর্মিস্ট। বামপন্থীরা রেভোলিউশনারী।" জুলি ব্যাখ্যা করে।

"বেশ তো।" মানস বলে, "আগে তো রিফর্মিস্টদের একটা সুযোগ দাও। দেখাই যাক না কতদূর ওদের দৌড়। ওরা বৃদ্ধ হয়েছে। এখন না পেলে কখন আর সুযোগ পাবে?"

"না, না, ওরা যদি একবার চেপে বসে তো ছলে বলে কৌশলে আর সবাইকে তাড়াবে। যেমন করে তাড়িয়েছে সুভাষদাকে। ওদের বিশ্বাস নেই। কেন্দ্রীয় সরকার যদি ওদের হাতে পড়ে তবে ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালে সব ক'টা বিপ্লবীকে ধরবে। কোনো তফাৎ থাকবে না ইংরেজে কংগ্রেসে।" জুলি ঘাড় নাড়ে।

"কিন্তু, জুলি," সৌম্য এতক্ষণ পরে মুখ খোলে, "তুমি কি জানো না যে যুদ্ধনীতি নির্ধারণের জন্যে সুভাষচন্দ্রও গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন? কংগ্রেসের পলিসি যদি হয় ব্রিটেনকে আলটিমেটাম দেওয়া ও মেয়াদ পার হয়ে গেলে স্বাধীনতার দাবীতে আপসহীন বিরামবিহীন সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়া তা হলে তিনি সব অপমান ভুলে গিয়ে আবার কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবেন। একথা শুনে বল্লভভাই বলেন, সুভাষ একটি কচি খোকা। এটা একটা পলিসিই নয়। বল্লভভাইদের পলিসি হলো সরকারের সঙ্গে মীমাংসার পথ সব সময় খোলা রাখা। সংগ্রাম যদি অনিবার্য হয় তবে না হয় সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়া যাবে, কিন্তু ন্যূনতম দাবী মিটিয়ে দিলে আর ইংরেজের সঙ্গে নয় হিটলারের সঙ্গেই সংগ্রাম। কংগ্রেস যে হিটলার বিরোধী এটা প্রমাণ করতে হবে। নয়তো ইংরেজের বিপক্ষে সংগ্রামকারীদের হিটলারের পক্ষে সংগ্রামকারী বলে অপবাদ দেওয়া হবে ও কোর্টমার্শাল করে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। যুদ্ধকালে সরকারমাত্রেই নির্মম। সংগ্রাম অনিবার্য হলে গান্ধীজীর উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত হবে। তিনিই স্থির করবেন সংগ্রাম বলতে কী বোঝাবে। নিছক অসহযোগ না সক্রিয় প্রতিরোধ।

যিনি সবচেয়ে অভিজ্ঞ তিনিই সর্বাধিনায়ক। সুভাষচন্দ্রকে মানতে হবে তাঁর নির্দেশ। নয়তো তাঁকে কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে পৃথক নীতি অবলম্বন করার স্বাধীনতা দেওয়া যাবে। সে পন্থা কি বামপন্থীরা সবাই সমর্থন করবেন?"

"বলা শক্ত। জবাহরলাল আবার দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ভিড়েছেন। উনি কি সত্যিকার বিপ্লবী? না উনি শুধুমাত্র অ্যান্টিফাসিস্ট? তাই যদি হয়ে থাকেন তবে উনিও অবিলম্বে সরকারের সঙ্গে ভিড়ে যাবেন।" জুলি বিমর্ষভাবে বলে।

"তা হলে বামপন্থী বলে আর বাকী রইল কে?" মানস বলে, "যারা অ্যান্টিফাসিস্ট নয় তারাই? কার এত সাহস হবে যে বলবে আমি অ্যান্টিফাসিস্ট নই, আমি অ্যান্টিইম্পীরিয়ালিস্ট?"

"সৌম্যদা," জিজ্ঞাসা করে জুলি, "তোমরাও কি অ্যান্টিফাসিস্ট? মানে তোমরা গান্ধীপন্থীরা।"

"আমরা অ্যান্টিওয়ার।" সৌম্য উত্তর দেয়, "ওয়ার যদি হয়ে থাকে ফাসিস্টদের স্বার্থে তবে আমরা অ্যান্টিফাসিস্ট। যদি হয়ে থাকে ইম্পীরিয়ালিস্টদের স্বার্থে তবে আমরা অ্যান্টিইম্পীরিয়ালিস্ট। যদি হয়ে থাকে বুর্জোয়াদের স্বার্থে তবে আমরা অ্যান্টিবুর্জোয়া। আমরা চাই যে এ যুদ্ধ আজ এখনি থেমে যাক। মানুষ মেরে, তার দেশ দখল করে, তার বাড়ীঘর ধ্বংস করে, তার সম্পদ লুট করে কোনো সত্যিকার বিরোধ মিটবে না। বিরোধ মেটাবার অন্য উপায় আছে। যুদ্ধবিগ্রহের নৈতিক বিকল্প হচ্ছে সত্যাগ্রহ। আমরা তারই সাধনায় আত্মনিবেদন করেছি।

"আমাদের এখানে দু'জন ইংরেজ অফিসার রয়েছেন।" মানস বলে, "যুদ্ধ বেধে গেছে শুনে আমি গেলুম ওঁদের সহানুভূতি জানাতে। ইংলণ্ডের দুর্যোগে আমি আন্তরিক দুঃখিত। দু'বছর ছিলুম ওদেশে। কত আনন্দ পেয়েছি। কত ভালোবাসা। তা মিস্টার শেফার্ড কী বললেন, জানো? বললেন, গান্ধী কি হিটলারকে নন্-ভায়োলেন্ট হতে পরামর্শ দিতে পারেন না? ইংরেজদেরকেই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন বিনা যুদ্ধে দেশ ছেড়ে দিতে ও তারপরে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ করতে। আমি চুপ করে শুনলুম। গান্ধীজীর ওই পরামর্শ কেউ কানে তুলবে না, ভারতীয়রাও না, যদি ভারত আক্রান্ত হয়।"

"তা কি আমরা জানিনে, মানস?" সৌম্য বলে, "যতক্ষণ না আমরা কাজে প্রমাণ করেছি যে ভারতের জনগণ বিনা অস্ত্রে ব্রিটিশ শাসকদের হারিয়ে দিয়েছে, তোমরা ওই শেফার্ড সাহেবকেও, ততক্ষণ কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করবে না। এমন কি কংগ্রেসের নেতারাও না। ওদের চালনা করতে হলে কিছুদূর ওদের সঙ্গে চলতে হয়। গান্ধীজী ওদের বেশ খানিকটে রাশ ছেড়ে দিয়েছেন। তবে আমাদের উপর নির্দেশ আছে আমরা যেন যুদ্ধে সহযোগিতা না করি। লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তা হলে তাকে লবণাক্ত করবে কে?"

"ওঃ তোমরাই হলে ধরিত্রীর লবণ!" পরিহাস করে দত্তবিশ্বাস।

"হাসতে পারো, কিন্তু এটা তো মানবে যে আজকের এই বিশ্বব্যাপী হিংসার বিরোধী শক্তি বলতে ওই ক'জন গান্ধীপন্থী কর্মীই সক্রিয়। ওদের কাছে সর্বপ্রধান সমস্যা ভারতের পরাধীনতা নয়, যদিও তার জন্যে তারা সর্বক্ষণ ব্যথিত। সর্বপ্রধান সমস্যা হিংসার উত্তরে হিংসার উপরে অত্যধিক বিশ্বাস। মানুষ কি বুঝতে পারে না যে হিংসার সঙ্গে হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উভয় পক্ষই চূড়ান্ত হিংসায় পৌঁছবে? শেষে একপক্ষ হেরে যাবে। তখন তার গৌরব করবার মতো কী থাকবে? জিতবে যারা তারা অবশ্য গৌরবে মশগুল হবে, কিন্তু সে আর ক'টা দিন? লুটের মালের বখরা নিয়ে ঝগড়া বেধে যাবে মিতায় মিতায়।" সৌম্য ভবিষ্যদ্বাণী করে।

"আপাতত হিটলারকে রুখতে হবে, এ ছাড়া আর কোনো কর্তব্য নেই বিশ্বমানবের। তোমরা যদি তোমাদের অহিংস উপায়ে তা পারতে তা হলে তোমাদের পরামর্শই শোনা যেত। কিন্তু হিটলার না শোনে অহিংসার কাহিনী।" মানস টিপ্পনী কাটে।

"তারপর, মানসদা, আপনার অপর ইংরেজ অফিসার কী বললেন?" জুলি সুধায়।

"তিনি যা বললেন তা আরো চমৎকার। বললেন, আমার ছেলের বয়স এখন চোদ্দ। আরো চার বছর বাদে যুদ্ধ বাধলে ওকে ধরে নিয়ে যেত। তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে। যুদ্ধ যখন বাধতই একদিন না একদিন। হিটলার থাকতে যুদ্ধ না বেধে পারে? বললেন মিস্টার বার্লো। ওঁর ওই একটিমাত্র সন্তান। স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। ছেলে থাকে ইংলণ্ডে। কিন্তু বোমাকে তিনি ভয় করেন না। কর্তারা নিশ্চয়ই অ্যান্টিএয়ারক্রাফট গান ব্যবহার করবেন। শেলটারও খোঁড়া হবে। ছেলেমেয়েদের শহর থেকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন। বলতে ভুলে গেছি যে শেফার্ড আর বার্লো দু'জনেই গত মহাযুদ্ধে জার্মানদের সঙ্গে লড়েছেন। শেফার্ড ছিলেন গোলন্দাজ। আর বার্লো পদাতিক বাহিনীর অফিসার। তাঁরা কেউ দ্বিতীয়বার যুদ্ধ বাধুক এটা চাননি। অনুমতি পেলে আবার যোগ দিতেন। দেশ আগে। মাই কাণ্ট্রি রাইট অর রং।" মানস তাঁদের মনোভাব জানায়।

"মাই কাণ্ট্রি রাইট অর রং, এটাই ঠিক। কিন্তু কার কাছে বড়ো তার কাণ্ট্রি?" বিলাপ করে মধুমালতী। "কংগ্রেসের ভিতরেই দ্বন্দ্ব। বাইরে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিস্ট পার্টি। যে যার নিজের তালে আছে। দেশের হয়ে কথা বলবে কে? গান্ধীজী? দশবছর আগে হলে পারতেন। এখন আর নয়।"

।। চার ।।

যূথিকা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার মুখ খোলে। "আচ্ছা তোমার ওই বার্লো সাহেবের ছেলেকে কি চারবছর আগে যুদ্ধ না থামলে ধরে নিয়ে যাবে? যখন তার বয়স আঠারো।"

"যুদ্ধের জন্যে লোক কম পড়লে আরো আগেও ধরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য আইন বদলে দিয়ে।" মানস বলে।

"সে কী!" যূথিকা চমকে ওঠে। "ছেলের নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠবে না? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। একেই তোমরা বলবে গণতান্ত্রিক জীবনধারা? কেউ যদি স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে যায় সে স্বাধীনতা তার আছে। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ধরে নিয়ে গেলে তার স্বাধীনতা রইল কোথায়?"

"ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট যদি আইন পাশ করে কনস্ক্রিপশন চালায় তবে সেটা জনপ্রতিনিধিদের অধিকাংশের ভোটেই সম্ভব। জনপ্রতিনিধিরা জনসাধারণের অধিকাংশের ভোটেই নির্বাচিত।" মানস ব্যাখ্যা করে।

"তোমার ও যুক্তি আমি শুনব না। দরকার হলে ষোল বছরের ছেলেকে যুদ্ধে ধরে নিয়ে যাবে, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা রাখবে না, এটা অন্যায়। তা সে নাৎসীদের দেশেই হোক আর ডেমোক্রাটদের দেশেই হোক। তা হলে তো একদিন মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যেতে পারে।" যূথিকা আঁতকে ওঠে।

"সে গুজবও শোনা যাচ্ছে," দস্তবিশ্বাস তার বিলেতের অভিজ্ঞতা থেকে বলে। "ভয় পেয়ো না। মেয়েদের ওরা লড়তে পাঠাবে না, পুরুষের অভাবে যেসব কাজ অচল সেইসব কাজে লাগিয়ে দেবে। যেমন অ্যাম্বুলান্স চালানো, টেলিফোন অপারেট করা, সৈনিকদের জন্যে রান্না। অমনি করেই হবে মেয়েদের মুক্তি। ওরাও বলবে, 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই। বাধাবাঁধন নেই গো নেই।' কেরানীগিরির দরজা আগেই খুলে গেছে, এবার আরো দরজা খুলবে। ওরাও কনস্ক্রিপশনে আপত্তি করবে না, যদি বিবাহিতা না হয়ে থাকে। এই যেমন এদেশে যুদ্ধের সময় মেয়েদের ডাক দিলে তুমি আপত্তি করতে পারো, মিস মুস্তাফী করবেন না।"

মধুমালতী খুশি হলে বলে, "তা হলে তো বেঁচে যাই। বাবা তো বলেন, যুদ্ধ জিনিসটাকে দূর

থেকে যত ভয়ঙ্কর মনে হয় নিকট থেকে সেটা তত ভয়ঙ্কর নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে তাঁরও মৃত্যুভয় ছিল। গিয়ে দেখেন ভয় ভেঙে গেছে। আমাকে বন্দুক ধরতে ডাকলেও আমি আপত্তি করব নাকি? আমি শুধু জানতে চাই যে আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক। কারো তাঁবেদার নই। বাবা তো বলেন, ইংরেজ এতকাল বাঙালীকে বন্দুক ধরার সুযোগ দেয়নি। এবার দেবে। দিতে বাধ্য হবে। তা হলে এ সুযোগ দেশকে স্বাধীন করারও সুযোগ।"

"তা বলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে কনস্ক্রিপট করলে তুমি বিদ্রোহ করবে না?" যূথিকা উত্তেজিত হয়ে 'তুমি' বলতে শুরু করে।

"আগে বন্দুকটা তো হাতে পাই, মিলিটারি ট্রেনিংটা তো নিই, সবাই মিলে দলবদ্ধ তো হই, তার পরে ওই বন্দুক দিয়েই দেশ স্বাধীন করব।" মধুমালতী নিশ্চিত।

"কিন্তু বন্দুকটা ধরিয়ে দেবে কে? ইংরেজেই তো। ট্রেনিংটাও দেবে ইংরেজ। সে কি বুঝবে না যে এর শেষপর্ব তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ?" যূথিকা সুধায়।

"এর উত্তর আমিই দিচ্ছি।" মানস বলে, "সে ভালো করেই বোঝে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহটা পর মুহূর্তেই পাত্রান্তরিত হবে। হিন্দু আক্রমণ করবে মুসলমানকে। মুসলমান হিন্দুকে। রক্ষা করবে কে? ওই ইংরেজ।"

"তোমার ও থীসিস বিলকুল ঝুটা। না একো জওয়ান, না একো রুপেয়া। এইটেই সাচ্চা।" জুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

"কিন্তু আমি ভেবে মরছি এ যুদ্ধ যদি পাঁচবছর গড়ায় তবে বার্লোব ছেলেটার কী গতি হবে। বার্লো বেচারার তো আর একটিও ছেলে কি মেয়ে নেই। তাঁরই বা কী দশা হবে?" যূথিকা সমবেদনায় গলে যায়।

"আহা, এটা তো একজন ব্যক্তির সুখদুঃখের ব্যাপার নয়। একটা জাতির জীবনমরণেব প্রশ্ন।" দত্তবিশ্বাস বলে। "জার্মান জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজয় ঘটলে বার্লোই বা কোথায় আর তাঁর পুত্রই বা কোথায়। পরাজিত জাতির পতনের দৃশ্য দেখবার জন্যে বেশীদূব যেতে হবে না। পালযুগের বাঙালী কী ছিল আর লক্ষণসেনের পরবর্তী যুগের বাঙালী কী হলো। কোথায় তার সেই সব সমুদ্রগামী পালতোলা জাহাজ? বণিকরা যা চড়ে জাভায় সুমাত্রায় যেত। বৌদ্ধ শ্রমণরাও। ইংরেজরা যুদ্ধে হেরে গেলে নৌশক্তি হারাবে। সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য ও বহির্বাণিজ্য। ওদের স্বাচ্ছন্দ্যের মান নেমে যাবে। বেকারসংখ্যা আরো বাড়বে। ওদের ভবিষ্যৎ ভেবে ওরা শিউরে উঠেছে বলেই না সময় থাকতে কনস্ক্রিপশন জারি করেছে। গত যুদ্ধেও করেছিল। দেরিতে। সেবার ছিল মাস হিস্টিরিয়া। সবাই ছুটে যায় যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে। তাই গোড়ার দিকে স্বেচ্ছাসৈনিকদের অভাব হয়নি। শেষের দিকে হয়। ততদিনে মাস হিস্টিরিয়া থেমে গেছে। এবার একটি অনিচ্ছুক জাতিকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামতে হয়েছে। নইলে আবার মিউনিকেব মতো আত্মসমর্পণ। সেইজন্যেই প্রথম থেকেই কনস্ক্রিপশন। বার্লোর বরাত ভালো। তাঁব ছেলের যুদ্ধে যেতে আরো চারবছর বাকী। ততদিনে হিটলার হেরে গিয়ে থাকবে।"

"কী করে এতটা নিশ্চিত হলে, সুকুমারদা?" জুলি জেরা করে।

"দ্যাখ, জুলি। জার্মানীকে কেউ জিততে দেবে না। না রাশিয়া। না আমেরিকা। অত বড়ো শক্তিশালী এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ওরা আরো শক্তিশালী হতে দেবে কেন? ব্রিটিশ নৌবহর যদি জার্মানদের হাতে পড়ে ওদের হাত থেকে আমেরিকার পরিত্রাণ নেই। পেছন থেকে আক্রমণ করবে জাপান। আর অর্ধেক ইউরোপের যুদ্ধোপকরণ যদি জার্মানীর এখতিয়ারে আসে তা হলে তার দাপট থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করবে কে? ওই দুই শক্তি নেপথ্যে অপেক্ষা করছে। মঞ্চে প্রবেশ করবে যথাকালে। হিটলাব আখেরে হারবেই, জুলি।" দত্তবিশ্বাস নিশ্চয়তা দেয়।

"তা হলে তো আমাদের এ সুযোগ ব্যর্থ হবে।" জুলি মুষড়ে পড়ে ।

"তুমি দেখছি জার্মানদের ভাগ্যের সঙ্গে ভারতের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলছ, জুলি। জার্মানদের হারজিৎ জার্মানদের। আমাদের হারজিৎ আমাদের। ইংলণ্ডের দুর্যোগ আমাদের সুযোগ নয়। আমাদের অস্ত্রও অন্যরকম, রণকৌশলও অন্যরূপ। জনতা উদ্বেল হয়েছে বলে নেতাদেরও উদ্দাম হতে হবে এর কোনো অর্থ নেই। কিছু না করাও শ্রেয় হতে পারে। পরিস্থিতিকে পাকতে দাও।" সৌম্য পরামর্শ দেয়।

"অমন করলে জোয়ার চলে যাবে। দেয়ার ইজ আ টাইড ইন দি অ্যাফেয়ার্স অভ মেন।" জুলি উদ্ধৃতি দেয়। "টাইম অ্যাণ্ড টাইড ওয়েটস ফর নো ম্যান।"

"একটি বিরাট দেশ তার যুদ্ধনীতি স্থির করবে এইসব প্রবাদ প্রবচন মেনে! এ যেন পাঁজি দেখে যুদ্ধযাত্রা!" মানস উপহাস করে। "দেশে কি কেবল বিপ্লবীরাই আছে আর আছে উদ্বেল জনতা? রাইটস অ্যাণ্ড রংস্ নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে কেউ নেই? নেই রবীন্দ্রনাথ, নেই অরবিন্দ, নেই গান্ধী? গোটা সভ্যতারই আজ সঙ্কট। শুধু ইংলণ্ডের দুর্যোগ নয়। এতদিন ছিল নেশনে নেশনে যুদ্ধ। এবার তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মতবাদের সঙ্গে মতবাদের। ইডিওলজির সঙ্গে ইডিওলজির। আমি গভীরভাবে চিন্তিত।"

জুলি বলে, "মানসদা, দশবছর আগেও তোমার মুখে শুনেছি তুমি গভীরভাবে চিন্তিত। চিন্তা করতে করতেই তোমার জীবন ভোর হবে। তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। তুমি যদি হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও তো যুদ্ধে ঝাঁপ দাও। আর যদি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে চাও বিপ্লবে ঝাঁপ দাও। কূলে বসে ঢেউ গোণার চেয়ে স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়াই প্রাণবন্ত পুরুষের কাজ।"

"ঝাঁপ! ওই একটা কথাই তুমি শিখেছ । যুদ্ধে ঝাঁপ দেবার অর্থ তবু বুঝি, কারণ যুদ্ধ সত্যি সত্যি বেধে গেছে। কিন্তু বিপ্লব! সে তো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।" মানস বলে।

"ও কী বলছ, দাদা! দেশের চারদিকে কত বড় বড় সভা হচ্ছে। নেতারা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। বুদ্ধের মতো একঠাই বসে আছেন শুধু গান্ধীজী। বিপ্লব ঘনিয়ে আসছে। তুমি তোমার গজদন্তের গম্বুজ থেকে নেমে এলে সারা অঙ্গে আগুনের আঁচ অনুভব করতে পারবে।" জুলি বলে।

"আপনিও অনুভব করতে পারছেন নাকি?" মধুমালতীকে সুধায় দত্তবিশ্বাস।

"কই, না। আমাদের এদিকে ছিল কৃষকপ্রজা আন্দোলন। সেটাও মিইয়ে গেছে। দিন দিন বাড়ছে মুসলমানদের গোঁড়ামি। ব্যারিস্টাররাও আচকান পায়জামা আর ফেজ পরে ঘুরছেন। আর সেই সঙ্গে বাড়ছে হিন্দুদেরও গোঁড়ামি। বাবা সেদিন বলছিলেন, এতদিন কেবল একপক্ষই কমিউনাল ছিল, এখন আরেকপক্ষও সমান কমিউনাল হয়ে উঠেছে। পরিণাম ভেবে আমি তো ভয়ে শিউরে উঠছি। বিপ্লব যারা করে তারা সামনের দিকে তাকায়। এদের দৃষ্টি পেছনের দিকে। এরা ফিরে যাবে মধ্যযুগে। না, মিস্টার দত্তবিশ্বাস, আমি জুলির সঙ্গে একমত নই।" মিলি বলে।

"আমি লক্ষ করছি যে আপনারা দু'জনেই একসঙ্গে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী থাকলেও আপনাদের পন্থা এক নয়।" দত্তবিশ্বাস বলে।

"মাঝখানে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে যে! আপনার উপরে আমার অভিমান আছে, আপনি বিলেত থেকে চিঠি নিয়ে এসে জুলিকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। যদিও পারলেন না বিলেত অবধি নিয়ে যেতে। ও বম্বে থেকে পুণা চলে গেল। আর আমি ওর বন্ধু হয়েও আটকা পড়ে থাকলুম। যতদিন না রোগে ধরে।" মিলির কণ্ঠে তিরস্কার।

"আপনার কথা কেউ আমাকে বললে তো চেষ্টা করতুম, মিস মুস্তাফী। তা ছাড়া আমার কেরামত তো মিস হ্যারিংটনের কাছ থেকে জুলির জন্যে সুপারিশপত্র জোগাড় করা। আর জুলির মায়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি যে জুলি বিলেত ফিরে যাবে। এসব তো আপনার বেলা খাটত না। তবে আরো একটা

কথা ছিল, সেটা সকলের সামনে খুলে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি। আমার প্রত্যাশা ছিল জুলি আমার জীবনসঙ্গিনী হবে। সেটা তো আপনার বেলা ছিল না।" দত্তবিশ্বাস সসঙ্কোচে বলে।

"স্বার্থ! স্বার্থ!" মধুমালতী হেসে বলে, নইলে কেউ বিলেত থেকে ছুটে আসে বন্দিনীকে মুক্ত করতে? এবারকার অভিযানটাও কি স্বার্থমূলক?" মিলি প্রশ্ন করে।

"খুলে যদি বলতেই হয় তবে আর ঢাকাঢাকি কেন? বাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো নয়, দেশের উপরেও তেমন নাড়ীর টান নেই। আমি যতদিন বিলেতে থাকি ততদিন আপ-টু- ডেট থাকি। দেশে ফিরে এলে আউট-অভ-ডেট হয়ে যাই। তা হলে আসি কেন? আসি জুলিকে নিয়ে যেতে। সেটা ওর মায়ের চিঠি পেয়ে। সেবারেও পেয়েছিলুম। এবারেও পেয়েছি। মাসিমার ধারণা সরকার আবার বন্দীশিবির খুলতে যাচ্ছে। পুরনো বন্দিনীদের একে একে ধরবে। এখন তো লেডী হ্যারিংটন নেই। কে সুপারিশ করবে? আর কেনই বা করবে? যার জন্যে লণ্ডনের বেডফোর্ড কলেজে সীট রিজার্ভ করতে আমি হিমশিম খেয়ে গেলুম, অবশ্য খরচ জোগাতেন ওর মা, আমার মাসিমা, সে কিনা পুণার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হলো। এর জন্যে, চৌধুরী, তুমিই দায়ী। তোমার উপরে আমার রাগ আছে। যাক, এবারেও আমি এসেছি জুলিকে বন্দীশিবির থেকে অগ্রিম উদ্ধার করতে। এবারেও আমার সেই একই প্রত্যাশা। কিন্তু যা শুনছি তাতে আমার আশাভরসা প্রায় নিঃশেষ। ও ঝাঁপ দেবার জন্যে দুই বাহু তুলে দাঁড়িয়েছে। ও যদি ঝাঁপ দেয় তো নির্ঘাত ডুববে। আমি কী করতে পারি! আমার জাহাজ এবারেও আমাকে একলা নিয়ে যাবে।" কম্পিত কণ্ঠে বলে দত্তবিশ্বাস।

"জুলি, এখনো সময় আছে।" মধুমালতী বলে।

"কিসের সময়? জাহাজের? তার আগেই যা হবার তা হয়ে যাবে। ওরা আমাকে ধরে নিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। বিপ্লবী জনতা আমাকে পাঁচিল ভেঙে উদ্ধার করবে। জীবনসঙ্গিনী হওয়া না হওয়া তার পরের কথা। বিলেতে যাওয়ার কথাই ওঠে না। মা আমাকে ভালোবাসেন। সুকুমারদাও। কিন্তু আমি যে বিপ্লবের পথে অনেকদূর এগিয়েছি। সুকুমারদাকে আশা দিতে অক্ষম।" জুলি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে।

"সুকুমারদা," যূথিকা বলে, "আপনার উপরে মিস মুস্তাফীর অভিমান আছে, সেবার আপনি তাঁকেও জুলির সঙ্গে মুক্ত করেননি। এবারেও পুরনো বন্দীদের একে একে ধরবে শুনেছেন। তা হলে তাঁদের একজনকে শুধু কেন, আরেকজনকেও অগ্রিম উদ্ধার করতে হয়।"

"আরেকজনকে?" দত্তবিশ্বাস আশ্চর্য হয়। "কে তিনি?"

"বুঝতে পারলেন না? আপনার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তিনী।" যূথিকা হাসে।

"সে কী!" দত্তবিশ্বাস থতমত খায়। "উনি যে সাক্ষাৎ অগ্নিকন্যা। আমি নিজেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব যে!"

মধুমালতী যূথিকার উপর কপট কোপভরে বলে, "মিসেস মল্লিক, এ কী কৌতুক! উনি এসেছেন জুলিকে নিয়ে যেতে। তার বদলে আমাকে নিয়ে যেতে নয়। ওঁর সঙ্গে গিয়ে আমি করবই বা কী? এটা কী দেশভ্রমণের সময়?"

যূথিকা জিভ কেটে বলে, "আমারই ভুল হয়েছে। অভিমান শুনে আমার মনে হলো হয়তো কোনো পূর্বসম্বন্ধ ছিল।"

"লেশমাত্র না। অভিমানটা এইজন্যে যে, জুলির কেমন একজন বান্ধব আছে, আমার কেন নেই। তার মানে এই নয় যে উনিই আমার বান্ধব। মিস্টার দত্তবিশ্বাস, আপনি মহৎ কাজ করেছিলেন জুলিকে বন্ধনমুক্ত করে। কিন্তু আমাকে মুক্ত করা অত সহজ ছিল না, আমার কেসটা আরো খারাপ। বাবারও বড় সাহেব বন্ধু ছিলেন। কিন্তু আমার ওই এক কথা। অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার। যুদ্ধে আর

ভালোবাসায় সবই ন্যায়সঙ্গত। আমাদের দেশের লোকের হাতে অস্ত্র থাকলে যেটার নাম হতো যুদ্ধ আমরা দু'চারজন গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করলে সেটার নামই হয় সন্ত্রাস। আমার কাজই ছিল অস্ত্র পাচার করা। জুলির মতো বোকা মেয়েদের হাত দিয়ে। ওরা আমাকে ধরেছিল ঠিকই, আটক করেছিল ঠিকই, ছাড়তেও যে চায়নি সেটাও ঠিক। তবে এখন আমার আর ওসব কাজে বিশ্বাস নেই। কিসে বিশ্বাস আছে সেকথা বলাও শক্ত। তবে একটু একটু করে আমি সৌম্যদার ব্রতের দিকেই ঝুঁকছি।" মধুমালতী বলে।

"সেই ভালো, সেই ভালো।" যূথিকা বুঝতে পারে যে সুকুমার আর মধুমালতী পরস্পরের জন্যে নয়। তবে সৌম্য আর মধুমালতী পরস্পরের জন্যে কি না বিধাতা জানেন। সে লক্ষ করে জুলি খুব খুশি হয় না সৌম্যদার ব্রতের দিকে মিলির একটু ঝোঁক শুনে। সৌম্য সম্পূর্ণ অবিচলিত।

"এই মেয়ে!" জুলি বলে মিলিকে, "তুমি কবে থেকে গান্ধীবাদী হলে? জানো ওটা আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়। ধনিকদের সঙ্গে যাদের এত দহরম মহরম তারা শ্রমিকদের শোষণের উপর একটু ত্যাগের প্রলেপ বুলিয়ে দিলেই অমনি বনবে শ্রেণীশূন্য সমাজের উদ্‌গাতা! ওদের ভূমিকা ওই স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে।"

"অন্তত সেটুকুও তো হোক। ওরা আট আটটা প্রদেশে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট স্থাপন করেছে। কেন্দ্রেও করতে পারে। এটা কি সামান্য কৃতিত্ব? ওদের পলিসি মেনে না নিলে ওরা ইস্তফা দিয়ে আবার লড়তে পারে। এটাও কি সামান্য শক্তিমত্তা? ওরা যদি স্বরাজ অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তবে আমি তোমাদের দিকেই ঝুঁকব, জুলি। ইতিমধ্যে তোমরা কী করতে চাও, করো।" মধুমালতী বলে।

"ওদের আগেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। সারা দেশ আমাদের পেছনে। ওদের পেছনে গোটাকতক মন্ত্রিত্বলোভী আপসপ্রয়াসী।" জুলি নিঃসন্দেহ।

"কী, সৌম্যদা, তুমি যে একেবারে চুপ।" যূথিকা বলে।

"আমিও গভীরভাবে চিন্তিত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যুদ্ধ করতে, অরবিন্দ বলছেন যুদ্ধ করতে, রলাঁ বলছেন যুদ্ধ করতে, রাসেল বলছেন যুদ্ধ করতে। নাৎসী বা ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা বিনা শর্তে যুদ্ধ করবেন না। শর্তটা ভারতের স্বাধীনতা। অথচ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পেলে যুদ্ধ করবেন এটাও তো শর্তাধীন স্বাধীনতা। বিনা শর্তে স্বাধীনতা ঢের বড়ো জিনিস। তার জন্যে সত্যাগ্রহ ভিন্ন গতি নেই। কিন্তু সত্যাগ্রহে মতি কোথায়? মতি যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হিংসাত্মক বিপ্লবে। তার থেকে দেশকে নিবৃত্ত না করলে সত্যাগ্রহের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না। সেই দুরূহ দায় বর্তেছে যাদের উপরে তাদেরই একজন আমি। জুলিকে আমি পুণা থেকে ভজাতে শুরু করি। সে সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু সত্যাগ্রহের পথ ধরে না। পুণাতে টিলক মহারাজের প্রভাব এখনো সক্রিয়। জুলি সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। ও যা বলছে টিলক মহারাজ বেঁচে থাকলে ওই কথাই বলতেন। ভাষাটা বোধহয় একটু অন্যরকম হতো। হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্লব এই দুই চরমপন্থার দুটোই হিংসাত্মক। আমরা গান্ধীপন্থীরা এই দুটোর থেকেই তফাতে থাকতে চাই। আমাদের সময় আসবে। তখন যেন জনগণকে প্রস্তুত দেখতে পাই।" সৌম্য ধীরে ধীরে বলে।

"তার মানে গান্ধীজী সহসা কিছু করবেন না।" মানস ভাষ্য করে।

"তার মানে গান্ধীজী আর কাউকে কিছু করতে দেবেন না।" জুলি আলাদা ভাষ্য করে।

"তোমরা কিছু করতে চাইলে গান্ধীজী বাধা দেবেন কী করে?" জানতে চায় মধুমালতী। "দিলে দেবে ব্রিটিশ রাজ।"

"বুঝতে পারলেন না? কংগ্রেস যদি যুদ্ধে যোগ দেয় কংগ্রেস সরকারই আমাদের বাধা দেবে। আর কংগ্রেস সরকার তো গান্ধীজীরই আঁচলধরা। জনতা অবশ্য আমাদের পক্ষে। তবু জনতা এখনো গান্ধীজীকে মানে।" জুলি উত্তর দেয়।

"তা হলে তোমাদের বিপ্লবটা নির্ভর করছে গান্ধীজীর সম্মতির উপরে।" মানস জুলিকে তর্কে কোণঠাসা করে।

"কিছুদিনের জন্যে নির্ভর করবে। কংগ্রেস মন্ত্রীদের আমরা মসনদ থেকে নামাবই নামাব। আবার আমরা আমাদের একজন নেতাকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদে বসাব। তিনি আসন থেকে নড়বেন না। নড়তে হবে বল্লভাচারী সম্প্রদায়কেই।" জুলি রসিকতা করে।

মধুমালতী দত্তবিশ্বাসকে বুঝিয়ে দেয় যে বল্লভাচারী সম্প্রদায় মানে কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃমণ্ডলী। বল্লভভাই পটেল যাঁদের সর্দার। মন্ত্রীরা তাঁদের আজ্ঞাবহ। কেন্দ্রীয় সরকারে রদবদল হলে তারাই সেখানে অধিষ্ঠান করবেন।

দত্তবিশ্বাস বলে, "ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে বল্লভাচারীদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় ধরপাকড় শুরু হয়ে যাবে। আপনাকেও ধরে নিয়ে যাবে। আমি দেশে থেকেও আপনার মুক্তির জন্যে কলকাঠি নাড়তে পারব না। আমার কী স্বার্থ।"

"ওঃ! স্বার্থ কথাটা আপনার মনে লেগেছে বুঝি!" মধুমালতী দুঃখিত।

"লাগবে না? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আর কাকে বলে? আমার কী গরজ বলুন দেখি, কেন আমি নিজের কাজকর্ম ফেলে জুলিকে বাঁচানোর জন্যে সাগর পারাপার করি? এতে খরচও কি কম নাকি? ওর মা আমার পাতানো মাসিমা। অমন মাসিমা পিসিমা আমার ইংরেজ ও ভারতীয় মিলে জনা দশ বারো আছেন। সকলেরই ফাই ফরমাস খাটি। লাভলোকসান হিসেবের মধ্যে ধরিনে। লাভও যে হয় না তা নয়। উচ্চতর সমাজে মেশবার সুযোগও মস্ত বড়ো একটা লাভ। এই যেমন ছিল লেডী হ্যারিংটনের বাড়ী অবারিত দ্বার। কতজনের জন্যে সুপারিশ আদায় করেছি, কিন্তু নিজের জন্যে নয়। কেউ একটু বললেই এদেশেও আমার একটা হিল্লে হয়ে যেত। সেটা আমার ইচ্ছে নয়। আমি ওই দেশেই থেকে যেতে চেয়েছি। থেকে গেছিও। কারো সুপারিশে নয়। কাজ দেখিয়ে। তবে এটাও ঠিক যে কাজ দেখানোও যথেষ্ট নয়। কাকে কাকে চিনি কে কে আমাকে চেনেন, কোন্ সমাজে মেলামেশা, এসবও গণনার মধ্যে পড়ে। তাই মাসিমা পিসিমাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। তাঁরাই আমার অ্যাসেটস।" দত্তবিশ্বাস পরিহাস করে।

"তা হলে স্বার্থ কথাটা ভুল নয়। কী বলেন?" মিলিও পরিহাস করে।

"জুলির বেলা ওটা স্বার্থ নয়, ওটা আরেকটা শব্দ। দুই অক্ষরের। আন্দাজ করুন।" দত্তবিশ্বাস উত্তরের প্রতীক্ষা করে।

"প্রেম।" মিলি মুচকি হাসে।

"ঠিক বলেছেন। মনে হচ্ছে অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন।" সুকুমারও হাসে।

"অভিজ্ঞতা?" মিলি চমকে ওঠে। "অগ্নিকন্যা বলে যার সুখ্যাতি তার ধারে কাছে আসতে সাহস পাবে কোন্ পতঙ্গ? তাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে বলে সেই যে আশঙ্কা সে আশঙ্কা থাকতে তার সঙ্গে ঘর বাঁধতে রাজী হবে কোন্ সুজন?"

"ট্র্যাজিক!" দত্তবিশ্বাস করুণ সুরে বলে, "ট্র্যাজিক! আপনাকে দেখে মনে হয় মূর্তিমতী একখানি ট্র্যাজেডী। একদিন না একদিন দেশ স্বাধীন হবে। তখন আপনার স্ট্যাচু তৈরি হবে। কিন্তু তাতে হয়তো দেখানো হবে আর একজন জোন অভ আর্ক। বেদনার নয়, বিজয়ের প্রতীক।"

"জোন অভ আর্ক কে? মিলি না আমি?" জুলি চেঁচিয়ে ওঠে। "তুমি কি ভুলে গেলে যে তোমাকে না আমি বলেছিলাম আমার আদর্শ জোন অভ আর্ক? ওর আদর্শ তো ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ।"

"আচ্ছা, বেশ, তোমারও তো স্ট্যাচু বানানো হবে। তোমারটাই না হয় জোনের মতো হবে আর তোমার বন্ধুরটা লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো। হ্যাঁ, আমার মনে আছে তুমি চেয়েছিলে জোনের মতো হতে।

তোমাকে এবার উদ্ধার করা গেল না। ওরা যদি তোমাকে জোনের মতো পুড়িয়ে মারে তা হলে কিন্তু আমি টেমস নদীতে ঝাঁপ দেব, জুলি।" দত্তবিশ্বাস শ্লেষের সঙ্গে বলে।

"ওসব কী অলক্ষুণে কথা হচ্ছে ডিনার টেবিলে বসে?" শাসন করে যূথিকা।

"মাফ কোরো, যূথি। নদীতে ঝাঁপ দেব বলেছি, ডুবে মরব বলিনি। আমি বীরপুরুষ নই, মরতে ভয় পাই।" দত্তবিশ্বাস বলে, "কিন্তু বিপ্লব একটা কমিক অপেরা নয়, জুলি। প্রতিবিপ্লবীরা তোমাকে হাতে পেলে অমর করে দেবে। আমরা যারা বেঁচে থাকব তারা কি তোমার স্ট্যাচু দেখে সান্ত্বনা পাব?"

"মিস্টার দত্তবিশ্বাস," মধুমালতী বলে, "আপনি আজ আমাকে যে কমপ্লিমেন্ট দিলেন আমি তার যোগ্য নই। বিপ্লব সম্বন্ধে এই সাত আট বছরে আমার ধ্যান ধারণা বদলে গেছে। বিপ্লবের পরে ক্ষমতা যাদের হাতে পড়বে তারা আমার শ্রেণীর লোক নয়, তারা আমার শ্রেণীটাকেই সমূলে উচ্ছেদ করবে। করলে আশ্চর্য হবার কী আছে? আমাদের পাপের বোঝা জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। একদিন হিসাবনিকাশের দিন আসবেই। সেদিন যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বোঝা নামিয়ে দিই তবেই রক্ষা। নয়তো জোর করে বোঝা নামানো হবেই। কিন্তু আমার নিজের ভূমিকা ওতে কোথায়? আমি আপনার লোকের রক্তপাত করতে পারব না। তারা ধনিকই হোক আর শ্রমিকই হোক। স্ট্যাচু যদি হয় তো জুলিরই হবে, আমার নয়।"

"আপনার লোকের রক্তপাত করতে কি আমরাও চাই, মিলি?" জুলি প্রতিবাদ করে। "ওরা যদি পা দিয়ে ভোট দেয় তা হলে ওদের ধরতে বাঁধতে মারতে হবে কেন? হা হা হা হা। বুঝতে পারলে না মর্ম? লেনিন কী বলেছিলেন? জমিদাররা পা দিয়ে ভোট দেবে। মানে, পালাবে। তখন কৃষকরা জমি দখল করবে। এটাও কি একপ্রকার গণতন্ত্র নয়? এই গণভোট?"

জুলির হাসিতে আর কেউ যোগ দেয় না। এর নাম রেভোলিউশন মেড ইজি। সে আপন মনে বকে যায়, "যে ঝাঁটা দিয়ে আমরা ইংরেজকে তাড়াব সেই ঝাঁটা দিয়ে রাজারাজড়াদেরও। সেই ঝাঁটা দিয়ে জমিদারদেরও। সেই ঝাঁটা দিয়ে পুঁজিপতিদেরও। তবে বুর্জোয়াদের সবাইকে তাড়ানো একই কালে হতে পারবে না। রাজ্য চালাবে কে? কলকারখানা চালাবে কে? দোকান বাজার চালাবে কে? তবে ওদের মাইনে কমাব। মানসদা, আপনাকেও অল্পে সন্তুষ্ট হতে হবে।"

"চল হে, মল্লিক, আমার সঙ্গে ইংলণ্ডে। সেখানে তোমার গুণের কদর হবে। যেদেশে মুড়ি মিছরির একদর সেদেশে থাকতে নেই।" দত্তবিশ্বাস বলে।

"জুলি, তোমার ধারণা আমরা আমাদের দায়িত্বের তুলনায় অত্যধিক পাই। তোমরা যদি আমাদের দায়িত্ব কমিয়ে দাও আমরাও কম নিতে রাজী হব।" মানস আশ্বাস দেয়।

"আমরা তার জন্যে তৈরি হচ্ছি, বোন। স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্যে বিস্তর বাজে খরচ করতে হয়। তোমরা আমাদের স্ট্যাটাস খাটো করলে আমরাও বেঁচে যাই।" যূথিকা বলে।

"স্ট্যাটাস সকলেরই সমান হবে। কৌঁসুলী আর মোক্তার, সার্জন আর হাতুড়ে সব সমান। বুর্জোয়াদের দেক্লাসে করতে হবে। মানে, শ্রেণীচ্যুত। ওদের মারব না, ধরব না, তাড়াব না। শুধু নিচের শ্রেণীতে নামিয়ে দেব। যেমন স্কুলের ছাত্রদের করা হয়। অমনি করেই শ্রেণীশূন্য সমাজ গড়ে উঠবে।" জুলি উৎসাহের সঙ্গে বলে।

"মল্লিক, তুমি কি এমন দেশে থাকবে না আমার সঙ্গে যাবে? আমি একদণ্ডও তিষ্ঠতে চাইনে।" দত্তবিশ্বাস উদ্বেগ প্রকাশ করে।

"আপনাকে জুলি ভয় পাইয়ে দিচ্ছে, মিস্টার দত্তবিশ্বাস। আপনি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। ওর আত্মীয়রা সবাই ব্যারিস্টার, ডাক্তার, পদস্থ অফিসার, কোম্পানীর ডাইরেক্টর। ওর শ্বশুর রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। বিপ্লব ওঁদের শ্রেণীচ্যুত করুক তো আগে। তারপরে আপনাকে

করবে। আপনি নিজের দেশেই থেকে যান। কেন এই যুদ্ধের মুখে ওদেশে যাবেন? আমি যদি বলি, যেতে নাহি দিব?" মধুমালতী ওর চোখে চোখ রাখে।

"জুলি আমাকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না। আপনি কি আমাকে রক্ষা করতে পারবেন। আপনি কি আমার তারিণী?" দত্তবিশ্বাস আবেগের সঙ্গে বলে।

"আপনি আমাকে অগ্রিম উদ্ধার করবেন।" মিলি হঠাৎ বলে ওঠে।

দত্তবিশ্বাস হকচকিয়ে যায়। "কী করে তা সম্ভব? আমি তো দেশ ছেড়ে চললুম।"

"আপনাকে দেশে থেকে যেতে বলব না। কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি ভাবছি আমিই বিদেশে যাব। তা হলে কেউ আমাকে জেলে পুরতে পারবে না। না, সেখানেও আটক করবে?" মিলি কী জানি কী ভেবে বলে।

"আরে না। ইংলণ্ডে কাউকে বিনা বিচারে আটক করে না। এক যদি না সে যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের লোক হয়। যুদ্ধটা তো জার্মানদের সঙ্গে। আপনি তো জার্মান নন। আপনি যদি জেল এড়াতে চান তো ইংলণ্ডেই চলুন।" দত্তবিশ্বাস আহ্বান করে।

"দেখি মা-বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে। মাসোহারা তো ওঁদেরকেই পাঠাতে হবে। কখনো ওদেশে যাইনি। আপনার সঙ্গেও পরামর্শ করতে চাই।" মধুমালতী বলে।

"আনন্দের সঙ্গে পরামর্শ দেব। জুলির জন্যে যে ব্যবস্থা করেছি সে ব্যবস্থা আপনারই কাজে লাগবে, ও যদি না যায়, আপনি যদি যান।" দত্তবিশ্বাস জুলির দিকে তাকায়।

"ঢং। ঢং! এটা একটা ঢং!" জুলি অবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, "মিলি যাবে বিলেত। ইংরেজরা যার জাতশত্রু।"

"এটা শত্রুতার সময় নয়। ওরা বিপন্ন। ওদের বিপদ কেটে যাক, আবার শত্রুতা করা যাবে। পড়াশুনা তো তেমন কিছু করিনি। বেডফোর্ড কলেজে জায়গা পাই তো জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়ে নেব। মিস্টার দত্তবিশ্বাস আমাকে নেবে তো?" মিলি সুধায়।

"নেবে না কেন? আপনার পলিটিকাল রেকর্ড নিয়ে ওরা মাথা ঘামাবে না। অ্যাকাডেমিক রেকর্ডটাই দেখবে। সঙ্গে কিছু রেফারেন্সও দরকার। সেটা আমি যেমন করে পারি ম্যানেজ করব। আপনার বাবার ওয়ার রেকর্ডও কাজে লাগবে। মেসোপোটেমিয়ায় টার্কদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। আপনার অ্যাডমিশন হয়ে গেছে বলে ধরে নিন। কালকেই টমাস কুককে লেখা যাবে প্যাসেজের জন্যে আর বেডফোর্ড কলেজকে অ্যাডমিশনের জন্যে। যদি আপনার গুরুজন অনুমতি দেন।" দত্তবিশ্বাস আগ্রহ দেখায়।

"পাশপোর্ট নিয়ে গণ্ডগোল বাধবে না?" যূথিকা সুধায়।

"সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি শেফার্ডকে বোঝাব" মানস আশ্বাস দেয়। "শেফার্ড সুপারিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাশপোর্ট মিলবে।"

"পুলিশ থেকে বাধা দেবে না?" যূথিকা প্রশ্ন করে।

"আমি জাফর হোসেনকেও বলব। জাফর তো প্রায়ই মুস্তাফীকে কল দেয়। ওঁর মেয়ের জন্যে এক লাইন লিখতে পারবে না?" মানস অভয় দেয়।

সৌম্য এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলে, "মিলি, তুমি কি সত্যি এ সময় দেশ ছেড়ে যেতে চাও? তোমার সেবাপ্রতিষ্ঠান চালাবে কে?"

"আমি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে যাব, সৌম্যদা। দেশে তো আমি কারো সঙ্গেই পা মিলিয়ে নিতে পারছিনে। এক আপনার সঙ্গেই কতকটা মেলে। কিন্তু আপনারা কবে সত্যাগ্রহ করবেন তা আপনারাও জানেন না। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে। না হলো বিয়ে। না একটা কেরিয়ার। আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা কি ভাবব না?" মিলির কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর।

"ওঃ তোমার সেই অভিজ্ঞতা!" জুলি টিটকারি দেয়।

"হ্যাঁ সে অভিজ্ঞতাও জীবনের সম্পদ। কেন কেউ আমার দিকে ফিরে তাকাবে না? কেন প্রপোজ করবে না? তোমার কাছে প্রপোজ করবে। তুমি প্রত্যাখ্যান করবে। আমি অগ্নিকন্যা হতে চাইনে, আমি স্ট্যাচু চাইনে, আমাকে বাঁচতে দাও।" মিলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দত্তবিশ্বাসের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকায়।

"জুলি ওর শেষকথা বলে দিয়েছে। আমি এখন ফ্রী।" দত্তবিশ্বাস মিলির দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকায়। দৃষ্টিবিনিময় হয়ে যায়।

মানস তা লক্ষ করে টিপে টিপে হাসে। সুকুমারের উদ্দেশে গেলাস তুলে বলে, " বেস্ট অভ্ লাক।"

সুকুমার উৎসাহের চোটে দাঁড়িয়ে উঠে সবাইকে চমক দেয়। "আমার একটু নাচতে ইচ্ছে করছে। মল্লিক, চল হে আমরা ক্লাবে ফিরে যাই। নাচের পার্টনার হতে অনুরোধ করি মিস্ সিন্‌হা ও মিস্ মুস্তাফীকে।"

মানস হো হো করে হেসে বলে, "তোমার পার্টনার কে হবেন জানি। কিন্তু আমার পার্টনার তো জুলি নয়, জুঁই। হায়! নাচতে আমরা ভুলে গেছি।"

সুকুমার অপ্রস্তুত হয়ে নিজের আসনে আছাড় খেয়ে পড়ে। "কেন যে মানুষ মরতে এদেশে আসে? কী সুখ পায় বেঁচে? মল্লিক, তুমি এদেশে ফিরে এসে প্রাণে বেঁচে আছো, কিন্তু জীবনটাকেই হারিয়েছ। তোমার জন্যে আমি সত্যিই মর্মাহত।"

।। পাঁচ ।।

যূথিকার এক চোখ ছিল জুলির উপরে, আরেক চোখ মিলির উপরে। মিলির মুখে একটুখানি গোলাপী আভা। জুলির মুখ টকটকে লাল।

"এই মেয়ে!" জুলি বলে মিলিকে, "বিপ্লবের দিন তুমি থাকবে বিলেতে। শত্রুপক্ষের খাস তালুকে। এর নাম কী, জানো? বিশ্বাসঘাতকতা। এর সাজা কী, জানো? ফায়ারিং স্কোয়াড।"

মিলি শিউরে ওঠে। "জুলি! তুমি দেখছি এখন থেকেই মারমুখো। লেনিন যখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা করতেন তখন তুমি থাকলে তাঁকেও ভয় দেখাতে। আমিও যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা করব না তা নয়। বিপ্লবীরা বরাবরই ইংলণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে ও পেয়েছে। মনে করো আমিও যাচ্ছি আশ্রয় নিতে। এদেশে থাকলে তো নির্ঘাত জেল।"

"জেল!" জুলি অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, "জেল! তুচ্ছ জেল! তাকেই এত ভয় যে তুমি জাহাজে চড়ে পালাবে। কেন, আমি কি বলিনি যে জনতা এসে জেল ভেঙে উদ্ধার করবে? চারদিকে রব উঠবে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আর তখন কিনা তুমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পুঁথি পড়ছ।"

"ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দিন লেনিনও তো পেট্রোগ্রাডে ছিলেন না। তখন তিনি সুইজারলণ্ডে। জার্মান শত্রুরাই ওঁকে ওদের স্পেশাল ট্রেনে করে রাশিয়ায় পৌঁছে দেয়। এ রকম যে হবে তা কি তুমি সেদিন থাকলে জানতে? জানলে ক্ষমা করতে? তুমি বলতে লেনিন জার্মানদের চর। ফায়ারিং স্কোয়াড ডাকতে। বিপ্লব যেদিন হবে সেদিন যদি আমি বিদেশে থাকি তবে ওরাই আমাকে ওদের স্পেশাল প্লেনে করে ভারতে পৌঁছে দেবে। চর বলবে কতক লোক, কিন্তু পরে দেখবে আমারই জিৎ। কার সাধ্যি

আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করায়!" মিলি জ্বলে ওঠে।

"সব বিশ্বাসঘাতকেরই ওই একই যুক্তি। সবাই যেন এক একটি লেনিন। তার চেয়ে সোজাসুজি স্বীকার করলেই পারো যে তুমি বিপ্লবের ভয়ে পলাতক। ভয় পাবারই কথা। ওই যে একজন পাতি বুর্জোয়া উনি দশ বছর আগে থেকেই পলাতক হয়ে লণ্ডনে বসে আছেন।" জুলি দত্তবিশ্বাসের উপর কোপদৃষ্টি হানে।

"দশবছর কেন বলছ, জুলি? বারো বছর।" দত্তবিশ্বাস শুধরে দেয়।

"একই কথা। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। তবে তোমাকে আমরা বিশ্বাসঘাতক বলব না। তুমি বিপ্লবীদের একজন ছিলে না। নিতান্ত এক সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী পুরুষ। তোমার স্বপ্ন নিচের শ্রেণীতে নামা নয়, উপরের শ্রেণীতে ওঠা। ইংলণ্ডই তোমার উপযুক্ত দেশ। জাতকে জাত ওরা তোমারই মতো স্নব। তোমার তো গার্ল ফ্রেণ্ডের অভাব নেই। মিলিকে নিয়ে তুমি করবে কী? বিয়ে?" জুলি রাগতভাবে বলে।

"বিয়ে!" দত্তবিশ্বাস গদগদভাবে বলে, "আমার মতো অভাগার তেমন সৌভাগ্য কি হবে! আমি চাইলে কী হবে, উনি রাজী হলে তো!"

"ওটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার, জুলি। এখন থেকে আমি আমার হাতের তাস দেখাব না। খেলবার সময় হলে খেলব। মিস্টার দত্তবিশ্বাস, এখন থেকেই ধরে নেবেন না যে আমি আপনাকে বা আর কাউকে বিয়ে করব; বা আদৌ বিয়ে করব। কিন্তু করতে চাইলে আমাকে রুখবে কে? বিপ্লবী নায়িকারা কি বিয়ে করেন না? রোজা লুকসেমবুর্গ কি বিয়ে করেননি? তাঁর স্বামীটি যে বিপ্লবী ছিলেন তা নয়। বিশ্বস্ত হলেই যথেষ্ট। সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী পুরুষও কি বিশ্বস্ত হতে পারে না? আমার কাছে একজন বিশ্বস্ত পুরুষের মূল্য অসীম। জুলির প্রতি দশ বারো বছর বিশ্বস্ত রয়েছেন দেখেই আমি চিনতে পেরেছি যে এটি একটি দুর্লভ রত্ন।" মিলি প্রকারান্তরে স্বীকার করে যে এমন রত্ন পেলে সে আঁচলে বেঁধে রাখবে।

যূথিকা বলে, "সৌম্যদা, আপনার কী মনে হয়? আমার তো মনে হচ্ছে জুলি মনঃস্থির করতে পারছে না সুকুমারদাকে ছাড়বে, না ধরে রাখবে।"

"মনঃস্থির করা শক্ত। সুকুমারকে প্রত্যাখ্যান করলে সুকুমার মধুমালতীকে বিয়ে করবে। তখন লোকে বলবে সুকুমারই মঞ্জুলিকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কী অপমান! অথচ সুকুমারের কী দোষ।" সৌম্য অভিমত দেয়।

"না, সৌম্যদা, তা নয়। সুকুমারদাকে আমি কি কোনোদিন আশা দিয়েছি যে আজ নতুন করে প্রত্যাখ্যান করলুম? উনি অন্য কাউকে বিয়ে করুন, আমি দারুণ খুশি হব। কিন্তু মিলি! ও যে আমার প্রিয় বান্ধবী। ও যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত তা হলে আমি পরম আনন্দিত হতুম। কিন্তু সুকুমারদাকে! না, না, এটা ভাবা যায় না। এ বিয়ে যদি হয় তবে আমি জানব যে মিলি বা সুকুমারদা কেউ আমার বন্ধু নয়। ওরা আমার সঙ্গে বন্ধুতার সুযোগ নিয়েছে।" জুলি বিষণ্ণ সুরে বলে।

"অপূর্ব মনস্তত্ত্ব।" মানস মন্তব্য করে। "এ না হলে নারী! তুমি নিজে বিয়ে করবে না। দশবছর কেন, এগারো বছর ধরে চলেছে সাধ্যসাধনা। তবু মন গলছে না। যেই তৃতীয় এক ব্যক্তি মাঝখানে এল অমনি দেখা দিল চিরন্তন ত্রিভুজ। মিলি আর সুকুমার, তোমরা তাড়াতাড়ি মনঃস্থির করে ফ্যালো। মিলির যা রেকর্ড, জুলির আগেই মিলি বন্দী হবে। জুলি হয়তো ফেরার হয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাবে। কিন্তু মিলির কি সে সামর্থ্য আছে! শরীর শক্ত নয়। দত্তবিশ্বাস, তুমি কালকেই ওর মা-বাবার সামনে বিয়ের প্রস্তাব পেশ কোরো। ওঁরা যদি রাজী হন তা হলে শুভকর্মটা সমুদ্রযাত্রার পূর্বেই সমাধা হবে। তার পর লম্বা হানিমুন।"

"আহা, অত তড়িঘড়ি কেন? আমাকেও একটু মনঃস্থির করতে সময় দিন। জুলিকে বঞ্চিত করে তার বরকে কেড়ে নিয়েছি বলে যে অপবাদ রটবে তার প্রতিকার না করেই যদি বিলেত চলে যাই তবে ওটা পলায়নের মতোই দেখাবে। জুলি, ভাই, তুমি আশ্বস্ত হও। বিয়ে আমি রাতারাতি করব না। পাত্রটিকে চিনলুম কবে যে চোখ বুজে বিয়ে করব? চিনতেও সময় লাগবে। না সমুদ্রযাত্রার পূর্বে শুভকর্ম নয়। সমুদ্রযাত্রা আমি আত্মরক্ষার জন্যেই করব। মিস্টার দত্তবিশ্বাসকে সাথী পাওয়া যাবে বলে নয়। বিয়ের কথাবার্তা চলবে, কিন্তু বিয়েটা কোথায় ও কবে হবে, আদৌ হবে কি না, সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। জুলিকেও পুনর্ভাবনার জন্যে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হবে। সে যদি চিঠি লিখে জানায় যে সে তার সুকুমারদাকে বিয়ে করতে রাজী তা হলে আমি তক্ষুণি সরে দাঁড়াব। বন্ধুর বরকে চুরি করার অপবাদ আমি সহ্য করব না। আমি তো আশা করছি জুলি নিজেই একদিন আমাদের বিয়েতে মত দেবে। যখন বুঝবে যে আমরা ওর সুখের অন্তরায় নই।" মধুমালতী ধীর গম্ভীরভাবে বলে।

মানস হেসে বলে, "তবে সমুদ্রবক্ষে লম্বা হানিমুন নয়, দীর্ঘ কোর্টশিপ। দত্তবিশ্বাস, আই এনভি ইউ।"

একথা শুনে যূথিকা পাল্টা দেয়, "মিস মুস্তাফী, আই এনভি ইউ।"

জুলির অবস্থা তখন ফুটো বেলুনের মতো। সৌম্যদার দিকে হেলে ওর কানে কানে বলে, "বিধবার বিয়ে কি পাপ?"

"কে বলে পাপ? মহাত্মাজী তো আজকাল বালবিধবা দেখলেই তার বিয়ের সম্বন্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তো ছেলের বিয়ে দিয়েছেন বালবিধবার সঙ্গে। ব্রাহ্মসমাজে তো এটা বহুদিন থেকেই চলতি। তুমি ব্রাহ্মসমাজেই জন্মেছ। হিন্দুমতে যদিও তোমার বিয়ে। বিদ্যাসাগর মশায় তো বিধান দিয়ে গেছেন যে হিন্দুর মেয়েরও আবার বিয়ে হতে পারে। তিনি নিজের ছেলের বিয়ে দেন এক বিধবা কন্যার সঙ্গে। না, জুলি, পাপ নয়। তোমার ওই মিথ্যে পাপবোধ কাটিয়ে ওঠ। মিলি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তবে কোর্টশিপ যদি বেশীদিন গড়ায় সুকুমার আর পিছু হটবে না। হটলে সেটা অনারেবল হবে না।" সৌম্য পরামর্শ দেয়।

"অনারেবল যদি বল, আমার পক্ষেও কি অনারেবল হবে আমি যদি দশবছর বিধবার মতো থেকে হঠাৎ সধবা সাজি? এয়োরা কেউ নেবে আমাকে তাদের দলে? লোকে মুখ ফুটে না বলুক মনে মনে বলবে না অসতী? বিপ্লবী দাদারাও আমার সতীত্বে সন্দেহ করবেন। রানী কমলিনীর মতো আমাকেও আত্মগোপন করতে হবে বিলেতে।" জুলি বলে।

"বিলেতে আমরা তো তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতুম।" সৌম্য বলে।

"বিলেতের আবহাওয়ার গুণে। এদেশে থাকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে কি না অপ্রমাণিত। এদেশে সধবারা বিধবা হয়, কিন্তু বিধবারা সধবা হয় না। হলে আড়ালে আবডালে থাকে। প্রকাশ্য সভাসমিতিতে নামে না। আমাকে তা হলে দেশের কাজ ছাড়তে হয়। বিপ্লবের দিন আমারও কি কোনো ভূমিকা থাকবে না?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"থাকবে না কেন? নিশ্চয় থাকবে।" সৌম্য আশ্বাস দেয়। "লোকে শ্রদ্ধাও করবে। বীরত্বের পরিচয় যদি পায়। সধবা কি বিধবা এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন যাঁরা তাঁরা সমাজপতি শ্রেণীর লোক। তাঁদের বিরুদ্ধেই তো বিপ্লব।"

"কী আশ্চর্য! তুমিও বিপ্লবে বিশ্বাস করো!" জুলি উৎফুল্ল হয়।

"কেন করব না? আমরাও তো বিপ্লবের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি। আমাদেরও ভরসা জনগণ। কিন্তু তারা প্রাণ বিসর্জন করবে, প্রাণ নাশ করবে না। তোমরা মেরে মরবে, আমরা মারব না, মরব। আমাদের সাধনা আরো কঠোর। যদি সিদ্ধিলাভ করি আমাদের সিদ্ধিও হবে আরো গৌরবময়। তোমাদের

বীরত্বের আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু আমাদের বীরত্ব আরো উচ্চ স্তরের।" সৌম্য বিনম্রভাবে বলে।

"তোমাদের পথ সময়সাপেক্ষ। আমাদের হাতে অত সময় নেই, সৌম্যদা। সুযোগ হাতছাড়া হলে আর ফিরবে না। অবশ্যই কিছু রক্তপাত হবে। সেটা দু'তরফা। তার জন্যে আমরা দুঃখিত। ইংরেজদের মহত্ত্বের পরিচয়ও তো আমি পেয়েছি। তা বলে কি ওদের দাসত্ব আর সহ্য হয়?" জুলি আবার তেজস্বিনী।

ডিনারের পর যূথিকা বলে, "দশবছর পরে চারজন একত্র হয়েছ তোমরা। আবার কবে হবে কে জানে। এস, চারজনে মিলে তাস খেলো।"

সৌম্য বলে,"আমি তাস খেলিনে। আমাকে বাদ দাও।"

জুলি বলে,"আমি তাস খেলি, কিন্তু আজ আমার সে মুড নেই। কেন, বুঝতেই পারছ।"

তখন দত্তবিশ্বাসের পার্টনার হয় যূথিকা, আর মানসের পার্টনার মধুমালতী। ব্রিজ খেলায় দত্তবিশ্বাসের ওস্তাদি আছে। চড়া স্টেকে খেলে। হারে যত তার চেয়ে জেতে ঢের বেশী। ওর আয়ের একটা প্রধান উৎস হলো ব্রিজ। আজ কিন্তু স্টেক রাখতে মানা।

"মানা। মানা। সব কিছুতেই মানা। স্টেক রাখতে মানা, বিষ খেতে মানা। তবে আমি খেল্ দেখাব কী করে?" দত্তবিশ্বাস অনুযোগ করে।

"আমরা খেল্ দেখতে চাইনে। খেলা করতে চাই।" মধুমালতী উত্তর দেয়।

"নইলে আজ দুই পরিবারের সঞ্চয় লুট হয়ে যায়।" যূথিকা হুঁশিয়ারি দেয়।

"এক পরিবারের লুটের মাল অর্ধেকটা ফিরে আসবে। কিন্তু অপর পরিবারের অর্ধেকটা ফিরে আসবে কি না কে বলতে পারে। সব নির্ভব করছে সেই পরিবারের গুরুজনের সম্মতির উপর।" মানস এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত।

মধুমালতী আরক্ত হয়। "ওটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার।"

জুলির ভালো লাগছিল না। সে বলে,"চলো, সৌম্যদা, বাইরে গিয়ে বসা যাক। তোমার সঙ্গে একরাশ কথা আছে। কবে আবার দেখা হবে কে জানে।"

বিশাল বারান্দার একপ্রান্তে ওরা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। আকাশের দিকে মুখ। আকাশে তখন চাঁদ নেই, নক্ষত্রের মেলা। তারাগুলো এত স্পষ্ট আর এত কাছে যে হাত বাড়ালে গাছ থেকে পেড়ে আনা যায়।

"রোজ রাত্রে আমি আকাশের তলায় শুই। নক্ষত্রলোকের সঙ্গ পাই। ভুলে যাই পৃথিবীর দুশ্চিন্তা। যুদ্ধ বলো, বিপ্লব বলো, সবই তো সাময়িক।" সৌম্য বলে।

"ইতিহাসের সমস্তটাই তো সাময়িক, সৌম্যদা। মহাকালের তুলনায় তিন হাজার বছরের ভারত ইতিহাস তো কালকের দিনের খবরের কাগজ। তা বলে কি তার গুরুত্ব কিছু কম? আমরাও ইতিহাস তৈরি করে যাচ্ছি। কালকের দিনের জন্যে। নইলে আমার জীবনের মূল্য কী?" জুলি জানতে চায়।

"আমারও সেই এক জীবনজিজ্ঞাসা। কিন্তু তোমার মতো আমি ইতিহাসের জীব নই। আমি টাইম-স্পেসের ভিতরেও আছি, তার বাইরেও আছি, আমি অমৃতের সন্তান। একদিন তোমারও এই উপলব্ধি হবে।" সৌম্য আশ্বাস দেয়।

"তোমার সঙ্গে দেখা হলে জীবনজিজ্ঞাসার কথা ওঠে। কথা ওঠে নীতিজিজ্ঞাসার। আমিও কত বড়ো হয়ে যাই। কিন্তু তোমাকে তো সব দিন পাইনে। পাবও না। যাদের সঙ্গে মেলামেশা তারা কেউ সময়ের উর্ধ্বে উঠতে চায় না। পারেও না। আমিও তাদেরই একজন। তোমার কাছে প্রথম ও শেষ বস্তু অমৃত ও অমৃতের সন্ধান। যাতে তোমাকে অমৃত না করবে তা নিয়ে তুমি কী করবে? আমার কাছে ওসব নিছক তত্ত্বকথা। মানুষের দুঃখদুর্দশাই আমাকে বিচলিত করে। আমি চাই এমন কিছু ঘটুক যাতে মানুষের সব দুঃখদুর্দশা এক রাত্রের প্লাবনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।" জুলি কাতরভাবে বলে।

"দুলালেরও সেই ধ্যান ছিল। দুলাল দেখছি তোমার মধ্যে বেঁচে আছে। ওর কথা কি তোমার মনে পড়ে?" সৌম্য অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করে।

"পড়বে না? ওঁর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়েছিল। যদিও সেটা ওঁর মতে একরকম শিকল পরানো। সোনার শিকল। উনি যেন ইচ্ছে করেই শিকল কাটিয়ে গেলেন। সব মনে আছে, সৌম্যদা! কিন্তু সব ভুলে যেতে চাই। তাই তো কাজের মধ্যে ডুবে থাকি। জানি সাময়িক। তবু মূল্যবান।" জুলি তার মনের ঢাকা খোলে।

"দুলাল বিয়ে না করেই বিলেত যেতে চেয়েছিল, ওর বাবা তাতে নারাজ। তিনি আর সব বিষয়ে একেলে হলেও ওই একটি বিষয়ে সেকেলে। তাঁর ধারণা বিয়ে না করে বিলেতে গেলে ছেলে মেম বিয়ে করে ঘরে ফিরবে। দুলাল বিলেতে যাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল, চাপে পড়ে বিয়ে করল। কিন্তু ওর বিবেক ওকে একমুহূর্তও সোয়াস্তি দিল না। তোমার উপরে ওর বিরাগ ছিল না, ছিল বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাব। বিবাহটা ও মেনে নিতে নারাজ। বাপ-বেটার গৃহযুদ্ধে তুমি হলে উলুখড়।" সৌম্য দরদের সঙ্গে বলে।

"আমি কেমন করে জানব বিয়েতে ওঁর অনিচ্ছা ছিল? জানলে কি আমি বিয়ে করতে রাজী হতুম? যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে। ওঁর বাবারও তো অনুশোচনার অন্ত নেই। আমাকে মোটা মাসোহারা পাঠান। ফিরিয়ে দিতে চাই, কোন্ সুবাদে নেব? কিন্তু না নিলে তাঁর জীবন দুর্বহ হবে। কাজ কী ওঁকে আরো কষ্ট দিয়ে? নিই, কিন্তু নিজের জন্যে নয়। কমরেডদের প্রয়োজন মেটাই।" জুলি সাফাই দেয়। তার বিবেকের সাফাই।

"দুলাল চেয়েছিল স্বামীস্ত্রীর মিথ্যা অভিনয় থেকে মুক্তি পেতে ও মুক্তি দিতে। তোমাকে ও মুক্ত করে দিয়ে গেছে, জুলি। তুমি সমাজের চোখে বিবাহিতা, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে অবিবাহিতা। কেন তবে সম্পর্কটার জের টেনে যাচ্ছ? মাসোহারা নেওয়াটাও জের টেনে চলা। তোমার শ্বশুর অবশ্য তাঁর পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কের জের টেনে চলেছেন। সেটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার পক্ষে মিথ্যার অভিনয়। ওঁর মনে যাতে আঘাত না লাগে সেকথা ভেবে তুমি ওঁর টাকা নিচ্ছ, কিন্তু নিজেও বাঁধা থাকছ। দ্বিতীয়বার বিবাহে আমি তো কোনো নীতিগত বাধাই দেখছিনে। তুমি যদি সুকুমারের প্রস্তাবে রাজী থাক তবে এখনো সময় আছে। কাল কিন্তু থাকবে না। কালকেই মিলির জন্যে বাস রিজার্ভ করা হবে। অবশ্য ওর মা বাবা যদি সম্মতি দেন।" সৌম্য অনুভব করে জুলির জন্যে কত বড়ো শক অপেক্ষা করছে।

"সৌম্যদা, তোমার কাছে আমার গোপন কিছু নেই। তোমাকেই আমি সব চেয়ে বিশ্বাস করি।" বলতে বলতে জুলির গলা ধরে আসে। "সুকুমারদা আমাকে আজ যে শক দিয়েছেন তা আমাকে থ করে দিয়েছে। আমি যদি ওঁকে বিয়ে না করি উনি মিলিকে বিয়ে করবেন। মিলি যদিও ঝট করে কথা দিচ্ছে না তবু আমি বেশ বুঝতে পারছি ও ভিতরে ভিতরে উল্লসিত। তুমি দেখবে কালকেই ও বাগ্দান করবে। বিয়েটা হয়তো এদেশে হবে না, কিন্তু ওদেশে হতে কতক্ষণ? তার মানে সুকুমারদাকে আমি চিরকালের মতো হারাচ্ছি। ওঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নয়, কিন্তু বিয়ে তো করেননি আর কোনো মেয়েকে। অপেক্ষা তো করে এসেছেন আমার সম্মতির জন্যে। এগারো বছর তো একটা যুগ বললেও চলে। প্রস্তাবও তো করলেন এই নিয়ে তিনবার। একবার বিলেতে, একবার বন্দীশালা থেকে মুক্তির পর, একবার এই সম্প্রতি পদ্মার স্টীমারে। জানি উনি আমার অশেষ উপকার করেছেন ও করবেন। প্রতিদানে আমারও তো কিছু করণীয় আছে। কিন্তু সে কি বিয়ে? না, দাদা, আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। বিয়ে আমি কাউকেই করব না। আমি ঘরপোড়া গোরু। সিঁদুর হচ্ছে সিঁদুরে মেঘ। সিঁদুর পরতে আমি ডরাই।"

"তা হলে তুমি মিলির জন্যে সুকুমারকে ছেড়ে দাও। মিলির হাতে সুকুমারকে তুলে দাও। সুকুমারের

প্রতি সেটাই তোমার করণীয়। সেটাই সব চেয়ে বড় উপকার। জানি তোমার মন এর জন্যে তৈরি ছিল না। হঠাৎ মিলির সঙ্গে সুকুমারের সংযোগ তোমাকে চমকে দিয়েছে। তুমিই তো একজনকে নিয়ে এলে আরেকজনের বাড়ি। তুমিই তো ওদের আলাপ করিয়ে দিলে। তোমারই তো এ ঘটকালি। তোমারই তো খুশি হওয়া উচিত যে মিলির মতো বান্ধবীর একটি বর জুটল। আর সুকুমারের মতো বন্ধুর একটি বৌ জুটল। তারপর ওদের ভাগ্য ওদের হাতে। মিলি ওদেশে না যেতেও পারে, সুকুমার এদেশে থেকে যেতেও পারে, মুস্তাফীদের একজন ঘরজামাই হলে ভালো হয়, যার হাতে ওঁরা রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব সঁপে দেবেন। হ্যাঁ, বলেছেন আমাকে একথা। অনেকদিন আগে। তখন আমিই বোধ হয় ছিলুম তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু এ-মহাদেবের তপোভঙ্গ ও-পার্বতীর অসাধ্য। মিলি যদিও হিংসার পথ থেকে বেশ কিছুদূর সরে এসেছে।'' সৌম্য মুখ টিপে হাসে।

''তবে তুমিই ওকে বিয়ে করে পুরোপুরি অহিংসাবাদী করো না কেন? গান্ধীজীর যেমন কস্তুরবা তোমার তেমনি মধুমালতী দেবী।'' জুলি সীরিয়াসভাবে বলে। ''তা হলে তো আমার কোনো খেদই থাকে না।''

''কেন, খেদ তোমার কিসের? চির অনুগত জনকে হারাচ্ছ বলে? এগারো বছরের সম্পর্ক কাটিয়ে উঠতে পারছ না বলে?'' সৌম্য সহানুভূতির সঙ্গে বলে।

''না, মিলির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। তুমি আর মিলি রাজযোটক। মিলি আর সুকুমারদা সম্পূর্ণ বিপরীত ধাতু দিয়ে গড়া।'' জুলি সুনিশ্চিত।

''মুস্তাফীরা ভালো করেই জানেন যে জেলে যাবার জন্যে আমি সদলবলে প্রস্তুত হচ্ছি। মিলি যদি আমার কস্তুরবা হয় তাকেও জেলে যেতে হবে। ওর মা-বাবা সেটাকে ভয় করেন। আর তাঁদের ওই অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে করবই বা কী? আমার পৈত্রিক সম্পত্তির মতো আরো একটা ট্রাস্ট? গান্ধীজীর ট্রাস্টীশিপ থিওরির অনুসরণ?'' সৌম্য ব্যাখ্যা করে।

''সেও মিলির পক্ষে ভালো। কিন্তু বিলেত ফেরৎ জামাই নিয়ে ওঁরা করবেন কী? যদি এদেশে ওর মন না বসে। ও একদিন উড়ে যাবেই। মিলি যদি ওর সঙ্গে উড়ে যেতে না চায় বা না পারে তা হলে বিচ্ছেদ অবধারিত। আর সে মিলনই বা কোন্ সুখের হবে? সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে বিপ্লববাদীর গরমিল অনিবার্য।'' জুলি লিখে দিতে পারে।

''আচ্ছা, জুলি, তোমরা কেউ যদি ওকে বিয়ে না করো তবে ও বেচারি যাবে কোথায়? ওদেশেই বিয়ে থা করে দেশকে ভুলে যাবে। চিরকাল তো অপেক্ষা করতে পারবে না। ওর তো তেমন কোনো ব্রত নেই, যেমন আছে আমার। ফিরে গিয়ে এবার ও বিয়ে করবেই। মিলিকে না হোক আর কাউকে।'' সৌম্য অনুমান করে।

জুলি একটু গুছিয়ে নিয়ে বলে, ''মা আমাকে জানতেই দেননি যে তিনি খবর পেয়েছেন যুদ্ধ বাধার মাসখানেকের মধ্যেই শতখানেক পুরানো রাজবন্দীকে আবার ধরে নিয়ে জেলে পোরা হবে ও তাদের তালিকায় আমারও নাম থাকবে। তিনি হন্তদন্ত হয়ে বিদেশে সুকুমারদাকে চিঠি লেখেন। সে যেন ওদেশের কলেজে আমার ভর্তির ব্যবস্থা করে ও অবিলম্বে দেশে ফিরে এসে ভর্তির প্রমাণ দেখিয়ে আমাকে ওদেশে নিয়ে যায়। চিঠিতে অবশ্য এমন কোনো কথা ছিল না যে যাবার আগে বা পরে আমার সঙ্গে বিয়ে হবে। তার জন্যে চাই আমার মতামত। আমি তো আরেক পরিবারের বৌ। মা আমাকে না বলে ও কথা লিখতে পারতেন না। তাঁর লক্ষ্য আমার নিরাপত্তা। সেটুকু সম্ভব হলে বাকীটা সুকুমারদার উদ্যোগিতা আর আমার ইচ্ছা।''

সৌম্য হেসে বলে, ''উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মী। গৃহলক্ষ্মী।''

''সংস্কৃত বুঝিনে। মানে কী ওর?'' জুলি সুধায়।

"উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মী লাভ হয়। এক্ষেত্রে গৃহলক্ষ্মী।" সুধী উত্তর দেয়।

"সুকুমারদার বোধ হয় সেই ধারণাই ছিল। সে সত্যি সত্যি ভর্তির কাগজপত্র নিয়ে এসে হাজির। টাকাও আগাম দিয়ে এসেছে। জাহাজও বুক করা হয়েছে। মা তো মহা খুশি। জানো তো মেজদির বর স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল। তিনি সরকারের পেয়ারের লোক। সুকুমারদাকে নিয়ে যান পুলিশ কর্তার দফতরে। তালিকা থেকে ওরা আমার নাম কাটতে রাজী হয়। সেটা কিন্তু দেশ ছেড়ে রওনা হবার পরে। কিন্তু আমি তো তেমন কোনো অঙ্গীকার করিনি যে বিপ্লব হলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব না। ঝাঁপ দেবার জন্যেই আমি তৈরি। ওরা যদি পারে তো আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। জনতা যদি পারে তো আমাকে জেল ভেঙে খালাস করে নিয়ে আসবে। বিলেত গিয়ে নিরাপদ হওয়ার আমি কোনো তাৎপর্য বুঝিনে। আর তার মাশুল যদি হয় বিয়ে সেটা তো আরো অর্থহীন।" জুলি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

"কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে তোমাদের বিপ্লবে তোমরা ছাড়া আর কেউ সাড়া দিল না। জনতা অসাড়। মাঝখান থেকে তোমাদেরই কারাদণ্ড। প্রাণদণ্ডও হতে পারে। যুদ্ধকালে বিপ্লব তো চরম রাজদ্রোহ। তোমাদের বাঁচাতে পারে একমাত্র কংগ্রেস। যদি কেন্দ্রে ক্ষমতা পায়। কিন্তু কংগ্রেসকেও তো তোমরা অমান্য করছ। গান্ধীজীর বিরুদ্ধেও তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ। যাতে তাঁর প্রভাব কমে আর তোমাদের নেতাদের বাড়ে। কিন্তু আপৎকালে সেই গান্ধীই তোমাদের ভরসা। না, জুলি, ওসব অবাস্তব পরিকল্পনা ত্যাগ করো। তা যদি করো তবে তোমাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে না, সুকুমারকে বিয়ে করতেও হবে না। ও তোমার প্যাসেজটা মিলিকে দেবে, তোমার নামের অ্যাডমিশনটা মিলির নামে করিয়ে নেবে। মিলি ওকে বিয়ে করবে কি করবে না সেটা পরে স্থির করবে। সেটা তোমার ভাবনা নয়। তোমার ভাবনা তুমি কী করে বাঁচবে, যদি বিপ্লব ব্যর্থ হয় বা কংগ্রেস অসমর্থ হয়। কংগ্রেস মন্ত্রীরা হয়তো অবিলম্বে গদী ছাড়বেন।" সৌম্য যতদূর জানে।

"আমরা কংগ্রেসের কল্যাণে মুক্ত হতে চাইনে। জনতার অভ্যুত্থানে মুক্তি পেতে চাই। তেমন সৌভাগ্য যদি আমাদের না হয় আমরা জেলের ভিতর থেকে লড়ব। প্রাণের ভয় এখনো আমার আছে, কিন্তু সেটাও ক্রমে ক্রমে যাবে।" জুলি বলে যায়, "তবে সব চাল বেচাল হয়ে যেতে পারে। নাৎসীদের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি। তারপরে জার্মানে ইংরেজে একজোট হয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধ। তখন আর ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ নয়। রাশিয়ার দুর্যোগই ভারতের দুর্যোগ। তেমন দিন যদি আসে আমি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ব। মীরার মতো বৃন্দাবনেই আশ্রয় নেব আমি। কোনো এক কুঞ্জে গাইব। বৃন্দাবনকে কুঞ্জ গলিনমে তেরী লীলা গাঁসু। বিপ্লব এগিয়ে আসবে না, পেছিয়ে যাবে কতকাল!" জুলি হতাশভাবে বলে।

সৌম্য অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "জুলি, তুমি তো একবার বৈষ্ণবী হয়ে বৃন্দাবনে আশ্রয় নিয়েছিলে। সে অভিজ্ঞতা প্রীতিকর হয়নি। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও যদি আশ্রয় নিতে চাও তো আমাকে একটা খবর দিয়ো। যদি জেলের বাইরে থাকি আমিই তোমার ভার নেব।"

"তা হলে তো আমি বর্তে যাই, সৌম্যদা। তোমার মতো নির্ভরযোগ্য আর কে আছে আমার।" জুলির কণ্ঠস্বরে ভাবাবেগের আভাস।

"কই, তুমি তো আমার খোঁজখবর রাখো না।" সৌম্য ক্ষোভ জানায়।

"আর তুমি! তুমি যেন আমার কত খোঁজখবর রাখো!" জুলি পালটা দেয়।

"কলকাতা হয়ে যাওয়া আসা করতে হয়। কিন্তু সেখানে থামিনে। সেইজন্যে কারো খোঁজ নেওয়া হয় না, শুধু কি তোমার!" সৌম্য কৈফিয়ৎ দেয়।

"ওঃ তোমার বান্ধবীদের কথা বলছ। হায়, তাঁদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ওই যে তোমার অলকনন্দা, যে তোমাকে বিয়ে করবে বলে ব্যাকুল হয়েছিল, ওর এখন তিনটি ছেলেমেয়ে। খাচ্ছে,

দাচ্ছে, পরচর্চা করছে। তোমার বিরহে দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে। হবে না কেন? স্বামীর মোটা আয়। সলিড বুর্জোয়া। তবে এখনো গান নিয়ে পাগল। গানের আসরে ওকে প্রায়ই দেখতে পাই।" জুলি বলে।

সৌম্যের মনে পড়ে যায়। সে সব দিনের জন্যে মন কেমন করে। অলকনন্দা ওকে সত্যি ভালোবাসত। কিন্তু ওর দাবী ছিল সৌম্যকে ব্যারিস্টার হতে হবে। কলকাতায় বসতে হবে। শ্বশুরের প্র্যাকটিস তিনি তাকে দিয়ে যাবেন। এদিকে সৌম্য মুক্ত থাকতে চায় দেশকে মুক্ত করতে। প্রয়োজন হলে আজীবন। কে জানে হয়তো আমরণ। সত্যাগ্রহীকে মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হয়।

"অলকনন্দার সঙ্গে দেখা হলে বোলো আমি ওর ছেলেমেয়েদের দেখতে যাব একদিন। কিন্তু কবে তা আমার হাতে নয়। হঠাৎ সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে যেতে পারে। আমার এখানকার কাজের ভার কার উপর দিয়ে যাই সে এক সমস্যা। মিলির যদি খাদি ও কুটিরশিল্পে মতি থাকত ওকেই বলতুম দেখতে। ওকে আশ্রমবাস করতে হতো না। আমরা মেয়েদের দিনের বেলা কাজ করতে দিই, কিন্তু রাতের বেলা থাকতে দিইনে। যদি না স্বামী স্ত্রী দু'জনেই আমাদের কর্মী হয়।" সৌম্য বুঝিয়ে বলে।

"তা মিলি তো তোমার দিকে এক পা বাড়িয়েই রেখেছে। একটু একটু করে এগোচ্ছে। সুকুমারদা হঠাৎ কোন্ দিক থেকে এসে দিগ্‌ভ্রম ঘটিয়ে না দিলে ও হয়তো মূর্তিমতী কস্তুরবা হতে পারতো। মহাত্মাটি কে তা আমি উচ্চারণ করব না। হ্যাঁ, সৌম্যদা, এটাও একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তুমি তো দেশের স্বাধীনতা না দেখে নারীর পাণিগ্রহণ করবে না। ততদিন অপেক্ষা করবে কোন্ নারীর রূপযৌবন। এমনিতেই ও মেয়ের চেহারা যা হয়েছে তা সুকুমারদার মতো রাতকানার চোখেই চলনসই। তোমার জন্যে অপেক্ষা করলে ও চেহারা হতো নন্দলাল বসুর 'শবরীর প্রতীক্ষা'র বৃদ্ধা শবরীর মতো।" জুলি উপহাস করে।

"মিলিকে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে না, জুলি। তুমি যা ভেবেছ তা নয়। মিলির দিক থেকে যা আছে তা শ্রদ্ধা, তা প্রেম নয়। আর আমার দিক থেকে যা আছে তা বিশুদ্ধ কল্যাণকামনা। কিসে ওর কল্যাণ হয় সেই ভাবনা। বিপ্লব ওর মতো মেয়ের জন্যে নয়। ওর মতো মেয়েও বিপ্লবের জন্যে নয়। সন্ত্রাসকেই ও বিপ্লব বলে ভুল করেছিল। সে ভুল ভেঙেছে। এখন যাকে বিপ্লব বলে বোঝানো হচ্ছে সেও একপ্রকার অ্যাডভেঞ্চার। তাতেও যে ওর অন্তরের সায় আছে তা নয়। মুসলিম জনতার মারমূর্তিকে ওর প্রাণে ভয়। আছে তো এখানে দুটিমাত্র সাহেব। দুটিকে মেরেই কি ওদের উন্মাদনা থামবে? বর্ধিষ্ণু হিন্দুদেরও ওরা মেরে খতম করবে। মিলি তাই ও পথ থেকে সরে আসছে, কিন্তু গান্ধীজীর উপরেও ওর পুরোপুরি বিশ্বাস জাগেনি।" সৌম্য বলে।

"কী এতক্ষণ ধরে গুজগুজ ফিসফিস করছ তোমরা?" যূথিকা বারান্দায় বেরিয়ে এসে সুধায়। "আমাকে ডামি করে সুকুমারদা যা খেলছে দেখবার মতো। কাউকে একটা হাতও নিতে দিচ্ছে না। তাসগুলো যেন ওর বোল মানে। যাকে যা করতে বলে তাই করে।"

তৃতীয়জনের আবির্ভাবে কথাবার্তায় ছেদ পড়ে যায়। সৌম্য জিজ্ঞাসা করে বাচ্চাদের কথা। যূথিকা আশ্বাস দেয় যে ওরা অকাতরে ঘুমচ্ছে। তা হলেও বার বার গিয়ে দেখে আসতে হচ্ছে মণিকে। মাকে ছাড়া ও শুতে পারে না।

জুলি লক্ষ করছিল যে দাদা ও বৌদির দুই ঘরে দুই বিছানা। মণি শোয় মায়ের সঙ্গে আর দীপক আলাদা খাটে। এ রকম ব্যবস্থা ও আর কোথাও দেখেনি। ওটাও কি একপ্রকার অসিধার ব্রত? সৌম্যদা না থাকলে প্রশ্ন করত বৌদিকে।

"আমি জানতে এলুম তোমাদের কালকের প্ল্যান কী। ডিনারে আসবে তো? আমাদের এখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।" যূথিকা বলে।

"আমাকে কাল আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। রাত্রে ফিরব না। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ো,

বোন।" সৌম্য ক্ষমা চায়।

"তুমি নিশ্চয়ই থাকছ, জুলি।" যূথিকা ধরে নেয়।

"আমি ভাবছি সুকুমারদাকে এস্‌কর্ট না করে আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে কালকেই ফিরে যাব। ওর যতদিন ইচ্ছে ততদিন এখানে থাকতে পারে। যে খেলাটা ও খেলছে তা দেখবার মতো। সেটা কিন্তু তাস নয়, বৌদি। সেটা মন দেওয়া নেওয়া। কবি রবীন্দ্রনাথ কাকে লক্ষ করে ওসব লিখেছিলেন জানিনে, কিন্তু ওর বেলা অক্ষরে অক্ষরে খাটে। 'মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে। নূপুরের মতো ফিরেছি চরণে চরণে।' এখন ও যতদিন ইচ্ছে ফিরবে চরণে চরণে। তুমি আমাকেও বাদ দিয়ো, বৌদি। কালকের ডিনারটা জমবে আরো ভালো।" জুলি ক্ষমা চায়।

"আমি সত্যিই দুঃখিত, সৌম্যদা ও জুলি। ব্যাপার কী আমি ঠিক ঠাওরাতে পারছিনে। কেন তোমরা দু'জনেই এখান থেকে যাবে? জুলির বৈঠক তো আরো কয়েক দিন চলবে। আর তোমার গ্রাম পরিক্রমা কি এতই জরুরি যে তুমি মানসের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা না করেই বিদায় নেবে, সৌম্যদা? তা হলে, চল ওঘরে, তাস খেলা বন্ধ করে দিই।" যূথিকা বলে।

তাস খেলা বন্ধ হয়। সৌম্য আর মানস বসবার ঘরে গম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করে। জুলি আর যূথিকা শোবার ঘরে চটুল বিষয়ে। আর সুকুমারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মধুমালতীর সঙ্গে বারান্দায়। সেখানে বসে ওরা সুখদুঃখের কথা বলে। আর কেউ শুনতে যায় না।

সুকুমার মধুমালতীর মুখোমুখি আসন নিয়ে মন খোলে। "আপনাকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব যেমন আমার, ফিরিয়ে দিয়ে যাবার দায়িত্বও তেমনি আমারই। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই যদি আপনি হোমসিক বোধ করেন তা হলে যুদ্ধকালে কেমন করে সেটা সম্ভব? যুদ্ধ হয়তো আর দু'বছর গড়াবে। আপনি আরো হোমসিক হবেন। কিন্তু টর্পেডোর ভয়ে যাত্রীজাহাজ এ মুখো হবেই না। কী সাংঘাতিক বিপদ!"

"আবার দেখছি সেই বন্দীশিবিরের মতোই হলো। সেবার স্বদেশে। এবার বিদেশে। তফাতের মধ্যে আপনাকে কাছে পাব।" মধুমালতী বলে।

"কিন্তু আমাকে কন্‌স্ক্রিপ্ট করে কোথায় নিয়ে যায় কে জানে। তবে ওরা খুবই বিবেচক। বুঝিয়ে বললে বুঝবে। আমার চেনাজানা প্রভাবশালী ব্যক্তির অভাব নেই। তবু আপনাকে সব রকম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। ওয়ার ইজ ওয়ার। ইংরেজরা নিজেরাই বিপন্ন।" সুকুমার হুঁশিয়ারি দেয়।

"বিয়ে যদি হয় তো স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর বিপদের ভাগী হওয়া, স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে আসা নয়। হোমসিক তো আমি বন্দীশিবিরেও ছিলুম।" মধুমালতী বলে।

।। ছয় ।।

সেদিন বিদায় দেবার সময় মানস বলে সৌম্যকে, "কত কথা বলবার ছিল, শোনবার ছিল, তার সিকির সিকিও হলো না। তুমি আরেকদিন এসো, সৌম্যদা।"

যূথিকা যোগ করে, "আমাদের সঙ্গে ডে স্পেণ্ড করবেন। সকাল থেকে শুরু। ডিনারের পর সারা। তা হলে বাচ্চাদেরও সঙ্গ পাবেন।"

"সেটাই তো সব চেয়ে বড় ভোজ। কিন্তু লোভ সংবরণ করতে হবে। আস্ত একটা দিন খরচ করার স্বাধীনতা কি আমার আছে? রবিবারেও না। ছুটির দিন দেখে একদিন দুপুরটা তোমাদের সঙ্গে কাটাব। কিন্তু," সৌম্য একটু থেমে বলে, "এত ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ হলে তোমার নামে পুলিশ রিপোর্ট

যাবে না তো?"

"গেলে কী হবে? কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এই তো। আমি তার চেয়ে কিছু বেশী দেব। বেণীর সঙ্গে মাথা।" মানস রহস্যময় করে।

"না, না, ওসব করতে যেয়ো না। তোমার যাতে অনিষ্ট হয় তার মধ্যে আমি নেই। সেইজন্যেই এতদিন দেখা করতে আসিনি। আচ্ছা, আবার আসব একদিন। বাচ্চাদের জন্যেই। দীপকের জন্যে সাপ আর শজারু আনতে হবে।" সৌম্য বিদায় নেয়।

এর পরে বিদায় নিতে আসে জুলি। বলে, "আপাতত এই শেষ দেখা। আমি কালকেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি, দাদা, বৌদি।"

"সে কী?" মানস বিস্মিত হয়। "তুমি একলা যাবে কী করে?"

"পথ চিনে গেছি। একলা যেতে খুব পারব। তবে একজন কমরেডকেও সঙ্গে নেব। সুকুমারদার কবে সুবিধে হবে, তার জন্যে বসে থাকব নাকি?" জুলি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলে।

"কেন? কালকেই তুমি যেতে চাও কেন? তোমার বৈঠক তো তিনদিনের আগে শেষ হবে না। ততদিনে আমিও যেতে পারব।" দত্তবিশ্বাস নিবেদন করে।

"তুমি পারবে কিনা সেটা নির্ভর করছে তৃতীয় একজনের উপরে। পাশপোর্ট, রিজারভেশন ইত্যাদির জন্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে না? তবে সমস্তটাই কেঁচে যেতে পারে, যদি গুরুজনের আপত্তি থাকে।" জুলি সাবধান করে দেয়।

"ওটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার।" মিলি একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলে।

জুলির সঙ্গে ওরাও মোটরে ওঠে। কিন্তু জুলি ওদের সঙ্গে পেছনের সীটে বসে না। সামনে শোফারের পাশে আসন নেয়।

যূথিকা হেসে বলে সৌম্যকে, "প্রজাপতির নির্বন্ধ। এগারো বছর তপস্যা করেও সুকুমারদা জুলির মন পেলেন না। দেখে শুনে মনে হচ্ছে একদিনেই মিলির মন পেয়েছেন। তবে গুরুজনের মত না পেলে আবার যে কে সেই। সুকুমার না চিরকুমার!"

"না, চিরকুমার নয়। ও ফিরে গিয়ে বিয়ে করবেই। ওর গার্ল ফ্রেণ্ডদের একজনকে।" মানস আভাস পেয়েছে।

"তা হলে মিলির জন্যে আমি দুঃখিত হব। ওর আর বর জুটবে না। ওর মা বলেছিলেন বলে আমি চেষ্টা করেছি ও কতকটা সফলও হয়েছি।" যূথিকা বলে।

"আমার মনে হয় তুমি পুরোপুরি সফল হবে, জুঁই। ঘটকালিতে তোমার সহজাত কুশলতা। তবে কিনা যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে মেয়েকে বিলেত পাঠাতে রাজী হবে কোন্ মা বাপ! ওরা হয়তো জামাইকে দেশে ধরে রাখতে চাইবেন। চাকরির টোপ দেখাবেন। দেখা যাক দত্তবিশ্বাস কী করে।" সৌম্য অপেক্ষমান।

"সুকুমারদা দেশ থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন। ও বিদেশে ফিরে যাবেই। মিলি যদি যেতে নারাজ হয় তবে সেই কারণে এ সম্বন্ধ ভেস্তে যেতে পারে। পূর্ণ সফলতা লাভ করব যখন মিলি রাজী হবে যুদ্ধের দুর্যোগ সত্ত্বেও বিলেতে যেতে।" যূথিকা আশা করে। তবে ভরসা রাখে না।

শুতে যাবার আগে মানস বলে যূথিকাকে, "দশ বছর আগে আমি লক্ষ করেছি যে জুলির মনের কম্পাসের ধ্রুবতারা সুকুমার নয়, সৌম্য। দশ বছর পরেও পরিবর্তন দেখছিনে। রাজনৈতিক মতান্তর থেকে ওদের মনান্তর ঘটেনি।"

"সে কী!" যূথিকা অবাক হয়। "তুমি বলতে চাও জুলির বিয়ের আশা আছে, সৌম্যদা যদি তপোভঙ্গ করে?"

"না, সৌম্যদা তপোভঙ্গ করবে না। বলতে পারো, সৌম্যদার তপস্যা যদি ভারতের স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়। তার অনেক দেরী। কারো কারো মতে ১৯৫৭ সালের মিউটিনির আগে নয়। তা যদি হয় তবে জুলি বেচারিকে আরো আঠারো বছর প্রতিক্ষা করতে হবে।" মানস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

"ততদিনে ওর মা হবার বয়স গড়িয়ে গিয়ে থাকবে।" যূথিকা আফসোস করে। "যদি দেখতে আমাদের বাচ্চাদুটিকে নিয়ে ও আজ কত আদর সোহাগ করছিল। মণি যেন ওর চক্ষের মণি। যেন ওর খেলার পুতুল। ওর স্বভাবটা মায়ের স্বভাব। মা হয়েই ওর সার্থকতা। ও যদি মা না হয় তবে ওর জীবন বৃথা। ভগবানের কী যে বিচার! যে স্নেহময়ী মা হতে পারত সে হলো অকালে বিধবা।"

"শুধু বিধবা নয়, কুমারী বিধবা।" মানস সংশোধন করে।

"ভগবান কি মুখ তুলে তাকাবেন না? কবে ১৯৫৭ সাল আসবে, তার আগে কি মিউটিনি কি বিপ্লব কি যুদ্ধে পরাজয় ঘটবে না? ফলে ভারত স্বাধীন হবে না? জুলি তো পারলে এই বছরই বিপ্লব ঘটায়। তা হলে পরের বছর ওর পরিণয়। বলো, ওর মনের কথাটা ঠিক ধরতে পেরেছি কি না।" যূথিকা জানতে চায়।

"যথার্থ।" মানস বলে, "আমার এখন মনে হচ্ছে জুলি সৌম্যদাকে বোঝাবার জন্যেই এখানে এসেছিল। গান্ধীজীকে সৌম্যদা যেন গণসত্যাগ্রহের জন্যে তাড়া দেয়। জুলির চেয়ে মিলি ঢের বেশী বাস্তববাদী। তাই ঢের কম বিপ্লববাদী।"

"ওদের দু'জনার মধ্যে কে বড়ো কে ছোট বলতে পারো?" জানতে চায় যূথী।

"মিলিই বড়ো। যদিও দেখতে ছোট। বুদ্ধিবিদ্যাও জুলির চেয়ে ওর বেশী। জুলি ওর তুলনায় ছেলেমানুষ। ও আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারবে। মিলি কিন্তু বুড়িয়ে যেত। হঠাৎ ওর কপাল খুলে গেল।" মানস আনন্দিত।

"খুলত না, যদি না সৌম্যদার আকর্ষণে জুলি এখানে আসত, আর জুলির আকর্ষণে সুকুমারদা। তবে এটাও আমি লক্ষ করেছি সৌম্যদার দিকে মিলি একটু একটু করে ঝুঁকছিল। দেখছ না, এর মধ্যে ও খদ্দর ধরেছে। জুলি কিন্তু ধরেনি।" যূথিকা বলে।

"সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেল।" মানস বলে, "সৌম্যদার দিকে নয়, সুকুমারের দিকে ঝোঁক। পল্লীর দিকে নয়, বিলেতের দিকে মুখ। কোন্ মন্ত্রে এটা সম্ভব হলো! বিয়ের মন্ত্রে। বিয়েটা যদি হয়।"

"কেন, তোমার মনে সন্দেহ আছে নাকি?" যূথিকা জেরা করে।

"কালকের দিনটা দেখি। তারপর বলব।" মানস পাশ কাটায়।

পরের দিন বিকেলে মিলি এসে হাজির। সুকুমারকে ক্লাবে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। মিলির প্রথম কথা হলো ওরা আজ ডিনারে আসবে না।

"ব্যাপার কী, মিস মুস্তাফী?" যূথিকা সভয়ে সুধায়।

"সংক্ষেপে বলছি। আমরা স্থির করেছিলুম জুলি চলে গেলে তার অসাক্ষাতে মাকে সব কথা খুলে বলব। তারপর বাবাকে। কিন্তু যাবার মুখেই জুলি একটা বেফাঁস কথা ছুঁড়ে ফেলে যায়। হয়তো ইচ্ছে করেই বেফাঁস। বলে, কেউ বা বিলেতে যাবার জন্যে বিয়ে করে। কেউ বা বিয়ে করার জন্যে বিলেত যায়। যেমন ওই দুলাল। যেমন এই মিলি।"

"তার পরে?" যূথিকা রুদ্ধশ্বাসে শুনতে চায়।

"তার পরে মা আমাকে চেপে ধরেন। জুলির কী! ও খিল খিল করে হাসে। কতো বড়ো একটা তামাশা! আমি বলি, মা, পাগলে কী না বলে! জুলি যে একটা পাগলী একথা কে না জানে? তুমিই তো কত বার ওকে পাগলী বলেছ।"

"মা বিশ্বাস করলেন?" যূথিকা কৌতূহলী।

"মা একবার আমার দিকে তাকান, একবার জুলির দিকে। তলে তলে একটা কিছু চলেছে আন্দাজ করেন। কিন্তু তখনকার মতো থামেন। পরে আমরাই খাবার টেবিলে কথাটা পাড়ি। মিস্টার দত্তবিশ্বাসই কয়েকবার ঢোক গিলে আগ বাড়িয়ে বলেন, জানি আপনারা ক্ষমা করবেন না, তবু জোড় হাতে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। কথা ছিল জুলি আমার সঙ্গে শেষ জাহাজে বিলেত যাবে। সেখানে বেডফোর্ড কলেজে ভর্তি হবে। তা হলে ওকে আর বন্দীশিবিরে ধরে নিয়ে যাবে না। সিদ্ধান্তটা জুলির মায়ের। মিসেস সিন্‌হার। জুলি কিন্তু বেঁকে বসেছে। জাহাজের বার্থ খালি। কলেজের সীট খালি। এমন সুযোগ তো চাইলেও মেলে না। কেউ কি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে? অধমের প্রস্তাবে মধুমালতী দেবী এ সুযোগ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন।"

"তারপরে?" যূথিকা রুদ্ধশ্বাস।

"তারপরে মা কেঁদে ওঠেন। কী কান্না! কী কান্না! সে কান্না এখনো থামেনি। যাকে বলে নন্‌স্টপ। মিস্টার দত্তবিশ্বাস মনের দুঃখে বিষপান কবতে গেছেন। সেখানেই মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে দেখা হবে। আমি ওঁকে সোজাসুজি 'না' বলিনি। বাবাও ছিলেন খাবার টেবিলে। তিনি কাঁদছেনও না, হাসছেনও না। সম্পূর্ণ মৌন। বোধহয় চিন্তামগ্ন। দু'জনেই ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছেন। বিলেত গিয়ে পড়াশুনাটা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। লক্ষ্য হচ্ছে বিবাহ। এর একটা উল্টোদিকও আছে। বিলেত থেকে যদি না ফিরি। যদি যুদ্ধে নিহত হই। এত কম নোটিসে বিলেত যাওয়াটাও মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। অথচ এর চেয়ে কম নোটিসেও বন্দীশিবিরে ধরে নিয়ে যেতে পারে। যুদ্ধের সময় ওরা বিপ্লবীদের বাইরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। বাবা এটা বোঝেন। মা অবুঝ। অথচ মাই তো চেয়েছিলেন আমার বিয়ে দিতে।" মিলি লজ্জায় নত হয়।

"আমাদের সকলেরই সেই ইচ্ছে। আমার মনে হয় আপনার বাবা এ প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন। তিনি সব দিক ওজন করে দেখবেন যে এইটেই সবচেয়ে ভালো। তখন তিনিই বোঝাবেন আপনার মাকে।" যূথিকা আশ্বাস দেয়।

"কিন্তু সব দিক বিবেচনা করতে হলে পাত্রটির সম্বন্ধেও আরো জানতে শুনতে হয়। যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। পাত্রটি অবশ্য বিয়ের প্রস্তাব তোলেননি, আমিও আমার মতামত হাতে রেখেছি। কিন্তু ওঁরা হলেন সেকেলে মানুষ। অমনি তো একজন অজানা অচেনা পুরুষের সঙ্গে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে যেতে দেবেন না। বিয়ে না হোক, বিয়ের কথাবার্তা পাকা হওয়া চাই। আপনারা এক্ষেত্রে পাত্রের বন্ধু। মধ্যস্থও বলা যেতে পারে। আপনারা পেছনে না থাকলে আমি নিজেই জোর পেতুম না। আপনাদের কি আজ সন্ধ্যায় সময় হবে? আমাদের ওখানে যেতে পারবেন? বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন মিস্টার মল্লিক। আর মায়ের সঙ্গে আপনি।" মিলি ব্যাকুলভাবে বলে।

"দরকার হলে একশোবার আসব। বিয়ের সিদ্ধান্ত অবশ্য আপনাকেই নিতে হবে। ভুল করলে পশতাবেন তো আপনিই।" যূথিকা সাবধান করে দেয়।

"সে আমার প্রাইভেট ব্যাপার। কিন্তু মা বোধহয় অনিশ্চিতকে নিশ্চিত করতে চাইবেন বিলেত যাবার আগে বিয়ে দিয়ে। তা হলে আর সময় কোথায়? আমাকেও তো বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে। মানুষকে গুলী করতে যত সময় লাগে বিয়ে করতে তার চেয়েও কম সময় লাগবে।" ... . মিলি গম্ভীরভাবে বলে।

ক্যাপটেন মুস্তাফী অপেক্ষা করছিলেন। মানসকে নিয়ে যান তাঁর চেম্বারে। একথা সেকথার পর বলেন, "বিলেত যাওয়া, বেডফোর্ড কলেজে পড়া, এসব কথায় ভবী ভুলবে না। ভবী শুধু জানতে চায় একটি কথা। মেয়ের বিয়ে হবে কি না। যদি হয় তবে শুধু শুধু বিলেত যাওয়া কেন, কলেজে পড়া কেন?

যদি না হয় তবে অকারণে বিলেত যাওয়া কেন, কলেজে পড়া কেন? এখন আমি এর কী উত্তর দিই, বলুন? বন্দীশিবিরের হাত থেকে পরিত্রাণের আর কোনো উপায় নেই বললে ভবী বিশ্বাস করবে না। মেয়ে তো রাজনীতি ছেড়েই দিয়েছে। সেবাকর্ম নিয়েই আছে। সরকার যদি অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেন তাতেও ওর মা রাজী। কিন্তু বিলেত? এই যুদ্ধকালে বিলেত? যে পারছে সে পালিয়ে আসছে। যে পালায় সে-ই বাঁচে।"

মানস কেমন করে বোঝাবে যে সমস্যাটা দত্তবিশ্বাসের সৃষ্টি নয়। সে তো আজ এখনি বিয়ে করতে পারলে বর্তে যায়। মিলিই মনঃস্থির করতে পারছে না। কারণ বিয়ে করলে দত্তবিশ্বাস যেখানে থাকবে মিলিও সেখানে থাকবে। দত্তবিশ্বাস থাকবে বিলেতে। দেশে ওর কোনো কাজও নেই, বন্ধনও নেই। বিলেতেই ওর অন্নসংস্থান। বইয়ের দোকান। ওর দোকান থেকে বই আনিয়েছে মানস কয়েকবার।

"মিলিকে বিলেতেই থাকতে হবে?" মুস্তাফী মেনে নিতে অক্ষম। "কেন, মিস্টার দত্তবিশ্বাস কি এদেশেই থেকে যেতে পারেন না? কাজের মানুষের কাজের অভাব কী? গভর্নমেণ্ট থেকে আমি ব্যাণ্ডেজ সরবরাহের অর্ডার পেয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে। তার জন্যে আমি একটা কোম্পানী ফ্লোট করব। ম্যানেজমেণ্টের জন্যে লোক চাই। হোয়াই নট ভাট বিশোয়াস?"

"বলে দেখব। কিন্তু ও দেশে ও লর্ড ও লেডীদের সঙ্গে মেশে। এ দেশে কার সঙ্গে মিশবে? বারো বছর ও দেশে থেকে ওর অনেকগুলি কন্‌ট্যাক্ট হয়েছে ওদেশে। এ দেশে ওকে চিনবে কে? মফঃস্বল বারের এক উকীলের ছেলে। সৎমায়ের শাসনে দেশছাড়া। বিয়ে করতে এসেছে। বিয়ে করার কথা জুলিকে। জুলি নারাজ। জুলি এখন ইংরেজের নাম শুনলে জ্বলে ওঠে। বিলেত যেতে বললে মারতে আসে। মিস মুস্তাফীরও সেই একই মনোভাব। তাই আমরা কেউ আশাবাদী নই। তবে মিসেস মুস্তাফী একটি পাত্রের সন্ধান দিতে বলেছিলেন। এটিও একটি পাত্র। দৈবাৎ উড়ে এসেছে। কিন্তু জুড়ে বসবে কি না নির্ভর করছে আপনার উপর।" মানস নিবেদন করে।

"আপনার বন্ধু, এ ছাড়া ওঁর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনে। জানবার দরকারও নেই। যার তার সঙ্গে আপনার বন্ধুতা হয় না। তবে জানতে ইচ্ছে করে ওঁর পড়াশুনা কতদূর। কোন্ ইউনিভার্সিটিতে।" মুস্তাফী জানতে উৎসুক।

"লণ্ডন স্কুল অভ ইকনমিকসের ছাত্র। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বি. এসসি। এদিকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বি. এ.। দেশে ফিরে এলে একটা কিছু জুটে যেত হয়তো, কিন্তু তেমন কোনো চাড় ছিল না। একজন মানুষের পক্ষে যাঁহা স্বদেশ তাঁহা বিদেশ। সেখানেও চেষ্টা করলে একটা কিছু জুটে যায়। এতকাল পরে একজনের জায়গায় দু'জন হতে যাচ্ছে। নিজের একটা আস্তানা আছে। স্থানাভাব হবে না। আয়ের অন্যান্য উৎসও আছে। চলে যাবে। যদি বিয়ে হয়। আপাতত বিয়ের কথা উঠছে না। মধুমালতী আগে পড়াশুনা করবেন, তারপরে বিয়ে। যদি ইচ্ছে হয়।" মানস বলে যায়।

"তার মানে কী দাঁড়াল? পাত্র পাত্রী কারো পক্ষে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিয়ে হলেও হতে পারে। না হলেও না হতে পারে। অথচ এই দুঃসময়ে ইংলণ্ডে যাওয়া চাইই চাই। লাগে টাকা দেবে কালী মুস্তাফী।" তিনি গজগজ করেন।

"বাধ্যবাধকতার কথা যদি বলেন, দত্তবিশ্বাস এক্ষুণি বিয়ে করতে রাজী। চোখ বুজে বিয়ে করবে। পলিটিকাল রেকর্ডের দিকে তাকাবে না। মেডিকাল রেকর্ডের দিকেও না। পণযৌতুকও নেবে না, বিলেতযাত্রার খরচপত্রও না। ও চায় জুলির পরিবর্তে মিলিকে। খালি হাতে ফিরবে না। ওর মানসম্মানের প্রশ্নও জড়িত। কিন্তু আপনার কন্যার মন পাওয়া অত সহজ নয়। উনি কারো পরিবর্ত হতে চান না। ওঁর জন্যেও তপস্যা করতে হবে। আমার বন্ধু তাতেও রাজী। কিন্তু একটি শর্তে। কন্যাকে বিলেতে গিয়ে বেডফোর্ড কলেজে পড়াশুনা করতে হবে। নয়তো আমার বন্ধু বার বার তিনবার প্রত্যাখ্যানের

জ্বালা সইতে পারবে না। ফিরে গিয়ে যাকে পাবে তাকে বিয়ে করবে।" মানস তার শেষ তাসটি খেলে।

"হুঁ। বুঝেছি। জেদের মাথায় বিয়ে। একজনকে না একজনকে উনি বিয়ে করবেনই। সম্ভব হলে আজ এক্ষুণি। কিন্তু মিলি প্রস্তুত নয়। ওরও তো মানসম্মানের প্রশ্ন আছে। মল্লিক সাহেব, আপনিই বলুন আমার কী করা উচিত। একটি পাত্রকে হাতছাড়া করলে আর একটি পাত্র জুটবে না। মিলিও কয়েকটি খারিজ করেছে। নিজেও খারিজ হয়েছে। দত্তবিশ্বাসকে তো আমার খুব তুখোড়, স্মার্ট ও করিৎকর্মা মনে হয়। কিন্তু আমার কন্যাটি যে আইডিয়ালিস্ট। আইডিয়ালিজমের জন্যে ওর জীবনটাই ব্যর্থ। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে এ জীবনে ওর বিয়ের আশা নেই। হঠাৎ একটু আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি। মল্লিক সাহেব, আপনার মেয়ে হলে আপনি কী করতেন? এক্ষুণি বিয়ে দিতেন না আরো কিছুদিন দেখতেন?" মুস্তাফী উদ্‌ভ্রান্ত।

"মেয়ে যেখানে সাবালিকা সেখানে সিদ্ধান্তটা মেয়ের উপরে ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। মধুমালতী শুধু সাবালিকা নন, তিনি স্থিরমতি। মনঃস্থির করতে তাঁর সময় লাগবে। অথচ দত্তবিশ্বাসের হাতে অত সময় নেই। ওর শেষ জাহাজ তিন সপ্তাহের মধ্যেই বম্বে ছাড়বে। একজন যদি সমুদ্রের এপারে থাকে আরেকজন ওপারে তা হলে চিঠিপত্রই মিলনের সূত্র। কিন্তু যুদ্ধকালে সেটাও ক্ষীণ হতে হতে ছিন্ন হতে পারে। তা হলে আরেকজনকেও ওপারে যেতে হয়। এই পর্যন্ত তাঁর বাধ্যবাধকতা। এর বেশী নয়। পছন্দ না হয় বিয়ে করবেন না। দত্তবিশ্বাসকে মুক্তি দিলে সেও আর কাউকে বিয়ে করবে। তবে আমার নিজের মত হচ্ছে হাতের লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলা। আইডিয়াল ম্যাচ এ পৃথিবীতে কোথায়? যতই দিন যাবে ততই রূপযৌবন ক্ষয় হবে। শেষে কেউ ফিরেও তাকাবে না। ওল্‌ড মেড হয়ে জীবন কাটাবে।" মানস তার মত জানায়।

"ঠিক। ঠিক। যতই দিন যাবে ততই বিবাহের অযোগ্য হবে। এটা কি ওর মা বোঝেন না? না বুঝলে কী করে বোঝাই বলুন তো? মিসেস মল্লিকের সহায়তা চাই। তিনি তো ঘরে বসে মিলির মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। একটু পরে জানতে পাব কী বললেন। এ ঘটকালি তো ওঁরই কীর্তি।" মুস্তাফী তারিফ করেন।

মিলির মা নরম হয়েছেন শোনা গেল। কিন্তু মেয়ে যদি বিয়ে না করেই ফিরে আসে লোকে ছি ছি করবে। পরে ওকে আর কেউ বিয়ে করবে না। লাভের মধ্যে হবে বিলিতী শিক্ষা। তাতে মাথা উঁচু হবে। সব চেয়ে ভালো হয় মিলি যদি বয়স থাকতে বিয়ে করে। বয়স কি আর অপেক্ষা করবে? যূথিকা নাকি পরামর্শ দিয়েছে চোখ বুজে ঝাঁপ দিতে। নারীর জীবনে এটাও তো একটা বিপ্লব। বিপ্লব মানেই ঝুঁকি। বিয়ে মানেও তাই। দু'তিন বছর পার করে দিয়ে এমন কী নিশ্চয়তা বাড়বে? সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। জুলি যথাকালে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ওর বন্ধু মিলির জন্যে। এটাকে বন্ধুকৃত্য বলেই মনে করা উচিত। মিলি কেন দোনোমনো করছে? ওর নজরে কি আর কোনো পাত্র আছে? পুরুষ হচ্ছে প্রজাপতির মতো। ওকে পিন দিয়ে এঁটে না রাখলে ও উড়ে গিয়ে অন্য কোনো ফুলে গিয়ে বসবে। অন্য কোনো মালতীর মধু পান করবে। আদর্শ পুরুষ নয়। কিন্তু তার জন্যে শবরীর প্রতীক্ষা নিরর্থক।

মা বলেন মেয়েকে, "মনঃস্থির তুই দিন সাতেকের মধ্যেই কর। তুই 'হ্যাঁ' বললেও আমি রাজী। 'না' বললেও রাজী। কিন্তু ঝুলিয়ে রাখিসনে।"

নৈশভোজন সেদিন মুস্তাফীদের ভবনেই হয়। বিদায় নেবার সময় মানস বলেন, "বেশ, সাতদিন পরেই এস্‌পার কি ওস্‌পার। কিন্তু ইতিমধ্যে পাসপোর্টের দরখাস্তটা করে রাখলে সময় বাঁচে। দরকার না হয় তুলে রাখবেন। পরে কাজে লাগতে পারে।"

পরের দিন পাসপোর্টের ফর্ম আনতে স্বয়ং মুস্তাফী যান জেলা শাসকের অফিসে। চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। লোকে ভাবে তিনিই বিদেশ যাচ্ছেন। এর পরে তিনি শেফার্ড সাহেবের কুঠিতে গিয়ে সাক্ষাৎ

করেন। সঙ্গে মিলি ও সুকুমার। শেফার্ড একগাল হেসে বলেন, "এই বাঘিনীর বিয়ে দেবার জন্যে সরকার থেকে কত না ফাঁদ পাতা হয়েছে। কিন্তু কারও মাথায় আসেনি যে একে বিলেত পাঠাতে হবে। সেখানেই অপেক্ষা করছে ফাঁদ। আমার ঘাড় থেকে একটা দুর্ভাবনার বোঝা নামল। দরখাস্ত মনজুর করতে এই আমি সুপারিশ করলুম। বেস্ট অভ লাক টু ইউ, মিস মুস্তাফী, অ্যাণ্ড টু ইউ ইয়ং ম্যান।"

মধুমালতী বলে, "আমি কিন্তু এখনো কথা দিইনি যে আমি বিয়ে করব।"

"আমিও তো উল্লেখ করিনি যে আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন। আপনি যাচ্ছেন পড়াশুনা করতে। মঞ্জুলিকা সোমের জন্যে সংরক্ষিত স্থানে। এস্‌কর্ট হচ্ছেন মিস্‌টার ডাট বিশোয়াস। যাঁর লণ্ডনে বইয়ের দোকান আছে। এর থেকে যদি কেউ অনুমান করে যে এর পরিণতি বিবাহান্ত তবে ক্ষতি কী?" শেফার্ড চোখ টেপেন।

ক্যাপটেন মুস্তাফী সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, "এমনও হতে পারে যে পাসপোর্ট পেলেও যাওয়া হবে না। কাজেই ব্যাপারটা গোপনীয় রাখবেন, সার।"

সাতদিনের মধ্যেই পাসপোর্ট পৌঁছে যায়। পাসপোর্টখানা হাতে পেয়ে মিলির সে কী বিস্ময়। ইংরেজদের উপর ওর বিশ্বাস একেবারেই ছিল না। অন্তত ছ'টি মাস না ঘুরিয়ে ওরা কি পাসপোর্ট ইস্যু করবে ওর মতো বিপ্লবী নায়িকাকে? ও যদি বিলেত থেকে সুইডেন চলে যায় ও সেখান থেকে রাশিয়ায় তা হলে ওরা কী করতে পারে?

"তা হলে তুই কী স্থির করলি, মিলি?" মা জানতে চান।

"এ পাসপোর্ট তুলে রাখলে ওরা যে-কোনো দিন কেড়ে নিতে পারে। আমি এটা নিয়ে সাগর পাড়ি দেব, মা।" মিলি উত্তর দেয়।

"তা হলে, বাছা, এবার আমার কথা শোন। বিয়ের পাট চুকিয়ে দিয়ে যা। কবে ফিরে আসবি কে জানে! ততদিন যদি বেঁচে না থাকি! তার আগে আমি দেখে যেতে চাই তোর সিঁথিতে সিঁদুর।" মা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন।

"তোমার হাসিমুখ দেখে যেতে চাই, মা। তোমাকে কাঁদিয়ে যেতে চাইনে। তুমি যা বলবে তাই হবে।" মিলি মাথা নত করে।

"তোর যাকে পছন্দ তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দেব, মিলি। যাবার আগেই দেব। অঘ্রান পর্যন্ত থাকলেই ভালো হতো, কিন্তু ততদিন তো জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকবে না। কার্তিকেই বিয়ের দিন ফেলতে হবে। অরক্ষণীয়া কন্যার বিয়ে কার্তিকেও হয়। হাতে সময় বড়ো কম। তেমন বেশী ধুমধাম হবে না। মনে খেদ থেকে যাবে। উপায় কী! তুই যে রাজী হয়েছিস এতেই আমি কৃতার্থ।" তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

মুস্তাফী সুকুমারকে ডেকে বলেন, "মিলি মত দিয়েছে, এখন আমরাও মত দিচ্ছি। ইংরেজরা বলে, ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন। আমরা নিমিত্তমাত্র। মিলির বিয়ে ভাবতে পারিনি যে স্বচক্ষে দেখতে পাব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি দিচ্ছি। তুমি কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে চাও ফর্দ করো। তোমাদের পক্ষ থেকে কে কে আসবেন? তোমার পিতৃদেব? তাঁকে চিঠি লিখব কি?"

"লিখলে ভালো দেখায়। কিন্তু ওঁর খাঁই মেটাতে পারবেন না। টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। পাঠাইনে বলে আমার উপর খাপ্পা।" সুকুমার লজ্জিত।

"মিলি আমাকে অনেকদিন আগে থেকেই বলে রেখেছে যে বিপ্লবীর জীবনে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু পণযৌতুক দানগ্রহণ নিষেধ। ত্যাগ ও শৌর্যের দ্বারা ও যেটুকু সুকৃতি অর্জন করেছে তার সবটাই নষ্ট হবে যদি ওর বিবাহ হয় বুর্জোয়া বড়লোকের মেয়ের মতো। সত্যি কথা বলতে কী, এতদিন যে ওর বিয়ে হয়নি তার প্রধান কারণ বরপক্ষ আশা করে পণযৌতুক আর কন্যাপক্ষ তাতে নারাজ। এক বিপ্লবী

ভিন্ন আর কে ওকে বিয়ে করত, বলো? তাতে কিন্তু ওর জননীর আপত্তি। মেয়েকে যার হাতে দেবেন তার জেল হবে কি দ্বীপান্তর হবে কে জানে! ফাঁসীও হতে পারে।" মুস্তাফী শিউরে ওঠেন।

"আমিও তো কালাপানি পার হয়েছি ও হব।" সুকুমার সবিনয়ে বলে।

"সেইজন্যে তোমার বেলাও তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু তিনিও চান যে মিলি আর কোথাও যাক, এদেশে থাকলে হয় বন্দীশিবিরে নয় আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বিপ্লব থেকে যত দূরে যায় তত ভালো।" মুস্তাফীর সেই মত।

"তা হলে এত কান্নাকাটি করলেন কেন? আমার তো মনে হলো মিলিকে ছেড়ে তিনি একদিনও বাঁচবেন না।" সুকুমার দুঃখিত।

"ওটা শক থেকে। এতদিনে সয়ে গেছে। তুমি চালাক চতুর ছেলে, যুদ্ধের সময় আপনাকে বাঁচাবে, বৌকেও বাঁচাবে, তোমাকে দেখেশুনে তাঁর প্রত্যয় হয়েছে। আমার তো সন্দেহই ছিল না। বিপদ বরং এই দেশেই বেশী।" মুস্তাফীর ধারণা।

"আমি সামান্য মানুষ। আমার উপর আপনাদের এই বিশ্বাস আমাকে অভিভূত করেছে, মেসোমশায়।" সুকুমার এর মধ্যে 'মেসোমশায়' ও 'মাসিমা' ডাকতে শুরু করেছে। সেটা জুলির অনুকরণে।

"বিলেত গেলে মিলিও চালাক চতুর হয়ে উঠবে। এদেশে থাকলে ওর জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হবে না। আমার মনেও তো একটা খেদ রয়ে গেছে যে আমার মা আমাকে বিলেত যেতে দিলেন না। নইলে আমিও একজন আই. এম. এস হতে পারতুম। এতদিনে কর্নেল মুস্তাফী। মা বেঁচে থাকতে আমাকে যুদ্ধে যেতেও দিতেন না। গেছি বলেই ক্যাপটেন মুস্তাফী হয়েছি। আরো উঁচু র‍্যাঙ্ক আমার পাওনা ছিল, সুকুমার। মেজর মুস্তাফী হওয়ার আগেই আমি সরে পড়ি। জানতুম যে বন্দীশিবিরে মিলিকে ওর বন্ধুরা ধিক্কার দেবে। যার মেয়ে বিপ্লবী বন্দী তার মেজর হওয়া সাজে না। তুমি হয়তো ভাবছ আমি র‍্যাঙ্কের জন্যে লালায়িত। না, বাবা। তবে এটাও কবুল করছি যে লোকে যদি আমাকে ক্যাপটেন মুস্তাফী না বলে ডাক্তার মুস্তাফী বলে আমি ব্যথা পাই। যুদ্ধে এবার বহু ডাক্তার নেবে। বহু ক্যাপটেন হবে। যুদ্ধ জিনিসটা সেদিক থেকে খুব একটা খারাপ জিনিস নয়। কী বলো, সুকুমার?" তিনি সিগারে টান দেন।

"আমিও তাই ভাবছি, মেসোমশায়। এই হিড়িকে আমিও ক্যাপটেন বনে যেতে পারি। হোম গার্ডে আমাকে নেবে, যদি রেগুলার আর্মীতে না নেয়। এবারকার যুদ্ধে সিভিল ডিফেন্স বলে একটা বিভাগ থাকবে। মিলিটারী ডিফেন্সই সব নয়।" সুকুমার উৎসাহের সঙ্গে বলে।

"যুবকদের মধ্যে আমি এমনি উৎসাহ দেখতে ভালোবাসি। বাঙালীর জীবনে সামরিক অভিজ্ঞতার সুযোগ কোথায়? যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়। তবে, হ্যাঁ, আপনাকে বাঁচিয়ে।" মুস্তাফী সাবধানী মানুষ।

বিয়ের দিন শেফার্ডকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একখানি পরিচয়পত্র দিয়ে যান। লণ্ডনে তাঁর এক বোন থাকেন। ওঁর নামে। মিসেস দত্তবিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ হলে উনি সুখী হবেন। প্রয়োজনের সময় সহায়তা করবেন।

"ভালো কথা," শেফার্ড মনে করিয়ে দেন, "কলকাতায় পাসপোর্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করে বলবেন যে ইতিমধ্যে আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। আপনার পদবী তাই পালটে গেছে। প্রমাণ চাইলে নিমন্ত্রণপত্র দেখাবেন।"

মধুমালতী তার আন্তরিক ধন্যবাদ জানায় ও করমর্দন করে তাঁকে বিদায় দেয়।

তখন পুলিশ সাহেব খোন্দকার জাফর হোসেন বলেন মুস্তাফীকে, কানে কানে, "আর কিছুদিন পরে ওই শেফার্ডের হাত দিয়েই আমি সই করিয়ে নিতুম গ্রেফতারি পরোয়ানা এই মেয়ের নামে। তার আগেই পাখী উড়ে যাচ্ছে। শুভ হোক।"

শহরের গণ্যমান্যরা প্রায় সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। দস্তুরমতো হিন্দু বিবাহ। সালঙ্কারা কন্যাকে দেখে কে বলবে যে ইনি শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর। তবে পণ যৌতুকের আড়ম্বর ছিল না। তার বদলে সেবাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তাবলী পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন।

কিন্তু বরকর্তা কোথায়? তিনি আসেননি। পত্রের উত্তরে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর পুত্রের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এ বিবাহে তাঁর সমর্থন নেই।

বরকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি না হলে বরকে সভাস্থ হতে অনুমতি দেবে কে? সৌম্যকেই বরকর্তা সাজতে হয়। বরের চেয়ে বয়স যদিও খুব বেশী নয় তবু দাড়িগোঁফের বাহুল্যে প্রৌঢ়ের মতো দেখায়। কন্যাকর্তার অনুরোধে সৌম্য বরকর্তার আসন নেয়।

বিয়ের পরে সৌম্যর কর্তাগিরির মুখোশ খসে পড়ে। সে বন্ধুর হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁকানি দেয়। "সত্য ত্রেতা দ্বাপরমে এ্যায়সা কাম কোই নেহি কিয়া। লাটিন ভাষায় জুলিয়াস সীজার একবার একটা দেশ জয় করে বলেছিলেন, ভেনি ভিডি ভিসি। বাংলাভাষায় তুমিও বলতে পারো, এলুম, দেখলুম, জয় করলুম।"

"কেন লজ্জা দিচ্ছ, ভাই চৌধুরী? তুমি তো জানো সব কথা। কাকে পেতে এতদূর এসেছিলুম, কাকে হারালুম, কাকে তার বদলে পেলুম।" সুকুমার বলে ধরা গলায়।

"কাকে হারালে সেটা বড়ো কথা নয়, কাকে পেলে সেইটেই বড়ো কথা। এই নারীর জন্যেও তপস্যা করতে হয়। বিনা তপস্যায় এমন নারী মেলে না। তুমি যে পাচ্ছ এটা নেহাৎ বরাত জোরে। বোধহয় তোমার সেই তপস্যাই তোমার এই সাফল্যকে বল জুগিয়েছে। মিলি তোমার সেই তপস্যায় মুগ্ধ। তা হলেও তোমাকে নতুন করে তপস্যা করতে হবে। মিলির মন পেতে। মিলি তোমাকে পরখ করে নেবে। সময় লাগবে। বিয়ে করেছ বলে ধরে নিয়ো না যে ভালোবাসা পেয়েছ।" সৌম্য উপদেশ দেয়।

"তুমি যে আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে, ভাই।" সুকুমার বলে।

"কেন, ভয় কিসের? জুলি মিলি দু'জনকেই আমি চিনি। জুলির সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে ওর হাত থেকে চড়টা চাপড়টা খেতে। বকুনি তো হতো নিত্য আহার্য। মিলি ঠাণ্ডা মেয়ে। সন্ত্রাসবাদী যুগে দেশের অপমানে আগুন হয়ে কী করেছিল না করেছিল সেসব পূর্বজন্মের মতো শোনায়। তবে আগুন পুরোপুরি নেবেনি, বিপ্লবের আবহাওয়ায় আবার জ্বলে উঠতেও পারে, সেইজন্যেই তো ওকে বিদেশে চালান করে দেওয়া। কিন্তু তেমন কোনো অঘটন না ঘটলে ও তোমাকে সুখী করবে, সুকুমার। তুমিও ওকে সুখী করবে, আশা করি। আর কারো দিকে দৃষ্টি দিয়ো না। আর কেউ যেন তোমাদের দু'জনের মাঝখানে না আসে। মিলি প্রাচ্য নারী। ওদেশের রীতিনীতি বোঝে না। তোমার গার্ল ফ্রেণ্ডদের থেকে শতহস্ত দূরে থেকো। একদা তুমি একজন গ্যালান্ট ছিলে। সেকথা বেবাক ভুলে যেয়ো। আলবামে ছবিটবি থাকলে পুড়িয়ে ফেলো। কষ্ট বোধ হলে ফেরৎ দিয়ো। জুলির নামও করতে মানা করি। ওদের দু'জনের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব লক্ষ করেছি। প্রিয় বন্ধু, অথচ প্রতিদ্বন্দ্বী।" সৌম্য সতর্ক করে দেয়।

সুকুমার গদগদ হয়ে বলে, "তোমার মতো শুভার্থী আর কে আছে আমার। তুমিই প্রকৃত বরকর্তা। তবে এ বিয়েটা যূথিকার কীর্তি। ভাগ্যিস, ওরা এখানে ছিল। মানস আর যূথিকা। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র।"

॥ সাত ॥

জুলিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সুকুমার সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করেছিল ওর মাকে। তিনি তা পেয়ে অবাক। মেয়েকে শেয়ালদায় রিসিভ করতে এসে তিনি ওর মুখে যা শোনেন তা আরো বিচিত্র। তিনি হতবাক হন। শেষে যখন বিয়ের নিমন্ত্রণ আসে তখন তিনি স্তম্ভিত হন। জুলিকে উদ্ধার করার জন্যে বিলেত থেকে যে ছুটে এল সে কিনা জুলিকে পথে বসিয়ে ওর বান্ধবী মিলিকে নিয়ে উধাও হবে।

"সুকুমারের মতো বিশ্বাসী ছেলে, এগারো বছর ধরে যে বিশ্বাস রক্ষা করে এসেছে, সেও শেষকালে বিশ্বাসভঙ্গ করল। ও তোকে বিট্রে করেছে, জুলি।" মিসেস বিনীতা সিন্‌হা হাহুতাশ করেন।

"না, মা, তুমি ভুল বুঝেছ। সুকুমারদা আমাকে বিট্রে করেনি। আমিই ওকে জিল্‌ট করেছি। এই নিয়ে ও তিনবার প্রপোজ করল। তিনবারেই আমি 'না' করলুম। ওর জীবনের উচ্চাভিলাষ হলো বুর্জোয়াদের সমাজে আরো, আরো, আরো উপরে ওঠা। পৈঠার পর পৈঠা পার হয়ে 'সার সুকুমার' কি 'লর্ড ডাট বিশোয়াস' বনা। আর আমি তো ওর বিপরীত মার্গে চলেছি। দিন দিন দেক্লাসে হচ্ছি। চাষানী কি মজুরনীর সঙ্গে আমার কোনো তফাৎ থাকবে না। ও আমাকে টেনে উপরে তুলতে পারবে না। আমিও ওকে টেনে নিচে নামাতে পারব না। এমন বিয়ে কি সফল হতে পারে? তা ছাড়া আরো কথা আছে।" জুলি একটু থামে।

"কী কথা?" ওর মা উৎসুক হন।

"ও ব্রহ্মচারী নয়।" বলতে গিয়ে জুলি লজ্জায় লাল হয়। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকে।

"ওঃ এই কথা! যার বয়স হলো গিয়ে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ সে কতকাল সাধু সন্ন্যাসীর মতো থাকবে? আজকাল সেটল্‌ড না হয়ে বিয়ে করা যায় না। আর সেটল্‌ড হতে অর্ধেক জীবন কেটে যায়। অত বাছবিচার করলে কি তোর দুই দিদির বিয়ে হতো? বিয়ের সময় ওসব বিষয়ে চোখ বুজে থাকতে হয়।" মাও লজ্জায় লাল হন।

"এ তো ভারী অন্যায়। মেয়েদের বেলা এক নিয়ম, ছেলেদের বেলা আরেক। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত।" জুলি ক্ষেপে যায়।

"তা হলে তো উপার্জনক্ষম হবার আগেই ছেলেদের বিয়ে দিতে হয়। ছিল আগে এ প্রথা। এখন উঠে গেছে। তোর নিজের বেলা আমরা ও প্রথা মানতে গিয়ে বিপাকে পড়েছি। বিশ বছর বয়সের ছেলের সঙ্গে ষোল বছর বয়সের মেয়ের বিয়ে। দু'বছর যেতে না যেতেই বিধবা। নইলে তুই যেমনটি চেয়েছিলি তেমনটিই পেয়েছিলি। ওটা একটা বিয়েই নয়। তাই আমি তোর আবার বিয়ে দিতে চেয়েছি। সুকুমারের মতো আর কেউ তো এগিয়ে আসেনি বিধবাকে বিয়ে করতে। এখন সুকুমার হাতছাড়া হলো। কোথায় আবার পাত্র খুঁজব! তোর বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিয়ে দিতে গেলে আবার ওই বয়সী ছেলের খোঁজ নিতে হবে। সেও কি শুদ্ধসত্ত্ব হবে?" মা সংশয় প্রকাশ করেন।

"বিয়ে তো তুমি একবার দিয়েছিলে, মা। আবার দেওয়া তো তোমার দায়িত্ব নয়। যদি আবার হবার থাকে তো আমার দায়িত্বে হবে। তার দেরি আছে। তখন তুমি দেখবে যে আমার ভুল হয়নি।" জুলি আশ্বাস দেয়।

"কার কথা ভেবে বলছিস্? আমি কি তাকে চিনি?" মা কৌতূহলী হন।

"খুব চেনো। এগারো বছর ধরে চেনো।" জুলি টিপে টিপে হাসে।

"কে? কে? আমি তো ভেবে পাইনে।" মা পীড়াপীড়ি করেন।

"সৌম্যদা।" জুলি ফাঁস করে দেয়।

"কী যে বলিস্।" মা যেন আকাশ থেকে পড়েন। "পাগল আর কাকে বলে। ওর না আছে চাল, না আছে চুলো। বাপের সম্পত্তি ও ট্রাস্ট করে দিয়েছে। তার পর থেকে আশ্রমে আশ্রমে ঘুরছে। তোর সঙ্গে বিয়ে হলে তোকে নিয়ে ও রাখবে কোথায়? সংসারটা চলছে যে দুটো চাকায় তাদের একটার নাম টাকা। আরেকটার নাম লাঠি। গান্ধী মহারাজ এর দুটোর একটাতেও বিশ্বাস করেন না। তাঁর শিষ্যও হয়েছে তাঁরই মতো। সংসার চলবে কী করে?" মা বার বার মাথা নাড়েন।

" তার অনেক দেরি আছে, মা। আগে তো দেশ স্বাধীন হোক। তার আগে ওঁর ব্রতভঙ্গ হবে না। ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখনো অনির্দিষ্ট। উনিও কথা দেননি, আমিও কথা দিইনি। আমি ইচ্ছে করলে আর কাউকে বিয়ে করতে পারি। উনিও আর কাউকে। তবে এটাও মনে রেখো, মা, আমি আমার দিদিদের মতো টাকার জন্যে বিয়ে করব না। বিপ্লবের দিন কোথায় থাকবে ওদের স্বামীদের সম্পত্তি! সব বাজেয়াপ্ত হবে। ওরা এমিগ্রি হয়ে বিদেশে পালিয়ে যাবে। নয়তো কচুকাটা হবে। তুমি ভাবছ সংসারের চাকার কথা। আমি ভাবছি ইতিহাসের চাকার কথা। সব টাকা সমাজের। সব লাঠি সমাজের। নিজের বলতে কারো কিছু থাকবে না।" জুলি করে ইতিহাসের ব্যাখ্যা।

ওর মা তর্ক করতে পারেন না। হাল ছেড়ে দেন। বলেন,"তার আগেই যেন আমার মরণ হয়। আমার যাতে আতঙ্ক তাতেই তোর উল্লাস। দেক্লাসে হওয়া যেন মস্ত বড়ো একটা বাহাদুরি।"

"সৌম্যদাও ওই লক্ষ্যে বিশ্বাসী। তবে ওর পন্থা অহিংস ও সত্যাশ্রয়ী। সেটা নীতিহিসাবে শ্রেয়, কিন্তু পলিসিহিসাবে অকেজো। সেইজন্যেই তো আমি ওর সঙ্গে যোগ দিতে পারছিনে। ও বেচারা নিঃসঙ্গ।" জুলি দুঃখিত।

"সৌম্যকে আমি স্নেহও করি, শ্রদ্ধাও করি। ও তো মানুষের ভালো ছাড়া আর কিছু ভাবে না ও করে না। কিন্তু দুনিয়া বড়ো কঠিন ঠাঁই। যীশুকেও ক্রুশে বিঁধে মারে। কেন? কারণ তিনি মানুষের চেয়ে বড়ো। তিনি অতিমানব। অতিমানব দেখলে আমি ডরাই। মহাত্মা যে এখনো বেঁচে আছেন এটাই আশ্চর্য। বড়ো হওয়ার শাস্তি আছে। সৌম্যর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে আমার ভাবনা বাড়বে।" মা উদ্বিগ্ন।

মা ও মেয়ে দু'জনেই দুটো গ্রীটিংস টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেন সুকুমারকে ও মিলিকে। দু'জনেরই শুভকামনা আন্তরিকতায় ভরা।

কলকাতা এসে সুকুমার জুলিদের বাড়ীতেই ওঠে। সেখানে ওর বাঁধা নিমন্ত্রণ। এবার কিন্তু তার ব্যত্যয় ঘটে। কলকাতায় মুস্তাফীদের নিজস্ব বাড়ী আছে। সেটার একটা অংশ ভাড়াটেদের দখলে। একটা অংশ খালি। মুস্তাফীরা কলকাতা এলে সেখানে ওঠেন। এবার মিলি ও তার বরকে নিয়ে মুস্তাফীরা স্বামীস্ত্রী দু'জনেই আসেন। দু'জনেই যাবেন ওদের নিয়ে বম্বে। তুলে দিয়ে আসবেন জাহাজে।

হঠাৎ মিলি বলে বসে, "শ্বশুরবাড়ী যাব। শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করব।"

সুকুমার বিব্রত হয়ে বলে, "কেন মিছিমিছি অপমান হতে যাবে? টাকা ছাড়া ওঁরা আর কিছু বোঝেন না। টাকা পাননি, সমর্থন করেননি।"

"আচ্ছা, সে ভার আমার উপর ছেড়ে দাও।" এই বলে মিলি অনেক টাকার বাজার করে, উপহার কেনে। যশোরে একটা টেলিগ্রাম করে দেয় যে পরের দিন আসছে। তারপরে আর যা করে তা শুধু বাবাকেই জানায়।

বাবা বলেন, "বিয়ের আগে যেটা দেওয়া হয় সেটার নাম পণ। বিয়ের পরে যেটা দেওয়া হয় সেটার নাম প্রণামী। আমি তো এতে নীতিবিরুদ্ধ কিছু দেখিনে। তোমার যা সাধ্য তা তুমি দেবে। একটা মোহরও দিতে পার, একশো একটা মোহরও দিতে পারো। শ্বশুর শাশুড়ী দু'জনকেই দিয়ো। যদিও সৎশাশুড়ী।"

মিলি কাউকে জানতেই দিল না দোকানে গিয়ে ক'টা মোহর কিনেছে। তোড়া দুটোর আকার আর ওজন দেখে মুস্তাফী অনুমান করেন আড়াইশো আর আড়াইশো। সুকুমার তো বিস্ময়ে থ।

বিয়ের আসল মন্ত্র তো এই। মন্ত্রের মতো কাজ করে। শ্বশুর শাশুড়ী দু'জনেই দুটি তোড়া পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ। এ তাঁদের আশার অতীত। শাঁখ বেজে ওঠে, যথারীতি বধূবরণ হয়। মিলির কি আর সেই মিলিটাণ্ট চেহারা আছে? সে লাবণ্যময়ী লজ্জানম্র সুমঙ্গলী বধূ। পাড়ার মেয়েরা তাকে লুট করে নিয়ে যায়। প্রত্যেকের বাড়ীতে সেও কিছু না কিছু প্রণামী দেয়।

জিতেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটা বৌভাতের আয়োজন করেন। এই জিনিসটি মিলি মনে মনে কামনা করেছিল। সব মেয়ের বিয়ের পরে বৌভাত হয়। ওর কেন হবে না? বিপ্লবের পরে কি বিয়ে থাকবে না, বৌভাত থাকবে না? থাকবে, থাকবে, সব থাকবে। স্ত্রী আচার লোকাচার কিছুই বাদ যাবে না। বাদ যাবে শুধু অলঙ্কারের বাহুল্য। বাবা যা দিয়েছিলেন তা বিলেত নিয়ে যাওয়া বৃথা। বিলেতে কেউ অত গয়না পরে না। যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার একদিন সব সোনা কিনে নেবে। মিলি তাই সাধারণ ব্যবহারের জন্যে কয়েকখানা রেখে আর সমস্ত বিক্রী করে দেয় ও সেই টাকায় মোহর কেনে।

সুকুমার অনুমোদন করে না। মুখ ভার করে থাকে। মিলির মা নন্দরানীরও সেই রকম মনোভাব। কিন্তু ক্যাপটেন মুস্তাফী মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করে বলেন," মিলি যা ঘটিয়েছে তা একটা বিপ্লব ছাড়া আর কী? সুকুমার এখন আর ত্যাজ্যপুত্র নয়, পিতার উত্তরাধিকারী। তার বিবাহ এখন সর্বস্বীকৃত। তার বৌকে এখন সবাই আদর করে ঘরে তুলেছে। খরচ যা হয়েছে তা আমি পরে পুষিয়ে দিতে পারব। আনন্দ করো, আনন্দ করো। মধুরেণ সমাপয়েৎ।"

জুলির মাকে সুকুমার মাসিমা বলে ডাকে। তিনিও তাকে মাসিমার মতো ভালোবাসেন। বিলেতে যতদিন ছিলেন সুকুমার ছাড়া তাঁর একটা সপ্তাহও চলত না। অত রকম ফাইফরমাস খাটবে কে? জুলিকে সুকুমার বিয়ে করতে চেয়েছিল বিলেত থাকতেই। আবার তাকে বন্দীশিবির থেকে মুক্ত করার পর। সেদিন আবার ওর এস্কর্ট হয়ে। জুলি যদি বার বার প্রত্যাখ্যান করে তবে আর একজনকে বিয়ে করা তো অপরাধ নয়। মিসেস সিন্‌হা সুকুমারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মিলির জন্যেও। ওরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করতেই তিনি ওদের দু'জনাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দু'জনের গালেই চুমু খান।

বলেন,"তোমাদের বিবাহে আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে, মিলি ও সুকুমার। আমার সঙ্গে সম্পর্ক যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। তবে জুলির সঙ্গে বদলে গেল।"

জুলি তখন বাড়ীতে ছিল না। তার মা বলেন,"জুলির বিয়ে যখন হবার তখন হবে। না হলেও যে আমি কাতর হব তা নয়। একবার তো ওর বিয়ে দিয়েছিলুম। কপালে সইল কই? জুলির না হয়ে মিলির হলো এতে আমি আরো খুশি। এ না হলে মিলি বেচারির একবারও বিয়ে হতো কি না সন্দেহ। সুকুমার, তুমি ঠিকই করেছ মিলির কাছে প্রপোজ করে। মিলি, তুমিও ঠিক করেছ অ্যাকসেপ্ট করে। এখন তোমরা হ্যনিমুনে যাচ্ছ। যাত্রা শুভ হোক। সুকুমার, ওদেশে পৌঁছেই পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের একটা রিসেপশন দিয়ো। আমাকে যাঁরা চেনেন সবাইকে আমার প্রীতি জানিয়ো।"

জুলির সঙ্গে যাবার আগে দেখা করতে ব্যাকুল ছিল সুকুমার। মিলি এটা জানত, কিন্তু বাধা দিতে চায়নি। এগারো বছরের সম্পর্ক একদিনে বদলে যেতে পারে, কিন্তু কেটে যেতে পারে না। সে বলে, "মাসিমা, জুলিকে বোলো হাওড়া স্টেশনে আমাদের সী অফ করতে। হ্যাঁ, ইম্পীরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল। বোট ট্রেন। যুদ্ধের পরে দেশে ফিরব। আপাতত দীর্ঘকালের জন্যে বিদায়। জুলি আর মিলি আমরা ছেলেবেলার থেকে বন্ধু। এ বন্ধুতা যেন অক্ষয় থাকে। ও যেন বিশ্বাস করে যে ওর বরকে আমি ভুলিয়ে কেড়ে নিইনি। ও যেন বিশ্বাস করে যে এটা ঘটনাচক্রে ঘটেছে। ওর যাতে ভালো বিয়ে হয় তার জন্যে আমি যথাসাধ্য করব।"

ট্রেন ছাড়বার একটু আগে জুলিকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে। দুই হাতে দুটো ফুলের তোড়া। বিরাট বিরাট। ওর পেছনে পেছনে ছুটে আসছে এক ঝাঁকা মুটে। তার ঝাঁকায় আপেল নাসপাতি কমলালেবু ইত্যাদি ফল। মিলি আর সুকুমার কামরায় তুলে নেয়।

"কী করব আমরা এত ফলমূল নিয়ে?" মিলি জিজ্ঞাসা করে।

"যত ইচ্ছে খাবে। বাকীটা বিলিয়ে দেবে।" জুলি উত্তর দেয়।

"তাহলে এখনি বিলিয়ে দিই।" এই বলে মিলি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের হাতে দুটি তিনটি ফল ধরিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন মুস্তাফী, মিসেস মুস্তাফী, এঁরা তো ছিলেনই, ছিলেন বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব। যশোর থেকেও এসেছিলেন অনেকে।

মুস্তাফীরা সেই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ পরে নিজেদের কামরায় চলে যান। অন্যান্যরাও নেমে যান। তখন জুলি বলে মিলিকে ও সুকুমারকে, "যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। আমি মিলির জন্যে পথ ছেড়ে দিয়েছি। মিলি আমার জন্যে পথ ছেড়ে দিয়েছে। আমার যেদিন বিয়ে হবে সেদিন হিসাব মিলে যাবে। গরমিলটা সাময়িক।"

সুকুমার সুধায় মিলিকে, "এর অর্থ কিছু বুঝলে?"

"পরিষ্কার, জুলির মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে ক'জন!" মিলি হাসে।

"কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না!" সুকুমার বলে।

"বুঝবে একদিন, যদি ওর স্বপ্ন সার্থক হয়।" মিলি সঙ্কেতে বলে।

জুলি বিদায় নিয়ে নেমে যায় ও রুমাল নাড়ে। ট্রেন ছেড়ে দিতে সুকুমার বলে, "তুমি কার জন্যে ওকে পথ ছেড়ে দিলে?"

"সৌম্যদার জন্যে।" মিলি মুখ নিচু করে। চোখে তার জল।

"বুঝেছি। সৌম্যদা মহান। তুমিও মহীয়সী। সোনায় সোহাগা হতো তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে। আমি কি তোমার যোগ্য। আমি যে মাঝারি! কিন্তু আকাশের চাঁদ যেমন দুর্লভ সৌম্যদাও তেমনি। মাটির প্রদীপই সুলভ।" সুকুমার সখেদে বলে।

"যে মানুষ নিজের উদ্যোগে পড়াশুনা চালিয়ে নিজের উদ্যোগে বিদেশে গিয়ে নিজের উদ্যোগে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে সে দেশেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে কি স্বয়ংবরসভায় উত্তীর্ণ হয়নি? আমি কি কৃতী পুরুষের কণ্ঠে মালা দিইনি? আমি ঘরসংসার করতে চাই। আমার পক্ষে মাটির প্রদীপই ভালো।" মিলি তার হাতে হাত সঁপে দেয়।

জুলি যে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে এ কাঁটা সুকুমারের মনে বিঁধে রয়েছে। সে বলে,"তোমাকে কখনো প্রত্যাখ্যানের বেদনা বহন করতে হয়নি, মিলি। তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করি সমবেদনা। এই যে তোমাকে নিয়ে আজ বিলেতের পথে রওনা হচ্ছি এমনি একদিন জুলিকে নিয়েও রওনা হয়েছিলুম, বিয়ের আশায়। কিন্তু বম্বেতে ও আমাকে ছেড়ে সৌম্যদার সঙ্গে পুণা যায়। সে বেদনা কি আমি ভুলতে পারি? তবু আবার ও মেয়ের পেছনে ছুটেছি। আবার সেই বিয়ের আশায়। আবার সেই সৌম্যদার সঙ্গে দেখা। আবার তেমনি ভাঙচি। ভাগ্যিস্ তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। নইলে আমাকে আবার খালি হাতে বিলেতে ফিরে যেতে হতো। তুমি আমার মুখরক্ষা করেছ। তুমি আমার মানরক্ষা করেছ। তুমি যেন ঈশ্বরের প্রেরিত। গডসেণ্ড। জুলির চেয়ে তুমি কোন্ অংশে খাটো? আমি তো মনে করি তুমিই ওর চেয়ে বড়ো। ইতিহাসে তোমারই নাম থাকবে। যদি না জুলি পরবর্তী অধ্যায়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে আরো নাম করে। কোথায় বিপ্লব! ও একটা আলেয়ার পানে ছুটেছে। তেমনি আরেক আলেয়া সৌম্যদা। ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা দেশ যতদিন না স্বাধীন হয়েছে ততদিন ও অবিবাহিত থাকবে। তা হলে জুলির কী আশা! স্বাধীনতা কি কেউ জয় করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে? হতে কতকাল লাগবে! সৌম্যদা

দশবছর অপেক্ষা করতে পারে, জুলি কি ততকাল পারবে? যদি পারে তবে হয়তো একদিন ওর স্বপ্ন সার্থক হবে। আর নয়তো একটা বাজে ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, দেখো। যেমন চেখভের গল্পে হয়।"

মিলি একটু ভেবে নিয়ে বলে, "জুলি বা আমার মতো মেয়ের স্বপ্ন কি একটি মনের মতো বর ও শান্তিময় ঘর? আমাদের স্বপ্ন বিশাল ব্যাপক কর্মক্ষেত্র, মুক্ত পক্ষে অবাধ সঞ্চরণের আকাশ। আমাদের স্বপ্ন আত্ম আবিষ্কার, আত্মবিকাশ। আমরা যখন দেশের স্বাধীনতার বা তার বৈপ্লবিক রূপের ধ্যান করি তখন বর ও ঘর যেন সিন্ধুর মাঝখানে বিন্দু। তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু মহিমা নেই। বিয়ে না হলে নারী অপূর্ণ থেকে যায়, নারীত্বের হানি হয়, আমরা একথা মানিনে। মা না হলে নারীর জীবন অচরিতার্থ এটাও তেমনি অসত্য। কিন্তু বয়স যতই বাড়ছে ততই অনুভব করছি যে পাখীর কাছে আকাশ যেমন আবশ্যক নীড়ও তেমনি প্রিয়। স্বভাবতই মন চাইছে স্থিতি। দেহ চাইছে সঙ্গ। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিলুম না। তুমি আমাকে বাঁচালে। এখন জুলির বাঁচা দরকার। সেও কি বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারবে? দশ বছর! জাতির জীবনে দশটা বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে? বিশেষ করে নারীর জীবনে।"

"বেচারি জুলি ! ওর জন্যে কী আমরা করতে পারি? ও যদি আর কাউকে বিয়ে করতে রাজী হয় তো ছেলের খোঁজ করতে পারি। কিন্তু সৌম্যদাকে পেতে হলে ওকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।" সুকুমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

"যদি না অকস্মাৎ একটা কিছু ঘটে যায়। বিপ্লব কি গণসত্যাগ্রহ কি মিউটিনি। জুলির বিশ্বাস তেমন কিছু ঘটবে ও তাতে তার হাত থাকবে। সে-ই তাকে ঘটাবে। এই নিয়ে সে বর ও ঘর ভুলে থাকছে। কিন্তু কদ্দিন পারবে! সাতবছর আগেও তো মনে হয়েছিল বিপ্লব আসন্ন। সাহেব খুন করলেই সাহেবরা পালাবে। ক্ষমতা দখল করবে বিপ্লবীরা। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। বাংলার ভাগ্যে যা হয়েছে তাতে কি বিপ্লবীদের কোনো ঠাঁই আছে? জেল থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেন ছাড়া পাবার জন্যেই তারা লড়েছিল। আরো একবার লড়তে কে উৎসাহ বোধ করবে? আমি তো নয়। জুলির উৎসাহ আমাকে লজ্জা দেয়। ওকে তো আমার মতো পাঁচ বছর দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। তুমি যদি ওকে সে সময় উদ্ধার না করতে তা হলে ওকেও আমারই মতো দুর্ভোগ পোহাতে হতো। তবে ওর অপরাধটা আমার মতো অত গুরুতর ছিল না। কিন্তু তুমি সৌম্যদার উপর অবিচার করলে, সুকুমার।" মিলি ওর স্বামীকে নাম ধরেই ডাকে। যেমন স্বামী ওকে।

"অবিচার!" সুকুমার চমকে ওঠে। "কেন অবিচার?"

"বম্বেতে জুলির সঙ্গে সৌম্যদার দেখা পূর্ব পরিকল্পিত নয়। সৌম্যদা জুলিকে তোমার কাছ থেকে ভাঙিয়ে নেয়নি। ও ভাবতেই পারেনি যে তুমি জুলিকে নিজের স্বার্থে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছ। ও ভেবেছিল তুমি নিঃস্বার্থ নিঃস্পৃহ পরমহংস। জুলিকে প্রশ্ন করে ও জানতে পারে যে বিলেতে ফিরে যাবার ইচ্ছে ওর একেবারেই নেই। ইংরেজদের উপর ওর ঘেন্না ধরে গেছে। ও দেশে থেকে দেশের মুক্তির কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়। বিবাহে ওর রুচি নেই। বিধবার বিবাহ দেশের লোক শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। সেইজন্যেই তো ওকে পুণার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো। আচার্য কার্বে বিধবাবিবাহের সমর্থক। সৌম্যদা সেটা নিজের স্বার্থে করেনি। ও জানত যে দেশের স্বাধীনতা পেছিয়ে গেলে ওর নিজের বিবাহও পেছিয়ে যাবে অনির্দিষ্টকাল। জুলি বা তার বয়সের একটি মেয়ে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে পারে না। জুলির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা সম্পূর্ণ নিষ্কাম। আমার সঙ্গেও তাই। জুলিও যে ওর জন্যে তোমাকে ছাড়বে এটাও তো সে কোনোদিন প্রকাশ করেনি। এই প্রথম করছে। এর জন্যে সৌম্যদা দায়ী নয়। মিলি না হয়ে জুলি হলেও সে সানন্দে বরকর্তার ভূমিকা নিত। তুমি যদি ওকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানতে তাহলে এটাও জানতে যে ও দেশের স্বাধীনতার জন্যে জান

দিতেও প্রস্তুত হচ্ছে। ও বলে দেশের জন্যে কতক লোককে মৃত্যু বরণ করতে হবে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের মতো মেরে মরতে নয়। ও কি বাঁচবে যে বিয়ে করবে!" মিলির দু'চোখ সজল হয় ।

"সৌম্যদা কিন্তু আগে এ রকম ছিল না, মিলি। বিলেতে ওর সঙ্গে বছর দুই কাটিয়েছি। তখন ও আদর্শ প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। তাঁরা বিবাহ করতেন। তাঁদের পুত্রকন্যা হতো। তপোবনের ঋষিরাই সমাজের পথপ্রদর্শক। সৌম্যদা চেয়েছিল এমন একজনকে যে হতো সেকালের ঋষিপত্নী। বাস করত শহরে নয়, গ্রামে। যে গ্রাম অরণ্যবেষ্টিত। প্রকৃতির কোলে লালিত হতো ওদের সন্তান। গ্রামই তো প্রকৃত ভারত। শহর বিজাতীয়। বিলেতে থাকতেই অলকা বলে একটি মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু ওর আদর্শের প্রেমে নয়। অলকা চায় কলকাতায় ঘরসংসার পেতে নাগরিক সমাজের একজন হতে। ওর বাবা ছিলেন ব্যারিস্টার। সৌম্যকে ও মেয়েটি নিজের ছাঁচে ঢালাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল সৌম্য যেন একটা বিলিতী ডিগ্রী নিয়ে ফেরে। পদস্থ রাজকর্মচারী হয়। নয়তো ব্যারিস্টার। সৌম্যদা তেমন শর্তে বাঁধা পড়তে নারাজ। অপর পক্ষে অলকাও পল্লীবাসিনী ঋষিপত্নী হবে না। প্রেম পরাজিত হয় ভিন্নমুখী জীবনধারার কাছে। এই তো আমি জানতুম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হতেই সত্য ও অহিংসায় সৌম্যদার বিশ্বাস। কিন্তু যতদিন না দেশ স্বাধীন হয়েছে ততদিন ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে এমন কোনো পণ ওকে গার্হস্থ্যবিমুখ করেনি। দশবছর আগে এই তো আমি জানতুম। এখন দেখছি ওর আদর্শ ঋষিদের তপোবন নয়, সন্ন্যাসীদের আশ্রম। স্ত্রী থাকলে সেও হবে সন্ন্যাসিনী। দেশের স্বাধীনতার জন্যে এই পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে যাঁরা প্রস্তুত তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার মতে তাঁদের এই আদর্শ সামাজিক মানুষদের জন্যে নয়।" সুকুমার অনুমোদন করে না।

"অলকার কথা কেউ আমাকে বলেনি। সৌম্যদা তা হলে গৃহস্থ হতে রাজী ছিল, যদি অলকা ওর সঙ্গে গ্রামে গিয়ে নীড় বাঁধত। জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি পার হয়ে যাবার পর ওর মতিগতি বদলে যায়। লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজীর অনুচর হয়ে কারাবরণ করে। মুক্তির পর তাঁরই নির্দেশে হরিজন সেবায় লেগে যায়। তিনিই ওকে পূর্ববঙ্গে ঘাঁটি গাড়তে প্রবর্তনা দেন। লক্ষ্য রাখতে বলেছেন যাতে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটাতে চিড় না ধরে। মহাত্মার আশঙ্কা যে সমস্যাটা তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। নেতারা সবাই তো কলকাতার মোহে মত্ত । মফঃস্বলে তাঁরা সফর করতে আসেন। দু'দিন থাকেন। চরকার মতো ঘোরেন। তারপর মধুচক্রে ফিরে যান। সৌম্যদা মাটি কামড়ে পড়ে আছে । মাঝে মাঝে সেগাঁওতে যায়, পথে কলকাতায় একদিন কি দু'দিন থামে। কাজের জন্যেই। ওর জীবনদর্শন ক্রমে স্টোইক হয়ে উঠছে। সুখ শান্তি ওর জন্যে নয়। ওর জন্যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন। নিজের মুক্তির জন্যে নয়, দেশের মুক্তির জন্যে। তবে ও হাসতে ভুলে যায়নি। খেলাধুলাও করে। যাত্রায় নারদ সাজে। মুসলমানদের নাটকে আলীবাবা। ও গায়ও ভালো। বাঁশিও বাজায়। অথচ খাবে ওই আকাঁড়া চালের ভাত। গান্ধীজীর আশ্রমে ওইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।" মিলি কৌতুকের সঙ্গে বলে।

"সব ভালো যার শেষ ভালো। শেষ ভালো হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা। হবে একদিন তার অভীষ্ট পূরণ। তখন আসবে ঘরসংসার পাতার সময়। আশা করি জুলির সঙ্গেই। লেবার পার্টিতে আমার বন্ধুবান্ধব আছেন। তাঁরা ভারতে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষে। স্বাধীনতা বলতে যদি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বোঝায় তো দশবছর লাগবে না। তার আগেই লেবার গভর্নমেণ্ট আসবে। কিন্তু যুদ্ধকালে নয়। যুদ্ধকালে সর্বদলীয় সরকার। সকলের পক্ষে একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই যুদ্ধকালে ইংলণ্ডের উপর চাপ না দিয়ে ধৈর্য ধরতে হবে। তাহলেও আমি অধ্যাপক ডালটনকে ভারতের জন্য তদ্বির করতে বলব। জানো তো আমি তাঁর ছাত্র। হ্যাঁ, ল্যাস্কির কাছেও পড়েছি।" সুকুমার সগর্বে বলে।

"ভারতের স্বাধীনতা হবে রাজ অনুগ্রহে।" মিলি ঠোঁট ওলটায়।

পরের দিন রেস্তোরাঁ কারের ব্রেকফাস্ট টেবিলে মুস্তাফী দম্পতির সঙ্গে ভোজন। রাত্রে ঘুম

কেমন হলো জিজ্ঞাসা করতে বলেন,"চোখের পাতা এক করতে পারিনি। সাত সমুদ্দর পারে তোরা যাচ্ছিস। তাও যুদ্ধক্ষেত্রে।"

"যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কিন্তু অঘোরে ঘুমোতুম। ভয়ের মাঝখানে পড়লে ভয় চলে যায়। তোমরা দেখবে ইংরেজরা কেমন নির্ভীক। ন'শো বছর আগে নর্মানরা ওদের দেশ আক্রমণ করেছিল। তারাও পরে ইংরেজ বনে যায়। তার পর থেকে আর কেউ ওদের আক্রমণ করেনি। না স্পেনের আর্মাডা। না নেপোলিয়নের আর্মি। এবার কিন্তু হিটলারের জার্মানরা হানা দেবে জলে স্থলে আকাশে। নর্মানের পর জার্মান। ভাবনা করি। ঘুম আসে না।" ক্যাপটেন বললেন।

"আকাশপথে ক'হাজার ল্যাণ্ড করতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে কোতল হবে। জলপথ নিয়েই ভাবনা। কিন্তু আমাদের নেভী ওদের নেভীর চেয়ে প্রবল। ওরা ল্যাণ্ড করার আগেই খতম হবে। বোমাবর্ষণকেই ভয়। তা আমরাও পাল্টা দিতে ছাড়ব না দেখবেন।" সুকুমারের 'আমরা' অবশ্য ভারতীয়রা নয়। সবাই হাসে।

ব্রেকফাস্টের পরে যে যার কামরায় যান। লাঞ্চের পর আবার একত্রভোজন।

"তোমাদের কুশল সংবাদের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকব। এয়ার মেলে চিঠি লিখো। আশাকরি জাহাজের ডাকও বন্ধ হবে না।" মুস্তাফী বললেন।

"জাহাজের ডাকের অন্য ব্যবস্থা হবে। তবে দেরি হতে পারে।" সুকুমার সুনিশ্চিত।

মিলির মা এমন দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকান যেন আর কোনোদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না। ওই শেষ দেখা। বাবা যদিও ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন তবু বাইরে নির্বিকার।

বম্বেতে পৌঁছে টমাস কুকের অফিসে গিয়ে জানা গেল যে জাহাজ যাবে ভূমধ্য সাগর দিয়ে যথারীতি। কারণ ইটালী এখনো যুদ্ধ ঘোষণা করেনি ও ইটালিয়ান জাহাজ নিয়মিত যাতায়াত করছে। সুতরাং সুকুমারের পি. অ্যাণ্ড ও জাহাজ 'স্ট্রাথমোর' তো সুয়েজের পথে যাবেই, ঐ জাহাজও শেষ ব্রিটিশ যাত্রী জাহাজ নয়।

"ওঃ। যা তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিলে তুমি। কী ক্ষতি হতো আরো কিছুদিন বাদে গেলে?" মিলি অনুযোগ করে।

"আহা আমি কী করে জানব যে মুসোলিনি হিটলারের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবে না? সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না।" কৈফিয়ৎ দেয় সুকুমার। "তা ছাড়া তোমার কলেজ তো এর মধ্যেই খুলে গেছে। আরো দেরি করলে ওরা এবছর নেবে না।"

"তা হলে তুমি সত্যিই চাও আমি আরো পড়াশুনা করি?" মিলি শুধায়।

"নিশ্চয় চাই। আধুনিক জগতের কেন্দ্রস্থল হলো লণ্ডন। সেখানে বাস করে তুমি আরো পড়াশুনা করবে, আরো জানবে শুনবে শিখবে। তখন বুঝতে পারবে যে এতদিন যা সত্য ভেবেছ তা সত্য নয়, যা অসত্য ভেবেছ তা অসত্য নয়। তোমার কর্মপদ্ধতি কেন সফল হয়নি তার অর্থ খুঁজে পাবে। বিপ্লব কি চাইলেই হয়? জুলি একটা ভ্রান্তির গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।" সুকুমার আবার জুলিকে স্মরণ করে।

"জুলি তো বলে তুমি একজন এমিগ্রি, তোমার সঙ্গে এসেছি বলে আমিও তাই। বিপ্লবের আগে ভাগেই আমরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছি। আমারও কতকটা সেইরকম মনে হচ্ছে। মা বাবার জন্যে আশঙ্কা হচ্ছে। বিপ্লবী জনতা যদি ওদের বুর্জোয়া বলে শেষ করে না দেয় বিপ্লবী সরকার ওদের লিকুইডেট করবে। আমি দেশে থাকলে আমার নাম ক'রে হয়তো ওঁরা বেঁচে যেতেন। কিন্তু আমি এমিগ্রি বলে উল্টো ফল হবে।" মিলি কাতর হয়।

ওঁদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ডাক্তারকে কেউ মারবে না। দানশীলতার জন্যে ওঁরা বিখ্যাত।

হিন্দু-মুসলমান সবাই ওঁদের চায়। ওঁরা বাঁচবেনই। পিছুটান ছেড়ে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।" সুকুমার বলে।

মিলির বিয়েতে তার দাদা শিবপ্রসাদ উপস্থিত হতে পারেননি। থাকেন তিনি বম্বে প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণপ্রান্তে ধারওয়ারে। উচ্চপদস্থ রেলওয়ে অফিসার। বোনকে বিদায় দিতে বম্বে আসেন। ক্রিকেট ক্লাব অভ ইণ্ডিয়াতে তাঁর বন্ধু জয়ন্ত চক্রবর্তীর স্থায়ী অধিষ্ঠান। দাদা নিজেও সেখানকার সদস্য। দুই বন্ধুতে মিলে ক্রিকেট ক্লাবেই মিলিদের চারজনের বন্দোবস্ত করে দেন।

ছোটবোনের বিয়ে না হলে দাদাও বিয়ে করবেন না, এ রকম একটা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও ছিল তাঁর।মিলি তাঁকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, " দাদা, এবার তোমার পালা। তুমি যদি ঘরে বৌ আনো তো মা বাবা একটু শান্তি পান। বুঝতেই তো পারছ, আমি যাচ্ছি সাত সমুদ্রপারে। যেখানে যুদ্ধ বেধে গেছে। কবে দেখা হবে, আদৌ হবে কিনা কে জানে? আমি না থাকলে তুমিই একমাত্র সন্তান।"

"ছি! অমন কথা বলতে নেই, বোন। দেখা আবার হবেই। লণ্ডনে আমার বন্ধুবান্ধব আছে। ভারতীয় আর ইংরেজ। সবাইকে আমি চিঠি লিখেছি। চিঠিগুলো তোর হাতেই দিচ্ছি। পৌঁছেই ডাকে ছেড়ে দিস্। কিন্তু ভাবনার কথা হচ্ছে পৌঁছবি কেমন করে। যুদ্ধের অবস্থা ঘন্টায় ঘন্টায় বদলাচ্ছে। মুসোলিনি যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে তা হলে ভূমধ্যসাগর দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে কবে যে ইংলণ্ডে পৌঁছবে কে জানে।" শিবপ্রসাদ চিন্তিত হন।

"কেন, কুক তো আমাদের বলেছে এ জাহাজ ভূমধ্যসাগরের পথেই যাচ্ছে।" মিলি সুকুমারকে সাক্ষী মানে।

"কুক কেমন করে জানবে মুসোলিনির মনে কী আছে। কাজেই অতটা আশাবাদী না হওয়াই ভালো। তবে হতাশারও হেতু নেই। পৌঁছে দেখে ঠিকই। ভালোই তো। হানিমুন আরো দীর্ঘ হবে।" শিবপ্রসাদ রঙ্গ করেন।

সুকুমারও সকৌতুকে বলে, "মুন মানে এখানে চাঁদ নয়, মুন মানে মাস। পুরো একমাস যদি জাহাজে কেটে যায় সেটাকে তো দীর্ঘ বলা চলে না।"

"তা হলেই হয়েছে আমার কলেজে ভর্তি হওয়া।" মিলি রাগ করে। "আমি কি তবে বিলেত যাচ্ছি ঘরকন্না করতে? না, আমি ক্যানসেল করব।"

"তুমি না থাকলে আমি একা একা গেরস্থালী করব নাকি? যুদ্ধে নাম লিখিয়ে আমি ফ্রণ্টে গিয়ে লড়ব।" সুকুমার হাসিমুখে বলে।

"কী সর্বনাশ! সেই ভয়ে আমাকে দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হবে?" মিলি আঁতকে ওঠে।

"ক্ষেপেছ? রান্নার পাট ওদেশে খুবই সংক্ষিপ্ত। চল তো আমার সঙ্গে। দেখবে তোমার জন্যে কলেজের দুয়ার খুলে যাবে। স্বয়ং সার জন অ্যাণ্ডারসনকেই ধরব। পুরনো টেররিস্টদের দিকে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।" সুকুমার আশ্বাস দেয়।

"আমি তাঁর সাহায্য চাইব কোন্ মুখে? খবরদার, তুমি ওঁর কাছে যেয়ো না। আমি নিজেই কলেজে গিয়ে সব কথা খুলে বলব।" মিলি দৃপ্ত কণ্ঠে বলে।

ক্যাপটেন মুস্তাফী বলেন, "জাহাজের উপরে তো কারো হাত নেই। সেটা কি ওরা বুঝবে না? আমিও এয়ার মেলে চিঠি লিখে সব কথা খুলে বলেছি।"

"আমিও আমার বন্ধুদের কাছে এয়ার মেলে এই সমস্যার কথা জানিয়ে রাখছি। দেখাই যাক না জাহাজ কোন্ পথে যায়।" শিবপ্রসাদ ভরসা দেন।

মিলির মা মনটাকে বেঁধে শক্ত করেছিলেন। মিলি দেশে থাকলে নির্ঘাত জেল। যাত্রাভঙ্গ করা কিছুতেই নয়। একবার যখন বেরিয়ে পড়েছে তখন এগিয়েই যাক। যা থাকে কপালে। ওর বাপ তো

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অক্ষত ফিরেছিলেন। ভগবান রক্ষা করবেন।

মিলির শেষ অনুরোধ, "মা, এবার দাদার বিয়ে দিয়ো। শুনেছি ও নাকি বম্বেতেই হৃদয় হারিয়েছে। দাদা, শুভস্য শীঘ্রম্।"

।। আট ।।

মণিকা ওইটুকু মেয়ে। ও "জ্যাঠামশায়" বলতে পারে না। তাই ওর মা ওকে শিখিয়ে দিয়েছে সৌম্যকে 'জেঠু' বলে ডাকতে। দীপক কিন্তু 'জ্যাঠামশায়' বলে ডাকে।

"জেঠু", "জেঠু", "জ্যাঠামশায়", "জ্যাঠামশায়।" দূর থেকে সৌম্যকে আসতে দেখে ভাই বোন দু'জনে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে দৌড়য়। সৌম্য মণিকে দুই হাতে তুলে নিয়ে কাঁধে চড়ায়। সেও জেঠুর মাথা চেপে ধরে। দীপক ততক্ষণে জ্যাঠামশায়ের বগল থেকে ঝোলা কেড়ে নিয়ে বগলদাবা করেছে।

"শম্ভুবাবু এসেছেন"। ভিতরে গিয়ে খবর দেয় বেয়ারা।

"শম্ভুবাবু" শুনে যূথিকা মানসের দিকে তাকায়। মানস যূথিকার দিকে। কিন্তু ঝড়ের মতো দীপক ঘরে ঢুকে বলে, "জ্যাঠামশায় কী এনেছে, দ্যাখ। হা হা হা। গণ্ডার। শজারু বানাতে গিয়ে গণ্ডার বানিয়েছে। সাপটা কিন্তু অজগর।"

সৌম্যর কাঁধ থেকে মণি নামে না। নামতে চায় না। সৌম্য ওকে কাঁধে নিয়েই ঘরে ঢোকে। চেয়ারে বসে। ওর মা রাগ করে। জেঠু ওর জন্যে একটা পুতুল এনেছিল, সেটা দিতেই নামে।

"দত্তবিশ্বাস বম্বে থেকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে যে ওরা নিরাপদে পৌঁছেছে। তোমাকে জানাতে বলেছে।" মানস বলে।

"আমি মুস্তাফীদের ওখান থেকেই জেনেছি। ওঁরাও প্রতিষ্ঠানে টেলিগ্রাম করেছেন ও আমাকে জানাতে বলেছেন।" সৌম্য বলে।

"আমিও বঁ ভোয়াজ জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিলুম কুকের কেয়ারে। বম্বেতে। যাতে জাহাজে ওঠার আগে পায়।" মানস আরো বলে।

"কুকের কথায় মনে পড়ল বছর ছয়েক আগে জুলিকে নিয়ে সুকুমার আর আমি ওদের ওখানে যাই। জুলি ওর প্যাসেজ ক্যানসেল করে। সুকুমার তো আমাকেই দোষ দেয়। আমি ওকে বুঝিয়ে বলি যে জুলি কারাগার থেকে মুক্ত হলেও সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত হয়নি। ওর দাদারা ওকে যে নির্দেশ দেবে ও বিলেতে গিয়েও সেই নির্দেশ পালন করবে। তখন তো আবার সেই কারাগার। তার চেয়ে ছেড়ে দাও আমার হাতে। ওকে আমি পুণায় নিয়ে যাব। আমাকে ওখানে থাকতে হবে গান্ধীজীর কাছাকাছি। জুলি থাকবে আমার কাছাকাছি। ওকে দেব মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ও পড়াশুনা করবে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হবে। গান্ধীজী জেল থেকেই হরিজনদের সেবা করে যাচ্ছেন। আমি ছাড়া পেয়ে বাইরে থেকে ওঁর কাজে সাহায্য করেছি। জুলি যদি আমাদের কাজকর্ম দেখে তবে ওরও অন্তঃপরিবর্তন হবে। বিয়ের সময় এখন নয়। বিলেতে গেলেই যে ও বিয়েতে রাজী হবে তা নয়। সুকুমার যেন ধৈর্য ধরে।" সৌম্য শোনায় স্মৃতিকথা।

"ওর মা তখন ওর সঙ্গে ছিলেন না?" জিজ্ঞাসু হয় মানস।

"না। সুকুমারকে উনি বিশ্বাস করতেন। তা ছাড়া উনি তো ধরে নিয়েছিলেন যে ওটা বিবাহের পূর্ব শর্ত। পরে আমি তাঁকে চিঠি লিখতেই তিনি সমর্থন করেন। জুলির সঙ্গে যথেষ্ট ট্রাভেলার্স চেক ছিল। পরে ওর মা আরো টাকা পাঠান। কিন্তু শেষপর্যন্ত জুলির মন টেকে না। সন্ত্রাসবাদটা ও সত্যি কাটিয়ে ওঠে। দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে। জুলি মায়ের কাছে ফিরে যায়। সরকার বাধা দেয় না।

আমিও গান্ধীজীর পিছু পিছু ওয়ার্ধা যাই। সেখান থেকে সেগাঁও। জুলির দায় থেকে আমিও মুক্ত। আমার তত্ত্বাবধান থেকে জুলিও মুক্ত। ওদিকে সুকুমারও বিবাহের পূর্ব প্রস্তাব থেকে মুক্ত।'' সৌম্য মুক্তির সমাচার শোনায়।

''কিন্তু জুলিকে কারামুক্ত করে ও যে উপকার করেছিল সেটার পরিবর্তে ওর তো কিছু পাবার কথা ছিল। ও কি এতদূর এসেছিল অমনি ফিরে যেতে?'' মানস সুধায়।

'' ওটা বন্ধুকৃত্য। বিবাহ ওর প্রতিদান নয়।'' সৌম্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

'' সব ভালো যার শেষ ভালো। দত্তবিশ্বাসকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হল না। কিন্তু হতেও তো পারত। তখন বন্ধুকৃত্য বলে কি করে ওকে সান্ত্বনা দিতে? তোমার উপরে ও রীতিমতো বিরূপ। তুমি ওকে একবার শিশুপাল করেছিলে, কিন্তু নিজে রুক্মিণীকে বিয়ে করোনি। আবার শিশুপাল করলে, এবারও রুক্মিণীকে বিয়ে করার নামগন্ধ নেই। তবে শিশুপাল এবার শুধু হাতে ফিরে যায়নি। রুক্মিণীর সখীকে বিয়ে করে নিয়ে গেছে। জুলির মা যা চেয়েছিলেন তা হলো না। মেয়ের সামনে বন্দীশিবিরের বিপদ। সে নিজেও বিবাহবন্ধনের পরিবর্তে কারাবন্ধন পছন্দ করে। পাগলীর ধারণা ফরাসী বিপ্লবে যেমন বাস্তিলের পতন এদেশেও তেমনি বক্সার পতন ঘটবে। জনতা গিয়ে পাঁচিল ভেঙে উদ্ধার করবে বন্দীদের। জুলি পড়াশুনা কিছু কম করেনি। কিন্তু সমস্তই একতরফা। বিপ্লবের তত্ত্ব ও ইতিহাস বা পুরাণ। পুরাণকে ইতিহাস বলে চালানো কেবল প্রাচীন হিন্দুদের একচেটে নয়। আধুনিক বিপ্লববাদীদেরও পুরাণ তৈরির উপর আগ্রহ। ট্রট্স্কি বলে আস্ত একটা চরিত্রকে ইতিহাস থেকে বেবাক মুছে ফেলা হয়েছে স্টালিনের মহিমা প্রচার করতে। জুলিকে তুমি পুণা নিয়ে গেলে সন্ত্রাসবাদের মোহ থেকে মুক্ত করতে। সেটা দত্তবিশ্বাসকে দিয়ে হতো না। কলকাতায় ফিরে এসে ও আবার সেই পুরাতন চক্রে ভিড়ে যায়। এবারকার তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাভূমি মার্কস কথিত সুসমাচার। সন্ত্রাসবাদীরা আর ক'টা মানুষ মারত! এরা তো শ্রেণীকে শ্রেণী লিকুইডেট করবে।'' মানস শিউরে ওঠে।

''তার আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে হবে। সে কাজটা যদি ওরা নিষ্পন্ন করার আগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাই নিষ্পন্ন করে তা হলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাই জনগণের নির্বাচিত সরকার গঠন করবে। সে সরকার যতদিন না জনগণের আস্থা হারাচ্ছে ততদিন ফরাসী বিপ্লব বা রুশ বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না। মাঝখানকার এই যে অধ্যায়টা এটাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বিপ্লব যদি পরাধীন ভারতের মাটিতে ঘটে তবে সেটা হবে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব। তাতে গান্ধী, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদেরও ভূমিকা থাকবে। ভূমিকা থাকবে জবাহরলাল, সুভাষচন্দ্র, জয়প্রকাশ নারায়ণেরও। মার্কস লেনিনবাদীরা এঁদের পর বিপ্লব করতে গেলে দেখবেন যে বিপ্লবের যা প্রেস্টিজ তা এঁরাই অর্জন করে বসে আছেন। এঁদের বঞ্চিত করতে হলে পৃথকভাবে বিপ্লব ঘটাতে হয়। সেটা কি এঁদের সাধ্যে কুলোবে? তাই এঁরা কংগ্রেসের ভিতরে ঢুকেছেন। কিন্তু তাতেও কি এঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে? আসল সিদ্ধান্তটা তো গান্ধীজীর হাতে। তিনি এগিয়ে না এলে কেউ তাঁর আগে এগোতে সাহস পাবে না। যদি সাহস পায় তবে অসময়ে ধরা পড়বে। জনগণ সাড়া দেবে না। গান্ধীজীর যখন সিদ্ধান্ত নেবার দিন আসবে তখন তিনিই তো সংগ্রামের একমাত্র পরিচালক। সফল হলে তাঁরই তো একচ্ছত্র নেতৃত্ব। বিফল হলে অবশ্য অন্য কথা। সেক্ষেত্রে মার্কসপন্থী বিপ্লবীদের একটা ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। সফল হলে তাঁদেরই একচ্ছত্র নেতৃত্ব হবে। বিফল হলে তাঁরাও নেতৃত্ব হারাবেন। সফল যে তাঁরা হবেনই এটা যুক্তির কথা নয়, বিশ্বাসের কথা।'' সৌম্য নীরব হয়।

এমন সময় মধ্যাহ্নভোজনের আহ্বান আসে। ছোটদের খাওয়া হয়ে গেছে। এখন বড়োদের পালা।

''মিলির তো একটা হিল্লে হলো,'' যূথিকা বলে, ''এবার জুলিরও একটা হিল্লে হয় না? নিজের ঘরসংসার হলে ও মা দুর্গার মতো তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মা কালীর মতো মার মার কাট কাট করে

বেড়াবে না।"

"ওর মায়েরও সেই বক্তব্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা!" সৌম্য সায় দেয়।

" শুনবে, যদি একজন তপস্বী তপোভঙ্গ করেন।" ইঙ্গিত করে যূথিকা।

" করবেন যখন তপস্যার ফল ফলবে। দেশের স্বাধীনতা। সেই স্বর্গে দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামীদের ইন্দ্রত্ব। তিনি তখন সরে দাঁড়াবেন।" সৌম্য আশা দেয়।

" কেন? কেন? তিনি কি ইন্দ্রত্ব কামনা করেন না।" যূথিকা আশ্চর্য হয়।

"ইন্দ্রকেও প্রয়োজনে বজ্র প্রয়োগ করতে হয়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের হাতে শাস্তির ক্ষমতাও থাকবে। যাঁরা সৈন্য পুলিশ ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক তাঁদের কর্তব্য রাষ্ট্রর দায়িত্ব না নেওয়া। গান্ধীজী কংগ্রেসকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুমতি দেবার আগে আপনি কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। কংগ্রেসের লক্ষ্য কেবল স্বাধীনতা অর্জন নয়, শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠান। স্বাধীনতা অর্জনে অহিংসাই যথেষ্ট, কিন্তু শাসনের কাজও যে সৈন্য পুলিশ জেল আদালত বিনা চলে একথা কংগ্রেস নেতারা মেনে নিতে নারাজ। গান্ধীজীও বোঝেন যে সেটা আপাতত অবাস্তব। কিন্তু সে আদর্শ তো তিনি ত্যাগ করবেন না। একা একাই যতদূর পারেন এগোবেন। আমিও তাঁর সঙ্গে পা মেলাব।" সৌম্য খুলে বলে।

" অবাস্তব বলে অবাস্তব!" মানস তার অভিজ্ঞতা থেকে বলে। "শাসনের দায়িত্ব নিলে শাসনের ক্ষমতাও হাতে থাকা চাই। তবে ক্ষমতা আছে বলে বেহিসাবীভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। গণতন্ত্রে হিসাবনিকাশের দায় আছে। পার্লামেন্টের কাছে। ইলেকটোরেটের কাছে। ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চতর আদালতের কাছেও। স্বাধীনতার পরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করতে হবে। কংগ্রেস নেতারা তাই সংবিধান সভার দাবী তুলেছেন।"

যূথিকার জ্ঞাতব্য ছিল জুলির ভাগ্যে বিবাহ আছে কি না। সে বলে, "তা হলে, দাদা, তুমি স্বাধীনতার পরেও তোমাব তপস্যা চালিয়ে যাবে? আশ্রমেই তোমার অবশিষ্ট জীবন কাটবে?"

"বুঝেছি তুমি যা শুনতে চাও।" সৌম্য হেসে বলে, " না, স্বাধীনতার পরে তেমন কোনো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আমার নেই। লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেবার আগে তো আমি বিবাহের জন্যে দ্বার খোলা রেখেছিলুম। অলকনন্দা যদি গ্রামে গিয়ে সংসার পাততে রাজী হতো আমিও তাকে বিয়ে করতে রাজী ছিলুম। মানস তোমাকে বলেনি ওকথা? মানস, তোমার মনে পড়ে অলকাকে?" সৌম্য যূথিকাকে ছেড়ে মানসকে সুধায়।

"কই, আমাকে তো উনি বলেননি।" যূথিকা উত্তর দেয়।

"মনে পড়ে বইকি। সার অজিত মজুমদারের কন্যা অলকনন্দা। তুমি ওকে গ্রামিকা করতে চেয়েছিলে। আর ও চেয়েছিল তোমাকে নাগরিক করতে। আমি তখন ছিলুম অলকনন্দারই পক্ষে। কারণ আমি ছিলুম আধুনিকতার পক্ষে। ইতিমধ্যে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামের পক্ষপাতী হয়েছি। আধুনিকতার সে জলুসও আর নেই, সে আবার এক মহাযুদ্ধ বাধিয়ে বসেছে। আমার এখন অর্জুনবিষাদ।" মানস গীতার আশ্রয় নেয়।

"অর্জুনবিষাদ।" সৌম্য জিজ্ঞাসু হয়।

"জার্মানীতে আমি কত সুন্দব সুন্দর জায়গা দেখেছি। কত অজানা অচেনা লোকের কাছে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি। সবাই তো নাৎসী নয়, কিন্তু সবাই হচ্ছে জার্মান। নাৎসীদের বিনাশ করতে গিয়ে জার্মানদের নির্বিচারে বিনাশ করতে হবে। ধ্বংস করতে হবে তাদের যুগ যুগান্তরের শিল্পকীর্তি। কেমন করে আমি শহরকে শহর গুঁড়িয়ে দেব? পরিবারকে পরিবার উড়িয়ে দেব? তেমন বাঁচা কে বাঁচতে চায়, যে বাঁচার শরিক জার্মান জাতি নয়? যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু যখনি মনে

পড়ে যায় ডাক্তার নয়মান বা ফ্রাউ নয়মানের মুখ বা তাঁদের ভাই হাইনরিখের মুখ তখনি অনিচ্ছায় অন্তর ভরে যায়। আমার বিশ্বাস হয় না যে ওঁরা সবাই নাৎসী। হতে পারে হাইনরিখ্ এখন কনসক্রিপ্ট। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু ওর বুড়ো বাপ মার বা ছোট ভাগনে ভাগনীর কি দোষ! কেন আমি তাঁদের বোমা দিয়ে বধ করব? শত্রু বলে? বালবৃদ্ধ বনিতাও শত্রু? হিটলার অবশ্য বলছে টোটাল ওয়ার। কিন্তু আমরা তো তার বিপরীতটাই বলি। কার্যকালে একই রকম দাঁড়ায়।" মানস মর্মবেদনায় অভিভূত হয়।

সৌম্য তা শুনে বলে, "তুমি অর্জুন হতে পারো, আমি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নই। কৌরবদের হারিয়ে দিতে হলে কৌরবদের মতো নির্বিবেক হতে হবে এ শিক্ষা আমার নয়। যুদ্ধে নামলে মানুষ বিচার বিবেক প্রজ্ঞা সব কিছুর কাছ থেকে বিদায় নেয়। বর্বরতায় শত্রুকেও ছাড়িয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও তার স্বভাবের পরিবর্তন হলো না। বিজ্ঞান মানুষকে সভ্যতর করেছে না অসভ্যতর করেছে যুদ্ধকালে সেটা ধরা পড়ে যায়। উপরে উপরে সভ্য, ভিতরে ভিতরে অসভ্য, এই হচ্ছে ইউরোপের পথ। ভারতও কি এই পথ ধরবে? অন্তত একটা দেশও কি এ জগতে থাকবে না যে বালবৃদ্ধ বনিতাকে নির্বিবেকভাবে হত্যা করতে অস্বীকার করবে? না হয় নাই বা হলো জয়।"

"সে কি কথা। জয় না হলে যে সর্বনাশ! হিটলার তার শত্রুদের কাউকে আস্ত রাখবে না। যারা অহিংস প্রতিরোধ করবে ভাবছে তাদেরও মেরে শহীদ করে দেবে। নৈতিক জয় নিয়ে তুমি সুখী হতে পারো সৌম্যদা, আমি কিন্তু সুখী হতে পারিনে। অথচ জার্মানদের সবাইকে আমি নাৎসী বলে উজাড় করতে পারিনে। এখানেও সেই নীতির প্রশ্ন। যুদ্ধ করতে হবে, হিটলারকে হারাতে হবে, অথচ যারা নাৎসী নয় তাদের বাঁচাতে হবে। কী করে এটা সম্ভব? গীতায় এর উত্তর নেই।" মানস উত্তর খোঁজে।

"এ সমস্যা তো গীতার যুগে ছিল না। তখন যুদ্ধ হতো লোকালয়ের বাইরে এক মাঠে বা ময়দানে। বালবৃদ্ধ বনিতা সেখানে থাকত না। অসামরিক পুরুষরাও না। লড়াই হতো শস্ত্রধারীর সঙ্গে শস্ত্রধারীর। বিষাদ সেক্ষেত্রে হৃদয়দৌর্বল্য। কিন্তু একালের যুদ্ধ তো সিভিল পপুলেশনকেও মেরে সাবাড় করে। দুই পক্ষই এটা মেনে নিয়েছে। একালের যুদ্ধ কাউকেই রেহাই দেয় না। না শিশুকে, না স্ত্রীজাতিকে, না অসামরিক পুরুষকে। মানুষ যদি এর থেকে নিবৃত্ত না হয় তো সভ্যতার নিদর্শন বিশেষ কিছু টিকে থাকবে না। গত মহাযুদ্ধের পর সাহিত্যের বা সঙ্গীতের বা চিত্রকলার বিকাশ যেটুকু দেখছ সেটুকু তার নিছক নূতনত্ব। নূতন পুরাতন হলে তার দিকে ফিরে তাকাবে কে? যদি না থাকে চিরন্তনের ছাপ। কোথায় কতটুকু তা দেখছ? বিজ্ঞান আর মারণাস্ত্র ছাড়া গর্ব করবার মতো আর কি আছে? গণতান্ত্রিক জীবনধারাও তো যুদ্ধকালে সংকীর্ণতর হয়।" সৌম্য খুঁত ধরে।

"কিন্তু একপক্ষকে বাধা দেবার জন্যে আরেকপক্ষ যদি না থাকে, যদি অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ে তবে অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড এক এক করে তাদের অস্তিত্ব হারায়। কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে হয়। নইলে ভারতও একদিন নাৎসী পদানত হবে। অর্জুনকে যুদ্ধ করতেই হবে, সৌম্যদা। ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে না হোক হোম ফ্রন্টে। তোমার অহিংসা তখন কোন্ কাজে লাগবে?" মানস সংশয়ান্বিত।

" আমরা যদি আমাদের অহিংস পদ্ধতির সংগ্রামে ব্রিটিশ রাজকে অচল করতে পারি। তবে নাৎসী রাজকেও অচল করতে পারব। মারতে মারতে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু সহযোগিতা পাবে না। নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের মতো হিটলারের ভারত অভিযানও ব্যর্থ হবে। আমরাই আমাদের ঘরবাড়ী দোকান বাজার ক্ষেত খামার দগ্ধ করে ওদের বঞ্চিত করব। আমাদের ক্ষতি যা হবে তা পুষিয়ে যাবে। বিরাট দেশ, তার বিশাল অভ্যন্তর। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদের মতো ওরাও ভিতরে ঢুকতে সাহস পাবে না। পাছে পেছনের রাস্তা কাটা যায়। নাৎসীরা কখনো অহিংস প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি।

যদিও অসিয়েটস্কির মতো শান্তিবাদী জার্মানীতে জন্মেছেন। আমরা যদি অন্তরে নির্ভয় হই কে আমাদের পদানত করতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরও হতে হবে। খাদ্য আর বস্ত্র এ দুটিতে আত্মনির্ভর হবে প্রত্যেকটি গ্রাম। গঠনকর্মের উপর সেইজন্যে আমরা এতটা জোর দিই। ওটাই আমাদের দেশরক্ষার প্রস্তুতি। যে দেশরক্ষায় সর্বসাধারণ অংশ নিতে পারে। কেবল মুষ্টিমেয় পেশাদার সৈনিক নয়। অথবা একরাশ অনিচ্ছুক কন্‌সক্রিপ্ট নয়।" সৌম্য অবিচলিত কণ্ঠে বলে।

জুলির বিয়ের কথাটা পাড়বার অবকাশ পায় না যূথিকা।

আহারের পর আরাম। মানস বলে, "আমি একটু গড়াতে চাই। তুমি চলো আমার শোবার ঘরে বসে গল্প করবে। তোমাকে দেওয়া হবে একটা ডেক চেয়ার।"

সৌম্য বলে, "দুপুরের খাওয়ার পর আমিও একটু গড়াই।"

"বেশ তো, তোমার যদি অসুবিধে না হয় তবে তুমি আমার ক্যাম্প খাটে শুতে পারো। ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসব আমি।" মানস প্রস্তাব করে।

সৌম্য লক্ষ করে যে মানস ক্যাম্প খাটে শোয়। তাতে গদীর বদলে একটা চাদর পাতা।

"কবে থেকে এই কৃচ্ছ্রসাধনা শুরু?" সৌম্য জানতে উৎসুক।

"আমার জীবন শূন্য হয়ে গেছে যেদিন, সেদিন থেকে।" মানস নিষ্প্রাণভাবে বলে। সৌম্য বুঝতে পারে। দীপকের ভাই রূপক আর নেই। সে "আহা" করে ওঠে।

"ভাই সৌম্যদা, আমি যে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিনে। আমার সব সময় মনে হচ্ছে ওর তো যাবার কথা ছিল না, ও গেল কেন, গভীরতর কারণটা কী।" মানস প্রশ্ন করে।

"এল কেন আর গেল কেন, এই দুই প্রশ্নের উত্তর তো আদিকাল থেকেই খোঁজা হচ্ছে, ভাই। এখনো কেউ নিশ্চিত উত্তর পায়নি। পাবে কী করে? মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি সীমাবদ্ধ। সত্যের উচ্চতম স্তরে পৌঁছতে হলে জ্ঞানবুদ্ধিই যথেষ্ট নয়। তার জন্যে চাই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। যার জন্যে চাই সব মানুষকে ভালোবাসা, সব প্রাণীকে ভালোবাসা। প্রেমের গভীরতম স্তরে যদি কেউ পৌঁছয় তবেই সত্যের উচ্চতম স্তরে পৌঁছতে পারে। সে রকম সাধক বিরল। তাঁরাই ভেদ করেছেন জন্ম মৃত্যুর দুর্ভেদ্য রহস্য। জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা মৌন থাকেন। কিংবা উত্তর দেন, ওপারে না গেলে ওপারের সত্য এপার থেকে প্রতিভাত হয় না। ওপার বলে কিছু আছে যদি মানো তবে ওপারে গেলেই তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। নিশ্চিত উত্তর। ওপারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় যদি থাকে তবে অবশ্য অন্য কথা। সাধারণ লোকের সংশয় নেই। তাই তারা বিশ্বাস করে ভগবান দিয়েছিলেন, ভগবান নিয়ে গেলেন। কিংবা পূর্বজন্মের কর্মফলে এসেছিল, কর্ম ফুরিয়ে গেল, তাই চলে গেল। কিংবা যার যতদিন আয়ু তার ততদিন স্থিতি। ললাটলিখন।" সৌম্য তার বন্ধুকে শোনায়।

মানস মন দিয়ে শোনে। চোখ বুজে থাকে। রূপককে স্মরণ করে। ফুলের কুঁড়ির মতো অকালে ঝরে পড়ল। এর একটা জৈব ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু অন্তর চায় গভীরতর ব্যাখ্যা।

"ও বোধ হয় বলতে এসেছিল যে, বাবা, তুমি কি জানো তুমি কেন এসেছ, কী তোমার প্রকৃত কাজ, সে কাজ না করে অকাজ করছ না তো? তোমাকে যে জীবন দেওয়া হয়েছে তা কি ব্যক্তিগত সুখের জন্যে? না মহত্তর কল্যাণের জন্যে? তুমি কেবল পদোন্নতির চিন্তায় মগ্ন থেকেছ। দারুণ আঘাত না পেলে তুমি জাগতে না। সত্যি, আমার পতন হতে যাচ্ছিল। দেখতে আরোহণের মতো। আসলে অবরোহণ। আমি নিজেই অশান্ত বোধ করছিলুম আমার উচ্চাভিলাষ আমাকে কোন্ পাতালে নিয়ে যাচ্ছে অনুভব করে। আমার অবরোহণ রোধ হয়েছে। কিন্তু আমার আর এ চাকরি ভালো লাগছে না। এটা আমার স্বধর্ম নয়। তুমি ভালো করেই জানো কেন, কার জন্যে, কোন্ অবস্থাচক্রে আমি এ পথে পদার্পণ করেছিলুম। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বদলে গেছে। আমাকে তার ভার নিতে হয়নি। তা হলে

কেন আমি অতীতের জের টেনে যাচ্ছি? আমি চাই নতুন করে শুরু করতে।" মানস বলে আকুল হয়ে।

"কিন্তু ইতিমধ্যে তুমি বিবাহ করেছ, তোমার পুত্রকন্যা হয়েছে, তাদের প্রতি কি তোমার কোনো কর্তব্য নেই? তাদের বাঁচবার একটা বিকল্প উপায় খুঁজে বার করো। সেটা এই যুদ্ধের বাজারে আরো দুরূহ। যেটাকেই জীবিকা করবে সেটাই পরধর্ম। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। তা বলে কি সপরিবারে নিধনং শ্রেয়ঃ? আমি যে বিয়ে করিনি সেটা এইসব ভেবেই।" সৌম্য তার আপনার কথা বলে।

"যে ব্যক্তি সব মানুষকে ভালোবাসবে, সব প্রাণীকে ভালোবাসবে, সে কি একটা নারীকে ভালোবাসবে না! ভালোবাসলে বিয়ে করবে না? বিয়ে করলে সন্তানের জনক হবে না? আমি আমার স্বভাবের অনুসরণ করেছি। যূথিকাও তার। আমাকে বিয়ে করে ও ত্যাজ্যকন্যা হয়েছে, জানো? অত বড়ো ত্যাগের উপরে আরো বড়ো ত্যাগ কি চাপানো উচিত? আমি যদি এমন কোনো বিকল্প জীবিকা খুঁজে না পাই, যেটা পরধর্ম নয়, তা হলে ও হবে ভিখারী শিবের অন্নপূর্ণা। একালে তার মানে ওকেই পরের বাড়ী রাঁধুনীর কাজ নিতে হবে। ও আমাকে অভয় দিয়ে বলেছে ও কিছু না কিছু রোজগার করবেই। শুনে আমি আরো ভয় পাই। না, ওটা একটা সমাধান নয়। নিজের বিবেককে নির্মল রাখব বলে স্ত্রীর বিবেককে বন্ধক দিতে পারিনে। সৈরিন্ধ্রী পরের গৃহে থাকলে কীচকও থাকে। অথচ কীচকবধের জন্যে ভীম নেই। আমার এই সাজানো সংসারে মৃত্যু হানা দিয়েছে, সেই শোকে অন্ধ হয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিলে সংসারটাই তছনছ হবে, সৌম্যদা।" মানস উদ্বিগ্ন হয়ে বসে।

"আমার মতে দুটোই বাড়াবাড়ি। চাকরি ছেড়ে দেবার উপযুক্ত কারণ যেখানে নেই সেখানে সেটা বাড়াবাড়ি। অপর পক্ষে, উপযুক্ত কারণ যেখানে আছে সেখানে অনিশ্চিতের ভয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাটাও বাড়াবাড়ি। সেক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতেই হবে, যা থাকে কপালে। ইতিমধ্যে যূথিকাকে তৈরি করে নাও। সেবাপ্রতিষ্ঠান চালাবে। খাদি ভাণ্ডারের ভার নেবে। কিছু না হোক টিউশনি করবে। ও তো ভালো পিয়ানো বাজায়। ওটাই ওর লাইন।" সৌম্য পথ দেখায়।

মানস চিন্তা করে। বলে, "ছেলেমেয়েরা একটু বড়ো না হলে ওদের মা কোনোটাতেই মন দিতে পারবে না। মন পড়ে থাকবে বাড়ীতে। ওমন কাজ চাই যা বাড়ীতে বসেই করা যায়। কিন্তু চরকা কেটে তো দিনে আট আনার বেশী হয় না।"

"তুমি কী করে জানলে যে আমি এখন এই সমস্যা নিয়েই গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি? তিনিই ডেকেছেন। মজুরি আরো বাড়াব কী করে? পড়তায় পোষাবে কেন? লোকে খাদি না কিনে মিলের কাপড় কিনবে। একটা মজার কথা শুনবে? আমার কাটুনীরাই আমার কাছ থেকে মাসে পনেরো টাকা গুনে নেয়, নিয়ে মিলের কাপড় কেনে। নিজেদের হাতে কাটা সুতোর খাদি নিজেরাই পরবে না। বাপু এই নিয়ে ঘোরতর চিন্তিত। দেশের স্বরাজ হয়তো বিঘ্নিত হবে না, কিন্তু সে স্বরাজ কি জনগণের স্বরাজ হবে, না বড়ো বড়ো কলওয়ালাদের রাজ হবে?" সৌম্যও ঘোরতর চিন্তিত।

"ওঃ তুমি তা হলে সেগাঁও যাচ্ছ? ফিরে এসে বলবে তো ওখানকার হালচাল। খবরের কাগজে যেটুকু লেখে সেটুকুতে মন ভরে না। আমার তো ইচ্ছে সোজাসুজি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার নিজের প্রশ্নের উত্তর চাওয়া। নচিকেতার প্রশ্নই আমার প্রশ্ন। জানি তিনি যমরাজ নন, সেগাঁও নয় যমরাজ্য, তবু মর্ত্যলোকে আর কে আছেন যিনি আমাকে আমার সংশয়ে নিশ্চিতি দিতে পারেন? তাছাড়া এটাও আমার জিজ্ঞাসা যে দেশ যখন দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, সত্যাগ্রহীদের শিবিরে আর সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরে, তখন আমার মতো ব্যক্তির স্থান কোন্ শিবিরে? আমি কি তোমাকে জেলে পুরব নাকি?" মানস শিউরে ওঠে।

"তোমার কর্তব্য হবে আমাকে সর্বাধিক দণ্ড দেওয়া, আর নয়তো নিজে পদত্যাগ করা। জজ ব্রুমফিলড্‌কে যা বলেছিলেন গান্ধীজী ১৯২২ সালে। কিন্তু এর জন্যে সেগাঁও যাবার দরকার কী? বাপু

তো গান্ধী সেবাসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশে আসবেন, কথাবার্তা চলছে। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা সে সময় করা যেতে পারে। তাড়া কিসের?" সৌম্য ভরসা দেয়। "কিন্তু নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর যম ভিন্ন আর কে দিতে পারবেন? মহাত্মাও যমের অধীন।"

আবার ওরা গান্ধীজীর প্রসঙ্গে ফিরে আসে। মানস জানতে চায়, "মহাত্মাজীর সঙ্গে কি তোমার কেবল চরকার অর্থনীতি নিয়ে কথাবার্তা হবে? ওর চেয়ে সীরিয়াস কোনো বিষয় নিয়ে নয়?"

"ওর চেয়ে সীরিয়াস আর কি হতে পারে, মানস?" সৌম্য আবেগের সঙ্গে বলে, "বুদ্ধকে অভিভূত করেছিল মানুষের জরা ব্যাধি মৃত্যু। গান্ধীজীকে অভিভূত করেছে মানুষের দীনতা হীনতা অধীনতা। আপাতত ভারতের স্বাধীনতাই তার লক্ষ্য। কিন্তু ভারত বলতে ভারতের দীনহীনদেরও বোঝায়। তাদের দীনতা দূর হবে কী করে, যদি সবাইকে কাজে লাগিয়ে না দেওয়া যায়? আর, সবাইকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া যাবে কী করে? যদি তাদের হাতে চরকা বা তারই মতো সহজ সুলভ হাতিয়ার ধরিয়ে না দেওয়া যায়? কলকারখানার কাজ শতকরা পাঁচজন কি দশজনকে সক্রিয় রাখতে পারে, কিন্তু আর-সবাই তো নিষ্ক্রিয় থাকবে। বিদেশী সরকার সেই নিষ্ক্রিয় জনতাকে আহার জোগাতে বাধ্য নয়। তারা দুর্ভিক্ষে মরলে বিদেশীর আসন টলে না। কিন্তু স্বদেশী সরকারকে সক্রিয় নিষ্ক্রিয় নির্বিশেষে সবাইকে অন্ন জোগাতে হবে। কেউ দুর্ভিক্ষে মরলে সরকারের আসন টলবে। যাদের আমরা খাওয়াব তাদের কি আমরা বসিয়ে রেখেই খাওয়াব? না, যাদের আমরা খাওয়াব তারা আমাদের পরাবে। আমরা জোগাব খাদ্য, ওরা জোগাবে খাদি। কেউ অনাহারে থাকবে না, কেউ নিষ্কর্মা হবে না। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ ওরা আমাদের বেশীর ভাগ লোককে অনাহারে রেখেছে বা মরতে দিয়েছে। তাদের হাতে কাজ নেই, তাদের কাজ কেড়ে নিয়েছে বিদেশী কলকারখানার শ্রমিক। বিদেশীর জায়গায় স্বদেশী কলকারখানা হলে যে তাদের দুঃখ দূর হবে তা নয়। তারা যে তিমিরে তারা সে তিমিরে। সেইজন্যেই তো চরকার অর্থনীতি।" সৌম্য যতদূর বোঝে।

মানস মন দিয়ে শোনে ও ভাবে। "এ তো গেল দীনদের দীনতা দূর করার উপায়। হীনদের হীনতা দূর হবে কী করে?"

"সেটা আরো কঠিন, আরো সময়সাপেক্ষ। হিন্দুসমাজের বর্ণবিন্যাস এমনভাবে হয়েছে যে সব চেয়ে দরকারী কাজ যারা করে তারাই সব চেয়ে হীন। তারা যদি দেশ ছেড়ে পালায় বা একধার থেকে মুসলমান হয়ে যায় তা হলে হিন্দুসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। আর হিন্দুসমাজ মানে তো দেশের অধিকাংশ লোকের সমাজ। তাদের পতন হলে তারা আর সবাইকে টেনে নামাবে। তখন আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। গান্ধীজী তাই বর্ণগর্বিত হিন্দুদের অন্তঃপরিবর্তনে তৎপর হয়েছেন। ইংরেজের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সেইজন্যে ইংরেজবিরোধী রাজনীতিকরা এর মর্ম বোঝেন না। কিন্তু দীনের দীনতা দূর করার মতো হীনের হীনতা দূর করাও গান্ধীজীর জীবনের উদ্দেশ্য। হরিজন যাদের তিনি বলছেন তাদের জন্য তিনি গোড়া থেকেই সীরিয়াস। তবে হরিজন আন্দোলনটা বেশীদিনের নয়। পুণায় যখন তিনি হরিজন আন্দোলনের সূচনা করেন তখন আমিও তাঁর একজন অনুগামী হই। এ সমস্যা দু'শো বছরের চেয়ে অনেক বেশী পুরনো। ভারত উদ্ধার যত না কঠিন তার চেয়ে বহুগুণ কঠিন হরিজনদের উদ্ধার। বর্ণহিন্দুরা ক্ষেপে যাচ্ছে, অশুচিদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া ও বিয়েসাদী করলে শুদ্ধতা থাকবে না। এ কী রকম মহাত্মা যিনি অশুচিকে শুচি করতে গিয়ে শুচিকে অশুচি করতে যাচ্ছেন? বর্ণ হিন্দুদের ভিতর উত্তেজনা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে গান্ধীবিরোধিতা। সমাজে হাত পড়বে না, অথচ দেশ স্বাধীন হবে এ মানসিকতা গান্ধীজীর নেতৃত্বের পূর্বেও ছিল। নতুন কিছু নয়। তবু খারাপ লাগে, যখন শুনি যে হরিজনদের বাদ দিয়েও দেশকে স্বাধীন করা যায়। সেটা যেন নিগ্রোদের ক্রীতদাস রেখে আমেরিকাকে স্বাধীন করা।" সৌম্য আক্ষেপ জানায়।

মানস বলে, "তার মানে স্বাধীনতাযুদ্ধের পরের অধ্যায় গৃহযুদ্ধ। ভারতকেও তার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। বর্ণ হিন্দুরা কি লড়তে প্রস্তুত?"

"পরে কী হবে না হবে তা ইতিহাসের উপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক। আপাতত প্রথম কর্তব্য স্বাধীনতা অর্জন। তাতে হরিজনদেরও অংশগ্রহণ।" সৌম্য বলে।

মানস জানতে চায় কংগ্রেস কি গান্ধীজীর মতবাদ সর্বাংশে সমর্থন করে। না কেবল তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বটুকুই মানে।

"কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক সংগঠন। রাজনৈতিক সংগ্রামের অধিনায়ক হিসাবে সে গান্ধীজীকে মানে। কিন্তু তাঁর মতবাদকে মানে না। এইখানেই গান্ধীজীর দুঃখ। অধীনতা দূর হবে, কিন্তু দীনতা ঘুচবে না, হীনতা মুছবে না। কংগ্রেসের তাতে আগ্রহ নেই। আমরা যারা বিশ্বাস করি যে গান্ধীজীই এ যুগের বুদ্ধ তারা অধীনতা দূর করার জন্যে কংগ্রেসে থাকলেও দীনতা ও হীনতা দূর করার জন্যে স্বতন্ত্র একটা সঙ্ঘের প্রয়োজন অনুভব করি। বৌদ্ধদের যেমন বুদ্ধ আর ধর্ম আর সঙ্ঘ আমাদেরও তেমনি গান্ধী আর গান্ধীবাদ আর গান্ধীসেবাসঙ্ঘ। কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, কিন্তু বিভিন্ন প্রশ্নে আমাদের ভিন্ন মত। এই ধরো না কেন, যুদ্ধ। আমরা চাই পৃথিবী জুড়ে নিরস্ত্রীকরণ। আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়। ভারতই সকলের আগে নিরস্ত্র হবে। কংগ্রেস নেতারা এতে নারাজ। কিংবা ধরো বিকেন্দ্রীকরণ। আমরা কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকৃত করতে চাই। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যাঁরা সমাজতন্ত্রী তাঁরা রাষ্ট্রকেই করবেন অর্থনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র কেন্দ্র। আর যাঁরা ধনতন্ত্রী তাঁরা বড়ো বড়ো কোম্পানীর হাতে মূলধনকে কেন্দ্রীভূত হতে দেবেন। তারপর তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপাবেন। গান্ধীজী তাঁদের ট্রাস্টী হতে বললেও তাঁদেরও বিকেন্দ্রীকৃত করার পক্ষে। কিন্তু ধনতন্ত্রীদের মতো সমাজতন্ত্রীরাও বিকেন্দ্রীকরণ পছন্দ করবেন না। তার বদলে করবেন ধনসম্পদ রাষ্ট্রসাৎ। তা হলেই দেখছ কংগ্রেসীদের সঙ্গে গান্ধীবাদীদের কত তফাৎ। আমরা অধীনতা দূর করার জন্যে কংগ্রেসে আছি, কংগ্রেসের সঙ্গে আছি, কিন্তু দীনতা ও হীনতা দূর করার জন্যে কংগ্রেসের উপর নির্ভর করতে পারিনি, তাই পৃথক সঙ্ঘ গঠন করেছি। এ না হলে গান্ধীবাদ বাঁচবে না, গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গেই দেহত্যাগ করবে। কংগ্রেস মত্ত থাকবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতে। প্রাদেশিক স্তরে যা দেখছ কেন্দ্রীয় স্তরেও তাই দেখবে। তাই আমরা কংগ্রেসের বাইরে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাই। এটা কি অন্যায়? তুমি কী মনে করো মানস?" সৌম্য ব্যাকুলভাবে বলে।

"না, অন্যায় কিসের? বুদ্ধ থাকলে সঙ্ঘ থাকে।" মানস রায় দেয়।

"কিন্তু বামপন্থীদের ধারণা এটা দক্ষিণপন্থীদের বর্ণচোরা সংগঠন। বামপন্থীরা যদি কংগ্রেস ক্যাপচার করে দক্ষিণপন্থীরা তাদের তাড়াবার জন্যে গান্ধীসেবাসঙ্ঘের শরণ নেবে। বামপন্থীরা যখন রাষ্ট্র ক্যাপচার করবে গান্ধীসেবাসঙ্ঘ তখন দক্ষিণপন্থীদের মদত দেবে। ওদের এ ধারণা গান্ধীজীকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। সন্দেহ নেই বহু দক্ষিণপন্থী নেতা আমাদের সঙ্ঘের সদস্য। গান্ধীবাদী বলে যদি কেউ পরিচয় দেন আমরা কি তাঁকে ফেলতে পারি? তেমনি বহু ধনিক গান্ধীবাদী বলে পরিচয় দিয়ে সদস্য হয়েছেন। তাঁদের ফিরিয়ে দিলে অনেকের উপর অবিচার করা হবে। দুর্মুখরা বলছে যে কংগ্রেসের হাতে প্রাদেশিক সরকার না থাকলে এঁরা সঙ্ঘে ভিড়ে যেতেন না। কংগ্রেস যেদিন প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবে এঁরাও সেদিন যে যার পথ দেখবেন। সঙ্ঘ কি থাকবে?" সৌম্য সুধায়।

"দেখা যাক। প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বত্যাগ তো একরকম নিশ্চিত। ব্রিটিশ কর্তারা কেন্দ্রে তেমন কোনো ক্ষমতা দেবেন না কংগ্রেস নেতারা যেমনটি আশা করেন। সেদিন শেফার্ডের সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি বলেন ইংরেজ হোম মেম্বর ফাইনান্স মেম্বররা যাবেন কোথায়? যুদ্ধকালে যে যার পদে থাকবেন।" মানস ভিতরের খবর দেয়।

॥ নয় ॥

মাঝখানে বিরতি। যূথিকা এসে দু'জনের সামনে দু'গেলাস সরবৎ রেখে যায়। লেবুর সরবৎ। সৌম্য তো বাজারের লেমন স্কোয়াশ খাবে না।

মানস বলে, "তুমি ধন্য, তোমার বিশ্বাসের জোর আছে। তুমি তোমার বিশ্বাসের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছ। প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হচ্ছ। কিন্তু আমি তো আঁকড়ে ধরবার মতো একটা খড়কুটোও খুঁজে পাচ্ছিনে। ভগবানে আমার অটল বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাসও টলতে টলতে অজ্ঞেয়বাদের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তেমনি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। পরলোকে বিশ্বাস। পরজন্মে বিশ্বাস। জগতের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস। মরাল অর্ডারে বিশ্বাস। সত্যের জয় হবে, ন্যায়ের জয় হবে, প্রেমের জয় হবে এই অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাস। একালের মানুষের ভুলভ্রান্তি দোষত্রুটি ভাবীকালের মানুষ শুধরে দেবে, এই নিশ্চয়তায় বিশ্বাস। ভাবীকাল যে একালের চেয়ে নিখুঁত হবেই এই নিশ্চিতিতে বিশ্বাস। ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব যে চিরকালের নয়, কালক্রমে মানবসংসার যে নির্জলা ভালো হতে পারে, এই শিবত্বে বিশ্বাস। নেতি নেতি করতে করতে আমি শূন্যের অভিমুখেই চলেছি।"

সৌম্য ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় বলে, "এটা বোধহয় তোমার পুত্রশোকের প্রতিক্রিয়া। সে আঘাত কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে।"

"সেই কি একমাত্র আঘাত? চোখের সুমুখেই দেখছ চেকোশ্লোভাকিয়ার দশা। আর পোলাণ্ডেব দশা। কতকাল ধরে কতশত দেশপ্রেমিক তোমার মতো জীবন উৎসর্গ কবে প্রাণদান করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। ত্রিভঙ্গ পোলাণ্ডকে একত্ব দিতে সে কী দুর্মব সাধনা! অথচ বিশ বছর যেতে না যেতেই আবার দ্বিভঙ্গ। ভারতের স্বাধীনতার তপস্যাও একদিন সফল হবে, আমিও তোমার মতো বিশ্বাস করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও করি যে কোনো একজন সর্বজনমান্য নেতা না হলে এই বিচিত্র দেশ ছত্রভঙ্গ হতে পারে। গান্ধীজী কি চিরদিন থাকবেন? সংগ্রাম চলছে বলেই তাঁর নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন আছে। সংগ্রাম সারা হলে কী প্রয়োজন? এর মধ্যেই তো তাঁকে মানতে চাইছে না লীগপন্থী মুসলমান, মহাসভাপন্থী হিন্দু, বামপন্থী কংগ্রেসী। ইংরেজ যখন বিদায় হবে তখন জাপানী কি আসবে না বিভেদের সুযোগ নিয়ে? ব্রিটিশ রাজত্বই যে সব চেয়ে বড়ো ইভিল এটা সত্য নয়। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা তার চেয়েও বড়ো ইভিল। আরো বড়ো ইভিল বর্ণভেদ ও জাতিভেদ।" মানস বলে চিন্তাকুল ভাবে।

"যা বলেছ সব ঠিক। কিন্তু ঐ যে বলে, প্রথম জিনিসগুলি প্রথমে। বিদেশীব ছত্রচ্ছায়ায় বাস করলে কোনো দিনই আমরা মানুষ হব না। আগে তো ওরা বিদায় হোক, তার পরে দেখা যাবে কতদিন আমরা স্বাধীন থাকতে পারি, এক থাকতে পারি। মুক্তির জন্যেই ভারতের অন্তরাত্মা ব্যাকুল। এই সত্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভারতের অদ্বিতীয় উপায় অহিংসা। গান্ধীজী সফল না হলেও এ সংগ্রাম চলবে। কারণ, প্রথম জিনিসটি প্রথমে। ভারত তখন যে-কোনো উপায় অবলম্বন করবে। খণ্ড খণ্ড হলেও যদি স্বাধীন হওয়া যায় তাও সই। অখণ্ড পরাধীনতার চেয়ে খণ্ডিত স্বাধীনতাও শ্রেয়। যেখানে সত্যিকারের ঐক্য নেই সেখানে শিকলে বাঁধা একত্ব নিয়ে আমরা কী করব! বিভেদের সুযোগ নিয়ে জাপানী ঢুকবে? ঢুকলে তার সঙ্গেও লড়ব। অহিংসভাবে সম্ভব না হয়, সহিংসভাবে। ইংরেজকে এবার আমরা হটাবই। যদি না ওরা মানে মানে হটে যায়। গান্ধীজী ওদের মানে মানে হটে যাবার জন্যে একটা রাস্তা খোলা রেখেছেন। কিন্তু সেটারও একটা সময়সীমা আছে। সীমা পার হয়ে যাচ্ছে দেখলে তিনি সংগ্রামের সঙ্কেত দেবেন। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। ফলাফল ভগবানের হাতে। হেরে যেতেও পারি। মরে

যেতেও পারি। কিন্তু বসে থাকতে পারিনে। লগ্নের প্রতীক্ষা করে বসে থাকা নয়।" সৌম্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"প্রথম জিনিসটি প্রথমে।" মানস বলে, "কিন্তু তোমার আমার কাছে যেটি প্রথম আমাদের মুসলমান বন্ধুদের কাছে সেটি প্রথম নয়। তাঁরা বলেন, আগে হিন্দু মুসলমানের একতা, তার পরে ভারতের স্বাধীনতা। একতা যদি পেছিয়ে যায় তো স্বাধীনতাও পেছিয়ে যাবে। একতা যদি এগিয়ে আসে তো স্বাধীনতাও এগিয়ে আসবে। একতার আগেই যদি স্বাধীনতা চাও তো মুসলমানরা সরে দাঁড়াবে ও বাধা দেবে। ওদের চোখে ইংরেজরা যেমন বিধর্মী হিন্দুরাও তেমনি বিধর্মী। বিধর্মীর শাসনে ওরা বাস করবে না। এতদিন যে বাস করেছে সেটা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে। নয়তো ওরাই তো রাজত্ব করত। স্বদেশী বিদেশীর প্রশ্ন ওদের কাছে বড়ো নয়। কারণ ওরাও তো বিদেশীর বংশধর। বিদেশীকে বিদায় করতে হলে ওদেরও তো বিদায় করতে হয়। ইংরেজদের তবু ফিরে যাবার একটা স্থান আছে, ওদের ফিরে যাবার স্থান কোথায়? আরবে ইরানে মধ্য এশিয়ার কেউ ওদের স্থান দেবে না। সেইজন্যে ওরা ভারতেরই একাংশকে বানাতে চায় পাকিস্তান। এটা যদি মেনে নাও তো ওরা স্বাধীনতার প্রশ্নে বাদ সাধবে না। নয়তো ওরা স্বরাজকে বলবে হিন্দুরাজ আর ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।"

"যা বলেছ সব ঠিক। কিন্তু কোনো শর্তেই ওরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবে না। ওরা মানে লীগপন্থী মুসলমানরা। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও খান্ আবদুল গফ্ফার খানের মতো মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে আছেন। লীগপন্থীরা সংগ্রামে যোগ না দিয়েই সংগ্রামের ফল ভোগ করবে, কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের ভোগ করতে দেবে না। ওরা নাকি মুসলমানদের প্রতিনিধিই নয়। এমন কি খাঁটি মুসলমানই নয়। শোন কথা! আজাদ খাঁটি মুসলমান নন, বাদশা খান্ খাঁটি মুসলমান নন। খাঁটি মুসলমান কিনা মহম্মদ আলী ঝীণাভাই খোজানী, যাঁর পিতৃনামের ইংরেজী সংস্করণ জিন্না। যাঁর পিতামহ হিন্দু। আমরা এখন আমাদের সংগ্রামী কমরেডদের তাঁদের ভাগ থেকে বঞ্চিত করি কী করে? তা যদি করি তবে অসমাপ্ত সংগ্রাম সমাপ্ত করার জন্যে ডাক দিলে তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন কেন? অবশ্য বাদশা খান্ বা মৌলানার মতো লোক মন্ত্রিত্বের জন্যে লালায়িত নন। তাঁরা ডাক পেলে সংগ্রামে যোগ দেবেনই। কিন্তু আমাদেরও তো একটা কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। যাঁরা আমাদের দুঃখের দিনের সাথী তাঁরা কি আমাদের সুখের দিনের সাথী হবেন না? যাঁরা কারাগারে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন তাঁরা কি মন্ত্রীর আসনে বসতে পাবেন না? কেন্দ্রে যদি সরকার পুনর্গঠন হয় জিন্নাও থাকবেন, আজাদও থাকবেন, কিন্তু আজাদ থাকলে জিন্না থাকবেন না, এটা হলো অন্যায় জেদ। এর দরুন দেশকে দু'ভাগ করতে হবে, এটা তো পাগলের প্রলাপ। কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মুসলমান এমন প্রলাপ করতে পারে না। দেশ দু'ভাগ হলে মুসলিম সম্প্রদায়ও দু'ভাগ হয়ে যায়। মুসলিম ঐক্য থাকে কোথায়? হিন্দু রাজত্ব এড়াতে চাইলে কতক মুসলমান তা পারবে, কিন্তু সব মুসলমান তো পারবে না। তবে, হ্যাঁ, ভারতের একাংশে মুসলিম রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে, তা ঠিক।" সৌম্য স্বীকার করে।

"আরে, সেইটেই তো আসল।" মানস বলে, "ইংরেজ চলে গেলে তার উত্তরাধিকারী হবে কারা? কংগ্রেস বলবে, যাদের মেজরিটি তারা। কিন্তু তা হলে তো হিন্দুরাই হবে উত্তরাধিকারী, যেহেতু তারাই মেজরিটি। তাদের সঙ্গে জনাকতক মুসলমান খ্রীস্টান পার্সী থাকলেও তারা মূলত হিন্দু। তাই লীগের বক্তব্য, লীগপন্থী মুসলমানদের বক্তব্য, ইংরেজ চলে যাবার আগেই স্থির করতে হবে যারা উত্তরাধিকারী হবে তারা কি মেজরিটির তথা মাইনরিটির সমান আস্থাভাজন, না কেবলমাত্র মেজরিটির আস্থাভাজন? সমান আস্থাভাজন বলতে বোঝাবে কংগ্রেস লীগ দুই দলই সমান শরিক, লীগ খাটো নয়। নয়তো লীগকে আলাদা উত্তরাধিকার দিতে হবে।"

সৌম্য এটা জানত। কিন্তু মানত না। হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকটি গ্রামে ও শহরে দুটি তারের মতো

জড়িয়ে গেছে। বেশীর ভাগ মুসলমানই ধর্মান্তরিত হিন্দুর সন্তান। ধর্ম ব্যতীত আর সব বিষয়েই তাদের মধ্যে মিল। গোটাকতক চাকরিবাকরির জন্যেই কি তারা একান্নবর্তী পরিবার থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক পরিবার গঠন করবে? পারবে কি সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে? যারা থেকে যাবে তারা তো আরো ক্ষুদ্র মাইনরিটি হবে। ওদিকে হিন্দুদের দশা কী হবে?

সৌম্য বলে, "হিন্দু মুসলমান বা কংগ্রেস লীগের বোঝাপড়া সত্যিই অত্যাবশ্যক। স্বাধীনতার আগেই হোক আর পরেই হোক এ সমস্যার সমাধান অবশ্যকর্তব্য। আমরা কেউ চাইনে যে হিন্দুরাই ইংরেজের পর সর্বেসর্বা হয়। মুসলমানদের আস্থা না পেলে কোনো সরকারই টিকবে না। দেখছ না বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকারগুলির দোটানা? লীগপন্থীদের বাইরে রাখলে তারা লোক ক্ষেপিয়ে দাঙ্গা বাধায়। দাঙ্গা থামাতে গেলে গুলী চালাতে হয়। অপর পক্ষে লীগপন্থীদের ভিতরে ঢুকতে দিলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের বহিষ্কার করতে হয়। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্বল হয়। কেন্দ্র নিয়েও একই দোটানা দেখা দেবে। স্বাধীনতাসংগ্রাম যদি অসমাপ্ত থাকে তবে তা দুর্বল হবেই। আগে তো স্বাধীনতা লাভ করি, তার পরে আমরা এ সমস্যার সমাধান উভয়পক্ষের শুভবুদ্ধির সাহায্যে করব।"

"ওরা যে বিশ্বাসই করতে চায় না ইংরেজ চলে গেলে রাজত্বটা ওদেরও রাজত্ব হবে, যদি না আগে থেকেই দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। তার মানে হিন্দু মুসলমানের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কংগ্রেস লীগ দ্বৈরাজ্য। সেটা যদি অকার্যকর হয় তবে দুই শরিকের মধ্যে পার্টিশন। যেমন জমিদারির ক্ষেত্রে হয়।" মানস তার সহকর্মীদের কথা শোনায়।

"ভারত কি কারো জমিদারি? ভারত এক ও অবিভাজ্য। দেশরক্ষার দিক থেকে এক ও অবিভাজ্য। বাণিজ্যের দিক থেকে এক ও অবিভাজ্য। পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকে এক ও অবিভাজ্য। ইংরেজদের কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ। ইংরেজ রাজত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এটা স্বতঃসিদ্ধই থাকবে। তারা বিদায় নিলেই এটা অসিদ্ধ হবে কী করে? ধর্ম এক নয় বলে? তা হলে তো খ্রীস্টান, শিখ, এদেরও এক একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দিতে হয়।" সৌম্য বলে।

"তোমারও কথা আমারও কথা। কিন্তু আমাদের কথাই তো চূড়ান্ত নয়। যেহেতু আমরাই মেজরিটি। ইংরেজরা যদি কারো হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সিংহাসন শূন্য রেখে যায় তবে যাদের যেখানে মেজরিটি তারাই সেখানে ক্ষমতাসীন হবে। কোথাও কংগ্রেস, কোথাও লীগ, কোথাও অন্য কোনো পার্টি। ভারত এক ও অবিভাজ্য থাকবে কিসের জোরে? ব্রিটিশ বেয়োনেটের জোরে নয়। কংগ্রেস বেয়োনেটের জোরে নয়। অহিংসার জোরে তো নয়ই। কন্‌স্টিটিউশনের জোরেও না, কারণ ইংরেজের দেওয়া কন্‌স্টিটিউশন আমরা মেনে নিইনি। নিজেদের একটা কন্‌স্টিটিউশন রচনা করার অধিকারও আমাদের অন্যতম দাবী। আর ধর্ম অনুসারে দেশভাগ ইতিহাসে অভূতপূর্ব নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আয়ারলণ্ডে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতেও হলে আশ্চর্য হবার কী আছে? ক্যাথলিক আর প্রটেস্টাণ্ট যদি এক নেশন হতে না পারে হিন্দু মুসলমান এক নেশন হবে কোন্ তপোবলে? নানক, কবিরের সাধনার ফলে কি দাঙ্গা বন্ধ হয়েছে? গান্ধীজীও কি পেরেছেন বন্ধ করতে? কংগ্রেস মন্ত্রীরা গদী ছেড়ে দিলেই সেটা বন্ধ হবে? না দিলে নয়? গদী ছেড়ে দিলে শাসন চালাবে কে? ওই ইংরেজ? তা হলে ইংরেজকেই চিরকাল আটকে রাখতে হয়। যাদের দুই হাতে আটক করবে তাদের সঙ্গে দুই হাতে লড়বে কী করে?" মানস সুধায়।

"না, না, ওদের আটক করা আর নয়। ওরা যদি নিরপেক্ষ হতো তা হলেও বা কথা ছিল। ওরা মুসলিম লীগের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে মিতালি পাতিয়েছে।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"ইঙ্গ-মুসলিম মিতালির কথা যদি বল তবে সেটা মুসলিম লীগের বেলা খাটে, কিন্তু জিন্নার বেলা নয়। এই সেদিনও তিনি ছিলেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা, তাঁর দলের সদস্যরা কেউ হিন্দু, কেউ

পার্সী। কখনো এঁরা কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিতেন, কখনো ইংরেজের পক্ষে। জিন্না সাহেব সরকারী খেতাবও পাননি, পদও নেননি। একদা কংগ্রেসের নেতা ছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ নীতি তাঁর মতবিরুদ্ধ বলে তিনি কংগ্রেস থেকে সরে এসেছেন। মুসলিম লীগেও তাঁর স্থান ছিল, নইলে তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনকেন্দ্র থেকে ভোটের জোরে জিততে পারতেন না। দুই নৌকায় পা রেখে তিনি কংগ্রেস লীগ চুক্তির ঘটকালিও করেছিলেন। সেটা মহাত্মা গান্ধীর উদয়ের পূর্বে। এমন মানুষ কেমন করে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে মুসলিম লীগের সর্বময় নেতা হলেন ও নিজের হিন্দু ও পার্সী সহকর্মীদের ত্যাগ করলেন সে এক রহস্য। তা বলে যে তিনি সরকারের ধামা ধরলেন তাও নয়। প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সময় মাইনরিটির প্রতিনিধিদেরও আসন দিতে হবে, এটাই শাসনতন্ত্রের নির্দেশ। কংগ্রেস এ নির্দেশ পালন করেছে নিজের দলের মুসলিম সদস্যদের দিয়ে। তার আগে তাঁদের স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জিতিয়ে দিয়েছে। জিন্নার দলের মুসলিম সদস্যরা মন্ত্রী হতে পারেননি, বহু কেন্দ্রে জিততেও পারেননি। বোম্বাই শহরে তাঁর বাস, অথচ বোম্বাই প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীতে তাঁর দলের লোক নেই। এ দুঃখ কি ভোলা যায়? তাঁর মতে এটা কংগ্রেসের মহা অপরাধ। এ অপরাধ কি ক্ষমা করা যায়? তাঁর লক্ষ্য দ্বিতীয় এক কংগ্রেস-লীগ চুক্তি। যে চুক্তির জোরে মুসলিম মন্ত্রীদের মনোনয়ন করবে মুসলিম লীগ, লীগপন্থীদের স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে জিতিয়ে দেবে মুসলিম লীগ। কংগ্রেসপন্থী মুসলিমরা সরে দাঁড়াবেন। সেই লক্ষ্যে তিনি অটল। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে তিনি কংগ্রেসের শত্রু বা ইংরেজের মিত্র। এই পর্যন্ত বলা যায় যে তিনি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কখনো কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করবেন, কখনো ইংরেজের পক্ষ। তিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।" মানস যতদূর জানে।

"আহা, সেইখানেই তো কাঁটা। দেশ যখন দুই শিবিরে বিভক্ত তখন কংগ্রেসের শিবির আর ইংরেজের শিবির এর মাঝামাঝি বা এর বাইরে তৃতীয় একটা শিবির মেনে নেওয়া যায় কি? ইংরেজরাও কি মেনে নেবে? এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ না নিলে বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীতে লীগ সদস্যদের কারো আসন পাকা নয়। জিন্না ধরে নিয়েছেন যে কংগ্রেস তার অসহযোগের প্রতিজ্ঞা বরাবরের মতো ভুলে গেছে। তা নয়। কংগ্রেস আইনসভা দখল করেছে আর-কাউকে দখল করতে না দিতে। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিয়েছে আর-কাউকে মন্ত্রী হতে না দিতে। কংগ্রেস যদি যুদ্ধে মতভেদের দরুন মন্ত্রিত্ব বর্জন করে তা হলেও আর কোনো দল মন্ত্রিত্ব করতে পারবে না, কারণ আর-কোনো দলেরও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। এ পলিসি কি জিন্না সাহেব মেনে নিতে রাজী হবেন? তাঁর শিবিরটি তো সঙ্কটের মুহূর্তে ইংরেজের পক্ষে, কংগ্রেসের বিপক্ষে। কংগ্রেস তা হলে কেমন করে তাঁর সঙ্গে চুক্তি করবে? তা ছাড়া তাঁর দাবীরও কি অন্ত আছে? মন্ত্রীমণ্ডলীতে তিনি চাইবেন ওয়েটেজ। তিনি চাইবেন সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। ইংরেজদের সঙ্গে যাঁদের গাঁটছড়া বাঁধা তেমন সব নাইট ও নবাবকে কি কংগ্রেস ট্রয়ের ঘোড়ার মতো দুর্গের ভিতর ঢুকতে দেবে? তা হলে হিন্দু মডারেটরা কী দোষ করলেন?" সৌম্য তর্ক করে।

মানস হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, "জিন্নাকে বাদ দিয়ে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট হতে পারে না, সৌম্যদা। যদি হয় তবে নির্ঘাত গৃহযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধে যদি কংগ্রেসের রুচি না থাকে তবে একভাবে না একভাবে আপস করতেই হবে। জিন্নার সঙ্গেও, ইংরেজের সঙ্গেও। শেষ তাসটা মুসলিম মাইনরিটির হাতেই।"

সৌম্য ব্যথিত স্বরে বলে, "মুসলিম মাইনরিটি মানে কি মুসলিম লীগ? তার হাতেই শেষ তাস মানে কি মুসলিম লীগের হাতেই ভীটো? কিংবা তার মিতা বড়লাটের হাতেই ভীটো? তা হলে তো আমাদের সংগ্রাম এ শতাব্দীতে শেষ হবে না। আমরা চাই নিখাদ স্বাধীনতা। তার সঙ্গে খাদ মেশালে তো খোদ ইংরেজদের সঙ্গেই আপস হতে পারত। অসহযোগ আন্দোলনের বা আইন অমান্যের দরকারটা কী ছিল? মহাত্মা একদিন মুসলিম নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তায় নাজেহাল হয়ে বললেন, এঁদের সঙ্গে মিটমাটের

চেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মিটমাটে পৌঁছনো আরো সহজ। হিন্দু মুসলমানের একতা মহাত্মার চেয়ে কে বেশী চায়? কিন্তু তার অর্থ কি এই যে প্রত্যেকটি মাইনরিটিকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিয়ে মেজরিটি তার নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে? তেমন গভর্নমেন্ট চালানোর দায়িত্ব নেবার চেয়ে অপোজিশনে থাকার ও সত্যাগ্রহ চালাবার সিদ্ধান্ত অধিক শ্রেয়। আপস করতে হয় কংগ্রেস করতে পারে, কিন্তু গান্ধীজী কখনো না। তাঁর লক্ষ্য নিখাদ স্বাধীনতা। তাই তিনি কারো সঙ্গে কোনো রকম শর্তে রাজী হবেন না। কংগ্রেস নেতারা হয়তো বড়ো বড়ো পদের টোপ গিলতে হাঁ করে বঁড়শীর কাঁটাও গিলবেন, গান্ধীজীর কিন্তু তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। নিজের জন্যে তিনি রাজক্ষমতাও চান না। তাঁকে গৃহযুদ্ধের ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করা যাবে না। উচ্চতম পদের লোভ দেখিয়ে তো নয়ই।"

মানস চিন্তান্বিত হয়ে বলে, "কিন্তু এটা তো তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে একদিন না একদিন দেশের নেতাদের উপরেই দেশের শাসন পরিচালনার দায় বর্তাবে। ইংরেজরাও এটা স্বীকার করে। তবে ব্যালান্স অব পাওয়ার হাতে রাখতে চায়। কংগ্রেসের সঙ্গে ব্যালান্স রক্ষার জন্যেই মুসলিম লীগের সৃষ্টি। কংগ্রেসকে একভাগ দিলে মুসলিম লীগকেও একভাগ দিতে হয়। একপ্রকার না একপ্রকার কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে ওদের বেসিক পলিসি। আর লীগপন্থী মুসলমানরাও এটা উত্তমরূপে বোঝেন যে তাঁদের স্বার্থ ইংরেজদের হাতেই নিরাপদ। এখন কথা হচ্ছে তাঁরাই কি মুসলিম মাইনরিটির একমাত্র প্রতিনিধি? এটা নির্ভর করছে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশের ভোটের উপরে। আবার যখন সাধারণ নির্বাচন হবে তখন মুসলিম লীগ প্রত্যেকটি আসন জিতে নিতে পারে। তখন কংগ্রেসের মন্ত্রীমণ্ডলীতে একজনও মুসলিম মন্ত্রী থাকবেন না। কেন্দ্রেও এ রকম হতে পারে। সেখানেও কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী বলতে বোঝাবে মুসলিম মাইনরিটিবর্জিত মন্ত্রীমণ্ডলী। তার হাতে ক্ষমতা সম্প্রদান করলে সেটা হয়তো নিখাদ স্বাধীনতা হবে, কিন্তু যার পেছনে মুসলিম ভোট নেই একা মৌলানা আজাদের কল্যাণে সেটা হিন্দু মুসলমানের যৌথ মন্ত্রীমণ্ডলী হবে না। সেদিন জিন্নার গুরুত্ব আজাদের চেয়ে বেশী। জিন্না বিমুখ হলে মুসলিম মাইনরিটি বিমুখ হবে। মুসলিম মাইনরিটি বিমুখ হলে সংঘর্ষ বেধে যাবে। মুসলিম সৈন্যদলও আসরে নামতে পারে। ইংরেজ না থাকলে কংগ্রেস একা এত বড়ো একটা দেশকে সামলাতে পারবে কি? আর ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে মদত দেয় তবে সে কি তার মাশুল আদায় করে নেবে না? মাশুলটা লীগের জন্যে একভাগ।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে গান্ধীজীর হাতেও আছে আরো একখানা তাস। কংগ্রেসকে তিনি পরামর্শ দেবেন পদত্যাগ করতে। ইংরেজ যদি একা সামলাতে পারে তবে সেই ভালো। যদি লীগকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে তাকে মদত দেয় সেও ভালো। কংগ্রেসকে হতে হবে সর্বপ্রকার শক্তি জোটের চেয়ে আরো শক্তিমান। দারুণ এক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সবাইকে। তাদের মধ্যে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরাও থাকবে। কংগ্রেসকে ওরা ছাড়বে না। কংগ্রেসও ওদের ছাড়বে না। ওরা ছাড়পত্র না দিলে লীগ নেতাদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের নিষ্পত্তি হবে না। তখন ইংরেজদের দেখতে হবে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের নিষ্পত্তি হবে কেমন করে। সেদিন গান্ধীজীর সঙ্গেই বড়লাটের চুক্তি। আর-একটা গান্ধী আরউইন প্যাক্ট।" সৌম্য নিঃসংশয়।

"আর-একটা গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট ইংরেজরাও হতে দেবে না, মুসলিম লীগপন্থীরাও না। উভয়েরই পূর্ব শর্ত আর-একটা কংগ্রেস-লীগ চুক্তি। তার মানে গান্ধী-জিন্না চুক্তি। তবে তার সঙ্গে আরো একটা শর্ত রয়েছে। যুদ্ধে সহযোগিতা।" মানস জানায়।

"তা হলে কাজ নেই অমন চুক্তিতে। দৈত্যের সঙ্গে বামনের চুক্তির গল্প মনে আছে? যুদ্ধ করতে বেরিয়ে দৈত্যের একখানা হাত কাটা পড়ে তো বামনের দু'খানা হাতই। দৈত্যের একটা পা কাটা পড়ে

তো বামনের দু'দুটো পা-ই। যুদ্ধে হার হবে না, জিৎ হবে, কিন্তু ইংরেজের এই বাড়-বাড়ন্ত থাকবে না, ভারত তো আরো কাঙাল হবে। অমনধারা চুক্তি না করাই ভালো। বড়লাটের সঙ্গে চুক্তি না হয় জিন্না সাহেবের সঙ্গে চুক্তি কেন? কে না জানে তাঁর মানের অভিপ্রায়? তিনি চান প্রত্যেকটি প্রদেশে কোয়ালিশন, অথচ সংগ্রামের দিন কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বেন না। সংগ্রামের দিন তিনি ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। দেশের স্বার্থে নয়, মুসলমানের স্বার্থে। যেন মুসলমানের স্বার্থ ইংরেজের হাতেই নিরাপদ।" সৌম্য বিশ্বাস করে না।

"তুমি তো মুসলিম অফিসার শ্রেণীর সঙ্গে মেশো না। মিশলে বুঝতে ওঁরা এখন কোন্ লাইনে ভাবছেন। ইংরেজ যে চিরদিন থাকবে না এটা ওঁরা এতদিনে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস যে ইংরেজের শূন্যস্থান একাই পূর্ণ করবে এটা তাঁদের কাছে আনন্দের না হয়ে আতঙ্কের বিষয়। গান্ধীজীকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু নিরপেক্ষ মনে করেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে গান্ধীজী হিন্দু পুনরুজ্জীবনের প্রতীক। তাঁর অহিংসাও হিন্দুর স্বকীয় সাধনা। তাঁর জাতীয়তাবাদও হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তাঁর গণতন্ত্রেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সুতরাং মুসলমানকে তার স্বতন্ত্র নিয়তির সন্ধান করতে হবে। সম্ভব হলে ভারতের ভিতরে। নয়তো ভারতের বাইরে। অর্থাৎ যে ভারত হিন্দুপ্রধান সে ভারতের বাইরে।" মানস সুস্পষ্ট করে।

"অর্থাৎ পাকিস্তানে।" সৌম্য আরো খোলসা করে। "তোমার অফিসার বন্ধুদের সঙ্গে না মিশলেও লীগপন্থী মুসলমানদের সঙ্গেও তো আমি মিশি। তাঁদের মধ্যেও আমার খেলাফতী দোস্ত আছেন। একসঙ্গে জেল খেটেছি আমরা। কেমন করে যে তাঁরা খেলাফতী থেকে পাকিস্তানী হলেন সে এক ঘোরালো ইতিহাস। আসলে ওটা প্যান-ইসলামিজমের অধুনাতন প্রকাশ। ইসলাম যেদিন ভারতে এসেছে সেইদিন থেকেই সেই স্রোতটি প্রবহমান। মুসলমানের স্বার্থ ও ভারতের স্বার্থ এক ও অভিন্ন নয়, মুসলমানের স্বার্থ ও বিশ্ব-মুসলিমের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় আমরাও এটা মেনে নিয়েছিলুম। নযতো ওঁরা আমাদের স্বরাজের আন্দোলনে যোগ দিতেন না। দুই আন্দোলন জুড়ে গিয়ে যুগ্ম আন্দোলন হয়। পরে তুরস্ক থেকেই খেলাফতের উচ্ছেদ ঘটে। খেলাফৎ আন্দোলন বিফল হয়। স্বরাজ আন্দোলন থেকে ওঁরাও সরে যান। ব্যতিক্রম মৌলানা আজাদ ও বাদশা খান্। এখন খেলাফতের মানসিকতা রূপ নিয়েছে স্বতন্ত্র মুসলিম বাসভূমিতে। জিন্না এটা চাননি। তিনি খেলাফতী ছিলেন না। তিনি চান হিন্দু-মুসলমানের দ্বৈত শাসন। কেউ গরিষ্ঠ নয়, কেউ লঘিষ্ঠ নয়। কংগ্রেস যদি এতে রাজী হয় তো তিনি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাইবেন না। নয়তো চাইবেন। কিন্তু দাবী মেনে নিলেও তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেবেন না। ইংরেজই তাঁর শেষ ভরসা। হিন্দুদের বিশ্বাস কী? ওরা কেড়ে নিতেও পারে। ঠকাতেও পারে।" সৌম্য আক্ষেপ করে।

"এর মূল কোথায়, জানো? সিপাই বিদ্রোহে। হিন্দু দৈত্য আর মুসলিম বামন মিলে যে লড়াইটা করে তার ফলে হিন্দুর কম ক্ষতি, মুসলমানের সর্বনাশ। তার বাদশাহী যায়। তার তালুক মুলুক ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে ও রাজভক্ত হিন্দুদের দেয়। তখন থেকেই মুসলমানদের মনে বদ্ধমূল অবিশ্বাস। একমাত্র গান্ধীজীকেই ওরা বিশ্বাস করেছিল। এখন তাঁকেও বিশ্বাস করে না। সেইজন্যে ওদের দাবী দিনকের দিন বাড়ছে। মেটাবে কে? ওই গান্ধীজী। যদি তিনি না মেটান তবে মেটাবে ইংরেজ।" মানস আফসোস করে।

সৌম্য ব্যথা বোধ করে। "মুসলমানরা একদা ভারত জয় করেছিল, সেই থেকে তাদের সকলের না হোক অনেকেরই ধারণা হিন্দুরা চিরকাল দুর্বল, দুর্বল বলেই অহিংসার বুলি আওড়ায়, গণতন্ত্রের খেলা খেলে। একরূপ ধারণা হিন্দুদেরও অনেকের আছে। দুই দিকেই বলপরীক্ষার জন্যে অর্থহীন ব্যাকুলতা। মেরে কেটে মেজরিটিকে কোনোদিন মাইনরিটি করা যাবে না। অথবা মাইনরিটিকে কোনোদিন নির্মূল

করা যাবে না। মিলে মিশেই থাকতে হবে। বিবাদের বিষয়গুলো আপসে মিটিয়ে নিতে হবে। যেকালে মুসলমান ছিল না, হিন্দুই কেবল ছিল, সেকালে কি বিবাদ বিসংবাদ ছিল না? সব মুসলমানকে বিদায় করলেও বিবাদ বিসংবাদ থাকবে। তেমনি, মুসলমানের হাতে যখন রাজ্যভার ছিল তখন কি মুসলমানে মুসলমানে হানাহানি ছিল না। নবাব বাদশাদের কি হিন্দুর সাহায্য নিতে হয়নি? ইকনমিক পাওয়ার ছিল হিন্দু ব্যবসায়ী, মহাজন, জমিদারদের হাতেই। হিন্দুরাই করত রাজস্ব আদায়। সব হিন্দুকে বিদায় করলেও মুসলমানে মুসলমানে মারামারি থাকবেই। নতুন মোগলরাও পুরনো মোগলদের মতো রাজসিংহাসনের জন্যে লড়তে লড়তে সর্বনাশ ডেকে আনবেন। বাইরে থেকে আসবে একদল বিদেশী বণিক। তারাই নতুন এক পলাশীর যুদ্ধে জিতবে। হিন্দুরা যে মেজরিটি হয়েছে এটার জন্যে দায়ী ইতিহাস। ইতিহাসকে উলটিয়ে দেবার সাধ্য আছে কার। সেইজন্যে ভূগোলকে পালটিয়ে দেবার কথা উঠেছে। ভারতের একটা অংশ কেটে নিয়ে তাকেই বানাতে হবে মুসলমানের বাসভূমি। যেন সমস্তটাই তার বাসভূমি নয়। সে যেন আর-সব জায়গায় বিদেশী। এতে রাজী হলে আমাকেও বলতে হবে বাংলাদেশে বিদেশী। কলমের এক খোঁচায় কোটি কোটি মানুষ হবে নিজ বাসভূমে পরবাসী। কত বড় অন্যায় বলো দেখি। এই মূল্য না দিলে নাকি একদিন গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। আমরা এখন তার জন্যে তৈরি হতে পারছিনে, কারণ স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, সমগ্র শক্তি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধেই নিয়োগ করতে হবে। আগে তো এই অধ্যায় সারা হোক। তার পরে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বলপরীক্ষার অধ্যায়। অর্ধেক মুসলমান আমাদের দিকেই থাকবে। তাদের উপর আমরা হিন্দু রাজত্ব চাপাব না। মুসলিম লীগ বল সংগ্রহ করবে কোন্ উৎস থেকে? ওই ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকেই। মুসলিম মিতাদের ক্ষমতার একভাগ পাইয়ে না দিয়ে ওঁরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর করবে না। আর শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরই হলো কংগ্রেস নেতাদের লক্ষ্য। ইংরেজের মিতাদের দেওয়া মানে ইংরেজকেই পরোক্ষে দেওয়া। তা হলে আর স্বাধীনতা হলো কী করে?"

"তা হলে শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের লক্ষ্য ত্যাগ করতে হয়। তার পরিবর্তে লক্ষ্য হবে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ক্ষমতার আসন অধিকার। গান্ধী নেতৃত্বে এটা সম্ভব নয়। সেইজন্যে নেতাবদলের প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রশ্নের উত্তর সুভাষচন্দ্র। জবাহরলালের ভিতরে একটা দোনোমনো ভাব আছে। তিনি বিপ্লবী নায়ক নন। কে জানে ইতিহাস কোন্ অভিমুখে যাচ্ছে? শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের না বৈপ্লবিক ক্ষমতা অধিকারের? কিন্তু হিন্দু প্রভুত্ব হলে মুসলিম বিদ্রোহকে তুমি এড়াবে কী করে? তার সঙ্গে যদি যোগ দেয় মিউটিনি? কতকগুলো প্রদেশ বা অঞ্চল ওরা ক্যাপচার করবেই। গৃহযুদ্ধ এড়াতে হলে চাই হিন্দু মুসলিম দ্বৈত প্রভুত্ব। সেইটাই বা কেমন করে সম্ভব? ইংরেজকে বিদায় করার আগে দশবার ভাবতে হবে বিকল্প রাজত্বের কথা। চান্সের উপর সেটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। কমিউনিস্টরাও ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারে। বিপ্লবের থিয়োরি ওদের মুখস্থ। কৃষক, শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে ওদের কর্মীরা সক্রিয়। আপাতত সুভাষচন্দ্রকে তুলে ধরলেও ওরা পরে নিজেদের লোককে গদীতে বসাবে। ওদের দলে মুসলমানও আছেন। তাঁদের বসিয়ে মুসলমানদেরও মন পাবে।" মানস যেন সবজান্তা।

সৌম্য একপ্রকার যন্ত্রণা বোধ করে। "ভাই মানস, আমরা বুঝি শুধু একটি কথা। স্বরাজ। আমাদের শুধু একটি লক্ষ্য। সারা ভারতের সার্বজনীন মুক্তি। আমাদের শুধু একটি পন্থা। অহিংস অসহযোগ। যার চরম পর্যায় গণসত্যাগ্রহ। এর কোনো শর্ট কাট নেই। লক্ষ্যের মধ্যপথে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে পৌঁছতেই আমাদের সতেরো বছর লেগে গেল। তা হলে হিসেব করে দেখতে পারো পূর্ণ স্বাধীনতায় পৌঁছতে কতকাল লাগবে। আরো সতেরো বছর লাগলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গান্ধীজীরই তো সব চেয়ে অধীর হবার কথা। কারণ তাঁরই বয়স সকলের চেয়ে বেশী। সত্তর বছর। বাইবেলে লিখেছে সত্তর বছরই মানুষের পরমায়ু। ইতিমধ্যেই তিনি কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর উপর যাঁদের

আস্থা নেই তাঁরা ইচ্ছে করলেই অন্য পন্থা গ্রহণ করতে পারেন। অন্য নেতা বরণ করতে পারেন। তিনি তাঁর সঙ্গী বেছে নিয়ে সঙ্ঘ গঠন করবেন। কেন তা হলে তাঁকে নিয়ে দুই দলের টাগ অভ ওয়ার? কেন একদল তাঁকেই পাঠাচ্ছেন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে? যাতে আর এক-দফা সংগ্রাম নিবারিত হয়, জেলে যেতে না হয়, প্রাণ বিপন্ন করতে না হয়। জমি বাজেয়াপ্ত করা না হয়। সম্পত্তি ক্রোক করা না হয়। জরিমানায় সর্বস্বান্ত হতে না হয়। তাও যদি নিশ্চিত জানতেন যে জনগণ তাঁদের এই সংগ্রামে সবাই মিলে ঝাঁপ দেবে। নিয়মিত কুচকাওয়াজ না করে কোনো দেশের সৈন্যদল যুদ্ধে ঝাঁপ দেয় কি? লেনিনের বোলশেভিকরাও কি ১৯০৫ সালের বিপ্লবে সফল হয়েছিলেন? বারো বছর তাঁকে বিদেশে অজ্ঞাতবাস করতে হয়েছিল। বিপ্লব যখন ঘটে তখন ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে। লেনিনের জন্যে বা দলের জন্যে অপেক্ষা করে না। দেশে ফিরে অক্টোবর মাসে তিনি জারের বিরুদ্ধে নয়, মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটান। আমাদের বামপন্থীরা বিপ্লবের জন্যে অধীর। কিন্তু সেই ভুলটি তাঁরা করবেন ১৯০৫ সালে লেনিনপন্থীরা যেটি করেছিলেন। কমসে কম বারোটি বছর নির্বাসনে কাটাতে হবে। ইতিমধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একদিন বিপ্লব ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। দেশে ফিরে এসে তাঁরা দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটাতে চাইবেন। সেটা নাও ঘটতে পারে। ক্ষমতার আসন জুড়ে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁরা মেনশেভিকদের চেয়ে আরো হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে পারেন। ইতিহাসে রুশবিপ্লবের পুনরাবৃত্তি হবার নয়। সেটাও ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি নয়। ইতিহাস আমাদের উপর ভার দিয়েছে নতুন এক পরীক্ষার। সেটা যুদ্ধের তথা বিপ্লবের নৈতিক বিকল্প আবিষ্কারের। যাকে বলে মরাল ইকুইভালেন্ট। আমরা অন্যের পুনরাবৃত্তি করব না, নিজেরাই নজীর রেখে যাব। বহু দেশ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। গান্ধীজীর কাছে পাঁচ মহাদেশ থেকে চিঠি আসে। মরাল ম্যান ইন্ অ্যান ইমমরাল ওয়ার্লড। অথচ তাঁর সঙ্গে ক'জন আছেন? তাঁদের পাঁচ আঙুলে গোনা যায়। বাপু আমাকে ডেকেছেন। যাচ্ছি দেখা করতে। ফেরার পর তোমার এখানে আসব।"

"সৌম্যদা", মানস ধরা গলায় বলে, "গান্ধীজীকে আমার বিনম্র প্রণাম জানিয়ে শুধু এই কথাটি বোলো যে ব্রিটিশ শাসন যদি তাঁর মতে একটা ইভিল হয়ে থাকে তবে তার চেয়ে শতগুণ ইভিল নাৎসী ডিকটেটরশিপ, যেটা অবশ্যম্ভাবী, এই যুদ্ধে যদি ইংরেজ হারে, হিটলার জেতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত স্বাধীন হবে এটা আদর্শবাদীদের স্বপ্ন হতে পারে, বাস্তববাদীদের কাণ্ডজ্ঞান নয়। তিনি আমাদেরও বাপু। আমরাও চরকা কাটি, খদ্দর পরি, হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীর জন্যে যথাসাধ্য করি, বাড়ীতে মুসলমান খানসামা, মগ বাবুর্চি। নিরামিষ খাই, মদিরা স্পর্শ করিনে, সত্যে মতি আছে, সাধ্যমতো অহিংসাও মানি, কিন্তু ব্রহ্মচর্য! এই ভরা যৌবনে? শিরসি মা লিখ, মা লিখ, চতুরানন।"

দুই বন্ধুতে মিলে হাসাহাসি করে। মজা দেখতে বাচ্চারা ছুটে আসে। তারাও হাসে।

॥ দশ ॥

চায়ের টেবিল থেকে যূথিকার ডাক আসে। দুই বন্ধুতে আবার তর্ক করতে করতে খাবার ঘরে যায়। যূথিকাও তাদের কথাবার্তায় যোগ দেয়।

"আচ্ছা, সৌম্যদা," যূথিকা বলে, "সমুদ্রমন্থনে কি শুধু অমৃত উঠেছিল? গরলও কি ওঠেনি? একরত্তি ক্ষমতা হাতে আসতে না আসতেই অমনি বেধে গেছে অন্তর্বিবাদ। কৃষক প্রজা দলের সঙ্গে মুসলিম লীগের, মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের, কংগ্রেসের ডান হাতের সঙ্গে বাঁ হাতের, ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে প্রেসিডেন্টের। এর পরে যখন কেন্দ্রেও ক্ষমতা আসবে তখন কি বাধবে না মিলিটারির সঙ্গে সিভিলের, দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে প্রাক্তন ব্রিটিশ ভারতের, বাংলার সঙ্গে বিহারের, গুজরাটের সঙ্গে

মহারাষ্ট্রের, তামিলের সঙ্গে তেলুগুর, হিন্দীর সঙ্গে উর্দুর, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর? অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলও উঠে আসবে। সে গরল পান করবেন কে? নীলকণ্ঠ হবেন কে? কেউ যদি সে গরল পান না করেন তবে সারা দেশ জুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।"

সৌম্য চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রাখে। কী উত্তর দেবে স্থির হয়ে ভাবে। তার পর বলে, "সব ঠিক, কিন্তু স্বাধীনতার পথে এতদূর এগিয়ে এসে চলার মোমেন্টাম থামাই কেমন করে? আমাদের নিয়তি আমাদের পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। বিবাদ তো আগে থেকে মেটানো যায় না। বিয়ের আগে কি দাম্পত্য কলহ মেটানো যায়? গান্ধীজীকে তো কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর বুকে সমস্তক্ষণ স্বাধীনতার আগুন জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে বইছে ভ্রাতৃস্নেহের অমৃতধারা। মুসলমান, খ্রীস্টান সকলেই তাঁর ভাই। এমন কি ইংরেজও পর নয়। অ্যাণ্ড্রুজকে আর মীরাবেনকে তিনি কত ভালোবাসেন। আমাদের সংগ্রাম যদি অহিংসভাবে সারা হয়, আমাদের জয় যদি অহিংসার জয় হয়, তবে অমৃতবণ্টনের একটা অহিংস পদ্ধতি পাওয়া যাবেই। আমরা আমাদের ভাগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করব। তবে তার আগে নিশ্চিত হব যে স্বদেশের স্বার্থই সকলের উপরে। সম্প্রদায়ের স্বার্থ নয় বা প্রদেশের স্বার্থ নয় বা শ্রেণীর স্বার্থ নয়। বিদেশের স্বার্থ তো নয়ই।"

মানস হেসে বলে, "একেই বলে কাউনসেল অভ পারফেক্শন। প্রথমেই ধরে নিয়েছ যে অহিংসার জয় হবে। তার পরে ধরে নিয়েছ যে কংগ্রেসের ভাগ কংগ্রেস স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে। তার পরে ধরে নিয়েছ যে স্বদেশের জন্যে যারা বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করেনি তারা স্বদেশের স্বার্থকে সম্প্রদায়ের বা প্রদেশের স্বার্থের উপর স্থান দেবে। তোমরা ন্যাশনালিস্ট বলে কি সবাই ন্যাশনালিস্ট? তোমরা অহিংস বলে কি সবাই অহিংস?"

"আমরাও কি অহিংস?" সৌম্য হেসে বলে, "আমাদের ক'জন অহিংস তা আঙুলে গোনা যায়। সেই ক'জনকে নিয়ে গান্ধী সেবাসঙ্ঘ গড়তে গিয়ে দেখছি তাতেও ভেজাল ঢুকেছে। না, ভাই, আমরা অহিংস নই, তবে আমরা আমাদের কর্মপদ্ধতি থেকে হিংসা প্রতিহিংসা বাদ দিয়েছি। আর ন্যাশনালিস্ট বলতে আমরা এইটুকু বুঝি যে আমরা সকলেই পরাধীন ও আমাদের জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ সে দেশও পরাধীন। পরাধীনতা একটা ইভিল্। তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধ কোথায় যা আমাদের একসূত্রে বাঁধবে? পরাধীনতার বন্ধনই হয়েছে একমাত্র সূত্র। বন্ধন খুলে গেলে আমরা মুক্ত হব ঠিকই, কিন্তু মুক্ত হওয়া আর যুক্ত হওয়া কি এক? ঐক্যের সাধনাও স্বাধীনতার সাধনার মতো একটা অবশ্যকরণীয় সাধনা। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, বাঙালী বিহারী প্রভৃতি বিভেদ সম্বন্ধে যেমন সচেতন ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে তেমন সচেতন নই। ইংরেজ চলে গেলে জাতীয়তাবাদ কতদূর পজিটিভ আর কতদূর নেগেটিভ তার পরীক্ষার সময় আসবে। আশ্চর্য হব না যদি দেশটা তুর্কদের অপসরণের পর বলকান হয়ে ওঠে। বলকান দেশগুলোও স্বাধীন, কিন্তু তাদের রাষ্ট্র এক নয়, কেন্দ্র এক নয়, পলিসি এক নয়, বাণিজ্য এক নয়। সেটা কি ভালো? না মন্দ?"

"তা হলে, সৌম্যদা, তুমি নিজেই স্বীকার করলে যে সেটা মন্দ। ইংরেজরা আর কিছু না করুক এ দেশে একটা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করেছে। ইণ্ডিয়ান আর্মি, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান পুলিশ, ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস থেকে শুরু করে ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ, ইণ্ডিয়ান পোস্টস অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফস প্রভৃতি ভারতকে এমন এক সংহতি দিয়েছে যা আমরা নিজেরা গড়ে তুলতে পারতুম বলে মনে হয় না। ওরা হয়তো সেটা নিজেদের জন্যেই করেছে, কিন্তু আমরাও কি তার থেকে উপকৃত হচ্ছিনে? ওদের তৈরি কাঠামো যদি ওদের অবর্তমানে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায় তা হলে আমরা কি সেই টুকরোগুলোকে জুড়ে জুড়ে একাকার করতে পারব? তেমন সামর্থ্য, তেমন শুভবুদ্ধি, তেমন সদ্ভাব কি আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর আছে? ক্ষমতা হাতে পেলে যে

যার নিজের রাজত্ব স্থাপন করবে। তার খানিকটে কেটে নিয়ে স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবে না। কেন্দ্রকেই সেটা জোর করে কেটে নিতে হবে। গণতন্ত্রের বিচারে ওটা হয়তো ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। কিন্তু জাতীয়তাবাদের দিক থেকে ওটা অত্যাবশ্যক। মুশকিল হচ্ছে এইখানে যে মৌলানা আজাদকে মোসলেম ভারত আপনার বলে গ্রহণ করছে না ও করবে না। মোসলেম ভারতের আনুগত্য চাইলে আজাদের জায়গায় জিন্নাকে নিতে হবে। নইলে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড কেন্দ্রীয় হাই কমাণ্ড হতে পারবে না। কেন্দ্রকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। ইংরেজ শাসনের শূন্যতা বহু পরিমাণে পূরণ করতে পারবে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। সত্যাগ্রহ তখন কোন্ কাজে লাগবে?" মানস সংশয় প্রকাশ করে।

"কংগ্রেস হাই কমাণ্ড একটা পার্টি হাই কমাণ্ড। তাতে জিন্নার স্থান হবে কী করে? তিনি তো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে অন্য পার্টির নেতৃত্ব করছেন। যদি তিনি কংগ্রেসে ফিরে আসতেন তা হলে অবশ্য তাঁর কথা ভাবা যেত। তেমন কোনো সম্ভাবনা আছে কি? তবে দেশ স্বাধীন হলে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড সম্প্রসারিত হয়ে ন্যাশনাল হাই কমাণ্ড হবে। তাতে জিন্না সাহেবকেও নিতে পারা যাবে। কিন্তু আজাদকে বাদ দিয়ে নয়। হ্যাঁ, এইখানেই মুশকিল। জিন্না আজাদকে বর্জন করতে বলবেন। আজাদকে কংগ্রেস পার্টি বর্জন করবে না। সংগ্রামী কমরেডকে কেউ কখনো বর্জন করে? ইংরেজও কি রাজী হবে লীগপন্থী মিত্রদের বাদ দিয়ে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট গঠন করতে? কংগ্রেস যদি গঠন করে ওরা কি স্বীকৃতি দেবে? এটা এমন একটা প্রশ্ন যার উত্তর দিতে না পারলে মোসলেম ভারত স্বতন্ত্র হতে চাইবে। এখন থেকেই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সব মুসলমান চাইবে না, জানি। কিন্তু যারা চাইবে তারা যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তবে তাদের উপর গুলী চালাবে কে? ইংরেজও না, কংগ্রেসও না। সে এক অসহনীয় পরিস্থিতি। উদ্ধারের উপায় এক কংগ্রেস যদি স্বেচ্ছায় অযোধ্যা ত্যাগ করে নির্বাসনে যায়। কিন্তু তা যদি হয় তবে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট গঠন করবে কে?" সৌম্য ভেবে পায় না।

"ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট আর কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট এক জিনিস নয়। মুসলিম রেজিমেণ্টগুলো কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের কাছে আনুগত্যের শপথ নেবে না। কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের নিশানকে সেলাম করবে না। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা সরকারও কেন্দ্রে কংগ্রেস গভর্নমেণ্টকে মান্য করবে না। যতদিন বড়লাট ও ইউনিয়ন জ্যাক, যতদিন ব্রিটিশ বেয়োনেট ততদিন শান্তি। তার পরেই বিস্ফোরণ। অযোধ্যা ত্যাগ করে নির্বাসনে গেলে তা সৈনিকে সৈনিকে লড়াই, জনতায় জনতায় দাঙ্গা। স্বাধীনতা মানে কি অরাজকতা? অরাজকতা কোনো দেশ সহ্য করতে পারে না। যে শাসন করতে পারবে তাকেই সে রাজা করবে। হলোই বা বিদেশী।" মানস বলে।

"সব ঠিক, কিন্তু বিদেশীকে কেউ ডেকে আনবে না। অহিংসার নিয়ম যদি লোকে মানে তবে দেশ অরাজক হবে না। যদি না মানে তবে গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যাবে। গৃহযুদ্ধই নির্ধারণ করবে দেশের ভবিষ্যৎ। যে জিতবে সে-ই রাজত্ব করবে। পরাজিত প্রতিপক্ষকে ডেকে এনে সে রাজত্বের একভাগ দেবে।" সৌম্যর মতে এই হচ্ছে সমাধান।

"গৃহযুদ্ধ?" মানস আঁতকে ওঠে। "এক একটা গৃহযুদ্ধে কত লোক মরে, জানো? আর সে যুদ্ধ কত-কাল ধরে চলে, জানো? জার্মানীর ত্রিশ বছরের যুদ্ধে লোকসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়। তোমরা তো যুদ্ধবিরোধী। আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধ রোধ করতে চাও। গৃহযুদ্ধ নিশ্চয়ই রোধ করবে।"

"করব নিশ্চয়ই! গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো শহীদ হতে হবে। মহাত্মার মনেও তেমনি শহীদ হওয়ার সংকল্প। গৃহযুদ্ধের দিন আমরা দুই আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শান্তির প্রয়াস চালিয়ে যাব।" সৌম্য প্রতিশ্রুতি দেয়।

"কিন্তু আরোগ্যের চেয়ে নিবারণ শ্রেয় নয় কি?" মানস তর্ক করে। "গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত যেতে হবে কেন? প্রত্যেকটি প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার গঠন করো। তার পরে কেন্দ্রেও তার অনুসরণ করো।

কংগ্রেস লীগ একমত হলে ইংরেজ কতদিন ঠেকাতে পারবে? তার জন্যে আর এক দফা সত্যাগ্রহ করতে হবে কেন?" মানস জানতে চায়।

"মনে হচ্ছে এটা তোমার মুসলিম বন্ধুদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি।" সৌম্য মুচকি হাসে। "কিন্তু তেমন কোয়ালিশন ক'টা বিষয়ে একমত হতে পারবে? এই ধরো না কেন, যুদ্ধে যোগদান। শর্তে না বনলে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন। লীগ মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন কি? তাঁরা যেখানে যেখানে আছেন তাঁরা সেখানে সেখানে থাকবেন। ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে অসহযোগ মুসলীম লীগ পলিসি নয়। তাঁদের পলিসি পারস্পরিক সহযোগিতা। ইংরেজরা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করবে। মুসলমানরা ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এরাও মাইনরিটি। ওরাও মাইনরিটি। মাইনরিটিকে মাইনরিটি রক্ষা না করলে কে রক্ষা করবে? ইংরেজ চলে গেলে মুসলিম মাইনরিটির কী দশা হবে? ইংরেজ থাকতে কংগ্রেসের ভূমিকা হচ্ছে অপোজিশনের ভূমিকা। লীগের ভূমিকা তা নয়। ইংরেজ যখন থাকবে না তখন লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের সময় আসবে। নেহাৎ যদি প্রতিনিধিত্বের চড়ায় আটকে না যায়। মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি মুসলিম লীগ এ দাবী মেনে নিতে কংগ্রেস কখনো রাজী হবে না। হলে তার নিজেরই প্রতিনিধিত্ব কেবলমাত্র হিন্দুদের হয়ে দাঁড়ায়। লীগ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন কংগ্রেস ছিল। বিশ একুশ বছর ধরে সে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছিল। লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব সংকীর্ণ হয়ে গেল? কংগ্রেস কি সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমবর্জিত হলো? কই, না। জিন্না সাহেব যেমন কংগ্রেসে ছিলেন তেমনি কংগ্রেসে রয়ে গেলেন। অধিকন্তু লীগেও যোগ দিলেন। জিন্নার কংগ্রেসত্যাগ অসহযোগের পরবর্তীকালে। গান্ধী এসে অসহযোগের সূত্রপাত না করলে জিন্না কংগ্রেসের ঘরের পিসী ও লীগের ঘরের মাসী হয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধন করতেন। নীতির সঙ্গে নীতির বিরোধ তো মডারেটদের সঙ্গেও হয়েছে। তা বলে কেউ তো কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাননি। কোয়ালিশন যদি কোনোদিন হয় তবে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উপেক্ষা করেই হবে। যেমন হয়েছে কৃষক প্রজা দলের সঙ্গে মুসলিম লীগের। হক সাহেব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উনিও এককালে কংগ্রেসে ছিলেন। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগেও ছিলেন। সেকালে এটা দোষের কথা ছিল না। গান্ধীজী যদি না আসতেন, কংগ্রেস যদি সহযোগিতার নীতি ত্যাগ না করত, কোয়ালিশন অনেকদিন আগেই সম্ভব হতো। জিন্নাই হতেন তখন কংগ্রেসের প্রতিভূ। এখন যেমন আজাদ। কিন্তু ইংরেজ থাকতে থাকতে কংগ্রেস তার নীতি পরিবর্তন করবে না। গান্ধীজী থাকতেও না।"

"আমাদের ছেলেবেলায় কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের একটা চুক্তি হয়েছিল। জিন্নার মধ্যস্থতায়ই সেটা সম্ভব হয়েছিল। তখন নামে না হোক কার্যত মুসলিম লীগ হয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও কংগ্রেস অমুসলমান সম্প্রদায়বর্গের। ইংরেজরা সেইভাবে নির্বাচকমণ্ডলী ভাগ করেছিলেন। একভাগে মুসলমান, অপর ভাগে অমুসলমান। শিখরা বাদে। কংগ্রেস সেটা মেনে নিতে নারাজ হয়েছিল, কিন্তু লখনউতে ১৯১৬ সালে রাজী হয়। এর পর ওঠে ওয়েটেজের প্রশ্ন। হিন্দুদের যেসব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেসব প্রদেশে মুসলমানরা চায় সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসন আইনসভায়। মুসলমানদের যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেসব প্রদেশে অমুসলমানরা চায় সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসন আইনসভায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলে এ প্রশ্নের ফয়সালা করে অমুসলমানের ভাগ থেকে কেটে মুসলমানকে ওয়েটেজ দিয়ে ও মুসলমানের ভাগ থেকে অমুসলমানকে ওয়েটেজ দিয়ে। বলা বাহুল্য অমুসলমান মানে প্রধানত হিন্দু। পরে তার জায়গায় বসানো হয় 'জেনারেল'। ওয়েটেজের এই আদানপ্রদান শাসনসংস্কারের সামিল হয়। কথা হচ্ছে এতদূর এসে তোমরা পিছিয়ে যাবে কোন্ যুক্তিতে? অসহযোগই করো আর সহযোগিতাই করো তোমরা অমুসলমানদের তরফ থেকে ওয়েটেজ দিয়েছ ও পেয়েছ। ওরাও মুসলমানের

তরফ থেকে ওয়েটেজ পেয়েছে ও দিয়েছে। মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী থেকে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা জয়ী হয়েছে বলেই কি কংগ্রেস মুসলমানদের তরফ থেকেও আদানপ্রদানের অধিকারী হলো? আদানপ্রদানটা কার সঙ্গে কার, যদি কংগ্রেসই হয় দুই তরফের প্রতিনিধি? আর লীগ হয় মুসলমানের ক্ষুদ্র একটি বিভাগের? কংগ্রেস একাই সকলের হয়ে ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করবে, দেশের জন্যে স্বাধীনতা আদায় করে নেবে? উত্তম। কিন্তু সংবিধান রচনার সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়ে সেফগার্ড দাবী করবে কারা? কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা বা লীগপন্থী মুসলমানরা? এই প্রশ্নে মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর ভোট পড়বে কাদের দিকে বেশী? জিন্নাকে তাঁর পাওনা দিতে হবেই। তিনি সায় না দিলে ইংরেজ সায় দেবে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টই তো আইন পাশ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। তবে তোমরা যদি গায়ের জোরে মসনদ দখল করতে পারো সেকথা আলাদা। গায়ের জোরে তোমরা বিশ্বাসই করো না। তবে কি আত্মার জোরে দখল করবে?" মানস হাসে।

"প্যারালাইজ করব। দিল্লীর হুকুম দিল্লীর বাইরে পৌছবেই না। কলকাতার হুকুম কলকাতার বাইরে পৌছবেই না। জেলার সদরের হুকুম সদরের বাইরে পৌছবেই না। মহকুমার সদরের হুকুম মহকুমা সদরের বাইরে পৌছবেই না। গ্রামে গ্রামে গজিয়ে উঠবে গ্রাম পঞ্চায়েৎ। তার ঊর্ধ্বে থানা পঞ্চায়েৎ। তার ঊর্ধ্বে মহকুমা পঞ্চায়েৎ। তার ঊর্ধ্বে জেলা পঞ্চায়েৎ। তার ঊর্ধ্বে প্রদেশ পঞ্চায়েৎ। সকলের ঊর্ধ্বে দেশ পঞ্চায়েৎ। সব চেয়ে কম ক্ষমতা সকলের ঊর্ধ্বে। সব চেয়ে বেশী ক্ষমতা সকলের নিচে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যদি স্বীকৃতি না দেয় কী আসে যায়? আমাদের সংবিধান আমরাই রচনা করব। সে সময় পঞ্চায়েতী পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে মুসলমান সদস্যরাও থাকবেন। সেফগার্ড যদি চান, যা চান আপসে মেনে নেওয়া হবে। সর্ব স্তরেই তাঁদের উচ্চস্থান থাকবে। তবে তাঁরা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি না হয়ে সাধারণের প্রতিনিধি হবেন। সেইজন্যে ওয়েটেজ ইত্যাদির প্রশ্ন উঠবে না। যদি ওঠে তখন পারস্পরিক আদানপ্রদান হবে। তবে কেন্দ্রে মুসলমানরা কেমন করে ওয়েটেজের প্রতিদানে ওয়েটেজ দেবেন বলতে পারছিনে। একটাই তো কেন্দ্র। সেখানে এক মাইনরিটিকে ওয়েটেজ দিলে অন্যান্য মাইনরিটিদেরও ওয়েটেজ দিতে হবে। সেটা দিতে গেলে মেজরিটির ভাগে কতটুকু বাকী থাকে?" সৌম্য সংশয়ান্বিত।

"এই নিয়েই বিরোধ বেধে যাবে, সৌম্যদা। সেটা যেন জার্মানীর মতো প্রটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকের সশস্ত্র যুদ্ধে না গড়ায়। হিন্দু মুসলমান তো প্রটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকের চেয়ে আরো বেশী ফারাক। দুটো সম্প্রদায় বললে ঠিক বোঝানো যায় না। দুটো নেশন বললেও ভুল বোঝানো হয়।" মানস ভেবে পায় না কী বলে বোঝানো যায়।

যূথিকা কণ্ঠক্ষেপ করে। "নেশন বললে কি ভুল হবে?"

"আলবত।" মানস উত্তর দেয়। "মুসলমান তো আফগান, ইরানী, তুর্ক এরা সবাই। তা হলে সবাই মিলে এক নেশন? তা নয়, চীনা মুসলমানরা চীনা, ইন্দোনেশিয়ান মুসলমানরা ইন্দোনেশিয়ান, ভারতীয় মুসলমানরা ভারতীয়। তবে তারা হিন্দু নয়। যেমন আইরিশ প্রটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিক নয়। তা সত্ত্বেও বার্নার্ড শ আইরিশ, য়েটস আইরিশ, এ. ই. যাঁর ছদ্মনাম সেই জর্জ রাসেল আইরিশ। আইরিশ নেতা পার্নেলও ছিলেন প্রটেস্টাণ্ট।"

"কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল আইরিশরা স্বাধীন হয়ে এক নেশন রইল না। প্রটেস্টাণ্টরা পৃথক হয়ে গেল।" যূথিকা বলে। "উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রটেস্টাণ্টরা আর আইরিশ বলে পরিচয় দেয় না। ওরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টেই ওদের সদস্য পাঠায়। নেশন বলতে ওরা বোঝে ব্রিটিশ নেশন। যে নেশন প্রধানত প্রটেস্টাণ্ট। ধর্মভেদ থেকে নেশনভেদ বিংশ শতাব্দীতেও অপ্রচলিত হয়নি। ভারতীয় মুসলমানরা যদি ভারতীয় বলে পরিচয় দেয় তবে ওরা আলাদা নেশন হতে পারে না। আর যদি আলাদা নেশন বলে পরিচয় দেয় তবে ওরা ভারতীয় থাকতে পারে না। ওদেরকেই মনঃস্থির করতে হবে। ওদের সিদ্ধান্তটাই

আমরা আপসে মেনে নেব। গৃহযুদ্ধ বাধতে যাবে কেন?"

"তুমি তো বেশ বললে!" মানস বিরক্ত হয়। "আলাদা নেশন হলে আলাদা নেশনকে আলাদা ভূমি দিতে হবে। ওরা যদি দিল্লী চায় তা হলে কি আমরা ওদের দিল্লী ছেড়ে দেব? কুরুক্ষেত্র বাধবে না? ওরা যদি বলে কলকাতা ওদের আমরা কি কলকাতা ছেড়ে দেব? লঙ্কাকাণ্ড বাধবে না? আবার শিখরাও তো বলবে লাহোর ওদের, অমৃতসর ওদের, নানকানা সাহেব ওদের। ওরাও তো বলবে ওরাও আলাদা এক নেশন, ওদেরও আলাদা বাসভূমি। মুসলমানরা কি তাতে রাজী হবে? বেধে যাবে না চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ? মুসলমানরা যে প্রত্যেকবারে জিতবেই এমন কী কথা আছে? যেটুকু ওরা বিনা দ্বন্দ্বে পাবে সেটুকুই ওদের। আর সেটুকু কি ওদের মনে ধরবে? ওতে কি ওদের পেট ভরবে?"

সৌম্য মৌনভঙ্গ করে। "দ্যাখ, মানস, মুসলমানরা বেশীর ভাগ আমাদেরই ঘরের ছেলে। এক একটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা তরু দত্ত। ওরা যদি আলাদা নেশন হয় তো আরবী নামকরণের মোহেই হবে। আলাদা বাসভূমি যদি চায় তবে সেটাও হবে মোহবশে চাওয়া। পুরুষানুক্রমে যদি চাইত তা হলে জানতুম যে ওরা দীর্ঘকাল ধরে বিচার বিবেচনা করে ও রকম একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রসঙ্গ সবে উঠতে শুরু করেছে। তার সংজ্ঞা যে কী তাও কেউ বলতে পারছেন না। লীগপন্থীদের ওয়েটেজ, ভীটো ইত্যাদি দাবী মিটলে তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনেই রাজী হবেন। তবে এটাও তাঁদের প্রত্যাশা যে আবার যখন নির্বাচনের সময় আসবে তখন একই নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রতিযোগিতায় নামবে না। কংগ্রেসকেই মুসলিম আসনের দাবী ছেড়ে দিতে হবে। এখন থেকেই কংগ্রেসপন্থী মুসলিমদের কোয়ালিশন থেকে বাদ দিতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস কখনো তার সংগ্রামী কমরেডদের বর্জন করবে না। লীগ যদি অবুঝ হয় তো কোয়ালিশন সুদূরপরাহত। অগত্যা আলাদা একটা রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠবেই। সব মুসলমান সে প্রস্তাব সমর্থন করবে না। করবে যারা তারা সেপারেটিস্ট। এদের সংখ্যা কত, প্রভাব কত তা বলা শক্ত। যদি খুব বেশী হয় তবে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা অমূলক নয়। কারণ হিন্দুরা কেউ তেমন প্রস্তাবে রাজী হবে না, শিখরাও না, কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরাও না। গোটা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নারাজ হবে। লীগপন্থীরা যদি মনে করে থাকেন যে সেই মর্মে আপস হবে তা হলে তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন। ইংরেজরাও যদি মনে করে থাকেন যে তাঁরা সে রকম একটা রোয়েদাদ চাপিয়ে দিয়ে যাবেন তা হলে তাঁরাও নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন।"

"আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের গুরুজনদের মুখে শুনতুম ভারতের আদর্শ হচ্ছে সর্ব ধর্ম সমন্বয় আর হিন্দু মুসলিম ঐক্য।" মানস বলে। "কিন্তু আমাদের চোখের সুমুখেই হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠছে। আমরা যতই বলি না কেন তৃতীয় পক্ষ এর জন্যে দায়ী, আমাদের দুই পক্ষের মনেই পরস্পরের প্রতি ভয় আর অবিশ্বাস, ঈর্ষা আর দ্বেষ। যেন অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ক্ষমতাই হচ্ছে মোক্ষ। যার আছে সে কিনা হ্যাভ। যার নেই সে কিনা হ্যাভ-নট। এদের মধ্যে ঐক্য কেমন করে সম্ভব? আর সমন্বয় বলতে কি বোঝায় প্রার্থনা সভায় যে যার মতে প্রার্থনা করা? ওটার নাম সমন্বয় নয়, সহ-অবস্থান। সহনশীলতা।"

"তিক্ততা যে দিন দিন বাড়ছে তা তো প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু সেটা কি ধর্মের সঙ্গে ধর্মের মিল নেই বলে? সাধারণ মানুষ এ নিয়ে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছেছে। সেটা সমন্বয় নয়, কিন্তু 'লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ'। তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি। এইভাবে বহু শতাব্দী ধরে শান্তি রক্ষিত হয়েছে। ক্রুসেডও বাধেনি, ত্রিশ বছরের যুদ্ধও বাধেনি। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে দাঙ্গা বেধেছে। তাও ধর্ম নিয়ে নয়, গোহত্যা নিয়ে। মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। কিন্তু আজকের দিনে যে অশান্তি দেখছ এটা তত্ত্বের মামলা নয়, স্বত্বের মামলা। কোন্ সম্প্রদায়ের ভাগে ক'টা চাকরি পড়বে, ক'টা আসন পড়বে, ক'টা মন্ত্রীপদ পড়বে এই নিয়ে রেষারেষি। হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষায় পঞ্চাশ বছর স্টার্ট পেয়ে চাকরিবাকরিতে সংখ্যানুপাতের

অতিরিক্ত পেয়েছে। পঞ্চাশ বছরের পথ মুসলমানরা পাঁচ বছরে অতিক্রম করবে কী করে? জার্মানী আর জাপান যেমন চাইছে ইংলণ্ড আমেরিকার শিল্পায়নের দেড়শো দু'শো বছরের প্রগতিকে পঞ্চাশ ষাট বছরে অতিক্রম করতে। পাল্লা দিয়ে পারছে না। তাই যুদ্ধ করছে। হ্যাঁ, যেমন ওদেশে তেমনি এদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাই হচ্ছে মোক্ষ। তার জন্যে ওরা যুদ্ধ করছে, বিপ্লব করছে। আমরা করছি ধর্মের নামে দাঙ্গা। হ্যাভ আর হ্যাভ-নট যদি বলো, শতকরা ক'জন হিন্দু হ্যাভ। বেশীর ভাগই তো হ্যাভ-নট। আর মুসলমানদের মধ্যেও কি হ্যাভ নেই? ভারতের সবচেয়ে ধনী মানুষটিই তো মুসলমান। হায়দরাবাদের নিজাম। ধনসম্পদের অসম বন্টন তো সম্প্রদায় অনুসারে হয়নি। হয়েছে পরিবার বা গোষ্ঠী বা ব্যক্তি অনুসারে। এর মধ্যে সম্প্রদায়কে টেনে আনা হচ্ছে যারা স্টার্ট পায়নি তাদের স্বার্থে। তারাই কি তাদের সম্প্রদায়ের শতকরা একশো জন? জনগণের এতে লাভ কতটুকু হবে? তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। অথচ তারাই মরছে দাঙ্গাহাঙ্গামায়। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য আমরা সমস্ত অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তা না হলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় পক্ষ থাকতে দাবীদাওয়ার শেষ নেই। তৃতীয় পক্ষই অলক্ষ্যে দর বাড়িয়ে দিচ্ছে। তারা আরো বেশী দিতে পারে এই বিশ্বাস থেকে উঠছে অতিরিক্ত দাবী।" সৌম্য বলে।

"তৃতীয় পক্ষকে কথায় কথায় জড়াতে চাও কেন? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান, মহাজন হিন্দু, খাতক মুসলমান? তার মানে হিন্দু হ্যাভ, মুসলমান হ্যাভ-নট। সাম্প্রদায়িক রূপ নিলেও আসলে এটা শ্রেণীসমস্যা। শ্রেণীসংঘর্ষ এদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূর্তি ধরতে পারে। অন্য দেশে যারা কমিউনিস্ট এদেশে তারা কমিউনালিস্ট। কিন্তু উদ্দেশ্য একই। জমিদারি বিলোপ। মহাজনী বারণ। যাদের স্বার্থহানি হবে তারা হিন্দুধর্মের নাম করে বাধা দেবে। কংগ্রেসও যে বাধা দিচ্ছে না তা নয়। আইনসভায় দেখা যাচ্ছে মুসলিম লীগই প্রগতিশীল, কংগ্রেস প্রগতিবিরোধী। বাংলার কথাই বলছি। কংগ্রেস যে কেবল মধ্যবিত্ত মুসলমানদের আস্থা হারাচ্ছে তাই নয়, প্রজা ও খাতক শ্রেণীর মুসলমানেরও বিশ্বাস হারাচ্ছে? ওরা দেশের স্বাধীনতার মহিমা বোঝে না। বোঝে কম খাজনা ও বিনা সুদের মর্ম।" মানসও সহানুভূতিশীল।

"যারা কমিউনিস্ট হতে পারত তারা কমিউনালিস্ট হচ্ছে। এটা আমিও লক্ষ্য করেছি। এইভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করা হচ্ছে। এই খেলা খেলছে হিন্দু মহাসভা। হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের স্বার্থ রক্ষা করতে। বাংলার কংগ্রেস যদি দূরদর্শী হতো জমিদার মহাজনদের স্বার্থের চেয়ে প্রজা ও খাতকদের স্বার্থের উপর আরো জোর দিত, যেমন দিচ্ছে মাদ্রাজের কংগ্রেস। এই অর্থনৈতিক বিরোধটাকে কংগ্রেস যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারছে না দলের সংহতি রাখতে গিয়ে। এই ইস্যুতে যদি দল ভেঙে যায় তো স্বাধীনতার জন্যে লড়বে কে? প্রথম কাজটি প্রথমে। একমুঠো জমিদার লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রতিরোধের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু সেটা এখন নয়, স্বাধীনতার পরে। মহাজনদের হটানো আরো শক্ত, কারণ ওরাই গ্রাম অঞ্চলের ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের বিস্তার না হলে অভাব অনটনের সময় লোকে যাবে কার কাছে? মানছি ওরা এক একটি শাইলক আর ওরা হয় হিন্দু নয় কাবুলী মুসলমান। সাধারণ মুসলমান ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে। সুদ নেওয়াকে মনে করে হারাম। ডাকঘরে যাদের আমানত আছে তারা সুদের টাকা তুলবে না। ও টাকা জমতে জমতে আসলকে ছাড়িয়ে যায়। এইখানেই ইসলামের জোর। এমন জোর তো আর কোনো ধর্মের নেই। যদিও কুসীদবৃত্তির নিন্দাবাদ আছে খ্রীস্টধর্মেও। হিন্দুধর্মেও ওটা গর্হিত। যেসব ব্রাহ্মণ কুসীদজীবী তারা ছোট ব্রাহ্মণ। আমি অবাক হই ভেবে ইসলামের কঠোর হস্ত কাবুলীদের বেলা নরম কেন? কাবুলীদের উৎপাতে বাঙালী হিন্দুরাও তো কমিউনাল হতে পারত। কিন্তু হয় না। তা হলে সাহা মহাজনদের উৎপাতে মুসলমানরা কমিউনাল হবে কেন?" সৌম্য বিস্মিত হয়।

"তবে কি তুমি বলতে চাও ওরা কমিউনিস্ট হবে? কংগ্রেসী হয়ে তো কোনো লাভ নেই। তোমরা পরাধীন থাকতে প্রতিকার করবেও না, করতে দেবেও না। মন্দ কী, যদি ওরা কমিউনিস্ট হয়ে প্রতিকার খোঁজে?" মানস ইচ্ছে করে খোঁচায়।

"কমিউনিস্টদের প্রতিকারের উপায় তো আগে রাষ্ট্র দখল করা, তার পরে অন্যায় দূর করা। রাষ্ট্র দখল করা কি আজ এখনি সম্ভব? কমিউনিস্টরা বিপ্লবের জন্যে তোড়জোড় করবে। তাদের শাস্ত্রে বলে বিপ্লব না হলে রাষ্ট্র দখল করা যায় না। তোড়জোড় করতে করতেই লগ্ন অতীত হবে। যে লগ্নে গণ সত্যাগ্রহ করে প্রশাসনকে প্যারালাইজ করা সম্ভবপর। তুমি দেখবে ওদের আগেই আমরা লগ্ন জেনে জয়যাত্রায় বেরোব ও জয়যুক্ত হব। তার পরে আসবে সামাজিক যত অন্যায়ের প্রতিকার। মেরে কেটে নয়, বিনা রক্তপাতে আমরা সব রকম শোষণ রদ করব। কমিউনিস্ট বা কমিউনালিস্ট না হয়েও অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়, মানস। যদি তার আগে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি। আপাতত আমাদের এক লক্ষ্য। লক্ষ্যভেদ করতেই হবে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।" সৌম্য উপনিষদ্ থেকে উদ্ধৃতি দেয়।

"আমার কী জানি সন্দেহ হয় যে কংগ্রেস হবে ভারতের কুওমিনটাং। মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়ে সান ইয়াৎ সেনও তো কত বড়ো বড়ো কথা বলেছিলেন। জীবনে দেখে যেতে পারলেন না তাঁর সাধু সংকল্পের রূপায়ণ। চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে, দরিদ্ররা আরো দরিদ্র। ওদেশেও সমাজবিপ্লবের জন্যে তোড়জোড় চলছে। মাওপন্থীরা লং মার্চ করে একটা অঞ্চল দখল করে ফেলেছে। ওরাও কমিউনিস্ট, তবে ঠিক লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। কংগ্রেস যদি কুওমিনটাং হয়ে ওঠে এদেশেও চীনদেশের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, সৌম্যদা। এটা গরিব লোকদেরই দেশ। দেশকে মুক্ত করলে কী হবে, গরিবকে মুক্তি দিতে হবে। সুদ থেকে, খাজনা থেকে, মুনাফা থেকে, বেগার থেকে, বেকারি থেকে, জাতপাত থেকে, ধর্মান্ধতা থেকে। যদি সম্ভব হয়, বিনা রক্তপাতে। নয়তো—" মানস শেষ করে না। চোখ বোজে।

"ক্ষমতা হাতে পেলে চরিত্রভ্রংশ ঘটে এটা কংগ্রেসের বেলাও যে সত্য হতে পারে না তা নয়। আমরা তো এর জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। কংগ্রেসের অধঃপতন দেখলে আমরা কংগ্রেস থেকে সরে যাব ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সত্যাগ্রহ করব। কংগ্রেসের বিনাশ নয়, তার সংশোধনই আমাদের কাম্য হবে। কংগ্রেস যদি গান্ধীনির্দিষ্ট পন্থায় চলে তবে সুদ, মুনাফা, খাজনা প্রভৃতির দুর্বহ ভার থেকে দেশের শোষিত জনগণ মুক্তি পাবে। মার্কসবাদীদের মতো আমাদেরও লক্ষ্য শোষণমুক্ত সমাজ। যেটা ওদের কল্পনার বাইরে সেটাও আমাদের ধ্যানে আছে। শাসনমুক্ত রাষ্ট্র।" সৌম্য বলে যায়।

"কেন, ওরাও তো বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে শূন্য হয়ে যাবে। ধরো, একশো বছর পরে।" মানস মুখ টিপে হাসে।

"আমরা কিন্তু আরো আগে লক্ষ্যভেদ করব আশা করি। ধরো, পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে। হাসছ যে। বিশ্বাসে হয় না?" সৌম্যও হাসে।

"বিশ্বাসে মিলয়ে গান্ধী, তর্কে বহুদূর।" যূথিকা ফোড়ন কাটে।

"দেখবে তোমরা, আগে স্বরাজটা তো হোক। সঙ্গে সঙ্গেই বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়ে যাবে। সেই প্রক্রিয়া যখন সারা হবে তখন দেখবে দেশের জনগণ আর প্রত্যেকটি বিষয়ে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী নয়। লোকে যদি রাষ্ট্রের মুখের দিকে তাকিয়ে না থাকে তবে রাষ্ট্রকেই বা পুছতে যাবে কেন? রাষ্ট্র তবু থাকবে। তার কাজ হবে কো-অর্ডিনেশন। নয়তো ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" সৌম্য আশঙ্কা করে।

"তা হলেও কংগ্রেসের মতো একটি সংগঠন বা গান্ধীসেবাসঙ্ঘের মতো একটি সঙ্ঘ আবশ্যক হবে পরিচালনার জন্যে বা সমালোচনার জন্যে বা প্রতিরোধের জন্যে। তা ছাড়া একটা বাহিনী তো

আবশ্যক হবেই দেশরক্ষার জন্যে। উচ্চতম বিচারশালাও আবশ্যক হবে। যত ক্ষুদ্র হোক না কেন; একটা ব্যুরোক্রাসীও আবশ্যক না হয়ে পারে না। সকলের উপরে আবশ্যক হবে একটা কনস্টিটিউশন। গান্ধীজীকেও এসব কথা ভেবে দেখতে হবে।" মানস বলে।

"গান্ধীজীর মতে সব কিছু গড়ে উঠবে নিচের থেকে উপরে।" সৌম্য বোঝায়।

"কিন্তু কার্যত সব কিছু নামছে উপরের থেকে নিচে। গান্ধীজী, তাঁর নিচে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড, তাঁর নিচে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, মায় কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী। এর পরে হয়তো কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের সদস্যগণ। আপাদমস্তক নয়, মাথা থেকে পায়ের নখ।" মানস টিপে টিপে বলে।

"এটা হচ্ছে সংগ্রামের অনুরোধে। আমাদের তো আর কোনো সৈন্যদল নেই। ঐ কংগ্রেসই আমাদের সৈন্যদল। আর গান্ধীজীই আমাদের প্রধান সেনাপতি। তাঁর নিচে সৈন্যদলের হাই কমাণ্ড। সংগ্রামের পর এর প্রয়োজন থাকবে না।" সৌম্য যেন সব জানে।

"আমার তো মনে হয় এ ব্যবস্থা থাকতে এসেছে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে সেকালের ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে স্টেটের। গান্ধীজীই হবেন পোপ। পোপ যেমন সম্রাটের ঊর্ধ্বে তিনিও তেমনি রাষ্ট্রপতির ঊর্ধ্বে। পরে একসময় ঘটবে উভয়ের সংঘর্ষ।" মানস অনুমান করে।

"রাজনীতি যদি নীতির অনুশাসন মেনে চলে তা হলে সংঘর্ষের উপলক্ষ থাকবে না। কংগ্রেস যদি কেবল রাজনীতি নিয়ে মত্ত থাকে, নীতি নিয়ে মাথা না ঘামায় তবে দেশের যিনি সবচেয়ে বিবেকবান পুরুষ তিনি বিবেকের বাণী শোনাবেন। না শুনলে সংঘর্ষ বাধবে। গান্ধীজী পোপও হতে চান না, চার্চও গড়তে চান না। তোমার ও সন্দেহ অযথা। পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম যতদিন কংগ্রেস হাই কমাণ্ড ততদিন। আবার যখন সত্যাগ্রহের ডাক আসবে তখন গান্ধীজীই হলেনএকমাত্র কমাণ্ডার। হাই কমাণ্ড কেউ নয়। কেন ওঁদের অত গুরুত্ব দেওয়া? ওঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা?" সৌম্য উপেক্ষা করে।

।। এগারো ।।

"দাদা," যূথিকা আর এক পেয়ালা চা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "এই মানুষটির সঙ্গে কী করে ঘর করি, বলতে পারো? সারা রাত ইনি পায়চারি করবেন। এঁর ওই একই চিন্তা, একই ধ্যান। গেল, গেল, ব্রিটিশ মিউজিয়াম গেল। গেল, গেল, লুভর মিউজিয়াম গেল। ভীনাস ডি মাইলো, তোমাকে কি আর দেখতে পাব? মোনা লিসা, তোমাকে কি আর দেখতে পাব? বিশ্বমানবের কী অপূরণীয় ক্ষতি। আমি কি নীরব দর্শক হতে পারি? বলুন দেখি দাদা, নীরব দর্শক না হয়েই বা আমরা কী হতে পারি। সশস্ত্র যোদ্ধা? তাতে কি ক্ষতি কমবে না বাড়বে? ইংরেজ ফরাসীরাও পাল্টা দিতে গিয়ে রোম মিউনিক ড্রেসডেন ধ্বংস করবে। ইউরোপে যদি যাই আমি কি দেখতে পাব রাফেলের আঁকা সিস্টিন মাডোনা? মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মোজেস?"

"বোন, ওটা আমারও জিজ্ঞাসা।" সৌম্য ব্যথিত হয়ে বলে, "হিংসা এখন বিশ্ব জুড়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে হিংসার সঙ্গে বলপরীক্ষা করতে। মানুষই মানুষের হাতে গড়া সভ্যতাকে বোমা ও গোলা দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করবে। শহরকে শহর জ্বালিয়ে দেবে। গুঁড়িয়ে দেবে। প্রাণের প্রতিও বিন্দুমাত্র মমতা নেই। নিরীহ নারী ও শিশুর প্রাণ যাবে। যুদ্ধ যেদিন শেষ হবে সেদিন আবার শুরু হবে আরো এক যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব। সেদিন যদি মানস বেঁচে থাকে তাকে সেই একই প্রশ্ন সারারাত জাগিয়ে রাখবে। আমি যদি বেঁচে থাকি আমাকেও। এর একটিমাত্র উত্তরই সম্ভব। হিংসা যেমন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে অহিংসাও তেমনি

সঙ্ঘবদ্ধ হবে। হিংসার সঙ্গে একদিন অহিংসার বলপরীক্ষা হবে। তাতে যদি অহিংসার জয় হয় তবেই মানুষ এ পৃথিবীতে আরো কয়েক হাজার বছর বাঁচবে। তার সভ্যতাও নিষ্কণ্টক হবে। নয়তো এই শতাব্দীতেই ইউরোপ আত্মঘাতী হবে, ভারতকেও নিজের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে সহমরণে নিয়ে যাবে। আমাদের সবচেয়ে জরুরি কাজ এখন নিজেদের ছাড়িয়ে নেওয়া ও সঙ্ঘবদ্ধ হিংসার প্রতাপকে সঙ্ঘবদ্ধ অহিংসা দিয়ে প্রতিরোধ করা। তা সে ইংরেজেরই হোক আর জার্মানেরই হোক আর জাপানীরই হোক। বিশ্ব এখন ভারতের কাছেই এর পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখবে বলে অপেক্ষা করছে। আমরা কি প্রস্তুত? হার জিৎ আমাদের হাতে নয়, ঈশ্বরের হাতে। হেরে গেলেও আমরা অপরের জন্যে দৃষ্টান্ত রেখে যাব। গান্ধীজীই যে অহিংসার শেষ প্রোফেট তা নয়। আমরাও যে শেষ সাধক তাও নয়। কিন্তু আজকের জগতে এই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত ভূমিকা। না, আমরা নীরব দর্শক নই। এই দাবানলের দমকল বাহিনী যদি কোথাও থাকে তবে তা ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ অহিংসাবাদী মণ্ডলী। কংগ্রেস বলতে পারলে গর্বিত হতুম, কিন্তু সে গর্ব আমাদের সাজে না। গান্ধী সেবাসঙ্ঘ বলতে পারলে আরো গৌরব বোধ করতুম, কিন্তু সেখানেও সুবিধাবাদীর ভিড়।"

মানস তা শুনে বলে, "সভ্যতার সঙ্কট ক্রমেই ঘনিয়ে আসবে, সৌম্যদা। হিটলার হয়তো পোলাণ্ডের পর স্টালিনের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়াকেই আক্রমণ করবে। প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে রুশ বিপ্লবকে পরাভূত ও বিপর্যস্ত করবে। আমি নিজে কমিউনিস্ট না হলেও ওদের ওই বিরাট পদক্ষেপের ট্র্যাজিক পরিণাম কামনা করিনে। সব লাল হয়ে যাবে না বলে বহু দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, কিন্তু সব কালো হয়ে যাবে এটাও কম অস্বস্তিকর নয়। এটা হবে আরো বড়ো ট্র্যাজেডী। কে জানে হয়তো ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রক্ষণশীলরা হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসরণ করবেন।"

"তাই যদি হয় তো ব্রিটেন ফ্রান্স বেঁচে গেল। ওরাই তো তোমার বিশ্বমানব। ওদের নিয়তিই তোমার মানবনিয়তি।" সৌম্য পরিহাস করে।

"আহা। তুমি বুঝতে পারলে না? জার্মানীর সঙ্গে সংগ্রামে রাশিয়া যদি জেতে বিপ্লব দেশে দেশে ছড়াবে। ভারতও লাল হয়ে যাবে। আর জার্মানী যদি যেতে তার বিপ্লব রুশদেশেই ব্যর্থ হবে। দুনিয়ার কোনোখানেই সফল হবে না। নাৎসীবাদ দিকে দিকে ছড়াবে। বিপ্লব বলো প্রতিবিপ্লব বলো উভয়েরই ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যাবে রুশ জার্মান রণক্ষেত্রে। এ যুদ্ধ কি কেবল আলসাস লোরেন আর উপনিবেশের জন্যে হচ্ছে? পোলাণ্ড থেকে হিটলার পূর্ব মুখেও এগিয়ে যেতে পারে, পশ্চিম মুখেও মোড় ঘুরতে পারে। বিশ্বমানব বলতে আমি রুশদেরও বুঝি। ইতিহাসে ওরা একটা নতুন পরীক্ষা চালাচ্ছে। ওদের গুরু মার্কস লেনিন। যেমন আমাদের এদেশে চলছে অহিংসার পরীক্ষা। যার গুরু গান্ধীজী। আমার সবতাতেই ইন্টারেস্ট আছে। তবে সব চেয়ে বেশী লিবারল ডেমোক্রাসীতে। সুতরাং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায়।" মানস বিশদ করে।

"ভাই মানস, ওদের ওই লিবারল ডেমোক্রাসী অক্ষয় হোক। আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। ইংরেজ বা ফরাসী হলে আমিও ওর জন্যে প্রাণ দিতুম, তবে প্রাণ নিতে আমার বিবেকে বাধত। কিন্তু আমাদের এদেশে ও জিনিস আমদানী করা বৃথা। যেমন বৃথা রুশ দেশের সোভিয়েট সমাজতন্ত্র। আমাদের ঐতিহ্য অন্যরূপ। তাই আমাদের পক্ষে অন্য ব্যবস্থাই শ্রেয়। যার নাম রাখতে পারি পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্র। এর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে দেশ স্বাধীন হলে।" সৌম্য আশ্বাস দেয়।

"সেটাও একপ্রকার সোশিয়াল ডেমোক্রাসী। জার্মানীতে যার পরীক্ষা হিটলারের দৌরাত্ম্যে অকালে অসমাপ্ত থেকে গেল।" মানস আক্ষেপ করে।

"আমাদের এদেশে আমরা এমনভাবে গোড়াপত্তন করব যে চূড়ায় উঠে কেউ ভিৎ পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারবে না। চূড়া ভেঙে দিলেও কেউ গোড়া ভেঙে দিতে পারবে না। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ রাজ

অবাধে কাজ করে যাবে। গ্রামগুলো হবে অন্নে বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের রাজধানী বেহাত হলেও গ্রামের রাজধানী বেহাত হবে না। কোনো ডিকটেটরই সাত লক্ষ পঞ্চায়েতের উপর গায়ের জোর খাটাতে পারবে না। ওদের সবাইকে বশ করাও অসম্ভব। অসহযোগের দ্বারা, সত্যাগ্রহের দ্বারা ওরা যে কোনো ডিকটেটরের শাসনকে অচল করে দিতে পারবে। সেইভাবে যেকোনো শোষণকারীর শোষণকেও।" সৌম্য অভয় দেয়।

"সাধু! সাধু!" মানস হাততালি না দিয়ে শান্তিনিকেতনী কেতায় বলে, "সাধু! সাধু!" কিন্তু তর্ক না করে থাকতে পারে না। "তুমি ধরে নিয়েছ যে দেশটা ভারত বলে আর-দশটা দেশের বেলা যেটা সত্য তার বেলা সেটা সত্য নয়। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ হয়ে উঠছে যন্ত্রশিল্পপ্রধান। তাই গ্রামপ্রধান না হয়ে নগরপ্রধান। জার্মানীর ভারকেন্দ্র সত্তর বছর আগে ছিল গ্রাম, এখন নগর। ব্রিটেনে সেটা আরো আগে থেকে হয়েছে। তার প্রধান কারণ ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যকে কৃষিভিত্তিক রেখে নিজেকে করেছে যন্ত্রশিল্পভিত্তিক। ভারত যেন একটা গ্রামসমষ্টি আর ব্রিটেন যেন একটা নগরসমষ্টি। বিরোধ অনিবার্য। ভারতেরও চাই যন্ত্রশিল্প। সে আর কাঁচামাল রপ্তানি করবে না, নিজের কলকারখানায় ব্যবহার করবে। তার যন্ত্রশিল্পের যতই প্রসার হবে তার নগরসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাবে, নাগরিকসংখ্যাও ততই স্ফীত হবে। জার্মানীর বেলা সত্তর বছর, ভারতের বেলা হয়তো পঞ্চাশ বছর। কংগ্রেস নেতারা এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো প্ল্যান আঁটছেন। যাতে আরো সময়সংক্ষেপ হয়। সত্তরের জায়গায় পঞ্চাশ নয়, বিশ কি পঁচিশ বছর। এঁদের কথামতো যদি কাজ হয় তবে দেশ হয়তো স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, কিন্তু গ্রাম কদাপি নয়। বিরোধ অনিবার্য। কেবল যে ইংরেজদের সঙ্গে তা নয়, এই দেশেরই টাটা বিড়লাদের সঙ্গে। প্রাইভেট ক্যাপিটাল থাকতে সত্তর বছরকে বিশ বছরে পরিণত করা যায় না। আর প্রাইভেট ক্যাপিটালকে স্টেট ক্যাপিটালে পরিণত করতে গেলে সোশিয়াল ডেমোক্রাসীকেও পরিণত করতে হয় কমিউনিজমে। জার্মানীতে এই রূপান্তরটাই ঘটতে ঘটতে ঘটল না। নাৎসীরা এসে এক হাতে সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের, অন্যহাতে কমিউনিস্টদের হটিয়ে দিল। আফসোসের কথা সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের জন্যে কেউ অশ্রুবর্ষণ করছে না। কমিউনিস্টদের জন্যেও না। অথচ কেউ যে নাৎসীদের পছন্দ করছে তাও নয়। আমি ব্রিটেন ফ্রান্সের দিক থেকেই বলছি।" মানস যতদূর জানে।

"ভাই মানস," সৌম্যর কণ্ঠস্বরে বিষাদ, "আমি ঘর ছেড়ে, কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছিলুম উনিশ বছর আগে একবছরের মধ্যে স্বরাজ জিতে নিতে। জয় এখনো হয়নি। ইংরেজরা জাঁকিয়ে বসে আছে। আমাদের যা দিয়েছে তা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। স্বরাজ পেতে আরো উনিশ বছর লাগবে কি না কে বলতে পারে? যে দেশ রাশিয়ার মতো স্বাধীন নয় সে দেশ লেনিনের মতো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে। বিপ্লবের পরেও কমিউনিস্টদের দশবছর কেটে গেল মনঃস্থির করতে রাশিয়াকে কলকারখানা দিয়ে শিল্পায়িত করা সমীচীন হবে কি না। সেই পদক্ষেপটি নেওয়া যখন হলো তখন দেখা গেল গ্রাম ছেড়ে মানুষ চলে আসছে শহরে, চাষের জন্যে ক্ষেতমজুর বিরল। ফসল যা ফলে সরকার তা জোর করে কেড়ে নিয়ে আসেন, চাষীকে ধরিয়ে দেন কাগজের নোট। তা দিয়ে সে কম দামে পরনের কাপড় কিনতে পারে না। জুতো কিনতে পারে না। নুন কিনতে পারে না। কেরোসিন কিনতে পারে না। চাষী তাই যেটুকু তার খোরাকের জন্যে প্রয়োজন সেইটুকুই ফলায়। ফলে শহরের খোরাকে টান পড়ে। শ্রমিকরা খেতে পেলে তো গতর খাটাবে। দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা যায়। এটা কিন্তু মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ। লেনিন হলে শিল্পায়নে ঢিলে দিতেন। এক কদম পেছিয়ে যেতেন, যাতে পরে দুই কদম এগোনো যায়। কিন্তু কর্তা এখন লেনিন নন, স্টালিন। তিনি পেছোবার পাত্র নন। ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়াই তাঁর নীতি। এক পরিকল্পনার পর আরেক পরিকল্পনা। এই হলো তাঁর রীতি। সাথীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি চাষের জমিকেই চাষীর হাত থেকে কেড়ে নিলেন। এখন থেকে খামার হলো খাসমহলের খামার

বা এজমালী খামার। চাষীদের পরিণত করা হলো মজুরে। নারাজ হলো যারা তাদের চালান করা হলো হাজার হাজার মাইল দূরে। সেখানে তারা বেগার খাটে, খাল কাটে। বাড়তি লোকজনকে সৈন্যদলে ভর্তি করে নেওয়া হয়। এমনি করে হয় বেকার সমস্যার সমাধান। অপোজিশন বলে কোনো পদার্থই নেই। যারাই অপোজ করবে তারাই কোতল হবে। হলোই বা তারা সর্বত্যাগী বিপ্লবী কমিউনিস্ট। এই যদি হয় ত্বরিত শিল্পায়নের মূল্য তবে এ মূল্য দিতে স্বাধীন ভারত কি রাজী হবে? আকাশে কেল্লা গড়ে কার কী লাভ? এত দলাদলিই বা কেন?"

"এখন থেকেই পরস্পরকে বলা হচ্ছে, আমরা রেভোলিউশনারী, তোমরা রিফরমিস্ট। অথচ কাজ দিয়ে বোঝানোর এখনো অনেক দেরি। না, ইংরেজরা স্বেচ্ছায় যাচ্ছে না। বড়লাট চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন যে যুদ্ধে যারা যোগ দিতে চায় তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে না, ভারতেই যে যার কর্মস্থলে থাকবে ও শাসনকার্য চালিয়ে যাবে। সেবারকার যুদ্ধে তো বহু ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে যায়। তাদের জায়গায় ভারতীয় অফিসারদের বসানো হয়। এবার কিন্তু ওরা আরো জাঁকিয়ে বসবে।" মানসের খেদ।

"দেখলে তো? ওঁরাও তোমারি মতো নীরব দর্শক। শেফার্ড আর বার্লো। যত রাজ্যের ভাবনা যেন তোমার একার। সেই যে বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। বিপদটা তো বিলেতের। দুর্ভাবনাটা ভারতের।" যূথিকা কটাক্ষ করে।

মানস তা স্বীকার করবে কেন? বলে, "বিপদটা বিবাহসূত্রে ভারতেরও। বিবাহবিচ্ছেদ তো হয়নি, কেউ চায়ও না। চাইলে এই মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। চাইছেন যেটা সেটা ব্রিটেনের সঙ্গে ডিভোর্সও নয়, সেপারেশনও নয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরের ধাপ, কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন। বাকীটা যুদ্ধজয়ের পর। কিন্তু যুদ্ধে যদি হার হয় তখন কী হবে? টার্কি আর ইরানের ভিতর দিয়ে জার্মানরা এসে হাজির হবে। তখন বিপদটা কার?"

"সে রকম দুর্ভাগ্য যদি হয় তবে আমরা সেই মুহূর্তেই স্বাধীনতা ঘোষণা করব ও সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা।" সৌম্যের কণ্ঠস্বরে প্রত্যয়।

"তখন তোমাদের অহিংসা কোথায় থাকবে?" মানস জেরা করে।

"দেশের লোক যদি হিংসা দিয়ে হিংসাকে রুখতে না পারে তবে অহিংসা দিয়ে প্রতিরোধ করবে। তার জন্যে জনগণকে তৈরি থাকতে হবে।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"অহিংসা কি অব্যর্থ?" মানস মানতে চায় না।

"রাশিয়ার জনগণ যদি একজোট হয়ে নেপোলিয়নের সৈন্যদলকে রাশিয়া থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করে থাকতে পারে তবে হিটলারের সৈন্যদলকেও ভারতের জনগণ ভারত থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারবে। জনগণের অসাধ্য কী আছে, যদি ওরা একজোট হয়? যদি একজোট হয়ে শহরকে শহর গ্রামকে গ্রাম খালি করে দিয়ে যায়, খাক করে দিয়ে যায়? জার্মানরা কার কাছে সহযোগিতা আশা করবে, সবাই যদি অসহযোগী হয়?" সৌম্যও তর্ক করে।

"কার্যক্ষেত্রে দেখবে সবাই একজোট নয়, অনেকেই সহযোগিতা করতে রাজী। না, সৌম্যদা, ভারত রাশিয়া নয়। যে ভুলটা কমিউনিস্টরা করছে সেই ভুলটা তোমরাও করছ। এ দেশটা কেবল যে পরাধীন তাই নয়, জরাজীর্ণ ও দুর্বল। তার উপর জাত নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, ভাষা নিয়ে শতধা বিভক্ত। বাইরে থেকে জোড়াতালি দেওয়া এক, আর ভিতর থেকে একতাবদ্ধ করা আরেক। তার লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা গেল না। হঠাৎ একদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেবে এটা হলো বিশ্বাসের কথা। তুমি বিশ্বাস কর, আমি করিনে। হিসাব নিলে দেখবে বেশীর ভাগ লোকই বিশ্বাস করে না।" মানস সুনিশ্চিত।

"যারা এখন করে না তারাও ক্রমে ক্রমে করবে, যখন দেখবে যে কতক লোক বিশ্বাসের জোরে অকুতোভয়।" সৌম্য সুনিশ্চিত।

যূথিকা বলে, "এখন থেকে এ নিয়ে তর্ক করে কার কী লাভ? ইংরেজদের হারতেও অনেক দেরি, জিততেও অনেক দেরি। ওদের হাবভাব দেখে মালুম হয় না যে ওরা একটুও বিচলিত। ওরা ভালো করেই জানে যে পেছনে মামা আছে। শুনছি নাকি চার্চিলকেই প্রধানমন্ত্রী করা হবে। আমেরিকা তাঁর মামার বাড়ী।"

সৌম্য তা শুনে খুশি হয়। "তা হলে জমবে ভালো। ভারতের অত বড়ো অকপট বন্ধু আর নেই। খোলাখুলি জানিয়ে দেবেন যে স্বাধীনতা তিনি থাকতে হবে না। আর যুদ্ধকালে তিনি ছাড়া আর কে আছে যে ইংরেজদের মনের জোর জোগাবে? চার্চিল থাকতে আমাদের মুক্তি নেই জানলে আমাদেরও মোহভঙ্গ হবে, আমরাও সহযোগিতায় মুক্তি নেই জেনে অসহযোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে যাব। হিটলারের সঙ্গে নয়, চার্চিলের সঙ্গেই সংগ্রাম।"

মানস আঁতকে ওঠে। "কিন্তু এটা কি তোমরা বুঝতে পারছ না যে চার্চিল যার দুশমন হিটলার তার দোস্ত? আর হিটলার যার দোস্ত হিটলারের পরাজয়ে তারও পরাজয়? হিটলার যদি জেতে তা হলেও ভারতের ক্ষতি। হিটলার যদি হারে তা হলেও ভারতের ক্ষতি। এই সঙ্কটে পলিসি নির্ধারণ করা একেবারেই সহজ নয়। ইংরেজরা হেরে গেলেও ওদের জাহাজগুলো ওরা কিছুতেই হিটলারের হাতে পড়তে দেবে না। কানাডা অস্ট্রেলিয়ায় চালান করে দেবে। সেগুলো হাতে পেলে জার্মানরা সমুদ্রপথে বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতায় এসে হাজির হতো। তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলত ভারতকে। কোন্ দিকে তোমরা পালাতে? কোন্ দিকটা খালি করে দিতে, খাক করে দিতে? সমুদ্রে ইংরেজের হার নেই, সে তার নৌবলের সাহায্যে আবার তার রাজ্য উদ্ধার করবে। জার্মানরা যদি টার্কি ও ইরান পেরিয়ে আসে জাহাজের অভাবে বেকায়দায় পড়বে। জার্মানদের হাত থেকে ইংরেজরাই আমাদের রক্ষক। তোমরা যা করতে চাও যুদ্ধের পর কোরো। যুদ্ধকালে চলুক তার প্রস্তুতি। কিন্তু প্রয়োগ নয়।"

"তোমার কথাগুলো মডারেটদের মতো শোনাচ্ছে। ওঁরাও মন্ত্রণা দিচ্ছেন সেই মর্মে। কংগ্রেসে এখন নানা মুনির নানা মত। এক মুনি বলছেন, এই তো সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে আর কখনো ফিরবে না। যুদ্ধে জিতে ইংরেজ জগদ্দলের মতো চেপে বসবে। তখন তাকে হটাতে হলে আরো দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাতে হবে, আরো কতবার জেল যেতে হবে, আরো কত লোককে প্রাণ দিতে হবে। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। আরেক মুনি বলেছেন, হিটলার যদি মরে তো মরণকামড় দিয়ে মরবে। ইংরেজের নখ দাঁত ভেঙে দিয়ে যাবে। তখন সে স্বাধীনতা দিতে সহজেই রাজী হবে। নয়তো তখন আমাদের চূড়ান্ত সংগ্রাম। আরো এক মুনি আছেন, তিনি বলেছেন, হিন্দু মুসলমান যদি এক হয় তো স্বাধীনতা পেতে কতক্ষণ! যদি এক না হয় তো ইংরেজ চলে গেলেই গৃহযুদ্ধ। তাকে ধরে রাখাই সুবুদ্ধি। মুসলমানদের যা মনোভাব তা স্বাধীনতার প্রতিকূল। এত বড়ো একটা সম্প্রদায়কে সঙ্গে না নিয়ে সংগ্রামে নামতে যাওয়া যেন অকূলে ঝাঁপ দেওয়া। সমুদ্র থেকে অমৃত উঠে আসবে না গরল উঠে আসবে কে জানে?" সৌম্যও চিন্তিত।

"ভাবনার কথা বইকি।" মানস বলে, "আমার তো মনে হয় প্রকৃষ্ট পলিসি হচ্ছে মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে চলা। তার জন্যে যদি সাত বছর অপেক্ষা করতে হয় তো সাত বছর অপেক্ষা করাই সমীচীন। লীগপন্থী মুসলমানরাই যে একমাত্র মুসলমান তা অবশ্য মেনে নেওয়া যায় না। তা বলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরাই যে একমাত্র মুসলমান তাও নয়। মোটের উপর বলতে গেলে মুসলমানরা মনে করে ইংরেজরা বিদায় নিলে হিন্দুরাই তাদের শূন্য স্থান পূরণ করবে, মুসলমানরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। তাদের বক্তব্য শূন্য স্থান পূরণ করবে দুই পক্ষ মিলে, সুতরাং দুই পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই একটা মিটমাট চাই। তা যদি সম্ভব না হয় তবে দুই পক্ষেই একটা সেপারেশন চাই। তাদের মতামত উপেক্ষা করে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে তাদেরও জড়াতে গেলে তারাও আপত্তি করবে যেমন আপত্তি করছে

কংগ্রেস, ভারতীয়দের মতামত উপেক্ষা করে ব্রিটেন জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে ভারতকেও জড়িয়েছে বলে।"

"এইখানে একটু সংশোধন দরকার। ব্রিটেন ভারতকেও যুদ্ধে জড়িয়েছে বলে কংগ্রেস আপত্তি করছে তা নয়, ভারতের জনগণকেও যুদ্ধে জড়িয়েছে বলে। ভারতীয়রা কেন রিক্রুট হবে, কেন ট্যাক্স দেবে, কেন খাদ্য পরিধেয় বিদেশে পাঠিয়ে ভাতকাপড়ের অভাবে কষ্ট পাবে? এটাই হলো হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সর্বসাধারণের বক্তব্য।" সৌম্য বুঝিয়ে বলে।

"মুসলমান বন্ধুরা বলছেন কংগ্রেস যদি ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে নামে তাঁদেরও তো জড়াবে। এই ধরো, তোমরা যদি মন্ত্রিত্ব বর্জন কর ওঁদেরও তো মন্ত্রিত্বের আশা ছাড়তে হবে। কাউন্সিল অ্যাসেম্বলি যদি বন্ধ থাকে তবে ওঁরাও তো সেখানে ঢুকতে পারবেন না, লোকসান দেবেন।" মানস বলে।

সৌম্য দুঃখিত হয়ে বলে, "এর মধ্যেও হিন্দু মুসলমান! সরকার যদি কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান তো মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে যাবেনই বা কেন? আর কাউন্সিল অ্যাসেম্বলি বন্ধ হবেই বা কেন? মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের দরজা তো খোলাই থাকবে, যদি না তাঁরা ডাক্তার খান্ সাহেব, রফি আহমদ কিদোয়াই, সৈয়দ মাহমুদ প্রভৃতি কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের বর্জন করার জন্যে জেদ ধরেন। যদি সরকারের সঙ্গে মিটমাট না হয় তবে কংগ্রেসকে আবার বনবাসে যেতে হবেই, মন্ত্রীদেরও শ্রীঘরবাস অবধারিত। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। কাউন্সিল অ্যাসেম্বলি বন্ধ হলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমান সদস্যদেরও কম লোকসান হবে না। উপরন্তু তাঁরাও জেলে যাবেন। তাঁরা আমাদের সুখদুঃখের সাথী। আর এঁরা তো কেবল কোয়ালিশনের বেলায়ই আমাদের সঙ্গে, জেলযাত্রার বেলায় নয়।"

এর পরে ওঠে গান্ধীজীর প্রসঙ্গ। "তুমি যাচ্ছ তবে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে?" মানস সুধায়।

"না গিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছিনে। উনিই আমাদের দেশের বিবেক। আমাদের যুগেরও। কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে তাঁর কাছে চিঠি আসে। জিজ্ঞাসুরা উদ্‌গ্রীব। এই সঙ্কটে তাঁর কী নীতি ও পন্থা? তাঁদের মধ্যে যাঁরা অহিংস তাঁদেরই বা করণীয় কী? যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত, না যুদ্ধ প্রতিরোধ করা উচিত? স্বাধীন দেশের নাগরিক যাঁরা তাঁরাও চোখ বুজে ঝাঁপ দিতে নারাজ। তাঁরাও উপলব্ধি করেছেন যে যুদ্ধ ব্যাপারটা একেবারে মিটে যাবার নয়। পঁচিশ বছর আগেও তো বেধেছিল, বলা হয়েছিল যে এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। কিন্তু একটা শেষ হতে না হতেই বিশ বছর ব্যবধানে আর একটা শুরু হয়েছে। এবারেও শোনা যাচ্ছে এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। বিশ্বাস করা শক্ত। মূল কারণগুলো যদি একই রকম থাকে তবে যুদ্ধ বার বার বাধবেই। আর মূল কারণগুলো কাইজার বা হিটলার বা অন্য কোনো ডিকটেটরের অস্তিত্ব নয়, সভ্য মানুষ পড়ে গেছে ধনপতি আর রণপতিদের ফাঁদে। ধনপতিরা সৃষ্টি করেছেন অর্থনৈতিক সঙ্কট। গণপতিরা সে সঙ্কটে দিশাহারা হয়ে রণপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ করছেন। অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করলেই নাকি বাজার তেজ হবে, মন্দা দূর হবে, কেউ বেকার থাকবে না, কাজের সঙ্গে সঙ্গে খোরাকও জুটবে। কিন্তু সবাই যদি অস্ত্রবৃদ্ধি করতেই থাকে যুদ্ধ একদিন আপনা আপনি বেধে যাবে, যে-কোনো একটা উপলক্ষে। তখন তারস্বরে চিৎকার উঠবে, ওরাই বাধিয়েছে, আমরা বাধাইনি। আমরা ধোয়া তুলসী পাতা। এস, ঝাঁপ দাও, না দিলে কনস্‌ক্রিপশন। সভ্য মানুষ এখন মিলিটারি- ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের হাতের পুতুল। কোথায় তার স্বাধীনতা। ইংলণ্ড ফ্রান্সও স্বাধীন নয়। তাদের স্বাধীনতাও যন্ত্রচালিতের স্বাধীনতা। তেমন স্বাধীনতা নিয়ে আমরা করবই বা কী? তাদের মতো যুদ্ধ? এই তো? আমরা চাই যুদ্ধ না করার স্বাধীনতা। ভারতের মতো একটা বৃহৎ দেশ যদি বেঁকে বসে তা হলে ধনপতি বা রণপতিদের খেলা মাৎ। ইতিহাসে একটা নতুন যুগ আরম্ভ হবে। ভারত তার নেতা। গান্ধীজী তার প্রোফেট। সভ্যতারও হবে নয়া মোড়। সমাজেরও নতুন শৃঙ্খলা। আমরা নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছিনে, মানস। আমরা ওদের ওই মিলিটারি- ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের থেকে সরে থাকতে চাই। ওটা একটা মারাত্মক প্লেগ। যার থেকে ওরা নিজেরাও ভুগছে, আমাদেরও ভোগাচ্ছে। এরোপ্লেন দেখে উচ্ছ্বসিত

হচ্ছে। জানো, ওইসব বিমান রাতারাতি বোমারু বিমানে রূপান্তরিত হবে? মোটরগাড়ীর কারখানা থেকে বেরিয়ে আসবে ট্যাঙ্ক। জাহাজের ইয়ার্ড থেকে সাবমেরিন বা টর্পেডো। কেন, তোমার রেলপথও তো মিলিটারির জন্যে তৈরি। যুদ্ধ বাধলে প্রত্যেকটাই হবে সৈন্য চলাচলের পথ। তেমনি তোমার টেলিগ্রাফের তার।" বলতে বলতে সৌম্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ওদিকে টর্পেডোর উল্লেখ থেকে যূথিকারও ভাবান্তর। সে বলে ওঠে, "বেচারি মিলি! ভালোয় ভালোয় পৌঁছতে পারলে বাঁচি!"

ইতিমধ্যে মিলি এডেন থেকে কেবল করে তার বাবাকে জানিয়েছিল যে কনভয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। তার জাহাজ সুয়েজ হয়ে যাচ্ছে। ক্যাপটেন মুস্তাফী কেবল পেয়ে ছুটে এসেছিলেন মানস আর যূথিকাকে দেখাতে। খবরটাতে কে না খুশি হবে! তবু একটু 'কিন্তু' থেকে যায়। সেই কিন্তুর নাম 'মুসোলিনি'। তিনি এখনো যুদ্ধে নামেননি। গড়িমসি করছেন। যুদ্ধে নামলে তাঁর নিজের সাগরপারের উপনিবেশগুলির জলপথও টর্পেডোসঙ্কুল হবে। তিনি যতদিন দেরি করবেন ততদিনে মিলি ও সুকুমারও সাগর পার হয়ে থাকবে। কিন্তু যদি হঠাৎ হিটলারের নির্দেশে যুদ্ধে নামেন? সুতরাং না আঁচালে বিশ্বাস নেই। যুদ্ধ জিনিসটাই সারপ্রাইজে ভরা। কারো সাধ্য নেই যে ভবিষ্যদ্বাণী করে বা করলে তা ফলে।

"ওরা পৌঁছে যাবে ঠিক।" মানস আশ্বাস দেয়। "কনভয় আছে কী করতে? বিজ্ঞান যেমন মারণাস্ত্র বানিয়েছে তেমনি তার মুশকিল আহসানও বাতলে দিয়েছে। বোমারু বিমানও যেমন হানা দেয় বিমানবিধ্বংসী কামানও তেমনি আসমান থেকে ওদের পেড়ে আনে। মজা করে দেখবে ওসব দস্তবিশ্বাস, কিন্তু দেখবে কী করে, যদি গর্ত খুঁড়ে আশ্রয় নেয়?"

"মজা!" যূথিকা শিউরে ওঠে, "তোমার কাছে মজা! আর ওদের কাছে জীবন মরণ সমস্যা।"

সৌম্য এইবার বিদায়ের উদ্যোগ করে। বলে সেগাঁও থেকে ফিরে আবার দেখা করবে। ইতিমধ্যে মিলিদের নিরাপদে পৌঁছনোর খবর এসে থাকবে। যাবার আগে সে একবার মুস্তাফীদের ওখানে ওর খোঁজ খবর নেবে।

"দাদা," যূথিকা পই পই করে বলে, "কলকাতায় জুলির সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না। ওকে যেমন করে হোক বিপ্লবের পথ থেকে নিবৃত্ত করা চাই।"

"উল্টো ফল হবে, বোন। জুলি এমন মেয়ে যাকে বাধা দিলে অবাধ হয়, বোঝাতে গেলে অবুঝ হয়, নিবৃত্ত করলে প্রবৃত্ত হয়। সাঁকো নাড়িস্‌নে বললে সাঁকো নাড়ে। আমার চেয়ে ওর বিপ্লবী দাদাদের উপরে ওর আরো বেশী বিশ্বাস। ওঁরা মনে করেন বিপ্লবের দিন ঘনিয়ে আসছে, গণ অভ্যুত্থান আসন্ন, জুলিও তাই মনে করে। বেশ তো, ওঁদের কথাই সত্য হোক। আমাদের দিন আসবে, যখন সরকারের সঙ্গে কথাবার্তার পালা সাঙ্গ হবে। যখন কংগ্রেস এক হয়ে মহাত্মার পেছনে দাঁড়াবে। যখন মহাত্মা অহিংসার পরীক্ষা নেবেন, পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হবেন, তার পরে সংগ্রামের সঙ্কেত দেবেন। জুলিকে এসব বোঝানো যাবে না, বোন। তা হলেও আমি যাব ওকে দেখতে, ওর মাকেও দেখতে। ওঁরা আমার আপন জন।" সৌম্য আবেগের সঙ্গে বলে।

"হ্যাঁ, তোমার মতো আপন জন আর কে আছে ওঁদের! তুমিই শেষ ভরসা। কিন্তু তোমার তো দুশ্চর তপস্যা। সিদ্ধিলাভ না হলে তপোভঙ্গ করবে না। রম্ভা মেনকাও পরাস্ত হয়। জুলি তো তেমন সুন্দরী নয়। রূপে তোমায় ভোলাবে না। পারে তো একদিন ভালোবাসায় ভোলাবে। ভালোবাসা ফল্গুধারার মতো অন্তঃসলিলা। কিন্তু ওর বৈধব্যের সংস্কার আরো প্রবল।" যূথিকার প্রত্যয়।

"আমার মনে হয় ওটা বৈধব্যের সংস্কার নয়, পাতিব্রত্যের সংস্কার। পতির মৃত্যু হলেও নারী পতিব্রতা থাকে। তা ছাড়া জুলি ওর স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। সে ভালোবাসা তো স্বামীর অবর্তমানে পাত্রান্তরিত হতে পারে না। আমি ওর সমস্যাটা বুঝি বলেই নীরব থাকি।" সৌম্য বলে

আবেগভরে।

"আচ্ছা, সৌম্যদা, এটা কী করে সম্ভব! দুলাল আর জুলি প্রেমে পড়ে বিয়ে করেনি, করেছে পিতামাতার নির্বন্ধে। বিয়ের পরে স্বামীস্ত্রী সম্পর্কও পাতায়নি। তার আগেই দুলাল বিলেত চলে যায়। জুলি যখন ওদেশে যায় তখন মায়ের সঙ্গেই থাকে। স্বামীর সঙ্গে নয়। তা হলে ভালোবাসা জন্মায়ই বা কী করে, বৈধব্যের দশ বছর বাদেও বেঁচে থাকেই কিসের জোরে? আমার তো মনে হয় ওটা নিছক হিন্দু সংস্কার, ব্রাহ্ম মেয়েরাও তার থেকে মুক্ত নয়।" মানস রায় দেয়।

"এমন না হলে ইনটেলেকচুয়াল।" সৌম্য পরিহাস করে। "নারীর হৃদয় কি পুরুষের মস্তিষ্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়? যূথিকা তোমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে। মেয়েদের ভালোবাসা দেহধর্মের অপেক্ষা রাখে না। তা যদি বলো, পুরুষের ভালোবাসাও কি দেহধর্মের অপেক্ষা রাখে? প্লেটোনিক প্রেম একটা কথার কথা নয়, এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। এটা বিয়ের পর স্বামীস্ত্রীতেও হতে পারে। গান্ধীজীও বিশ্বাস করেন যে বিবাহের পর এটাই আদর্শ। তিনি তো তাঁর শিষ্যদের বিয়ে করতে বারণ করেন না, যদি সে বিবাহ প্লেটোনিক হয়। আমরা অবশ্য তেমন কোনো অঙ্গীকার করতে পারিনে। একতরফা অঙ্গীকারের মূল্য কতটুকু। দুই তরফের অঙ্গীকারও ক্ষণভঙ্গুর।"

তিনজনেই হাসে। দীপক আর মণিকা একটু দূরেই খেলা করছিল। তারা জানতে পায় না কারণটা কী। কেন এত হাসি। সৌম্যকে উঠতে দেখে ওরা দু'জনেই ছুটে আসে।

মণি জেঠুর কোলে লাফিয়ে ওঠে। দীপক গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বলে, "জ্যাঠামশায়, তুমি এবার আমার জন্যে কী আনবে?"

"তুমিই বলো কী আনলে তুমি খুশি হবে?" সৌম্য তাকে জড়িয়ে ধরে।

"আমি ভাবছি একটা সার্কাসের দল করব। তাতে থাকবে হাতী ঘোড়া বাঘ বানর ডালকুত্তা টিয়াপাখী পায়রা এমনি সব জীবজন্তু। সত্যিকার নয় কিন্তু। কাচের বা চীনেমাটির। তোমার জন্যে আমি একটা নক্‌শা তৈরি করছি তাতে দেখাব বাঘের সঙ্গে হাতীর লড়াই। আচ্ছা, জ্যাঠামশাই, বাঘের সঙ্গে যদি হাতীর লড়াই হয় কে জেতে আর কে হারে?" দীপকের প্রশ্ন।

"বাঘই জিতবে। বাঘ হলো রয়াল বেঙ্গল টাইগার।" সৌম্যর উত্তর।

"কিন্তু যদি ঈগলপাখীর সঙ্গে বাঘের লড়াই হয় তা হলে কে জিতবে কে হারবে?" দীপক আবার প্রশ্ন করে।

"সেইটেই তো বাধতে যাচ্ছে, বাবা। জার্মান ঈগলের সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহের লড়াই। সিংহ বলছে, ভাই হাতী, এস, তুমিও আমার হয়ে লড়ো। হাতী বলছে, তুমি যে আমাকে হারিয়ে দিয়ে দাবিয়ে রেখেছ, আগে আমার পিঠ থেকে নামো দেখিনি। সিংহ এখন কী করবে? হাতীর পিঠ থেকে নামবে? না হাতীর পিঠে চেপেই ঈগলের সঙ্গে লড়বে?" সৌম্য বলে ধাঁধার মতো করে।

দীপক ভাবনায় পড়ে। চট করে উত্তর দিতে পারে না। তার মা তাকে উৎসাহ দেয় নিজের বুদ্ধি খাটাতে। আর তার বাবা উৎকর্ণ হয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা করে।

"হাতীর সঙ্গে বাঘের যদি বন্ধুতা না হয়, শত্রুতা চলতে থাকে তা হলে ঈগল এসে ছোঁ মেরে দুটোকেই ধরে নিয়ে যাবে, গরুড় যেমন করেছিল গজ আর কচ্ছপকে। তার পর এক পর্বতের চূড়ায় বসে একটার পর একটাকে খাবে।" দীপক উত্তর দেয়।

মানস বলে ওঠে, "সাবাস!" সৌম্য একেবারে চুপ। যূথিকা মনে মনে গর্বিত হয় ওইটুকু ছেলের প্রত্যুৎপন্নমতি দেখে।

মণিকে ঘাড় থেকে নামিয়ে চুমু খেয়ে সৌম্য দীপককে ছাড়া দিয়ে বলে, "হাতীর ইচ্ছা নয় লড়তে, সে চায় লড়াই থামিয়ে দিয়ে স্বাধীন হতে।"

।। বারো ।।

টেনিস র‍্যাকেট হাতে মানস বেরিয়ে পড়ে ক্লাবের অভিমুখে। সৌম্যকে বলে, "তোমাকে আমি এগিয়ে দিই। আমাকে তুমি এগিয়ে দাও।"

"লণ্ডনে থাকতে যেমন আমরা প্রায়ই করতুম। আচ্ছা, মানস, তোমার কি মনে আছে দু'জনেই আমরা লীগ অভ নেশনস ইউনিয়নের সভ্য হয়েছিলুম? একবার কি দু'বার গিয়ে তুমি ছেড়ে দাও। আমি নিয়মিত ওদের সভায় যেতুম। কোয়েকারদের সঙ্গেও আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সম্পর্ক এখনো ছিন্ন হয়নি। ওঁরা কেউ চাননি যে আবার মহাযুদ্ধ বাধে। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব ওঁরা তা করে এসেছেন। ওই ধরনের শান্তিবাদী জার্মানীতেও ছিলেন ও আছেন। অসিয়েট্স্কি তো বিদেশ থেকে প্রচারকার্য চালানোর চেয়ে দেশে ফিরে এসে কারাবাসের ঝুঁকি নিলেন। বললেন বাইরে থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ফাঁপা শোনাবে। যা ফাঁপা শোনায় তাতে কেউ কান দেয় না। কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়। বেঁচে থাকলে তো তিনিও হতেন যুদ্ধকালে যুদ্ধবিরোধী কারাবাসী। সময় যখন আসবে তখন তুমি দেখবে আমিও নীরব দর্শক নই। আমাকেও কারাবাস করতে হবে। সেটা যদি দীর্ঘমেয়াদী হয় আমিও তো অসিয়েট্স্কির মতো চরম মূল্য দিয়ে কারামুক্ত হতে পারি। যমরাজ তাঁর দূত পাঠিয়ে আমাকে ব্রিটিশ রাজের কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন।" সৌম্য বলে উচ্চস্বরে।

মানস দুঃখ পেয়ে বলে, "না, না, জেলখানায় তোমার উপর কেউ অত্যাচার করবে না। তবে তুমি যদি গান্ধীজীর মতো অনশন কর সেকথা আলাদা। তিনি তো তোমাদের সবাইকে বারণ করে দিয়েছেন অনশন করতে। একমাত্র তিনিই করতে হয় করবেন। তোমাকে জেলে যেতে হবেই বা কেন? কংগ্রেস যদি কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেয় তবে তো কারো জেলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কংগ্রেস ক্ষমতার আসনে থাকতে কেই বা তোমাদের বন্দী করবে? কেনই বা করবে?"

"সেটা তুমি ইংরেজ বা কংগ্রেস এই দুই শিবিরের উপর ছেড়ে দাও। আমরাও ছেড়ে দিয়েছি। গান্ধীজী কংগ্রেসের উপর কোনোরকম চাপ দিচ্ছেন না। শুধু বলছেন, আমাকে আমার পথে একলা চলতে দাও। তিনি একজন বিবেকচালিত সত্যাগ্রহী। তাঁর বিবেকের নির্দেশ পেলে তিনি সত্যাগ্রহ করতে পারেন। ভুলে যেয়ো না যে তিনি কেবল স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনের নেতা নন। সারা বিশ্বের শান্তিবাদীরাও তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যাশা করেন তাঁর কাছ থেকে বিবেকচালিত আপত্তিকারীর চেয়ে কিছু বেশী। তিনি যার নাম দিয়েছেন সত্যাগ্রহ। যার প্রথম পদক্ষেপ অহিংস অসহযোগ। তিনি কি তাঁদের সেইভাবে মনের জোর জোগাবেন না? সঙ্কটকালে তিনি কি তাঁদের হতাশ করবেন? তাঁর মতো শান্তিসংগ্রামের নেতা তাঁরা পাবেন কোথায়? স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতার অভাব হবে না, সব দেশেই তেমন নেতা আছেন। কিন্তু শান্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব নিতে পারেন একমাত্র গান্ধীজী। সেক্ষেত্রে তিনিই এক ও অদ্বিতীয়। কংগ্রেস যদি-বা তাঁকে ছাড়ে আমি কিন্তু তাঁকে ছাড়ব না। আমরা বিশ্বাস করি যে শান্তির সংগ্রামই স্বাধীনতার সংগ্রাম, যুদ্ধকালে। শান্তির বিনিময়ে যে স্বাধীনতা সেটা সত্যিকারের স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস যুদ্ধকালে সরকার চালিয়ে সেটা ঠেকে শিখবে। তোমারও চোখ ফুটবে। হিটলারকে হিটলার না হয়ে কেউ হারাতে পারবে না। নাৎসীদের নাৎসী না হয়ে কেউ সায়েস্তা করতে পারে না। ইংরেজ ফরাসীও সমান হিংস্র হয়ে উঠবে, তাদের সঙ্গে জুটে কংগ্রেসীরাও। ইংরেজের সঙ্গে আবার যদি বিরোধ বাধে তখন আর সত্যাগ্রহের পথ খোলা থাকবে না। ডাক দিলে জনগণ সাড়া দেবে না।" সৌম্য জানিয়ে রাখে।

''আচ্ছা, সৌম্যদা'' মানস প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, ''মিস ম্যানিংকে তোমার মনে আছে? যাঁর বান্ধবী মুরিয়েল লেস্টারের ভাই কিংসলীর নামে কিংসলী হল। যেখানে গান্ধীজী উঠেছিলেন। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের সময়।''

''মনে আছে বইকি। কোয়েকারদের সভায় তো প্রায়ই ওঁর সঙ্গে দেখা হতো। কালেভদ্রে এক আধখানা চিঠিও তো পাই। হাতে বোনা কাপড়ের পোশাক পরতেন, হাতে গড়া চামড়ার জুতো পায়ে দিতেন, হাতে তৈরি ব্রাউন ব্রেড খেতেন। ভারতের বন্ধু ও গান্ধীজীর ভক্ত। লীগ অভ নেশনস ইউনিয়নের উৎসাহী কর্মী। আর কী শুনতে চাও?''

''বলতে পারতে জার্মানীরও বন্ধু ও জার্মান সঙ্গীতের ভক্ত। সেই তিনি আমাকে সেদিন লিখেছেন তাঁর নিশ্চিত প্রত্যয় হিটলারই বাইবেল বর্ণিত অ্যান্টি-ক্রাইস্ট। অতএব ধরো অস্ত্র করো যুদ্ধ। তাঁর মতো শান্তিবাদীও এ যুদ্ধের সমর্থক। বাইবেল কী লিখেছে বলতে পারো?'' মানস জিজ্ঞাসু হয়।

''লিখেছে পৃথিবী একদিন শেষ হয়ে যাবে। তার আগে কে জানে কোন্‌খানে থেকে আসবে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট। খ্রীস্টের প্রতিপক্ষ ও প্রবল শত্রু। কিন্তু বিয়াট্রিস এ তত্ত্ব বিশ্বাস করবেন এটা আমার কাছে সংবাদ। এ যেন সেই, 'হে অর্জুন, যুদ্ধ করো'। হিন্দুর মুখে মানায়, কিন্তু খ্রীস্টানের মুখে নীতিবিরুদ্ধ। যীশু যে অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন, ''শত্রুকেও ভালোবাসবে।'' যুদ্ধকালে ভালোবাসতে পারাটাই অনুজ্ঞার অগ্নিপরীক্ষা। জার্মানদের বিয়াট্রিস ভালোবাসেন, একথা আমারও জানা। কিন্তু হিটলারের হিংস্রতার জন্যে কি তাঁকে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট বলে তার জাতির বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করতে হবে? স্টালিনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি না করে যুদ্ধে নামলে কি তাঁকে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট না বলে প্রো-ক্রাইস্ট বলা হতো? খ্রীস্টকে এর মধ্যে টেনে আনা কেন? আমি ভাবছি যুদ্ধকালীন প্রোপাগাণ্ডা কত নিচে নামতে পারে। সত্য যেমন অহিংসার সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত অসত্য তেমনি হিংসার। যুদ্ধের উত্তেজনায় মানুষ মিথ্যা প্রচার করে, মিথ্যায় বিশ্বাস করে, মিথ্যাকে বেদীতে বসিয়ে পুজো করে। মহাত্মাকে বলা হবে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট, যদি তিনি যুদ্ধকালে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, যদিও সেটা পুরোপুরি অহিংস।'' সৌম্যর সন্দেহ।

এর পরে ওরা ক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। মানস বলে, ''চল না কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। দেখবে আমার বন্ধুরা কেউ অ্যান্টি-গান্ধী নন। তবে আইন অমান্য তাঁরা সমর্থন করেন না। এবার যদি লোকের মাথায় ঢোকে যে আইন অমান্য করলে বাহবা মেলে তা হলে স্বরাজের পরে সে পোকা মাথা থেকে বেরোবে না। প্রশাসন অচল হয়ে যাবে। কেরানীরা অফিসারদের মানবে না, সিপাইরা পুলিশ কর্তাদের মানবে না, জওয়ানরা সেনাপতিদের মানবে না। দেশ অরাজক হবে। তা বলে তোমাদের কেউ নিষ্ক্রিয় হতে বলছেন না। গদী ছেড়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারো। আসন ছেড়ে দিয়ে আবার সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়াতে পারো। জেলে না গেলে কি নয়? তবে আর একটা পোকাও মাথায় ঢুকছে। জেলফেরৎ না হলে মন্ত্রী হওয়া যায় না, নির্বাচনে জেতা যায় না। গ্রেপ্তার না হয়ে তোমাদের গতি নেই। এর জন্যে একদিন পশতাতে হবে। ক'জনই বা মন্ত্রীপদ পাবেন আর ক'জনই বা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস টিকিট? জেলফেরৎদের মধ্যেও অসন্তোষ ঘনাবে।''

সৌম্য অন্যমনস্ক থাকে। অর্ধেক কথা ওর এক কান দিয়ে ঢোকে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। ''হ্যাঁ। কী বলছিলে? অ্যান্টি-গান্ধী? শোন, মানস, তুমি পরিহাস ছলে যে কথাটা বললে, সেটা একদিন সত্যি সত্যি ফলে না যায়। আমার অনেকদিন থেকে সন্দেহ যে, ইংরেজরা নয়, মুসলমানরা নয়, কমিউনিস্টরা নয়, তাঁর স্বধর্মীরাই তাঁকে একদিন সরাবে। সরাবে হিংসার উপরে অহিংসার জয় প্রত্যক্ষ করে। সেই ভাবেই তারা প্রমাণ করতে চাইবে যে অহিংসার চেয়ে হিংসা বলবান। কিন্তু ফল হবে ঠিক উল্টো। গান্ধীর জন্যে সারা দুনিয়া কাঁদবে। ভারতকে তো অনন্তকাল অশৌচ পালন করতে হবে।

আমাদের হেঁট মাথা যাঁর জন্যে উঁচু হয়েছিল তাঁর প্রতিপক্ষ অ্যান্টি-গান্ধীর জন্যেই আবার হেঁট হবে। বছর কয়েক আগে আমার এক মামাতো ভাই জাপান থেকে শিক্ষা শেষ করে ফিরে আসে। গান্ধীজীর অসুখের খবর পড়ে অচেনা অজানা জাপানীরা এসে তার কাছে খোঁজ নিত গান্ধী কেমন আছেন। গান্ধীর জন্যে ওদের এত মাথাব্যথা কেন জানতে চাইলে বলত, গান্ধী যে গরিবের মা বাপ। পরে জিজ্ঞাসা করত, আচ্ছা কে বড়ো? গান্ধী না মিকাডো? আমার ভাই পাল্টা প্রশ্ন করত, গান্ধী কেমন করে মিকাডোর চেয়ে বড়ো হবেন? মিকাডো যে মহাশক্তিমান সম্রাট, সূর্যদেবীর বংশধর। মিকাডোই বড়ো। ওরা মাথা নাড়ত। না, না, গান্ধীই বড়ো। উনিই এ যুগের বুদ্ধ। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা। বুদ্ধ সর্বত্র পূজ্যতে।"

ভাবাবেগের আতিশয্য অমন একজন সংযত পুরুষের মধ্যেও থাকতে পারে মানস এতে বিস্মিত। সৌম্য আপনাকে সামলে নিয়ে বলে, "না ভাই, আমার কাজ আছে। তোমার ক্লাবে আজ আসতে পারছিনে বটে, কিন্তু সময় যখন হইবে তখন আসিব, বাসবদত্তা। হবেই একদিন, যেদিন ওখানে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়বে, আর মদ বন্ধ হবে। প্রতি বিশ বছর অন্তর অন্তর একবার করে যদি মহাযুদ্ধ বাধে আর চার পাঁচ বছর ধরে চলে তা হলে তো মানব জাতটাই নির্বংশ হয়ে যাবে। এখন আর শুধু নিঃক্ষত্রিয় নয়, এখন সবাই মারণাস্ত্রের নির্মাণে নিযুক্ত, সবাই মারণাস্ত্রের লক্ষ্য। এখন নির্ব্রাহ্মণ, নির্বৈশ্য, নিঃশূদ্র। এসব কথা যখন মনে আসে তখন বুঝতে পারি যে মিলিটারিজম থাকতে শান্তি নেই, আর শান্তি না থাকলে কিছুই গড়ে উঠবে না, গড়ে উঠলেও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ইংলণ্ডের মিলিটারিস্টরাও অ্যান্টি-ক্রাইস্ট। কিন্তু দোহাই তোমার, বিয়াট্রিসকে একথা লিখো না, লিখলে আমার উল্লেখ করো না। উনি ঠাওরাবেন আমরাও নাৎসী বনে গেছি। জার্মানদের পক্ষ নিয়েছি। ভুল, ভুল, তেমন ধারণা সত্যের বিপরীত। ওঁরা যদি বিশ্বাস না করেন তবে বাপুকে আবার অনশন করতে হবে।"

সৌম্য জোর কদমে পা চালিয়ে দেয়। মানস ক্লাবের লনে গিয়ে টেনিসের জন্যে অপেক্ষমানদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। একদলের পালা সাঙ্গ হলে আর একদলের পালা আসবে। দুটি কোর্টে আটজন খেলোয়াড়। একজন মাত্র মহিলা। হ্যাফপ্যান্ট পরা বাঙালী মেমসাহেব। কিছুক্ষণ পরে মানসের পালা আসে।

খেলার সময় খেলা। তার পরে মেলা। ক্লাব বাড়ীর ভিতরে গিয়ে যে যার পছন্দমতো পানীয় অর্ডার দেয়। কেউ-বা নিজের খরচে কেউ-বা পরের খরচে। দু'একজন তার আগেই বাড়ী চলে যায়, দু'একজন বিলিয়ার্ড খেলতে আসে। রকমারি খোশগল্পের মধ্যে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কথাও ওঠে। কংগ্রেস কী করবে এটাও একটা জল্পনার বিষয়! সরকারী কাজকর্মের প্রসঙ্গ ওঠে। আরও ওঠে বদলীরও প্রসঙ্গ, প্রমোশনেরও প্রসঙ্গ। ধর্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, একজন বাদে। ছেলেটি খাঁটি মুসলমান। যদিও গান্ধীভক্ত।

স্টেশনে উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে আটজনই ভারতীয়, তাঁদের মধ্যে চারজন হিন্দু আর চারজন মুসলমান। পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির প্রশাসনিক গঠন মোটামুটি এইরকম। ইংরেজরা ইতিমধ্যেই কলকাতায় বা দিল্লীতে জড়ো হয়েছেন। হিন্দুদেরও গতি কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে। মুসলমানদের মধ্যে তিনজনই পশ্চিমা মুসলমান। তাঁদের প্রবণতাও পশ্চিমমুখী, অথচ তাদের জোর করে পদ্মাপারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কারণ অফিসার মহলে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা কম। উচ্চতর পর্যায়ে তো নিশ্চয়ই, নিম্নতর পর্যায়েও।

"ফ্রেণ্ডস, রোমানস অ্যাণ্ড কান্ট্রিমেন" এই বলে হঠাৎ ভাষণ দিতে শুরু করেন, ক্লাবের সেক্রেটারি খোন্দকার জাফর হোসেন, "লেণ্ড মী ইয়োর ইয়ার্স।"

"ভুল করলেন, খোন্দকার" বাধা দেন হায়দার, "রোমানরা আজ কেউ উপস্থিত নেই। শেফার্ড

এখন যুদ্ধ ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আর বার্লো তো প্রায়ই ফাঁসীর হুকুম দিয়ে দূরবীণ নিয়ে বসেন আসমানের তারা গুনতে।" বলেন তিনি ইংরেজীতে।

"অল রাইট। ফ্রেণ্ডস, আই . সি. এস. মেন অ্যাণ্ড কাণ্ট্রিমেন", হায়দার, মল্লিক প্রভৃতির উপরে কটাক্ষ করেন পুলিশম্যান, টু বী অর নট টু বী দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। না, না, বাধা দেবেন না, মল্লিক, আমি জানি এটা 'জুলিয়াস সীজার' থেকে নেওয়া নয়, 'হ্যামলেট' থেকে নেওয়া, আমরা বিলেত যাইনি বটে, কিন্তু কলেজে তো পড়েছি।" এসব কথাও ইংরেজীতে। নইলে পশ্চিমারা বুঝবেন না।

"গো অন, গো অন" উস্কে দেন বক্সী, "হীয়ার, হীয়ার।"

জাফর হোসেন যা বলেন তার মর্ম। "এই ক্লাব আর বেশীদিন চলবে বলে মনে হয় না। লোকে বলে, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কী? আদা তো বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় না। জাহাজ না এলে আদার দামও বাড়ে না। কিন্তু যুদ্ধের দরুন জাহাজ চলাচল অনিয়মিত হলে হুইস্কির দাম হু হু করে বেড়ে যায়, ব্রাণ্ডির দাম হু হু করে বেড়ে যায়, বীয়ারের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। সেই কারণে ক্লাবের খরচও হু হু করে বেড়ে যায়। এখানে সাচ্চা মুসলমান যাঁরা আছেন তাঁরা সরাব স্পর্শ না করলেও তাঁদের বিল আকাশ স্পর্শ করবে, যদি তাঁরা তাঁদের দোস্তদের ড্রিঙ্কস অফার করেন। আমি নিজে একজন পাক্কা মুসলমান, তবু আমাকেও আমার উপরওয়ালাদের ড্রিঙ্কস অফার করতে হয়। তারা কিছু মনে করতে পারেন বলে গেলাসে গেলাস ঠোকাঠুকি করতে হয়। তারপর অলক্ষ্যে সরিয়ে রাখি। হলফ করে বলতে পারব না যে মুখেও এককোঁটা লাগে না। শ্যাম্পেন যদি কেউ অফার করেন, যেমন লাটসাহেবের টেবিলে, আমি এমন কিছু মোল্লা মৌলবী নই যে, নরকের ভয়ে পেছিয়ে যাব। চরম অভদ্রতা হবে তা যদি আমি করি। রিপোর্ট যাবে যে লোকটা চৌকস হলে কী হয় সামান্য কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। সাহেব মেমসাহেবদের প্রকাশ্যে অপমান করে। না, বন্ধুগণ, আমার অতো বড়ো বুকের পাটা নেই। চাকরিতে কর্মদক্ষতাই কি সব? শুধু কর্মদক্ষ বলেই কি কারো প্রমোশন হয়? রোমে না যাই রোমানদের সঙ্গে তো কাজ করেছি। রোমানদের সঙ্গে রোমানদের মতোই আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই তো জেলা পুলিশের ভার পেতে পেরেছি। কিন্তু যুদ্ধ যদি চার পাঁচ বছর গড়ায়, জাহাজ যদি নিয়মিত চলাচল না করে, সব ক'টা মদের ব্যাপারীকে জেলে পুরলেও আমি মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে অক্ষম। অভাবে স্বভাব নষ্ট। ওদের মধ্যে যারা সাধু তারাও অসাধু হবে। আর আমাদের মধ্যে যারা নেশাখোর তারাও অসাধু হবে। সেটা তো ভালো নয়। বিল মেটাতে না পারলে ক্লাব ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু বেশীর ভাগ মেম্বর ক্লাব ছেড়ে দিলে বা বিল চুকিয়ে দিতে গড়িমসি করলে ক্লাব থেকে মদের পাট উঠিয়ে দিতেই হয়। তা হলে এটা আর ইউরোপীয়ান ক্লাব থাকবে না, হয়ে উঠবে ইণ্ডিয়ান ক্লাব। তা যদি হয় তবে ইউরোপীয়ানরা আর এ মুখো হবেন না, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ইণ্ডিয়ানদের হবে না, হাফিজকে দেখা যাবে চরকা কাটতে আর নামাজ পড়তে । আর মল্লিক তো এখন থেকেই শাকাহারী, ডিনার পার্টি কি তা হলে আমিষবর্জিত হবে? যে যার ওয়াইফকে নিয়ে আসার রেওয়াজ এমনিতেই বিরল, কারণ ইউরোপীয়ানরা বিরল, হিন্দুরা তবু তাদের শূন্যতা কতকটা পূরণ করেছেন, কিন্তু মুসলমানদের বেলা কড়া পর্দা। মহিলারা বড়ো একটা আসেন না, এলেও পান করেন না।"

মানসের বরাত ভালো। মিসেস মল্লিকের না আসার জন্যে কেউ কৈফিয়ৎ চান না। সকলেরই জানা আছে তিনি এখনো শোকাহত।

হোসেন বলে যান, "আমাদের এখন হ্যামলেটের মতো দোটানা। ক্লাব থেকে ড্রিঙ্কস তুলে দেওয়া ইংরেজ আমলে হবে না। হবে কংগ্রেস আমলে বা লীগ আমলে। বড়ো বড়ো পদগুলো হিন্দু মুসলমানদের দেওয়া হলেও মাঝে মাঝে ইউরোপীয়ান জজ ম্যাজিস্ট্রেট আসবেনই। তাঁদের সৃষ্টি যে ক্লাব তাকে বিলুপ্ত করবে কে? ক্লাব থাকছে, কিন্তু আয় যথেষ্ট না হলে টেনিস, বিলিয়ার্ডস, ডিনার ইত্যাদি একে একে বন্ধ

হচ্ছে। স্টাফ ছাঁটাই করতে হবে। সেক্রেটারি যদি বলেন যে সেই অপ্রিয় কাজটি তাঁকে দিয়ে হবে না তবে তাঁকে অব্যাহতি দিলে কেমন হয়? আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি ক্লাব কোনো মতে বেঁচে থাকবে, কিন্তু মেম্বর হতে বিশেষ কারো আগ্রহ থাকবে না, কারণ চাঁদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমেনিটি কোথায়? আপনারা কি বর্ধিত হারে চাঁদা দিতে প্রস্তুত? না আপনারা ব্যবসাদার শ্রেণীর লোকদের অবাধে প্রবেশ করতে দেবেন? তারা টাকা ঢালবে আর ফেভার চাইবে। সেটা আমি থাকতে নয়। ফেভার আমি কখনো কাউকে দেখাইনে। আমি জানি আপনারা এ বিষয়ে একবাক্যে একশব্দে 'না' বলবেন।"

"না।" "না।" "না।" "না।" "না।" "না।"

হোসেন তাতে আনন্দ প্রকাশ করেন। এটা হলো অফিসারদের ক্লাব। তাও উচ্চপর্যায়ের অফিসারদের। জমিদার শ্রেণীর প্রতি বিশেষ সৌজন্য এর পুরাতন ঐতিহ্য। তাও বিশিষ্ট জমিদার না হলে নয়। যাঁরা রাজা কিংবা নবাব। তাঁরা বড়লোক বলে নয়, তাঁরা অভিজাত বলে। তবে হ্যাঁ, ইউরোপীয় প্ল্যাণ্টারদের বেলা অন্য নীতি। তাঁরা রাজা রাজড়া না হলেও রাজার জাত তো বটে। বিলেতফের্তা বলে ব্যারিস্টারদেরও প্রবেশ আছে, কিন্তু বিলেতফের্তা না হলে উকিলদের নয়। ডাক্তারদেরও নয়, অধ্যাপকদেরও নয়। আগে ছিল এটা ইউরোপীয়ানদের ক্লাব, এখন শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাগত প্রাধান্য নেই, কিন্তু প্রভাব অসামান্য। প্রেসিডেন্ট হন সাধারণত কলেকটর অথবা জজ। তাঁদের একজন অন্তত ইউরোপীয়। সেক্রেটারি হন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট অথবা সিভিল সার্জন। আজকাল দু'জনেই ভারতীয়। একদা সিভিল সার্জন ছিলেন বলে মুস্তাফীকেও মেম্বর করা হয়েছে। তিনি বিলেতফের্তা না হলেও যুদ্ধফের্তা। সেই সুবাদে একজন যুদ্ধফের্তা মুসলিম ডেপুটিকেও নেওয়া হয়েছে। যাতে মুসলমানদের অনুপাত বাড়ে। তিনি বাঙালী হলেও তাঁর বেগম লখ্নৌয়ের তালুকদার ঘরানা। ইসাবেলা থোবার্ন কলেজে পড়েছেন। ক্লাবে আসেন, নাচেরও পার্টনার হন। কিন্তু কদাচিৎ। স্বামীর সঙ্গে কেউ নাচতে চান না বলে তাঁর মলিন মুখ দেখে বেগমও লজ্জিত।

ক্যাপটেন লাহা জানতেন যে প্রথা অনুসারে সিভিল সার্জনকেই এ দায় নিতে হবে, যদি পুলিশম্যান সত্যি সত্যি সেক্রেটারি থাকতে নারাজ হন। তিনি বলেন, "খোন্দকার সাহেব, আপনি ধরে নিয়েছেন যে ফ্রান্সই একমাত্র দেশ যেখানে আঙুর ফলে, যার থেকে ব্রাণ্ডি হয়। আর জার্মানীই একমাত্র দেশ যেখানে বার্লি আর হপ থেকে বীয়ার বানায়। আর স্কটল্যাণ্ডই একমাত্র দেশ যেখানে মণ্ট ইত্যাদি থেকে হুইস্কি চোলাই করে। এই বিশাল ভারতে এর প্রত্যেকটির উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু ইউরোপীয় কায়েমী স্বার্থ তার অন্তরায়। তাই সাত সমুদ্র পার থেকে আমদানী করতে হয়। আমদানী বন্ধ হলে গোরা অফিসারদের অসুবিধা আরো প্রবল হবে। মূলধন খাটাতে তো মাড়োয়ারীরাও স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে, অবশ্য গোরা কোম্পানীর বেনামীতে। ওদের ভয় কেবল এই যে কংগ্রেসের প্রোহিবিশন নীতি হবে আরো বড়ো অন্তরায়। আর মুসলিম লীগ প্রভৃতি মুসলমানদের দলগুলিও এই একটি বিষয়ে একমত। কে এত টাকা এসব ব্যবসায় খাটাতে সাহস পাবে?"

"ক্যাপটেন ল," জাফর হোসেন বলেন," আপনি তো যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে এসেছেন পানী ছাড়া মীন বাঁচে না পানীয় ছাড়া মিলিটারি তেমনি বাঁচে না। তেষ্টায় ওদের বুক ফেটে যাবে, লড়বে কী করে? এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান ইণ্ডিয়ান ইউরোপীয়ান ভেদ নেই। সরবরাহ বজায় রাখার জন্যে গভর্নমেণ্টকে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতেই হবে। মাড়োয়ারীদের চেয়ে পার্শীরাই এগিয়ে আসবে, কারণ এটা ওদের নিত্য নৈমিত্তিক পানীয়। ওদের বিয়েব ভোজেও পানীর গেলাসের সঙ্গে পানীয়ের গেলাস থাকে। তাতে পানীয় ঢেলে দিয়ে যায় উপবীতধারী পার্শী ব্রাহ্মণ, পদবী পাণ্ডে। ওরাই সত্যিকার আর্য বংশধর। আর্য যুগের সোমরস ওরাই সংরক্ষণ করে এসেছে। শুধু কি সোমরস? বৎসতরী ভক্ষণও। বৌদ্ধ জৈনদের প্রভাবে পড়ে সেটাও আপনারা ছেড়ে দিয়েছেন। বরং আরো কঠোরভাবে বন্ধ করেছেন। নৈতিক জয়

হয়েছে বৌদ্ধ জৈনদেরই। আপনারা নৈতিক অর্থে পরাজিত। এখন পার্শীদের কথা হচ্ছিল, ওরা সোমরস বর্জন করবে না বলে স্বদেশ থেকেই চিরবিদায় নিয়েছে। ওদের উপর প্রোহিবিশন জারি করলে ওরা এদেশ থেকেও চিরবিদায় নিয়ে আর্যদের সংস্কার সংরক্ষণ করতে ইউরোপে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করবে। অথচ ভেবে দেখুন ইণ্ডাস্ট্রি এদেশে যে ক'টি গড়ে উঠেছে সে ক'টি ওদেরই উদ্যোগে। মার্কিন গৃহযুদ্ধের মরসুমে ওরাই প্রথম কটন মিল পত্তন করে। প্রথম মহাযুদ্ধের মওকায় প্রথম ইস্পাতের কারখানাও ওদেরই উদ্যোগিতায়। অভয় দিলে ওরাই প্রথম ভারতীয় হুইস্কি আর ব্রাণ্ডি, জিন আর বীয়ার উৎপাদন করবে। কিন্তু আপনি তো ভালো করেই জানেন যে ইংরেজ থাকতে ওরা অনুমতি পাবে না, বিলেতের কায়েমী স্বার্থ বাধা দেবে, ওদের মিতা ফ্রান্সের কায়েমী স্বার্থও। যুদ্ধ শেষ হলে সন্ধিসূত্রে জার্মান কায়েমী স্বার্থও। ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে যায় কংগ্রেসও বাধা দিবে, গান্ধী বেঁচে থাকতে কংগ্রেসের এত সাহস হবে না যে মহাত্মাকে অমান্য করবে। আর লীগ দলপতি কায়েদে আজম জিন্না সাহেব যদিও আর সব বিষয়ের মতো সুরাপানেও সাহেব তবু তিনিও তাঁর সম্প্রদায়ের ভোট পাবার জন্যে তাঁর জিন্নৎবাসিনী পার্শী পত্নীর সঙ্গে যা নিত্য সেবন করতেন তার বেলা পার্শীদের সঙ্গে নয় মোল্লা মৌলবীদের সঙ্গে সুর মেলাবেন। মসজিদ থেকেই মসনদ, আলাদা একটি মসনদ, এটাই তো পাকিস্তানের বিবর্তনের সূত্র। এ বিবর্তন রোধ করবে কে?"

প্রসঙ্গটা রাজনীতির দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে ক্যাপটেন নিতাইচাঁদ লাহা শঙ্কিত হয়ে বলেন, "খোন্দকার, এই একটি জিনিস আছে যা হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টান শিখ একসঙ্গে বসে পান করতে পারে। এই একটি জায়গা আছে যেখানে সেটা সম্ভব। সুতরাং ক্লাব যাতে বাঁচে তাই হোক আমাদের ভাবনা। যুদ্ধ কি চিরকাল চলতে পারে? চার বছর বাদেই হোক, পাঁচ বছর বাদেই হোক একদিন না একদিন থামবে। তখন আবার জাহাজ চলাচল নিয়মিত হবে, আবার জার্মানী থেকে বীয়ার আমদানী হবে, ফ্রান্স থেকে ব্রাণ্ডি, স্কটল্যাণ্ড থেকে স্কচ। আপনার আমার বদলীর চাকরি, বরাবরের জন্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের কর্ম নয়। আপনি সেক্রেটারি থাকতে নারাজ হলে আমিই তো সেক্রেটারি হব। আমি এই মহামানবের সাগরতীরে সবাইকে মেলাব ও সবার সাথে মিলব। মার্কার, পুছো।"

মার্কার তখন জনে জনে সুধায় কে কী খেতে চান। বিল তো মেটাবেন ডাক্তার তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের আয় থেকে। হোসেন বলেন, "ডাক্তারকে চটালে নিশ্চিত পরলোক। কল দিলে প্রেসক্রাইব করবেন ব্রাণ্ডি। তখন তো তাঁর আজ্ঞা মানতেই হবে। মেডিকাল লীভ চাইলে তিনিই তো রেকমেণ্ড করবেন। যদি না করেন তা হলে তো প্রিভিলেজ লীভ নিতে হবে। মার্কার, ছোটা পেগ।" বলা বাহুল্য হুইস্কির।

মানসের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে যূথিকা খোঁজ নিতে লোক পাঠিয়েছিল। মানস তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরে যায়। শোনে ক্যাপটেন মুস্তাফী তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

"মাফ করবেন, ক্যাপটেন মুস্তাফী, পুলিশের কবলে পড়েছিলুম, শেষে ডাক্তার এসে আমাকে উদ্ধার করেন।" মানস হাসতে হাসতে বলে।

"অ্যাঁ!" মুস্তাফী চমকে উঠে বলেন, "জজকে ধরতে আস্পর্ধা হয় পুলিশের! এমন বিচিত্র কাহিনী তো কখনো শুনিনি।"

"শোনাব। শোনাব। তার আগে শুনতে চাই মিলির খবর। কিন্তু আরো আগে শুনতে চাই কী খাবেন?" মানস যূথিকার দিকে তাকায়।

"সেটা কি এতক্ষণ বাকী আছে নাকি? যূথী মা আমাকে কি অমনি বসিয়ে রেখেছেন? হ্যাঁ, মিলির খবর দিতেই আজ আমার আসা। মিলি পোর্ট সেড থেকে কেবল করে জানিয়েছে যে মেডিটেরানিয়ান দিয়েই মার্সেলস যাচ্ছে। কোনো ভয় নেই। সব ভালো। এডেন থেকে এয়ার মেলে চিঠিও পেয়েছি।

তাতে আপনাদের দু'জনকে ওদের দু'জনের প্রীতি নমস্কার জানাতে বলেছে। জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা এত কম যে সকলেই সকলের চেনা। সাহেব মেমদেরও অন্য চেহারা। যেচে আলাপ করেন। সব সময় কুশল প্রশ্ন করেন। লিখেছে আমি কি জানতুম যে ওরা 'হাউ ডু ইউ ডু' বললে আমাকেও তার উত্তরে বলতে হবে 'হাউ ডু ইউ ডু'? আমি বলি, 'নট ভেরি ওয়েল, আই ফীল সিক'। কথাটা সত্যি, কিন্তু ইংরেজদের স্বভাব হচ্ছে ওরা মুখ ফুটে ওকথা জানায় না। চেপে রাখে। অন্তরঙ্গতা জন্মালে কথাপ্রসঙ্গে বলে। আর আমরা তো সম্পূর্ণ অপরিচিতকে রোগের খুঁটিনাটি বিবরণ শোনাই। কিংবা বলি, 'আমি ভালো আছি। আপনি?' তখন হয়তো শুনতে হয় আধিব্যাধির বিশদ বর্ণনা। যাত্রীদের সবাইকে ক্যাপটেন সাহেব নিজের টেবিলে বসান, আমাদের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেন। খাবারও পাই প্রথম শ্রেণীর। তবে ক্যাবিনের শ্রেণীভেদ মানতে হয়। ক্যাপটেন সাহেবের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে। একটা বাইনোকুলার ধার দিয়ে বলেছেন যতদিন খুশি রাখতে পারি, নামবার আগে ফিরিয়ে দিলেই চলবে। ডেক চেয়ারে বসে হাওয়া খাই আর বাইনোকুলার দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখি। এই অপূর্ব অনুভূতির জন্যে সমুদ্রযাত্রার আবশ্যক ছিল। আর সমুদ্রযাত্রার জন্যে বিবাহের আবশ্যক ছিল। আর বিবাহের জন্যে অমন একজন দেবদূতের আবশ্যক ছিল। কিন্তু একটুও ভালো লাগছে না ভাবতে যে জুলির বরকে আমি ছিনিয়ে নিলুম। যূথিকে বোলো জুলিকে বোঝাতে যে এর জন্যে জুলিই দায়ী। ও যদি ওর বরকে বার বার তিনবার প্রত্যাখ্যান না করত তা হলে উনিও আমাকে চাইতেন না, আমিও ওঁকে চাইতুম না। প্রজাপতির নির্বন্ধ ব্যতীত এর আর কী ব্যাখ্যা আছে? তোমরা যতবার নির্বন্ধ করেছ ততবার ব্যর্থ হয়েছ। আমি তো চেষ্টাই করিনি। যাই হোক, বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে বিয়ে যাতে সুখের হয়। আমি ওঁকে অভয় দিয়েছি যে ওঁর জীবনে আমি যখন ছিলুম না তখন আর কেউ ছিলেন কি না, কার সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল, তা নিয়ে একটিও প্রশ্ন করব না। উনিও কথা দিয়েছেন কখনো প্রশ্ন করবেন না আমি সন্ত্রাসবাদীদের কোন্ দলে যোগ দিয়েছিলুম, আমার কমরেডদের কার কী নাম, কার কী ঠিকানা, কার কী কীর্তি বা অপকীর্তি, কোন্ জন সাচ্চা, কোন্ জন মেকী, কতবার সর্পতে রজ্জুভ্রম করেছি, কতবার রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছি। আমাদের দু'জনের জীবনেই জন্মান্তর ঘটে গেছে, আমার তো সেই সঙ্গে গোত্রান্তর।"

চিঠিখানা তিনি পড়ে শোনান। তারপর মানস ও যূথিকার কাছে তাঁর সহধর্মিণীর ও তাঁর নিজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করেন।

তখন পুলিশ ও ডাক্তারের কাহিনী শুধু যূথিকাকেই শোনাতে হয়।

খুব একচোট হাসাহাসির পর যূথিকা বলে, "তোমরাও এবার নিশ্চিন্ত হলে। যে পথ দিয়ে মিলি গেছে সেই পথ দিয়ে হুইস্কি ব্রাণ্ডি আসবে। বীয়ার কিন্তু আসবে না। তার জন্যে হিটলারের সঙ্গে লড়তে হবে। তাকে হারাতে হবে। মিউনিকের সেই বীয়ারগার্টেনেই তো নাৎসী পার্টির সমাবেশ হয়।"

"ভেবো না, বীয়ার বাঁকা পথ দিয়ে আসবে ঠিকই। গোটা কয়েক নিরপেক্ষ দেশও তো থাকবে।" মানস আশ্বাস দেয়।

"বেল পাকলে কাকের কী? আমি তো ক্লাবেও যাইনে, মদও খাইনে। যে দুটির ভার ভগবান আমাকে দিয়েছেন সে দুটিকে বাঁচিয়ে রাখা ও মানুষ করে তোলাই আমার প্রথম ও প্রধান কাজ। বলতে পারতুম সব সময়ের কাজ, কিন্তু আমি তো কেবল মাতা নই, কেবল বধূ নই, আমি নারী। আমার নারীত্বের বিকাশ তো থেমে থাকতে পারে না। যেমন তোমার পৌরুষের বিকাশ। শোক আছে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকেও তো দৃষ্টি রাখতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্যেই তোমার টেনিস খেলতে যাওয়া। আড্ডা দেবার জন্যে নয়। বেচারা ক্যাপটেন মুস্তাফী! কতক্ষণ থেকে এখানে এসে বসে আছেন। বাড়ীতে ওঁর মিসেসও তো এমনি উতলা।" যূথিকা শুনিয়ে দেয়।

মানস নীরবে শুনে যায়। সত্যিই তো। ক্লাবে এতো বেশী সময় নষ্ট করা ঠিক হয়নি। তবে মেম্বর মাত্রেরই ক্লাবের প্রতি একটা কর্তব্য আছে। মদের অভাবে নয়, মেম্বরের অভাবে ক্লাব উঠে যেতে পারে। তখন কোথায় খেলতে যাবে টেনিস?

"ছেড়ে দাও। যা হবার তা হয়ে গেছে।" যূথিকাই আবার বলে, "এখন থেকে জুলির কথাটা একটু ভেবো। মিলির বিয়েতে ও দারুণ আঘাত পেয়েছে। বর ছিনিয়ে নিল বলে নয়, বিপ্লবের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল বলে। যেত যদি রাশিয়া জুলি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরত। ধরে নিত যে বিপ্লবকে এগিয়ে দেবার জন্যেই যাচ্ছে। তখন মনে হতো বিয়েটা যেন রোজা লুকসেমবুর্গের বিয়ে। প্রেমের জন্যে নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে। তা তো নয়, চলল কিনা বিলেত। যে দেশ আমাদের দেশকে বুটের তলায় পিষে মারছে। জনগণকে চুষে খাচ্ছে। না, না, এসব আমার নিজের উক্তি নয়, জুলির উক্তির পুনরুক্তি। আমি ওর মতো আঁধারে ঝাঁপ দিতে চাইনে। ইংরেজ শুধু অনিষ্টই করেছে, ইষ্ট কি একটুও করেনি? বিপ্লব কি শুধু ইষ্টই করে, অনিষ্ট একটুও করে না?"

মানস বলে, "সামনে আসছে একটা ঘোরতর পরিবর্তন। সেটা বিপ্লবের রূপও নিতে পারে, জুই। সেটা ভালো কি মন্দ তা এককথায় চিহ্নিত করা যায় না। কারো মতে মন্দ, কারো মতে ভালো। সৌম্যদা চাইছে সেটাকে নির্জলা অহিংস রূপ দিতে। নির্জলা একাদশীর মতো সম্পূর্ণ কল্যাণকর। যেটা হবে সকলের মতে ভালো। আমার দুর্ভাগ্য এই যে আমি কারো সঙ্গে একমত হতে পারছিনে। ইংরেজদের চাইতেও মন্দ আছে, তারা হিটলারপন্থী জার্মান। সেইজন্যে কংগ্রেস নেতারা বিপ্লবীদের মতো অন্ধ ব্রিটিশবিদ্বেষী নন। বিপ্লবের দিন তাঁরাও তো কোতল হবেন। বুর্জোয়া বলে তারাও তো রক্তশোষক। কংগ্রেস ভেঙে যাচ্ছে বাম দক্ষিণের কোঁদলে। বিকল্পে যে তেমনি একটা শক্তিমান সঙ্ঘ গড়ে উঠছে তা নয়। ক্ষমতার হস্তান্তর নির্বিবাদে না হলে চরম অরাজকতা। গান্ধীজীও বুঝতে পারছেন যে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। তিনিও তখন অসহায়। আর আমি? আমি নীরব সাক্ষী। তোমাদেরও যে প্রোটেকশন দিতে পারব সে ক্ষমতা আমার নেই। কে দেবে তাও জানিনে। বিশ্বের ভবিষ্যৎ আমাকে ভাবায়, অথচ আগেকার মতো ভগবানে বিশ্বাস, তাঁর মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস আজ আমার নেই। সেটা আছে সৌম্যদার। ওর দৃষ্টি ধ্রুবতারার উপরে।"

।। তেরো ।।

এর পরে যখন ক্যাপটেন লাহার সঙ্গে দেখা হয় মানস তাঁর করমর্দন করে বলে, "ক্যাপটেন, আপনি কি গালিলেও না নিউটন না আইনস্টাইন? সেদিন কতে বড়ো একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করে শোনালেন।"

লাহা তো অবাক। "আমি নিউটন বা আইনস্টাইন! তত্ত্ব আবিষ্কার!"

"ওই একটি জিনিসই হিন্দু মুসলমান ইণ্ডিয়ান ইউরোপীয়ান সবাইকে একসঙ্গে মেলায়। আর এই একটি জায়গাই মহামানবের সাগরতীর। কেন আপনাকে আই. এম. এস করেনি, তাই ভেবে আকুল হচ্ছি।" মানস গম্ভীরভাবে বলে।

"অমন করে আঁতে ঘা দিতে নেই, মল্লিক। আমি বিলেতে যাবার সুযোগ পাইনি। যুদ্ধে যাবার মওকা জুটেছিল। ফিরে এসে সরকারী চাকরি পেয়ে যাই। সেই থেকে ক্যাপটেন র‍্যাঙ্কটাও থেকে যায়। ফলে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে। ক্লাবে ঢুকতে চাইলে কেউ ব্ল্যাকবল করে না। সাহেব মেমদের সঙ্গে সমানে মিশতে পারি, তার জন্যে ওই জিনিসটি খেতে ও খাওয়াতে হয়, তবে মাসের শেষে বিল কত উঠবে তারও একটা হিসেব রেখে চলি। কোথাও সিভিল সার্জনের পদ খালি হলে, আই. এম. এস দাবীদার না থাকলে আমাকেই অফিসিয়েট করতে ডাকে। চাকরিতে যারা আমার সীনিয়র তাঁদের এই

বলে স্তোক দেওয়া হয় যে ওটা তো লীভ ভেকেন্সী। পার্মানেন্ট ভেকেন্সী তো নয়। লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী। প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ছেদ পড়ে। সরকারী ডাক্তারেরা একস্থানে স্থির হয়ে না বসতে পেলে তাঁদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস জমে না। এই জন্যে অনেকে অস্থায়ী পদোন্নতি প্রত্যাখ্যানও করেন। তখন আমাকেই মনে পড়ে। আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মায়া কাটিয়ে প্রমোশনের মায়াবিনীর ফাঁদে পড়ি।" লাহা একটু রসিয়ে রসিয়ে বলেন।

মানস তা শুনে আরেক দফা করমর্দন করে। "নোবেল প্রাইজ। নোবেল প্রাইজ ফর মেডিসিন।"

"থামুন থামুন। এখনো তো সব কথা বলা হলো না।" ডাক্তার সাহেব কানে কানে বলেন; "আপনাদের মতো আমরা তো বিলেতেও যাইনি, কোমর জড়িয়ে হাত ধরাধরি করে নাচবার সুযোগও পাইনি। আমাদের পক্ষে এই সেই বিলেত, এখানে যারা নাচতে জানে তারা ইণ্ডিয়ান হলেও অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। কিন্তু কৃষ্ণাকেও সঙ্গে করে আনতে হয়। নইলে কৃষ্ণকে ওরা সন্দেহ করেন। আমি তো চিরকুমার, আমার কে আছে যে কাকে সঙ্গে করে আনব। আমার মতো ইউরোপীয়ানও তো আছেন। তাঁরা যদি মার্জনা পান আমিও কি পেতে পারিনে? আর ওই বেটা সাহনী ক্যাপটেন থেকে মেজর হয়েছে, মেজর থেকে লেফটনান্ট কর্নেল হয়েছে শুধু তাই নয়, আই. এম. এসও হয়েছে। কেন বলতে পারেন? ও হলো ক্রিশ্চান, মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত। ওর নাকি ফরাসী মেমসাহেব। এ দেশ সহ্য হলো না, বাচ্চাকে মানুষ করার নাম করে প্যারিসে বসবাস করছেন। কেউ কখনও তাঁকে চক্ষে দেখেনি। ধাপ্পাও হতে পারে। তবু তাসের আসরে ওর বাঁধা আসন। মেমসাহেবরা ওকেই পার্টনার পেলে ভরসা পান যে বাজীমাৎ করবেন। ব্রিজ খেলায় লোকটা পয়মন্ত। টাকা পায় ও পাইয়ে দেয়। অমন ভাগ্যবান পুরুষকে যে নাচের পার্টনার হতে দেওয়া হয় তার এটাও একটা হেতু। আমি কিন্তু তাসের আসরে লক্ষ্মীছাড়া। ওদিকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসেও হতভাগা। আমার বন্ধু মুস্তাফী কেমন জাঁকিয়ে বসেছেন দেখেছেন? এক স্টেশনে চিরস্থায়ী হতে চান বলে চাকরিটাই দিলেন ছেড়ে। উনি ভালো করেই জানতেন যে ওঁকে সিভিল সার্জন পদে পারমানেন্ট করা হবে না, কেননা ওঁর মেয়ে একজন নাম-করা টেররিস্ট। এটাই বা কোন্ সুবিচার! মেয়ের অপরাধে বাপের প্রাণদণ্ড! মুস্তাফীর চেয়ে বিচক্ষণ কোন্ সাহেব ডাক্তার! ও বেটা সাহনী তো একটা মানুষমারা সার্জন। প্রাণদণ্ড দিতে হলে সাহনীকেই দিতে হয় সব আগে। যা বলছিলুম, আমি পড়ে গেছি আরো এক মায়াবিনীর ফাঁদে। ব্রিজে আমাকে কেউ পার্টনার করে না, সেদিক থেকে আমি পয়মন্ত নই। কিন্তু বল নাচে আমার পার্টনার হতে কেউ সাড়া না দিয়ে পারবেন না। কেন বলতে পারেন?"

মানস নির্বাক। লাহা আরো চুপি চুপি বলেন, "খবরদার, ফাঁস করবেন না। তা যদি করেন আমার কপালে আছে বাঁদর নাচ। আপনি তো লেখেনও শুনেছি। কে জানে কোন্‌দিন নভেল কি নাটকে আমাকে দিয়ে বল নাচ নয়, বাঁদর নাচ নাচাবেন। দেশশুদ্ধ লোক হাসবে। লাহা পরিবারের মাথা হেঁট হবে।"

মানস তাঁকে অভয় দেয় যে তেমন কোনো অভিলাষ তার নেই। ক্যাপটেন লাহাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তিনি একই ব্রাদারহুডের মেম্বর, যদিও একই সার্ভিসের নন। তেমন কাজ যদি করে তবে সবাই তাকে একঘরে করবেন। বলবেন সে একটা ক্যাড।

তখন লাহা রসিয়ে রসিয়ে বলেন, "শত্রুরা বলে আমার নাকি সেই জিনিসটি আছে যা রুডলভ ভালেন্টিনোর ছিল। আরো খোলসা করে বোঝাতে হবে? ওই শব্দটা কি মুখে না আনলে নয়? দুটি হরফ উহ্য রেখে বলি, এক্‌স অ্যাপীল।"

হো হো করে হেসে ওঠে মানস। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। পানের মাত্রা বোধ হয় বেশী হয়ে গেছে। ভদ্রলোক কৃষ্ণবর্ণ হলেও কৃষ্ণ নন। তাঁর সঙ্গে রাসলীলার জন্যে গোপীরা উদ্বাহু হবেন না। ক্লাবের মেম্বারমাত্রেরই তেমন সৌভাগ্য হয় না। "কোনো কোনো ভাগ্যবান নাচিবারে পায়।"

মানস কথা রাখে। এসব কথা আর কারো কানে যায় না। কিন্তু এখন বুঝতে পারে ইউরোপীয়ান

ক্লাবের মেম্বর হবার জন্যে ইণ্ডিয়ানরা কেন লালায়িত আর তাঁদের মেম্বর করতে ইউরোপীয়ানরা কেন আতঙ্কিত। ইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ানদের একজনকে মেম্বর করেও কেন পরে পুকুরের জলে পাতিহাঁসের মতো চোবানো হয়েছিল। অশালীন ভাষায় যাকে বলে "ডাকিং"।

ক্যাপটেন সঙ্গে সঙ্গে উধাও হন। কয়েকদিন ক্লাবেই আসেন না। আবার যেদিন দেখা হয় সেদিন মাফ চেয়ে বলেন, "একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। না? সেদিন নিজের হাতে পোস্ট মর্টেম করতে হয়েছিল। শেফার্ডের হুকুম। কেসটা হয়তো আপনার কোর্টে পাঠানো হবে। আপনি যেমন নরম মানুষ আসামীকে হয়তো সন্দেহের অবকাশ দেবেন। তবে এসব কেস সাধারণত বার্লো নিজেই বিচার করেন ও আসামীকে ঝুলিয়ে দেন। যুদ্ধফের্তা ইংরেজরা মরণের মুখোমুখি হয়ে অসাড় হয়ে গেছে। শেফার্ড ও বার্লো দু'জনেই ফ্রন্টে গেছেন। গুলী চালাতে বা ফাঁসী দিতে তাঁদের বিবেকে বাধে না। আমিও ফ্রন্টে গেছি। কিন্তু আমার তো কর্তব্য আহতদের প্রাণ রক্ষা করা, তার জন্যে নিজের প্রাণ বিপন্ন করা। আমি অসাড় হয়ে যাইনি। তাই অপ্রিয় কর্তব্য করবার সময় একটু আধটু টানতে হয়। ওই বীভৎসতা কি নেশা না করলে সহ্য হয়। সেদিন তারই খোয়ারি ভাঙছিলুম। সেইজন্যে ওসব কথা আপনাকে বলতে সাহস হয়েছিল। এখন হাত পা কামড়াচ্ছি।"

মানস হেসে ওঠে। "হাত পা কামড়াবেন কেন? বন্ধু মহলে কে না অমন কথা বলে? কার না ধারণা যে সেও একজন ভালেন্টিনো হলেও হতে পারত, যদি আমেরিকায় গিয়ে সিনেমায় নামত। ওটাকে আমরা স্পোর্টসম্যানের মতো নিই। মনে রাখি নে। নির্ভয়ে বলবেন, ডাক্তার সাহেব।"

আশ্বাস পেয়ে ক্যাপটেন লাহা বলেন, "কারই বা ভালো লাগে নিজের হাতে পোস্ট মর্টেম করতে! সিভিল সার্জনরা এসব কাজ সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জনদের দিয়ে করান। আমি যদি সাহেব হয়ে জন্মাতুম শেফার্ড কি আমাকেই আদেশ দিতেন একাজ স্বহস্তে করতে? ওঁর আদেশ দেবার পদ্ধতিটাও চমৎকার। 'বাই দ্য ওয়ে, ল, মে আই আস্ক আ ফেভার?' অর্থাৎ আমার অফিসিয়াল সুপীরিয়র আমার অনুগ্রহপ্রার্থী। কে জানে, বাবা, আপনিও কোন্‌দিন আমার অফিসিয়াল সুপীরিয়র হবেন। এর মধ্যেই কোথায় যেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন।"

"হাঁ, কিন্তু অস্থায়ীভাবে। আপনি আমার চেয়ে বয়সে তো সীনিয়র। অনেক সীনিয়র। আপনাকে কি অমন আদেশ দিতে পারতুম? কিন্তু বলা যায় না। সীরিয়াস কেস হলে আমরা কনভিকশনের দিক থেকেই ভাবি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে জজ হলে আবার উল্টো দিক থেকে ভাবতে হয়। প্রত্যেকটি আসামীকেই নির্দোষ বলেই ধরে নিতে হয়, যতক্ষণ না সে অপরাধী বলে প্রমাণিত হয়। এটাই ব্রিটিশ ধর্মাধিকরণের বৈশিষ্ট্য। জুরি প্রথার প্রবর্তনও এর অঙ্গ। জুডিসিয়ারিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা লাটসাহেবেরও নেই। শেফার্ড তো মুখ ফুটে তেমন কোনো ফেভার চাইতেই ভয় পাবেন। ব্রিটিশ শাসন যে এতকাল ধরে টিকে আছে এটা কি শুধু গায়ের জোরে? তার সঙ্গে ন্যায়ের জোরও আছে। ম্যাজিস্ট্রেট হলেন শস্ত্রশক্তির প্রতীক, আর জজ হলেন শাস্ত্রশক্তির প্রতীক। একজন হলেন আমাদের ভাষায় ক্ষত্রিয়, অপর জন ব্রাহ্মণ। দুই শক্তিই পরস্পরকে চেক ও ব্যালান্স জোগায়। এটাই হলো নিয়ম, তবে সঙ্কটকালে এর ব্যতিক্রম ঘটে। অর্ডিনান্সের শাসন আইনের শাসনকে ছাড়িয়ে যায়।" মানস এর জন্যে দুঃখিত।

"ওরা সংঘাতের সময় বলে, মাইট ইজ রাইট। শান্তির সময় বলে, রাইট ইজ মাইট। কখনো বিবেকের উপর জয়ী হয় স্বার্থবুদ্ধি। কখনো স্বার্থবুদ্ধির উপর বিবেক। লোহার হাত আর মখমলের দস্তানা দুটোই মিলে ব্রিটিশ রাজ। পোষ না মানলে ডাণ্ডা। পোষ মানলেই ঠাণ্ডা। ভালো কথা, মল্লিক, আপনি কি জানেন এখানে মিলিটারি আসছে? থামবে না, আরো দক্ষিণে চলে যাবে। বার্মায় কি মালয়ে। বোধহয় সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি গাড়বে। কেন, বলুন দেখি? জার্মানরা কি সিঙ্গাপুর অবধি ধাওয়া করবে?" ক্যাপটেনের কথায় কিসের যেন সঙ্কেত।

"তা যদি হয় আপনি যাবেন নাকি সিঙ্গাপুর ফ্রন্টে ? তেমন কোনো অঙ্গীকার দেননি তো?" মানস উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে।

"ওরা চায়ও নি। আমি দিইও নি ।" লাহার উত্তর।

" আমিও এককালে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে ভর্তি হয়েছিলুম। যেদিন বলে ভারতের বাইরে যখনি দরকার হবে তখনি যেতে হবে, সেদিন বণ্ড সই করতে অস্বীকার করি। বলে, ওটা একটা মামুলি ফর্মালিটি। আমি কি তাতে ভুলি? মানে মানে সরে পড়ি । একবার সই করলে পরে আর ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। কোর্ট মার্শাল।" মানস শিউরে ওঠে।

"যাঃ ! আপনি দেখছি নেহাৎ এক ভেতো বাঙালী। সাধে কি বলে আমরা মার্শাল রেস নই? আর্মিতে আমাদের অফিসার করে না, কারণ আমরা লড়ুইয়ে জাত নই। আমরা ভাবি কারণটা রাজনৈতিক। তা নয়, সামরিক । মেসোপোটেমিয়ায় গিয়ে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট লোক হাসিয়ে এসেছে। নিজেদের মধ্যেই লড়াই।" আফসোস করেন লাহা।

"কেন, আমি তো একজনকে জখম হয়ে ফিরতে দেখেছি। ফিরে এসে হয়েছিল সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।" মানস আশ্চর্য হয়ে বলে।

"ওটা কি টার্কদের গুলীতে না বাঙালীদের গুলীতে?" লাহা মুচকি হাসেন।

"অবশ্যই টার্কদের গুলীতে।" মানস দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"আপনি দেখছি সহজেই সকলের সব কথা বিশ্বাস করেন। ইংরেজরা অত নীরেট নয় যে অকারণে একটা রেজিমেণ্ট ভেঙে দেবে। ডিসিপ্লিন ইজ দ্য ওয়ার্ড। অনার ইজ দ্য ওয়ার্ড। লয়ালটি ইজ দ্য ওয়ার্ড। কথা দিয়ে কথার খেলাপ করলে মিলিটারিতে রাখে না। সিভিলে হয়তো রাখে, কিন্তু নিচের তলায়। ডাক্তারদের মধ্যেও কোঁদল। যেখানেই বাঙালী সেখানেই দলাদলি। ফ্রন্টে গিয়েও ঢেঁকি ধান ভানে। ফলে আর সরকারী চাকরি জোটে না। অবশ্য ডাক্তারি ব্যবসা করতে বাধা নেই। সে রকম কেস কিন্তু বিরল। ডাক্তাররা মোটের উপর মাথা ঠিক রেখে কাজ করেছেন। বাঙালীরা ডাক্তার হিসেবে খুব নাম করে ফিরেছেন। আমাকেও এতদিনে মেজর কি লেফটনান্ট কর্নেল করে থাকত, আমি যদি ফ্রন্টিয়ারে কি বেলুচীস্থানে চাকরি নিয়ে থেকে যেতুম। সেটা যে হলো না তার কারণ আমি ভীতু বাঙালী বা ভেতো বাঙালী নই। আমি চেয়েছিলুম বুড়ো বাপ মার কাছে না হোক কাছাকাছি থাকতে। কিন্তু তাঁদের শেষ সাধটা মেটাতে কি পারলুম?" লাহা আবেগের সঙ্গে বলেন।

"শেষ সাধ? তার মানে কী, ক্যাপটেন? শুনতে চাইলে কি অশিষ্টতা হবে?" মানস কৌতূহলী হয়।

"না, না, অশিষ্টতা নয়। সেটা আমারই দুর্ভাগ্য। তাঁরা আমাকে বিলেত যেতে দেননি, জেদ ধরেন যে তার আগে বিয়ে করতে হবে। আমি দেখি মহাবিপদ। তা হলে আর বিলেত গিয়ে স্বাধীনতা কী হলো? হাত পা বাঁধা। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারব না। যার জন্যে সবাই বিলেত যায়। আপনি হয়তো ব্যতিক্রম। প্রেজেণ্ট কম্পানী অলওয়েজ একসেপটেড। আই বেগ ইয়োর পার্ডন, সার।" লাহার কাঁচুমাচু মুখ।

মানস হা হা করে হেসে ওঠে । "মেলামেশা আমিও কামনা করছি। সেটা কিন্তু অত সুলভ নয়। কেউ ইনট্রোডিউস করে না দিলে রীতিমতো দুর্লভ। নেহাৎ যদি এল-এল ডি না হয়।" মানস রঙ্গ করে।

"সে কী, মশায়। তার মানে তো ডক্টর অভ ল। আমি যেমন ডক্টর ল। ওদেশের মেয়েরাও কি তাই? ডক্টরেট এত সুলভ?" লাহা বিশ্বাস করেন না।

"আরে দূর! আপনি কি ঠাট্টাও বোঝেন না? এল-এল ডি মানে ল্যাণ্ডলেডীস ডটার। ওদের সঙ্গে ঘরে নাচতে পারা যায়, বাইরেও অসম্ভব নয়। আমি ওসব কিছু করিনি। করলে বাঙালী মহলে টি

টি পড়ে যায়। বেটার সার্কলেই মিশেছি। তবে মেলামেশাটা প্রধানত বাঙালী মহিলাদের সঙ্গেই হয়েছে। যেটা দেশে থাকলে হতো না। যা কড়া পর্দা! এই দশ বছরে কতকটা কমেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন মেয়েদের কতকটা মুক্তি দিয়েছে। জেল থেকেও রাজবন্দিনীদের চিঠিপত্র পেয়েছি। এ যে অভাবনীয় পরিবর্তন!" মানস উচ্ছ্বসিত।

"জেল থেকে? রাজবন্দিনীদের। আপনাকে দিল পড়তে!" লাহা তো অবাক।

"সেনসর যদি পাস করে পড়তে দেবে না কেন? তবে পুলিশের খাতায় আমার নিজের নাম উঠল কি না কে জানে। কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসেনি। অতি নির্দোষ চিঠি। বড়ো দুঃখ হয় যে কাউকে আমি ছাড়িয়ে আনতে পারিনি। তাঁরাও চাননি। দেশের মুক্তির জন্যেই তাঁরা জেলে গেছেন, অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন সংগ্রামে। কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ নিরস্ত্র হয়ে। আমি তাঁদের বন্দনা করি। তবু মনটা কেমন করে। জেল যে কী জিনিস তা কি আমি জানিনে?" মানস ব্যথিত।

"সে কী! আপনি আবার জেলে গেলেন কবে? অসহযোগ করেছিলেন নাকি? তা হলে তো পরীক্ষায় বসতেই দিত না।" লাহার মুখে বিস্ময়।

"অসহযোগের দিন জেলে যেতে পা বাড়িয়েছিলুম আমরা ক'জন, কিন্তু এই শর্তে যে আমাদের গুরুমশাইরাও যাবেন। তাঁরা পেছিয়ে যান। আমরাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। লগ্ন উত্তীর্ণ হলে যা হয়। চৌরীচৌরা এসে গান্ধীজীকেও নিবৃত্ত করে। কিন্তু এমনি বিধাতার বিধান যে পরে চাকরি করতে হয় সেই সরকারের অধীনেই। জেলে যেতে হয় হপ্তায় হপ্তায়, অন্তত একবার। খোঁজ করতে হয় আণ্ডারট্রায়ালদের। তাদের কোনো নালিশ থাকলে প্রতিকার করতে হয়। এটা রামরাজ্য না হলেও দেশীয় রাজ্য নয়।" মানস সপ্রশংস হয়।

"আর বলতে হবে না। ইংরেজের ব্যবস্থা ঢের ভালো। তবু আরো অনেক ভালো হতে পারত ওদেরই কল্যাণে। ডিটারেন্ট সেনটেন্স বলে সেই যে একটা বিধি আছে সেটাকে যতদূর সম্ভব প্রয়োগ করতে হয় জেলখানার ভিতরে। জেল যদি আরামের জায়গা হয় তবে আর ডিটারেন্ট সেনটেন্সের ত্রাস রইল কোথায়! সাজা আর মজা তো একাকার হলো।" ক্যাপটেন সাফাই দেন। তাঁকেও জেলে যাওয়া আসা করতে হয়।

"যা বলেছেন। সেদিন শেফার্ড খুব উত্তেজিত হয়ে অভিযোগ করেন, আমার মুখে যখন শোনেন যে কংগ্রেসীরা আইন সভা থেকে সরাসরি জেলখানায় যাবেন যুদ্ধের প্রতিবাদে। 'ওঁরা কি কম তুখোড়!' শেফার্ড বলেন, 'জানেন ওঁরা জেল কোড বদলে দিয়েছেন আটটি প্রদেশে, যেখানে ওঁদের মন্ত্রিত্ব? জেল কি আর জেল? জেল এখন গেস্ট হাউস। সরকারী খরচে ফার্স্ট ক্লাস কম্ফর্ট ভোগ করা হবে। ফিরে এসে আবার গদীয়ান হয়ে বসবেন। দেশের লোক ঠাওরাবে এঁরা কত বড়ো বীর!' গান্ধীজী চড়েন থার্ড ক্লাস ট্রেনে, তা শুনে শেফার্ড বলেন, 'সেটাও কি ত্যাগস্বীকার! কামরাটা তো ওঁর জন্যে আর ওঁর দলবলের জন্যে রিজার্ভড। ধুয়ে মুছে তকতকে করে রাখতে হয়, নইলে বড়লাটকে লিখে বিব্রত করবেন। দেশের লোক তো এই নিয়ে চেঁচামেচি করবেই। মিস্টার গান্ধী একজন সেন্ট কি না জানিনে, কিন্তু একজন ওস্তাদ পলিটিসিয়ান। আমাদের বাধ্য করবেন ওঁকে সদলবলে জেলে পাঠাতে। দুনিয়ার লোক বিশ্বাস করবে যে তিনিই রাইট, আমরাই রং। টেররিস্টদের আমরা বুঝি, যদিও তারিফ করিনে। কিন্তু কংগ্রেস একটি প্রহেলিকা।' শেফার্ড বিরক্ত।" মানস টিপে টিপে হাসে।

"কথাটা, সত্যি, মল্লিক সাহেব। সোজা মানুষটাকে বাঁকা মানুষগুলো কেমন সুকৌশলে তাড়িয়েছে। বাঙালীকে ওরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সুভাষকে ওরা পুতুল প্রেসিডেন্ট করে রাখবে, ওরাই হবে পুতুল নাচের সূত্রধার। ঝগড়া বাধবে না? তা বলে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হলো? ওদের কারো উপর আর আমার আস্থা নেই, ভাই। হিন্দুস্থানের মসনদে ওরাই তো বসবে। তা হলে আমাদেরও কি

একই দশা হবে না? স্বরাজের জন্য আমার তেমন ব্যস্ততা নেই। কিন্তু ক্লাইভ যদি মীর জাফরকে আবার বাংলার মসনদে বসিয়ে দিয়ে ছাতার আড়ালে থেকে যায় তা হলেই বা আমাদের কোন্ সুখ?" লাহার কাছে সেটাও অসহ্য।

"তা হলে আপনি কী চান, ক্যাপটেন?" মানস সুধায়, " সুভাষ নেতৃত্ব?"

"কেন নয়? সুভাষের মতো ব্রহ্মচারী আর কে আছে? কার এত ব্রহ্মতেজ? গান্ধী মহারাজও বিবাহ করেছেন, সেইসূত্রে প্রচুর শুক্রক্ষয় করেছেন। আর সুভাষের তো এক বিন্দুও ক্ষয় হয়নি। ভিতরে ভিতরে সবটাই রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে বজ্রকঠিন বীরত্বে। হিটলারও সেইরকম এক নিষ্কাম ব্রহ্মচারী। হিটলার যদি জেতে তবে সেই পুণ্যের ফলেই জিতবে। খবরদার, একথা যেন আর কারো কানে না যায়, প্রিয় বন্ধু।" লাহা মিনতির সুরে বলেন হাত যোড় করে।

মানস তাঁকে অভয় দেয় যে এসব গোপন কথা আর কারো কাছে ফাঁস করা হবে না। "কিন্তু, ক্যাপটেন ল, আপনার বন্ধু হিসাবে আমি কি জানতে পারব না যে আপনারও চিরকুমার হবার মূলে তেমনি কোনো সংকল্প বা ব্রত ছিল, যেমন ছিল সুভাষচন্দ্রের বা হিটলারের? পরাধীন দেশের উদ্ধার বা পরাজিত দেশের জয়?"

"না ভাই, তেমন কোনো ব্রত নয়। নিছক জেদ। আগে বিলেত, তার পরে বিয়ে। তার মানে আগে আই. এম. এস, তার পরে পদের উপযুক্ত মিসেস। যাকে আমি সমাজে বার করতে পারি, ক্লাবে নিয়ে যেতে পারি। ক্লাবই তো অফিসারদের সমাজ। রোমে গেলে রোমানদের মতো আচরণ করতে হয়। ক্লাবে গেলে ইংরেজদের মতো। ওরাও নাচে, আমরাও নাচব। ওরাও খানাপিনা করে, আমরাও করব। আমার যুক্তি কি ভ্রান্ত না অভ্রান্ত? যেদিন জানব যে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে সেদিন আমরা আর ওদের ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। ওদের মতো আচরণ করব না। সেদিন আমিও আই.এম. এস থেকে বিদায় নিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নামব। আরে, ডাক্তারকে মারে কে। ডাক্তারই সবাইকে মারে। গান্ধী বলো নেহরু বলো, সুভাষ বলো, কেউ আমাদের মারবে না। না, খোদ হিটলারও না, যদি তিনি বায়ুরথে আকাশ পাড়ি দিয়ে ভারতে অবতীর্ণ হন। আজন্ম ব্রহ্মচারী বলে নতজানু হয়ে দেশসুদ্ধ হিন্দু তাঁর চরণ বন্দনা করবে। মুসলমানরাও করবে, সেটা তাঁর সংহারমূর্তি দেখে। এই কলেরা ম্যালেরিয়ার দেশে এসে নাৎসীদেরও তো আধিব্যাধি হবে। জার্মান ডাক্তারদের কি এসব রোগ সারাবার যোগ্যতা থাকবে? থাকবে আমাদেরই। আমাদেরই ডাক পড়বে। তা হলে, ভাই, আমাদের মারবে কে ? কিন্তু দোহাই তোমার, এসব কথা মণিমুক্তার মতো কুয়োর জলে ফেলে দিয়ো। প্রয়োজন হলে তুলবে।" লাহা কী বলতে কী বলে বসেন।

মানস পরিহাস করে বলে, " আপনিও তো হিটলারের মতো ব্রহ্মচারী ও আপনার হাতেও মারণাস্ত্র। আপনিই বাঁচবেন, আমরা মরব। কিন্তু এখনো আমার আসল কথাটা শুনতে বাকী। আপনার মা বাবা কি আপনার সরকারী চাকরি হয়েছে দেখে আবার বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেননি? কন্যাকর্তারাও কি পণযৌতুকের টোপ ফেলেননি? কই, আপনার মতো আর একজনকেও তো দেখছিনে?"

"কেন, ডাক্তার রায়?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন ক্যাপটেন। "হুঁ হুঁ। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ। উহুঁ। উহুঁ উহুঁ । বলব না।"

মানসকে বলতে হয় না । সে ফিক করে হাসে। "থাক, নাই বা বললেন।"

"যাক, যেকথা আমি মা বাবাকে বলি সেই কথা অতি সরল ও সহজ ভাষায়, নেই বিলেত তো নেই বিয়ে। নো ইংলণ্ড তো নো ম্যারেজ। আরে ভাই, এটাও কি বলতে হয় যে আই.এম. এস হলে আমার বিয়ের বাজারে পণযৌতুকের হারও পাঁচগুণ হতো? ওসবও আমি তুচ্ছ করতুম বৌ যদি হতো সুন্দরী, সুমধ্যমা, নৃত্যগীতনিপুণা, আধুনিকা। সোনা জহরৎ দিয়ে যার সর্বাঙ্গ মোড়া তেমন একটি সাজানো

প্রতিমাকে নিয়ে ঘরকন্না করা যায়, রন্ধননিপুণা হলে তো ঝালটা ঝোলটা অম্বলটাও মুখরোচক হয়, দেশী খাবারই আমার বেশী ভালো লাগে। সেদিক থেকে আমি রোমানদের মতো নই, ওই অ্যাংলো-মোগলাই খানা আমার অসহ্য। লর্ড সিন্‌হার তো রোজ সুক্তো না হলে চলত না। রাঁধতেন স্বয়ং লেডী সিন্‌হা। সবার সেরা বাঙালী সাহেব ও বাঙালী মেম এই বচনে বিশ্বাস করতেন যে, পর রুচি পিন্‌হা আপ রুচি খানা। আমিও তাঁদের অনুগামী । বিয়ে করলে এমন একজনকেই করতুম যিনি হয়তো একদিন হতে পারতেন লেডী ল। আর তোমার ওই পর্দানশীন গৃহলক্ষ্মী? মা বাবার পছন্দ, আমার অপছন্দ। দেবদেবীকে দেবভাষায় প্রার্থনা করি ভার্যাং মনোরমাং দেহি। প্রজাপতি শুনলেন না। মা দুর্গা বললেন, কার্ত্তিকো ভব। অগত্যা ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী। পতিযোগ্য নহি, বরাঙ্গনে।"

"দাদা," মানস হাসি চাপে "বাকীটুকু ভুলে যাচ্ছেন কেন? শেষে সেই চিত্রাঙ্গদাই সেই অর্জুনকে বল্লেন, 'গর্ভে আমি ধরিয়াছি যে সন্তান তব'। সুন্দরী রাজেন্দ্রনন্দিনী যদি আপনার সম্মুখে উদয় হতেন আপনিও বাকীটুকু পূরণ করে বলতেন, 'প্রিয়ে, ধন্য আমি।' ইংরেজরা তো পঞ্চাশের পরেও বিয়ে করে সংসারী হয়। পুত্রকন্যার জনকও হয়। ইচ্ছে করলে আপনি এখনো বিলেত যেতে পারেন। এই মহাযুদ্ধের মরসুমে চেষ্টা করলে আই.এম. এসও হওয়া যায। মনোরমার দর্শন এখনো মিলতে পারে। এমন কোনো পণও আপনি করেননি যে দেশ স্বাধীন না হলে আপনি পাণিগ্রহণ করবেন না। তেমন পণ করেছেন আমার বন্ধু সৌম্য চৌধুরী। তাঁর জন্যে পার্বতীর মতো প্রতীক্ষা করছেন বহুদিন ধরে একটি কন্যা। আমার বোন না হলেও বোনের মতো প্রিয়। জীবনটা কি এতই দীর্ঘ যে অনির্দিষ্টকাল অবিবাহিত থাকলেও চলে?"

"সৌম্য চৌধুরী তোমার বন্ধু? কট্টর গান্ধীবাদী আর পাক্কা সাহেব। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু!" লাহা তো শুনে থ।

"আমিও তো ছাত্রজীবনে গান্ধীর অনুগামী ছিলুম, কিন্তু তাঁর সব কথা কি বিনা বাক্যে মেনে নিতে পারতুম? সত্যের মহিমা আমি তখনো মানতুম, এখনো মানি। আমারও একটা সত্যের অন্বেষণ আছে। অহিংসা আমি হিংসার চেয়ে মহত্তর বলে তখনো মানতুম, এখনো মানি, কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামে অপরিহার্য মনে করিনে। কোথাও এর নজীর নেই। এক ভারত যদি নজীর রাখতে চায় সেটা হয়তো সম্ভব, কিন্তু তার জন্যে কে চিরকাল অপেক্ষা করবে? নেহরুর মতো দুই দরজা খোলা রেখেছি। গান্ধীজীর মতো হিংসার দরজা বন্ধ করে দিইনি। কিংবা সুভাষচন্দ্রের মতো অহিংসার দরজা। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের বেলা গান্ধীজীর সঙ্গে আমার গোড়া থেকেই অমিল। তিনি কোনো দিন প্রেমে পড়েননি, আর আমি প্রেমের খাতিরে ব্রহ্মচর্য ছাড়তে রাজী। তবে আমারও একটা ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল। প্রেমে না পড়লে আমি বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ব না। আমার জীবনে প্রেম না এলে আমিও আপনার মতো অবিবাহিত থাকতুম। দেশপ্রেমের মতো নারীর প্রেমও সাধনা আরাধনার ধন। সৌম্যদা আর আমি দু'জনে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছি। তাই আমাদের বন্ধুতা ছাত্রবয়স থেকেই অব্যাহত । তবে আমরা আগের মতো মেলামেশার সুযোগ পাইনে। ও ভাবে ও আমার সঙ্গে মিশলে আমার উপরওয়ালারা আমাকে সন্দেহ করবেন। আমি ভাবি আমি ওর সঙ্গে মিশলে ওর সংগ্রাম সাথীরা ওকে সন্দেহ করবেন। সেইজন্যে দীর্ঘকাল দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। সম্প্রতি আবার শুরু হয়েছে। এটাও বেশী দিন চলবে না। ওরা হয়তো আবার জেলে চলে যাবে।" মানস বুঝিয়ে বলে।

লাহা কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না। "আচ্ছা, সেই যে একটি কন্যা সৌম্য চৌধুরীর জন্যে শবরীর মতো প্রতীক্ষা করছেন তিনি কি আমার বন্ধুকন্যা মধুমালতী মুস্তাফী? ওর তো বিয়ে হয়ে গেল আরেকজনের সঙ্গে।"

"শুনেছি তিনিও প্রত্যাশা করেছিলেন সৌম্যদার সঙ্গে বিবাহ, কিন্তু আমি যার কথা বলছি সে

আর একটি মেয়ে। ওকে আপনি চিনবেন না। ওর জীবনটা বড়ো দুঃখের। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহ, মিলনের পূর্বেই বিরহ ও বৈধব্য। লোকচক্ষে বিবাহিতা, কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে কুমারী। ও আর বিয়ে করতে চায় না, যদি না সৌম্যদাকে পায়। মিলির সঙ্গে যার বিয়ে হলো সেই পাত্রটিকে জুলি বার বার তিনবার প্রত্যাখান করেছে। দশবছর অপেক্ষার পর সুকুমার হাল ছেড়ে দেয়।" বলতে বলতে মানস নামগুলো ফাঁস করে দেয়।

"বুঝেছি তুমি কার কথা বলছ।" লাহা স্মরণ করেন। "ওঁর বাবা ক্যাপটেন সোম যুদ্ধে আমার সমসাময়িক, কিন্তু চাকরিতে বছর পাঁচেক সীনিয়ার। মুস্তাফী আর সোম তো আই. এম. এসের জন্যে মনোনয়নও পেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ওঁদের স্থায়ীভাবে বহাল করা হয়নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের পর থেকে ওঁদের ভিতরে একটা বিদ্রোহীভাব লক্ষ করা যায়। মিলি তো সোজাসুজি টেররিস্ট বনে যায়। সোম ওঁর ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ের দুঃখে মনমরা হয়ে মারা যান। অথচ অমন পাত্র হাতছাড়া করা যায় না। ওঁর স্ত্রী ওঁকে নিত্য খোঁটা দিতেন যে কেন ওঁকে ক্যাপটেন থেকে মেজর করা হচ্ছে না, কেন তিনি স্বদেশিয়ানা করে সরকারকে বিরূপ করে তুলছেন। যাক, সেসব পুরনো কাসুন্দী ঘেঁটে কী হবে? সাহেবদের সঙ্গে দহরম মহরম না করলে কি অমনি প্রমোশন হয়? হতে পারে চিকিৎসার গুণে প্রাইভেট প্র্যাকটিস। তাতে তো তিনি ভালোই করছিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীদের চক্রান্তে ওঁকে দেওয়া হতো এমন সব জেলা যেখানকার লোক নেহাৎ গরিব। সিভিল সার্জনকে ডাকবার মতো অর্থবল নেই। তিনি আবার কম ফী নেবেন না। তাতে মর্যাদাহানি। তবে প্রথমবার পুরো ফী নিয়ে দ্বিতীয়বার সেই রুগীর কাছ থেকে আদৌ কিছু নিতেন না। ভেট তো সকলেই নেয়। দিলে ফিরিয়ে দিতেন। তাতে জমিদারদের সম্মানহানি। স্ত্রীর বিরক্তি। পারিবারিক জীবনের গতি চূড়ান্ত অশান্তিতে পৌঁছয় যখন জুলি নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার শ্বশুরবাড়ী থেকে। পরে অবশ্য তাকে পাওয়াও যায়। কিন্তু ততদিনে তাঁর মন ভেঙ্গে গেছে। শরীরও। নিত্য অনুশোচনা করতেন। ছেলেটিকে বিলেত যাবার আগে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া হলো। বছর দু'তিন সবুর করলে কী এমন ক্ষতি হতো! ছেলেটিও তার বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতো না। স্ত্রীর উপরেও বিমুখ হতো না। জুলি তো বিলেতেও যায়। বিধবা মায়ের সঙ্গে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে। ততদিনে ওরও অন্যদিকে মন গেছে। তাতে জুলির মনোভঙ্গ হয়। এসব কথা আমার চেয়ে তুমিই বেশী জানো, মল্লিক।"

"তার পরের অধ্যায় আপনারও আরো বেশী জানা। সে অধ্যায়ও বাসি হয়ে গেছে। ও মেয়ে বন্দীশিবির থেকে ছাড়া পেয়েছে অনেক দিন আগে। ওর টান সৌম্যদার উপরে। জুলি ওকে দেবতার মতো পুজো করে। অথচ সৌম্যদা হলো সত্য, অহিংসা আর ব্রহ্মচর্য এই ত্রিনীতিতে বিশ্বাসী। কট্টর গান্ধীবাদী। আইন ভঙ্গ করে জেলে যাবে, কিন্তু ব্রতভঙ্গ করে বিয়ে করবে না। তবে আমি যতদূর জানি দেশ যেদিন মুক্ত হবে সেদিন ব্রহ্মচর্যব্রত থেকে ওর মুক্তি। জুলির উপরেই ওর টান সব চেয়ে বেশী। কিন্তু ওটা স্নেহ বা প্রেম না কম্পানিয়নশিপ তা তো বোঝা যাচ্ছে না। ওদের সম্পর্কের পরিণতি কী হবে তা স্বরাজ আন্দোলনের পরিণতির মতোই দুর্বোধ্য। তাই আমি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করব না। মিলনান্ত হলে আনন্দিত হব। বিয়োগান্ত হলে মর্মাহত হব।" মানস ও প্রসঙ্গের উপর যবনিকা টেনে দেয়।

"স্বরাজের কথা যদি বলো,আমার দিন দিন মালুম হচ্ছে যে ইংরেজরা ছাড়তে চাইলেও হিন্দু মুসলমান ওদের ছাড়বে না। কমলী নেহি ছোড়তি। এমন মারামারি বাধাবে যে সেটা থামাবার জন্যে একটা তৃতীয় পক্ষকে সালিশ মানতে হবেই। ওরাই সেই তৃতীয় পক্ষ যারা উভয় পক্ষেরই আস্থাভাজন। পুরোপুরি নিরপেক্ষ না হলেও মোটামুটি ফেয়ার। তুমি দেখবে ওরাই আর একটা রোয়েদাদ দিয়ে শেষরক্ষা করবে। কোনো পক্ষই সন্তুষ্ট হবে না, অথচ দুই পক্ষই মেনে নেবে। নয়তো দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে হিন্দু মুসলমানের এই দ্বন্দ্ব সেই কৌরব পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রের মতো তলোয়ার দিয়ে মীমাংসিত হবে। কোথায়

থাকবে তোমার বন্ধুর সত্য ও অহিংসা।" লাহা ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

।। চোদ্দ ।।

ক্যাপটেন লাহা নিজের গাড়ীতে করে মানসকে বাড়ী পৌছে দিতে চান। বলেন, "তোমার মিসেসকে. বিশ্বাস করতে অনুরোধ করব যে তোমার কোনো দোষ নেই। আমিই তোমাকে আটক করে রেখেছিলুম। তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করব।"

"দেরি করিয়ে দিয়েছেন তা ঠিক, কিন্তু তাতে আমার অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। লেখক যারা হতে চায় তাদের অভিজ্ঞতাই তাদের সম্বল। ভাবছি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মতো আমিও একখানা 'চার ইয়ারী কথা' লিখব। সেটাও হবে ক্লাবভিত্তিক কাহিনী। আপনার নাম তাতে থাকবে না, কিন্তু আপনিও হবেন চার ইয়ারের এক ইয়ার। কেমন?" মানস না ভেবে চিন্তে যা বলে যায় তার সবটাই বানানো।

"কী সর্বনাশ! তুমি তো দেখছি একটি বিপজ্জনক প্রাণী। আর কার কার সর্বনাশ করতে আমাদের চিড়িয়াখানায় অনুপ্রবেশ করছ?" লাহা কপট আশঙ্কার সঙ্গে কৌতূহল মেশান।

"সর্বনাশ কেন বলছেন? কী লিখতে চাই তা আগে শুনতে হয়।" মানস তাঁকে একটু খেলিয়ে খেলিয়ে বলে, "আমার নায়কদের চারজনের একজনের প্রার্থনা হলো, ভার্যাং মনোরমাং দেহি। দেবী তাঁকে বর দিলেন, কার্ত্তিকো ভব। দেবীর বর কি ব্যর্থ হতে পারে? কার্ত্তিকের মতোই রূপবান হলেন তিনি, কিন্তু কার্ত্তিকের মতোই চিরকুমার । বৃথাই একটি বিশেষ শ্রেণীর মনোরমারা কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক পূজা করেন। তিনি যে মুনিপুত্র শুকদেবের মতো নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী এর আরো এক কারণ ছিল। তাঁর বাসনা ছিল তিনি বিলেত গিয়ে উচ্চতর ডাক্তারি ডিগ্রী নিয়ে আই. এম. এস হয়ে দেশে ফিরবেন। সূর্যকুমার চক্রবর্তীর মতো গুডিভ সাহেবের কন্যা বিবাহ করে নিজের পদবীর সঙ্গে শ্বশুরের পদবী যুক্ত করার অভিলাষও ছিল। কিন্তু মাতা শত্রু পিতা বৈরী। বিলেত যাওয়া হয় না । জীবনের সাধ মেটে না। প্রাদেশিক সরকারের চাকরি নিয়ে মফঃস্বলের জেলায় জেলায় অ্যাসিস্টান্ট সার্জন হয়ে বেড়ান। এমন সময় বেধে যায় প্রথম মহাযুদ্ধ। বাঙালী পলটনের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়ে মেসোপোটেমিয়ায় প্রেরিত হন। যুদ্ধের পরে দেশে ফিরে অস্থায়ী সিভিল সার্জন। এক মুসলিম জমিদারের চার নম্বর বেগম সতীনদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে সতীনের বাটিতে বিষ গুলে খেয়ে মারা যান। জমিদার পুলিশে খবর না দিয়ে বেগমকে গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে কবর দেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক উড়ো চিঠি পেয়ে জানতে পান যে ওটা আত্মহত্যা নয়, হত্যা। অপরাধী তিন সতীন। জমিদারও কম অপরাধী নন। কেন তিনি সাক্ষ্য গোপন করলেন? সাহেব হুকুম দেন কবর থেকে লাশ উদ্ধার করে পোস্ট মর্টেম করতে হবে। কিন্তু সাধারণ সাবঅ্যাসিস্টান্ট সার্জনকে দিয়ে নয়। সিভিল সার্জনকে দিয়ে। কে সেই সিভিল সার্জন? ক্যাপটেন ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কে? তিনিই সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন ও দায়িত্বশীল। তাঁরই রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে জমিদার ও তাঁর বেগমদের শাস্তি বা মুক্তি। সিভিল সার্জন 'না' বলতে পারেন না। তিনি পড়ে যান বিষম ধাঁধায়। তার পর কী হলো তা ক্রমশ প্রকাশ্য।" মানস এইখানে ছেদ টানে। চেয়ে দেখে ডাক্তার সাহেব একেবারে কাৎ।

"লিখবে তুমি এইসব কথা! তা হলেই হয়েছে আমার প্রমোশন। আমাকে দেখছি মিলিটারির সঙ্গে ভাব করে ওদের সঙ্গেই সিঙ্গাপুর পাড়ি দিতে হবে। সেখান থেকে তদ্বির করে বিলেত। আমার রিপোর্টে আমি কী লিখেছি তা কিন্তু ফাঁস করছিনে, মল্লিক। আমার বিভাগের মন্ত্রী মুসলমান, তিনি জমিদারও বটে। যদি মিলিটারিতে যাওয়া না হয় তা হলে আমার ভাগ্যে কী আছে কে জানে? প্রমোশন না ডিমোশন।" লাহা ভাবনায় পড়েন।

গাড়ী থেকে নেমে ডাক্তার সাহেব মানসকে পেছনে ফেলে ছুটে যান যূথিকার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে। সে তখন গাড়ীর আওয়াজ শুনে নিজেই এগিয়ে এসেছে স্বামীর কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে। সাহেব ডান হাত বাড়িয়ে দিতেই সে দুই হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে বলে, "নমস্কার।"

ক্যাপটেন আগে থেকে তাঁর পার্ট মুখস্থ করে এসেছিলেন। অপদস্থ হয়ে বাড়িয়ে দেওয়া বাত ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, "গুড ইভনিং, মিসেস মল্লিক, আই হ্যাভ কাম টু অ্যাপলোজাইজ।"

যূথিকা তাকে অভয় দিয়ে বলেন, "আমারই তো মাফ চাইবার কথা। কেন আমি আপনার মতো বড়ো সাহেবের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে না দিয়ে নেটিভদের মতো দুই হাত জুড়ে নমস্কার করেছি। কিন্তু এর নজীর আছে, ক্যাপটেন সাহেব। মনে করুন আপনি বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড, আর আমি সামান্য প্রজা, মিসেস জিন্না। স্থানটা সিমলায় বড়লাটের প্রাসাদ আর কালটা আজ থেকে বিশ একুশ বছর আগে কোনো এক সন্ধ্যা। এই সেই মহিলা যিনি কোটিপতি পার্শী পিতার অবাধ্য হয়ে মোসলেম ব্যারিস্টার জিন্নাকে বিবাহ করে ত্যাজ্যকন্যা হয়েছেন। জিন্নারই বা তখন কী এমন পসার। মাঝারি মাপের ব্যারিস্টার। তেমনি বাড়ীঘর। তাঁর স্ত্রী কি না মহামান্য রাজপ্রতিনিধির প্রসারিত হাত উপেক্ষা করেন।"

"এত বড়ো আস্পর্ধা!" লাহা স্তম্ভিত হন। "এ কে? সেই রতনপ্রিয়া পেতিত। ডানা কাটা পরী। এটা কি রূপের দেমাকে না রুপেয়ার দেমাকে? বলুন, বলুন, মিসেস মল্লিক। আপনি তখন কোথায়?"

"সিমলাতে। সেইখানেই আমার জন্ম। সেইখানেই কনভেন্টের পড়াশুনা। আমার বাবা তখন বড়লাটের পার্সনাল স্টাফে। তাঁর উপরে অতিথি আপ্যায়নের সরঞ্জাম তদারকির ভার। যেন পান থেকে চুণ না খসে। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। বড়লাট এত লোকের মাঝখানে অপ্রস্তুত হন বইকি। কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিকে অসম্মান দেখাতে পারেন না। ভদ্রমহিলাকে আদর করে পাশে বসিয়ে হিতোপদেশ শোনান। মিসেস জিনা, আপনি ছেলেমানুষ, তাই আপনি হয়তো জানেন না। 'হোয়েন ইউ আর ইন রোম ডু অ্যাজ দ্য রোমানস ডু।' হ্যাঁ, সাহেবরা উচ্চারণ করেন জিনা। আর গুজরাটীরা ঝীণা। আসলে ওটা একটা গুজরাটী হিন্দু নাম। ওর মানে ছোট। আর-সবাই উচ্চারণ করে জিন্না। মুসলমানরা ইদানীং উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন জিন্নাহ্। যেমন আল্লাহ্। আরবীর মতো শোনায়। জিন্না কিন্তু সে সময় কমিউনাল ছিলেন না। পাক্কা সাহেব, সেইসঙ্গে খাঁটি ন্যাশনালিস্ট। আর তাঁর মিসেস শিক্ষাদীক্ষায় ইংরেজ হয়েও আচারে আচরণে কট্টর স্বদেশী। বড়লাটকে তিনি মুখের মতো জবাব দেন। ইয়োর একসেলেন্সী, এটাই তো রোম, আমিই তো রোমান। আমিই তো ইয়োর একসেলেন্সীর সঙ্গে রোমানদের মতো আচরণ করেছি। আমিও সেটাই প্রত্যাশা করেছি। আমাদের সঙ্গে ইয়োর একসেলেন্সী যদি আমাদেরই একজনের মতো আচরণ করতেন তা হলে আমরাও আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারতুম।"

"মাই গড! সো শী ইজ ইয়োর মডেল!" হকচকিয়ে যান লাহা।

"না, ডাক্তার সাহেব। আমি কখনো আমার স্বামীকে ছাড়ব না। পরে তিনি স্বামীর আদর না পেয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে পরে পুনর্মিলন হয়। কিন্তু ভাঙা সংসার জোড়া লাগবে কেন? স্বামীও ততদিনে কমিউনাল হয়েছেন। রতনপ্রিয়া তো মুসলমান হননি। আরবী নাম নেননি। মুসলিম আইনে ইহুদীর মতো পার্শীও কিতাবী। কলমা না পড়িয়েও বিয়ে করা চলে। আচরণ তাঁর বিয়ের পরেও বদলায়নি। মুসলিম সমাজ সহ্য করে না। অকালে মারা যান। একটি সন্তান রেখে যান। এই সেদিন ও মেয়ে সার নেস ওয়াডিয়ার ছেলে নেভিল ওয়াডিয়ার সঙ্গে ইলোপ করেছে। জাতে ওঁরা পার্শী, ধর্মে কিন্তু খ্রীস্টান। বিয়েটা বোধহয় সিভিল মতে হয়েছে। জিন্না সাহেব ওকে ত্যাজ্য কন্যা করেছেন। মুসলিম লীগের দলপতি থাকতে হলে খ্রীস্টান পাত্রের সঙ্গে মুসলিম কন্যার বিবাহ মেনে নেওয়া চলে না। মেয়ের বিয়ে কিতাবীর সঙ্গে বারণ। জিন্না ওকে প্রাণভরে ভালোবাসতেন।" বলতে বলতে যূথিকা কেঁদে ফেলেন।

"হোয়াই আর ইউ ক্রাইং, মাই সিস্টার?" লাহা আরেকবার স্তম্ভিত হন।

"এমনি। পরের দুঃখে চোখে জল এসে পড়ে।" চোখের জল মোছে যূথিকা। বলে, "আপনি এত বার কেন ইংরেজীতে বলছেন, দাদা? আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী। এ বাড়ীতে কেউ ইংরেজীতে কথা বলে না। ছেলেমেয়েদের আমরা বাঙালীও করব, মানুষও করব। আমাদের হোম হচ্ছে আমাদের রোম। এখানে এলে রোমানদের মতো আচরণ করতে হয়। তবে সাহেব মেম এলে আমরা তাঁদের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলি। উনি যদি সত্যি সত্যি চাকরি ছেড়ে দেন তা হলে আমরা ওঁদেরও রেয়াৎ করব না। কিন্তু তেমন খুঁটির জোর কোথায়? সংসার চলবে না বই লেখার টাকায়। আর আমিও সঙ্গীত শিখিয়ে উপার্জন করতে পারিনে। যত্ন করে পিয়ানো বাজাতে শিখেছি। কিন্তু তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ তো কলকাতা। কলকাতায় থাকলে আবার রাজসিক ধারায় জীবন তরী ভাসাতে হয়। আমরা ও ধারা ছেড়ে সাত্ত্বিক ধারা শরণ করেছি। আমাদের জীবনে সেই যে শোকাবহ ঘটনা ঘটে গেল সেটা আমাদের মতে শূন্য গর্ভ সাহেবিয়ানার পরিণাম।" যূথিকা আবার চোখের জল মোছে।

"আই অ্যাম সো সরি!" বলেই লাহা জিব কাটেন। "আমি এত দুঃখিত!"

মানস মন্তব্য করে, "ওটা ঠিক বাংলার মতো শোনায় না, ডাক্তার সাহেব। কিন্তু ও প্রসঙ্গ থাক। চা না কফি? কী খাবেন, বলুন।"

"আমারই উচিত ছিল জিজ্ঞাসা করা। অপরাধ মার্জনা করবেন।" যূথিকা ভুলে গেছে বলে সত্যিই লজ্জিত।

"ওটাও ঠিক বাংলার মতো শোনায় না, জুঁই। ওটা ইংরেজী না হলেও ইংরেজীতরো। যেমন ফজলি না হয়ে ফজলিতরো।" মানস হাসিমুখে বলে।

"বলুন, কী খাবেন, দাদা। বিদেশী তো দূরের কথা বিশুদ্ধ স্বদেশী মদিরাও আমরা রাখিনে। তবে চা কফি ছাড়তে পারিনি। আমরা তো সৌম্যদার মতো গান্ধীবাদী বা গান্ধীপন্থী নই। অতিথিদের দিতে হয়, নিজেরাও অন্যায় মনে করিনে। কী দেব বলুন।" যূথিকা নতুন করে সুধায়।

"নো। থ্যাঙ্কস। ক্লাবে আমি যা পান করে এসেছি তার উপরে আর কিছু পান করতে আগ্রহ নেই। আজ থাক আরেকদিন আসব। তখন যেটা খুশি দিয়ো। কিন্তু তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিলে, বোন। তুমি যাঁর মেয়ে তিনি তো তোমাকে কনভেন্টেও পড়িয়েছেন। পিয়ানো বাজাতেও শিখিয়েছেন। কিন্তু তিনি হাজার সাহেব সাজলেও ব্রাহ্মণ। তাঁর অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি। তিনি কি তোমাকে ত্যাজ্যকন্যা করেছেন? সার জাহাঙ্গীর পেতিতের মতো? বা জিন্নার কন্যাকে জিন্নার মতো? তার উপরে এই পুত্রশোক। কী করবে, ভগবানের মার।" লাহা দরদের সঙ্গে বলেন।

"ও প্রসঙ্গ থাক, দাদা।" মানস মিনতি করে। "জিন্না সাহেব যে একবার কত বড়ো একটা কাজ করেছিলেন সেকথা খুব কম লোকেরই জানা। কৃষ্ণদাসের বই ক'জনই বা পড়েছে! এখন সেটি একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। সেদিন হঠাৎ আমার চোখে পড়ে। মাস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের জন্যে সারা দেশ অধীর, ঘোষণার দিনক্ষণ ধার্য হয়ে গেছে গুজরাটের বারদোলী তালুক থেকেই শুরু হবে, তার পর গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়াবে দাবনলের মতো। অকস্মাৎ যুক্তপ্রদেশের অখ্যাত অজ্ঞাত চৌরীচৌরা গ্রামে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা। কী কারণে পুলিশের উপর চড়াও হয় জনতা, থানাশুদ্ধ পুলিশকে জ্বালিয়ে দেয়। মহাত্মা সেই ঘটনাকে উপলক্ষ করে মাস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স স্থগিত রাখেন। আর আমরা সবাই তাঁর সেই পশ্চাদ্ অপসরণে হতাশ হই, ক্ষুব্ধ হই। অনেকেই তাঁর আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য নেতা বরণ করেন। কেউ ফিরে যান পার্লামেন্টারি পন্থায়, কেউ এগিয়ে যান বিপ্লবী পন্থায়। কিন্তু এই ডিগবাজির পেছনে আসলে কী ছিল তা কোথাও প্রকাশ পেল না। চৌরীচৌরা গ্রামের আকস্মিক সেই শঙ্কাদহনের পূর্বেই একদিন গভীর রাত্রে বম্বের থেকে বারদোলীতে গিয়ে গান্ধীজীর শিবিরে গোপনে সাক্ষাৎ করেন

এক গুজরাটী ব্যারিস্টার বন্ধু। যাঁর নাম ঝিণা থেকে জিন্না। তাঁকে সমঝিয়ে দেন যে তিনি যেমন প্রস্তুত সরকারও তেমনি প্রস্তুত। আর্মি মোবিলাইজ করা হয়ে গেছে। অদূরেই তাদের শিবির। গান্ধী আদেশ দিলেই বড়লাটও হুকুম দেবেন। তখন আবার জালিয়ানওয়ালাবাগ। গণবিদ্রোহ সাতদিনের মধ্যেই খতম। তার চেয়ে আরো একবার কথাবার্তা চালানো যাক। মালবীয়জী আর জিন্না সাহেব লর্ড রেডিংকে বৈঠকে বসতে রাজী করিয়েছেন। গান্ধীজী তো থাকবেনই, মালবীয়জীও থাকবেন, জিন্না সাহেবও থাকবেন। এখন গান্ধীজী রাজী হলে হয়। মহাত্মা কিছুতেই মাস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স স্থগিত রাখবেন না। রাখলে ধূমায়িত আগুন নিবে জ্বলে ওঠবার আগেই নিবে যাবে। জিন্না সাহেব ব্যর্থ হয়ে সেই রাত্রেই বম্বে ফিরে যান। গোপন সাক্ষাৎকার গোপন থেকে যায়। এর পরে ঘটে চৌরীচৌরার সেই ঘটনা। মহাত্মার মনে পড়ে জিন্নার হুঁশিয়ারি। তিনি বুঝতে পারেন যে ওটা নতুন এক জালিয়ানওয়ালাবাগের পূর্বাভাষ। তিনি তার প্রতিকার করতে পারবেন না। তাকে নিবারণ করাই সুবুদ্ধি। মিলিটারির সঙ্গে পাঞ্জা কষতে জনগণ প্রস্তুত নয়। তিনি তাঁর পরিকল্পনা আপাতত ত্যাগ করেন। কিন্তু অসহযোগ নীতি ত্যাগ করেন না। প্রস্তাবিত বৈঠক বসে না। তাতেও তাঁর অনীহা। বড়লাট তাঁকে জেলে পোরেন। উপলক্ষ কয়েকটা পুরাতন প্রবন্ধ। তিনিও হাসিমুখে কারাবরণ করেন। জিন্না সাহেবেরও তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। মালবীয়জীরও। পরে একজন যদি হন মুসলিম লীগের নেতা, তো অপর জন হন হিন্দু মহাসভার নেতা। তাঁদের পরস্পরের সঙ্গেও যোগসূত্র ছিন্ন হয়। দেশ জুড়ে বয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতার জোয়ার। তলিয়ে যায় হিন্দু মুসলমানের একতা। দাঙ্গার পর দাঙ্গা বেধে এমন আগুন জ্বালিয়ে রাখে যে জেল থেকে বেরিয়ে মহাত্মা তাঁর একুশ দিনের অনশনেও কোনো পক্ষের হৃদয় গলাতে পারেন না। দাঙ্গা থামাতে হয় ওই ইংরেজকেই। তার মানে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তৃতীয় পক্ষকেই নিতে হবে। দায়িত্ব যার ক্ষমতাও তারই। ক্ষমতা যার নেই সে দায়িত্ব নেবে কী করে? অসহযোগও স্থগিত রাখা হয়। সেটা আরেক ডিগবাজি। আমরাও যে যার পথ দেখি।"

"অত কথা আমার জানা ছিল না, ভাই। আমি ততদিনে সরকারী চাকুরে। তাও আই.এম.এস নয়। আই অ্যাম অ্যাস। আমি একটি গাধা।" শুনে সবাই হো হো করে হাসে।

একথা বলেই ক্যাপটেন একদৌড়ে গাড়ীতে গিয়ে ওঠেন।

আবার যখন ক্লাবে দেখা হয় তিনি বলেন, "মল্লিক, আমি ভেবে দেখলুম এই জন্মে আই.এম. এস হতে হলে আবার মিলিটারিতে যোগ দিতে হবে। আগে থেকেই বোঝাপড়া আছে যে সিভিল থেকে আমি মিলিটারিতে ফিরে যেতে পারি, তবে যুদ্ধ বাধলে ভারতের বাইরেও যেতে হবে। বিয়ে তো করিনি। আমাকে ঠেকায় কে? ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। কেন একটি মেয়েকে বিধবা করে দগ্ধ হতে দিতুম? চিতার আগুন নয়, একান্নবর্তী পরিবারের ঈর্ষার আগুনে। এক ভাই আই. এম. এস হলে আরেক ভাই বিধবা বৌদিকে জ্বালিয়ে মারত। মানুষটা আমি সাহেব হতে পারি, সমাজটা তো হিন্দু সমাজ। আমাদের আবার পুরনো বনেদী একান্নবর্তী পরিবার। জ্ঞাতিবিরোধে জর্জর। থাকে সবাই একই ছাদের তলায়। কর্তাব ছাতার আড়ালে। কিন্তু তলে তলে সেই ষড়রিপুর চক্রান্ত। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। বিয়ে করিনি বলেই আমি স্বাধীন। আমি জানি যে যুদ্ধক্ষেত্রেও ডাক্তারকে কেউ মারবে না। জখম হলে শত্রুও তার চিকিৎসায় বাঁচবে। তবে দূর পাল্লার কামানের গোলায় ডাক্তারেরও প্রাণ উড়ে যেতে পারে। আর আকাশ থেকে বোমা পড়লে তো কথাই নেই। সেটারই সম্ভাবনা বেশী। তবু আমি যাবই। আজকেই একখানা চিঠি ছেড়ে দিয়েছি। জানতে চেয়েছি আই.এম. এস কমিশন সরাসরি দেবে কি না। তোমাকে যথাকালে জানাব। তোমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করব। শ্যাম্পেনের স্রোত বইয়ে দেব।"

মানস সকৌতুকে উচ্চারণ করে, "আই সী অ্যাস।"

"তার মানে কী হলো? তুমি যাকে দেখছ সে একটি গাধা। আমারি ঢিল আমারই উপর ছুঁড়ছো। আই অ্যাম অ্যাস?" তিনি খেঁকিয়ে ওঠেন।

"মাফ করবেন, দাদা। আমি যা জানি আপনি তা জানেন না। এবারকার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে বড়লাট স্থির করেছেন উচ্চপদস্থ সিভিল অফিসারদের কাউকেই ফ্রন্টে যেতে দেবেন না। আপনিও একজন উচ্চপদস্থ সিভিল অফিসার। ফ্রন্টে আপনি যেতে না পারলেও পদোন্নতি প্রত্যাশা করতে পারবেন। ঘরে বসেই আই. এম. এস হতে পারবেন। যাঁদের অবসর নেবার বয়স হবে তাঁদের তো আটকে রাখতে পারা যাবে না। তাঁদের স্থান পূরণ করতে হলে নতুন রিক্রুট সংগ্রহ করতে হবে। বিলেত থেকে তো নতুন কেউ আসবেন না। অগত্যা ভেকেন্সী পূরণ করতে হবে আপনার মতো পুরনো অফিসার দিয়ে। এ লড়াই যদি চার পাঁচ বছর গড়ায় তো আপনারাই পূরণ করবেন। সিভিল থেকে মিলিটারিতে যেতে চান বলে চিঠি লিখতে গেলেন কেন? অবশ্য মিলিটারিতেই ভেকেন্সীর সম্ভাবনা বেশী। তা হলে কিন্তু ফ্রন্টে যেতে হবে। আপনি কি তার জন্যেও ব্যগ্র?" মানস প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, ভাই। এই একঘেয়ে ডিউটি কারই বা ভালো লাগে। স্টেশনটা ভালো। পদটাও পাকা। আর আমাকে নিচে নামতে হবে না। কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিস তো প্রাইভেট ডাক্তারদেরই একচেটে। উপরি আয় বলতে একে ওকে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যে ফী। সেটা আমি চোখ বুজে সই করিনে। সুস্থ মানুষটাকে অসুস্থ বলে ষোল টাকা পকেটে পুরতে আমার বিবেকে বাধে। বনেদিয়ানায়ও বাধে। কলকাতায় আমাদের যে সম্পত্তি আছে তার একটা হিস্‌সা তো আমি পাবই। এ টাকা দুই হাতে উড়িয়ে দিলেও ও টাকা তো আমার কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। পেনসন পেলেও আমার টাকার অভাব হবে না। অভাব হবে যেটার সেটা ওই মেজর বা লেফটনাণ্ট কর্নেল বলে পরিচিতির। আর ওই যাকে বলে আই. এম. এস। এই গাধার ল্যাজ হবে ওটা, আর কান দুটোর নাম হবে লেফটনাণ্ট কর্নেল কি মেজর। ক্যাপটেন হয়ে আমি মরতে চাইনে। তার আগে আমি ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে ভাব করে ওঁকে ভিজিয়ে সিঙ্গাপুর বা পেনাং কোথাও এক জায়গায় গিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় বাঁচব বা শত্রুর হাতে মরব। যদি বন্দী করে তাও সই। ক্লাবটা তো বলতে গেলে সাহেবশূন্য। শেফার্ড কালেভদ্রে আসেন। টেনিসের পর অন্তর্ধান। বার্লো তো ডুমুরের ফুল। শেফার্ডের সহধর্মিণী স্বদেশে বাস করছেন। বার্লোর পুত্র আর তার জননীও সেই দেশে। তবে এখন তিনি আর মিসেস বার্লো নন। বিবাহবিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ হয়েছে। হ্যাঁ, এই স্টেশনে একজন মেমসাহেব আছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বামী একজন ফরাসী জমিদার। তাঁরা ক্লাবের মেম্বর হলেও কদাচিৎ আসেন কারণ মেমসাহেব বহুদিন ধরে অসুস্থ। এখন এই সাহেবমেমশূন্য ক্লাবে নাচবেই বা কে, আর নাচতে চাইলে কার সঙ্গেই বা নাচবে? বেগম হায়দারও নাচবেন না, মিসেস বক্‌সীও নাচবেন না। বলবেন নাচতে জানেন না। আরে, ওটা কি একটা কথা হলো? নাচতে নাচতেই আমি নাচতে শিখেছি। ওঁরাও শিখতেন। বাধছে কোথায়, জানো? অযোধ্যার লোক সীতার মতো সন্দেহ করবে। হ্যাঁ, বুকের পাটা আছে বটে শামসুর রহমানের। দশ বছর আগেও আমি ওকে আর ওর বেগমকে নাচতে দেখেছি। ক্লাবে সাহেব মেমের সঙ্গে। এখানে নয় অবিশ্যি। এখনো আমি সিভিল সার্জন হইনি। কী আমার ক্লেম? আমি যুদ্ধফের্তা ক্যাপটেন আর রহমান তো বিলেতফের্তাও নয়, যুদ্ধফের্তা নয়। সে তখনো পুলিশ সুপার হয়নি। তবু তো একজন আই. পি। তারই মতো আই. পি. ছিল আর একজন মুসলমান। সেও ছিল ক্লাবের মেম্বর। কিন্তু ওর বেগমকে ক্লাবে আসতে দিত না। কেউ কল করলেও কারো সামনে বেরোতে দিত না। অথচ ধর্মের বেলা একান্ত উদার। সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। রহমান অতটা নয়। রহমানই বরং কমিউনাল। ওদের দু'জনের কাছে আমি ঋণী। ওরাই আমাকে ক্লাবে টেনিস কোর্টে ধরে নিয়ে যায়। খেলায় ওস্তাদী দেখে মেম্বর করিয়ে নেয়। কেউ যে আমাকে ব্ল্যাকবল করেনি সেটা বোধহয় ওদেরই তদ্বিরে। পরে আমি তাসেও ওস্তাদী দেখাই। বদলী হয়ে যে স্টেশনেই যাই গিয়ে দেখি আমার আগে

আমার ওস্তাদীর খ্যাতি সেখানে পৌঁছেছে। কখন একসময় আবিষ্কার করি আমি নাচতেও পারি। মেমসাহেবরাই আমাকে নাচান। হ্যাঁ, দুই অর্থে। তবে আমি তোমাদের ওই পাতিহাঁসের মতো সীমা ছাড়িয়ে যাইনি। ভুলেও ফ্লার্ট করিনি। তাই সাহেবের বাচ্চাদের বিষ নজরে পড়িনি। আরে, বাবা, কোথায় লাইন টানতে হয় সেটা যদি না জানো তো শ্বেতাঙ্গ সমাজে মিশতে যাও কেন? বিদ্যার জোরে আই সি এস হয়েছ বলে কি জাতে উঠেছ? ওরাও জাতিভেদ মানে। ওদেরও বর্ণাশ্রম আছে। বর্ণ মানে একজন গৌরবর্ণ ও আরেকজন কৃষ্ণবর্ণ। আমাদের ধর্মেও সেই অর্থে একজন হতো ব্রাহ্মণ, আরেক জন শূদ্র। তেমনি ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য। তাদের গায়ের রং মনে পড়ছে না। বোধহয় লোহিত ও পিঙ্গল।" বলতে বলতে শ্রান্ত হন ক্যাপটেন ল।

লাহা যদি কেউ বলে তিনি চটে যান। কলকাতা যেদিন থেকে ক্যালকাটা, লাহা সেদিন থেকে ল। সেকালের উচ্চারণ লা। কিন্তু বানান ডবল-ইউ দিয়ে। মানস তাঁকে আশ্বাস দেয় যে ইংরেজকে বন্দী করার মতো ক্ষমতা জার্মান ভিন্ন কারো নেই। আর জার্মানও সাবমেরিন দিয়ে সাত সমুদ্র পেরিয়ে সিঙ্গাপুরে আসবে না। আসতে পারে জাপানী। যদি যুদ্ধে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু তা যদি করতে যায় ওরা নিজেরাই জব্দ হবে। অ্যাডমিরাল পেরীর জাহাজ আবার জাপানে গিয়ে হাজির হবে। ওরা ভাবছে নৌশক্তিতে ওরা সমান সমান। তা হলেও মোটের উপর অসমান। কারণ ব্রিটেন আর আমেরিকার মিলিত নৌশক্তি জাপানের দ্বিগুণ। জার্মানীর নৌশক্তি তার সঙ্গে মিলিত হলেও দুই পক্ষের নৌশক্তি অসমান।

দিন কয়েক পরে মানস ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলছে এমন সময় তার খোঁজে আসেন তার দুই সিভিলিয়ান বন্ধু পাকড়াশী আর ঘোষাল। দু'জনেই এখন ডেপুটি সেক্রেটারি, কলকাতায় অধিষ্ঠান। সেখান থেকে মফঃস্বলে টুর করতে বেরিয়েছেন। যে যার ডিপার্টমেন্টের কাজে।

"খেলা কতক্ষণ চলবে?" পাকড়াশী সুধান। "আমরা কি তেষ্টায় গলা শুকিয়ে মরব?"

"মার্কার, পুছো।" বলে মানস সেটটা শেষ করতে অনুমতি চায়।

সেটটা সমাপ্ত হতেই র‍্যাকেটখানা ঘোষালের হাতে দিয়ে বলে, "এবার তুমি খেল্ দেখাও। টেনিস কাকে বলে।" খেলার সাথীদের ডেকে বলেন "ইনি কে, জানেন? স্বনামধন্য টেনিস চ্যাম্পিয়ন বিনোদ ঘোষাল।"

ঘোষাল একটু ওজর আপত্তি জানান। "আমি আজ ফ্যাগড্ ফীল করছি।"

ওই আজব বাংরেজী শুনে সবাই হেসে ওঠেন। জোরজার করে ওঁকে কোর্টে নামানো হয়। তার পর মানস গিয়ে পাকড়াশীর সঙ্গে বসে।

"তার পর, স্বামী মানসানন্দ পরমহংস।" পাকড়াশী ওকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বলেন, "কবে থেকে তুমি রামকৃষ্ণ পরমহংস হলে? এই যে শুনছি তুমি নাকি প্রতিজ্ঞা করেছ যে এ জীবনে আর কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। চাকরিটা অকালে ছেড়ে দিলে কাঞ্চনও আপনি ছেড়ে যাবে। তবে কামিনীকে ছাড়তে চাইলেও কামিনী নেহি ছোড়তি। না তিনিও একজন সারদামণি দেবী?"

মানস তাজ্জব বনে যায়। "কে এসব রটায়। কে এত খবর রাখে!"

"কেন, যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, উনি এখন সন্ন্যাস নিয়েছেন। কেবল গেরুয়াটা পরেন না এই যা তফাৎ। মাছ মাংস ছেড়েছ, মদও তুমি তেমন কিছু খেতে না, শুধু সঙ্গ রাখার জন্যে এক আধ চুমুক। কিন্তু এ কী কথা শুনি আজ সুফলার মুখে!"

"সুফলা! সুফলা কে?" মানস জানতে চায়।

"আহা, মিসেস বক্সী। তিনি একদিন তোমার ওখানে গিয়ে লক্ষ করে আসেন যে তোমাদের দু'জনের বিছানা দুই আলাদা বেডরুমে। ব্যাপার কী, মল্লিক? জীবনে একটা শোক পেয়েছ, আমাদের

সমবেদনা জেনো। কিন্তু তোমার বয়স তো বোধহয় পঁয়ত্রিশও পেরোয়নি, আর ওঁর বোধ করি সাতাশ কি আটাশ। নিজের উপর রিপ্রেসন চালাতে চাও, দেখা যাবে কদ্দিন পারো। কিন্তু ওঁর উপরে চালাতে গেলে একদিন একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিছু মনে কোরো না, ভাই। তোমার ভালোর জন্যেই বলা। শোকেরও একটা সীমা আছে। সব কিছুর মতো।"

মানস আর হাসি চাপতে পারে না। "সব বিলকুল ঝুট হ্যায়। শুধু সুফলা বক্সী কেন মহিলা আগন্তুকদের সকলের মুখেই সেই একই প্রশ্ন। যূথিকা এক একজনকে এক একটা উত্তর দিয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করে। সুফলাকে কী বলেছে, জানিনে। কিন্তু প্রকৃত উত্তরটা হচ্ছে এই যে, হঠাৎ একটিকে হারিয়ে ওর মনে ভয় ঢুকেছে। কে জানে আবার কোন্‌টিকে কখন হারায়। তাই দুটিকেই দুই পাশে শোওয়ায়। মেয়েটি তো একবার কেঁদে উঠবেই, একবার জেগে উঠে খেলা করবেই। আমি, বাপু, রাতের ঘুমটা মাটি করতে পারিনে। পরের দিন আদালতে গিয়ে ঢুলব। আলাদা ঘরে শোওয়া বেশ কিছুদিন থেকে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু এই সব নয়, পাকড়াশী।"

"এ ছাড়া আর কী কারণ?" পাকড়াশীর মুখে অবিশ্বাসের ভাব।

"তবে শোন। হিটলার যেদিন চেকোস্লোভাকিয়া নেয় সেইদিন থেকেই আমার রাতে ঘুম নেই। পোলাণ্ড যেদিন আক্রমণ করে সেদিন থেকে আমি বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ভাবি, এ যুদ্ধ এইখানেই থামবে না। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স তো যুদ্ধ ঘোষণা করবেই, এক এক করে আরো অনেকে সমবেত হবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রে। আমি কি শুধু নীরব দর্শক হব? না আমারও একটা ভূমিকা আছে? থাকলে কী সে ভূমিকা? আহার নিদ্রা মৈথুন আর আপিস আদালতের রুটিন। এই কি জীবন। না জীবনের আর কোনো অর্থ আছে? কী সে অর্থ? জীবনের অর্থ কি জীবিকা? আর বিনোদনের জন্যে তাস, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে টেনিস? আমি বারান্দায় পায়চারি করে ভাবি। ঘুম পেলে বিছানায় যাই। দুঃস্বপ্ন দেখি। হিটলার আসছে তেড়ে। ইংরেজ যাচ্ছে ছেড়ে।"

পাকড়াশী হো হো করে হেসে ওঠেন। "ওরে ভীরু, তোমার পরে নাই ভুবনের ভার। তুমি তোমার অফিস আদালতের ভার নিয়েই নিজেকে ব্যাপৃত রাখবে। যা হবার তা হবেই। কেউ রোধ করতে পারবে না।"

"কেন? দিল্লীতে যদি ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়? দেশের লোক যদি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপরে ভারতের ভার সমর্পণ করে? চল্লিশ কোটি ভারতীয়ই একজোট্টা হয়ে রুখবে।"

"ওটাও একটা স্বপ্ন। দিবাস্বপ্ন। ইংরেজরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে যুদ্ধকালে ওরা ক্ষমতা হাতছাড়া করবে না। বড়লাটের শাসন পরিষদের কয়েকটা আসন ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু সেখানেও একমাত্র কংগ্রেসকে নেবে না। মুসলিম লীগকেও নেবে। লীগেরও তেমনি জেদ যে মুসলমানদের জন্যে বরাদ্দ পদগুলোতে একমাত্র লীগ সদস্যদেরই নিতে হবে। নইলে লীগ যোগ দেবে না। যুদ্ধের পরে স্বরাজের দাবী যদি মনজুর হয় তবে সেইসঙ্গে পাকিস্তানের দাবীও মনজুর করতে হবে। মুসলমানদেরকে নেকড়ের মুখে সঁপে দিয়ে যাওয়া চলবে না। ওদিকে গান্ধীরও সমান জেদ যে ওটা আমাদের ঘরোয়া সমস্যা। আমরাই যেমন করে পারি মেটাব। তৃতীয় পক্ষ কেন নাক গলাবে? আর একটা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড তিনি মেনে নেবেন না। তা হলেই দেখছ কোনো পক্ষই কোনো পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেবে না। পর্দার আড়ালে গলাকাটা দর কষাকষি চলেছে। এর পরে আসছে বল কষাকষি। ইংরেজের হাতে আছে আর্মি, গান্ধীর হাতে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স, জিন্নার হাতে দাঙ্গাবাজি। এর মধ্যেই সাগরপার থেকে আরো কয়েক ব্রিগেড সৈন্য আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাতদিনের মধ্যেই সুভাষের সশস্ত্র বিপ্লব আর গান্ধীর নিরস্ত্র বিদ্রোহ ক্রাশ করে দেওয়া হবে। তা যদি হয় জিন্নাকে কিছু না দিলেও চলবে। কংগ্রেসকে যদি কিছু দাও, লীগকেও কিছু দিতে হবে, এই তো তাঁর আর্জি। কংগ্রেসকে কেক না

দিলে লীগকেও কেকের ভাগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেক ইংরেজরা নিজেরাই খাবে। নিজেরা খেতে না পেলে বরং জার্মানদের কেড়ে নিতে দেখে, পরে আবার বলবান হয়ে কেড়ে নেবে, ভারতীয়দের দু'চারটে ক্রাম্ব ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবে না। কাজেই তুমি নিয়তির উপর ওসব ছেড়ে দাও। আমরা যা করছি।'' পাকড়াশী সৎপরামর্শ দেন।

মানস নীরব থাকে। ইতিমধ্যে ঘোষাল এসে জুটেছিলেন। প্রসঙ্গটার আভাস পেয়ে মন্তব্য করেন, ''কংগ্রেস মন্ত্রীরা অপূর্ব ডিসিপ্লিন দেখিয়েছেন। সবাই একযোগে গদীতে বসেন। সবাই একযোগে গদী থেকে স্বেচ্ছায় নেমে আসেন। এত বড়ো ত্যাগ, এতখানি ডিসিপ্লিন কে কবে দেখিয়েছে! তাও যুদ্ধের মরশুমে। যখন কোটি কোটি টাকা খরচ বা লুট করার মওকা। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে বাহবা দিতে হবে। ওঁরা সত্যিই স্বরাজের যোগ্য। কিন্তু যোগ্যতা প্রমাণ করার পথে এখনো বিস্তর কাঁটা। লীগ তো বাধা দেবেই রাজন্যরাও অবাধ্য হবেন। ওঁদের লক্ষ্য বলকানিস্থান। এঁদের লক্ষ্য পাকিস্তান।

।। পনেরো ।।

অন্য সময় হলে ওরা মানসের ওখানেই উঠত। কিন্তু ওরা জানে যে মনের দিক থেকে যূথিকা ও মানস এখন প্রস্তুত নয়। পরের দিন ওরা যথারীতি কল করবে ও একসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবে। তা শুনে মানস বলে, ''তা হলে ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল।''

মানসের ওরা বিলেতের সমসাময়িক বন্ধু। তথা কর্মজীবনের সতীর্থ। কিন্তু যূথিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ কদাচিৎ ঘটেছে। এক স্টেশনে কখনো বদলী হয়নি। আলাপটা ঝালিয়ে নিতে চায়।

যূথিকা তো সানন্দে সায় দেয়। ওদের জন্যে ভালোমন্দ নিজেই রাঁধে। আমিষ খেতে আপত্তি। রাঁধতে নয়। অতিথিদের কেনই বা তাদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করবে? কিন্তু পানীয় সম্বন্ধে সে আপসবিরোধী। না, ও পাপ ও ঘরে ঢুকতে দেবে না।

''মল্লিক নাকি সারা রাত পায়চারি করে মহাযুদ্ধের কথা ভেবে উতলা হয়?'' পাকড়াশী যূথিকাকে সুধায়।

''সত্যি। ওকে নিয়ে কী যে করব ভেবে পাইনে। জোর করে ধরে এনে শুইয়ে দিলেও ঘুমের ঘোরে বকবক করে, পোলাণ্ড! হতভাগ্য পোলাণ্ড! তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি।'' যূথিকা হাসে।

''কী করতে পারি।'' পাকড়াশী ব্যঙ্গ করে। ''ওই পোল ব্যাটারা কি কম বজ্জাত! মাফ করবেন, মিসেস মল্লিক। আমি লোকটা মুখফোঁড়। যা মনে আসে তাই বলে ফেলি। ভাষাটাও মহিলাদের সমাজে জলচল নয়। আপনি হয়তো মনে আঘাত পেলেন। কিন্তু পোলদের মতো পাজী জাত কি বেশী দেখেছেন? স্বাধীন হতে না হতেই বিশ লাখ ইহুদীকে দিল খেদিয়ে। ওরাও হুড়মুড় করে জার্মানীতে ঢোকে। যে জার্মানী যুদ্ধে বিধ্বস্ত। অবশ্য নিজেদের বুদ্ধির দোষে। বিসমার্ক তো ওদের পই পই করে বারণ করে গেছেন। খবরদার, ইংরেজের সঙ্গে লড়তে যেয়ো না। নেপোলিয়নের দশা হবে। কায়জারের মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। নইলে বিসমার্ককে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়! যে বিসমার্ক জার্মান নেশনের জনক।''

মল্লিক বলে, ''তা তোমার ইহুদীরা নিরীহ মেষশাবকটি নয়, পাকড়াশী। জার্মানীতে শরণার্থী হয়ে এসে জাঁকিয়ে বসে। ইহুদীবিদ্বেষ তলে তলে জার্মানদের ভিতরে বহু শতক ধরে কাজ করছিল। কিন্তু নবাগতদের বাড়বাড়ন্ত দেখে ওদেব চোখ টাটায়। তার সঙ্গে নিজেদের অভাব অনটন তুলনা করে ওরা এমন উত্তেজিত হয় যে ইহুদীবিদ্বেষী এক পাগলকে বসিয়ে দেয় বিসমার্কের আসনে। তারপরে সে বিসমার্ককেও ছাড়িয়ে গিয়ে সর্বেসর্বা বনে যায়।''

"আহা, আমি কি বলেছি যে ইহুদীরা নিরীহ মেষশাবক!" পাকড়াশী বোঝায়। "ও ব্যাটারা যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে। ওদের কপালে দুঃখ আছে। কিন্তু কথা হচ্ছিল পোলদের নিয়ে। এক হাতে তালি বাজে না। পোলরা ইহুদীদের জার্মানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে জার্মানদের বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে, এটা যদি মানো তো পোলদের জন্যে তোমার অত দরদ কেন? শুধু পোলাদের জন্যে নয়, গোটা ইউরোপের জন্যেই তুমি চিরদিন ভেবে আকুল। বার্লো বা শেফার্ড কেউ তোমার মতো ওদের নিজেদের দেশের জন্যে অত কাতর নয়। একেই বলে মায়ের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ!"

"হা হা!" ঘোষাল হেসে ওঠে। "বার্লো রাত জেগে দূরবীণ দিয়ে গ্রহনক্ষত্র দেখেন। আর মানস রাত জেগে মানসিক দূরবীণ দিয়ে পোল জার্মান ফরাসী ইংরেজ দেখে। কিন্তু গ্রেট ওয়ারের আড়ালে যে এক লিটল ওয়ার ব্রু করছে সেদিকে নজর নেই। তুমি কি কাছেরটা দেখতে পাও না, দূরেরটাই দেখতে যাও? না, তোমার ওটা পাশ্চাত্য প্রেমের পরিণতি?"

মানস চমকে উঠে বলে, "তার মানে কী হলো, বিনোদ?"

"না, না, আমি বলতে চাইনি তুমি পশ্চিমে গিয়ে প্রেমে পড়েছিলে। ওটা বাঙালীদের সনাতন স্বভাব। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রীতি মানে ইউরোপের উপর অন্ধ অনুরাগ। সেই অনুরাগ তোমাকে দেখতে দিচ্ছে না যে তোমার নিজের দেশেই, এমন কি তোমার নিজের এলাকাতেই, গৃহযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হিন্দু মুসলমানের লিটল ওয়ার।" ঘোষাল গম্ভীর হয়ে যায়।

মানস চিন্তিত হয়ে বলে, "আমাদের উকিল সরকারও তার আভাস পেয়ে আতঙ্কিত। তাঁর কথা হলো একপক্ষ কমিউনাল তো বরাবরই ছিল, এখন আরেকপক্ষও কমিউনাল হয়ে উঠেছে। পরে সে যা হবে তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। পূর্ববঙ্গ যে এতদূর উন্মত্ত হবে তা আমি বিশ্বাস করিনে। আবার মোহিনীবাবুর মতো এক উকিল আছেন যিনি ওসব ভয়ভাবনা হেসে উড়িয়ে দেন। তাঁর মতে মুসলমানরা হিন্দুদের গভীরভাবে ভালোবাসে। হিন্দুরাও মুসলমানদের। আর দু'পক্ষই বাংলা বলতে, বাংলাদেশ বলতে, বাঙালী জাতি বলতে অজ্ঞান। যত নষ্টের গোড়া অবাঙালী হিন্দু মুসলিম পলিটিসিয়ানরা। ইংরেজরা যদি বাঙালীর হাতে বাংলাকে সঁপে দিয়ে যেত তা হলে দু'দিনেই সব বিরোধ মিটে যেত। এটা আমাদের স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া। দাম্পত্য কলহ। ইংরেজ যে তৃতীয় পক্ষ কে না সেটা জানে? কিন্তু কংগ্রেসও তৃতীয় পক্ষ। মুসলিম লীগও তাই। এর মধ্যে হিন্দু মহাসভা ঢুকে মুসলিম লীগকে আরো বলবান আর কংগ্রেসকে আরো দুর্বল করে তুলেছে। তাই কৃষক প্রজা দলকে আরো জোরদার করা দরকার। কিন্তু রাজা মহারাজা নবাব নবাবজাদারা কি তাতে রাজী হবেন? শ্রেণীসংগ্রামকে তারা দিতে চাইবেন সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের রূপ। বিপদটা তো সেইখানে।"

"যত সব বাজে কথা।" পাকড়াশী তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। "ভুলে যেয়ো না, মল্লিক, তোমার মতো অসাম্প্রদায়িক অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জুডিসিয়ারিতে। আর আমাদের মতো অসাম্প্রদায়িক অফিসারদের সেক্রেটারিয়াটে। আমাদের তিনজনের ও আমাদের মতো আরো যারা আছে তাদের কারো প্রমোশন হবে না এটা সুনিশ্চিত। তবে মন্দের ভালো এইটুকু যে ইংরেজ আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিয়ে যাবে না। আর কোথাও না হোক বিলেতে আমাদের চাকরি দেবে। দিতে বাধ্য। কারণ আমাদের কভেনান্ট সেক্রেটারি অভ স্টেটের সঙ্গে। ওঁর বিরুদ্ধে শ্বাস ফেললেই আমরা গিয়ে মামলা রুজু করে দেব। সেক্রেটারিয়াটে বসে কলকাতার বড়ো বড়ো কাউন্সেলের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে পারছি। নইলে ডেপুটি সেক্রেটারি একটা পদ। কোথায় সেই প্রেস্টিজ যা আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গদীতে বসে পেয়েছি! কী করি, বলো। শক্ত হাতে দাঙ্গা না থামালে চলে? বাড়তে দিলে গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করবে না?"

"আরে, আমিও তো সেই কথাই বলতে চেয়েছিলুম। সুপ্রকাশ যা বলেছে তা আমারও কথা।"

ঘোষাল বলেন, "কড়া হাতে না থামালে পরে দেখবে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তাতে ইংরেজের কী? তার গায়ে তো আঁচড়টি লাগবে না। মরবে হিন্দুর ছাওয়াল, মুসলমানের পোলা। গৃহযুদ্ধ কি আমরা কেউ বাধাতে দিতুম, যদি ক্ষমতা থাকত আমাদের কারো হাতে? মুসলিম মন্ত্রীদের আমরা চোখের বালি। আর হিন্দু নেতাদেরও পথের কাঁটা। ওঁদের ধারণা আমরা সবাই দেশদ্রোহী, তাঁরা সবাই দেশভক্ত। আরে বাবা! রাজনীতির খেলায় তোমরা ধুরন্ধর হতে পারো, কিন্তু প্রশাসনের বেলায় তোমরা শিশু ভিন্ন আর কিছু নও। ইংরেজ কি দেশকে অরাজক হবার আগে স্বরাজ দিয়ে যাবে? সেই দেশব্যাপী অরাজকতার দিন কারা তোমাদের বাঁচাবে? তোমাদের চোখ কান কারা? হাত পা কারা? এ তত্ত্ব বোঝেন রাজগোপালাচারীর মতো বিচক্ষণ ও বহুদর্শী নেতা। বোঝেন না নেহরুর মতো ব্রীফলেস ব্যারিস্টার, যিনি আই. সি. এস হতে না পেরে তখন থেকেই প্রতিশোধের দিন গুনছেন।"

"না, না। ওটা ঠিক নয়, বিনোদ। নেহরুর ত্যাগশক্তির সীমা নেই। দেশ যাঁকে ভালোবেসে রাজার আসনে বসাবে আমরা তাঁর কাছেই আনুগত্যের শপথ নেব। যদি তিনি আমাদের অভয় দেন যে আমাদের চাকরিও যাবে না, প্রমোশনও আটকাবে না। আসলে হয়েছে এই যে গান্ধীজী যেমন ভালোমানুষ, নেহরুজীও তেমনি ছেলেমানুষ। যাঁদের সঙ্গে এঁরা তাস খেলতে বসেছেন তাঁরা দু'জন ঝানু খেলোয়াড়। ব্রিজ খেলায় একজন আরেকজনের ডামি। যেমন তুখোড় লিনলিথগাউ তেমনি তুখোড় জিনা। হ্যাঁ, বিলিতী উচ্চারণ জিনা। দুটি ব্যাটাই বদ্।" এই বলে পাকড়াশী জিব কাটে। "মাফ করবেন, মিসেস মল্লিক।"

"জিন্নাকে তুমি জিনা বলতে পারো, কিন্তু ডামি বলছ কোন্ আক্কেলে? বলতে পারতে বড়লাটই জিন্নার ডামি।" ঘোষাল অনুযোগ করে।

"আমি বলেছি একজন আরেকজনের ডামি। তার মানে কখনো বড়লাটের ডামি জিনা, কখনো জিনার ডামি বড়লাট। কখনো নৌকোর পিঠে গাড়ী, কখনো গাড়ীর পিঠে নৌকো। তবে ইংরেজদের শুভবুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে। ও ব্যাটারা বাহুবলে ভারত শাসন করছে এটা আমাদের নেতাদের ভুল। করছে বুদ্ধির বলে। বুদ্ধি যে সব সময় দুর্বুদ্ধি তা নয়। বিপদ কালে সুবুদ্ধিও হতে পারে। গতবারের যুদ্ধে বড়লাট স্মরণ করলেন কাকে? ওই গান্ধীকে। বড়লাটের প্রস্তাবের সমর্থন করলেন কে? ওই গান্ধী। কই, তখন তো আর কাউকে মনে পড়েনি? না মডারেটদের, না মুসলমানদের? সেইরকম বিপদ যদি আবার ঘনিয়ে আসে, যদি দূরে বহুদূরে টেমস নদের তীরে নয়, সেন নদীর তীরে নয়, কাছে আরো কাছে? তখন আবার মনে পড়বে ওই ভালোমানুষ গান্ধীকেই। ছেলেমানুষ নেহরুকেও। লর্ড আরউইনের নতুন নাম লর্ড হ্যালিফাক্স। আর লর্ড রোনাল্ড্‌শের নতুন নাম লর্ড জেটল্যাণ্ড। এঁদের দু'জনেরই এখন আরো বেশী প্রতিপত্তি। এঁরা জানেন কখন কার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হয়। এঁরা হলেন কবিগুরু যাদের বলেছেন বড়ো ইংরেজ। জাতটা সত্যিই বড়ো। গ্রেট ব্রিটেন সত্যিই গ্রেট। ওরা গ্রেট না হলে এতদিন ধরে এত বড়ো একটা সাম্রাজ্যকে একমুঠো সিভিলিয়ান দিয়ে শাসন করতে পারত না। এখনো ব্রিটিশ জাসটিসের উপর ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আছে। হাইকোর্টে সুবিচার হয়, নয়তো প্রিভি কাউনসিল তো আছেই। কবে, কোন্ যুগে ছিল এমন সুবিচার?" পাকড়াশী গুণগান করে বড়ো ইংরেজের।

"তা হলে তুমি জুডিসিয়ারিতেই থেকে যাও, মল্লিক।" পরামর্শ দেয় ঘোষাল। "যথাকালে হাইকোর্টে যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

"না, ভাই। আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। আমি প্রথম সুযোগেই অপসরণ করব। যদি মহাযুদ্ধের মাঝখানে ক্ষুদ্রযুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লব বাধে আমি কাউকে গুলীও করতে পারব না, ফাঁসীও দিতে পারব না। জেলায় থাকলে এ দায় আমার ঘাড়ে চাপবেই। তোমরা এসব অপ্রিয় কর্তব্য থেকে বেঁচে গেছ। তাতেও সন্তুষ্ট নও। তা বলে আমি যে জেলা থেকে সেক্রেটারিয়াটে গিয়ে দিস্তা দিস্তা নোট

লিখতে পেলে ধন্য হব তাও নয়। আমি চাই এমন কিছু লিখতে যা আমার অন্তরের কথা, যা না লিখে আমার মুক্তি নেই, যা লিখতে পেলেই আমি ধন্য। যা নোট নয়, রিপোর্ট নয়, রায় নয়, অর্ডার নয়। যাতে আমাকে অমৃত না করবে তা নিয়ে আমি কী করব!"

"তার মানে তুমি এসকেপিস্ট।" পাকড়াশী বলে। "ওটা মহত্ত্বের লক্ষণ নয়। আমি হলে গুলীও করতুম, ফাঁসীও দিতুম, যেমন করে পারি লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে রক্ষা করতে কয়েক শো বদমায়েসকে পিষে মারতুম। তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, তারা গুণ্ডা। তারা সমাজের শত্রু। তারা দেশের মিত্র বা ধর্মের মিত্র হতে পারে না। তারা যদি নাই পেয়ে মাথায় ওঠে তবে সর্বনাশ হবে। তেমন স্বরাজ নিয়ে আমরা করব কী? তেমন পাকিস্তানই বা কার কোন্ কাজে লাগবে?"

"যদি পাকিস্তান হয়!" ঘোষাল আপত্তি করে। "তুমিও যেমন। কে চায় পাকিস্তান! ওটা কি জিন্না সাহেবের সত্যিকার দাবী? আমাকে কী দেবে দাও, না দিলে আমি পাকিস্তান চাইব। শাদা কথায়, গোটা কেক্‌টা তোমরাই খাবে সেটি হবে না, গান্ধী নেহরু। আমাকেও ভাগ দিতে হবে। আমি যদি রাজত্বের ভাগ পাই তবে রাজ্যের ভাগ চাইব না। আমিও শাহ্‌জাহানের আরেক ছেলে। ভাগ না পেলে বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে লড়ব। পাকিস্তান হবে না, যদি আমাকে পার্টনার করে নাও। হয় পার্টনারশিপ, নয় পার্টিশন। কড়া হাতের শাসন এর উত্তর নয়, সুপ্রকাশ। তোমাকে আপসের চেষ্টা করতে হবে।"

"তার মানে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের বিসর্জন দিতে হবে। কী অপরাধ ওঁদের। ওঁরা কি মুসলমানের ভোটে নির্বাচিত হননি? ওঁরা কি কারো চেয়ে কম জেল খেটেছেন, সম্পত্তি হারিয়েছেন? আঠারো বছর দুর্ভোগের পর যদি একটু সুদিনের মুখ দেখে থাকেন সেটা কি তাঁদের প্রাপ্য পুরস্কার নয়? তাও তো কংগ্রেসের আহ্বানে পদত্যাগ করে জেলের দিকে পা বাড়িয়েছেন আবার । মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলতে কি এঁদেরও বোঝাবে না, বোঝাবে শুধু লীগপন্থী মুসলমানদের? কেন, ফজলুল হক, সিকন্দর হায়াৎ খান্, আল্লা বক্স, এঁরা কী দোষ করলেন? ব্রিটিশ সরকার তো এঁদের দলগুলিকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই স্বীকৃতি খারিজ করবেন কী কারণে? জেদ, জেদ ছাড়া জিনাব আর কোনো যুক্তি নেই। আর যা আছে তা বিলেতের রক্ষণশীল দলের সঙ্গে গোপন আঁতাত। জিনার শর্তে রাজী না হলে ব্রিটেনের সঙ্গে কংগ্রেসের ফাইনাল সেটলমেন্ট হবে না। জিনাকে পার্টনার না করলে কংগ্রেসকে ভারতের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পরিচালনা ভার দেওয়া হবে না। কংগ্রেস যদি সেই মর্মে আপস করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল হানবে। আমি বলবার কে? আমাকে পোছে কে? আমি তো সরকারী চাকরি করছি বলে দেশদ্রোহী। জানো তো, টেররিস্টরা আমাকে খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছিল?" পাকড়াশী আবেগের সঙ্গে বলে।

"ওরা তো শুধু হুমকি দিয়েছিল। মারেনি তো। আর এরা কী করেছিল, জানো? কংগ্রেসী হিন্দুরা আমার নামে বদনাম রটিয়েছিল যে আমি নাকি ওদের লাথি মেরেছি, চাবকেছি, ঘর ভেঙে দিয়েছি। বদনাম রটানোও কি খুন করার চেয়ে কিছু কম? চরিত্রহত্যাও একপ্রকার হত্যা। অহিংস হত্যা।" ঘোষাল তার আবেগ হাসি দিয়ে ঢাকে।

মানস এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলে, "যেতে দাও। যেতে দাও। পাবলিক লাইফে এলে অমন অনেক বদনাম, অমন অনেক হুমকি হজম করতে হয়। ওরাই একদিন তোমাদের মূল্য বুঝবে। তোমাদের সাহায্য চাইবে। তখন তোমরা নোবল রিভেঞ্জ নেবে।"

যূথিকা না শোনার ভাণ করছিল। বলে, "ও প্রসঙ্গ থাক। এখন একটু সংসারের কথা হোক। মিসেসরা কেমন আছেন? ছেলেমেয়েদের খবর কী?"

"ওসব জানতে চেয়ে কেন লজ্জা দিচ্ছেন? আপনাদের তিন ছেলেমেয়ে। একটিকে হারালেও তবু তো দুটি থাকে। আমাদের ওই একটিই সবে ধন নীলমণি। যখনি বলি, আরেকটি হলে ভালো হতো

না? তখনি শুনি, মিনু ঘোষালের যদি না হয় আমার কেন হবে। আহামরি, কী যুক্তি! শুনতে পাই মিনু ঘোষালও বলেন, রমি পাকড়াশীর যদি না হয় আমার কেন হবে? মহিলারা আজকাল তলে তলে একটা প্যাক্ট করেন না তো?" পাকড়াশী রসিকতা করে।

"কই, আমি তো কারো সঙ্গে সে রকম কোনো প্যাক্ট করিনি।" যূথিকা হাসে। "আমার মনে হয় ওটা একরকম বিউটি ইনশিওরান্স। রূপযৌবন অক্ষুণ্ণ রাখার উপায়। এক একটি বাচ্চা এসে এক এক গণ্ডা বয়স বাড়িয়ে দেয়। কুড়িতেই বুড়ি।"

"বেয়াদবি মাফ করবেন, আপনাকে দেখলে কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়। আমার উনিই বরং বিউটি ইনশিওরান্স করতে গিয়ে চড়া প্রিমিয়াম গুনছেন।" পাকড়াশী লোকটা মুখফোঁড় বলে মুখফোঁড়। একেবারে ঠোঁটকাটা।

"থাক, থাক। অমন কথা মুখে আনতে নেই। উনি যদি শুনতে পান বিষম রাগ করবেন। একবার যে মা হয়েছেন এটাও কি কম ত্যাগস্বীকার! ভুলে যাচ্ছেন কেন যে মা হতে গিয়ে আমরা যমের মুখোমুখি হই। আপনাদের কী! বৌ মারা গেলে আর একটি বিয়ে করবেন। বৌ বুড়ি হলেও আর একটি বৌ আনবেন।" যূথিকা বলে।

"এই হলো মহিলাদের চিরকালের অভিযোগ।" ঘোষাল বলে।

"এ যুগে তাঁদেরই জিৎ। তাঁরা যদি মা না হতে চান কে তাঁদের বাধ্য করতে পারে? শেষ তাসখানা তো তাঁদেরই হাতে। পুরুষ এখানে অসহায়। বহুবিবাহ এখনো পুরুষের হাতের পাঁচ, কিন্তু সব ক'টা বৌ যদি তলে তলে প্যাক্ট করে তো বহুবিবাহের ফলে বহু সন্তান হবে না। আমরা পুরুষরাই তখন ব্রত মানত ষষ্ঠীপূজা করব। তাতেও কি ফল হবে!" পাকড়াশী ফোড়ন দেয়।

মানস কোনো মতে অশ্রু সম্বরণ করে বলে, "যাকে বাঁচাতে পারিনে তাকে পৃথিবীতে আনতে যাই কেন? তাতে তারও দুঃখ, তার মায়েরও দুঃখ, তার বাপেরও দুঃখ। যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো। বেশী চাইতে নেই। পেলে হারাবার ভয়ও বাড়ে। নারীর রূপযৌবনের ইনশিওরান্সটা মিথ্যে আশ্বাস। দশটি সন্তানের জননীকেও রূপসী যুবতীর মতো দেখতে। মা না হয়েও কেউ কেউ অকালে বুড়ি। এর রহস্য আমার জানা নেই। বোধহয় আছে একরকম তন্ত্রমন্ত্র বা জড়িবুটি। মেয়েরাই মেয়েদের কাছ থেকে পায়। ব্যাপারটা পুরুষদের কাছে ফাঁস করে না। নিজের চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি পঞ্চাশ বছর বয়সেও চিরযুবতী। রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী'। আমরা কতটুকুই বা জানি।"

পাকড়াশী কারো কোনো কথা শুনবে না। এমন অবুঝ। "আমি কেবল সেই নারীকেই শ্রদ্ধা করি যে বহুসন্তানবতী। যেমন আমার মা কাকিমা মাসিমা পিসিমা মামিমা। আমি মানসের মতো ফেমিনিস্ট নই। অথচ মজা দ্যাখ, নিজেই তিনটি সন্তানের বাপ হয়ে বসে আছে। বৌকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে।"

হাসির ধুম পড়ে যায়। মানস বলে, "আমি কিন্তু সব নারীকেই শ্রদ্ধা করি। যে মা হয়েছে তাকেও। যে মা হয়নি তাকেও। যে একসন্তানবতী তাকেও। যে বহুসন্তানবতী তাকেও। নারীকে শ্রদ্ধা করি তার নারীত্বের জন্যে। মাতৃত্ব তো উপরন্তু। সেই উপরন্তু সকলের বরাতে জোটে না। কেউ অকালে বিধবা হয়। কেউ বিনা দোষে বন্ধ্যা হয়। তা বলে শ্রদ্ধার পাত্রী হবে না কেন? বৈষ্ণবদের আরাধ্য রাধা। শাক্তদের আরাধ্য শ্যামা। এঁদের কারো সন্তান ছিল বলে ধর্মগ্রন্থ লেখে না। তা বলে কি এঁরা কম ভক্তি পান!"

"তা যদি বলো, উমার ওই একটিই গর্ভজাত সন্তান, গণেশ। কার্তিকের জন্ম ছয় বোন কৃত্তিকাদের গর্ভে। কুমারসম্ভব পড়েছ?" ঘোষাল জিজ্ঞাসা করে।

পাকড়াশী মাথা নাড়ে। "আমি বিজ্ঞানের ছাত্র।"

"আমি আর্টসের ছাত্র। আমার অন্যতম বিষয় ছিল সংস্কৃত। তা হলে শোন। শিবের প্রথম পক্ষ

সতী নিঃসন্তান। আর তাঁর তৃতীয় পক্ষ গঙ্গা। তাঁরও সন্তান হয়নি। পার্বতীর তো ওই একটিমাত্র সন্তান, গণেশ। তা হলে তোমার আমার পত্নীদের কাছে আর প্রত্যাশা না করাই ভালো।" ঘোষাল বলে।

"প্রত্যাশা কাকে বলছ, ভাই? ওটা যে অলিখিত শর্ত। বাপ আর মা মিলে দুই। ছেলে আর মেয়ে মিলে দুই। দুইয়ের জায়গায় দুই। দুইয়ের জায়গায় এক হলে হিসেব মিলবে কী করে? জনসংখ্যা অর্ধেক কমে যাবে। কয়েক পুরুষ বাদে শূন্যে ঠেকবে। এ রকম সিদ্ধান্ত কি এককভাবে নেওয়া যায়? অবলারা হঠাৎ প্রবলা হয়ে উঠে কী যে বিপ্লব বাধাতে যাচ্ছে তার ফলাফল কেউ খতিয়ে দেখেছে কি?" পাকড়াশী উত্তেজিত হয়।

"লোকটা রসকষবর্জিত।" ঘোষাল হেসে উড়িয়ে দেয়।

"তর্কে পরাস্ত হলে সকলেই ঘোড়ার মতো হাসে। বলো, আমার যুক্তি কোন্‌খানে ভুল?" পাকড়াশী চেপে ধরে।

"যুক্তি তোমার সম্পূর্ণ নির্ভুল। কিন্তু যুক্তিটাকে প্রয়োগ করবে কী করে? অনিচ্ছুক নারীর বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে কনজুগাল রাইটের মামলা দায়ের করবে? তাতেও কি এর কোনো প্রতিকার আছে? বৌকে ধরে নিয়ে এসে বিছানায় শোয়াতে পারা যায়, কিন্তু মা হতে বাধ্য করা অসম্ভব। সভ্য মানুষ এখানে পরাজিত। বর্বর হয়তো হত্যার ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে। তাকে আদালতেও যেতে হয় না। কিন্তু তুমি আমি বর্বর নই। আর একটা উপায় অবশ্য হিন্দু বলে তোমার হাতের পাঁচ। বৌকে বলতে পারো, এই চললুম বর-বর খেলা খেলতে। আবার বর হতে। তোমার তো ছেলে হলো না। ছেলে না হলে বংশরক্ষা হবে কী করে? পাকড়াশী বংশ কি নির্বংশ হবে! তা শুনে বৌ বেচারি ভয় পেয়ে আবার মা হবার ঝুঁকি নেবে। হয়তো আঁতুড়ঘরেই পটল তুলবে। সুপ্রকাশ, ইজ ইট ওয়ার্থ হোয়াইল?" ঘোষাল টিপে টিপে হাসে।

"তুমি আমাকে বলেছ রসকষবর্জিত। আমি তোমাকে বলব স্ত্রৈণ। ওর বাড়া গাল নেই।" পাকড়াশী বিজেতার মতো বুক ফোলায়।

"বলো, বলো, যা মুখে আসে বলো। কিন্তু এটাও মনে রেখো যে বাইরে তুমি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে পারো, ঘরে কিন্তু তুমি নারীমুখাপেক্ষী। সেখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নয়, কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাইনে। ক'টি সন্তান হলো, আদৌ হলো কি না এসব ভেবে সময় নষ্ট না করে এক সেট টেনিস খেলা ভালো। স্ত্রীর কাছে আমি সব খেলায় পরাজিত হতে রাজী, শুধু টেনিসে নয়। তোমার মনে খালি বাজছে, তুমি পরাজিত। তুমিও একটি ক্ষেত্রে অপরাজিত। আমাদের সকলের মধ্যে তুমিই হচ্ছ দীর্ঘতম। তা বলে দীর্ঘতমা ঋষি হতে যেয়ো না।" ঘোষাল হেসে ওঠে।

দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যান জানতে চাইলে ঘোষাল বলে, " সে এক দীর্ঘ উপাখ্যান। সংক্ষেপে শোনাচ্ছি।"

দীর্ঘতমা ধার্মিক ও বেদজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যত্রতত্র সঙ্গম করার জন্যে প্রতিবেশী ক্রুদ্ধ মুনিগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। তাঁর স্ত্রীও অন্ধ স্বামীকে ভরণ পোষণ করতে অস্বীকার করেন। পুত্ররা মাতার আদেশে তাঁকে ভেলায় করে ভাসিয়ে দেন। সেকালে সন্তান উৎপাদনের জন্যে নিয়োগ প্রথা ছিল। বলিরাজা তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যান ও নিজের রানী সুদেষ্ণাকে তাঁর শয্যায় যেতে বলেন। রানী নিজে না গিয়ে দাসীকে পাঠান। অন্ধ তো তফাৎ বুঝতে পারেন না। দাসীর গর্ভেই একাদশ পুত্রের জন্ম দেন। তা শুনে রাজা আবার রানীকে ঋষির শয্যায় পাঠান। এবার রানীর গর্ভে পাঁচটি পরাক্রান্ত পুত্র হয়। পাঁচজনের নামে পাঁচটি দেশ নামাঙ্কিত হয়! অঙ্গ,বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।

পাকড়াশীর তো মুখ চুপ। "আমি টেনিস খেলিনে। ডুয়েল লড়ি।"

যূথিকা বুঝতে পারে যে এর পরে হয়তো হাতাহাতি বেধে যাবে। সে শান্তিজল ছিটিয়ে দেয়।

"ছি! এই সামান্য কথায় কেউ ডুয়েল লড়ে ? একটি ছেলে কি মেয়েকেই আজকাল মনের মতো করে মানুষ করা এত শক্ত যে দুটির দায়িত্ব নিতে কেই বা সহজে রাজী হয়? কিন্তু দুটি না হলে খেলার সাথী জোটে না। খেলার সাথী না জুটলে একা একা থাকতে হয়। তাতে চরিত্রের ঠিকমতো বিকাশ হয় না। তা হলে খুব কম বয়সে নার্সারি স্কুলে পাঠাতে হয়। কোথায় মেলে তেমন স্কুল? আমরা দুটিই চেয়েছি। দুটিই যখন পেলুম তখন দেখলুম দুটিই ছেলে, মেয়ে একটিও নয়। মেয়ে না হলে ঘর আলো হয় না। তাই মেয়েও চাইলুম। বিধাতা সে বাসনা পূরণও করলেন। তখন কি জানতুম যে সমতা রাখার জন্যে একটি ছেলেকে ফিরিয়ে নেবেন? জানলে হয়তো মেয়ে চাইতুম না। তাই বা কেমন করে বলি! মণিকা আমার দু'চক্ষের মণি।"

ঘোষাল এবার রসিকতা করে বলেন, "সাবধান, মিসেস মল্লিক। মিনু যদি মণিকে দেখতে পায় এখন থেকেই আপনার সঙ্গে বেয়ান সম্পর্ক পাতাবে। ওর ছেলের জন্যে ও এখন থেকেই বৌ খুঁজতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে রমি পাকড়াশীর সঙ্গেও বেয়ান সম্পর্ক পাতানো হয়ে গেছে। সেই সুবাদে সুপ্রকাশ আমার বেয়াই। বেয়াইতে বেয়াইতে ডুয়েল। তামাশা মন্দ নয়। তবে বেয়ানদের সাক্ষাতে হওয়া চাই।"

পাকড়াশী ঠাণ্ডা হয়ে বলে, "তা হলে তুমি কথা ফিরিয়ে নাও। আমি বর্বর, আমি দীর্ঘতমা। আমি যত্রতত্র সঙ্গম করে বেড়াই। এসব কী কথা!"

"কবে বলেছি যে তুমি দীর্ঘতমা? আমি বরঞ্চ বলেছি দীর্ঘতমা হতে যেয়ো না। তুমিই আমাকে বলেছ স্ত্রৈণ। যার বড়ো গাল নেই। কিন্তু আমি তো মনে করি ওটা নিন্দার কথা নয়, প্রশংসার কথা। মিনুকে শোনালে ও কত খুশি হবে। আমি খেলোয়াড় মানুষ। সব কিছু আমি খেলোয়াড়ের মতো নিই। ডুয়েল যদি লড়তে বলো, খেলোয়াড়ের মতোই লড়ব। টেনিস র‍্যাকেট হাতে। সিঙ্গলস খেলবে আমার সঙ্গে?" ঘোষাল চ্যালেঞ্জ করে।

"না, টেনিস র‍্যাকেট হাতে নয়। তবে ব্রিজের টেবিলে খেলতে পারি। চড়া স্টেকে। মল্লিক আর মল্লিকা, তোমরাও খেলবে নাকি? তাস ঘরে আছে? বিনোদকে আজ আমি দেউলে করে ছাড়ব।" পাকড়াশী চ্যালেঞ্জ করে।

"বিনোদের পার্টনার যে হবে তাকেও। কে অমন প্রস্তাবে রাজী হবে!" মানস যূথিকার দিকে তাকায়।

"আমি রাজী। আমার খেলার পার্টনার যদি জেতেন তো আমিও জিতব। তাতে আমার বাড়ীর পার্টনার হেরে গিয়েও জিতবেন। আর আমার খেলার পার্টনার যদি হারেন তো আমিও হারব। সে হার পুষিয়ে দেবে আমার বাড়ীর পার্টনারের জিৎ। কারো পকেট থেকে কিছু যাবে না, কারো পকেটে কিছু আসবে না।" এই পর্যন্ত বলে যূথিকা কথা ঘুরিয়ে নেয়। বলে, "কিন্তু আমরা যে স্টেক রেখে খেলা ছেড়ে দিয়েছি।"

পাকড়াশী উঠে দাঁড়ায়। "চলো হে চলো, বিনোদ। ক্লাবে গেলে এখনো ব্রিজের টেবিলে জনা দুই পার্টনার মিলবে। তোমাকে আজ আমি হারাবই হারাব।"

"বেশ, চলো। কিন্তু আমার পার্টনার যদি হন ক্যাপটেন ল তোমার এ গুমোর ফাঁস হবে।" ঘোষালও বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

পরের দিন টেনিসে আবার দেখা হলে মানস জানতে চায় ব্রিজ খেলার খবর। ঘোষাল বলে, "আমরা গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। ক্লাবের দুয়ার বন্ধ। তখন সারকিট হাউসে গিয়ে যে যার ঘরে ঢুকি। সকালে উঠে সব ভুলে যাই।"

"আমারও কি মনে আছে? অমন কত হয়।" পাকড়াশী বলে।

মানস জানতে চায় সুপ্রকাশ হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন। তুচ্ছ কারণে কেউ ডুয়েল লড়ে?

"দ্যাখ, মল্লিক, তোমার কাছে যা তুচ্ছ আমার কাছে তা তুচ্ছ নাও হতে পারে। ধড়াচূড়া আমার একেলে, সুট আমার বানায় অ্যাসকুইথ অ্যাণ্ড লর্ড, কিন্তু মানুষটা আমি সেকেলে। ওই ব্যাটা হিটলারকে যদিও আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি তবু ও ব্যাটা যা বলেছে তা লাখ কথার এক কথা। কিরখে, কুখেন উণ্ড কিণ্ডেরগার্টেন। গির্জে, কিচেন আর নার্সারি! এই তিন হলো নারীজাতির স্বরাজ্য। এর বাইরে তাদের পররাজ্য। এর খাঁটি বাংলা হচ্ছে মন্দির, রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘর। এই তিন নিয়ে যারা আছে তারাই আমার আদর্শ নারী। এইজন্যেই মিসেস মল্লিককে আমি বন্দনা করি। কিন্তু আমার আর বিনোদের দুই রূপসী নবযুবতীকে পারলে বন্দী করতুম। আমরা অক্ষম। আমরা কাপুরুষ। আমার মা আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, বৌমার আর একটি হয় না কেন? আমি এর কী উত্তর দিতে পারি? বলতে পারতুম বৌমাই জানে। সাহসে কুলায় না। বলি, ভগবান জানেন। মা আমার সেকেলে মানুষ। এখানে ওখানে সেখানে মানত করে বেড়ান। ষষ্ঠীব্রত করেন। নাতনি হয়েছে, কিন্তু সে পরের বাড়ী চলে যাবে। নাতি চাই। সে স্বর্গে দেবে বাতি। বেচারি মা আর কদ্দিন বাঁচবেন। রূপবতীর কি সেদিকে হোঁশ আছে। অথচ বিনোদ কিনা ওর নবযুবতীর পক্ষ নিয়ে আমাকে অপ্রস্তুত করছে। আমি যদি বলে থাকি স্ত্রৈণ এমন কী অন্যায় করেছি? কোদালকে কোদাল বলা কি অন্যায়? তর্কে হেরে গিয়ে ও এক গল্প ফেঁদে বসেছে। আমি কিনা দীর্ঘতমা ঋষি।" পাকড়াশী উপরে উপরে ক্ষুব্ধ হলেও ভিতরে ভিতরে পুলকিত।

"ওঃ এই কথা!" মানস ওকে প্রবোধ দেয়। "কী করবে বলো? ওটা যুগধর্ম। যে নারীকে আমরা সব দেশেই জেগে উঠতে দেখছি সে নারীকে ইংরেজীতে বলে নিউ উওম্যান। সে নারী ঘর নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, বাইরেকেও তার চাই। সেও ক্লাবে যাবে, আফিসে যাবে, খেলার মাঠে যাবে, আকাশে উড়বে, সমুদ্রে সাঁতার কাটবে, নির্বাচনে ভোট দেবে, জিতলে মন্ত্রী হবে। শুনছি সোভিয়েট রাশিয়াতে নাকি ওরা যুদ্ধক্ষেত্রেও যায়, রাতের বেলায় সঙ্গ দিতে নয়,— সেটা তো হোমারের যুগেও ছিল, — চিত্রাঙ্গদার মতো শত্রুর সঙ্গে শস্ত্র হাতে লড়তে। মারতে ও মরতে। এই যে নিউ উওম্যান একে তুমি হিটলারী অনুশাসন জারি করে ঘরে ফেরাতে পারবে না। যদি না সে আপনা থেকে নীড়ের বন্ধন মানে। যূথিকাকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু সে হচ্ছে সেই দেবী যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। তা না হলে সেও নব্য নারী। সে সনাতনী নয়। সে বিংশ শতকেরই কন্যা। যেমন তোমার উনি বা বিনোদের তিনি। সুপ্রকাশ, তুমিও মেনে নাও, যেমন মেনে নিয়েছে বিনোদ। দেখবে ফল ভালোই হবে। যথাকালে।" ইতি মানস।

"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। কিন্তু যথাকাল যে কতকাল তা আমার মাকে কে বোঝাবে? বা বিজনের মাকে? সেই বৃদ্ধার সঙ্গে যখনি দেখা হয় তিনিও জানতে চান, হাঁরে, আমার বৌমার আর হচ্ছে না কেন? বিনোদের মা নেই, তাই রক্ষে। এটা হলো শাশুড়ী জাতির সাধারণ জিজ্ঞাসা। যেমন মৈত্রেয়ী গার্গীদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অথ সুপ্রকাশ।

মানস বলি-বলি করে বলতে পারে না যে কোনো কোনো নব্য নারীর বেলা অঘটনও বার বার ঘটে। সেটা অবশ্য পরের মুখে শোনা।

।। ষোল ।।

কংগ্রেস মন্ত্রীদের এক ধার থেকে পদত্যাগের পর হামিদ বলেন মানসকে, "আপনারা অমন করে পালিয়ে গেলেন কেন?"

"পালিয়ে গেলুম আমরা!" চমকে ওঠে মানস। "এর মানে কী, হামিদ?"

"আহা, আপনারা মানে কি আপনি আর মিসেস মল্লিক।" হামিদ বুঝিয়ে বলেন, "আপনারা মানে কংগ্রেসমন্ত্রীরা। পালিয়ে যাওয়া মানে শাসনকার্য ছেড়ে বনবাসে যাওয়া। কী দরকার ছিল এই মহাপ্রস্থানের? এটা কি জিন্না সাহেবের ভয়ে, না বোস বাবুর ডরে?" সুভাষচন্দ্রকে তিনি বলতেন বোসবাবু।

মানস সামলে নিয়ে বলে, "তাই বলুন। আমি তো ভেবেছিলুম আমরাই আবার ইলোপ করেছি। হা হা হা হা! আরে ভাই, ওসব আপনাদের বয়সেই সাজে। আমরা এতদিনে ঘোরতর ঘরপোষা। যাকে বলে ডোমিস্টিকেটেড।"

হামিদ জানতেন না মল্লিক দম্পতির পরিণয় কেমন ভাবে হয়েছিল। তাঁর নিজের বিবাহ হয়েছে বিশুদ্ধ শরীয়তী মতে। গুরুজনের নির্বন্ধে। ভাগ্যে হয়েছিল, তা নইলে ওঁকেও মুশকিলে পড়তে হতো ওঁর সতীর্থ ইমতিয়াজ মির্জার মতো। ইমতিয়াজ হলেন খানদানী পাঞ্জাবী মুসলমান । চেহারা দেখে মালুম হয় সেকালের গ্রীকদের বংশধর। গৌরবর্ণ সেই সুপুরুষের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণা বঙ্গকন্যার সাদী দিতে সাধ বেগম জাফর হোসেনের। তাঁর বিশ্বাস মুসলমানমাত্রেই এক জাতি। ইসলাম যে জাতিভেদ মানে না।

বেগমের দাদার সঙ্গে রাজশাহীতে থাকতে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেই সুবাদে মানসকেও বেগম বলতেন ভাই। একদিন বিশ্বাস করে বলেন, "আমার মনের সাধ কি মিটবে না? মির্জার সঙ্গে কি রোকেয়ার হতে পারে না? কেন হতে পারে না?"

মানস কী করে বোঝাবে যে বাঙালী মুসলমানদের হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী মুসলমানরা অন্তরের সঙ্গে অবজ্ঞা করে। যেমন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ইংরেজরা। মানসও যেহেতু বাঙালী সেহেতু ওঁদের বাক্যবাণ তারও গায়ে বেঁধে। বেচারারা মুসলমান বলে নয়। বাঙালী বলেই অবজ্ঞেয়। বাঙালীরা নাকি মার্শাল রেস নয়। যোদ্ধা জাতি নয়। তবে, হ্যাঁ, বাঙালী সন্ত্রাসবাদীদের ওঁরা জুজুর মতো ডরান। ভয় থেকে আসে ভক্তি। সুভাষচন্দ্রকে ওঁরা ভক্তি করেন। গান্ধীজীকে মনে করেন দুর্বল বলেই অহিংস। এক হামিদ বাদে। হামিদ নিজে চরকা কাটেন, কেউ ভিক্ষা চাইতে গেলে তাকেও কাটান। খাদির উপরে তাঁর আস্থা আছে। কিন্তু অহিংসার উপরে নেই। তাই তিনি খাকসার হয়েছেন। পাঠান বলে পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী মুসলমানদের থেকে তিনি ভিন্ন।

মানসের চার মুসলিম সহকর্মীর মধ্যে একজন তো বাঙালী, আরেকজন হিন্দুস্থানী, তৃতীয়জন পাঞ্জাবী ও চতুর্থজন পাঠান। আশ্চর্যের কথা, পাঠানের সঙ্গেই তার মনের মিল বেশী। বোধহয় গান্ধীজীর সঙ্গে যে কারণে বাদশা খানের মনের মিল সেই কারণে মানসের সঙ্গেও হামিদের মনের মিল। হামিদ কিন্তু সোজা জানিয়ে দিয়েছেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসা কোনো কাজের নয়। আর তিনি নিজে প্যানইসলামিজমে বিশ্বাসবান। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম তাঁর কাছে পরধর্ম। অথচ কোরানের আদ্যোপান্ত তাঁর কণ্ঠস্থ হলেও তিনি গীতাও পড়েছেন, বাইবেলও পড়েছেন। মুহম্মদের পরে যদিও আর কোনো নবী জন্মাননি ও জন্মাবেন না তবু তাঁর আগেও তো আরো কয়েকজন নবী জন্মেছিলেন। তা নইলে তাঁকে শেষ নবী বলার অর্থ কী? তেমনি দু'জন নবী ছিলেন বাইবেলের যীশু ও গীতার কৃষ্ণ । না, এঁরা কেউ ভগবান বা ভগবানের পুত্র বা ভগবানের অবতার নন। কিন্তু মহাপুরুষ নিশ্চয়ই। এঁদের বাণী প্রণিধান করতে হয়। অত বড়ো না হলেও গান্ধীও মহাত্মা। মানস যখন বলে 'গান্ধী' হামিদ শুধরে দিয়ে বলেন, "মহাত্মা গান্ধী। তিনি একজন ইন্‌স্পায়ার্ড লীডার।" কিন্তু মহাত্মার মাহাত্ম্য স্বীকার করলেও তিনি আল্লামা মাশরিকির শিষ্য। যাঁর আসল নাম ইনায়তুল্লাহ্ খান্। তিনিও পাঠান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল হলো খাকসার পার্টি। মুসলিম লীগের সঙ্গে আড়াআড়ি। খোন্দকার জাফর হোসেন মুসলিম লীগের পক্ষপাতী। আলী হায়দারও কতকটা তাই। নেতা হিসাবে জিন্না সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধা আছে। জিন্না যে শিয়া

মুসলমান। হায়, ইকবাল যদি আরো কিছুদিন বাঁচতেন! ইমতিয়াজ মির্জা পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকন্দর হায়াৎ খানের অনুগামী ইউনিয়নিস্ট। হাফিজ জানেন যে এঁরা কেউ খাকসারদের মতো লড়নেওয়ালা নন। এঁরাও জানতেন যে খাকসাররা কোন্‌দিন হয়তো ইংরেজদের সঙ্গে মারামারি বাধিয়ে দেবে। তাই হাফিজ কতকটা একঘরে।

"কিন্তু আপনি তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, পাশ কাটিয়ে গেলেন, মিস্টার মল্লিক। আট আটটা প্রদেশের শাসনভার ছেড়ে অমন করে বনবাসে যাওয়ার তাৎপর্য কী? ওইটুকু করলেই কি ইংরেজ বিদায় হবে?" হামিদ সুধান।

"আরে, না। ওটা তো সবে যাত্রারম্ভ। কংগ্রেসকে অনেকদূর যেতে হবে। মহাযুদ্ধের মাঝখানে গণসত্যাগ্রহ বাধালে সে আন্দোলন হিংসার দিকেই মোড় নিতে পারে। কাজেই ফাঁসীর সম্ভাবনাও রয়েছে। কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডের। আমি যে কী দারুণ সঙ্কটে পড়ে গেছি, কী করে বোঝাব!" মানস করুণস্বরে বলে।

"আপনি সঙ্কটে পড়েছেন! কেন, আপনার কিসের সঙ্কট।" হামিদ বিস্মিত।

"শুনুন তা হলে খুলে বলি। জার্মানদের একটা প্রিয় গান আছে, হাইডেলবার্গে হৃদয় হারিয়েছি। আমি হাইডেলবার্গে গেছি, তবে হৃদয় হারাইনি। কিন্তু তার চেয়েও গুঢ়তর অর্থে হৃদয় হারিয়েছি ইউরোপে। সেইজন্যে আমার হয়েছে অর্জুনবিষাদ। কেমন করে আমি হিটলারকে হিট করতে গিয়ে জার্মানদের হাইডেলবার্গ, ড্রেসডেন, নুরেনবার্গ মিউনিকের মতো সুন্দর সুন্দর শহর ধ্বংস করব? কেমন করে বোমা বর্ষণ করব নারী ও শিশুদের উপর? কত বড়ো একটা বনেদী সংস্কৃতি জার্মানদের! কেমন করে তার হন্তারক হব? অথচ হিটলারের নাৎসী বাহিনী পোলাণ্ডের পর পশ্চিমমুখো হয়ে হলাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স আক্রমণ করবে আর পঙ্গপালের মতো সব সাফ করে দেবে এটাও কি আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি! বিশেষ করে প্যারীসের পতন! চ্যানেল পার হওয়া অবশ্য অত সহজ হবে না, তবু বিশ্বাস কী! ইংরেজদের ভয়ঙ্কর বিপদ। এই দুর্যোগের সুযোগ নেওয়া ভারতীয়দের পক্ষে মারাত্মক অন্যায় হবে। তাই আমি কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারছিনে। কিন্তু এইখানেই যদি ওরা থামত তা হলেও কথা ছিল। আমার আশঙ্কার কারণ আছে যে ওরা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে এই দুর্বিপাকের পূর্ণ সুযোগ নেবে। তা যদি হয় তবে আমার নিজের কর্তব্য কী হবে? আমি কী আমার দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সদলবলে জেলে পাঠাব? ম্যাজিস্ট্রেট হলে গুলীর হুকুম দেব? জজ হলে ফাঁসীর হুকুম দেব? না আমিও তার আগে পদত্যাগ করব? তা যদি করি তো চালাব কেমন করে? বিশ্বের সঙ্কট, ভারতের সঙ্কট, আমার সঙ্কট, সব একাকার হয়ে গেছে, হামিদ। অমার একমাত্র আশা ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজের একটা মিটমাট হবে। কিন্তু তার জন্যে চাই ইংরেজ পক্ষেরও অন্তঃপরিবর্তন। শেফার্ড কী বললেন, শুনবেন?" মানস বলতে চায়।

"শুনতে কৌতূহল হয়?" হামিদ শুনতে চান।

"কংগ্রেসমন্ত্রীরা সবাই একসঙ্গে পদত্যাগ করেছেন শুনে শেফার্ড আমাকে বললেন, জানেন ওঁরা কী রকম ধূর্ত? জেলে যাবেন বলে আগে থেকে জেল কোড সংশোধন করে বসে আছেন! এবার জেলে গেলে মহা আরামে বাস করবেন। ওদিকে লোকে ভাববে না জানি কত বড়ো ত্যাগবীর!" মানস হাফিজকে শোনায়।

"তা শেফার্ড সাহেবরাও তো কম ধূর্ত নন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস যা পেয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে ও বিনা শর্তে যুদ্ধের জন্যে জান মাল ধন সমর্পণ করবে। যেমন করেছেন পাঞ্জাবের সিকন্দর হায়াৎ খান্‌ ও তাঁর দল। কিন্তু কংগ্রেসকেও ভেবে দেখতে হবে যে এই পলায়নের রাজনীতি মুসলমানদের মনে কোন্‌ ধারণার সৃষ্টি করবে। লীগপন্থীরা বলাবলি করছেন এটা তাঁদের ফাঁকি দেবার

ছল। কোয়ালিশন এড়াবার কৌশল। কোয়ালিশনে রাজী হলে সবাই মিলে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দিয়ে কেন্দ্রেও রদবদল ঘটানো সম্ভব হতো। এতে লাভ কী হলো? বাকী তিনটে প্রদেশে তো অকংগ্রেসী মন্ত্রীরা কেউ পদত্যাগ করবেন না। যুদ্ধকালে জান মাল ধন বিনা শর্তে জোগাবেন। অর্ধেক সহযোগ ও অর্ধেক অসহযোগ কি দেশের পক্ষে স্ববিরোধী নীতি নয়। দেশ তো এমনি করেই দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের ইস্যুতে নয়। সহযোগী অংশটাই একদিন সহযোগিতার পুরস্কার প্রত্যাশা করবে। তাকে বঞ্চিত করে ব্রিটেন কি কংগ্রেসকে সর্বময় ক্ষমতা দেবে?" সংশয় প্রকাশ করেন হামিদ।

"না, না, কংগ্রেসের তেমন কোনো অভিসন্ধি নেই। কংগ্রেসও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে, যদি ভারতের ভাগ ভারতীয়দের নির্ধারণ করতে দেওয়া হয়। সেটা একটা কন্‌স্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে। আপাতত ভারত সরকার যেন গঠিত হয় জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে। তাঁদের মধ্যে লীগপন্থীরাও থাকবেন। সর্বময় ক্ষমতা আসবে যুদ্ধের পরে। কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতি সকলেরই হাতে। শুধুমাত্র কংগ্রেসের হাতে নয়? এক কথায় বলা যেতে পারে সাম্রাজ্যের হাত থেকে নেশনের হাতে। যে নেশন হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলেরই নেশন। শুধুমাত্র হিন্দুর নয়।" মানস পরিষ্কার করে বলে।

"ওইখানেই তো মুশকিল।" হামিদ মাথা নাড়েন। "আমরা কখনো আপনাদের সঙ্গে এক নেশন গড়ব না, মিস্টার মল্লিক। ন্যাশনালিজম আপনাদের কাছে একটা ধর্ম বিশেষ। আমাদের কাছে ইসলামই সব। সাম্রাজ্য যতদিন আছে আপনারা ও আমরা একঘাটে জল খাচ্ছি। কিন্তু সাম্রাজ্য যেদিন থাকবে না সেদিন দেখবেন মুসলমানের টানটা আরব, ইরান , তুরস্ক, আফগানিস্থানের দিকে। তাদের যারা শত্রু মুসলমানের তারা শত্রু। তাদের যারা মিত্র মুসলমানের তারা মিত্র। মুসলমানের কাছে তারা এলিয়েন নয়, তাদের কাছে মুসলমানও এলিয়েন নয়। ভারতীয় নেশনের থেকে ভিন্ন প্যান-ইসলামিক ব্রাদারহুড। বেছে নিতে হলে আমরা প্রথমটাকে নয়, দ্বিতীয়টাকেই বেছে নেব। আপনাদের সঙ্গে নেশন গড়লে আমাদের আরবে ইরানে বিদেশী ও বিজাতীয় মনে করবে। আমরাও তাদের বিদেশী ও বিজাতীয় মনে করব। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে আমরা সব দেশের মুসলমানই একজাতি। ইসলাম শুধু একটা ধর্মমত নয়, ইসলাম হচ্ছে একটা সমাজ, একটা রাষ্ট্র। আর খেলাফৎ হচ্ছে তার একটা মূল স্তম্ভ । খেলাফৎ উঠিয়ে দিয়ে তুরস্ক এক মহা অপরাধ করেছে। আমরা সেটাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যদি সুযোগ পাই। পাকিস্তান আমাদের পক্ষে একটা সুযোগ। আপনাদের পক্ষে একটা দুর্যোগ। ইংরেজ চলে গেলে মিলনের সূত্র আবিষ্কার করতে হবে। যেমন খেলাফৎ আন্দোলনের সময়। মহাত্মা গান্ধীকে উভয়পক্ষই নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁর প্রভাব কমেছে। জিন্না সাহেবের প্রভাব বেড়েছে। এখন চাই গান্ধী-জিন্না সমঝোতা। কংগ্রেস-লীগ চুক্তি। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমি নিজেই জিন্নাপন্থী নই। আমি একজন খাকসার। মুসলিম লীগই যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি দল এটা আমি মানিনে। আর ন্যাশনালিজম এই তত্ত্বটাই ইসলামের সঙ্গে বেখাপ। তাই ওদের মুখে মুসলিম নেশন বা পাকিস্তানী নেশন শুনলে আমি ফাঁপরে পড়ি।" হাফিজ প্রাণ খুলে প্রকাশ করেন।

"দেখুন, হাফিজ", মানস বলে, "মুসলমানরা যদি একাই একটা ভ্রাতৃসঙ্ঘ গঠন করতে চায় সেটা সম্পূর্ণ সম্ভব ও বাস্তব। কিন্তু ওরা যদি একাই একটা নেশন গঠন করবে বলে মনঃস্থির করে তবে সেটা কোথাও সম্ভব নয়, কোথাও বাস্তব নয়। না পাঞ্জাবে, না বাংলাদেশে, না উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে। সেসব প্রদেশের উপর হিন্দু ও শিখদেরও জন্মগত দাবী আছে। ইতিহাস বলে যে পাঞ্জাব শিখদের রাজ্য ছিল, এখনো থাকত, ইংরেজরা যদি শিখদের হারিয়ে না দিত। কিংবা শিখরা যদি ইংরেজদের অনুগত হতো। পাতিয়ালার শিখরা যেমন রয়েছে। মুসলমানরা মাইনরিটি হিসাবে যত ইচ্ছা সেফগার্ড চাইতে পারে, সেটা অন্যায় নয়, কিন্তু কতকগুলি প্রদেশে মেজরিটি বলে সেই প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাদের একক স্বার্থে পাকিস্তান চাইতে গেলে সেখানকার মাইনরিটির স্বার্থহানি হবে। তারা তো প্রতিরোধ

করাবেই। কংগ্রেস কি তাদের অসন্তুষ্ট করে লীগের সঙ্গে মিটমাট করতে সাহস পাবে? সে সাহস ইংরেজেরও কি আছে? শিখরা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পায় যে ব্রিটিশ রাজ তাদের পাকিস্তানের কর্তাদের হাতে সঁপে দিয়ে যাবেন তা হলে কি তারা জার্মানদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে জান দেবে, না আর একটা সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁপ দেবে? ইংরেজরা যদি শিখদের সঙ্গে বেইমানী করে তবে তাদের রাজত্ব আরো আগে খতম হবে। তার পর চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে স্থির হবে পাঞ্জাব কার। মুসলমানের না শিখের, শিখের সঙ্গে হিন্দুর। জিন্না সাহেব সুচতুর ব্যারিস্টার, কিন্তু তিনি কোন্ পক্ষের ব্যারিস্টার? মুসলিম মাইনরিটির না মুসলিম মেজরিটির?এতদিন তিনি ছিলেন মুসলিম মাইনরিটির ব্যারিস্টার। এখন তিনি মুসলিম মেজরিটির ব্যারিস্টার। যদি মুসলিম মেজরিটির ইচ্ছায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে অবশিষ্ট ভারতে মুসলিম মাইনরিটির কি হাল হবে? আর পাকিস্তানে হিন্দু শিখ মাইনরিটিদেরই কী দশা হবে? যেখানে যত সংখ্যালঘু আছে সকলেই বিপন্ন হবে। একবার ভেবে দেখুন জিন্না সাহেবের নিজের প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থা। তিনি না হয় পালিয়ে বাঁচবেন, কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের সবাই কি পালিয়ে বাঁচবে। তাদের ঘরবাড়ী ভূসম্পত্তির কী ব্যবস্থা হবে?"

হামিদ স্বীকার করেন যে এসব প্রশ্ন উঠবেই। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান যদি পাকিস্তান দাবী করে তবে তাদের সে দাবী এককথায় খারিজ করার মালিক কারা? হিন্দুরা না শিখরা না ইংরেজরা? স্বরাজের দাবীর মতো এটাও একটা বৈধ দাবী, কারণ এটার পেছনেও অধিকাংশের ইচ্ছা, অধিকাংশের ত্যাগ, অধিকাংশের স্বার্থ।

"না, মিস্টার মল্লিক, আমি লীগপন্থী না হলেও লীগের ওই দাবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব না। খান্ আবদুল গফ্ফার খান্ কেমন করে দাঁড়াবেন তিনিই জানেন। এটা এমন একটা প্রশ্ন যে প্রশ্নে মুসলমানদের দু'ভাগ করতে পারা যাবে না। মহাত্মা গান্ধী যদি তেমন কোনো মোহ পোষণ করেন তো একদিন তাঁর মোহভঙ্গ হবে। সব চেয়ে ভালো সমস্যাটাকে অত দূর গড়াতে না দেওয়া। সময় থাকতেই মিটিয়ে দেওয়া। কংগ্রেসকেই এগিয়ে আসতে হবে।"

"কিন্তু কংগ্রেস যতবারই এগিয়েছে ততবারই ব্যর্থ হয়েছে, হামিদ। লীগ নেতারা কিছুতেই তাঁদের শেষ তাসটি দেখাবেন না। কিছুতেই বলবেন না যে এই হচ্ছে তাঁদের চূড়ান্ত দাবী, এর পরে তাঁদের আর কোনো দাবী নেই। হাতের পাঁচটি সব সময়েই তাঁদের আস্তিনের তলায়। এই যে পাকিস্তানের দাবী এটাও কি চূড়ান্ত দাবী? এর আড়ালেও আছে একটা গোপন সূত্র। পাকিস্তান ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ সৈন্যকে ঘাঁটি দিতে পারবে, ব্রিটেনের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করতে পারবে। লীগ নেতারা যদি ইংরেজদের সঙ্গে তলে তলে গাঁটছড়া না বাঁধতেন তা হলে কবে মিটমাট হয়ে যেত। কিন্তু তাদের মূলনীতিটা হলো এই যে, তাঁরাই ভালো ছেলে, কংগ্রেস নেতারা মন্দ ছেলে, সুতরাং তাঁরা পাবেন ভালো ছেলে হওয়ার জন্যে পুরস্কার, আর কংগ্রেস নেতারা পাবেন মন্দ ছেলে হওয়ার জন্যে শাস্তি। এই মূলনীতির কাছে নতিস্বীকার করবে কে? কেনই বা করবে? এতে কি স্বাধীনতা সুগম হবে? স্বাধীনতার বদলে তার চেয়ে কম দামী জিনিস নিয়ে কী করবেন গান্ধী, নেহরু, বল্লভভাই, আজাদ, বাদশা খান্? কী করবেন সুভাষ, জয়প্রকাশ, মেহের আলী? কয়েকটা প্রদেশ বাদ গেলে এমন কোনো ক্ষতি হতো না, যদি বাকী সব প্রদেশ সত্যি সত্যি স্বাধীন হতো। কিন্তু তা তো হবার নয়। পাকিস্তানে ব্রিটিশ সৈন্য থাকতে ভারতের কোনো অংশই নিষ্কণ্টক হতে পারে না। এখানে লীগ স্বার্থ ও ব্রিটিশ স্বার্থ একাকার হয়ে গেছে। লীগ চাইবে পাকিস্তান রক্ষার জন্যে ব্রিটিশ প্রোটেকশন। আইন অনুসারে সে অধিকার তার থাকবে। সুতরাং তেমন কোনো আইনে সায় দেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে দেশকে বিকিয়ে দেবার সামিল। লীগের পেছনে যদি ভারতের মুসলমানরা সার বেঁধে দাঁড়ায় তা হলে সে এক ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডী হবে। স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিণত হবে দ্বিতীয় এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। কুরু পাণ্ডবের ভূমিকায় নামবে হিন্দু মুসলমান। গান্ধীজী কি তেমন মঞ্চে

কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করবেন? কখনো না। তিনি মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেহত্যাগ করবেন। আমরা যারা মুসলমানদের ভালোবাসি তাদের জীবন দুর্বহ হবে। আপনাদের অনেকের মধ্যেও তো হিন্দুদের প্রতি ভালোবাসার অভাব দেখিনে। তাঁদের জীবনও কি দুর্বহ হবে না? জিন্না সাহেব তো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা ছিলেন, তাঁর অনুগামীরা ছিলেন কেউ মুসলমান, কেউ পার্শী, কেউ হিন্দু। হঠাৎ ভোল বদল করে মুসলিম লীগের একচ্ছত্র অধিনায়ক হতে গেলেন কেন? তিনি যেমন হিন্দু ও পার্শীদের ছেড়েছেন তেমনি গান্ধীজীও মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ ও পার্শীদের ছাড়বেন, বিশুদ্ধ হিন্দু নেতায় পর্যবসিত হবেন, এটা কি একটা গণতান্ত্রিক দাবী না এটা একটা স্বৈরতন্ত্রী ফরমান? মুসলিম লীগ মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি এটা মেনে নিলে কংগ্রেস-পন্থী মুসলিমদের অস্তিত্ব থাকে না, আর কংগ্রেস-পন্থী মুসলিমদের অস্তিত্ব না থাকলে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের দিন সংগ্রামী মুসলিম বলতে একজনও থাকে না। সবাই ভালো ছেলে হয়ে ইংরেজের হাত থেকে কয়েকটা প্রদেশ পুরস্কার পাবে, এটা কি স্বাধীনতাপ্রিয় মুসলমানদের পক্ষে গৌরবের কথা? না সংগ্রাম বলতে বোঝায় ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম নয়, হিন্দুর সঙ্গেই সংগ্রাম? তাই যদি হয়ে থাকে তবে সে সংগ্রাম আজকের দিনের সংগ্রাম নয়, কালকের দিনের সংগ্রাম, আজকের প্রশ্ন কংগ্রেস কি ইংরেজকে যুদ্ধকালে আরো বিপন্ন করবে, না শুধুমাত্র যুদ্ধে অমত জানিয়ে দূরে সরে থাকবে? আমি তো মনে করি এই একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট। এতে ইংরেজকে বিব্রত করা হচ্ছে না, শুধুমাত্র নৈতিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা অন্যায় নয়, কারণ কংগ্রেস তো আমার মতো একটি ব্যক্তি নয় যে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই শ্রেয় বিবেচনা করে! কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল, দলকে কাজ করতে হয় অধিকাংশের মতামত অনুসারে, নইলে দল ভেঙে চৌচির হয়। আত্মরক্ষাই দলের প্রাথমিক কর্তব্য। সেদিক থেকে কংগ্রেসকে দোষ দিতে পারিনে। তবু আমি দুঃখিত যে হিটলারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সংগ্রাম করবে না, যতদিন না ইংরেজরা কংগ্রেসের পরামর্শ শোনে। এবার শোনা যাবে হিটলারের বিরুদ্ধে ভালো ছেলেরা কী বলেন। কে কে জান মাল ধন কবুল করে যুদ্ধে যোগ দেন। এখন পর্যন্ত একমাত্র সিকন্দর হায়াৎ খান্‌কেই অগ্রণী হতে দেখা যাচ্ছে। তিনি ভালো ছেলেদের চেয়েও আরো ভালো ছেলে। তাঁকে বিসর্জন দিয়ে কি লীগপন্থীদের পুরস্কার দেওয়া সম্ভব?'' মানস হেসে উড়িয়ে দেয়।

হামিদ মুচকি হেসে বলেন, ''সিকন্দর হায়াৎ খানের রাজভক্তির সঙ্গে আর কার রাজভক্তির তুলনা! তিনি যেমন করেই হোক যুদ্ধের জন্যে জওয়ান রিক্রুট করবেনই। শিখদের বোঝাবেন তোমরা যদি যুদ্ধে না যাও মুসলমানরা যাবে, অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতেই পড়বে, তাই দিয়ে তারাই ইংরেজের পরে পাঞ্জাবের রাজত্ব পাবে। মুসলমানদের বোঝাবেন তোমরা যদি যুদ্ধে না যাও শিখরা যাবে, অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতেই পড়বে। তারাই পরে পাঞ্জাবের মসনদে বসবে। হিন্দুদের বোঝাবেন তোমরা যদি যুদ্ধে না যাও মুসলমানরা যাবে, শিখরা যাবে। অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতেই পড়বে। তারাই মিলেমিশে তোমাদের উপর প্রভুত্ব করবে। এই প্রোপাগাণ্ডা খুবই ফলপ্রদ হয়েছে। দলে দলে রংরুট নাম লেখাচ্ছে আর বন্দুক ঘাড়ে করে মার্চ করে যাচ্ছে। একদল আওয়াজ দিচ্ছে 'আল্লা হো আকবর'। আরেক দল 'সৎ শ্রী অকাল'। তৃতীয় দল 'কালী মাই কী জয়'। না, 'বন্দে মাতরম্' নয়। দেশ বা নেশন বোধটাই ওদের কারো মধ্যে নেই। তবে পাঞ্জাবের জন্যে ওরা লড়তে তৈরি। এখন বিদেশী বাদশার জন্যে, পরে একই হাতিয়ার হাতে নিয়ে যে যার নিজের সম্প্রদায়ের জন্যে। যদি ইংরেজরা সত্যি সত্যি চলে যায় ও তার আগে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হয়।''

মানস চিন্তিত হয়ে বলে, ''লক্ষণ শুভ নয়। সৈনিকদের মধ্যেই যদি দেশবোধ বা নেশনবোধ না থাকে তবে তাদের দায়িত্ব কংগ্রেস নেবে। কিসের ভরসায়? আনুগত্যের? কার প্রতি আনুগত্যের? ক্ষমতার হস্তান্তর মানে তো সৈন্যদলের হস্তান্তর। সিভিল সার্ভিসের হস্তান্তর। সৈন্যদলের উপরে যদি

নির্ভর না করতে পারে তো সিভিল সার্ভিসের উপরেই বা নির্ভর করবে কিসের ভরসায়? আনুগত্যের? কার প্রতি আনুগত্যের? দেশবোধ বা নেশনবোধ যদি না থাকে। যে যার সম্প্রদায়ের জন্যেই যদি মমতা বোধ করে। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায় জুড়ে জুড়ে যে ঐক্য সে তো একটা জোড়াতালি। আনুগত্যের সঙ্গে আনুগত্য জুড়ে কি একটা মিশ্র আনুগত্য হয়? তেমন আনুগত্য একানুগত্যের মতো অটুট নয়। ক্ষমতার হস্তান্তর অসম্ভব নয়, কিন্তু আনুগত্যের হস্তান্তর কেমন করে সম্ভব হবে? সম্রাটের স্থান নেবেন কে? দেশীয় রাজন্যরাই বা কার কাছে আনুগত্যের শপথ নেবেন? সম্রাট যদি না থাকেন? সম্রাটের শূণ্যতা পূরণ করাই কঠিন, সাম্রাজ্যের শূণ্যতা পূরণ করা কঠিন নয়।"

হামিদের বয়স কম। তিনি অত বোঝেন না। বলেন, "সমস্যা রীতিমতো জটিল হবে যদি সাম্রাজ্যের স্থান নেয় নৈরাজ্য।"

এর উপরে আর কথা চলে না। কে না জানে যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদীদের সঙ্গে মিটমাট না হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গেও মিটমাট হবে না? আর মিটমাট না হলে কি ইংরেজরা অনন্তকাল সাম্রাজ্য পাহারা দেবে? তখন একতরফা সিংহাসন ত্যাগ। বিপ্লবীরা ঠিক যে জিনিসটি চায়। যে যেখানে পারে পুলিশ স্টেশন দখল করবে, রেলস্টেশন দখল করবে, রেডিও স্টেশন দখল করবে, সরকারী আফিস দখল করবে, ট্রেজারি দখল করে নেবে। কোথায় এত সৈন্য সামন্ত, কোথায় এত আমীর ওমরাহ, কে কাকে হটিয়ে দিয়ে একচ্ছত্র হবে? জমিদার মহাজন পুঁজিপতি শিল্পপতি যে যেখানে পারে পা দিয়ে ভোট দেবে। ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াশী, ঘোষাল, জাফর হোসেন প্রভৃতি ইম্পীরিয়াল অফিসাররা কলকাতায় বম্বেতে মাদ্রাজে করাচীতে জাহাজ ধরবেন কিংবা দিল্লীতে করাচীতে বিমান ধরবেন। দেশে থাকতে চাইলে চাকরি দিচ্ছে কে? কোন্ অথরিটি? মাইনে জোগাচ্ছে কে? কোন্ ট্রেজারি? কোন্ ব্যাঙ্ক? তখন পদত্যাগ করলেই বা কী? না করলেই বা কী? তখন পদমর্যাদা বলে কিছু থাকবে না। তখন পদযোগে পলায়ন, যদি বিপ্লবীরা পালাতে দেয়।

জাফর হোসেনের বাংলোয় গেলে মানস দেখতে পায় বেগম বসে আছেন মাথায় হাত দিয়ে। "বলুন দেখি, ভাই, কী করতে পারি? সেটলমেন্ট ক্যাম্পের দিন এগিয়ে আসছে। মির্জা তৈরি হচ্ছে চারমাসের জন্যে ক্যাম্পে যেতে। তারপরে কোথায় কোন্ মহকুমায় বদলী হবে কে জানে! কথাটা যখনি পাড়তে যাই পাশ কাটিয়ে যায়। বলে, আমাদের দেশে বিয়ে সাদী হয় বাপ মায়ের নির্বন্ধে। আমি তো মালিক নই, আমি কি করে কথা দেব? আপনারা কি পারবেন লাহোরে গিয়ে রোকেয়াকে দেখাতে? ওঁরা এদেশে আসবেন না। আমরা কী করে এত খাটো হই বলুন তো? হাজার হোক একটা জেলার পুলিশ সাহেব। লাটসাহেব ডাকেন খানা খেতে। প্রায়ই তো কলকাতায় যান মোলাকাৎ করতে। সাহেব সুবো এলে ক্লাবে পার্টি দেন। বাড়ীতেও আমি পর্দা মানি। শুধু আপনার মতো আপন জনের সামনে নয়।"

মানুষটি অতিশয় সরল। তাঁর একমাত্র ভাবনা সমাজে কেমন করে উঠবেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়াই সব নয়। অমন একটি সুপাত্র হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। আবার কবে তেমন সৌভাগ্য হবে। যদি না কলকাতায় বদলী হন। তার দেরি আছে। মানস তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। মেয়ের বয়স এমন কিছু হয়নি। চোদ্দ কি পনেরো। লেখাপড়ায় সিনিয়র কেমব্রিজও পেরোয়নি। নিদেনপক্ষে ম্যাট্রিক।

জাফর হোসেন আফসোস করে বলেন, "আরে, ভাই, শুধু ইংরেজী নয়, মুসলমানের মেয়েকে ভালো করে উর্দুটাও শিখতে হবে। নইলে তাকে মুসলমান বলে কেউ চিনবে না। উর্দু বলতে পারিনে বলে ওরা কি আমাদের কম ঘেন্না করে? আমাদের সবাইকে ভালো করে উর্দু শিখতে হবে। আমি তো কোনো মতে কাজ চালাতে পারি। আমার বেগম যে পদে পদে হোঁচট খান। মুসলিম সমাজে ওঁকে বার করি কেমন করে? ইংরেজ সমাজেও না। চেষ্টা করি ওঁর সঙ্গে উর্দুতে বাতচিৎ করতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

হাড়ে হাড়ে বাঙালী।"

"তা হলে আপনারা পাকিস্তান চাইছেন যে বড়ো!" মানস রঙ্গ করে।

"পাকিস্তান চাইছি কি সাধে?" জাফর হোসেন উষ্ণ হয়ে বলেন, "চাইছি আপনাদের চেয়ে খাটো না হতে। আপনারা চলেন ডালে ডালে তো আমরা চলি পাতায় পাতায়। আপনারা চান কংগ্রেস রাজ তো আমরা চাই মুসলিম লীগ রাজ। আপনারা চান মেজরিটি রুল তো আমরাও চাই মেজরিটি রুল। যে যার নিজের এলাকায়।" একটু ঠাণ্ডা হয়ে জুড়ে দেন, "মানছি এটা হিন্দু-শিখ মাইনরিটির পক্ষে উপাদেয় নয়। কিন্তু এর একমাত্র প্রতিকার কংগ্রেস লীগ ডায়ার্কি বা দ্বৈরাজ্য।"

"কিন্তু ভোটসংখ্যা সমান সমান হলে কাস্টিং ভোট দেবেন কে? প্রধানমন্ত্রী হবেন কে?" মানস ভেবে পায় না।

"প্রধানমন্ত্রী কি আমেরিকায় আছেন? একজন প্রেসিডেণ্ট থাকলেই হলো। পালা করে কংগ্রেস থেকে ও লীগ থেকে একজনকে প্রেসিডেন্ট করা যাবে। তা যদি না হয় তবে বড়লাটই হবেন প্রেসিডেণ্ট।" জাফর হোসেন মীমাংসা করেন।

"তার মানে ইংরেজই চিরকাল ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল চালাবে?" মানস হাসে।

"না, না, হাসির কথা নয়। ও ছাড়া আর কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়, মল্লিক। দ্বৈরাজ্য না হয় তো নৈরাজ্য। তখন জোর যার মুলুক তার। আপনারা গায়ের জোরে যতটা পারেন জবর দখল করবেন। আমরাও গায়ের জোরে যতটা পারি জবর দখল করব। এর নাম তলোয়ারের দ্বারা মীমাংসা। এটা যদি পছন্দ না হয় তো ইংরেজকে মধ্যস্থ করে পার্টিশন।" জাফর হোসেন দস্তুরমতো সীরিয়াস।

"তার মানে আর একটা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড?" মানস আশঙ্কা করে।

"মন্দ কী! প্রাদেশিক স্তরে তো সেটা মেনে নিয়েছেন।" হোসেন বলেন।

পান করতে নয়, পান খেতে ভালোবাসেন আলী হায়দার। অক্স্‌ফোর্ডফের্তা আই সি এস। টেনিসেও তাঁর অনীহা ছিল। বাড়ীতে বসে উর্দু পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখেন। মানসও লেখে বাংলা পত্রিকার জন্যে। সেইসূত্রে দু'জনের অন্তরঙ্গতা। কখনো মানস যায় হায়দারের ওখানে, কখনো হায়দার আসে মানসের এখানে।

"কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে, ভাই মল্লিক।" আলী হায়দার বলেন। "এর পরে আর কে চাইবে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের গাঁটছড়া বাঁধতে? কংগ্রেস যখন খুশি তার মন্ত্রীদের সরিয়ে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে লীগকেও তার মন্ত্রীদের সরিয়ে নিতে হবে। ইস্তফা দিতে না চাইলেও ইস্তফা দিতে হবে। এ কী জুলুম বলেন দেখি। মেজরিটি পদত্যাগ করলেই মাইনরিটিকে পদত্যাগ করতে হবে! আইনসভা বন্ধ থাকবে! মেজরিটি যদি ভুল করে মাইনরিটিও ভুল করবে!"

"ভাই হায়দার, আপনি কি বলতে চান কংগ্রেসের পলিসি ভুল?" মানস সুধায়।

"যুদ্ধকালে ব্রিটেনকে নাজেহাল করা তো প্রকারান্তরে জার্মানীকে সাহায্য করা। চাপ দিয়ে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট আদায় করাও তো প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় স্তরেও মেজরিটি রুল আদায় করা। মুসলিম লীগের তথা মুসলিম জনমতের এতে তীব্র আপত্তি। ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট যদি কংগ্রেস গভর্নমেণ্টেরই নামান্তর হয় তবে মুসলিম লীগ ওতে যোগ দেবে না। আর মুসলিম লীগ যোগ না দিলে মুসলিম জনমতও মেনে নেবে না। মুসলমানরা মোটের উপর মাইনরিটি হলেও কয়েকটা প্রদেশে তো মেজরিটি। সেসব প্রদেশের গভর্নমেণ্ট মুসলিম জনমতের চাপে কেন্দ্রীয় সরকারকে অমান্য করবে। প্রথমে চাইবে আরো বেশী ক্ষমতা। পরে চাইবে পুরোপুরি স্বাধীনতা। এরই একটা সহজবোধ্য নাম পাকিস্তান। পাকিস্তান একটাও হতে পারে, দুটোও হতে পারে, তিনটেও হতে পারে। যেখানেই হবে সেখানে মুসলিম মেজরিটি রুল।" হায়দার বিশদ করেন।

মানস চুপ করে শুনে যায়। ভেবে চিন্তে বলে, "কংগ্রেস তো হিন্দু মেজরিটি রুল চাইছে না, চাইছে ভারতীয় মেজরিটি রুল। দুটো এক জিনিস নয়। অথচ আপনার কথায় মনে হয় মুসলিম লীগ চাইছে ইহুদীদের ন্যাশনাল হোমের অনুসরণে বিশুদ্ধ মুসলিম ন্যাশনাল হোমল্যাণ্ড। সেখানে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট দেশভিত্তিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত হবে না, সেইজন্যে নেশন কথাটার কদর্থ করা হচ্ছে মুসলিম নেশন। পাকিস্তান সম্ভব হলে সে রাষ্ট্রে সব অমুসলমান রাতারাতি এলিয়েন হবে। আর বাকী স্থানে সব মুসলমান রাতারাতি এলিয়েন। দুই ধারেই কোটি কোটি লোক এলিয়েন। এলিয়েনদেরকে একপক্ষ সন্দেহ করবে অপরপক্ষের অনুগত বলে। তাদের লয়ালটি নিয়ে বিতর্ক বাধবে। হয় তারা পালিয়ে বাঁচবে, নয় তারা ঠায় মারা যাবে। আমরা বিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাব জার্মানীর ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের সপ্তদশ শতাব্দীর ত্রিশবছরের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি। শিখরা কি পাকিস্তান একমুহূর্তের জন্যে বরদাস্ত করবে? হিন্দুরা করতে পারে, তারা স্বভাবত সহিষ্ণু। তা বলে কলকাতা কেউ পাকিস্তানকে অমনি ছেড়ে দেবে না। অথবা দিল্লী। অথবা লাহোর। রক্তপাত অনিবার্য। কার কী পাওনা তা স্থির হবে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে। ইংরেজদের দেওয়া রোয়েদাদে নয়।"

"এ তো বড়ো আফসোসের কথা!" হায়দার বলেন পান মুখে দিয়ে, "হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। আমরা কি ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে আপসে বাঁটোয়ারা করতে পারিনে? পাকিস্তান কথাটার আসল মানে পার্টিশন। পার্টিশন মেনে নিলে নেশন শব্দটার কদর্থের কোনো প্রয়োজন থাকে না। জার্মানীতে যেটা দেখা গেল সেটাও তো একপ্রকার পার্টিশন। কোথাও ক্যাথলিক মেজরিটি, কোথাও প্রটেস্টোণ্ট মেজরিটি, যার যেখানে মেজরিটি তার সেখানে আধিপত্য। তা বলে মাইনরিটি বাঁচল না তা নয়। এখন তো ওরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে।"

।। সতেরো ।।

উকিলদের সঙ্গে মেলামেশা জজসাহেবদের রীতি নয়। পাছে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ রটে। কিন্তু রায় বাহাদুর বাসুদেব হালদার তো কেবল উকিল হিসাবে অগ্রগণ্য নন, মানুষ হিসাবেও সর্বজনশ্রদ্ধেয়। পিতার বয়সী এই সজ্জনের সঙ্গে মানস কথা বলতে যায় তার পুত্রশোকে শান্তির অন্বেষণে।

"আমাকেই বা শান্তির সন্ধান দেয় কে, মল্লিক সাহেব?" রায় বাহাদুর বলেন, "আমিও যে আপনার মতোই ভুক্তভোগী। দ্বিতীয়বার যখন ওই শোক পাই তখন আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। ভগবানকে বলি, প্রভু আর কত মার মারবে? আমাকে মারতে চাও, মারো। কিন্তু আমার বাছাদের বাঁচতে দাও। ওদের তো ঝরে পড়ার বয়স নয়। তাঁর হাতের মার খেতে খেতেই আমি হিউমিলিটি শিখেছি।"

এর পর তিনি বলেন তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী। কিছু কম ট্র্যাজিক নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "কিন্তু আছে, আছে এর মানে। আমরা বুঝিনে। আমরা অবোধ। এতে আমাদের ভগবানের দিকে টানে। আমরা তাঁর আরো কাছে যাই। আমার নিজের কথা যদি বলেন আমি বেটার ম্যান হয়েছি।"

মানস বলে, "কিন্তু ভগবান আছেন কি না তাই বা আমি নিশ্চিত জানব কেমন করে? অনবরত চেষ্টা করছি বিশ্বাস করতে। পারছিনে। ছেলেবেলায় করতুম। বড়ো হয়েও করেছি। কিন্তু পশ্চিমে গিয়ে দোটানায় পড়েছি। হ্যামলেটের মতো টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। আপনার মধ্যে একটা স্থিতির ভাব আছে। আমার মধ্যে শুধু অস্থিরতা।"

রায় বাহাদুর এর উত্তরে একটি গল্প বলেন। একটি মা সদ্য সন্তানহারা। কিন্তু সে কাঁদারও সময় পাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আগে তো আর সকলের জন্যে রান্নার জোগাড় করি। এদের খাইয়ে

দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপরে কাঁদতে বসব। দেখছ না আমার হাত জোড়া।

"মল্লিক সাহেব, আমিও তেমনি ভাববার সময় পাইনি ভগবান আছেন কি নেই, থাকলে এমন দুঃখ দেন কেন, না থাকলে এত লোক তাঁর কাছে দুঃখ জানায় কেন, তাঁকে পূজা করে কেন। তিনি কি প্রত্যেকের অভীষ্টপূরণের যন্ত্র? না প্রত্যেকেই তাঁর অভীষ্টপূরণের যন্ত্র? ভগবান কি মানুষের জন্যে, না মানুষ ভগবানের জন্যে? আমি তাই অত কথা ভাবিনে, ভাবি শুধু একটি কথা যে, যারা রয়েছে তাদের জন্যে রান্নার জোগাড় করতে হবে। সেই যারা শুধু আমার সংসারের ক'জন নয়, আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশী শহরবাসী জেলাবাসী সর্বসাধারণ। 'গড' আর 'গুড' দুটি আলাদা শব্দ নয়, একই শব্দ। গুড করতে করতেই আমি গডকে জানব। প্রার্থনা উপাসনা পূজা আর্চার জন্যে সময় কোথায়? এরা কি আমাকে একদণ্ড ফুরসৎ দেয়?" রায় বাহাদুর বলেন।

"গান্ধীজী আগেকার দিনে বলতেন, গড ইজ ট্রুথ। আজকাল বলেন, ট্রুথ ইজ গড। তেমনি ছেলেবেলায় আমি পড়েছি, গড ইজ গুড। আজ আপনার মুখে যা শুনছি তার মর্ম গুড ইজ গড। ঠিক কি না, রায় বাহাদুর?" মানস সুধায়।

"ঠিক। কিন্তু আমাকে অতবার রায় বাহাদুর বলে লজ্জা দেবেন না? ওটা শুনলে মনে হবে আমি যেন সাহেবদের চাটুকার। আমি তো সেই ভয়ে কোথাও যাইনে। নইলে আপনার ওখানেই আমাকে দেখতে পেতেন। আমার এখানে আপনাকে আসতে হতো না। শেফার্ড সাহেবকেও আসতে হয়।" রায় বাহাদুর মুচকি হাসেন।

এর পর থেকে তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁকে হালদার মশায় বলে ডাকতে হলো। আরেকদিন ভাববিনিময়ের জন্যে তাঁর ওখানে গেলে তিনি ওকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখেন। তারপর এসে মাফ চেয়ে বলেন, "আদালত থেকে ফিরেছি খুব দেরিতে। কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজলে মুখ ধুয়ে এই আপনার কাছে আসছি, মল্লিক সাহেব।"

"গঙ্গাজলে মুখ ধুতে হয় কেন? গঙ্গা তো এখানকার নদী নয়।" মানস অবাক। হালদার মশায় অপ্রতিভ হয়ে বলেন, "আদালত থেকে ফিরেই আমার প্রথম কাজ হয় গঙ্গাজলে মুখ প্রক্ষালন। উকিলের মুখ তো? কত মিছে কথা মুখে আনতে হয়। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। হাসছেন যে! বিশ্বাস হয় না?"

"কিন্তু উকিলকে এত মিছে কথা বলতে হয় কেন? না বললে ক্ষতি কী? সাক্ষীদের সত্য পাঠ করতে হয়, যাহা বলিব তাহা সত্য হইবে, সত্য ভিন্ন অসত্য হইবে না, সম্পূর্ণ সত্য হইবে।" মানস মনে করিয়ে দেয়।

"আপনাকে তো কখনো ওকালতি করতে হয়নি। হলে জানতেন যে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার খাদ না মেশালে মামলা টেকে না। দুই পক্ষই যে যার মামলার দুর্বল জায়গাগুলো মিথ্যা সাক্ষ্য বা মিথ্যা তর্ক দিয়ে মজবুৎ করে। এটা একটা ওপেন সীক্রেট। ভাগ্যিস মাথার উপরে ধর্মাবতার বলে একজন থাকেন। তিনিই তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে তৌল করে সত্যাসত্য নির্ধারণ করেন। তাই আমরা মনে শান্তি পাই। নইলে অশান্তিতে ছটফট করতুম। গঙ্গাজলেও পাপমোচন হতো না।" হালদার স্বীকার করেন।

"শুনে আমার বড়ো কষ্ট হয়, হালদার মশায়, যে সত্যাসত্য নির্ধারণের সমস্ত দায় আপনারা সঁপে দিয়েছেন বিচারকের উপরে। বিচারকরা কী করে নিঃসন্দেহ হবেন? সন্দেহের অবকাশ যদি থাকে তবে তো আসামীকে খালাস দিতে হবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ হবে কী করে? আর যদি আসামীর তেমন কোনো খুঁটির জোর না থাকে তবে তো তারই উপর অন্যায় করা হবে। আপনারা উকিলেরা অমন মার্সিনারি কেন? অপরাধীকেও জেনে শুনে প্রশ্রয় দেন কেন?" মানস মহাবিরক্ত হয়।

"এসব প্রশ্নের জবাব আপনি গোটা বারের কাছেই তলব করতে পারতেন। আমি একাই জবাবদিহি করি কী করে? সাধ্যমতো সত্য মামলাই হাতে নিই। আরো উপার্জনের লোভ সংবরণ করি। নিশ্চয়ই

জানেন যে উপার্জনের নিরিখে আমি পয়লা নম্বর নই। প্রতিদিনই অনুভব করি যে এ ব্যবসা এ দেশের উপযোগী নয়। কিন্তু কোন্‌টা যে এ দেশের উপযোগী তাও বলতে পারিনে। এইটুকুই বুঝি যে আমি পরের চাকর নই, স্বাধীনভাবে উপার্জন করি। সরকার আমাকে গভর্নমেণ্ট প্লীডার আর পাবলিক প্রোসিকিউটার করেছেন বলে আমি তাঁদের কেনা গোলাম নই, কিন্তু সরকারী মামলা আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে। পুলিশ না থাকলে ধন প্রাণ বিপন্ন হয়। পুলিশ কেস যদি সত্য ঘটনামূলক না হয় কী করা যায় বলুন! কালো ভেড়া তো সব দলেই আছে। পুলিশের মধ্যে থাকা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া ওরাই বা করবে কী? কেস যদি কাঁচা হয় তবে ওটা কি সব সময় পুলিশের দোষে? এক একটা মামলা দারুণ জটিল। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব সব মিলেই তো সত্য। জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গেলে মামলা ফেঁসে যেতে পারে। লোকটা খারাপ, কাজটা খারাপ, এই সরল ব্যাখ্যাই আদালতের সামনে পেশ করতে হয়। সত্যিকার অপরাধীও ভগবানের চোখে নিরপরাধ হতে পারে। কিন্তু আইনের চোখে অপরাধী হলেই আমাদের জিৎ। পসারও নির্ভর করে জয়পরাজয়ের উপরে। আদালতও একপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্র। সভ্য সমাজে বিচারশালা আছে বলেই শৃঙ্খলা আছে, শান্তি আছে। নয়তো আইনকে যে যার হাতে নিত। একমাত্র আইন হতো জঙ্গল আইন। কিংবা আফ্রিদি বা মোহ্‌মন্দদের মতো ব্লাড ফিউড। রহিম খান্‌ যদি করিম খান্‌কে মারে করিম খানের ছেলে রহিম খান্‌কে বা তার ছেলেকে মারবে। তার চেয়ে ভালো ইংরেজের আইন। করিম খানের ছেলে নয়, আদালতের বিচারই রহিমকে মারবে। আপনি আমি নিমিত্তমাত্র।" হালদার মশায় থামেন।

চায়ের সঙ্গে প্রচুর সুখাদ্য পরিবেশন করা হয়। হালদার অভুক্ত ছিলেন। মানসও তাঁর সঙ্গ রাখে। কিন্তু মনটা খচখচ করে।

"তা বলে সত্যের সঙ্গে অসত্যের মিশোল দিতে আপনার বিবেকে বাধে না?" মানস প্রশ্ন করে। "মামলাটা যাতে কেঁচে না যায়।"

হালদার মশায় সাফাই দিতে গিয়ে বলেন, "সে কাজ তো রাজনীতিক্ষেত্রে দু'বেলা দেখা যায়। গান্ধীজীও উকিল, জিন্না সাহেবও উকিল। বিলিতী মতে ওঁরা ব্যারিস্টার। যে যার দলের হয়ে মামলা সাজিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সামনে পেশ করেন। ওটাই ওঁদের পেশা না হোক নেশা। মামলার হার জিতের উপরেই ওঁদের নেতৃত্ব নির্ভর করে। গান্ধীজীর অবশ্য আরো একটা বলপরীক্ষার ক্ষেত্র আছে। সেখানকার নিয়ম সত্যাগ্রহ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। জিন্না সাহেবের একমাত্র ক্ষেত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট। সেখানেই পাশ হয় ভারত শাসন আইন। এখন কথা হলো কংগ্রেসের কেসটা কি ষোল আনা সত্য? আর মুসলিম লীগেরটা ষোলো আনা অসত্য? কংগ্রেসই কি নিখিল ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান? মুসলীম লীগ কি মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে না? আবার মুসলিম লীগ যদি বলে সে একাই সারা দেশের সব মুসলমানের প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান সেটাও কি অত্যুক্তি নয়? তা হলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা দাঁড়ান কোথায়! গান্ধীজীর মনে অভিমান, বড়লাট কেন তাঁর সঙ্গে জিন্না সাহেবকেও পরামর্শের জন্যে ডাকলেন, এক একজনের সঙ্গে এক একরকম কথা বললেন! গান্ধী কথা বলবেন বড়লাটের সঙ্গে সর্বভারতের পক্ষে। আর জিন্না কথা বলবেন গান্ধীর সঙ্গে মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশের পক্ষে। বড়লাটের সঙ্গে জিন্না সরাসরি কথা বলতে পারবেন না। তিনি উল্টো সুরে গাইলে ভারতের পক্ষে এককণ্ঠস্বর না হয়ে দুই কণ্ঠস্বর হবে। সেটা গান্ধীজীর মতে জাতীয় স্বাধীনতাবিরুদ্ধ। ওদিকে জিন্না সাহেব বলতে শুরু করেছেন যে জাতীয় বলতে বোঝায় হিন্দু জাতীয় তথা মুসলিম জাতীয়। দুই জাতীর জন্যে দুই বাসভূমি। দুই স্বতন্ত্র স্বাধীনতা। হায়! সত্য আর অসত্যের কী রকম মিশোল। এটা ক্রমে ক্রমে জন আদালতেও পেশ হবে। তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তারও পাল্টা দিতে যাচ্ছেন সাভারকর। ইংরেজদের মতো মুসলমানরাও বিদেশী তথা বিজেতা তথা বিধর্মী। অতএব এলিয়েন। একথা শুনলে

কোন্ মুসলমানের না রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তা দেখে হিন্দুর রক্তও যদি রাগে টগবগ করে তবে সে যা হবে তা ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়, মল্লিক সাহেব।''

মানস বলে, ''হ্যাঁ, মনে পড়ছে সাভারকরও আরেক ব্যারিস্টার।''

''কিন্তু একটা দিনও প্র্যাকটিস করেননি। তাই তাঁর কাছে ভারতের দশকোটি মুসলমান এলিয়েন। বেশীর ভাগই ধর্মান্তরিত হিন্দুবংশীয়। এদের সবাইকে এলিয়েন করতে গেলে প্রতিফল পেতে হবে সমসংখ্যক হিন্দুকেও।'' হালদার মশায় হুঁশিয়ারি দেন।

''সাভারকরের মামলাটা ডাহা মিথ্যা। যেমন হিটলার আর্যত্বের মামলা। ইহুদীদের অন্য গতি নেই, কিন্তু মুসলমানদের তো আছে। যেখানে তারা মেজরিটি সেখানে তারা পাকিস্তান কায়েম করলে হিন্দুরাই হবে এলিয়েন। তখন তাদের রক্ষা করবে কে? সাভারকর?'' মানস সে মামলা সরাসরি ডিসমিস করে।

''আপনি তো দু'দিন পরে বদলী হয়ে যাবেন, আমরাই মারা পড়ব, মল্লিক সাহেব। আর নয়তো ঘরবাড়ী ছেড়ে হিন্দুস্থানে আশ্রয় নেব।'' হালদার কুণ্ঠিত।

''না, না, ওসব কিছু হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইংরেজরা যদি যায় তো তার আগে নিরাপত্তার পাকা বন্দোবস্ত করে যাবে। যেমন মুসলমানের তেমনি হিন্দুর। আর গান্ধীজীও সচেতন। জিন্না সাহেবও ধর্মান্ধ নন।'' মানস অভয় দেয়।

'' দেখুন, মল্লিক সাহেব, শাহ্ জাহানের বেঁচে থাকা আর না থাকা এ দুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা তফাৎ ছিল। তা না হলে তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ বেধে গেল কেন? দারা নিঃসন্দেহে জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু তৈমুরবংশের প্রথা অনুসারে নির্বিবাদে পিতৃসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন না। ওয়ার অভ সাকসেসন অনিবার্য ছিল। পিতার মৃত্যু পর্যন্ত কারো তর সইল না। যে আগে দিল্লী দখল করতে পারবে তারই জবর দখল হবে ধারাবাহিক স্বত্ব। তাই দিল্লী অভিমুখে সশস্ত্র অভিযান। দারা হেরে যান, বন্দী হন, তখন শস্ত্রীদের ইচ্ছায় শাস্ত্রীরা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেন। সে দণ্ড স্বয়ং বাদশা শাহ্ জাহানও মকুব করতে অপারগ। এই তো ভারতের ঐতিহ্য। এদেশে এ ছাড়া আর কী আপনি আশা করেন? ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগি করে নিলেই চলত। সেকালে এটা দারা শিকোর মাথায় আসেনি। তাই মাথাটা কাটা গেল। একালে যদি কেউ আপসে ভাগাভাগির প্রস্তাব তোলেন তাঁকে কেমন করে বোঝাবেন যে সেটা আইনবিরুদ্ধ বা নীতিবিরুদ্ধ বা প্রথাবিরুদ্ধ বা স্বার্থবিরুদ্ধ? ইংরেজদের দেওয়া ভারতশাসন আইন আমাদের নেতাদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা নিজেরাই কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বসিয়ে স্বদেশের সংবিধান প্রণয়ন করতে চান। তার মানে ভারতের স্থায়ী সংবিধান এখনো প্রণীত ও গৃহীত হয়নি। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ বা সিন্ধুপ্রদেশ বা পঞ্চনদ যদি সেলফডিটারমিনেশনের দাবী তোলে সেটা কি অন্যায় দাবী? হ্যাঁ, অন্যায় হতো, যদি আগে থেকে একটা ঘরোয়া চুক্তি থাকত। ভাইয়ে ভাইয়ে চুক্তি। যেমন কংগ্রেস-লীগ চুক্তি। বা গান্ধী-জিন্না চুক্তি।'' হালদার মশায় চিন্তান্বিত।

মানস চিন্তা করে। বলে, ''এসব পয়েন্ট ভেবে দেখবার মতো। বাংলাদেশ যদি বেরিয়ে যেতে চায় কে তাকে বাধা দেবে? দিলে গৃহযুদ্ধ ডেকে আনা হবে। কিন্তু ওরা তো বাংলাদেশের সেলফ-ডিটারমিনেশনের কথা মুখে আনছে না। তুলছে মুসলিম সম্প্রদায়ের তথা মুসলিম নেশনের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী। বাংলাদেশ যদি দিল্লীর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় হিন্দুদের অনেকেও বিচ্ছিন্নতার পক্ষে ভোট দেবে। তারা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের উপর আস্থা হারিয়েছে। প্রশ্নটা সেক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন নয়। বাঙালী অবাঙালী প্রশ্ন। ফজলুল হক সাহেবকে হিন্দুরাও বিশ্বাস করে। তিনিও হিন্দুদের বিশ্বাস করেন। যে যাই বলুক বর্তমান মন্ত্রীসভা হিন্দুর স্বার্থবিরোধী নয়। কতক পরিমাণে জমিদারস্বার্থবিরোধী, বহু পরিমাণে মহাজনস্বার্থবিরোধী। কিন্তু জমিদার কি মুসলমানদের মধ্যে নেই? আর মহাজন বলতে কাবুলী

মহাজনও বোঝায়। এই তুচ্ছ কারণে হিন্দুরা এই মন্ত্রীমণ্ডলের আসন টলাতে যাবে না। তবে এঁরা যদি হিন্দু অফিসার শ্রেণীর উপর ক্রমাগত অবিচার করে যান তা হলে অবশ্য তাঁদের আস্থা হারাবেন। তাঁদের অনাস্থা ধীরে ধীরে তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যেও চারিয়ে যাবে। আমি পড়ে যাব উভয় সঙ্কটে। মুসলমানদের আমি ভালোবাসি। তারাও আমাকে ভালোবাসে। আমার মতে এটাও একটা তুচ্ছ কারণ। কিন্তু আমার সহকর্মী হিন্দু অফিসারদের কাছে জীবনমরণ প্রশ্ন। আমি পদত্যাগের জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছি।" মানস হালদারকে বিশ্বাসভাগী করে।

"সে কী কথা! আপনি পদত্যাগ করতে যাবেন কেন? আপনি কি এস্‌কেপিস্ট? এস্‌কেপ করে কোথায় পালাবেন আপনি? যেখানেই যাবেন সেখানেই দেখবেন হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে, সুতরাং মতান্তর আছে, মতান্তর থেকে মনান্তরও আছে, মনান্তর থেকে ঝগড়াঝাটিও আছে, ঝগড়াঝাটি থেকে দাঙ্গাহাঙ্গামাও আছে। শাহ্ জাহান বেঁচে থাকতেই এই। মারা গেলে তো দেশের অবস্থা চরমে উঠবে। পলায়ন এ সঙ্কটের সমাধান নয়। তা ছাড়া সঙ্কট থেকে হতভাগ্যদের ত্রাণ করবে কে, আপনি যদি পালান বা আমি যদি পালাই। না, মল্লিক সাহেব, আমরা পালাব না। অভয় দেব।" হালদারের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

পদত্যাগের জের টেনে মানস জিজ্ঞাসা করে কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ সম্বন্ধে হালদার মশায়ের মত কী। তিনি একটুও ইতস্তত না করে উত্তর দেন, "কাজটা চটকদার হতে পারে, কিন্তু অনুচিত হয়েছে, মল্লিক সাহেব। লাটসাহেব কি মন্ত্রীদের শাসনকর্মে হস্তক্ষেপ করেছিলেন? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কি কংগ্রেসকে প্রোভোকেশন দিয়েছিলেন? আরে, বাবা, ডিফেন্স এখনো হস্তান্তরিত হয়নি, ওটা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টেরই দায়িত্ব। ফরেন অ্যাফেয়ার্স? না, সেটাও হস্তান্তরিত হয়নি, সেটাও তাঁদেরই দায়িত্ব। গায়ে পড়ে ইস্তফা দেওয়ার তো কোনো সঙ্গত কারণই দেখিনে। আরো একবছর অপেক্ষা করলে হয়তো একটা সত্যিকার উপলক্ষ জুটত। যেমন যুদ্ধের জন্যে নতুন কোনো ট্যাক্স বসত। কিংবা জোর করে রংরুট ধরে নেওয়া হতো। ব্যাপারটা আসলে তা নয় কিন্তু। আর মাস কয়েক বাদে আবার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পদের জন্যে দলীয় নির্বাচন। সে সময় সুভাষ না হোক ওঁর বামপন্থী গোষ্ঠীর একজন দাঁড়াত ও হাই কমাণ্ডের নমিনীকে হারিয়ে দিত। এবার আর গান্ধীজীর কাছে যাওয়া নয়, সরাসরি আপনার লোক দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন। হাই কমাণ্ড ঢেলে সাজা। ফলে প্রত্যেকটি প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলের রদবদল। তখন তো গদী যেতই, গেলে বেড়াল কুকুর কাঁদত না। তাই এখন থেকেই মানে মানে বিদায়। যেন মস্ত বড়ো একটা ত্যাগ। একেই বলে, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।"

মানসও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে। তা বলে সে একমত নয়। বলে, "এটা কিন্তু কংগ্রেসনেতাদের প্রতি কটাক্ষপাত। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।"

"মল্লিক সাহেব," হালদার মাফ চেয়ে বলেন, "আপনি রাজনীতিক্ষেত্রে একটি খোকা। শেফার্ড সাহেবও যে আপনার চেয়ে বেশী বোঝেন তা নয়। দেখি তিনি মহা উত্তেজিত। কংগ্রেস মন্ত্রীরা জেলে যাবেন বলে আগেভাগে জেল কোড সংস্কার করে রেখেছেন। এমন ধড়িবাজ যে দল তাকে বিশ্বাস কী? আমি তখন কংগ্রেসের পক্ষেই ওকালতি করি। অথচ আপনি বলছেন কটাক্ষপাত। তা নয়। আমি সম্পূর্ণ নির্দলীয়। সুভাষও আমার কেউ নয়। তবে ওই বুড়োরা ছেলেটাকে ফাঁকি দিল। শেফার্ডকে বলি, সাহেব, তুমি যা ভেবেছ তা ঠিক নয়। ওরা মাস কয়েক বাদে ফিরে আসবেই। যখন দেখবে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পদে ওদেরই নমিনী জিতেছেন। সুভাষদের আরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন কি ওরা ধৈর্য ধরতে পারবে? ছেলেমানুষের দল। হৈ হৈ করে জেলে চলে যাবে। তখন মন্ত্রীদের পুনঃপ্রবেশ। ইতিমধ্যে একটা মুখরক্ষাকারী সূত্র খুঁজে বার করা চাই। যাতে মানে মানে প্রত্যাবর্তন সুগম হয়। নইলে লোকে দুয়ো দেবে। কেন্দ্রে একটা রদবদল কি সম্ভব নয়? শেফার্ড সাহেব তো রেগে টং। বললেন, আগে

তো ওরা মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা করুক। নইলে মুসলমানরা আমাদের সিপাহী সংগ্রহে বাগড়া দেবে। লড়াইটা চালাবে তবে কারা? ওইসব পেটমোটা হিন্দু বানিয়া? যাদের মুখপাত্র দ্যাট ম্যান গ্যাণ্ডী। আমি বলি, দ্যাট ম্যান ইজ আ মহাত্মা। তা শুনে সাহেব আরো ক্ষেপে যান। বলেন, টেল দ্যাট টু হিটলার। আমি তো বোকা বনে যাই। অথচ এই শেফার্ডই আমাকে মাস খানেক আগে বলেছেন, থ্যাঙ্ক গড ফর মহাটমা গ্যাণ্ডী। তখন গান্ধীজী সহানুভূতি জানিয়েছিলেন কিনা। সাহেবকে বলি, ইংরেজদের মতো কূটনীতি বিশারদ আর কোন্ জাত। ভেবে চিন্তে বার করুন আপনারা একটা কমপ্রমাইজ ফরমুলা। তা হলে দেখবেন কংগ্রেস নেতাদের বদলে যাবে মতটা। সাহেব গোস্যা হয়ে বলেন, গ্যাণ্ডী যা বলবেন কংগ্রেস নেতারা তাই করবেন। তাই কমপ্রমাইজ অসম্ভব।"

মানস আর কথা বাড়ায় না। করমর্দন করে বিদায় নেয়। তিনি তাকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, "দেখবেন গরিবের কথা বাসী হলেই ফলে।"

রোজগারের দিক থেকে পয়লা নম্বর উকিল মোহিনীমোহন ধর ইদানীং তাঁর ওকালতির পেশা ছেড়ে রাজনীতির নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন। সেটা কিন্তু কংগ্রেসী রাজনীতি নয়, যা নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। তিনি কৃষক প্রজা দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শীর্ষস্থানীয় নেতা। কংগ্রেসে যেমন বহু মুসলমান রয়েছেন কৃষক প্রজা দলেও বহু হিন্দু। দলটি ধর্মনিরপেক্ষ। যে যার ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে, যে যার সমাজে বিয়ে সাদী করতে পারে, কিন্তু রাজনীতি অর্থনীতির বেলা কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়, সবাই কৃষক প্রজা বা তাদের দরদী। বড়ো বড়ো মামলায় তিনি এখনো আদালতে হাজির হন, মোটা ফী নেন। কিন্তু তার বেশীর ভাগই চলে যায় দলের তহবিলে। তা দিয়ে তিনি একরাশ কর্মী পুষছেন। বেশীর ভাগই মুসলমান। আদালতের বাইরে তিনি সারাক্ষণ মুসলিম পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। নিষিদ্ধ মাংস ছাড়া আর সবই একসঙ্গে বসে খান। ফলে হিন্দু মহলে বিশেষ অপ্রিয়। হিন্দু উকিলরা বলেন তিনি প্রচ্ছন্ন মুসলমান। অথচ দুর্গাপূজায় কালীপূজায় সরস্বতী পূজায় হিন্দুরাই তাঁর কাছ থেকে চৌথ আদায় করে সব চেয়ে বেশী। তিনিও হাসিমুখে তাদের খাঁই মেটান। একশো দু'শো টাকা তাঁর কাছে নস্যি। কাউকে একশোর কমে দেন না। কাজেই হিন্দু ভোট নির্বাচনের দিন তাঁর পাতেও পড়ে।

তাঁর এক ভাই মুস্তাফীর সঙ্গে গতবার যুদ্ধে যান। সেই সুবাদে মুস্তাফীরও তিনি দাদা। একদিন মুস্তাফীর ওখানে নিমন্ত্রণে মানসের পাশে মোহিনীবাবুর আসন। নিমন্ত্রণের উপলক্ষ মিলির নিরাপদে ইংলণ্ডের মাটিতে পদার্পণ। ডোভার থেকেই সে লম্বা এক কেবল পাঠিয়েছে। বলেছে সব ভালো যার শেষ ভালো। ধন্যবাদ জানিয়েছে মানসকে, যূথিকাকে, শেফার্ডকে, জাফর হোসেনকে ও আরো কয়েকজনকে। তাই এঁদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন মুস্তাফী। শেফার্ড ও জাফর হোসেন এখন টুরে। তাঁদের খালি জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মোহিনীবাবুকে ও হালদার মশাইকে। বারের দুই নেতাকে। বিভিন্ন মামলায় এঁরা দু'জনেই পরস্পরের বিপরীতে দাঁড়ান। হালদারের ফী পরিমিত, ধরের অপরিমিত। তা বলে হালদারের হাত কম দরাজ নয়। কিন্তু তিনি রাজনীতির পেছনে টাকা ঢালেন না। তিনি ভোটপ্রার্থী নন, মন্ত্রিত্বপ্রার্থীও নন। মানস শুনেছিল যে হক সাহেব নাকি মোহিনীবাবুকেও মন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন, গভর্নর তাতে রাজী হননি। কৃষক প্রজাদের বরাদ্দ আসন শুধুমাত্র মুসলমানদেরই বরাতে জোটে।

এই নিয়ে কথা উঠতেই মোহিনীবাবু বলেন, "দশচক্রে ভগবান ভূত। হক সাহেবও আমাদের মৌলানা ইসলামাবাদীর মতে আর একটি র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। নিজের দল ছেড়ে এখন পরের দলে মোড়লী করছেন। বোঝেন না যে প্রথম সুযোগেই নাজিমউদ্দিন আর সুহরাবর্দী সাহেবরা ওঁকে মোড়ল পদ থেকে হটাবেন। জিন্নার সঙ্গে এতকাল তাঁর রেষারেষি চলছিল। এখন শুনছি মিটমাট হয়েছে। উপরের দিকের রাজনীতিতে জিন্না যা বলবেন তাই হবে। তলার দিকের রাজনীতিতে হক যা বলবেন তাই হবে। হক সাহেবও জপ করছেন পাকিস্তান। তবে একটা নয়, একজোড়া পাকিস্তান। কিন্তু কৃষক

প্রজা দল এতে কিছুতেই রাজী হতে পারে না, মিস্টার মল্লিক। এই ইস্যুতে দল ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যেতে পারে। আমরা কেন জিন্নার নির্দেশ মান্য করব? আমরা কেন পাকিস্তানে যাব?"

মানস দুঃখিত হয়ে বলে,"আপনাকে তা হলে রাজনীতিক্ষেত্রে অনাথ হতে হবে।"

"তার জন্যে আমি পরোয়া করিনে, মিস্টার মল্লিক। আমার পপুলারিটি তাতে একফোঁটাও কমবে না। পীপল আমার সঙ্গে। আমিও পীপলের সঙ্গে। মাসে যদি এক হপ্তা আদালতে যাই তো তাতেই আমার একমাসের খরচ উঠে আসে। তার বেশী এ বয়সে আর আমি চাইনে। ছেলেরা বড়ো হয়েছে, তারাও ভালোই করছে। আমার ছায়া সরিয়ে নিলে তারা আরো ভালো করবে। বুড়ো বয়সে লোকে কাশী বৃন্দাবন যায়। মনে করুন আমিও একহিসাবে তীর্থবাসী। আমার তীর্থ কিন্তু মানবতীর্থ। এদেশের কৃষক প্রজার দুর্দশার সীমা নেই। এদের জন্যে যদি কিছু না করে যাই তো স্বর্গে আমার স্থান হবে না, মিস্টার মল্লিক। স্বর্গ যদি থাকে।"

মুস্তাফী কথা কেড়ে নিয়ে বলেন,"কৃষক প্রজার দুর্দশার কথাটা তো শেফার্ড স্বীকারই করতে চান না, দাদা। শেফার্ডের মতে ওদেশের কৃষক প্রজাদের তুলনায় এদেশের কৃষক প্রজারা ভাগ্যবান। ওদেশে নাকি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেও জমিদারের অনুমতি নিতে হয়। বিংশ শতাব্দীতেও ফিউডাল ব্যবস্থা খাস বিলেতেই এখনো কায়েম রয়েছে। সাহেব আমাকে বলেন, হোয়াই নট সেণ্ড মোহিনী টু মাই কান্ট্রি? কৃষক প্রজা আন্দোলন এদেশের চেয়ে ওদেশেই আরো দরকার।"

"তার মানে," মোহিনীবাবু হেসে বলেন,"শেফার্ড আমাকে শীপ বানাতে চায়। আমি শীপ নই। আমি সাহেবদের কথায় ওঠ বস করিনে। তোমার ওই নাজিমউদ্দীনের মতো। কী কৌশলেই না ওরা ও বেচারাকে রাজনীতিতে টেনে এনেছে। প্রথমে করে দেয় গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর। সে পদ যখন উঠে যায় তখন ওকে বানাতে চায় নতুন মন্ত্রীমণ্ডলের প্রাইম মিনিস্টার। সার জন অ্যাণ্ডারসন আর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি গিয়ে বিদায়ী এম. এল. এ-দের জনে জনে সাধেন, আপনারা ফিরে এলে নাজিমউদ্দীনকেই প্রাইম মিনিস্টার করবেন। তা ও বেটাদের ফিরে আসতে দিচ্ছে কে? এদিকে যে হক সাহেবকে শীর্ষে রেখে কৃষক প্রজা দল গড়ে তুলেছি আমরা পুরনো কংগ্রেস ও খেলাফৎ কর্মীরা। আমরা যারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি যে কংগ্রেস আর কোথাও না হোক বাংলাদেশে রায়তের নয়, জমিদারের পক্ষে। খেলাফৎ তো একটা লস্ট কজ। খলিফা কোথায় যে খেলাফৎ থাকবে? খলিফার জায়গায় মুসলিম লীগ এখন জিন্নাকেই বানাতে চায় আরেক রকম খলিফা। বাংলার মুসলমান কেন তাঁকে খলিফার মতো মানবে? দিল ওরা হক সাহেবের দলকেই জিতিয়ে। নাজিম সাহেব গেলেন দুই জায়গায় হেরে। কিন্তু এমনি আমাদের অদৃষ্ট যে আমাদের দল একক মেজরিটি পায় না। কোয়ালিশনের জন্যে কংগ্রেসকে ডাকে। কংগ্রেস সাড়া দেয় না। ওদের পলিসি নাকি আর কোনো দলের সঙ্গে কোয়ালিশন না করা। ওদের ইচ্ছাটা নাকি এই যে হক সাহেবকেও সদলবলে কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে। তার পরে সবাই মিলে স্থির করবে কাকে প্রধানমন্ত্রী করবে। হক সাহেবকে না শরৎ বোসকে। সেটা হক সাহেব কেন মেনে নেবেন? এমন অবস্থায় মুসলিম লীগের সঙ্গেই হাত মেলাতে হয়। ওদের দলকেই ছেড়ে দিতে হয় হোম মিনিস্টার প্রভৃতি কয়েকটি হোমরা চোমরা গদী। স্বয়ং হক সাহেবকেই নিতে হয় একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রীর যা পাওনা। ক্রমে ক্রমে মালুম হয় মুসলিম লীগই সিনিয়র পার্টনার। কৃষক প্রজা দল জুনিয়র পার্টনার। নাজিম সাহেবই আরো শক্তিমান। হক সাহেবের মুখে এখন শোনা যাচ্ছে ন্যাশনালিস্ট যে সে মুসলিম নয়, ন্যাশনালিজম আর ইসলাম পরস্পরবিরোধী। আর একটি র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।"

মানস শুনে দুঃখিত হয় যে কৃষক প্রজাদের ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্ব ক্রমে ক্রমে ধর্মভিত্তিক নেতৃত্বের খপ্পরে পড়ে চরিত্রভ্রষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে কংগ্রেসের অদূরদর্শিতাও কম দায়ী নয়। বাংলাদেশে কোয়ালিশন ছাড়া আর কী সম্ভব হতে পারে? কস্মিন কালেও কি কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

করতে পারবে? বাধ্য হয়ে একদিন তাকে অপর একটি দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হবে। সেই দলটি যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায় আর তার প্রধান নেতা যদি ধর্মভিত্তিক দলের দলপতি হয়ে মুসলিম লীগকেই দলে ভারী করেন তা হলে আর কোয়ালিশনেরই প্রয়োজন হবে না। কংগ্রেস কোণঠাসা হবে।

হালদার মশায় এতক্ষণ মৌন ছিলেন। এবার তিনি মুখর হন। "পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে ক্রিকেটখেলার মতো একটা দল যখন ব্যাট ধরে তখন আরেকটা দল বল করে। একটা দল যখন গভর্নমেণ্ট চালায় আরেকটা দল তখন অপোজিশন চালায়। নির্বাচনে হার জিৎ নির্ধারিত হলে অপোজিশন হয়তো মেজরিটি পেয়ে গভর্নমেণ্ট গঠন করে, শাসকদল অপোজিশনের ভূমিকা নেয়। নয়তো শাসকদলই আবার শাসন চালায়, অপোজিশন বিরোধিতা করে যায়। কিন্তু বারবারই তার মনে এই আশা থাকে যে তার উপরেও একদিন শাসনভার বর্তাবে। এই আশাটুকু যদি নিবে যায় তবে সে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর উপরেই আস্থা হারায়। তখন সে বামপন্থী হয়ে থাকলে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে আর দক্ষিণপন্থী হয়ে থাকলে দেশভাগের। বামপন্থীরা এদেশে সংখ্যালঘু। নির্বাচনে যাদের জয়লাভ সুদূরপরাহত। তারা তো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবেই। তেমনি মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকরা জানেন যে নির্বাচনে তাঁরা কয়েকটি প্রদেশে মেজরিটি পেতে পারেন, কিন্তু সারা ভারতে কখনো নয়। তাঁদের একমাত্র আশা কংগ্রেসের সঙ্গে একটা চিরস্থায়ী চুক্তি, যেমন ১৯১৬ সালের লখ্‌নউ প্যাক্ট। কিন্তু চুক্তি হয় সমানে সমানে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসের ভোট মুসলিম লীগ ভোটের প্রায় তিন গুণ। ভবিষ্যতে সব ক'টা মুসলিম আসন লীগের দখলে এলেও কংগ্রেসের একক মেজরিটি অটল অনড়। সুতরাং কংগ্রেসই হবে কোয়ালিশনের সীনিয়র পার্টনার। যদি তেমন কোনো চুক্তি সম্ভব হয়। অথচ জিন্না সাহেবের স্বপ্ন ইকুয়াল পার্টনারশিপ। এ স্বপ্ন তিনি এখনো ছাড়েননি। তবে ক্রমশই উপলব্ধি করছেন যে হিন্দু জনমত কিছুতেই তাঁর সম্প্রদায়কে কেন্দ্রীয় স্তরে প্যারিটি দেবে না কিংবা শতকরা চল্লিশ অবধি ওয়েটেজ দেবে না, দিলে অন্যান্য সম্প্রদায়কেও অনুরূপ ওয়েটেজ দিয়ে হিন্দু মেজরিটিকে মাইনরিটিতে পরিণত হতে হয়। এই উপলব্ধি তাঁকে নিজের স্বপ্ন ছেড়ে ইকবালের স্বপ্ন দেখতে প্ররোচিত করছে। তার মানে পাকিস্তানের স্বপ্ন। মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে সংগঠিত হবে মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র। এক বা একাধিক। সেখানেও কংগ্রেস লীগ দুই দলই থাকবে, কিন্তু উল্টে যাবে তাদের ভূমিকা। লীগ হবে সীনিয়র পার্টনার, কংগ্রেস হবে জুনিয়র পার্টনার। যদি তারা চুক্তিবদ্ধ হয়। নয়তো লীগই তার একক মেজরিটির জোরে গভর্নমেণ্ট চালাবে, কংগ্রেস হবে তার অপোজিশন। দুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যেও পরে একটা চিরস্থায়ী আন্তর্জাতিক চুক্তি হতে পারে। যদি তারা হয় সমান সমান। সেকথা মনে রেখে জিন্নাসাহেব মুসলিমপ্রধান পাঁচটি প্রদেশের উপর ওয়েটেজ হিসাবে আসামকেও জুড়ে দিতে চান। ইকবালের স্বপ্নের চেয়ে জিন্না সাহেবের স্বপ্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে আরো মনোমুগ্ধকর। এখন কথা হচ্ছে হিন্দু বেড়ালের গলায় ঘন্টি বাঁধবে কে? ইংরেজ সরকার? না কনস্টিটুয়েন্ট আসেম্বলি? আমি তো ভেবে পাইনে। তোমার কী মনে হয়, মোহিনী?"

মোহিনীবাবু চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন। চোখ মেলে বলেন, "বাসুদেব, তুমি ধরে নিয়েছ যে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী ব্রিটেনের মতো ভারতেরও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? কমিউনিস্টরা তা বিশ্বাস করে না। প্রথম সুযোগেই ওরা ধনতন্ত্র তথা গণতন্ত্র লোপ করবে। লীগপন্থী মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, কিন্তু যেখানে তাঁদের সম্প্রদায়ের মেজরিটি সেখানেই করেন, অন্যত্র নয়। এই বিশ্বাস তাঁদের প্রেরণা দিচ্ছে পার্টিশনের। একান্নবর্তী পরিবারের ছোট ভাইয়ের মতো। কিংবা এজমালী জমিদারের ছোট শরিকের মতো। আমি তো এতে নীতিগতভাবে অন্যায়ের কিছু দেখিনে। অন্যায় যেটা সেটা হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দ্বিতীয় এক কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড হিসাবে গাওয়া।"

।। আঠারো ।।

যুদ্ধ এতদিন সুদূর ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল এই শহরের বুক দিয়েই সৈন্য চলাচল শুরু হয়ে গেছে। আস্ত একটা রেজিমেন্ট এখানে এসে বিশ্রাম করছে, কিছুদিন পরে দক্ষিণমুখে যাত্রা করবে। চট্টগ্রাম থেকে জলপথে বা স্থলপথে বর্মা মালয় সিঙ্গাপুর অভিমুখে। রেজিমেন্টাল মেস থেকে নিমন্ত্রণ এল। সান্ধ্য পার্টিতে মিস্টার ও মিসেস মল্লিক যদি যোগ দেন কমাণ্ডান্ট তাঁদের আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা করবেন।

যূথিকা সাফ শুনিয়ে দেয়, "তুমি চাকরি করছ। তুমি যেতে বাধ্য। আমি তো চাকরি করিনে। আমার কী বাধ্যবাধকতা!"

মানস চুপ করে থাকে। যুদ্ধযাত্রী মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গে তাঁদের সহধর্মিণীরা নেই। সিভিল অফিসারদের পত্নীরা যদি বিব্রত বোধ করেন তবে তাঁদের বাড়ীতে রেখে যাওয়াই তো সুবুদ্ধি। অথচ সেটাও অস্বস্তিকর। এসব ক্ষেত্রে ক্যাপটেন লাহার মতো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে হয়।

"কেন, তোমার মিসেস কি লাটসাহেবের পার্টিতে যোগ দেননি? তা হলে কমাণ্ডান্টের বেলা আপত্তি কিসের? ওরা বাঘও নয়, ভাল্লুকও নয়, খাসা ভদ্রলোক। মিলিটারিকে লোকে জমের মতো ভয় করে। যম ওরা ঠিক, কিন্তু যুদ্ধকালে ওদের শত্রুপক্ষের।" ক্যাপটেন লাহা অভয় দেন।

"না, দাদা, ওর আপত্তিটা ভয় থেকে নয়। কথা হচ্ছে, অত বড়ো একটা শোকের পর তুচ্ছ সামাজিকতায় ওর অরুচি ধরে গেছে। দেবে তো রকমারি মদ। ওসব আমাদের চলে না।" মানস যূথিকার হয়ে কৈফিয়ৎ দেয়।

"আরে, ওটা কি একটা কথা হলো! মদ খেতে না চাও খেয়ো না। সফ্‌ট ড্রিঙ্কস তোমাদের জন্যে মজুত থাকবে। কিন্তু মিসেস মল্লিক যদি না যান কথা উঠবে। কে না জানে তিনি এখানকার ফার্স্ট লেডী? মিসেস শেফার্ড বা মিসেস বার্লো না থাকলে মিসেস মল্লিকই তো এই স্টেশনের অগ্রগণ্য মহিলা। তিনি যোগ না দিলে আর কে তাঁর স্থান নেবেন? মিসেস হায়দার, মিসেস জাফর হোসেন এঁরা তো পর্দানশীন। মিসেস বক্‌সী? হা হা হা! আমি তো ভেবে পাইনে মিসেস মল্লিক থাকতে মিসেস বক্‌সী কী করে ফার্স্ট লেডীর পার্ট প্লে করবেন? এটা কি টেনিস?" ক্যাপটেন লাহা হাসি চাপতে পারেন না। টেনিসের বেলা ঐ মহিলা হাফপ্যান্ট পরে দৌড় ঝাঁপ করেন।

"তা হলে আপনিই বুঝিয়ে বলুন আপনার বোনকে।" মানস সে ভার নেবে না।

ক্যাপটেন লাহার কথা শুনে যূথিকা বলে, "আমাকে মাপ করবেন, দাদা। আমি ক্লাবেই যাইনে, ক্লাবের পার্টিতেই যোগ দিইনে, লক্ষ করেছেন নিশ্চয়। নেহাৎ অভদ্রতা হবে বলে পারিবারিক নিমন্ত্রণ এড়াতে পারিনে, কিন্তু এটা হলো পরিবারের বাইরের নিমন্ত্রণ। এ ধরনের জীবনে আমার বৈরাগ্য এসেছে। আগে যদি আসত তা হলে হয়তো অমন শোচনীয় ঘটনা ঘটত না। বিপথে চলেছি বলেই বিপদে পড়েছি। কারো জন্যে কিছু আটকায় না। কমাণ্ডান্টের পার্টি এসব ছোট খাটো মফস্বল স্টেশনে জমতে পারে না, এটা ওঁরাও জানেন। না জমলে মিসেস শেফার্ডকে বা মিসেস বার্লোকে দোষ দিন। কেন ওঁরা বিলেতে গিয়ে বসে আছেন?" যূথিকা অনুযোগ করে।

"মিসেস শেফার্ড এমনতরো ছোটখাটো স্টেশনে আরাম পান না বলেই বিলেতে সময় কাটাচ্ছেন। আর শেফার্ডও তো মাসে বিশ দিন টুর করে বেড়ান, বাকী দশ দিন স্তূপীকৃত ফাইল সাফ করেন। স্ত্রীকে সঙ্গ দেবেন কখন? আর বার্লোর তো ডিভোর্স ঘটে গেছে। কার দোষে তা বলতে পারব না। মিসেস

বার্লো এখন অন্যের স্ত্রী। তা ছাড়া বিলেতে থেকে ছেলের পড়াশুনা দেখাও তো মায়ের কর্তব্য।" ক্যাপটেন তাঁদের মুখরক্ষা করেন।

"মায়ের কর্তব্য যদি বলেন তো আমারও সেই একই জবাবদিহি। আমার কোলের বাছাকে কার কাছে রেখে আমি পার্টিতে যাব? আয়াদের আমি বিশ্বাস করিনে, তাই আয়া রাখিনে। বুড়ো বেয়ারাটি খুব বিশ্বাসী। ওই ওদের ভুলিয়ে রাখে বলেই আমি মাসে একদিন বা দু'দিন বেরোতে পারি। তাও দিনের বেলা। ব্যতিক্রম একবার কি দু'বার ঘটেছে। যেমন মধুমালতী মুস্তাফীর বিয়ে।" যূথিকা স্মরণ করে।

ক্যাপটেন লাহা এর পরে মিলির আনকোরা খবর জানতে আগ্রহ দেখান। আছে কেমন মেয়েটা আচমকা বিয়ে করে ও তড়িঘড়ি বিলেত গিয়ে? বিশেষত অমন যে চণ্ডিকা চামুণ্ডী।

যূথিকা সলজ্জভাবে বলে, "কোন্ মেয়ে না চায় বিয়ে থা করে সুখী হতে? আপনি তো মেয়েদের সবাইকে ফাঁকি দিলেন, দাদা। নইলে দেখতেন মিলির মতো কোনো এক চণ্ডিকা কি চামুণ্ডী আপনাকেও সুখী করে সুখী হতো। আপনার বোধহয় এদেশের মেয়েদের কাউকেই মনে ধরে না। মনটা বোধহয় পড়ে রয়েছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে কোনো এক রাজকন্যার কাছে।"

লাহা কবুল করেন যে ওটা ওঁর প্রথম বয়সের স্বপ্ন। যে বয়সে বিলেত যাবার কথা সে বয়সে মেসোপোটেমিয়ায় গিয়েই না সব গোলমাল হয়ে যায়। এখন কমাণ্ডান্টকে ধরে যদি ফ্রন্টে যেতে পারেন তা হলে আপাতত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় গেলেও পরে ফ্রান্সে বেলজিয়ামে জার্মানীতেও বদলী হতে পারেন। যুদ্ধের পরে তিনি অবসর নিয়ে বিলেতেই ঘর বাঁধবেন। তখন ঘরণীরও প্রয়োজন হবে। এদেশ থেকে কেই বা ওদেশে যেতে চাইবে? অগত্যা তিনি ওদেশেই স্বপ্নের সার্থকতা অন্বেষণ করবেন।

মিলির খবর যূথিকা ইতিমধ্যে আরো কিছু পেয়েছে। বেডফোর্ড কলেজ ওকে নিতে রাজী হয়নি। একজনের বদলে আরেকজনকে নেওয়া ওদের রীতি নয়। জুলি পড়াশুনা করেছিল বলে তার কেসটা ওরা সদয়ভাবে বিবেচনা করেছিল। মিলি তো এই প্রথম ওদেশে যাচ্ছে। এদেশের ডিগ্রীও নেই। বিপ্লব করতে গিয়ে কলেজের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। পরে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারত, অসুখের দরুন সেটাও হয়ে ওঠেনি। বেডফোর্ড ওসব অজুহাত শুনবে না। তাই বেচারিকে নিরাশ হতে হয়েছে। তা বলে সে বসে থাকেনি। বইয়ের দোকানের কাজে ভিড়ে গেছে। আর কিছু না হোক রোজগার তো হচ্ছে। ভদ্রঘরের মেয়েরা কেউ রোজগার করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। তা সে যত কমই হোক না কেন।

ক্যাপটেন লাহা হায় হায় করেন। "ওই অগ্নিকন্যার কিনা এই পরিণতি! বইয়ের দোকানের সেলসগার্ল! তার চেয়ে ও মেয়ে শহীদ হলো না কেন! লোকে ধন্য ধন্য করত। ওর বরের তো শুনেছিলুম লর্ড আর লেডীরা মুঠোর মধ্যে। তাঁদের একজন সুপারিশ করলে কলেজে জায়গা হতো না?"

"সুকুমারদা নাকি চেয়েছিলেন সার জন অ্যাণ্ডারসনের শরণ নিতে। কিন্তু মিলি নাকি আগুন হয়ে বলে, খবরদার! কালিদাস বলে গেছেন 'নাধমে লব্ধকামা'। উত্তমের কাছে অনুরোধ করে ব্যর্থতাও বরং ভালো, তবু অধমের কাছে হাতযোড় করে সিদ্ধিলাভ ভালো নয়। মিলি এখনো অগ্নিকন্যা, তবে ছাইঢাকা আগুন।" যূথিকা ওকে শ্রদ্ধা করে।

যেখানে ছিল ফাঁকা খেলার মাঠ সেখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠে সামরিক শিবির। হাজার দুয়েক সৈনিকের ছাউনি। একদিন সন্ধ্যাবেলা ক্যাপটেন লাহা তাঁর গাড়ীতে করে মানসকে নিয়ে যান অফিসারদের মেসে। রীতিরক্ষার জন্যে নামের কার্ড যথাস্থানে লগ্ন হয়। কমাণ্ডান্ট এসে সাদরে করমর্দন ও কুশলপ্রশ্ন করেন। তার পর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অতিথিদের সংখ্যা তো কম নয়। সারা শহরের গণ্যমান্যরা ভেঙে পড়েছেন মিলিটারির সঙ্গে মেলামেশা করতে। করমর্দন ও কুশলপ্রশ্ন। ওইপর্যন্ত বাক্যালাপ। বাকীটা পানভোজন।

ক্যাপটেন লাহা কমাণ্ডান্টের সঙ্গে লেপটে থাকেন। তিনিই তাঁর সিভিল অ্যাডভাইজার।

আমন্ত্রিতদের কার কী পরিচয় তিনিই শোনান। মানস চেষ্টা করে চেনা মানুষ খুঁজে পেতে বার করতে। মহিলাদের মধ্যে চোখে পড়ে মিসেস বক্‌সিকে। শাড়ী পরা প্রজাপতির মতো সাজে শোভা পাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করেন যূথিকাদি কোথায়। মানস মুশকিলে পড়ে। সত্য বলতে সাহসে কুলয় না, মিথ্যা বলতে বিবেকে বাধে, শুধু বলে, "তিনি মাফ চেয়েছেন।"

বক্‌সী তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে ফিক করে হাসেন। "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। নহিলে খরচ বাড়ে। সাজগোজের খরচ।"

বক্‌সীরাও উধাও হয়ে যান। এমন সময় একটি ইংরেজ ছোকরা এসে মানসকে খুব খাতির করে চারদিক ঘুরিয়ে দেখায়। লেফটেনান্ট উইলকিনসন তার নাম। বছর আঠারো কি উনিশ তার বয়স। এই সেদিন দেশ ছেড়ে সৈন্যদলে চাকরি করতে বেরিয়েছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। একদল ডোগরা জওয়ানকে নিয়ে ফ্রন্টে চলেছে। জানে না কী আছে কপালে। মরণ না বন্দীদশা।

"হোমের জন্যে মন কেমন করে না?" সস্নেহে প্রশ্ন করে মানস।

"ওয়েল, সার, হোমে যদি সবাই থাকতে চায় তো এম্পায়ার রক্ষা করবে কে? এটা কিন্তু আপনাদেরই দায়িত্ব। আপনারাও এগিয়ে আসুন। আমাদের এখানে ক্যাম্প করার উদ্দেশ্যই হলো আপনাদের মনে দেশরক্ষার আগ্রহ সঞ্চার করা। আর আপনাদের শুভকামনা লাভ করা। সৈনিকদের মনোবলের জন্যে এটারও প্রয়োজন।" ছেলেটি সরল মনে বলে যায়।

মানস বলতে পারত যে এর জন্যে চাই রাজনৈতিক মীমাংসা। কিন্তু বিষয়টা এত জটিল যে বিলেত থেকে সদ্য আগত একটি অল্পবয়সী সাব-অলটার্নকে বোঝানো যাবে না। বলে, "আমার আন্তরিক শুভকামনা সৈনিকদের সকলের প্রতি। পারলে আমিও লড়তে যেতুম। ইংলণ্ডকে রক্ষা করতে হবে। ভারতকেও।"

"অজস্র ধন্যবাদ,সার।" ছেলেটির চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা।

সাধারণ ইংরেজ সাধারণ ভারতীয়ের শত্রু নয়। সাধারণ ভারতীয়ও সাধারণ ইংরেজের শত্রু নয়। পরস্পরকে রক্ষা করাই পরস্পরের কর্তব্য। অথচ রাজনৈতিক কারণে জনমত ক্রমেই ব্রিটিশবিরোধী ও যুদ্ধে উদাসীন হচ্ছে। এখানে ওখানে শিবির করে জনসমর্থন করা অত সহজ নয়। কিন্তু যারা মৃত্যুপথযাত্রী তাদের মনোবল বজায় রাখাও জরুরি।

শিবিরে অনেক রকম অস্ত্র শস্ত্র ছিল। সেসব পরিদর্শন করা সন্ধ্যেবেলা সম্ভব নয়। তার জন্যে দিনের বেলা আবার আসতে হয়। কিন্তু সময় কখন? আদালতে ব্যস্ত থাকতে হবে। লেফটেনাণ্ট উইলকিনসন মানসকে গছিয়ে দেয় মেজর সুইনারটনের হাতে। প্রায় দ্বিগুণবয়সী বহুদর্শী অফিসার। যথেষ্ট সৌজন্য দেখান। মিলিটারি ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র লক্ষণ নেই। হয়তো আসন্ন অগ্নিপরীক্ষার চিন্তায় বিনম্র।

মেজর বলেন, "সেদিন কি আর আছে যখন আমিই আমার সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে উৎসাহভরে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তুম? সেটা হতো একটা অ্যাডভেঞ্চার। সামান্য তার প্রস্তুতি। আজকাল প্রত্যেকটি জওয়ানের প্রত্যেকটি অভাব অভিযোগ শুনতে হয়। রোজ পাঠাতে হয় ডাক্তারের কাছে। কারো চোখ খারাপ। কারো দাঁত খারাপ। কারো কান খারাপ। কারো পেটে ব্যথা। কারো পায়ে ব্যথা। কারো হাড়ে ব্যথা। এদের নিয়ে অন্তহীন ঝামেলা। এরা প্রাণ দিতে এসেছে, কিন্তু তার আগে যে যত পারে আদায় করে নিতে চায়। এদের প্রেরণা দেবার মতো ধর্মীয় উন্মাদনা কোথায়? কিন্তু তারই অনুরূপ জাতীয় উন্মাদনা? রাজার হুকুমে এরা লড়তে যাচ্ছে। রাজার নিমক খায়। নিমকহারামী করতে পারে না। আমরা এদের আনুগত্যের উপর নির্ভর করতে পারি। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ কি মার্সিনারিদের দিয়ে জেতা যায়?"

বিষম প্রশ্ন। এতদিন মার্সিনারিদের দিয়ে যুদ্ধ জেতা গেছে, সাম্রাজ্যের সঙ্কটে মার্সিনারিরাই সঙ্কটত্রাণ করেছে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা কি বর্তমান সঙ্কটে ফলপ্রদ হবে? নাৎসীরা মার্সিনারি নয়, ফাসিস্টরা মার্সিনারি নয়, জাপানীরা মার্সিনারি নয়। কারো প্রেরণার উৎস দেশপ্রেম। কারো প্রেরণার উৎস সামাজিক মতবাদ। কিন্তু এই ডোগরা জওয়ানদের প্রেরণার উৎস কী? রাজার প্রতি আনুগত্য? নিমকের প্রতি আনুগত্য? এদের মনোবল কি অগ্নিপরীক্ষার দিন অটুট থাকবে?

বলা বাহুল্য অফিসাররা সবাই মানসকে ড্রিঙ্কস অফার করেন। সে সফ্‌ট ড্রিঙ্কস চেয়ে নেয়। আর ক্যাপটেন ওদিকে দামী সুরা খেতে খেতে আধা মাতাল। তাঁকে কোনো মতে টেনে নিয়ে মানস গাড়ীতে তোলে।

তিনি তো প্রায় পাকাপাকি করে এনেছেন যে সিঙ্গাপুরে গিয়ে এই রেজিমেন্টে যোগ দেবেন। এই কমাণ্ডান্টের অধীনেই কাজ করবেন। কিন্তু মানস তাঁকে ঘাবড়িয়ে দেয়। বলে, "ক্যাপটেন ল, আপনি কি ঠিক জানেন যে এরা দুর্ধর্ষ জাপানীদের রুখতে না পেরে আত্মসমর্পণ করবে না? তারপর যুদ্ধবন্দী হয়ে বছরের পর বছর কাটাবে না?"

"কেন? কেন তোমার ওকথা মনে এল?" লাহা সুধান।

"জাপানীদের প্রেরণার উৎসে তাদের দেশের স্বাধীনতা, যার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করা যায়। আর ভারতীয়দের প্রেরণার উৎস তাদের রাজানুগত্য, যার জন্যে ত্যাগস্বীকারের সীমা আছে। দেখবেন, আপনাকে যেন জাপানে ধরে নিয়ে না যায়।" মানস ভয় দেখায়।

"হুঁ! আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। এত বড় কথা!" গর্জে ওঠেন লাহা। "আমাদের জওয়ানরা যখন 'দুর্গা মাইকী জয়' বলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন জাপানীসেনার 'বানজাই' আওয়াজ শূন্যে মিলিয়ে যাবে, ওরাও ঝাঁপ দিয়ে পড়বে, কিন্তু সমুদ্রের জলে। তারপর সাঁতার কেটে নিপ্পনে।" লাহা হা হা করে হেসে ওঠেন।

মানস আর কথা বাড়ায় না। লাহা গজ গজ করতে থাকেন। "তুমি একজন কবি, তাই ওসব তোমার কবিকল্পনা। আরে, কোথায় জাপান, আর কোথায় সিঙ্গাপুর। জাপানীরা আসবে কী করে সেখানে? জাহাজে করে? কেন, ইংরেজদেরও কি ড্রেডনট নেই? ডেস্ট্রয়ার নেই? টর্পেডো নেই? সিঙ্গাপুর বেস হল ব্রিটিশ নেভীর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। জাপানীরা সেখানে ল্যাণ্ড করতে পারবে না। তা হলে সেখানে ফৌজ মোতায়েন করা কেন? এরা যাচ্ছে কী করতে? এটা হলো মিলিটারি সীক্রেট। আমি যতদূর আঁচ করতে পারি এদের কাজ হবে আচমকা আক্রমণ প্রতিরোধ করা। আক্রমণ তো আকাশপথেও হতে পারে। যেটা ইংলণ্ডের লোক আশঙ্কা করছে সেটা মালয়ের লোকও আশঙ্কা করতে পারে। যদি জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে।" ক্যাপটেন যুক্তি দেখান।

মানস সেটা মেনে নিয়ে বলে,"তা হলেও আপনার ওদেশে না যাওয়াই শ্রেয়। সবচেয়ে খারাপটা যদি ঘটে তবে আপনার কপালে আছে বন্দী দশা। আপনার অন্তিম লক্ষ্য তো ইংলণ্ড। সেখানে যাবার পথ সিঙ্গাপুর দিয়ে নয়। আপনি বরং শিখদের সঙ্গে ফ্রান্সে বা বেলজিয়ামে যাবার উমেদারি করুন। বন্দী হলেও মুক্তির পর ইংলণ্ডে হাজির হবেন।"

লাহা মানসকে বাড়ী পৌঁছে দেন। যূথিকা তাঁকে ঠেস দিয়ে সুধায়, "ফার্স্ট লেডির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কে?"

"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল যে।" লাহা কারো নাম করেন না।

মানস বলে, "মহিলাদের সংখ্যা তো একটি কি দুটি। ফরাসী জমিদারপত্নী মাদাম দুপোঁ তাঁদের একজন। মিসেস বক্সীকেও লক্ষ করা গেল।"

এখন পরিষ্কার হয় আপনি মোড়ল কে। যূথিকার মুখে হাসি ফোটে।

এর পরে সে এক মোক্ষম প্রশ্ন করে। "তার পর মিলিটারি অফিসারদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান অফিসার কেউ ছিলেন? না সবাই ইউরোপীয়?"

লাহা মানসের দিকে তাকান। মানস লাহার দিকে। দু'জনেই অপ্রস্তুত। সেই যে ভারতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কতদূর প্রগতি হলো?

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না।" যূথিকা ঝাঁঝালো স্বরে বলে, "এত বড়ো দুর্দিনেও শাদা কালোর ভেদ যেমনকে তেমন। যুদ্ধে যাবার জন্যে নাচছেন যাঁরা তাঁদের কিছুতেই শিক্ষা হবে না? ইংরেজ যাচ্ছে তার সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। আপনারা যাবেন আপনাদের দাসত্ব রক্ষা করতে। ধিক্।"

এর পরে ক্যাপটেন লাহা আর এমুখো হন না। ক্লাবে মানসের সঙ্গে মুখোমুখি হলে শিষ্টাচার বিনিময়ের পর সরে পড়েন। বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর স্টেশনে ফিরে তল্পিতল্পা গোটান। মানসদের ওখানে পার্টিং কল দিতে এসে বিগলিত কণ্ঠে বলেন, "এখন আমি মেজর ল। মিলিটারী সার্জন হয়ে কলম্বো হয়ে সিঙ্গাপুরযাত্রী।"

ইতিমধ্যে সৌম্য ফিরে ছিল সেগাঁও থেকে। সেখানে হপ্তা তিনেক ও কলকাতায় হপ্তা খানেক কাটিয়ে সে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছে। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সঙ্গে ভাব বিনিময় করেছে।

"কবিগুরুর অভিমত কী?" জিজ্ঞাসা করে মানস, সৌম্যকে বাড়ীতে পেয়ে।

"জার্মানীতে তিনি শান্তিপ্রচার করে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন ওরা শান্তির পথেই ওদের মহত্ত্বের পরিচয় দেবে। এখন তাঁর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ ঘটেছে। এবার যিনি সর্বাধিনায়ক হয়েছেন তিনি সর্ব মানবের শত্রু। শুধু ব্রিটেনের বা ফ্রান্সের নয়। তাঁর বিরুদ্ধে সবাইকে অস্ত্র ধরতে হবে। ভারতকেও। হ্যাঁ, ব্রিটিশশাসিত ভারতকেও। ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া একসময় হবে। এই মুহূর্তে নয়।" সৌম্য যা শুনেছে তার মর্ম শোনায়।

"কবি তা হলে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে? আর সে সংগ্রাম জার্মানীর বিরুদ্ধে?" মানস খুঁটিয়ে জানতে চায়।

"হ্যাঁ, তাই তো মনে হলো।" সৌম্য স্মরণ করে। "নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যেন কৌরবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ওদের সঙ্গে লড়তে হবে অর্জুনের মতো। বিষাদমুক্ত হয়ে। বিদ্বেষমুক্ত হয়ে। অর্জুন তো নিমিত্তমাত্র।"

মানস এটা অনুমান করেছিল। অবাক হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে বলে আসছিলেন কিছুদিন থেকে। আর সে দানব দেশের শত্রু ইংরেজ নয়, মানবের শত্রু হিটলার।

"তারপর গান্ধীজীর কী অভিমত?" মানস মিলিয়ে দেখতে চায়।

"গান্ধীজী এখন পড়ে গেছেন মহা দোটানায়। তাঁর অনুগামীদের একদল অবিকল কবিগুরুর মতো নাৎসীবিরোধী, কৌরববিরোধী। তারা প্রথম সুযোগেই সশস্ত্র সংগ্রামে নামবে ইংরেজদের কাঁধে কাঁধ দিয়ে। অহিংসার ধার ধারবে না। কিন্তু পরে যদি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে হয় তখন কোন্ মুখে জনগণকে ডাক দেবে নিরস্ত্র সংগ্রামে অহিংসভাবে লড়তে? জনগণ বিভ্রান্ত হবে। সহিংস সংগ্রামে পরাস্ত হবে। গান্ধীজীর সারাজীবনের বাণী তখন ব্যর্থ হবে। তিনি তাঁর সেইসব অনুগামীদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের সুবিধা মতো অহিংসা ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর স্বধর্মে স্থির থাকতে হবে, তিনিও চান তাঁর বিশ্বাসের স্বাধীনতা। ইতিহাস একদিন তাঁকেও একটা সুযোগ দেবে। না দেয় তো স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ। তিনিও গীতার ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু কৌরবনিধনে অর্জুনের মতো নিমিত্তমাত্র হতে বলেন না। কৌরবকে জয় করতে হবে অহিংসা

দিয়ে। সেইখানেই গৌরব।'' সৌম্য অন্য অর্থ করে।

''এ তো গেল একদল অনুগামীর কথা। আরেকদল অনুগামী তাঁকে কোন্ দিকে টানতে চায়?'' মানস জিজ্ঞাসা করে।

''ওঁরা ঠিক অনুগামী নন, অহিংস উপায় সম্বন্ধে বরাবরই সন্দিহান। তবু একসঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, এখনো করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সে সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নাৎসীদের বিরুদ্ধে নয়। আর সে সংগ্রাম সর্বপ্রকার উপায়ে, কেবলমাত্র অহিংস উপায়ে নয়। গান্ধীজী এঁদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করেন। কিন্তু এঁদের নেতা হতে নারাজ। তিনি এঁদেরও স্বাধীনতা দিয়েছেন, এঁরা যে যার উপায়ে লড়াই করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে জড়াতে পারবেন না, তাঁর নির্দিষ্ট উপায়কেও না। অমন করলে জনগণ অহিংসার গুণাগুণ বিচার করতে শিখবে না। বিভ্রান্ত হবে। আর তাঁকেও হিংসার দায় বহন করতে হবে। প্রতিপক্ষ বিশ্বাস করবেন না যে তিনি হিংসার নির্দেশ দেননি। এটা তাঁর মিশনের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষেও যে হিতকর তাও নয়। তাঁকেও তাঁর কর্মপদ্ধতির স্বাধীনতা দিতে হবে। দেশের লোক বিচার করবে কার কর্মপদ্ধতি শ্রেয়স্কর।'' সৌম্য গান্ধীজীর বক্তব্য বিশদ করে।

''তা হলে এই দোটানার থেকে পরিত্রাণ কিসে?'' মানস অস্থির হয়।

''পরিত্রাণ গঠনের কাজে। আমাদের বলা হয়েছে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে। গ্রামের মানুষকে ভাত কাপড়ে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করতে। এক একটি গ্রাম হবে এক একটি রেপাবলিক। সর্বতোভাবে আত্মনির্ভর। সাত কোটি গ্রাম যদি আত্মনির্ভর হয় তবে তাদের সঙ্ঘশক্তিই তাদের রক্ষা করতে সমর্থ হবে। শস্ত্রশক্তির প্রয়োজন হবে না। তাদের সেই সঙ্ঘশক্তির দ্বারা যে আত্মরক্ষা সেটাই তো বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশরক্ষা। গান্ধীজী যতদূর দেখতে পাচ্ছেন অহিংস উপায়ে স্বাধীনতার পর দেশরক্ষার জন্যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন থাকবে না, যদি থাকে তবে সেটা হবে আকারে প্রকারে পরিমিত। আকস্মিক আক্রমণ রোধ করার জন্যে সে বাহিনী সীমান্তে মোতায়েন থাকবে। এই পর্যন্ত আপস করতে গান্ধীজী সম্মত। এর বেশী নয়। কিন্তু সেগাঁওতে গিয়ে দেখি গান্ধীজীকে ঘিরে রয়েছে একটি মিলিটারিস্ট লবি। তাদের মতে ভারতরাষ্ট্রকে দেশরক্ষার খাতিরে সশস্ত্র বাহিনী সবসময়ে তৈরি রাখতেই হবে আর সে বাহিনী আকারে প্রকারে চীন জাপানের সমতুল্য হবে। তেমন একটি বাহিনী গড়ে তুলতে হবে ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এখন থেকে গড়ে তোলাই সুবুদ্ধি। আগেকার দিন হলে ওরা বাধা দিত, এখন বুঝতে পেরেছে যে ভারতরক্ষা ওদের একার সাধ্য নয়, ভারতীয়দেরও সহযোগিতা চাই। তাই লক্ষ লক্ষ জওয়ান নেওয়া হবে, হাজার হাজার অফিসার। তাদের ইউরোপীয় রীতিতে ক্যাপটেন, মেজর, কর্নেল ইত্যাদি পদ দেওয়া হবে। যথাকালে প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত করা হবে। গান্ধীজীকে ঘিরে আরো একটি লবিও দেখা গেল। ক্যাপিটালিস্ট লবি। যুদ্ধকালে শিল্পায়নের অবাধ বিস্তৃতি হতে যাচ্ছে। সৈন্যদলের জন্যে সর্বপ্রকার উপকরণ এদেশেই নির্মিত হবে, বাইরে থেকে আমদানী বন্ধ থাকবে। বড়ো বড়ো কারখানা গড়ে উঠবে। শ্রমিকদেরও সুরাহা হবে। শুধু তাঁত চরকার দৌলতে তো একটা দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে না। জাপানের দিকে তাকান। এই দুই লবি এখন মেনকা রম্ভার মতো তপস্বীর তপোভঙ্গে সচেষ্ট।'' সৌম্য পরিহাস করে।

মানসের মনে পড়ে একটি বিলিতী পত্রিকার মন্তব্য। গান্ধীজীর পলিসিকে ওরা বলে গত মহাযুদ্ধে লেনিনের পলিসিরি মতো 'রেভোলিউশনারি ডিফিটিজম'। তিনি সাম্রাজ্যকে জয়ী হতে সাহায্য করবেন না, সে যদি পরাজিত হয় তবে তার সেই পরাজয়টাকে বিপ্লবের পাদপীঠ করবেন। অথচ অকালে আঘাত হানবেন না। অপেক্ষা করবেন।

''পত্রিকার এই মন্তব্য যথার্থ হলে গান্ধীজীই সত্যিকার বিপ্লবী, জবাহরলাল তা নন। যুদ্ধে সাহায্য করলে আর যাই হোক বিপ্লব হবে না। জবাহরলাল যা বিনা বিপ্লবে লাভ করবেন তা শান্তিপূর্ণভাবে

ক্ষমতা হস্তান্তর। ঠিক ওই জিনিসটা আবার সুভাষচন্দ্রের চোখে বীরত্ববর্জিত বুর্জোয়া কৌশল। জবাহরলাল লড়তে চান হিটলারের বিপক্ষে, তাই ইংরেজ তাঁর মিত্র। সুভাষচন্দ্র লড়তে চান ইংরেজের বিপক্ষে, তাই হিটলার তাঁর শত্রু নন। শত্রুর শত্রু। শত্রুর শত্রুকে মিত্র বলেই গণ্য করতে হয়।" মানস বোঝাতে চেষ্টা করে।

"বুঝেছি। কিন্তু কংগ্রেসের ঐতিহ্য সে রকম নয়। গত মহাযুদ্ধে কংগ্রেস একমত হয়ে ব্রিটেনের পক্ষ নিয়েছিল, এবার একমত না হলেও বিপরীত মতাবলম্বী নয়। অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য ব্রিটেনের পক্ষে, যদি কেন্দ্রীয় সরকারে বড়োরকম রদবদল হয়। তা না হলে তাঁরা নিরপেক্ষ থাকবেন, ব্রিটেনের পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াবেন না। এটাই হচ্ছে সাধারণ জনমত। এই যুদ্ধে ভারতের জনসাধারণ ইংরেজ বা জার্মান কারো সঙ্গে শত্রুতাও করতে চায় না, কারো সঙ্গে মিত্রতাও করতে চায় না। তাদের মত না নিয়ে তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা দুনিয়াকে জানাতে চায় যে তারা যুদ্ধে মত দেয়নি। পদত্যাগের দ্বারা কংগ্রেস মন্ত্রীরা ঠিক এইটুকুই বিশ্বজনকে জানিয়েছেন। এর বেশী না। এর থেকে কেউ যেন টেনে না নেন যে ভারতের জনমত ব্রিটেনের বিপক্ষে বা জার্মানীর পক্ষে। এটাও তো একটা ভুল ধারণা যে গান্ধীজী মনে করেন ব্রিটেন এ যুদ্ধে হেরে যাবে ও তখন তিনি বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। না, তিনি তাঁর বিপ্লববিরোধী অনুগামীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করেন না। বিচ্ছেদ যদি ঘটে তো অনিবার্য কারণেই ঘটবে। ক্যাপিটালিস্ট ও মিলিটারিস্টদের লবি যদি কংগ্রেসকে ইংরেজেব শিবিরে টেনে নিয়ে যায় ও ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে পার্টনার করে নেয় তা হলে গান্ধীজীকে আর কংগ্রেসের প্রয়োজন থাকবে না। গান্ধীজীরও আর কংগ্রেসকে প্রয়োজন থাকবে না। বিচ্ছেদ অনিবার্য হবে। লোকেও জানবে যে গান্ধী ও কংগ্রেস এক ও অভিন্ন নয়। যাঁরা তাঁর খুব কাছের মানুষ তাঁরা আঁচ করতে পারছেন যে এরকম একটা সম্ভাবনা তাঁর ভাবনার বাইরে নয়। যুদ্ধে যোগ দিলে ভারতের বণিকরা বড়ো বড়ো কনট্রাক্ট পাবেন, আর সৈনিকরাও পাবেন বড়ো বড়ো কমিশন। কংগ্রেস নেতারাও পাবেন বড়ো বড়ো পদ। সংবাদপত্র হাতে থাকলে জনমতকেও যুদ্ধানুরাগী করে তোলা শক্ত নয়। তবে কংগ্রেসের মুখ্য স্রোতটা গান্ধীজীকে ঘিরে। বড়লাটকে ঘিরে নয়। সেগাঁওকে ঘিরে। দিল্লীকে ঘিরে নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে বিচ্ছেদ যদি ঘটে তবে সেটা হবে মুখ্য স্রোতের সঙ্গে বিচ্ছেদ। যুদ্ধসমর্থকরা নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হবেন। পক্ষান্তরে বিপ্লবসমর্থকরাও ব্রিটেনের দুর্যোগকে ভারতের সুযোগ করতে গিয়ে মুখ্যস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।" সৌম্য এ বিষয়ে নিশ্চিত।

মানস অর্জুনের মতো যুদ্ধ করার কথাই ভাবছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তার মতের মিল। চেকোস্লোভাকিয়ার পর পোলাণ্ড, পোলাণ্ডের পর হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম, তার পরে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের এ কথা কল্পনা করতেই তাব রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তখন তার মনে থাকে না যে সে স্বাধীন নয় পরাধীন ভারতীয়, সে শ্বেতাঙ্গ নয়, সে কৃষ্ণাঙ্গ। সে একলাফে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে চায়, যূথিকা না থাকলে সে এতদিনে ঝাঁপ দিয়ে থাকত।

সৌম্য জানত মানস কী ভাবছিল। বলে, "দ্যাখ, মানস, ব্যক্তিহিসাবে তুমি যা ভালো মনে কর তা করবে, রবীন্দ্রনাথও তাই। কিন্তু দেশের লোককে সঙ্গে নিয়ে চলা যদি তোমার কর্তব্য হয় তবে দেখবে দেশের অধিকাংশ লোক তোমার সঙ্গে চলতে রাজী নয়। যুদ্ধে তাদের লাভ যত হবে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। তারা ধনে প্রাণে মারা যাবে। ফুলে ফেঁপে উঠবে আর ক'জন। ইংলণ্ডের সাধারণ লোক লড়তে চলবে তাদের অধিকার রক্ষা করতে। ভারতের লোকের অধিকার বলতে কী আছে? ভোট দেবার অধিকারও তো সকলের নেই। বুভুক্ষুকে তুমি আরো বুভুক্ষু করবে, বিবস্ত্রকে তুমি আরো বিবস্ত্র করবে, নির্জীবকে তুমি আরো নির্জীব করবে, নীট ফল যা হবে তা পরাজয়ের চেয়ে কী কম ভয়ঙ্কর? পরাজয়ও যে এড়াতে পারবে তাও নয়। ইংলণ্ড হেরে গেলে তুমিও হেরে যাবে। আর ইংলণ্ড

যে হারবে না তা তুমি কেমন করে জানলে ? এত বড়ো একটা সাম্রাজ্য নিয়ে যে বসে আছে তার নৈতিক শ্রেষ্ঠতা কোথায় ? ফ্রান্স, হলাণ্ড, বেলজিয়াম এদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতাই বা কোথায় ? এরা সাম্রাজ্যের মায়া কাটিয়ে এদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতা প্রমান করুক। তারপর তুমি এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অর্জুনের মতো লড়বে। আর তোমার দেশের লোকও ত্যাগস্বীকারে সম্মত হবে। নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী এদেশে খুব বেশী নেই। গান্ধীজীও সেকথা জানেন। সারা দেশে হয়তো হাজার খানেক লোক সব অবস্থায় যুদ্ধবিরোধী। এমনকি দেশ আক্রান্ত হলেও তাই। নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী যাঁরা তাঁদের মত তাঁদের ব্যক্তিগত মত। যেমন আমার। কিন্তু রাজনীতিগত ভাবে যুদ্ধবিরোধী এদেশের সাধারণ জনমত। এমনটি গত মহাযুদ্ধের বেলা দেখা যায়নি। গত মহাযুদ্ধের পর যেসব ঘটনা ঘটেছে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই যুদ্ধবিরোধিতা।

গান্ধীজী এর জন্যে দায়ী নন। উনি তো বরাবর ইংরেজদের বন্ধু। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে জুলু যুদ্ধে ও বুয়র যুদ্ধে উনি ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। গত মহাযুদ্ধেও তিনি সৈন্য সংগ্রহ করতে নেমেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সর্বতোভাবে যুদ্ধবিরোধী। যেমন নীতিগতভাবে তেমনি রাজনীতিগতভাবে। তাঁর মতের পরিবর্তন হতে পারে, যদি ইংলণ্ড তার সাম্রাজ্য থেকে নিজে মুক্ত হয় ও অপরকে মুক্তি দেয়। তা যদি হয় তবে যুদ্ধবিরোধী হলেও তিনি কংগ্রেসকে তাঁর মতবাদ অনুসরণ করতে বলবেন না। সে তার স্বকীয় নীতি অবলম্বন করবে। সে যদি স্বেচ্ছায় গান্ধীবাদী হয় সেকথা আলাদা। তা যদি হয় তবে পৃথিবীতে ভারতই হবে একমাত্র দেশ যে তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করবে যুদ্ধজয়ের জন্যে নয়, শান্তিজয়ের জন্যে। স্বাধীন ভারত অস্ত্র প্রতিযোগিতার দুষ্ট চক্র ভেদ করবে। নিরস্ত্রীকরণের জন্যে তৎপর হবে। হিটলার তো দুষ্ট চক্রেরই যোগফল। যেখানে দুষ্ট চক্র নেই সেখানে হিটলারও নেই। গান্ধীর জয়ই হিটলারের পরাজয়। বিনা যুদ্ধেই হিটলারের পরাজয় ঘটতে পারে। কিন্তু সেটাকে পরাজয় না বলে সম্মানজনক সন্ধি বলা যেতে পারে। মানুষে মানুষে যতরকম বিরোধ আছে সমস্তই মেটানো যায়, যদি হিংসা ছেড়ে মানুষ অহিংসার দিকে মোড় ঘোরে।"

মানস তারিফ করে। কিন্তু মানতে নারাজ হয়। "হিটলারের পরাজয় অত সহজ হবে না, সৌম্যদা। গান্ধীজী হয়তো ইংরেজকে হটাতে পারবেন, সত্যাগ্রহই তার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু হিটলারকে সম্ভব করেছে প্রথম মহাযুদ্ধ আর রুশ বিপ্লব। হিটলারকে হটাতে হলে শুধু সাম্রাজ্য ত্যাগই যথেষ্ট নয়, ধনতন্ত্রও বর্জন করতে হবে। ধনতন্ত্র তো ভারতেও প্রবল। কংগ্রেসও তার একটা শক্তিশালী ঘাঁটি।"

।। উনিশ ।।

যূথিকা বাড়ী ছিল না। বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। সৌম্যকে দেখে বলে, "ওমা, সৌম্যদা যে! কতক্ষণ!"

"এই কিছুক্ষণ। কই, মণি কোথায়? দীপক কোথায়?" সৌম্য খোঁজ করে।

"জেঠু" বলে মণিকা ছুটে আসে। "জ্যাঠামশায়" বলে দীপক। ওদের কাছে টেনে নিয়ে সৌম্য আদর করে। এবার দীপকের জন্যে এনেছে একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা আর মণিকার জন্যে ইলামবাজারের গালার খেলনা।

যূথিকা বলে, "মিলির খবর শুনেছ, আশা করি। লণ্ডনে পৌঁছে ঘর সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। বরের সঙ্গে দোকানেও যাওয়া আসা করছে ও দোকানে কাজ শিখছে। বর যদি যুদ্ধে যায় ওকেই তো দোকান চালাতে হবে। বুদ্ধিমতী মেয়ে। মিলির খবর তো পাচ্ছি, কিন্তু জুলির খবর কী?"

"ভালোই আছে। ওদের বাড়ী গিয়ে দেখা করেছি, একবেলা খেয়েছি। ওর মা শক্ কাটিয়ে উঠেছেন। সুকুমারের বিশ্বাসঘাতকতার শক্। আর জুলি তো এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন কত বড়ো

একটা আপদ থেকে বেঁচে গেছে। কৃতজ্ঞতার খাতিরে বিবাহ। তবে এখনো ওই চিন্তা। কবে বিপ্লব ঘটবে।" সৌম্য হাসে।

"তার মানে জেলে না গিয়ে ছাড়বে না। কী যে মতিগতি ও মেয়ের। কিন্তু এবার জেল থেকে উদ্ধার করবে কে? সুকুমার তো ফিরেও তাকাবে না। যাঁর তাকানো উচিত তিনিও তো জেলে গিয়ে বসে থাকবেন।" যূথিকা কটাক্ষ করে।

"কার কথা ভেবে ও কথা বললে, যূথী?" সৌম্য গম্ভীর হয়ে বলে, "যদি আমার কথা হয়ে থাকে তবে তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে বাপু আমাকে এবার জেলে যেতে দেবেন না। হিন্দু মুসলমানকে দৈনন্দিন কর্মে একসাথ করতে হবে। এটাই আমাব উপর বরাত। জাহাজ পুড়ছে দেখলে জাহাজের পাটাতনের উপর কাসাবিয়াঙ্কার মতো খাড়া থাকতে হবে। জলে ঝাঁপ দিয়ে আপনা বাঁচানো চলবে না। তবে তার আগে চেষ্টা করতে হবে জাহাজ যাতে না পোড়ে।" সৌম্য ধাঁধার মতো করে বলে।

"বুঝতে পারলুম না, সৌম্যদা।" যূথিকা আরো মনোযোগী হয়।

"বুঝতে পারলে না? স্বরাজ যতই নিকট হচ্ছে হিন্দু মুসলমানদের দ্বন্দ্ব ততই প্রকট হচ্ছে। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল ইংরেজরাই মুসলমানদের একদলকে খেলার ঘুঁটির মতো চালছে। এখন দেখছি মুসলমানদের একদলই ইংরেজদেরকে খেলার ঘুঁটির মতো চালছে। দশরথ এখন কৈকেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এতবড়ো দুর্বিপাকেও ইংরেজ কর্তারা কংগ্রেস কর্তাদের বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরতে পারছেন না। মুসলিম লীগ কর্তা চোখ রাঙাচ্ছেন। কংগ্রেসমন্ত্রীরা পদত্যাগ করছেন। কিন্তু সেটা তো অন্তর থেকে নয়। গান্ধীজী এখন মহা ভাবনায় পড়ে গেছেন। তিনি নিজে যুদ্ধবিরোধী। যুদ্ধের বিকল্প প্রচার ও প্রমাণ করাই তাঁর নিজের কাজ। কিন্তু কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নেতা হিসাবে তাঁকে তাঁর অনুগামীদেরও সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। সঙ্গে নিয়ে চলতে হলে পাঁচজনের পরামর্শ শুনতে হয়। শ্রদ্ধাভাজন সহযোগীরা তাঁকে বোঝাতে চাইছেন যে ইংলণ্ড, ফ্রান্সের মতো স্বাধীন দেশকেও আত্মরক্ষার জন্যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিতালি পাতাতে হয়। ভারত যদি স্বাধীন দেশ হতো তাকেও আত্মরক্ষার জন্যে মিতালি পাতাতে হতো। স্বাধীন ভারতের স্বাভাবিক মিতা চীন বা জাপান নয়, কমিউনিস্ট রাশিয়া তো নয়ই। ওই ইংলণ্ড বা ফ্রান্স। বা আমেরিকা। এটা যে শুধু ধনিকদের স্বার্থে তা নয়। শ্রমিকদের এত বেশী অধিকার আর কোথায় আছে? মধ্যবিত্তদেরও এতবেশী সিভিল লিবার্টি আর কোন্‌খানে? সুতরাং গান্ধীজী যেন যুদ্ধবিরোধিতা না করেন,কংগ্রেসকে করতে না বলেন। কংগ্রেস যেন মুসলিম লীগের মতোই ভালো ছেলে হয়। কংগ্রেস মন্দ ছেলে বলেই না মুসলিম লীগের প্রতি ইংরেজ সরকারের এত টান। এখন ভালো ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরো ভালো ছেলে হওয়াই পলিসি। গান্ধীজী এঁদের পরামর্শ চুপ করে শুনে যান। হ্যাঁ কি না বলেন না। তবে আমরা যাঁরা তাঁকে চিনি তাঁরা বিশ্বাস করতে পারিনে যে তিনি অমন করে আত্মবিলোপ করবেন। অন্তত একটি কণ্ঠস্বর এত বড়ো দেশে থাকবে যা কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে যুদ্ধবিরোধী। কংগ্রেসকে তিনি আরো সময় দেবেন মনঃস্থির করতে। দেখাই যাক না ভালো ছেলে মুসলিম লীগের দৌড় কতদূর। আর সেই দৌড়ের শেষে সে কোন্ পুরস্কার পাচ্ছে।" সৌম্য মুচকি হাসে।

এবার মুখ খোলে মানস। "তার মানে কি স্টেলমেট? ইংরেজ বনাম কংগ্রেস। কংগ্রেস বনাম লীগ।"

"সেইরকম তো মনে হচ্ছে। স্টেলমেট যাদের অসহ্য হবে তারা ইচ্ছে করলে বিপ্লব ঘোষণা করতে পারে, সাধ্য থাকলে ক্ষমতা দখল করতে পারে। নয়তো জুলির মতো দিনরাত ছফর করতে পারে। এবেলার থীসিস ওবেলা বদলে যায়। কেবল গালিগালাজ সার। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, বুর্জোয়া কংগ্রেস, ধনিকদের সখা গান্ধী। তবে কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের ফলে হাই কমাণ্ডের নিন্দাবাদ অত

বেশী জনপ্রিয় হচ্ছে না। বন্ধভাচারী সম্প্রদায়কে নিয়ে হাসি টিটকারি কমে আসছে। জুলির মা সেদিন বললেন, মন্ত্রীদের বেতন যদি আগেকার মতো পাঁচহাজার টাকা হতো তা হলে কি ওঁরা অত সহজে পদত্যাগ করতেন? পাঁচশো টাকা বলেই এটা সহজ হলো। গান্ধীজীর দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হবে।'' সৌম্য তার কলকাতার অভিজ্ঞতার কথা শোনায়।

''আর জুলি কী বলল?'' জানতে চায় যূথিকা।

''জুলি? ও কি কোনোদিন কংগ্রেসের প্রশংসা করেছে না করবে? জুলি বলল, পদত্যাগ করে ওঁরা পা দিয়ে ভোট দিয়েছেন। নইলে ওঁদের পদাঘাত করে তাড়াতে হতো। আর কিছুদিন বাদে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হতেন আবার সুভাষচন্দ্র বা তাঁর মতো আর কোনো বামপন্থী। তাঁর প্রথম কাজ হতো ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠন। তার পরের কাজ হাই কমাণ্ড কব্জা করে মন্ত্রীদের বিতাড়ন। তার পরে আপসহীন বিরামহীন সংগ্রাম। সেগাঁওতে বামপন্থীদের মুখেও এইসব কথা শুনেছি। জুলির ওটা ধ্বনি নয় প্রতিধ্বনি। ওঁরাও গান্ধীজীকে ভজাচ্ছেন যে আর কালবিলম্ব নয়। এই মুহূর্তেই সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া উচিত। নইলে উত্তাপ জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে। জনচিত্তের উত্তাপ। একবার জুড়িয়ে গেলে ফের কতকাল লাগবে তপ্ত করতে। দেশ প্রস্তুত, নেতারা প্রস্তুত নন। মুসলিম লীগের নেতাদের প্রসঙ্গ তুললে ওঁরা এককথায় উড়িয়ে দেন। জনাকতক নাইট আর নবাব আর খান্ বাহাদুর আর খান্ সাহেবই নাকি সরকারের পক্ষে। আর-সব মুসলমান নাকি বিরোধী পক্ষে। বিপ্লবে ঝাঁপ দেবার জন্যে নাকি পা বাড়িয়ে রয়েছে। জিন্নাকে এঁরা ধর্তব্যের মধ্যে আনতে রাজী নন। পার্লামেন্টের বাইরে নাকি ওঁর শিকড় নেই। গান্ধীজী এঁদের পরামর্শ চুপ করে শুনে যান। হ্যাঁ কি না বলেন না। তবে আমরা যারা তাঁকে চিনি তারা ভাবতেই পারিনে যে তিনি পরের মুখে ঝাল খেয়ে পরের কথায় নাচবেন।'' সৌম্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

''তাহলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় স্টেলমেট।''মানস মন্তব্য করে।

''তার মানে যুদ্ধে যারা সহযোগিতা করতে চায় তাদের কেউ বারণ করছে না। যারা করতে চায় না তাদেরও কেউ মানা করছে না। যারা সরকারের পক্ষে লড়তে চায় তারাও স্বাধীন। যারা সরকারের বিপক্ষে লড়তে চায় তারাও স্বাধীন। আর গান্ধীজী স্বাধীন, কিছু করা না করার স্বাধীনতা তাঁর আছে।'' সৌম্য তাৎপর্য শোনায়।

''বুঝতে পারছি। গান্ধীজী ও তাঁর দলবল এক নয়, বিভক্ত।'' যূথিকা বলে।

''যা বলেছ। এমন অবস্থায় নেতৃত্ব করা যায় না। অপেক্ষা করতে হয় যতদিন না একতা ফিরে আসে। কংগ্রেস যা করবে এক হয়ে করবে। সেটা যদি হয় যুদ্ধে সহযোগিতা তবে সেও ভালো। কিন্তু সেক্ষেত্রে গান্ধীজীকে নেতারূপে পাওয়া যাবে না। কংগ্রেস পাবে নারায়ণকে বাদ দিয়ে নারায়ণী সেনা। তিনিও নিশ্চিন্ত হয়ে বিবেকচালিত সত্যাগ্রহীর কর্তব্যে মন দেবেন। তিনি বেশী লোকজন চান না। যাঁদের চান তাঁরা হবে খাঁটি সোনা। আটজন কি দশজন হলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। উদ্দেশ্য স্বরাজ্যলাভ নয়। হিংসার উন্মত্ত পৃথ্বীর শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন। হিংসার উত্তরে হিংসা, তার উত্তরে হিংসা, এ ভাবে চললে পৃথিবী প্রাণশূন্য হবে। তখন সেই মরুভূমিতে বাস করবে কে? তেমন বিজয়ের কী মূল্য? পরাজিত হলেও তবু একটা প্রতিকার থাকে। সত্যাগ্রহ। কিন্তু হিটলারের উপর টেক্কা দিতে গিয়ে যা হবে তা মনুষ্যত্বের দিক থেকে দেউলেপনা। ভারতকে যদি আমরা এর আওতার বাইরে রাখতে না পারি তো অন্তত তার অল্প পাড়াগুলোকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। ভবিষ্যতের সত্যাগ্রহ সেই কোণ থেকে আসবে।'' সৌম্য দৃঢ়নিশ্চয়।

''তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয় তোমরা সত্যি সত্যি রেভোলিউশনারি ডিফিটিস্ট। যোদ্ধাদের মনোবল জোগাবে না। তারা হেরে গেলে সত্যাগ্রহ করবে। অবিকল লেনিনের স্ট্র্যাটেজী। শুধু ট্যাকটিস আলাদা।'' মানস রায় দেয়।

সৌম্য হেসে উঠে বলে, "আমরা ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু শুধু তোমার কাছেই। জুলি তো মনে করে আমরা রিয়াকশনারি।"

আবার জুলির প্রসঙ্গ ওঠে। যূথিকা বলে, "জুলিরা যা মনে করে তা যদি ঠিক না হয় তো বাধছে কোথায়? কেন ওদের সঙ্গে তোমাদের এত অমিল?"

সৌম্য একটু চমকে উঠে বলে, "তা কি এককথায় বোঝানো যায়? আমরা সবাই চাই দেশের স্বাধীনতা ও সমাজের পুনর্বিন্যাস। কিন্তু উদ্দেশ্য এক হলেও উপায় এক নয়। আর উপায় যদি এক না হয় তো উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্যও প্রভাবিত হয়। অহিংসা উপায়ের দ্বারা অর্জিত স্বাধীনতা রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান করে না, তার সৈন্যবল খর্ব করে, খর্বতর করে খর্বতমও করতে পারে। পুলিশবল সম্বন্ধেও সেই কথা। সমাজের পুনর্বিন্যাসে রাষ্ট্রের ভূমিকাও খর্ব থেকে খর্বতর, খর্বতর থেকে খর্বতম হয়। আমরা সেজন্যে উপায়শুদ্ধির উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করি। গান্ধীজী তো এখন বলতে শুরু করেছেন যে উপায়ই সব। উপায় থেকেই প্রবাহিত হবে উদ্দেশ্য। এণ্ড্স আগে থেকে স্থির করে নিয়ে সেই অনুসারে মীনস্ নয়। মীনস্ আগে থেকে স্থির করে নিয়ে সেই অনুসারে এণ্ড্স। এতে কংগ্রেস নেতারা ক্ষুব্ধ। একটা গান্ধীবিরোধী মনোভাব এখন কংগ্রেসের সকল অঙ্গে । কেবল বাম অঙ্গে নয়। উপায়কে অহিংস করতে যারা রাজী তারাও সেটাকে উদ্দেশ্যানুগ করতে চায়। উদেশ্যকে উপায়নুগ করতে চায় না অথচ সবাই মানে গান্ধী ভিন্ন আর কেউ নেতা হলে কংগ্রেস নতুন কোনো সংগ্রামে নামতে পারে না। যারা নামবে তারা কংগ্রেসের নামে নয়, অন্য কোনো সংস্থার নামেই নামবে। কংগ্রেস অপেক্ষা করবে যতদিন না গান্ধীজী নেতৃত্ব নিতে রাজী হন, আর গান্ধীজীও অপেক্ষা করবেন যতদিন না উপায় সম্বন্ধে কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে একমত হয়। জুলি যদি অপেক্ষা করতে নারাজ হয় তো পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। প্রাণে বাঁচলে হয়।"

যূথিকা কুপিত হয়ে বলে,"আর তুমি ওকে না বাঁচিয়ে আপনা বাঁচবে! ধিক্, সৌম্যদা, ধিক্! কে যে ওকে বাঁচাবে তাই ভাবি। এখন তো সুকুমারদাও নেই।"

"বোন, তুমি কেন ধরে নিচ্ছ যে আমরা অহিংসাবাদীরাও প্রাণে বাঁচব? দেশ যদি আক্রান্ত হয় তা হলে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। হিংসাবাদীরা যদি এ কাজ না করেন বা এতে ব্যর্থ হন তা হলে আমাদের উপরই বর্তাবে এ দায়। প্রাণ হাতে করেই আমাদের বাঁচতে হবে। যেমন সেগাঁওতে তেমনি প্রত্যেকটি গ্রামে। তাই প্রত্যেকটি গ্রামকেই করে তুলতে হবে সেগাঁও। গান্ধীজী একদিন না একদিন সংগ্রাম ঘোষণা করবেনই, যদি না ব্রিটিশ রাজশক্তি মানে মানে বিদায় হয়। সংগ্রাম শুরু হলে গান্ধীজীকে তো জেলের বাইরে পাওয়া যাবে না, তখন কর্মীদের প্রত্যেকেই হবে যে যার নেতা। কর্মীদের সবাইকে জেলে পুরলে সাধারণ মানুষকেই মনোনয়ন করতে হবে কে হবেন কোন্ অঞ্চলের নেতা। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে সাধারণ মানুষকেই শিখে নিতে হবে নেতৃত্বহীন সংগ্রামের পদ্ধতি। জুলি যদি আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে এ দায় বহন করতে রাজী হতো তা হলে আর ভাবনা কী ছিল? কিন্তু তা তো হবার নয়। জুলি সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে-কোনো উপায় অবলম্বন করতে ইচ্ছুক। যাদের সঙ্গে ওর নিত্য মেলামেশা তারা উপায় সম্বন্ধে নির্বিবেক। আমার উপরে ওর বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমার কর্মপন্থার উপরে বিশ্বাস নেই। ওকে নিয়ে আমি করব কী? আর আমাকে নিয়ে ওই বা কী করবে? তুমি কী চাও, তা আমি জানি। কিন্তু আমি, বোন, নিরুপায়।" সৌম্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

যূথিকাও হাল ছেড়ে দেয়। "যাক্, জুলি তো কচি খুকীটি নয়। কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হয় তা নিশ্চয় জানে। জেনে শুনে আগুনে ঝাঁপ দিলে পতঙ্গের মতো পুড়বে। আমার তো মনে হয় না সেরকম কিছু ঘটবে। গদী ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীরা এখন আবার জনপ্রিয় হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এখন শান্ত। আর সেই বিক্ষোভই তো ছিল জুলির ধারণায় বিপ্লবের পূর্বাভাস। জুলিরা আসলে

ছিল মন্ত্রীত্ববিরোধী। ওদের উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রীদের মসনদ থেকে নামানো। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তার চেয়ে বৃহত্তর উদ্দেশ্য ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়ন। তার ফলে দেশ অরাজক হলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। তারপরে দেশ আক্রান্ত হলে সশস্ত্র প্রতিরোধ। এসব দায়িত্ব জুলিরা সাধ করে ঘাড়ে নিতে যায় তো পশতাবে। জনতা যদি ওদের পেছনে থাকে তো জনতাই ওদের ফেলে পালাবে। ওরা বিচ্ছিন্ন হবে।"

মানস বলে,"বিপ্লব যেদেশে ঘটেছে সেদেশে এটাও দেখা গেছে যে বিপ্লবীরা কেবল তাদের শাসক বা শোষকদের নিপাত করেই নিরস্ত হয় না, নিজেদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকেও নির্মূল করে। ফ্রান্সের ইতিহাসে এটা আমরা দেখেছি, রাশিয়ার ইতিহাসে দেখেছি। কে বলতে পারে যে ভারতের ইতিহাসেও বিপ্লবীরা পরস্পরকে মেরে সাবাড় করবে না? তারপর এটাও কি দেখা যায় না যে বিপ্লবীদের ঘরোয়া গোলমাল মেটাতে ডাক পড়ে সেনাপতিদের, আর তাঁদেরই একজন সর্বেসর্বা হয়ে বিপ্লবকেই বিসর্জন দেন? যেমন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। রাশিয়ায় এখনো সে পর্যায় আসেনি। কে বলতে পারে যে কখনো আসবে না? স্টালিন নিজেই একদিন সেনাপতি হয়ে নেপোলিয়নের ভূমিকায় নামতে পারেন। জুলিরা ইংরেজকে হটাবে হয়তো, কিন্তু যাঁর জন্য পথ করে দেবে তিনি যে ওদের আমল দেবেন তা নয়। মাথা তুলতে গেলেই মাথা গুঁড়িয়ে দেবেন।"

"সম্ভব। সম্ভব। সব কিছুই সম্ভব।" সৌম্য সায় দেয়, "তবে আমরা যে এতকাল ধরে তপস্যা করলুম সেও সম্ভাবনাময়। কোথাও কি এর তুলনা বা নজির আছে? যুদ্ধের সময় তো মন্ত্রীদের হাত দিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, আত্মসাৎও হয়। আমাদের মন্ত্রীরা সে প্রলোভন স্বেচ্ছায় দমন করেছেন। জুলির মতো অনেকেই ভাবছে এটা একটা চাল। কিন্তু ওঁরা যদি চাল ফিরিয়ে না নেন, গোটা যুদ্ধকালটাই সরকারের বাইরে কাটিয়ে দেন, তা হলে লোকে ওঁদেরই জয়ধ্বনি করবে।"

যূথিকার ওই একই ভাবনা। "এখন জুলির কী হবে বলতে পারো? সময় আর জোয়ার আর কতকাল সবুর করবে? জোয়ার যদি সত্যি সত্যি আসে জুলিও কি জোয়ারের মুখে ভেসে যাবে? আহা, বেচারি।"

"কী করে বলব, বোন?" সৌম্য ঈষৎ হাসে। "যুদ্ধ ঘোষণা করলেই যেমন যুদ্ধে নামা যায় না বিপ্লব ঘোষণা করলেই তেমনি বিপ্লবে এগোনো যায় না। ইংরেজরা যুদ্ধ ঘোষণা করেও করছে না। তেমনি জুলিরা বিপ্লব ঘোষণা করেও বিপ্লবে ঝাঁপ দেবে না। বন্দী হওয়া বোধ হয় জুলির বরাতে নেই। খুব সম্ভব ও মাটির তলায় যাবে। ওই যাকে বলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড।"

"আণ্ডারগ্রাউণ্ড।" যূথিকা অবাক হয়। "আণ্ডারগ্রাউণ্ড তো লণ্ডনের টিউব রেলকে বলে। এদেশে তো টিউব রেল নেই। ওরা কি তা হলে মাটির তলায় সুড়ং খুঁড়বে?" না পাহাড় পর্বতে গিয়ে সুড়ং খুঁজবে?"

"হা হা! আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাকে বলে জানো না?" মানস হেসে ওঠে। "ওই কলকাতা শহরেই এমন সব গলি ঘুঁজি আছে যেখানে গা ঢাকা দিলে টিকটিকির বাবাও টের পাবে না। জুলিকে ওর বন্ধুরা পিস্তল বা রিভলভারের মতো বেমালুম পাচার করে দেবে। ও নিরাপদে থাকবে। তবে ওর মা বেচারির বিপদ।"

"সেটা তো ভালো নয়। ওঁকে বাঁচাবে কে?" যূথিকা উদ্বিগ্ন হয়।

সৌম্য অভয় দিয়ে বলে, "উনিও নিরাপদ। ওঁর এক জামাই স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল। তবে ধরপাকড় একচোট হবেই। জুলিকে বাগে পেলে ওরা ছাড়বে না। কিন্তু জুলিরাও কম ফন্দীবাজ নয়। ওদেরও টিকিটিকি আছে। ঠিক সময়ে খবর এনে দেবে। শঠে শাঠ্যম্। এই হলো ওদের নীতি। হিংসার জুটি অসত্য। যেমন অহিংসার জুটি সত্য। জুলিদের সঙ্গে আমাদের নীতিগত বিভেদ।"

"কিন্তু আরো একটা ভয়ের সম্ভাবনা আছে, সৌম্যদা সেটা শুধু ওদের বেলা নয় তোমাদের

বেলাও খাটে। কিছু একটা করতে গেলেই ইংরেজরা রটাবে যে জুলির দল হিটলারের পঞ্চমবাহিনী। আর তোমরাও হিটলারের শত্রুর শত্রু, অতএব মিত্র। এই অপবাদের ছাপ জেলখানার দাগের চেয়েও কলঙ্কময়। কুকুরকে বদনাম দিয়ে ওরা ফাঁসীতে লটকাবে।" মানস হুঁশিয়ারি দেয়।

সৌম্য স্বীকার করে যে ইংরেজদের হাতে ওটাও একটা তাস। বেকায়দায় পড়লে ওই তাসটা খেলবে। কিন্তু সব অপবাদ কাটিয়ে ওঠবার ক্ষমতা তাদের আছে যারা সত্য আর অহিংসায় কায়মনোবাক্যে প্রতিষ্ঠিত। একথা অবশ্য জুলিদের বেলা পুরোপুরি খাটে না। হুঁশিয়ারিটা জুলিদের মনে রাখা উচিত।

মানস বলে,"ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যুদ্ধকালে প্রথমেই নিহত হয় সত্য। সত্য কী কাউকেই জানতে দেওয়া হয় না। অসত্য বা অর্ধসত্যকেই সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এটা তো মহাভারতের যুগ থেকেই চলে আসছে। যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যনিষ্ঠ পুরুষকেও উচ্চারণ করতে হয় অশ্বত্থামা হতো ইতি গজঃ। শেষ অংশটুকু ঢাক ঢোল পিটিয়ে চাপা দেওয়া হয়। একালের যুদ্ধে যত রকম মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে সব চেয়ে সাংঘাতিক হচ্ছে কলম আর কণ্ঠ। ইংরেজরা বড়াই করে যে গত মহাযুদ্ধে তারা প্রোপাগাণ্ডার জোরেই জিতেছে। এবারেও তাই হবে, সৌম্যদা। যুদ্ধকালে যদি ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দাও তোমাদের বিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে কুৎসা রটনা হবে খবরের কাগজে আর রেডিয়োতে। তোমরা আত্মসমর্থন করতে গেলে দেখবে সভাসমিতি নিষেধ, মুখ ফুটে কিছু বলতে গেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ছাপার উপরে কড়া সেনসরশিপ, চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত। তোমরা একেবারে নীরব। সুতরাং সর্বপ্রকারে নিরস্ত্র।"

সেগাঁওতে যে এ নিয়ে আলোচনা হয়নি তা নয়। সৌম্য বলে,"বাপুর সব চেয়ে অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌রাই তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন যে যুদ্ধকালে ইংরেজরা তাঁকে একটি কথাও বলতে দেবে না। সত্যকে বিকৃত করতেও ওদের বাধবে না। এ তোমার লবণ সত্যাগ্রহ নয় যে আমেরিকা থেকে ওয়েব মিলার এসে রিপোর্ট করবেন। আর আমেরিকার লোক ব্রিটিশ অত্যাচারের বিবরণ পড়ে স্তম্ভিত হবে। এবার কোনো রিপোর্টারকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। কেউ রিপোর্ট পাঠালে মাঝপথে আটক করা হবে। আর আমেরিকানরাও যদি হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তো রিপোর্ট ছাপছেই বা কে? পড়ছেই বা কে? যুদ্ধকালে সংগ্রাম স্থগিত রাখাই শ্রেয়। গান্ধীজী এঁদের কথা মেনে নেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকেন। তাঁর সংগ্রাম নিছক ভারতের স্বার্থে নয়, ইংলণ্ডেরও স্বার্থে, সারা বিশ্বের স্বার্থে। স্বাধীন ভারত হিটলারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করবে। হিটলার যদি অবুঝ হয় তবে স্বাধীন ভারতের নৈতিক সমর্থন পাবে সাম্রাজ্যহীন ব্রিটেন। স্বাধীন ভারত আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে অস্ত্রধারণ করবে। তিনি আপনাকে সরিয়ে নেবেন। কিন্তু তাঁর সত্যভাষণের স্বাধীনতা থাকবে। তিনি সত্যের উপর নিষেধাজ্ঞা সহ্য করবেন না। সত্য তাঁর কাছে অহিংসার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্যে তাঁর সংগ্রামপদ্ধতির নাম সত্যাগ্রহ। ব্রিটিশ প্রোপাগাণ্ডাকে তিনি ব্রিটিশ অস্ত্রশস্ত্রের মতোই ব্যর্থ প্রতিপন্ন করবেন। কিন্তু ব্রিটেনকে তিনি বিব্রত করতে অনিচ্ছুক। তাই যতদিন সম্ভব সংগ্রাম সংবরণ করবেন। তা বলে গোটা যুদ্ধকালটা নয়। ইংরেজরা যদি তাদের কাজকর্মের দ্বারা ভারতীয়দের অতিষ্ঠ করে না তোলে তা হলে তিনিও তাদের অতিষ্ঠ করে তুলবেন না। কিন্তু জোর করে যদি সৈন্য বা শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়, জোর করে যদি ট্যাক্স বসানো বা চাঁদা আদায় হয়, জোর করে যদি মুখের অন্ন বা গায়ের কাপড় চালান দেওয়া হয় তবে সংঘাত অনিবার্য। সংঘাতকে তিনি অহিংস আকার দিতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু ইংরেজরা যদি খেলোয়াড়ের মতো খেলার নিয়ম মেনে না খেলে তবে দেশের লোককে তিনি কাঁহাতক ঠেকিয়ে রাখবেন?"

মানস আশ্বস্ত হয়ে বলে, "সংগ্রামটা আপাতত বছর কয়েক সংবরণ করে দেখা যাক ব্রিটেন কতদূর সামলে উঠতে পারে। যুদ্ধ তো চার বছরের আগে থামছে না। আমেরিকা ইতিমধ্যে নামবেই। হিটলার পাগলের মতো ইহুদীদের মেরে তাড়াচ্ছে। ওরাও আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকানদের উস্‌কাচ্ছে।

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে টোমাস মানের মতো স্বদেশপ্রেমিকজার্মানদের। তাঁর সহধর্মিণী ইহুদীবংশীয়া। তা বলে কারো চেয়ে কম স্বদেশপ্রেমিক নন। কিন্তু এখন জাতীয়তার নিরিখ জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতি নয়, নর্ডিক রক্ত। মানের নিজেরই সেটা নেই, মাতৃকুল ক্রিওল। গত মহাযুদ্ধে তিনি কাইজারের সমর্থক ছিলেন, সবাই জানত তিনি পাকা জার্মান। এবার তিনি হিটলারের সমর্থক নন, তাই নাৎসীদের মতে কাঁচা জার্মান। তাদের মতে তাঁর সহধর্মিণী জার্মানই নন। আর সন্তানদেরও ওরা জার্মান বলে স্বীকার করবে না। পারিবারিক নিরাপত্তার জন্যে তাঁকে স্বদেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। আমেরিকা যদি যুদ্ধে যোগ না দেয় তবে তিনি দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত হবেন না। নয়তো তাঁকে গণ্য করা হবে দেশের শত্রু বলে। তাঁর পরিবারের আর সবাইকেও। গত মহাযুদ্ধের সেই জার্মান ন্যাশনালিস্ট টোমাস মানের এই মহাযুদ্ধে কী দুঃসহ সঙ্কট!"

যূথিকা তা শুনে বলে, "কেন? তোমার সঙ্কটটাই বা কম দুঃসহ কিসে? এই যুদ্ধে তুমি ইংরেজ পক্ষে। কিন্তু যুদ্ধকালে যদি গান্ধীজী তাঁর সংগ্রাম শুরু করেন তবে দেশের লোকের চোখে তুমিও দেশের শত্রু। দেশর স্বাধীনতাসংগ্রামীদের তুমি জেলে পাঠাবে। ওরা যদি হিংসার পথ ধরে তবে ওদের ফাঁসীও দিতে পার। আর আমি তোমার সহধর্মিণী বলে তোমারই মতো দেশদ্রোহী। চাকরি ছাড়তে চাইলেও অনুমতি পাবে না। অনুমতি পেলেও এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষেই থেকে যাবে। দেশর লোক তোমাকে সাধুবাদ দেবে না, অথচ সরকারী কর্মচারীরাও তোমাকে ছেই ছেই করবে। তুমি হবে না-ঘরকা না-ঘাটকা। আর তোমার হাত ধরেছি বলে আমিও তাই। অর্থনৈতিক সমস্যা তো থাকবেই, তোমার তো আন্তর্জাতিক খ্যাতি বা উপার্জন নেই। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ পক্ষে থেকেও খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ ও স্বস্তি এর কোনোটাই হারাবেন না। আর তুমি হবে সর্বহারা।"

মানস একেবারে মূক। টোমাস মানের প্রসঙ্গ তুলে বোকা বনে গেছে। সৌম্যর দিকে করুণভাবে তাকায়।

"হাঁ, তোমার অবস্থাটা উদ্বেগজনক বইকি।" সৌম্য সহৃদয়ভাবে বলে। "তবে তুমিই একমাত্র নও। আরো অনেকেই তোমার মতো ইংরেজদের পক্ষে। যেমন পণ্ডিত জবাহরলাল। হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই ছেড়ে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে চান না। কিন্তু গান্ধীজী যদি সংগ্রাম শুরু করেন তাঁকেও চোখ বুজে ঝাঁপ দিতে হবে। গান্ধীজী এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ। কিন্তু জবাহরলাল তা নন। তিনি ইউরোপ গিয়ে সবাইকে জানিয়ে এসেছেন যে তিনি ও তাঁর দেশ ঘোরতর নাৎসীবিরোধী ও সেই কারণে হিটলারের সঙ্গে আপসবিরোধী। তিনি যদি এ যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে না দাঁড়ান তো ইউরোপে তাঁর মানসম্মান ধুলোয় লুটোবে। সেও তবু ভালো, কিন্তু যদি উল্টে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেন তবে সবাই ধরে নেবে যে তিনি একজন প্রচ্ছন্ন নাৎসী। এর মতো অপবাদ তাঁর পক্ষে আর কী হতে পারে? হিটলারের অত বড়ো শত্রু কি খাস ইংলণ্ডেও বেশী আছে? কল্পনা করো জবাহরলালের অবস্থা। গান্ধীজী সব জানেন, সব বোঝেন। তাই অপেক্ষা করছেন। কে জানে যদি ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজের একটা বোঝাপড়া হয়। যেটা উভয় পক্ষেই সম্মানের।"

"তা হলে তো আমি বেঁচে যাই। চাকরি ছাড়তে আমি মনে মনে তৈরি, কিন্তু ইংরেজ পক্ষ থেকে ডিগবাজি খেয়ে ইংরেজের বিপক্ষে যেতে পারব না। দেশের লোকের সাধুবাদে আমার কাজ নেই। হিটলার হচ্ছে মূর্তিমান শয়তান। স্বাধীন ভারত প্রথম দিনই তারও বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবে। আমিও লড়তে না হোক লড়াই দেখতে যাব। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া কি এ জন্মে হবে? মুসলিম লীগ কি হতে দেবে? ভুলে যেয়ো না যে বাংলা, পাঞ্জাব আর সিন্ধু তিনটে প্রদেশই ভিন্নদলের শাসকদের দখলে। এঁরা কংগ্রেসকে কেন্দ্রে মেজরিটির অধিকার দিতে নারাজ। এঁদের উপর কংগ্রেসপ্রাধান্য চাপিয়ে দিলে এঁরাও আন্দোলন শুরু করবেন। যুদ্ধকালে ইংরেজরা এঁদের সহযোগিতা হাতছাড়া করবেন না।

বিশেষ করে পাঞ্জাবে। সেখানে সৈন্যসংগ্রহ পুরো দমে চলেছে। পাঞ্জাবী মুসলমানরা বেঁকে বসলে কে তাদের উপর জোর খাটাবে? আমি তো শুনতে পাই যে ভারতীয় সৈন্যদলের ওরাই শতকরা চল্লিশজন।" মানস ভাবনায় পড়ে।

"কঠিন সমস্যা।" সৌম্য বলে, "বাপু সমস্তই জানেন ও বোঝেন। এসব কথা তাঁর অন্তরঙ্গরাও তাঁকে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি যতদূর আভাস পেয়েছি তিনি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করলেও চিরকাল অপেক্ষা করবেন না। যুদ্ধ যদি আপনা থেকে না থামে তবে তাকে থামাবার জন্যে পৃথিবীতে ওই একজন আছেন। সেটা তাঁর পবিত্র কর্তব্য। তাঁর মুখের কথায় কোনো পক্ষই সাড়া দেবে না। সুতরাং তাঁকে সত্যাগ্রহে নামতেই হবে। এটাও তাঁর পবিত্র কর্তব্য। মানবিক কর্তব্য। যদিও দৃশ্যত জাতীয়তাবাদী কর্তব্য। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে হিংসার চেয়ে অহিংসার জোর আরো বেশী। অসত্যের চেয়ে সত্যের জোর আরো বেশী। তাঁর পেছনে যদি সারা দেশের সমগ্র জনগণ না-ও থাকে তবু তিনি একাই এগিয়ে যাবেন। কিন্তু যেদিন অন্তরের নির্দেশ পাবেন সেদিন। তার একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়। তাঁর সময়বোধ লেনিনের মতোই সঠিক।"

এর পরে সৌম্য বিদায় নিতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু যূথিকা আহারের আয়োজন করেছিল। না খাইয়ে ছাড়বে না। ওজর আপত্তি শুনবে না। সৌম্য বলে, "এসব যদি খাই তো জেলখানার পথ্য আমার মুখে রুচবে না। আমার অভ্যাস নষ্ট হবে। কী করি? পড়েছি মোগলানীর হাতে। খানা খেতে হবে সাথে।"

"তোমাদের একটা খবর দেওয়া হয়নি।" সৌম্য বলে, "মালিকান্দায় এবার গান্ধী সেবাসঙ্ঘের অধিবেশন হচ্ছে। স্বয়ং গান্ধীজী যোগ দিচ্ছেন। আমাকেও যেতে হবে। সেবাসঙ্ঘের পক্ষে এটা জীবনমরণ প্রশ্ন। গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন। সঙ্ঘের সঙ্গেও জড়িয়ে থাকতে অনিচ্ছুক।"

"মালিকান্দা?" মানস জানতে চায়, "কোথায় সে জায়গা?"

"স্টীমারে আসবার সময় পাশ দিয়ে এসেছ। পদ্মার ধারে। ঢাকা জেলায়। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের স্বস্থান।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"তা হলে তো কাছেই। একবার ঘুরে আসা যায় না? বাপুকে আমি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।" মানস তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।

"তা হলে তাঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। তোমার হয়ে আমি তার বন্দোবস্ত করতে পারি। কিন্তু তোমার উপর সরকারের নিষেধ নেই তো? পরে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে।" সৌম্য আশঙ্কা প্রকাশ করে।

"সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নয়। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে নচিকেতার জিজ্ঞাসা। যমরাজকে তো হাতের কাছে পাচ্ছিনে, তাঁর কাছে যাবারও সময় হয়নি। তাঁর মতো যোগ্য উপদেশক আর কে হতে পারেন? মানুষের মধ্যে মহাত্মাই তো সবচেয়ে বিজ্ঞ।" মানস মনে করে।

এই স্থির হলো যে অধিবেশনের একদিন আগে সৌম্য এসে মানসকে সঙ্গে করে সমস্ত পথ নিয়ে যাবে। ফেরবার সময় মানস একাই ফিরবে। তার দেরি আছে।

যূথিকা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, সৌম্যদা, আমাকে বলতে পারো ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে অহিংসার ভবিষ্যৎ কী? ব্যক্তি অহিংসা হতে পারে, কিন্তু আস্ত একটা জাতি! আস্ত একটা রাষ্ট্র!"

সৌম্য হকচকিয়ে যায়। "সেইটেই তো এ যুগের সর্বপ্রধান জিজ্ঞাসা। মার্কস লেনিন এর উত্তর দিয়ে যাননি। দিলে আর একটা মহাযুদ্ধ বাধত না। গান্ধীজী যদি দিতে পারেন তা হলে এই মহাযুদ্ধই হবে শেষ মহাযুদ্ধ, তৃতীয় মহাযুদ্ধ আর বাধবে না। আর নয়তো একটার পর একটা মহাযুদ্ধ বাধবেই, তার

মাঝখানে বা পরে সশস্ত্র বিপ্লবও। মানবজাতির অস্তিত্ব যদি-বা থাকে সে জাতি নীতির দিক থেকে রুচির দিক থেকে ক্রমাগত অধোগামী হবে। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিদ্যার প্রগতিই তো সব নয়। তাই যদি হতো রাবণের লঙ্কার মতো প্রগতিশীল আর কোন্ দেশ ছিল সেকালে? যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। অন্তত একটি দেশকে বেছে নিতে হবে সত্যিকার মনুষ্যত্বের পথ। আপাতমনোহর রাক্ষসত্বের পথ নয়। সেই দেশটি কি ভারত? না ভারত নয়? এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হবে গান্ধীজীকে। নয়তো তিনি একজন জাতীয়তাবাদী নেতারূপেই ইতিহাসে থাকবেন, তার বেশী নয়।"

যূথিকা তা শুনে বলে, "কিন্তু সৌম্যদা, মহাযুদ্ধের রকমারি কারণ যদি থাকে, সেসব কারণ যদি সবাই মিলে দূর না করে তবে মহাযুদ্ধ তুমি ঠেকাবে কী করে?"

"ঠেকাতে না পারলে যুদ্ধবিগ্রহের একটা অহিংস পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মামলা মোকদ্দমাও একপ্রকার অহিংস বিকল্প। বিশ্ব আদালতে বিচার হবে। বিচারকরা নিরপেক্ষ। তা যদি না হয় তবে অহিংস অসহযোগ থেকে গণ সত্যাগ্রহ পর্যন্ত সব রকম অহিংস উপায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমাদের এসব পরীক্ষা বিশ্বজনের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ব্যর্থতাও সিদ্ধির সোপান।" সৌম্য স্থিরনিশ্চয়।

।। বিশ ।।

কলকাতা থেকে স্বপনদার চিঠি। চিঠিখানা যূথিকার হাতে দিয়ে মানস বলে, "পণ্ডিচেরী থেকে মুকুলদা এসেছেন। তাঁর থাকবার মেয়াদ সাতদিন কি আটদিন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা আমি একবার তাঁর সঙ্গে মিলিত হই। ইচ্ছাটা শুধু তাঁর নয়, স্বপনদারও। কেউ-বা যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যাজুয়ালটি হয়, কেউ-বা ঘরে বসেই ক্যাজুয়ালটি। স্বপনদা এদের একজন।"

যূথিকা চমকে উঠে সুধায়, "কেন? কী হয়েছে তোমার বন্ধুর? বেঁচে আছেন তা তো চিঠি থেকেই প্রমাণ। জখম হলেন কবে ও কী করে?"

"আরে না, না। জখম টখম নয়।" মানস অভয় দেয়। "ওটাকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করিনি। মুকুলদা যেমন গান নিয়ে পাগল স্বপনদারও তেমনি আরেক রকম পাগলামি। এত বয়স হলো, তবু বিয়ে করেনি, করবেনও না। ফ্লোবেয়ার ওঁর আদর্শ। সারাজীবন সাহিত্য নিয়েই কাটিয়ে দেবেন। এমন কিছু সৃষ্টি করে যাবেন যা 'মাদাম বোভারি'র মতো অমর ও বিশ্বজনীন। কিন্তু ওঁর প্রস্তুতিপর্ব এখনো শেষ হলো না। কবে যে সত্যি সত্যি লিখতে বসবেন তাও জানেন না। ওঁর স্টাডিতে গেলে দেখবে চারিদিকে কেবল বই আর বই। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, বাংলা। শুনবে বাংলাকে ওদের পর্যায়ে তুলতে হবে। নয়তো জীবন বৃথা। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, লণ্ডনের মিডল টেম্পলে বছরে চারবার ডিনার খেয়ে বাকী সময়টা প্যারিসে আর হাইডেলবার্গে কাটিয়েছেন। সেই যে বিখ্যাত গান আছে, 'হাইডেলবার্গে হৃদয় হারিয়েছি,' সেটা ওঁর বেলাও খাটে কিনা জানিনে, কিন্তু আছে ওঁর জীবনের নেপথ্যে একটা প্রেমের উপাখ্যান। একসঙ্গে বহুদিন আমরা ইউরোপে ঘুরে বেড়িয়েছি, কখনো আমাকে ওঁর গোপন কথা বলেননি। যতদূর জানি কন্যাটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে, তাঁকে ঘরে আনার উপায় নেই। কিন্তু ঘরে বসেই ক্যাজুয়ালটি আমি সেকথা ভেবে বলিনি।"

"তবে কোন্ কথা ভেবে?" যূথিকা জিজ্ঞাসু হয়।

"পুরুষের জীবনে বিবাহই কি সব? স্বপনদার ব্রত হলো ফ্লোবেয়ারের মতো অমনি একটি উপাখ্যান লেখা। তার জন্যে নানা ভাষার বইপত্র পড়া। সঙ্গীতের রেকর্ড শোনা। চিত্রকলার রিপ্রোডাকশন দেখা। ওঁর রেকর্ড সংগ্রহটিও অসাধারণ। যা শুনতে চাইবে শোনাবেন। আর আলবামের পর আলবাম তোমার

সামনে মেলে ধরবেন। কার কার আঁকা ছবি দেখতে চাও বলো। এক এক করে দেখাবেন। এখন ওঁর সমস্যাটা হচ্ছে এই যে জার্মানী থেকে ওঁর বন্ধুবন্ধুনীদের চিঠিপত্র আসছে না, বইপত্রও সরকার আটক করছেন। ফ্রান্স এখন আক্রমণের মুখে। প্যারিস যে কোনো দিন শত্রুর হাতে পড়বে। ছবির রিপ্রোডাকশন আর আসবে না। রেকর্ড কিছু কিছু লণ্ডন থেকে আনিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু আনলেও সমস্যা মিটবে না। রোজ রাত্রে ওঁর বাখ্, বেঠোভেন, মোৎসার্ট, শুবার্ট, ভাগনার শোনা অভ্যাস। নইলে ওঁর ঘুম হবে না। এতদিন কেউ কিছু মনে করেনি। এখন বাড়ীর লোক ভয় পাচ্ছে। পুলিশ যদি টের পায় তবে নাৎসী গুপ্তচর বলে সন্দেহ করবে। বাড়ী খানাতল্লাস হবে। ধরে নিয়ে যেতেও পারে। ব্যারিস্টারকে জেলে পুরতে পারবে না। তবু চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে। কেলেঙ্কারিকে দাদা বড্ড ডরান।" মানস তার বন্ধুর দুঃখের কাহিনী শোনায়।

"ওঃ! এইজন্যেই বলছ ক্যাজুয়ালটি।" যূথিকা মন্তব্য করে।

"আরো কথা আছে।" মানস বলে, "ইউরোপ থেকে ফিরে দাদা একটি ক্লাব পত্তন করেন। ইস্ট ওয়েস্ট ক্লাব। কিপলিংয়ের প্রত্যুত্তর। আমিও তার মেম্বর। তা তুমি জানো। সেই ক্লাবও একটি ক্যাজুয়ালটি হতে চলেছে।"

"ওমা! ক্লাব আবার কী অপরাধ করল?" যূথিকা অবাক। সেখানেও সন্দেহ।

"না, না। কথাটা সে অর্থে বলিনি।" মানস খোলসা করে। "আমাদের মেম্বররা কেউ নাৎসীদের পক্ষে নন। যাঁরা জার্মানীফের্তা তাঁরাও ইংরেজ-ফরাসীদের পক্ষে। তাঁরা জার্মানীকেভালোবাসেন, কিন্তু নাৎসীদের ঘৃণা করেন। তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা টোমাস মান, হাইনরিখ্ মান প্রভৃতি পলাতক জার্মান বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। নতুন একটা সমিতি স্থাপনের উদ্যোগও চলেছে। ফাসিস্টবিরোধী সমিতি। তাঁরাও উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন। স্বপনদা কিন্তু সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তিনি রাজনীতির ঊর্ধ্বে। ক্লাবটিকেও রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে চান। কিন্তু সদস্যরা এবিষয়ে একমত নন। অনেকেই নীরব সাক্ষী হতে নারাজ। স্বপনদা এতে ক্ষুণ্ণ। সরব হওয়া মানে সরকারের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে নেওয়া। আর সাক্ষীর ভূমিকা ছেড়ে সৈনিকের ভূমিকায় নামলে তো মসী ছেড়ে অসি ধরতে হয়। তার মানে সরস্বতীকে ছাড়পত্র দেওয়া। তা হলে কোন্ সুবাদে আমি ক্লাবের মেম্বর থাকব? মেম্বরশিপের একটা অলিখিত শর্ত হচ্ছে স্বাধীনভাবে মসীচালনা। এ ছাড়া আরো একটা শর্ত আছে।"

যূথিকা কৌতূহলী হয়। "জানতে পারি?"

"তা হলে শোন।" মানস বিশদ করে। "দেয়ালির রাতে একজনের দীপ নিবে গেলে সে আরেকজনের দীপ থেকে নিজের দীপ জ্বালিয়ে নেয়। তেমনি সংস্কৃতির জগতেও এক দেশের দীপ থেকে আরেক দেশের দীপ। এক সভ্যতার দীপ থেকে আরেক সভ্যতার দীপ। এমনি করেই ইটালিতে ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে রেনেসাঁসের দীপ জ্বলেছে। তার থেকে বাংলাদেশে তথা ভারতে। আমাদের রেনেসাঁস এখনো অসমাপ্ত। তাকে সমাপ্ত করার দায় আমাদের উপরে। তাই আমরা ইউরোপের দীপ থেকে আমাদের দীপ জ্বালিয়ে নিতে সচেষ্ট। কিন্তু এখন দেখছি জার্মানীর দীপ নিবে গেছে। বুদ্ধিজীবীরা কে যে কোথায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা ও সৃষ্টিরক্ষা করছেন তার খবর মিলছে না। যাঁরা দেশে পড়ে আছেন তাঁরা হয় কারারুদ্ধ নয় রুদ্ধবাক্। সভ্যতা বলতে ও দেশে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। ফ্রান্সের দীপশিখাও নিবু নিবু। নাৎসীরা আক্রমণ করলে প্যারিস কি প্রতিরোধ করতে পারবে? বুদ্ধিজীবীরা দোটানায় পড়বেন। লড়বেন, না গা-ঢাকা দেবেন? পালাবার অভিপ্রায় নেই। এ অবস্থায় ফ্রান্সের কাছ থেকেই বা আমরা নতুন কী পেতে পারি? বাকী থাকে ইংলণ্ড। বইপত্র ওদেশ থেকে কিছু কিছু আসছে। কিন্তু লিখছেন কারা, বেশীর ভাগই তো যোগ দিয়েছেন সেনাবাহিনীতে বা দমকলবাহিনীতে বা

বোমাবর্ষণের থেকে নাগরিকরক্ষা বাহিনীতে। অনবরত চর্চা না করলে সঙ্গীতেরও উন্নতি হয় না, চিত্রকলারও না, সাহিত্যেরও না। এই যুদ্ধ যদি চারবছর গড়ায় তো ইংলণ্ডের দীপশিখাটিও নিবে যাবে। ইংরেজদের কাছ থেকেই বা আমরা নতুন কী পেতে পারি? বুদ্ধিজীবীদের দিক থেকে বলছি, রাজনীতিকদের দিক থেকে নয়। তা হলে আমাদের ক্লাব আর প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলনকেন্দ্র হবে না। তার চরিত্র বদলে যাবে। স্বপনদা তার দায়িত্ব নিতে চান না। আমাকে ডাকছেন এর একটা বিহিত করতে। আমরা কি পাট গুটিয়ে নেব, না সুদিনের ভরসায় অস্তিত্ব বজায় রাখব?''

যূথিকা চিন্তান্বিত হয়। ''তা তুমি একবার কলকাতা ঘুরে আসতে পারো। স্বপনদা আর মুকুলদা দু'জনের সঙ্গেই ভাববিনিময় হবে। এখানে তো সরকারী মহলের বাইরে পা বাড়াবার জো নেই তোমার। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখবে?''

মানস ঠাওরায় কিছু একটা কিনে আনার বরাত। তা নয়। জুলিকে খুঁজে বার করতে হবে। ও কেমন আছে? ওর মা কেমন আছেন? যূথিকার মন কেমন করে।

শিয়ালদা স্টেশনে স্বয়ং স্বপনদা হাজির। দুই হাতে ঝাঁকানি দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। ''কী আফসোস, তুমি পরশু ফিরে যেতে চাও? আরো দু'তিন দিন থাকলে ভালো হতো না? ক্লাবটার একটা সদ্‌গতি করতে হবে। আমার ইচ্ছা নয় যে সেটা হয় একটা অ্যান্টিফাসিস্ট ফোরাম।''

স্বপনদার নিজের গাড়ী ছিল না। এক বন্ধুর গাড়ী। পথে যেতে যেতে মানস বলে, ''ছুটি চাইলে পাওয়া যায়। কিন্তু মামলা পেছিয়ে দেওয়া আমি পছন্দ করিনে, স্বপনদা। কত লোকের কত ক্ষতি হয়। তা ছাড়া যূথিকা এখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ওকে একলা রেখে আসা সুখের নয়।''

''দ্যাখ, মানস, তোমাকে আমি ডিস্‌টার্ব করতুম না। কিন্তু আমাদের বন্ধুদের মনোভাব লক্ষ করে আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে আমি সব দিক থেকেই একটি ফেইলিওর। কোর্টে যাই আসি। পসার জমে না। তাই গাড়ী কিনতে পারিনে। ভাগ্যে একখানা বাড়ী আছে। বাবার সারাজীবনের সঞ্চয়ের ফল। ওঁরও তো বয়স হয়েছে। উনি আর কদ্দিন। যাবার আগে আমাকে সেটলড দেখে যেতে চান। আর সকলের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংসারী। তোমার যেমন পুত্রশোক বাবার তেমনি পৌত্র শখ। কিন্তু বিয়ে আমার কপালে থাকলে তো! যাক্, ছেড়ে দাও ওকথা। এই ক্লাবটাই আমার সন্তান। এ যদি গত হয় আমিও শোকসন্তপ্ত হব। কিন্তু একে বাঁচিয়ে রাখা আমার একার সাধ্য নয়।'' স্বপনদা খেদোক্তি করেন।

''কেন? কী হয়েছে? কেউ চাঁদা দিচ্ছে না?'' মানস অনুমান করে।

''না, সেটা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু তুমি তো জানো আমার ব্রত হলো পূর্ব পশ্চিম মিলন। পশ্চিমের তিনটি দেশ আমি বিশেষ করে বেছে নিয়েছি। ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স। ইটালীকেও বেছে নিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে যে শিক্ষা হয় তার পরে ইটালী সম্বন্ধে আমি হতাশ। ইটালী মজেছে। মুসোলিনি ওকে মজিয়েছে।'' স্বপনদা বিলাপ করেন।

''কই, আমাকে বলনি তো ক্রোচে তোমাকে কী বলেছিলেন?'' মানস সুধায়।

''ক্রোচে আমার প্রশ্নের উত্তরে মুখে হাত চাপা দিয়ে ইঙ্গিতে বোঝান যে তিনি মৌনীবাবা। লিখিত উত্তরও দেবেন না। মুসোলিনির নিষেধ। না মানলে দেশত্যাগ। এত বড়ো লাইব্রেরী ফেলে কোথায় তিনি যাবেন? তাঁর লাইব্রেরীই তাঁর বোধিবৃক্ষ। তেমনি আমারও। আমিও দেশত্যাগ করব না স্থির করেছি। তাই মৌনব্রত গ্রহণ করেছি। যুদ্ধই হোক আর বিপ্লবই হোক আমি নীরব সাক্ষী। কিন্তু আমার বন্ধুরা তা নন। তাঁরা সবাই সরব। কেউ কেউ তো সাক্ষী না হয়ে সক্রিয় হতে চান। এই যুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী। তা না হয় হলো, কিন্তু পূর্ব পশ্চিমের মিলন ঘটল কোথায়? জার্মানীর সঙ্গে লড়লে কি মিলন হয়, না বিরোধ হয়? ওঁরা বলেন বিরোধটা জার্মানীর সঙ্গে নয়, নাৎসীদের সঙ্গে। কেন, নাৎসীরা কি জার্মান

নয়? দৃশ্যত তারাই তো অধিকাংশ।" স্বপনদা তাই মনে করেন।

বালীগঞ্জে স্বপনদাদের বাড়ী। উপরতলায় থাকেন বাবা, নিচের তলায় ছেলে। মা নেই সৎ মা আছেন। মানস তাঁদের প্রণাম করে। অবসরপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান অধ্যাপক যা বলেন তা মনে রাখবার মতো। "মানস, তোমার ছেলেদের আমি দেখেছি। কী সুন্দর উতরেছে! ওই রকম আরো কয়েকটি তৈরি করো।" ভদ্রলোক জানেন না যে ইতিমধ্যে ওদের একটি এ জগতে নেই। মানসের মনে লাগে।

কথাটা স্বপনদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। বেচারা মুখ বুজে পালান। মানসের স্নানাহারের আয়োজন করেন। আহারের সময় আবার সেই ক্লাবের প্রসঙ্গ। ক্লাব যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে তাকে জীইয়ে রেখে কার কী লাভ? যাক না ওরা, অ্যান্টিফাসিস্ট সমিতি গড়ুক। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিক।

মানস বলে, "ওঁরা যে জার্মানীকে ভালোবাসেন এটা যদি সত্য হয় তবে পূর্ব পশ্চিমের মিলনের পক্ষে এই যথেষ্ট নয় কি? জার্মানীকে ভালোবাসেন বলে কি নাৎসীদেরও ভালোবাসতে হবে? গের্নিকার উপর যারা অকারণে বোমাবর্ষণ করেছে তাদের ঘৃণা করা চলবে না? চেকদের স্বাধীনতা হরণ করার পরও ক্ষমা করতে হবে?"

"কিন্তু এটাও তো ভেবে দেখতে হবে যে ক্ষমাহীন ঘৃণার লজিকসম্মত পরিণাম কী। পরিণাম সংঘর্ষ, রক্তপাত, যুদ্ধ। নাৎসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানেই জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। তাতে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে মরবে। তাদের ঘরবাড়ী নির্বিশেষে ধ্বংস হবে। তাদের সভ্যতাও নির্বিশেষে লুপ্ত হবে। তা হলে মিলনটা হবে কার সঙ্গে কার? মিলনের জন্যে যদি চাড় থাকে তবে আমার মতো মৌন হও। একমনে নিজের কাজ করে যাও। ক্রোচে যেমন করে গেছেন।"

স্বপনদার যুক্তি মানসের চিত্ত স্পর্শ করে। প্রসঙ্গটা পালটে দিয়ে সুধায়, "তোমার জার্মান বন্ধুবান্ধবীদের খবর পাচ্ছ তো?"

"সরাসরি পাচ্ছিনে। সুইডেন বা সুইটজারলণ্ডের মারফৎ পাচ্ছি। ফ্রাউ নয়মানকে তোমার মনে আছে?" স্বপনদা প্রশ্ন করেন।

"থাকবে না? ওঁদের বাড়ীতে তিনদিন ছিলুম। কী যত্ন! কী আদর! ওঁর মা বাবা কি এখনো বেঁচে? ওঁর স্বামী ডাক্তার নয়মান আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন। আর ওঁর ভাই হাইনরিখ তো ছিল আমার নিত্য সঙ্গী। ওঁর মেয়েটির বোধহয় বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেটিও বড়ো হয়েছে এতদিনে।" মানস বলে যায়।

স্বপনদার মুখে বিষাদের প্রলেপ। "তুমি শুনে দুঃখিত হবে যে হাইনরিখকে যুদ্ধে ধরে নিয়ে গেছে। সে এখন ইস্টার্ন কি ওয়েস্টার্ন কোন্ ফ্রন্টে, জানিনে। যদি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে নিযুক্ত হয়ে থাকে তবে বেলজিয়ান আর ফরাসীদের মারবে বা তাদের হাতে মরবে। দুই পক্ষই ক্যাথলিক। তা যদি বলো, পোলরাও ক্যাথলিক। ধর্মমত এ যুদ্ধে অবান্তর। এ তোমার সপ্তদশ শতাব্দী নয়। এবারকার যুদ্ধের বিশেষত্ব ধর্মের স্থান নিয়েছে ইডিওলজি। অর্থাৎ কমিউনিজম অথবা ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম। হাইনরিখ কখনো ইডিওলজি নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু মন্দার সময় ষাট লক্ষ বেকারের মধ্যে সেও ছিল একজন। নাৎসী দলে নাম না লেখালে বেকার দশা ঘুচবে না বলে নাৎসী বনে যায়। সেটা তো মন থেকে নয়, পেট থেকে। ওই মতবাদের কল্যাণে ক্যাথলিক হিটলার এখন প্রটেস্টান্ট জার্মানীর কর্ণধার হয়েছেন। ক্যাথলিক অস্ট্রিয়াকে একসঙ্গে মিশিয়েছেন। নাৎসী না হলে আর কেউ কি এ কাজ করতে পারত? বিসমার্ক যে কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারলেন না হিটলার তা পারলেন। এটা একটা অলিখিত ম্যাণ্ডেট যা হিটলারকে নেতার আসনে বসায়। তেমনি আর একটা অলিখিত ম্যাণ্ডেট ভের্সাই সন্ধি রদবদল করা। ইংলেণ্ড ও ফ্রান্স এতে রাজী হলে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে লড়াই অমনি বন্ধ হয়ে যাবে।"

মানস চমৎকৃত হয়। "আর ইস্টার্ন ফ্রন্টের লড়াই?"

"বলা শক্ত। গত যুদ্ধের পর জার্মানীতেও কমিউনিস্টরা বিপ্লব বাধিয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। তাদের ভয়েই তো লোকে নাৎসীদের দিকে ঝোঁকে। নাৎসীরাই কমিউনিস্টদের বিপরীত মেরু, সোশিয়াল ডেমক্রাটরা নয়। জার্মানীর ভিতরেই একটা পোলারাইজেশন ঘটে গেছে। সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা ধূলিসাৎ। আর কখনো মাথা তুলবে না। আহা, কী সুখের ছিল সেই দিনগুলি যখন আমরা ওদেশে ছিলুম! তুমি কয়েক সপ্তাহ। আমি ঘুরে ফিরে বছর দুই। এখন নাৎসীরা কমিউনিস্টদের ঘরে হারিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু বাইরে হারিয়ে দেয়নি। ওদের ওটা তো একটা আন্তর্জাতিক মতবাদ। যেমন মুসলমানদের। ওদের মক্কা হচ্ছে মস্কো। ওদের হারিয়ে দিতে হলে মস্কো অবধি তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। পোলাণ্ড তার পথে পড়ে। আপাতত একটা চুক্তি হয়েছে বটে, কিন্তু আখেরে রাশিয়াতে জার্মানীতে বেধে যাবে। কমিউনিস্টে নাৎসীতে। পেছনে আরো অনেকে দাঁড়াবে। শেষ ফল কী হবে তা কে বলতে পারে! সেই জন্যেই বলছিলুম যে ইস্টার্ন ফ্রন্টের লড়াই বন্ধ হবার নয়। যদিও ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের লড়াই থেমে যেতে পারে"। স্বপনদার অভিমত।

মানস একটু ভেবে নিয়ে বলে, "সেটা জার্মানীর পক্ষে সুবিধের। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্সের পক্ষে নয়। ফরাসীদের একটা বচন আছে — 'সাডোয়র পরে সেডান।' উচ্চারণটা বোধহয় সেদাঁ। সাডোয়াতে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে দিয়ে প্রাসিয়া সেডানে ফ্রান্সকে হারিয়ে দেয়। তেমনি পুবদিকের কোনো এক যুদ্ধে রাশিয়াকে হারিয়ে দিয়ে জার্মানী পশ্চিমদিকে ফ্রান্সকে হারিয়ে দেবে, ইংলণ্ডকে হারিয়ে দেবে। শুধু যে আলসাস লোরেন ফিরে পাবে তা নয়, উপনিবেশগুলো ফেরত পাবে। এ যুদ্ধ মাঝপথে থামার নয়, স্বপনদা। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীকে আরো বাড়তে দেবে না। দিলে ব্যালান্স অভ পাওয়ার বিপর্যস্ত হবে। কমিউনিজমের আতঙ্ক ওদের নেই। ফাসিজমকেই ওদের শঙ্কা। রাশিয়া বহুত দূরে। জার্মানী নাকের ডগায়। যুদ্ধ কি কেবল মতবাদের সঙ্গে মতবাদের হয়? জাতীয় স্বার্থও যুদ্ধ ডেকে আনে।"

"যে কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছিলুম," স্বপনদার মনে পড়ে, "হাইনরিখ্ যেমন পেটের দায়ে নাৎসী হয় তেমনি আরো লক্ষ লক্ষ তরুণ। তাদের আমি ঘৃণা করি কেমন করে? নাৎসী না হলে ওরা যে না খেয়ে মারা যেত। হিটলার ওদের অন্নদাতা। তবে এটাও ঠিক যে আরো লক্ষ লক্ষ তরুণ নাৎসী হয়েছে ভেরসাই সন্ধি বরবাদ করার উদ্দেশ্যে বা কমিউনিজমকে সমূলে বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আরো অনেক লক্ষ নাৎসী বনেছে ইহুদীদের ঘরবাড়ী চাকরিবাকরি কলকারখানা দোকানপসার আত্মসাৎ করতে। যেহেতু তারা আর্য বংশ নয়, সেমিটিক বংশ। এতকাল জাতীয়তার আইন ছিল jus soli অর্থাৎ যে-দেশে যার জন্ম সেই দেশের সে নাগরিক। এখন তার বদলে jus sanguinis প্রচার করা হচ্ছে। জন্মভূমি অনুসারে নাগরিক নয়, রক্তধারা অনুসারে নাগরিক। ইহুদীদের রক্তধারা স্বতন্ত্র। সুতরাং ওরা জার্মানী নাগরিক হবার অযোগ্য। যদিও ওরা দেড় হাজার বছর ধরে জার্মানীর অধিবাসী। জার্মানীতেই ওদের পুরুষানুক্রমে জন্ম ও মৃত্যু। নাৎসীরা তাদের আর্যত্ব জাহির করার জন্যে স্বস্তিক ধারণ করে। সেটা সংস্কৃত শব্দ। শুভ আর অশুভ উভয়েরই প্রতীক। ডান দিকে মোড় না বাঁ দিকে মোড় সেই অনুসারে। নাৎসীদেরটা অশুভ।"

মানস সংশোধন করে। "শব্দটা সংস্কৃত, কিন্তু চিহ্নটা নিশ্চিতভাবে আর্য নয়। আমেরিকার আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও ওর প্রচলন। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করব না। আক্ষেপের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ইহুদীরাও রাজা ডেভিডের পঞ্চকোণ তারকা ধারণ করে। ওদের অনেকের আনুগত্য প্রাচীন জায়নের প্রতি, আধুনিক জার্মানদের প্রতি নয়। ওরাও একটা হোমল্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখছে। আর ওরাও আর্য জাতিতত্ত্বের মতো ইহুদী জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। ইংলণ্ডে ওরা ইংরেজ, ফ্রান্সে ফরাসী, জার্মানীতে জার্মান, কিন্তু সর্বত্র ইহুদী। সর্বত্র ওদের জ্ঞাতি। যুদ্ধকালে কে ওদের বিশ্বাস করবে? কে জানে কার চর। নিষ্কণ্টক হবার জন্যে নাৎসীরা ওদের বিদায় করে দিতে চাইছে। কিন্তু ওরা যাবেই বা কোথায়! যেখানেই যাবে

সেখানেই বিরোধ বাধবে। এমন কি তাদের প্রাচীন হোমল্যাণ্ডেও। সেখানে এখন আরব বসতি। সেও প্রায় দেড় হাজার বছরের। আমি তো এ সমস্যার কূল খুঁজে পাইনে। যদি না দুই পক্ষ মিশ্রণে সম্মত হয়। অর্থাৎ অন্তর্বিবাহে।"

"তাতেও কি রক্ষা আছে? টোমাস মান তো তাই করেছেন। এখন স্ত্রীপুত্রকন্যার জন্যে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।" স্বপনদা ব্যথিত।

রাত্রে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি। মানস দুপুরে একটু গড়ায়। তার উঠতে কিছু দেরি হয়। স্বপনদা চায়ের টেবিলে প্রতীক্ষা করছিলেন। উঠে এসে জাগিয়ে তোলেন।

কথাপ্রসঙ্গে মানস বলে, "কই, ফ্রাউ নয়মানের কাহিনী শেষ করলে না তো?"

"শুনে দুঃখ পাবে। বাপ মা বুড়ো হয়েছিলেন, মারা যান। তার পর মারা যায় ছেলেটি। যার টি বি হয়েছিল। এখন ওই বিশাল বাড়ীতে উনি আর ওঁর মেয়ে মারিয়া। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। তিনি আবার বিয়ে করেছেন। ছিলেন তো ঘরজামাই। সেটা বোধহয় মনোমালিন্যের হেতু। ওঁদের সঙ্গে তুমি তো মাত্র তিনদিন কাটিয়েছ। আমি পুরো সিমেস্টার। সেইখান থেকেই রোজ বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করতুম।" স্বপনদা স্মরণ করেন।

"আমি তো জানতুম হাইডেলবার্গ।" মানস জেরা করে।

"হাইডেলবার্গেও এক সিমেস্টার। জার্মানীতে আমি মোট চার সিমেস্টার পড়াশুনা করেছি। হাইডেলবার্গ, বন্, বার্লিন আর লাইপৎসিগ। ওদেশে ওরা এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হতে দেয়। ক্রেডিটও মেলে। চারটের যে কোনো একটার থেকে ডক্টরেট নিতে পারা যেত। কিন্তু থীসিস লিখতে আমি গা করিনি। লিখলে জার্মান ভাষায় লিখতে হতো। আমার জার্মান বিদ্যা শতং বদ মা লিখ। ফরাসীও তাই। সরবনেও তো একবছর পড়েছি। বাকী একবছর গ্রেনোবলসে। ডিগ্রী চাইনি, পাইনি। বার-এ কল্‌ড হয়ে দেশে ফিরেছি। সেইটেই ছিল আমার আসল লক্ষ্য।" স্বপনদা স্মৃতিচারণ করেন।

চায়ের পরে মানস মুকুলদার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ভেবেছিল। স্বপনদা ওকে উঠতে দেন না। "এইখানেই ক্লাবের মেম্বরদের সঙ্গে আড্ডা বসবে। মুকুলকে আমি কথা দিয়েছি কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাব ওর গুরুভগিনী মিসেস্ মুখার্জির ওখানে।"

এক এক করে সদস্য সমাগম হয়। মানসের সঙ্গে কারো কারো পরিচয় ছিল, কারো কারো নতুন করে ঘটে। জার্মানীফের্তাই বেশীর ভাগ।

"নীরব সাক্ষী হয়ে থাকা উটপাখীর মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকা। স্বপন হয়তো সেটা পাবে, আমি তো পারিনে।" বলেন কান্তি পালিত। "হিটলার এসে ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। জার্মানরা জাতকে জাত পেগান হয়ে গেছে। যীশুর ধর্মে বিশ্বাস করে না। যেহেতু তিনি ইহুদী। আর যেহেতু সে ধর্ম শক্তিমানকে বিবেকবান ও হৃদয়বান হতে শেখায়। হিটলারের আদর্শ নীটশের সুপারম্যান আর ভাগনারের অপেরার সিগ্‌ফ্রীড। আর ওঁর পূর্বসূরী বিসমার্কের মতো ওঁরও মূলমন্ত্র 'রক্ত আর লৌহ'। ওঁর লক্ষ্য আপাতত ইউরোপের উপর আধিপত্য। 'আপাতত' বলেছি, 'আখেরে' বলিনি। আখেরে রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও রাশিয়া কুপোকাৎ হলে আমেরিকার সঙ্গে মুখোমুখি।"

বেণীমাধব কাঞ্জিলাল তা শুনে বলেন, "আমেরিকার সঙ্গে মুখোমুখির আগে আধখানা এশিয়া মুখে পুরবে। বুঝলে, স্বপন?"

"আমি নিয়তি মানি। যা হবার তা হবেই। তোমার আমার কথায় একচুলও নড়চড় হবে না। সেইজন্যেই চুপ করে থাকি।" স্বপনদার কৈফিয়ৎ।

"তোমাকে লক্ষ্য করেই জুলিয়া বাঁদা লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত সন্দর্ভ। বাংলা করলে যার মানে

দাঁড়ায় বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতা। সঙ্কটের দিন চাচা আপনা বাঁচা, সঙ্কট কেটে গেলে চুলচেরা বিশ্লেষণ। কেন অমন হলো, কেন তেমন হলো না। তখন সবাই মুখর। কিন্তু কার্যকালে মূক। বোবার শত্রু নেই, এই হচ্ছে তোমার পলিসি।" কাঞ্চিলাল খোঁচা দেন।

"ক্রোচেরও পলিসি তাই।" স্বপনদার সাফাই।

তা শুনে সরোজ পুরকায়স্থ মন্তব্য করেন, "আমি কিন্তু মেনে নিতে পারব না যে আজকের এই ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে আমার কোনো ভূমিকা নেই, আমার স্থান রঙ্গমঞ্চের বাইরে যেখানে দর্শকরা সমাসীন।"

সিঙ্গাড়ার থালা বাড়িয়ে দিয়ে স্বপনদা বলেন, "সবাই যদি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে যায় তো রঙ্গ দেখবে কে? মুচি আর মুদ্দফরাস, ভিস্তি আর ফিরিওয়ালা, মিস্ত্রি আর ময়রা, দর্জি আর গয়লা এদেরও কি রঙ্গমঞ্চে তুলতে চাও? সবাই হবে অভিনেতা, দর্শক কেউ নয়? যদ্ধ ব্যাপারটা কি একটা জেলেপাড়ার সঙ্, না একটা সীরিয়াস ব্যাপার?"

পুরকায়স্থ অপ্রস্তুত হন। "আমি কি তাই বলেছি? আমার বলার উদ্দেশ্য বুদ্ধিজীবীরা নিষ্ক্রিয়ভাবে ঘটনার সাক্ষী হতে পারেন না। তাঁদের অ্যাকশনে নামতে হবে। কেউ হয়তো অসি হাতে নিয়ে সৈনিক হবেন, কেউ হয়তো মসীকেই অসির মতো এফেকটিভ করবেন। সৈনিক যেমন নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না, থাকলে নির্ঘাত পরাজয়, বুদ্ধিজীবীও তেমনি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। থাকলে নিশ্চিত পরাজয়। পরাজয়ের ঝুঁকি আগেকার যুগে নেওয়া হয়েছে, এযুগে নেওয়া যায় না। কারণ এযুগে রাজত্ব বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কাঠামো বদলে যায়, সমাজের বিন্যাস বদলে যায়। এটা ইডিওলজির যুগ। দরকার হলে মুচি আর মুদ্দফরাসকেও একভাবে না একভাবে লড়তে হবে। রম্যাঁ রলাঁ সেবার ছিলেন 'অ্যাবভ দ্য ব্যাটল'। এবার তা নন। তেমনি বারট্রাণ্ড রাসেল সেবার ছিলেন যুদ্ধের না হোক কন্‌স্ক্রিপশনের বিরোধী। তার জন্যে জেল খেটেছিলেন। এবার তিনিও নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থন করেন, কন্‌স্ক্রিপশনেও তাঁর আপত্তি নেই। 'অ্যাবভ দ্য ব্যাটল' কি তবে তুমিই?"

স্বপনদা সেইসব মহান সাহিত্যিকদের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হয়ে আত্মপ্রসাদ বোধ করেন। "আরে নাও, নাও, আর-একটা সিঙ্গাড়া নাও। ফুলুরি আসছে। কী যে বলো, আমি কি রাসেল বা রলাঁর সঙ্গে এক সারিতে বসার যোগ্য? গতবারের যুদ্ধে রিল্‌কের মতো কবিকেও কন্‌স্ক্রিপ্ট করা হয়েছিল। ফল কী হলো তাতে? অস্ট্রিয়া জিতল? মাঝখান থেকে কাব্যের ক্ষতি হলো। একবার ভেবে দ্যাখ ফ্লোবেয়ার যদি অসিযুদ্ধ বা মসীযুদ্ধ চালাতেন তা হলে আর-একজন অসিযোদ্ধা বা মসীযোদ্ধা বাড়ত, কিন্তু কোথায় থাকত 'মাদাম বেভারি'র মতো অপূর্ব সৃষ্টি? ফরাসীরা কী নিয়ে আজ অবধি গর্ব করত? কতক লোককে সৃষ্টির কাজ নিয়ে থাকতে হবে। যেমন নারীকে থাকতে হয় গর্ভধারণের কাজ নিয়ে, শিশুপালনের কাজ নিয়ে। তার বেলা সে-যুগ এ-যুগ নেই। স্রষ্টারা সব যুগেই স্রষ্টা, মাতারা সব যুগেই মাতা। তেমনি চাষীকেও চাষবাস নিয়েই থাকতে হবে, নইলে সবাই অভুক্ত থাকবে, যোদ্ধারাও। তাঁতীকেও কাপড় বোনা নিয়ে থাকতে হবে, নইলে সবাইকে বল্কল পরতে হবে, সৈনিকদেরও। মানুষ ফিরে যাবে কোন্ আদিযুগে, যদি যুদ্ধের দাবী সর্বগ্রাসী হয়? আমি যুদ্ধবিরোধী নই। শান্তিবাদী নই। কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্প নিয়ে থাকতে চাই।"

তা শুনে আদিত্য বর্মণ সবাক হন। "আজকের দিনে বিশুদ্ধ শিল্প বলে কিছু আছে নাকি? পিকাসোকেও গের্নিকার ছবি এঁকে প্রতিবাদ জানাতে হয়। তাতে স্পেনের লোকের প্রতিরোধেরও শক্তি বাড়ে। অথচ কে বলবে যে সেটা শিল্প নয়?"

"রক্ষে করো।" স্বপনদা বলেন, "পিকাসোকে আমার আদর্শ করতে যেয়ো না। উনি অসংখ্য ছবি এঁকেছেন, একখানা একটু অন্যরকম হলে কী আসে যায়। আর আমি তো পরীক্ষার পর পরীক্ষা

করেই চলেছি। ক্লাসিক লিখতে চাই, কিছুতেই পারছিনে।"

"আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে আজকাল চিত্রকরকেও চিত্রের ভিতর দিয়ে সমকালীন ব্যাপারে বক্তব্য জানাতে হয়, স্বপনদা। নইলে তিনি এ যুগের লোক নন। তুমিও সেকেলে বলে গণ্য হবে। ক্লাসিকের দিন গেছে। পরে ফিরে আসতেও পাবে, যদি সভ্যতা স্থিতি পায়। নাৎসীদের দৌরাত্ম্যে সভ্যতা বিপন্ন।" বর্মণ উদ্বিগ্ন।

তা শুনে স্বপনদা জ্বলে ওঠেন। "সভ্যতা বিপন্ন কি শুধু নাৎসীদের দৌরাত্ম্যেই? কমিউনিস্টদের দৌরাত্ম্যেও নয়? ডেমক্রাট বলে যারা ঢাক পেটায় সেইসব প্লুটোডেমক্রাটদের দৌরাত্ম্যেও নয়? যত দোষ নন্দঘোষ! আমি তিন তিনটে দেশে চার চারটে বছর কাটিয়েছি। সাধারণ মানুষ কোথাও খারাপ নয়, ধনপতি গণপতি রণপতিরা কোথাও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। সমস্তক্ষণ যদি অস্ত্রপ্রতিযোগিতা চলতে থাকে তবে নিরস্ত্রীকরণ কি কোনোদিন সম্ভব? একতরফা নিরস্ত্রীকরণ কোন্ রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে? জার্মানরা নাৎসী না হয়ে কমিউনিস্ট হলেও অস্ত্রবল বাড়াত, প্লুটোডেমক্রাট হলেও অলক্ষে তাই করত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওই সোনার দিনগুলিতে আমি ইউরোপে ছিলুম। সেই সুবর্ণ সুযোগ ইউরোপের লোক হেলায় হারিয়েছে। নিরঙ্কুশ অস্ত্রপ্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যুদ্ধক্ষেত্রে বল পরীক্ষা। দোষ ধরতে গেলে সকলেরই দোষ ধরতে হয়। বুদ্ধিজীবীরা যদি নীরব দর্শক না হয়ে সরব অভিনেতা হতে চান তো বাক্যবীর না হয়ে কর্মবীর হোন। ঘর্মপাত করুন। যেমন করছেন গান্ধীজী। অন্তত একটা দেশকে অস্ত্র প্রতিযোগিতার থেকে বিরত থাকতে শেখাচ্ছেন। তোমাদের যুক্তিতর্কের সারমর্ম তো এই যে ভারতকেও অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়তে হবে। আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। আমি কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিতে চাইনে। আমার হাতে সৃষ্টির কাজ। সৃষ্টির অবহেলা করলে সভ্যতা বলে কিছু থাকবে না। এইচ জি ওয়েলসের ভাষায় আমিই সেই সভ্যতা যাকে রক্ষা করার জন্যে তোমরা লড়াই করছ।"

গরম গরম ফুলুরি খেতে খেতে নিখিল বাগচী চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, "ভাই স্বপন, তুমি যখন জার্মানীতে ছিলে তখন ওদেশের শাসকদের অধীনে সেনাবাহিনী ছিল, পুলিশবাহিনী ছিল, কিন্তু ছদ্মনামে একটা গুণ্ডাবাহিনী ছিল না। রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, কিন্তু নাৎসী আমলে যেটা হলো সেটা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। ইতিহাসে কোথাও এর নজির নেই, এক মুসোলিনির ফাসিস্ট ইতালী বাদে। এর যদি মূলোচ্ছেদ না করো তো এইটেই সব দেশের নিয়তি, ভাবতও তাদের অন্যতম। এখন থেকেই জবাহরলাল তার লক্ষণ দেখে সরব। আমরা যারা দর্শক তারা পূর্বাভাষ দেখে শিউরে উঠছি। তবে অভিনেতা হবার যোগ্যতা যে আমাদের সকলেরই আছে, তা নয়। যদি কেউ হতে চান তাঁর কাজ হবে যুদ্ধে যোগদান। যেমন জবাহরলালের।"

জবাহরলালের নাম শুনে তর্কবিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। মানবেন্দ্রনাথ কেন নন? সুভাষচন্দ্র কেন নন? কেউ চান ঘোড়ার সামনে গাড়ী। কেউ চান গাড়ীর সামনে ঘোড়া। যুদ্ধের সামনে বিপ্লব। বিপ্লবের সামনে যুদ্ধ। মানস নীরব শ্রোতা।

স্বপনদা তার দিকে তাকান। "মানু, তুমিও কিছু বলো।"

মানস বলে, "মানবতার এত বড়ো সঙ্কট আর কখনো হয়নি। এত বেশী মানুষও আর কখনো অস্ত্র হাতে নেয়নি। এতরকম মারাত্মক অস্ত্রও আর কখনো তৈরি হয়নি। আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীরা যদি উদাসীন থাকেন তবে ভাবীকাল তাঁদের ক্ষমা করবে না। যদি না তাঁরা যুদ্ধকালে একখানি অনবদ্য কাব্য উপন্যাস রচনায় নিমগ্ন থাকেন, যেমন রয়েছেন স্বপনদা। কিন্তু মুশকিল এই যে বাইরে যেমন সঙ্কট ভিতরেও তেমনি সঙ্কট। যারা স্বদেশের জন্যে অস্ত্র ধরেননি ও ধরবেন না তাঁরা বিদেশের জন্যে অস্ত্র ধরতে দেশের লোককে ডাক দেবেন কোন্ মুখে? তা হলে কি তাঁরা এককভাবে লড়বেন? লড়তে যাঁরা প্রস্তুত নন, তাঁরা কলরব করলেই কি নাৎসীরা নিরস্ত বা পরাস্ত হবে?"

এর পরে আড্ডা জমে না। ঘর খালি হয়ে যায়। তখন স্বপনদা বলেন, "তুমি আজ আমার মুখরক্ষা করেছ, মানু। অ্যান্টিফ্যাসিস্ট বলে যাঁরা পরিচয় দিচ্ছেন তাঁদের অনেকেই বর্ণচোরা কমিউনিস্ট। তাঁদের মতে হিটলার নাকি দানব আর স্টালিন নাকি দেবতা। হিটলারকে এঁরা রুখবেন, স্টালিনকে রুখবেন না। স্টালিন এসে আমাকে লিকুইডেট করার আগেই আমি এই ক্লাবকে লিকুইডিশনে দিতে চাই।"

।। একুশ ।।

আড্ডায় যে কথা অনুক্ত থেকে যায় সে কথা নৈশভোজনের সময় উত্থাপন করেন। স্বপনদা। "সভ্যতা বিপন্ন বলে রাত্রে ঘুম নেই কাদের? না বুদ্ধিজীবীদের। কী করে তুমি এঁদের বোঝাবে যে বিপদটাকে প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলছেন সভ্য দেশের বুদ্ধিজীবীরাই? নিত্য নতুন মারণাস্ত্র উদ্‌ভাবন করছেন কারা? সেসব অস্ত্র রণপতিদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন কারা? রণপতিরা যদি সেসব অস্ত্রের অপপ্রয়োগ করেন তবে সেই পাপের ভাগী হবেন কারা? একবারও তাঁরা চিন্তা করে দেখছেন না যে পরস্পরের বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হবে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিসের লুভর, ইটালীর ফ্লোরেন্স তথা রোমের অসংখ্য পুরাকীর্তি, জার্মানীর কোলন, মিউনিক, ড্রেসডেন ও ন্যূর্নবার্গের অমূল্য শিল্পসম্পদ। আর অস্ট্রিয়ার নগরীরানী ভিয়েনা। সভ্যতা বলতে কোথায় কতটুকু থাকবে যুদ্ধ যদি আরো দূরে ছড়ায়? মস্কো আর লেনিনগ্রাড যদি পুড়ে ছাই হয়? এই সর্বনাশ থেকে সভ্যতাকে বাঁচানোর উপায় কি সাহিত্যিককে সৈনিক করা ও সেই সৈনিকের উপর আকাশ থেকে বোমাবর্ষণের বরাত দেওয়া? তার চেয়েও আরো মারাত্মক কাজ খবরের কাগজে বা রেডিওতে মিথ্যাপ্রচার করে জনমনকে বিষাক্ত করা। সাহিত্যিকরাও যদি পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই অপকর্ম করতে যান তবে সরস্বতী তাঁদের ক্ষমা করবেন না। তাঁদের দিয়ে মহৎ কোনো সৃষ্টি হবে না। সভ্যতা তার সত্যতা হারাবে।"

মানস বলে, "তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? তবু সভ্যতার এই সঙ্কটে উদাসীন থাকা যায় না, স্বপনদা। সৃষ্টির কাজ নিয়ে আমি ব্যাপৃত থাকতে চাই, কিন্তু সমস্তক্ষণ অস্বস্তি বোধ করি। রোম পুড়ছে, নীরো বাঁশি বাজাচ্ছেন!"

"এর উত্তরে আমি বলব, ভিয়েনার উপর গোলাবর্ষণ হচ্ছে, বেঠোভেন কানে শুনতে পাচ্ছেন না, একমনে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছেন। অমর সঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছে।" স্বপনদা উদাহরণ দেন।

"সেটা সম্ভব হয়েছিল তিনি বধির ছিলেন বলে। নইলে তিনিও অস্বস্তি বোধ করতেন, স্বপনদা।" মানস সুনিশ্চিত।

"তা হলে তুমিও কানে তুলো গুঁজে চোখে ঠুলি পরে সৃষ্টির কাজ নিয়ে থাকবে। যুদ্ধের খবর তোমার কানে পৌঁছবে না, চোখে পড়বে না।" স্বপনদার পরামর্শ।

"চোখে ঠুলি পরলে লিখব কী করে?" মানসের প্রশ্ন।

"সে বিদ্যা তোমাকে অভ্যাস করতে হবে।" স্বপনদা হাসেন। ওটা একটা ধাঁধা।

"আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছিনে, স্বপনদা, চোখ মুখ বুজে আমি কেমন করে সৃষ্টির কাজে তন্ময় হতে পারি। ওটা তো উটপাখীর মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকা। তুমি কি বুদ্ধিজীবীদের উটপাখী হতে বলবে? তা হলে সবচেয়ে অতন্দ্র প্রহরী হবে কারা? এটা সেকালের সেই মঠবাড়ীতে আবদ্ধ থাকার ঐতিহ্য। রেনেসাঁসের পর থেকে দেখা যাচ্ছে লেওনার্দো, মিকেল আঞ্জেলো প্রভৃতি শিল্পীরা স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন নাগরিক হিসাবে তাঁদের কর্তব্য করতে। দুর্গ নির্মাণ করতে, অস্ত্র ধারণ করতে।" মানস তর্ক করে।

"প্রাচীন গ্রীসেও তুমি তার নজির পাবে, মানু। কিন্তু সেকালের যুদ্ধ একালের মতো এমন সর্বগ্রাসী ছিল না। কতক লোককে বীজধান রক্ষা করতে হবে, সেই বীজ থেকে নতুন ধান গজাবে। সেই কাজটাই বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত কাজ। নয়তো দেখবে বানের জলে সব ভেসে গেছে, বীজধানটুকুও নেই। যুদ্ধকালে চাষীকে চাষ করতে দেওয়া হয়, নইলে সৈনিকদের খোরাকে টান পড়ে। আমরাও আরেকপ্রকার খোরাক জোগাই। নইলে মনের খোরাকে টান পড়ে। মানুষ তো কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না। সাধুসন্তরাও আরো একপ্রকার খোরাক জোগান। সেটা আত্মার খোরাক। তার জন্যে মঠবাড়ীরও সার্থকতা আছে। হিটলার নাকি পাদ্রীদেরও যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। চ্যাপলেন হবার জন্যে নয়, অফিসার হবার জন্যে। হিটলার খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসই করেন না। কিন্তু যাঁরা করেন তাঁদের কর্তব্য কি হিটলারের শাসন মানা, না খ্রীস্টের অনুশাসন মানা? রুশদেশেও একই সঙ্কট। যীশু তো যীশু খোদ ঈশ্বরকেই কমিউনিস্টরা খারিজ করেছে। এখন আত্মার খোরাক যে ধান সে ধানের বীজধান রক্ষা করবে কারা? কতক লোককে প্লাবনের দিন নোয়ার মতো ভেলা বানিয়ে ভাবী সৃষ্টির বীজধান বাঁচাতে হবে।"

দুই বন্ধুতে মতভেদ যখন গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে তখন বসবার ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। স্বপনদা উঠে যান। ফিরে এসে বলেন, "জুলি বলে কে একটি মেয়ে তোমাকে ডাকছে। ও কি তোমার জুলিয়েট না জুলেখা?" স্বপনদা রঙ্গ করেন।

"ওর নাম মঞ্জুলিকা সোম। বন্ধুপত্নী। যূথিকা আমাকে বলেছে ওর খোঁজ নিতে। ফোন করা হয়নি।" মানস উঠে যায়।

টেলিফোনে জুলি অভিমানের সুরে বলে, "বেশ! বেশ! মানসদা! এই তোমার বন্ধুতা! আমি যেমন তোমাদের ওখানে উঠেছিলুম তেমনি তুমিও কেন আমাদের এখানে উঠলে না? অন্তত একটা খবর দিতে পারতে কোথায় উঠবে। তাহলে আমি স্টেশনে গিয়ে তোমাকে রিসিভ করে সেই ঠিকানায় পৌঁছে দিতুম।"

"কিন্তু তুমি জানলে কী করে আমি কলকাতা এসেছি ও এখানে উঠেছি? আমার ইচ্ছে ছিল তোমাকে সারপ্রাইজ দেওয়া।" মানস বলে।

"হা হা! ওটা আমার সীক্রেট। আমাদেরও একটা সীক্রেট সার্ভিস আছে। তোমার গতিবিধি আমরাও লক্ষ করছি।" জুলি কৌতুক করে।

"এতই যদি জানতে তো স্টেশনে গেলে না কেন?" মানস জেরা করে।

"কারণ যূথীদির চিঠিখানা আমি সবে বাড়ী ফিরে পাচ্ছি। এই যাঃ! ফাঁস হয়ে গেল আমার সীক্রেট। যাক তুমি কি এখন ফ্রী আছো? দিনের বেলা আমি ফ্রী থাকিনে। কালকেও দিনের বেলা দেখা হবে না। হতে পারে রাত্রে এইরকম সময়। আমাদের এখানে ডিনারে আসবে? তোমার বন্ধুকে নিয়ে? বলো তো আমি তাঁকে আজ এখনি গিয়ে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করি। তোমার সঙ্গে একরাশ কথা আছে, মানসদা।" জুলি এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

"চলে এসো।" মানস এককথায় উত্তর দেয়।

"জুলি আসছে তোমাকে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করতে।" স্বপনদাকে বলে মানস।

জুলির পরিচিতি শুনে স্বপনদা বলে, "ওর ভগ্নীপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। মহা ধুরন্ধর ব্যারিস্টার। আদালতে বেস্ট ড্রেসড ম্যান বলে ওঁর সুখ্যাতি। কিন্তু দিনরাত মামলা মোকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন বৌকে সময় দিতে পারেন না। বৌকে বেড়াতে যেতে দেন জুনিয়রের সঙ্গে। বেড়াতে বেড়াতে বৌ একদিন হাওয়া।"

স্বপনদা হো হো করে হেসে ওঠেন। মানস স্তম্ভিত হয়।

"বৌকে সময় দিতে পারো না তো বিয়ে করতে যাও কেন? সেইজন্যেই তো ফ্লোবেয়ার বিয়ে

করেননি। নইলে লুইজ কোলে কি তাঁকে কম সাধাসাধি করেছিলেন? শেষে একদিন প্যারিস ছেড়ে তাঁর মফঃস্বলের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। ফ্লোবেয়ার সেই বিখ্যাত লেখিকাকে ঘাড় ধরে বার করে দেন। তা দেখে মর্মাহত হন তাঁর মা মাদাম ফ্লোবেয়ার। ছেলেকে বলেন, তুমি আজ সমগ্র নারীজাতির অবমাননা করলে। কাজটা সত্যিই গর্হিত হয়েছিল, মানস। কিন্তু নিয়তি! নারীর মনোরঞ্জন করতে গেলে আর্টের বিঘ্ন হয়। আর্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও এক ঈর্ষাপরায়ণা দেবী। আর্টের পূজারী হওয়াই তাঁর নিয়তি। তাঁর নিয়তিই তাঁকে নির্মম করেছিল। নয়তো সত্যিই কি তিনি হৃদয়হীন ছিলেন? যাকে শরবৎ তন্ময় হয়ে ক্লাসিক লিখতে হবে সে নারীর দাবী মেটানোর জন্যে সময় পাবে কখন?'' স্বপনদা বোধহয় নিজের নিয়তির ইঙ্গিত দেন।

মানস দুঃখিত হয়। ''কিন্তু কথা হচ্ছিল জুলির ভগ্নীপতির।''

''হ্যাঁ, যা বলছিলুম। বৌ হাওয়া হয়ে যাবার পর চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যায়। সে এক মহা কেলেঙ্কারি। হাইকোর্টে ডিভোর্সের মামলা। বারের মুখ চেয়ে জজসাহেব ক্যামেরাতে বিচার করেন। ডিভোর্সের পর দু'জনেই আবার বিয়ে করেন। জুলির দিদি হচ্ছেন দ্বিতীয় পক্ষ। তাঁর কর্তা তাঁকে মাথায় করে রেখেছেন। আর সেই প্রথম পক্ষ পড়েছেন অনটনের কবলে। ওঁরা কলকাতা ছেড়ে চলে যান পাটনায়। সেখানে নতুন করে প্র্যাকটিস জমাতে কষ্ট হয়। দেখা গেল ধনের চেয়ে মনই বড়ো জিনিস। নারীর মন চায় পুরুষের মন। অনটনে পড়লেও তিনি অনুতপ্ত নন। মা হয়েছেন। একেই বলে নিয়তি। সবই নিয়তি। সবই নিয়তির খেলা।'' স্বপনদার জীবনদর্শন।

জুলিকে রিসিভ করে বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। মানস বলে, ''ইনি আমার বন্ধু স্বপনদা। আর এই আমার বন্ধুপত্নী জুলি।''

জুলি একবার ভেবে নেয় কী করবে। পা ছুঁয়ে প্রণাম, না হাতযোড় করে নমস্কার, না হ্যাণ্ডশেক, না লাল সেলাম। তার পর হ্যাণ্ডশেকের জন্যে ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। ''প্লীজড টু মীট ইউ, মিস্টার গুপ্ত।''

স্বপনদাও ব্যারিস্টারি ঢঙে জবাব দেন, ''সো প্লীজড টু মীট ইউ, মিসেস সোম। আমি আপনার ভগ্নীপতিকে চিনি। এইমাত্র ওঁর কথা বলছিলুম।''

''আমাকে মিসেস সোম বলে লজ্জা দেবেন না। আর আমাকে 'আপনি' বললে আমি আরো লজ্জা পাব।'' এই বলে জুলি জাঁকিয়ে বসে।

তখন মানসকেই ব্যাখ্যা দিতে হয় যে বিয়ের অল্পদিন পরেই ওর স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তার পর ঘটে অকাল বৈধব্য। তখন থেকেই ও কুমারী নাম ব্যবহার করে আসছে। পিতৃপরিচয় ক্যাপটেন সিন্‌হা। সিভিল সার্জন। স্বর্গত।

''হাউ স্যাড। হাউ ভেরি স্যাড, মিস সিন্‌হা।'' স্বপনদা প্রথমে ইংরেজীতে বলে পরে শুধবে নেন। ''নিয়তি! তোমার নিয়তি।''

''আমাকে জুলি বললেই আমি খুশি হব, মিস্টার গুপ্ত। আরো খুশি হব, যদি আমাকে স্বপনদা বলার অধিকার দেন।''

''স্বচ্ছন্দে। তুমি আমাকে তুমি বললেও আমি রাগ করব না। বরং না বললেই রাগ করব, জুলি।'' স্বপনদা অভয় দেন।

এর পর মানস বলে, ''যূথিকা তোমার জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন। তুমি কি জেলে গেছ না জেলের বাইরে আছো না মাটির তলায় লুকিয়ে রয়েছ না দেশ ছেড়ে ফেরার হয়েছ? একখানা চিঠি লিখতে সময় পাও না?''

জুলি খিল খিল করে হেসে ওঠে। ''কেন? আমার কি ফ্লার্ট করার বয়স গড়িয়ে গেছে? না আমি

দেখতে খুব বিশ্রী? না আমার বিবাহে বাধা আছে?''

মানস অপ্রস্তুত হয়ে স্বপনদার দিকে তাকায়। স্বপনদা আশ্বাস দিয়ে বলেন, ''আমরা কেউ কিছু মনে করব না। তুমি নির্ভয়ে বলে যাও।''

''মানসদা তুমি তো জান আমি একটা দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। দলের লক্ষ্য বিপ্লব। কিন্তু আগেকার মতো সন্ত্রাসবাদী অর্থে নয়। এখন মার্কসবাদী অর্থে। তাই নিয়ে আমরা আজকাল সারাক্ষণ ব্যস্ত। আর কিছু পারি না পারি পুলিশকে কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো ঘোরাচ্ছি। ওরাও বিরক্ত হয়ে বলে, একটা কিছু ঘটাচ্ছ না কেন? আমরাও বিরক্ত হয়ে বলি, গান্ধী বুড়ো কেন ঘটাতে দিচ্ছে না?'' জুলি শুনিয়ে যায়।

''দেশ প্রস্তুত না হলে গান্ধীজী ডাক দেবেন না। আর প্রস্তুত বলতে তিনি বোঝেন অহিংস অর্থে প্রস্তুত। তোমরা ওঁর মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন?'' মানস জানতে চায়।

''আমরা যদি আগ বাড়িয়ে আরম্ভ করি আর তিনি বুদ্ধের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন তো আমরাই আইসোলেটেড হব।'' জুলি অকপটে স্বীকার করে।

''তার মানে জনতা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না।'' মানস এই অর্থ করে।

''তার মানে গান্ধীজী ওদের হিপনোটাইজ করেছেন। এটা একটা আজব দেশ। এদেশে ভেক না পরলে ভিখ মেলে না। নির্বাচনে দাঁড়ালে ভোট মেলে না। সংগ্রামের ডাক দিলে সাড়া মেলে না। গান্ধীজীর ভেক হচ্ছে খদ্দরের নেংটি। আর খদ্দরের টুপি। আমাদের বাধ্য হয়ে খাদি পরতে হচ্ছে, তবে নেংটি পরতে কেউ রাজী নয়। সেইজন্যে তো আমরা হিপনোটাইজ করতে পারছিনে। প্রতিদিন আমরা এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করি। বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অন্বেষণ করি। কিন্তু সমস্যার মীমাংসা মেলে না। গান্ধীজী থাকতে মিলবেও না।'' জুলিকে শান্ত মনে হয়।

স্বপনদা মৌনভঙ্গ করেন। ''দ্যাখ, জুলি, রুশ বিপ্লবের পর জার্মানীতেও বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল। তোমাকে দেখে আমার রোজা লুকসেমবুর্গের কথা মনে আসে। তুমিও তেমনি আদর্শবাদী এক বিপ্লবী নায়িকা। কিন্তু তাঁর আদর্শবাদ তাঁকে বাঁচাতে পারে না। তাঁর বিপ্লববাদ তাঁকে সাফল্য এনে দিতে পারে না। গান্ধীজী না থাকলেও যে তোমরা বিপ্লব ঘটাতে পারতে বা তাতে সফল হতে পারতে তা নয়। তিনি আছেন বলেই তোমরা একটা অজুহাত দেখাতে পারছ। হিপনোটিজম দিয়ে এর ব্যাখ্যা হয় না। ভেক দিয়েও না। সোজা অর্থে এই যে কাইজারের শাসন জারের শাসনের মতো দুর্বহ ছিল না, ইংরেজের শাসনও জারের শাসনের মতো দুর্বহ নয়। যুদ্ধের চাপে যদি কোনোদিন দুর্বহ হয় তবে জনগণ তোমাদের ডাকেও সাড়া দেবে। তবে সব বিপ্লব সফল হয় না। ফরাসী বিপ্লবও শেষপর্যন্ত বিফল হয়। তোমাদের বিপ্লবেরও শেষ পরিণতি কী হবে কে জানে? গান্ধীজী সেইজন্যে বিপ্লবের নাম মুখে আনছেন না। তাঁর লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা। উপায় অহিংস সংগ্রাম। তাঁর সঙ্গে তোমাদের না উদ্দেশ্যের মিল, না উপায়ের মিল। কেন তবে তোমরা তাঁর দোষ ধরছ?'' স্বপনদা সুধান।

''কারণ তাঁর জন্যেই সময় বয়ে যাচ্ছে। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ। এ সুযোগ একবার হাতছাড়া হলে আর মিলবে না। ইংলণ্ড সামলে নেবে। আমেরিকা সাহায্য করবে। ভারতের স্বাধীনতা একপুরুষ পেছিয়ে যাবে।'' জুলি আশঙ্কা করে।

স্বাধীনতা পাওয়া যত না কঠিন রাখা তার চেয়েও কঠিন। দেখলে না তুমি পোলাণ্ডের কী হাল হলো। পোলাণ্ডও দেড়শো বছর পরাধীন ছিল। তোমরা কি পোলদের চেয়ে বেশী সংগ্রাম করেছ? পোলদের চেয়ে বেশী নির্যাতনে ভুগেছ? পোলদের চেয়ে বেশী বীরত্ব দেখিয়েছ? আগে স্বাধীনতার যোগ্য হও। পরে স্বাধীন হবে। মওকার উপর যারা নির্ভর করে তারা দুর্বল। তারা জুয়াড়ি।'' বলে স্বপনদা মাফ চান।

জুলি ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু প্রতিবাদ করে না। স্বপনদা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "তোমার বয়স কম। তুমি অনায়াসেই আরো বিশবছর অপেক্ষা করতে পারবে। গান্ধীজীর বয়স ঢের বেশী। তিনি বিশবছর অপেক্ষা করতে পারবেন না, তার আগেই শেষবারের মতো লড়বেন। কত আর দেরি হবে! ততদিন তাঁর কথামতো কাজ করো। তাঁকে পেছনে ফেলে তোমরা কেউ এগিয়ে যেতে পারছ না, পারবেও না। তুমি এত মিষ্টি মেয়ে, তুমি এর মধ্যে কেন? তোমাকে আমি উড়নচণ্ডী দেখতে চাইনে। চুলে চিরুনি পড়েনি কদ্দিন?"

জুলি মনে মনে খুশি হয়। কিন্তু বিপ্লবী নায়িকার ভাষায় উত্তর দেয়, "দ্রৌপদীর মতো আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে দেশ স্বাধীন না হওয়াতক কেশ বাঁধব না।"

"পাগল মেয়ে।" স্বপনদা সস্নেহে বলেন, "তার আগে জট পাকিয়ে যাবে। থাকত যদি তোমাব বৌদি তা হলে এক্ষুণি ধরে নিয়ে গিয়ে মাথায় চিরুনি বুলিয়ে দিত। স্বাধীনতার অনেক দেরি। দিল্লী অনেক দূর।"

এরপর তিনজনে মিলে স্টাডিতে গিয়ে বসে। কফি আর ক্রীম পরিবেশিত হয়। চাকরকে দেখে জুলির খটকা বাধে। "স্বপনদা, বৌদি কোথায়? বৌদিকে দেখছিনে কেন?"

"বৌদি!" স্বপনদা স্বকৌতুকে বলেন, "বৌদি যে কোথায় তাই যদি জানতুম তবে এতদিন আইবুড় থাকতুম না।"

"ওঃ! তোমার বিয়েই হয়নি!" জুলি আশ্চর্য হয়। "কেন বল তো?"

"কারণটা খুব সোজা। আমি যাকে চাই সে আমাকে চায় না। যে আমাকে চায় আমি তাকে চাইনে। এমনি করে প্রায় বুড়ো হতে চললুম। তোমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাই। আমার নয়, আইরিশ কবি য়েটসের।" এই বলে স্বপনদা তাঁর বুকশেলফ থেকে একখানা কাব্যসংগ্রহ পেড়ে নিয়ে আসেন। আর পড়েন।

"Pardon, old fathers, if you still remain
Somewhere in ear-shot for the story's end...
Pardon that for a barren passion's sake,
Although I have come close on forty-nine,
I have no child, I have nothing but a book,
Nothing but that to prove your blood and mine."

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মানস। "তোমার বয়স ঊনপঞ্চাশ নয়, তোমার আশা আছে। য়েটস তো ওই কবিতা লেখার তিন বছর বাদেই বিয়ে করেন। দুটি সন্তান হয়। কিন্তু তোমার যে আবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তুমি ফ্লোবেয়ারের মতো ক্লাসিক লিখবে।"

"সেটাই বা হচ্ছে কোথায়? কেবল খসড়ার পর খসড়া মুসাবিদা করা চলেছে। আমার পরিস্থিতিটা না ঘরকা না ঘাটকা।" স্বপনদা স্বীকারোক্তি করেন।

"ওঃ।" জুলি সান্ত্বনা দেয়। তার চোখে জল এসে পড়ে। মুখ ফুটে জানায় না যে তার নিজেরও সেই একই পরিস্থিতি।

বইখানার পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় মানসের দৃষ্টি আটকে যায়। সে জুলির দিকে তাকায় আর তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চারণ করে—

"Dear shadows, now you know it all,
All the folly of a fight
With a common wrong or right
The innocent and the beautiful
Have no enemy but time. ."

মানস পড়া শেষ করে বলে, "জুলি, ওটা তোমাকেই উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। মনে রেখো, তোমার আর কোনো শত্রু নেই, তোমার একমাত্র শত্রুর নাম সময়।"

স্বপনদারও চোখে জল এসে পড়ে। "জুলি, তুমিও সময়ে সচেতন না হলে ওই দুটি সুন্দরী মেয়ের মতো শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে যাবে। দেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, নারীর যৌবন অপেক্ষা করতে পারে না।"

জুলি দুই হাতে দুই চোখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, "তুমি কি জানো না, মানসদা, কেন আমার এই দশা। কেন তবে নাকাল করতে যাও। আর স্বপনদা, তুমি যদি সব কথা জানতে তা হলে আমাকে ভুল বুঝতে না।"

এর পর জুলি স্বপনদাকে ও মানসকে পরের দিন ডিনারের নিমন্ত্রণ করে বিদায় নেয়।

মানসের ঘুম পেয়েছিল। সে উঠতে চায়, কিন্তু স্বপনদা তাকে ছাড়বেন না। শুনতে হবে তাঁর বহুদিনের না বলা কথা।

"ভ্যানিটি অভ্ ভ্যানিটিজ। অল ইজ ভ্যানিটি।" স্বপনদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "যেন আমার একার মাথাব্যথা, আর কারো নয়।"

"কোন্ প্রসঙ্গে বলছ?" মানস ঠাহর করতে পারে।

"প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমন্বয়। যার স্বপ্ন ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি। এমন করে স্বপ্নভঙ্গ হবে কে পেরেছিল ভাবতে। আমার চারিদিকের বাতাসে আজ কী উৎকট ইংরেজ বিদ্বেষ। যেন ওরা অমঙ্গলের প্রতীক। শনি কিংবা রাহু। ওদের গ্রাস থেকে মুক্তি হলেই বাঁচি। ওরা যে ইউরোপীয় সভ্যতার দূত একথা বলতে গেলে উলটো বুঝলি রাম। গোটা ইউরোপীয় সভ্যতাই অসভ্যতা। ইউরোপ বলতে ওরা বোঝে সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, বস্তুবাদ, ভোগবাদ। আর আমি বুঝি প্রাচীন গ্রীস ও রোম যার প্রতিভূ হোমার ও ভার্জিল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে জুডিয়া থেকে আগত খ্রীস্টধর্ম, যার প্রতিভূ দান্তে। এই ত্রিবেণীসঙ্গমের থেকে উত্থিত রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেন্ট। যার প্রতিভূ শেক্সপীয়ার, রুশো, গ্যেটে। এঁদের বর্জন করে কি কোনো সমন্বয় হতে পারে? কিন্তু গ্রহণশীল মনোভাবটা আজ কোথায়? বিশুদ্ধ ভারতীয় সভ্যতার স্বপ্নে যাঁরা বিভোর তাঁদের আমি কেমন করে বোঝাব যে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে আগত হেলেনিক প্রবাহকে প্রাচীন ভারত বিজেতা বলে বর্জন করেনি, আরব ইরান তুর্কিস্থান থেকে আগত সারাসেনিক মৌসুমী বর্ষণকে মধ্যযুগের ভারত বিধর্মী বলে বর্জন করেনি, তা হলে ব্রিটেন থেকে আগত আধুনিক ইউরোপীয় ভাবধারা তুমি বিদেশী বলে বর্জন করবে কোন্ যুক্তির জোরে? বিদেশী বস্ত্র বা বিদেশী লবণ বর্জন করা এক জিনিস, তা দিয়ে স্বদেশী শিল্পের সংরক্ষণ হয়, শিল্পীদের প্রতিপালন হয়। কিন্তু সেই যুক্তি কি বিদেশী জ্ঞান বিজ্ঞানের বেলায় খাটে? বিদেশী কাব্য নাটকের বেলা? সেসব অন্য জিনিস। তার যেটুকু আমরা গ্রহণ করেছি তার সংযোগে কি আমাদের যাবনী মিশাল সংস্কৃতির নব রূপান্তর ঘটেনি? বলতে পারো, এই যথেষ্ট নয়, কিন্তু বলতে পারো কি, এটা সত্য ও সৌন্দর্যহীন ব্যর্থ অনুকরণ? বিজাতীয় উন্মার্গগামিতা?"

"কে বলছে এমন কথা, স্বপনদা? আমি তো বলিনি।" মানস ক্ষুণ্ণ হয়।

"না, তোমাকে দোষ দিচ্ছিনে।" স্বপনদা শুধরে দেন। "প্রেজেন্ট কোম্পানী অলওয়েজ এক্সসেপ্টেড। তুমি তো আমার দিকে। কিন্তু অন্য দিকে যাঁরা আছেন তাঁরা খোদ রবীন্দ্রনাথেরই মহিমা অস্বীকার করছেন। রবি বাদ দিলে কী বাকী থাকে চন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র। চন্দ্রকেও অনেকে বুর্জোয়া বলে বাতিল করবেন। চন্দ্রকেও বাদ দিলে বাকী থাকে কী? তারা। যাক্, আমি আর নাম করব না। পাছে কেউ ভাবে আমি তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী। না, আমি কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নই। আমি সকলের সঙ্গেই মিশি, সকলেরই তারিফ করি। সকলেই যে যাঁর বক্তব্য বলছেন, আমি মন দিয়ে শুনছি। কিন্তু আমার সাধনা আমার

নিজস্ব। এই যে লাইব্রেরী দেখছ এর গ্রন্থরাজি থেকে আমি তিল তিল করে রূপ আহরণ করে তিলোত্তমা সৃষ্টি করছি। তেমনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার থেকে বিন্দু বিন্দু রস আহরণ করে সেই তিলোত্তমাকে মাধুরী অভিষিক্ত করছি। আমারও কিছু দেবার আছে। সে দান আমি যদি না দিই আর কে দেবে? তাই আমি অনন্য। শুধু আক্ষেপ আমার এই যে মনের মতো পাঠকমণ্ডলী নেই।"

"তা যদি বলো, রবীন্দ্রনাথেরও মাত্র তিনশো জন বাঁধা পাঠক। কবি আমাকে নিজে বলেছেন। তিনশোখানা বই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়, আর সব আস্তে আস্তে। প্রমথ চৌধুরীর বই বাজারে কাটে না, পোকায় কাটে।" ভবভূতির শ্লোক ভাষান্তর করে স্তোক দেয় মানস, কাল সে নিরবধি, বিপুলা এ পৃথ্বী।"

পরের দিন সকালে স্বপনদা বলেন, "চল, যাই, আমাদের প্রিন্স চার্মিংকে দেখে আসি। এখন না গেলে পরে ভিড় হবে।"

"প্রিন্স চার্মিং কে? মুকুলদা?" বিস্মিত হন মানস। "ও তো সন্ন্যাসী।"

"হা হা। গেরুয়া নিলেই কি সন্ন্যাসী হয়? যে যা সে তাই। মুকুল মুকুল। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। মুকুল পণ্ডিচেরীতে গেলেও গান গায়। অর্ফিউসের মতো নরনারী পশুপাখী তরুলতা সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কলকাতায় থাকলে ওর গুণগ্রাহী ও রূপদর্শীরা ওকে বাঁচতে দিত না। পণ্ডিচেরীতে গিয়ে ও বেঁচে গেছে। তবে মহানগরীর মায়া কাটাতে পারেনি। মাঝে মাঝে আসে, দু'চারদিন থেকে যায়। এবার যাঁর বাড়ীতে অতিথি তিনি ওঁর আত্মীয়া নন। আত্মীয়া ওঁর অনেক, কিন্তু ওঁদের ওখানে উঠবে না। কর্নেল মুখার্জির নাম শুনেছ? আর্মি সার্জন। যুদ্ধে ওঁকে তলব করেছে। চলে গেছেন দেশের বাইরে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আলীপুরের বাড়ীতে বাস করছেন মিসেস মুখার্জি। মন খারাপ। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখেন। তাই মুকুল গেছে কনসোলেশন দিতে। তুমি যাই বলো, ধর্মের মতো কনসোলেশন আর কিছুতেই নেই, তার সঙ্গে যদি যোগ দেয় সঙ্গীত। ভক্তিমূলক সঙ্গীত।" স্বপনদা একনিঃশ্বাসে বলে যান।

মানস সায় দেয়। "যা বলেছ। ধর্মের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা পারব না। ধর্মের পরেই আর্ট। আর্টই আমাদের শরণ্য। তা বলে ধর্মাশ্রিত আর্ট নয়। এই নিয়ে মুকুলদার সঙ্গে আমার দশবছরের তর্ক। গেলেই চেপে ধরবে। অথচ ও যে আমাকে কম ভালোবাসে তা নয়। দরদী বন্ধু। কিন্তু বিশুদ্ধ আর্ট সহ্য করতে পারে না।"

"আমার বেলাও তাই। ইউরোপ গিয়ে ও রেনেসাঁস-পূর্ববর্তী আর্ট দেখে বিমোহিত হয়েছে। যে আর্ট ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত। গ্রীক রোমক ও অগ্রাহ্য করেছে। আর আধুনিক তো ওর চক্ষুশূল। আমার কলেজ জীবনের প্রিয় বন্ধু ইউরোপ গিয়ে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গের শিল্পরসিক হয়ে ফিরেছে।" স্বপনদা দুঃখ করেন।

আলীপুরের বাড়ীতে বিস্তীর্ণ লন পার হয়ে পোর্টিকোতে পৌঁছতেই গৃহকর্ত্রী স্বয়ং অভ্যর্থনা করেন। বয়সে অনেক বড়ো, তবু দাদা বলে সম্বোধন করেন। "আসুন, আসুন, দাদারা আসুন। আহা, অত ফুল কেন? আপনারা কি পর? মুকুল তো 'ভাই' 'ভাই' করে অজ্ঞান।"

"এস, ভাই, এস" বলে মুকুলদা ওদের দু'জনকে আলিঙ্গন করেন। তার পর পরিচয় করিয়ে দেন দুই মূর্তি সাধুর সঙ্গে। দু'জনেই শ্বেতাঙ্গ, দু'জনেই মধ্যবয়সী, দু'জনেই দীর্ঘকায়। মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিকধারী। কৃষ্ণপ্রাণ একজনের নাম। হরিপ্রাণ অপরজনের।

"স্বপন আর মানস এঁরা আমার প্রিয় বন্ধু। কিন্তু এঁদের সঙ্গে আমার আড়ি। মানুষ আর প্রকৃতিকে নিয়েই এঁদের সাহিত্য। এঁরা হিউমানিস্ট। ডিভাইনকে এঁরা সাহিত্যে আনতে রাজী নন। মানস তবু বিশ্বাস করে যে মানুষ বিবর্তন সূত্রে দেবতা হতে পারে, কিন্তু স্বপন বলে বিবর্তনসূত্রে দেবতা না হয়ে দানবও হতে পারে। বিবর্তন বলতে ভালোমন্দ দুই বোঝায়। দু'রকম সম্ভাব্য তাই আছে। এঁদের সঙ্গে

তর্ক করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত।" মুকুলদা মিষ্টি হাসেন।

"আর এঁদের কথা বললে না যে?" অনুযোগ করে মানস।

"এই যে কৃষ্ণপ্রাণ ইনি ছিলেন গত মহাযুদ্ধে ফাইটার পাইলট। আর ওই যে হরিপ্রাণ উনি ছিলেন সৈন্যদের ডাক্তার। ভারতে এসে বৈষ্ণব দীক্ষা নেন। বাস করেন হিমালয়ের আশ্রমে। শীতকালে বেরিয়ে পড়েন তীর্থভ্রমণে। ফিরে যান শীতের শেষে। ইংলণ্ড থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। এখন এঁরা ভারতীয়।" মুকুলদা বলেন।

"ইংলণ্ডকে ইংরেজ না রাখলে কে রাখবে? আপনারা এবারকার মহাযুদ্ধে যোগ দিতে যাবেন না?" মানস জিজ্ঞাসা করে ইংরেজীতে।

বাংলায় উত্তর দেন কৃষ্ণপ্রাণ, "আমরা বৈরাগী বিবাগী মানুষ। ঠাকুরের নিত্য সেবা নিত্য পূজা করি। পাহাড়ে থাকি, পাহাড়ের লোক চিকিৎসার জন্যে ডাকালে চিকিৎসাও করি। এই আমাদের কাজ। যুদ্ধ এককালে করেছি, আর নয়। ঠাকুর এবার নিজেই যুদ্ধ করবেন।"

তা শুনে সংশয় প্রকাশ করেন স্বপনদা। "ঠাকুর কী করে সশরীরে যুদ্ধ করবেন? তাঁর হাত পা তো আপনি আমি?"

"স্বপন হচ্ছে সংশয়াত্মা।" কটাক্ষ করেন মুকুলদা।

"ঠাকুরের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। তিনি মধুসুর বিনাশ করেছিলেন। রাবন বধ কংস বধ করেছিলেন। এই হিটলার কোন্ ছার।" কৃষ্ণপ্রাণ উত্তর দেন।

মানস স্বপনদাকে বলে, " বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

স্বপনদা টিপ্পনী কাটেন, "বিশ্বাসে জেতেন যুদ্ধ সাধু কৃষ্ণপ্রাণ।"

সাধুরাও হো হো করে হাসেন। উপস্থিত গৃহীরাও। এক এক করে অনেকেই এসে প্রণাম করে উপবেশন করছিলেন। মুকুলদাকে ঘিরে।

"আচ্ছা, মুকুলদা," মানস জিজ্ঞাসা করে, "তুমি যে লিখেছিলে শ্রী অরবিন্দ এই যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে যোগদানের পক্ষপাতী সেটা কি নিঃশর্তে না শর্তাধীন ভাবে? যদি নিঃশর্তে হয়ে থাকে তো দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম কি ব্যাহত হবে না?"

মুকুলদা এর উত্তরে বলেন, "তোমার এই প্রশ্ন শ্রী অরবিন্দের কাছে আরো আগে আরো অনেকে করেছেন। তাঁর মতো ন্যাশনালিস্ট কে? কিন্তু সেটাই কি তাঁর একমাত্র পরিচয়? তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে নানা দেশের জিজ্ঞাসু মানুষ। তিনি কি শুধু দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক নন? তিনি কি কেবল ন্যাশনালিস্ট, ইণ্টারন্যাশনালিস্ট নন? সব দিক বিবেচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভারত স্বাধীন হলেও নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না, নিরপেক্ষ থাকাটা একটা পাপ, কারণ এই যুদ্ধটা হচ্ছে একটা মহাভয়ঙ্কর অশুভ শক্তির সঙ্গে একটা কম ভয়ঙ্কর অপেক্ষাকৃত শুভ শক্তির। এককথায় কৌরবের সঙ্গে পাণ্ডবের। ভারতের ভূমিকা হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের। তাই যদি হয়ে থাকে তবে স্বাধীনতা পেলেও ভারত লড়বে, না পেলেও ভারত লড়বে। আর মিত্রপক্ষেই লড়বে। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম আপাতত অবান্তর। আগে তো অশুভ শক্তি পরাভূত হোক, বিশ্বমানব মহাভয় থেকে পরিত্রাণ পাক। তার পরে ভারতের স্বাধীনতার দাবী আরো জোরালো হবে। সে দাবী কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। স্বাধীনতা আপনি আসবে।"

এবার স্বপনদা মুখ খোলেন। "তার মানে স্বাধীনতার জন্যে আর কখনো সংগ্রাম করতে হবে না। বিনা শর্তে যুদ্ধে যোগদানের ফলে বিনা শর্তে স্বাধীনতালাভ। কিন্তু, মুকুল, দেশের লোক যে ইংরেজদের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রাখতে পারছে না। গোটা ইউরোপীয় সভ্যতাটাকেই অভিশপ্ত ও পতনোন্মুখ ভাবছে। তা নইলে এঁরাই বা ইউরোপ ছেড়ে ভারতে বনবাস করতেন কেন? আমরা যারা ইউরোপের

গুণমুগ্ধ তারা পড়ে গেছি বিষম সঙ্কটে। এ সঙ্কট কায়িক নয়, মানসিক। ইংরেজরা লড়ছে স্বাধীনতার ইস্যুতে, গণতন্ত্রের ইস্যুতে। আমরা যদি তাদের পক্ষে অস্ত্র ধরি ও প্রাণপাত করি তবে সেটাও স্বাধীনতার ইস্যুতে, গণতন্ত্রের ইস্যুতে। কিন্তু ইংরেজের পক্ষে যেটা সত্যিকার আমাদের পক্ষে সেটা অভিনয়। গান্ধী, সুভাষ, জবাহরলাল অভিনেতা নন, দেশনেতা। দেশের লোক এঁদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। দেশবাসীর কাছে এঁরা সত্যবদ্ধ। কেমন করে এঁরা সত্যভঙ্গ করবেন ? আমার দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের অন্তরে অন্তরে একটা বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে, যদিও এত ভালোবাসি ওদের সাহিত্য, ওদের আইন, ওদের পার্লামেন্টারি সীস্টেম। নিয়তি! আমাদের নিয়তি!"

।। বাইশ ।।

এর পরে কখন একসময় অনুরাগীদের অনুরোধে গানের আসর বসে। মুকুলদার সঙ্গে যোগ দেন তাঁর প্রিয় শিষ্যা মাধুরী। ভিড় বাড়তে বাড়তে ঘর ভরে যায়। বারান্দায় উপচে পড়ে। " এ যে দেখছি অভিমন্যুর ব্যূহ।" মানস কানে কানে বলে স্বপনদার। " চল, পালাই।" স্বপনদার উত্তর। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান।

"এটা আমি শিখেছি গ্যেটের কাছ থেকে ।" স্বপনদা বলেন। "যখনি মনে হবে তুমি অবরুদ্ধ তখনি সাত পাঁচ না ভেবে দৌড় দেবে। প্রেমিকাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ফ্লাইট। তোমার মূলমন্ত্র হবে ফ্লাইট।"

"তোমার বয়সে ওঁকেও সংসার পেতে বসতে হয়। যদিও বিবাহসূত্রে নয়। পরে পুত্রকলত্রের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিয়ের মন্ত্রও পড়েন। ফ্লাইট তোমার জীবনে যথেষ্ট হয়েছে। এবার একটু গুছিয়ে বসলে গ্যেটের মতো তুমিও সৃষ্টির কাজে মগ্ন হতে পারবে।" মানস মন্ত্রণা দেয়।

"দ্যাখ, মানু। এটা ইউরোপ নয় । আগে একসঙ্গে বসবাস, বনিবনা হলে তার পরে বিয়ে, ওদেশে ওটা জলচল। এদেশে নজির থাকলে না হয় ভেবে দেখা যেত। চোখ বুজে বিয়ে করলুম, তার পরে দেখলুম বনিবনা হচ্ছে না, তখন কোথায় তোমার মুক্তি ? কোথায় তোমার শান্তি ?" স্বপনদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

" বিবাহের বেলাও নিয়ম হচ্ছে, নো রিস্ক নো গেন। তোমাকেও রিস্ক নিতে হবে। গেন যদি না হয় তবে ডিভোর্সের কথা ভাবা যাবে । সমাজ তো অনেকটা উদার হয়েছে।" মানস প্রবোধ দেয়।

" ছাই উদার হয়েছে। হিন্দু আইনে এখনো ওটা নিষেধ। আর ব্রাহ্মরাও তেমনি পিউরিটান। চরিত্রদোষ দেখাতে না পারলে তো ডিভোর্স হয় না। আমার উনি যদি নির্দোষ হন আমি কোন্ মুখে ডিভোর্স চাইব ? তা হলে আমাকেই দোষী হতে হয়। অন্তত দোষী সাজতে হয়। তা হলেও কি উনি আমাকে ত্যাগ করতে রাজী হবেন ? বিলেতে ওরা নিজেদের মধ্যে চক্রান্ত করে। দোষী না হয়েও স্বামী কলঙ্ক মাথায় নেয়। স্ত্রী মুক্তিপণ আদায় করে। দু'জনেই আবার সংসার পাতে। যদি সাথী জোটে। স্ত্রীর পক্ষে সেটা তেমন সহজ নয়। ছেলেমেয়ে হয়ে থাকলে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও ঝামেলা। না, মানু, আমি কখনো আমার ছেলেমেয়েদের হাতছাড়া করব না।" স্বপনদার দুর্জয় পণ।

মানসের মনটা উদাস হয়ে যায়। সেও কি পারবে তার ছেলেমেয়েদের হাতছাড়া করতে ? কিন্তু দূর হোক সে চিন্তা। বিয়ে তার সুখেরই হয়েছে । কেউ কাউকে ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারে না। এই যে দু'দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে মানস এর মধ্যেই ফিরে যাবার জন্যে পিছুটান শুরু হয়েছে।

"ও প্রসঙ্গ থাক ।" স্বপনদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। "মুকুলদার বিশ্বাস ধর্মের প্রেরণা থেকেই মহৎ আর্টের উদ্ভব। সেইজন্যে সে পণ্ডিচেরী গিয়ে শ্রী অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। তবে বিরজা হোম

করে সন্ন্যাসী হয়নি। মুকুল সাধু নয়, সাধক। আর তার বন্ধু কৃষ্ণপ্রাণ সাধক তথা সাধু। কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হয় না যে ধর্মের সাধক হলেই সঙ্গীতের সাধনাতেও মহত্তর সিদ্ধিলাভ ঘটে। কই, বেঠোভেনের জীবনে ধর্মের প্রভাব কোথায়? মানছি, সেটা ছিল বাখ্-এর জীবনে। অনেকের মতে তিনি বেঠোভেনের চেয়েও বড়ো। কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালে মহৎ সৃষ্টি যাঁরা করেছেন তাঁদের কেই বা ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত? আমার কাছে একরাশ রেকর্ড আছে। শুনবে?"

"জুলিদের ওখান থেকে ফিরে এসে শোনা যাবে রাত্রে।" মানস কথা দেয়।

ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনসের পেছনের সারির একটি বাংলোয় থাকেন সকন্যক মিসেস সিন্‌হা ও তাঁর এক সম্পর্কীয়া দিদি মিসেস নন্দী। জুলির মা ও মাসিমা। জুলির বাবার সম্পত্তি। রাতের বেলাটা জুলিকে এখানেই পাওয়া যায়। দিনের বেলা সে নিখোঁজ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা স্বপন আর মানস সেখানে গিয়ে সাদর অভ্যর্থনা পায়। জুলি তখনো বাড়ী ফেরেনি। তার মা ও মাসিমা ওদের দু'জনকে দু'পাশে বসিয়ে কুশলপ্রশ্ন করেন ও বেয়ারাকে ডেকে পানীয়ের ফরমাস দেন। দু'জনেই বিধবা।

"তোমাকে আমার বেশ মনে আছে, মানস। একবার আমাকে তুমি ছাতা ধরে টিউব স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলে। সে কি আজকের কথা! কেটে গেছে বছর এগারো বারো। দুলাল তখন বেঁচে। আহা, বেচারা দুলাল!" বিনীতা সিন্‌হা রুমালে চোখের জল মোছেন।

"হাঁ, আমারও মনে আছে, মিসেস সিন্‌হা।" মানস স্মরণ করে।

"আবার মিসেস সিন্‌হা কেন? তখন তো মাসিমা বলতে। দুলাল ছিল তোমার প্রাণের বন্ধু। তা হলে তার শাশুড়ী কেমন করে তোমার পর হয়?" অকাট্য যুক্তি।

"এখন মনে পড়ছে, মাসিমা।" মানস শুধরে দেয়।

"কিন্তু তোমাকে তো ওদেশে দেখেছি বলে মনে হয় না, স্বপন। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো?" বিনীতা বিনীতভাবে বলেন।

"না, মিসেস সিন্‌হা। তুমি না বলে আপনি বললেই কষ্ট পাব। আপনার মেজ জামাই আমার দাদার মতো। একসঙ্গে কত মামলায় লড়েছি। কখনো কখনো বিপক্ষেও। আপনি আমার পূজনীয়।" স্বপনদা মিসেস নন্দীর দিকে চেয়ে বলেন, "আপনিও।"

"তা হলে শোন, বাবা স্বপন। তুমি আমাকে মাসিমা বলে ডাকতে পারো। আর আমার শোভনা দিদিকেও। তোমাদের দু'জনকে দেখে আমরা যে কত খুশি হয়েছি তা কি বলবার? কিন্তু তোমাকে কি আমি আগে কোথাও দেখেছি? কবে দেখেছি, বলতে পারো? চেনা চেনা ঠেকছে কেন?" বিনীতা মাসিমা সুধান।

"আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু আপনারা যে সময় বিলেতে যান তার আগেই আমি ইউরোপ ছাড়ি। আমার চার বছরের মেয়াদ পার হয়। বেশীর ভাগ থাকতুম কন্টিনেন্টে। মাঝে মাঝে লণ্ডনে গিয়ে টার্ম রাখতুম। তাহলে আপনাকে আমি দেখেছি আরো আগে কিংবা আরো পরে। কিন্তু কোথায় ও কবে?" স্বপনের জিজ্ঞাসা।

"আচ্ছা, তুমিই বিশবছর আগেকার সেই তরুণ চিত্রকর স্বপন নাগ না? যে আর্টস ক্লাবের বৈঠকে প্রায় যোগ দিতে। চেহারা বদলে গেলেও চেনা যায়।" বিনীতা মাসিমা বলেন।

"আপনি যার কথা বলছেন তার নাম গোকুল নাগ। আমরা তো নাগ নই, গুপ্ত। আর আমি চিত্রকর নই, সাহিত্যিক।" স্বপনদা শুধরে দেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কী যেন একটা নভেল লিখে খুব নাম করেছিলে। কিন্তু তার পরে তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে। ক্লাবটাও উঠে গেল। এখনো আমি ভুলতে পারিনি সেই শক্। বুঝলে, দিদি। এরা ক'জন

মিলে যে চমৎকার ক্লাবটা গড়ে তুলেছিল তার সুযোগ নিয়ে লীলাখেলা শুরু করে দেয় অন্য কয়েকজন। তারা বয়সে বড়ো! বিবাহিত বিবাহিতা। ছেলেমেয়ের বাপ মা। একদিন শোনা গেল ক্লাবের প্রাণপ্রতিমা সুষি চ্যাটার্জী ও প্রবীণ সদস্য শিবু গোস্বামী ইলোপ করে উধাও। এদের বয়সী কুমার কুমারী হলে কেউ শক্ পেতো না। কিন্তু দু'জনেরই ঘরে বৌ আছে, বর আছে, ছেলেমেয়ে আছে। কী ঘেন্না। এর পরে কি ক্লাব চলতে পারে? সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করে। কার মনে কী আছে কে জানে! তোমার কি সেসব কথা মনে আছে, স্বপন?'' জুলির মা সুধান।

''আছে বইকি, মাসিমা। কিন্তু ক্লাবের কল্যাণে কয়েকটি ভালো বিয়েও তো হয়েছিল। যেখানেই কিছু ভালো সেখানেই কিছু মন্দ, এটাই তো দুনিয়ার রীতি। আমাদের ক্লাবও তার ব্যতিক্রম নয়। এ রকম ঘটনা কোথায় না ঘটেছে, কবে না ঘটেছে? সেকালের সবচেয়ে সুন্দরী যে হেলেন আর সব চেয়ে সুপুরুষ যে পারিস তাঁরাও তো ইলোপ করে উধাও হয়ে যান। তাই নিয়ে বেধে যায় ট্রয়ের যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধ নিয়ে অমর কাব্য ইলিয়াড রচনা করেন হোমার। ওঁরাও ছিলেন বিবাহিতা নারী ও বিবাহিত পুরুষ। ওঁদের বয়স হয়েছিল। সন্তানও ছিল হেলেনের। লোহা টানে চুম্বককে আর চুম্বক টানে লোহাকে। ওটা মেণ্টাল নয়, এক প্রকার এলিমেণ্টাল আকর্ষণ। মানুষ অসহায়।'' স্বপনদা ব্যাখ্যা করেন।

''সব চেয়ে সুন্দরী না হোক, সুন্দরী ছিল বটে সুষি। শুধু কি সুন্দরী, ওর মতো শক্তিমতী করুণাময়ী কল্যাণময়ী ক'জন? আর শিবুও ছিল তেমনি শিবতুল্য স্বামী, শুধু সুপুরুষ নয়। সেইজন্যেই ওদের পদস্খলন সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। বিলেতে গিয়ে ওরা নাকি খ্রীস্টীয় মতে বিয়ে করে। জানিনে কেমন করে দু'জনে ডিভোর্স পায়। শুনেছি ওদের নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু ঘরে ফেরার পথ বন্ধ। শিবু নাকি বিলেতেই থেকে গেছে। আর সুষি নাকি মুসৌরিতে না কোথায় হোটেল খুলে বসেছে।'' মাসিমা যতদূর জানেন।

তাঁর দিদি এতক্ষণ মুখ খোলেননি। আর চুপ করে থাকতে পারেন না। বলেন, ''বড়লোকের মেয়ে বলে সুষি ধরাকে সরা জ্ঞান করত। শিবু ছিল শিবের মতোই গরিবের ছেলে। ঝুটো আভিজাত্যের মোহে পড়ে আপনি মজেছে আর লঙ্কা মজিয়েছে। হি ইজ আ ব্রোকেন ম্যান।''

''তা যদি বলেন, মাসিমা, তো গোস্বামী সাহেবের প্রথম পক্ষ বনেদী জমিদার বংশের কন্যা। আভিজাত্যের মোহ এক্ষেত্রে অবান্তর নয় কি?'' মানস প্রতিবাদ করে। ''তার চেয়ে স্বীকার করা ভালো যে গোস্বামী সাহেবের প্রথম বিবাহটারই ব্রেকডাউন ঘটেছিল। তেমনি মিসেস চ্যাটার্জীর প্রথম বিবাহটারও। সারাজীবন দুঃখবহন না করে তাঁরা চেয়েছিলেন নতুন সাথীর সঙ্গে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে। এটাও একটা মোহ। নতুন যখন পুরনো হয়ে যায় তখন মোহভঙ্গ ঘটা বিচিত্র নয়। কিন্তু কারো কারো বেলা প্রথম বিবাহের ব্যর্থতাটাই দ্বিতীয় বিবাহের সার্থকতার সোপান। এদেশে না হোক ওদেশে তো এসব ঘটনা আকছার ঘটছে। দেখেশুনে মনে হয় নতুন করে জীবন আরম্ভ করার সব চেয়ে বড়ো অন্তরায় প্রথম বিবাহের সন্তান। এটা আরম্ভের সময় খেয়াল থাকে না। পরে একটু একটু করে হুঁশ হয়। তখন অনুশোচনা জন্মায়। আবার সন্তান হলে, আবার জড়িয়ে পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই। আরো বড়ো দুঃখবহন করতে হয়। বিশেষত নারীকে। আপনি হলে বলতেন, শী ইজ আ ব্রোকেন উওম্যান।''

স্বপনদা কী জানি কেন আহত বোধ করেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হয় তিনি বাণবিদ্ধ। বেয়ারা এসে পানীয় পরিবেশন করলে তিনি হুইস্কির গ্লাস টেনে নিয়ে জোরে চুমুক দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাক্যের ফোয়ারা খুলে যায়।

''ওটা একটা শাশ্বত সমস্যা, মানস। ওর থেকে এসেছে সেকালে ইলিয়াড। একালে আনা কারেনিনা।'' পারি তো আমিও তেমনি একখানা ক্লাসিক লিখব। যার পরিণতি বেদনাদায়ক। হ্যাঁ, পুরুষের পক্ষেও।'' স্বপনদা সংশোধন করেন।

স্বপনদা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢোকে জুলি আর তার দুই কমরেড, বাবলী সেন ও চানু লাহিড়ী। ভালো নাম অপরাজিতা ও প্রণব। পরিচয়পর্ব সারা হলে জুলি বলে, "স্বপনদা, বাবলীর বহুদিনের সাধ তোমার সঙ্গে আলাপ। তোমার জন্যেই ওর আসা।"

"আমার সঙ্গে!" স্বপনদা আশ্চর্য হন। "মহিলাদের কাছ থেকে আমি শতহস্ত দূরে থাকি। আর বিপ্লবীদের কাছ থেকে সহস্রহস্ত দূরে। তবে এমন একদিন ছিল যখন আমার কাহিনীর নায়িকা হবার জন্যে কত মেয়েই না আসাযাওয়া করত। সেই যে ফোর আর্টস ক্লাবের দিন, যার কথা একটু আগে হচ্ছিল মাসিমাদের সঙ্গে।"

তা শুনে খিল খিল করে হেসে ওঠে বাবলী আর জুলি। বাবলী বলে, "তখন মডেলের জন্যে আপনাকে আর কারো দিকে তাকাতে হতো না। ঘরে বসেই পেয়ে যেতেন মডেল। কী মজা!"

"মডেল!" স্বপনদা চমকে ওঠেন। "না, কাউকে মডেল করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার ছবি আঁকার পদ্ধতি অন্যরকম। মডেল সামনে রেখে আমি আঁকিনে। আপনি ধরে নিতে পারেন যে আমার নায়িকারা অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা। আমি বাস্তববাদী নই, তবে যা আঁকি তা অবাস্তবও নয়।"

"আমার তো মনে হয় সব সত্যি, একটুও কল্পনা নয়। এক একখানা উপন্যাস যেন এক একটা আর্ট গ্যালারি!" বাবলী বলে,"এখন আমি কৈফিয়ৎ দাবি করি, আপনি লেখা বন্ধ করে দিলেন কেন?"

স্বপনদা গলে গিয়ে জবাব দেন,"লেখা তো আমার পেশা নয়, আমার নেশা। পেশার জন্য অন্য কিছু করতে হয়, তার আগে শিখতে হয়। গেলুম বিদেশে ব্যারিস্টারি পড়তে। লেখায় ছেদ পড়ে গেল। ফিরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করলুম। জানো তো, ল ইজ আ জেলাস মিস্‌ট্রেস। আইন একটি ঈর্ষাপরায়ণা দেবী। লক্ষ্মী দেবী সরস্বতী দেবীকে সহ্য করবেন না। সরস্বতীই বা সহ্য করবেন কেন? তিনিও তেমনি ঈর্ষাপরায়ণা। একে তো দেবীতে দেবীতে ঈর্ষা, তার উপর মানবীতে মানবীতে। এর জন্যে আপনিও কৈফিয়ৎ দাবী করেননি, আমিও কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই। আমি জানি যে আমার কাছে পাঠকরা অনেক প্রত্যাশা করে, কিন্তু এইসব দেবী আর মানবী মিলে আমাকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। আর প্র্যাকটিসও যে জমাতে পারলুম তাও নয়। সেখানেও জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমি তো মুখচোরা মানুষ। দাঁড়াতে গেলেই স্টেজ ফ্রাইট। ওই জুনিয়র হয়েই বারো বছর কেটে গেল। আমিই খেটে খুটে ব্রীফ তৈরি করে দিই, লড়াই করেন যখন যিনি সীনিয়র। সিংহের ভাগ তাঁরই পেটে যায়। ছেড়ে দেবার কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। কিন্তু তা হলে আমার পেশা কী হবে? নেশাটাকেই পেশা করতে পারলে এ প্রশ্নের উত্তর মিলে যায়, কিন্তু তাতে অন্তরের সায় নেই। সে কাজে সফল হয়েছিলেন প্রভাত মুখুজ্যে। কিন্তু শরৎ চাটুজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবেন কেন? আমিও কি তাঁর সঙ্গে বা তাঁর সগোত্রদের সঙ্গে পারতুম? আমার গোত্রই আলাদা। আমি সব দিক থেকে হেরে গেছি, ব্যর্থ হয়েছি, বাবলী ভাই।"

বাবলী তা শুনে গদগদ হয়ে বলে, "না, না, আপনি আবার উঠবেন, দাদা। আমরাই আপনাকে টেনে তুলব। আপনার কাছে আমরা একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। আপনিই আমাদের টুর্গেনিভ। আপনিই, একমাত্র আপনিই লিখতে পারেন আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল'। জুলি যা বলে বলুক, বিপ্লবের ঢের দেরি। তার আগে জমি চষতে হবে। অহল্যা জমি। টুর্গেনিভ না হলে, গোর্কি না হলে লেনিন হয় না। টুর্গেনিভের খোঁজ পেয়েছি, কিন্তু গোর্কি নিখোঁজ।"

স্বপনদা অভিভূত। ওদিকে জুলি মানসের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। হঠাৎ নিজের নাম শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে জানতে চায়,"আমার নামে কী চুকলি কাটছিস্, বাবলী?"

"চুকলি নয়, বলছি তোর মতে বিপ্লবের আর দেরি নেই, আমার মতে ঢের দেরি। এটা কি ঠিক নয়?" বাবলী সাফাই দেয়।

"দেশটা আগ্নেয়গিরির চূড়ায় বসে আছে। যে কোনো দিন লাভাবর্ষণ হতে পারে। তারই নাম বিপ্লব। কী বলিস্, চানু? তুই তো আমাদের থিয়োরিটিসিয়ান।" জুলি চানুকে সালিশ মানে।

চানু চাণক্যের মতো মহাধূর্ত। জুলিকেও চটাবে না, বাবলীকেও না। হিসেব করে কথা বলে। "বিপ্লবের আর দেরী নেই এটাও যেমন ঠিক ওটাও তেমনি ঠিক যে বিপ্লবের সিগনাল আসবে কমরেড স্টালিনের কাছ থেকে কমরেড রজনী পাম দত্তের কাছে, তার পর রজনী পাম দত্তের কাছ থেকে কমরেড ডাঙ্গের কাছে তার পর কমরেড ডাঙ্গের কাছ থেকে আমাদের কাছে। দিনক্ষণ স্থির করার ভার কমরেড স্টালিনের উপরে। কারণ তিনিই সবচেয়ে অভিজ্ঞ। সব চেয়ে বিচক্ষণ।"

জুলি অধৈর্য হয়ে সুধায়, "কিন্তু সেই দিনটি কবে?"

"যে কোনো দিন। ছ'মাস পরেও হতে পারে ছ'বছর পরেও হতে পারে।" চানু ছেলেটি ঝানু। একবার এর মুখের দিকে তাকায়, একবার ওর মুখের দিকে।

সালিশের রায় শুনে দু'জনেরই চক্ষু স্থির। বাবলী বলে, "ছ'মাস পরে যদি হয় তবে স্বপনদাকে দিয়ে 'ভার্জিন সয়েল' লেখানো যাবে না। কী আফসোস।"

জুলি বলে,"ছ'বছর দেরি হলে গান্ধী বুড়ো কী হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? বামপন্থীদের উপর দক্ষিণপন্থীরাই টেক্কা দেবে।"

বিনীতা মাসিমা বিনীতভাবে প্রশ্ন করেন,"আগ্নেয়গিরিটা তো ভারতের মাটিতে। লাভাবর্ষণটাও মস্কো থেকে সহস্র যোজন দূরে। তবে সিগনালটা কী করে আসবে কমরেড স্টালিনের কাছ থেকে? তাও বিলেত ঘুরে? ওদেশের ইংরেজরা ওটা ইন্টারসেপ্ট করবে না?"

বাবলী এর উত্তরে বলে,"সেইজন্যেই বামপন্থীদের কতক এখন সুভাষ বোসের দিকে ঝুঁকছে। কতক এম. এন. রায়ের দিকে। স্টালিন যাদের কাছে অভ্রান্ত তাদের কতক আবার বিলেতের দিকে তাকাতে নারাজ। আমরা কি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই বিলেতের মুখাপেক্ষী? বিপ্লবের ব্যাপারেও? আমাদের মধ্যে যারা সরাসরি মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে চাই তারা বিলেতকে বাদ দিতে চাই।"

"মরণ!" শোভনা মাসিমা মন্তব্য করেন,"বিলেতকে বাদ দিয়ে কিছুই কি হবার জো আছে এদেশে? রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে সংস্কারকরা সবাই বিলেতমুখো। মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে কবিরা সবাই বিলেতমুখো। স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনও হয় আমেরিকামুখী, নয় বিলেতমুখী। তোমার নরমপন্থী চরমপন্থী সব কটি নেতাই তো বিলেতে পড়াশুনা করেছেন বা বিলেতে গিয়ে স্বরাজের জন্যে তদ্বির করেছেন। বিলেতফের্তা না হলে কেউ আজকাল নৃত্য গীত অভিনয়েও পাত্তা পায় না।"

বাবলী তা শুনে ক্ষুণ্ণ হয়। সাহেব খুন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে পাঁচটি বছর জেলখানায় কাটিয়েছে। সেই সুবাদে সে সর্বত্র সমীহ পায়। কিন্তু তা নিয়ে সে গর্ব বোধ করে না। কেউ বন্দনা করলে বলে,"সাহেব বেঁচে গেছে, আমিও বেঁচে গেছি। সাহেব মারা গেলে আমিও মারা যেতুম। তোমরা শহীদ বলে পুজো করতে জানি। কিন্তু আমার জীবনে আরো মহৎ কাজ আছে।"

বাবলীর মুখভাব দেখে জুলি ত্রস্ত হয়ে বলে,"মাসিমা, বাবলী বিলেতে যায়নি বলে ওর কি কম খাতির?"

"খাতির যা দেখছিস্ সেটাও ওই সাহেব মারতে যাওয়ার জন্যেই। নেটিভ মারতে গেলে অত খাতির পেত না।" মাসিমা উত্তর দেন।

বাবলী বেচারির মুখ চুণ। জুলির মা সেটা লক্ষ করে দিদিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বলেন, "আমরা বুড়ীরা যদি এখানে থাকি ওঁরা যুবাবয়সীরা প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে সঙ্কোচ বোধ করবে। চল, দেখি গিয়ে রান্নার কতদূর কী হলো।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হাওয়া বদলে যায়। বাবলীকে উৎফুল্ল দেখায়। জুলিও কলরব বাধায়। চানুকে নড়েচড়ে বসতে দেখা গেল। ওদের ফুর্তি বেড়ে যায় যখন আরো এক মূর্তির আবির্ভাব হয়। জুলির সন্ধানে সৌম্য চৌধুরীর।

পরিচয়পর্বের পর সৌম্যকে ঘিরে আলোচনা জমে ওঠে। সবাই জানতে চায় গান্ধীজী কী ভাবছেন। কংগ্রেসের ভিতরের খবর কী। বিপ্লবের প্রসঙ্গ তলিয়ে যায়।

সৌম্য যা শুনেছে তার মর্ম, গান্ধীজী বামপন্থীদের কাজকর্মে বাধা দিতে চান না। তারা যা ভালো মনে করে করুক। শুধু কংগ্রেসকে বা তাঁকে না জড়ালেই হলো। তিনি এ যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন না, কংগ্রেস যদি করে তবে তাঁকে বাদ দিয়েই করবে। ওরা স্বাধীন, উনিও স্বাধীন। যখন সত্যাগ্রহের লগ্ন আসবে তখন তিনি কারো জন্যে অপেক্ষা করবেন না। একাই এগিয়ে যাবেন।

"কিন্তু সেটা কবে?" সৌম্যদার পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে জুলি সুধায়।

"যে কোনো দিন। লগ্নের কোনো ঠিক ঠিকানা আছে নাকি? তবে আমার যতদূর অনুমান সেটা খুব কাছেও নয়, খুব দূরেও নয়।" সৌম্যর অনুমান।

"মিলে যাচ্ছে।" চানু খুশি হয়ে বলে, "আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।"

"কিন্তু তোমারটা তো বিপ্লব। ওঁরটা তো সত্যাগ্রহ।" বাবলী একটার সঙ্গে আরেকটার তুলনা করে।

"আর সিগনালটা তো একই উৎস থেকে নয়।" জুলি ছিদ্র ধরে।

"আসুন, সৌম্যবাবু, আমরা হাত মেলাই।" চানু হাত বাড়িয়ে দেয়। "আমাদের উপর নির্দেশ হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে মোর্চা গঠন করে বিপ্লব ঘটানো। অবশ্য আমাদের মধ্যেও কতক লোক আছেন যাঁদের বিশ্বাস গান্ধী ও কংগ্রেস জনগণের কেউ নন, সাম্রাজ্যবাদের বা ধনতন্ত্রবাদের বর্ণচোরা মিত্র। এটাও একপ্রকার গোঁড়ামি। ইংরেজ যতদিন আছে তার বিরুদ্ধে আপনারা ও আমরা একজোট হয়ে লড়ব। তার পরে একসঙ্গে কাজ করা অসম্ভব হলে জোট ভেঙে দেওয়া যাবে।"

সৌম্য হেসে বলে,"প্রস্তাবটা তো ভালোই, কিন্তু আপনাদের যে আবার প্রতি ছ'মাস অন্তর থীসিস পালটে যায়। একদিন হয়তো শুনব ইংরেজ আপনাদের মিতা, কারণ রাশিয়ানরা ইংরেজদের মিতা। আমরা লড়ব একটা মরাল ইস্যুতে। যুদ্ধের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। মিলিটারিজম তো রাশিয়াতেও ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। আর স্টেট ক্যাপিটালিজমও তো আরেক রকম ক্যাপিটালিজম। ভারতের জনগণকে আমরা যে কেবল ইংরেজদের কবল থেকে উদ্ধার করতে চাই তা নয়, যুদ্ধবাজ ও যন্ত্রবাজ স্বদেশীয় প্রভুদের হাত থেকেও।"

স্বপন আর মানস ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠছিল। বাড়ী ফিরে বেঠোভেন শুনতে হবে। কিন্তু কোথায় ডিনারের লক্ষণ! এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দেয় খানা তৈয়ার। ডাইনিং রুমে গিয়ে যে যার নামের কার্ড চিনে নিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করে।

টেবিলের দুই মাথায় বিনীতা সিন্‌হা আর শোভনা নন্দী। মিসেস সিন্‌হার বাঁ দিকে স্বপন আর ডান দিকে মানস। মিসেস নন্দীর বাঁ দিকে সৌম্য আর ডান দিকে চানু। স্বপন আর মানসের মাঝখানে বাবলী। সৌম্য আর চানুর মাঝখানে জুলি। সৌম্যর জন্যে নিরামিষ তরকারি ছিল। বিধবারাও নিরামিষ খান। জুলিও তাদের তালিকায় পড়ে। তবে সে কট্টর নিরামিষাশী নয়। পাঁচজনের খাতিরে নিয়মভঙ্গ করে।

জুলি জিজ্ঞাসা করে সৌম্যকে,"ওসব তো বাইরের কথা। ভিতরের কথা কী শুনেছ? যা কোথাও বেরোয়নি।"

"গান্ধীজীর কাছে গোপনীয় বলে কিছু নেই। তাঁর তাসগুলো সকলের সামনে মেলে ধরা। যেটা

গোপনীয় সেটা হচ্ছে কংগ্রেস নেতাদের পলিসি। তাঁরা স্থির করে ফেলেছেন যে দরজা সব সময় খোলা রাখবেন। কোনো অবস্থায় বন্ধ করবেন না। তার মানে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা ভিতরে ভিতরে চলছে ও চলতেই থাকবে। গ্রহণযোগ্য ফরমূলা এখনো পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলেই ওঁরা সদলবলে যুদ্ধে ঝাঁপ দেবেন। কারো মানা মানবেন না। মহাত্মারও না। বাপু এখন ভীষণ নিঃসঙ্গ। তাঁর তো আলাদা কোনো দল নেই। ওই কংগ্রেসই তাঁর দল। নতুন একটা দল তৈরি করার মতো বলও নেই, বয়সও নেই। মনে মনে প্রার্থনা করছেন, সবকো সম্মতি দে, ভগবান। বাঘ হরিণ মেরে তার মাংস ফেলে রেখে এসেছে। ফিরে গিয়ে ভূরি ভোজন লাগাবে। অর্থাৎ মন্ত্রীরা খালি রেখে আসা গদীতে বসবেন। সুভাষচন্দ্র তো রাগ করবেনই, কিন্তু গ্রহণযোগ্য একটা ফর্মূলা যদি পাওয়া যায় আর মন্ত্রীরা যদি মসনদে ফিরে যান কী করে তিনি তাঁদের তাড়াবেন? কংগ্রেসে তাঁদেরই তো ভোটবল বেশী। আর কংগ্রেস চলে ভোটের জোরে। যুদ্ধে যোগদানকারীদের গায়ের জোরে হটানো যাবে না। তাঁদের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। কংগ্রেসের ভাঙন অনিবার্য, ইংরেজ যদি তাকে ডেকে নিয়ে কেন্দ্রের শাসন পরিষদে ক্ষমতার সিংহভাগ দেয়। সেক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ কোনো কাজেই লাগবে না, অথচ খুব কাজে লাগবে জিন্না সাহেবের বিদ্রোহ। গান্ধীজী আশা করছেন যে বড়লাট পেছিয়ে যাবেন। তাঁর কাছে যেটা আশার কথা কংগ্রেস নেতাদের কাছে সেটাই আশঙ্কার কথা। তাঁরা এখন ভাবছেন কী দিয়ে জিন্নাকে তোষণ করা যায়। তাঁর আপ্ত বাক্য হচ্ছে মুসলীম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র দল। কংগ্রেস যদি মুসলীম লীগের কলমা না পড়ে তবে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলবেন না। আর বড়লাট যদি প্রকারান্তরে স্বীকার না করেন তো বড়লাটের সঙ্গেও না। সবাই ভেবে অবাক হচ্ছে জিন্নার এতখানি তেজ আসে কোন্‌খান থেকে। গান্ধীজী বলছেন, জিন্না সকলের উপর ডিকটেটরি করবেন, শাসকদের উপরেও। কংগ্রেস তার দরজা খোলা রাখলে কী হবে, লীগ তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে! আর লীগের দরজা বন্ধ মানে বড়লাটের দরজাও বন্ধ।

মানস মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করে, "তাই যদি হয় তবে যুদ্ধে সকলের সহযোগিতা চাওয়া কেন? কেন্দ্রে রদবদল না হলে কেই বা রাজী হবে সহযোগিতা করতে?"

জুলি চেঁচিয়ে ওঠে, "না একো রুপেয়া, না একো জওয়ান। মরুক ব্যাটারা বেলজিয়ামের যুদ্ধক্ষেত্রে।"

ওর মা বাধা দেন। "ও কী বলছিস্, জুলি! কেউ যদি রিপোর্ট করে তোর শ্বশুরের পেনসন বন্ধ হয়ে যাবে।"

"এই, তোমরা কেউ রিপোর্ট করবে নাকি?" জুলি চুপসে যায়।

"ক্ষেপেছিস্? আমরা কেউ কখনো অমন কাজ করতে পারি!" বাবলী অভয় দেয়। চানুও। স্বপনদা ওকে সতর্ক করে দেন। দেওয়ালের কান আছে।

মিসেস সিন্‌হা কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বলেন, "এ মেয়ে আমাকে পাগল করে ছাড়বে। এরই জন্যে কোন্ দিন না আমাকে সুদ্ধ ধরে নিয়ে যায়। বিপ্লব, আগ্নেয়গিরি, লাভাবর্ষণ এসব শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা।"

স্বপনদা তাঁকে আশ্বাস দেন। "ওদের বিপ্লব তো ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও এখন বেকার। আবার যেদিন মন্ত্রীরা মসনদে ফিরে যাবেন আবার আগ্নেয়গিরির লাভাবর্ষণ হবে, অবশ্য সমস্তটাই মুখে। ওদিকে জিন্না সাহেবেরও ধনুর্ভঙ্গ পণ কংগ্রেস মন্ত্রীদের তিনি মসনদে ফিরে যেতে দেবেন না। যেতে দিলে তিনিও অগ্নিবর্ষণ করবেন। তার মানে দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। একদিকে বিপ্লব, আরেকদিকে দাঙ্গা, এ যেন সেই হোমার বর্ণিত সীলা আর ক্যারিবডিস। এ দুয়ের মাঝখান দিয়ে জাহাজ চালাতে হবে স্বাধীনতার পাইলটকে। কী

করে তা সম্ভব তা জানেন একমাত্র গান্ধীজী। কিংবা তিনিও জানেন না। জানে আমাদের নিয়তি। যাকে বলে হিস্টরিকাল ডিটারমিনিজম। মানুষ তো নিমিত্তমাত্র।"

ডিনারের পর সকলের সঙ্গে করমর্দন করে স্বপনদার সঙ্গে মানসেরও বিদায়। সৌম্যও উঠতে যাচ্ছিল, জুলি তাকে উঠতে দেয় না। বাবলীরাও সেবাগ্রামের ভিতরের খবর শুনতে চায়। কিন্তু সৌম্য নিজে জানলে তো? গান্ধীজীর মুখ বন্ধ।

বাড়ী ফিরে গ্রামোফোনে বেঠোভেনের 'এরোইকা' চড়িয়ে স্বপনদা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে শোনেন। তার পর বলেন, "তুমি বোধ হয় জানো না যে এই হীরোর নাম নেপোলিয়ন। তখনো তিনি সম্রাট হননি, অথচ দিগ্বিজয়ী। বেঠোভেনের মনে হয়েছিল তিনি শুধু ফরাসী বিপ্লবের নয় বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের বীর। সুতরাং সকলের শ্রদ্ধেয়। পরে তাঁর মোহভঙ্গ হয়। তাই বলে তিনি তাঁর সৃষ্টি প্রত্যাহার করেন না বা তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন না। একবার যেটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা বরাবরের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য হাওয়ার সঙ্গে উড়ে গেছে, কিন্তু 'এরোইকা'র সমাদর এখন জগৎ জুড়ে, ধর্মের পরে আর্টই চিরজীবী।"

তন্ময় হয়ে শোনে মানস। বলে "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মতো এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও একদিন হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যাবে। কিন্তু কোথায় আমাদের বেঠোভেন, কোথায় তাঁর 'এরোইকা'! আমাদের এই দুই শতাব্দীর কোন্ সৃষ্টি আজি হতে শতবর্ষ পরে দেশ বিদেশের মানুষের অন্তরে এমনি দোলা দেবে!"

প্রশ্নটা স্বপনদাকেও ভাবিয়ে দেয়। তিনি বলেন, "বোধহয় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান ও কবিতা। হয়তো শ্রী অরবিন্দের 'সাবিত্রী'।"

"তা হলে তুমিই তোমার আর-সব কাজ ছেড়ে 'এরোইকা'র সঙ্গে তুলনীয় কিছু সৃষ্টি করো, স্বপনদা।" প্রস্তাব করে মানস।

স্বপনদা চমকে ওঠেন। "আমি! আমি কি বেঠোভেনের সঙ্গে তুলনীয়! তবে আমারও একটা মহৎ কল্পনা ছিল, এখনো আছে, রূপ দিতে পারলে ক্লাসিক পর্যায়ে ঠাঁই পেতো। কিন্তু বকুল কি আমাকে লিখতে দেবে! সে এখন পরের ঘরণী। পূর্ব প্রেমের উপাখ্যান তাকে বিষম বিব্রত করবে। সীতার মতো অগ্নিপরীক্ষার ভয়ে সে অস্থির। ভয়টা অমূলক নয়। যা সমাজ আমাদের! আমার আশা ছেড়ে দাও, মানু। আমি ফেল। পারো তো তুমিই একখানা ক্লাসিক লেখো।"

"আমি!" মানস অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "আমার কাছে প্রথম কথা হচ্ছে ঠিকমতো বাঁচা। তার পরের কথা ঠিকমতো লেখা। জীবন ঠিক না হলে আর্ট ঠিক হবে কী করে!"

"ওখানেই তোমার ভুল। আর্ট হচ্ছে পঙ্কজ। দান্তে, গ্যেটে, টলস্টয়, টুর্গেনিভ কারই বা জীবন অকলঙ্ক চন্দ্র! অথচ জ্যোৎস্না তো ফিনিক ফুটেছে।" স্বপনদা বলেন।

।। তেইশ ।।

দুই বন্ধুর নৈশ সংলাপে গভীর থেকে গভীরতর ও গাঢ় থেকে গাঢ়তর স্তরে পৌছয়। ওদিকে রাত্রিও গভীরতর ও অন্ধকারও গাঢ়তর হয়।

"তোমাকে কেমন করে বোঝাব, স্বপনদা, আমার কী যন্ত্রণা, কী বিষাদ! বিশ্বরঙ্গমঞ্চে কত বড়ো বড়ো ঘটনার অভিনয় চলছে, আমি শুধু নীরব দর্শক। আমাকে সমস্তক্ষণ দগ্ধ করছে আমার এই অসহায় দশা, এই ইম্পোটেন্স। আমার বিয়ে সুখের হয়েছে, তা ঠিক। কিন্তু আমরা দু'জনে সুখী হলে কী হবে কোটি কোটি মানুষ এই যুদ্ধের আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়ে মরবে। তাদের পারিবারিক সুখ নষ্ট হবে। কোন্ অধিকারে আমরা সুখী হব? আমি তো মনে মনে অপরাধী বোধ করছি।" মানস এলিয়ে

পড়ে।

"একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।" স্বপনদা কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলেন, "নাও, খাও দাও ফুর্তি করো। আজ বাদে কাল কী হবে তার ঠিক নেই, যুদ্ধ যে কতদূর গড়াবে তার স্থিরতা কী? এই কলকাতা শহরই যুদ্ধের অঙ্গন হতে পারে আর আমিও এয়ার রেডের শিকার হতে পারি। নীরব দর্শক না হয়ে সরব অংশীদার হয়েই বা আমার সার্থকতা কী? পারব কি আমি আগুন নেবাতে? আমিও হব আর-একটি পতঙ্গ। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে কত বড়ো বড়ো ঘটনার অভিনয় হচ্ছে সেটা দর্শন করাও তো একটা করণীয় কর্ম। দর্শন না করলে ব্যাস কখনো মহাভারত রচনা করতে পারতেন না। বাল্মীকি কখনো রামায়ণ রচনা করতে পারতেন না। বেশীর ভাগ কল্পনা হলেও খানিকটা তো সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা।"

"তা হলে আমাদের ওয়ার করেসপণ্ডেণ্ট হয়ে ফ্রণ্টে যেতে হয়, স্বপনদা। আমাদের ভূমিকা সঞ্জয়ের ভূমিকা।" মানস বলে।

"ফ্রণ্ট কি একটা? ফ্রণ্ট ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পৃথিবী জুড়বে। একদিন এই বাংলাদেশেই হবে অন্যতম ফ্রণ্ট। যদি না যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। অসম্ভব নয়। একপক্ষ আত্মসমর্পণ করলেই যুদ্ধ থেমে যাবে।" স্বপনদা স্বপ্ন দেখেন।

"অসম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভবপরও নয়।" মানস বলে। "জার্মানরা সেবার আত্মসমর্পণ করেছিল সৈনিকদের খোরাকের অভাবে। এবার যাতে খোরাকে টান না পড়ে তার জন্যে তারা প্রথমেই দখল করে নিচ্ছে পোলাণ্ড। তার অসামান্য শস্যভাণ্ডার। একদিন না একদিন উক্রাইন আক্রমণ করবে। দখল করতে পারলে অফুরন্ত শস্যভাণ্ডার। হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগারিয়া এরাও শস্য জোগাবে, যদি পদানত হয়। এবারকার যুদ্ধ সেবারকার মতো খোরাকের অভাবে থামবে না, স্বপনদা। নাৎসীরা যেমন নিষ্ঠুর, ওরা নাকি সৈনিকদের জন্যে খোরাক বাঁচাবে অসুস্থ ও রুগ্‌ণ মানুষদের বাঁচতে না দিয়ে। তার পরের ধাপটা ইহুদী ও জিপ্‌সী জাতীর বিনাশ। তারও পরের ধাপ স্লাভ জাতির নিকাশ। ওদের ওই সর্বনেশে জাতিতত্ত্ব বিংশ শতাব্দীতে অভাবনীয়। ওদের নিরস্ত করতে হলে পরাস্ত করতেই হবে, কারণ ওরা আত্মসমর্পণ করবে না বলে বদ্ধপরিকর।"

স্বপনদা স্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। যুদ্ধে হেরে যাবার গ্লানি ওরা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যায়নি। রাতকে ওরা দিনে পরিণত করবে। হারকে জিতে পরিণত করবে। ওই ম্যাণ্ডেট নিয়েই হিটলার নেতৃত্বে নাৎসীরা এসেছে। কেবল ইংরেজ ও ফরাসীদের উপর জিতলে চলবে না, রাশিয়ানদের উপরেও জিততে হবে। তা না হলে ওদের জয় অসপত্ন হবে না। তার পরে আমেরিকার উপরেও জিততে হবে। নইলে জয় অসমাপ্ত থেকে যাবে। নেপোলিয়নের পরে হিটলারের মতো উচ্চাভিলাষী আর জন্মায়নি। কিন্তু নেপোলিয়নের পেছনে ছিল ফরাসী বিপ্লবের বিরাট পটভূমিকা। বিপ্লবের সার্বজনীন বাণী। নেপোলিয়ন নিজেও ফরাসী ছিলেন না। আর এই হিটলার জার্মান ভিন্ন আর কারো প্রাণে আশার সঞ্চার করেন না। এঁর যে বাণী তা বিপ্লবের নয় প্রতিবিপ্লবের। তুমি তো জানো জার্মানদের প্রতি আমার কী পরিমাণ ভালোবাসা। তা বলে কি আমি ফরাসীদের কিছু কম ভালোবাসি? আমার দেশকে স্বাধীন হতে, সমান হতে দিচ্ছে না বলে ইংরেজদের উপর রাগ থাকলেও অনুরাগ কিছুমাত্র কম নয়। এ যুদ্ধে ওদের হার হোক এটা আমি চাইনে। তা হলে দাঁড়ায় এই যে আমি এবারকার যুদ্ধে নিরপেক্ষ। তবে ইংরেজরা যদি বিনা শর্তে আমার দেশকে স্বাধীনতা দেয় আমিও নেহরুর মতো মিত্রপক্ষে যোগ দেব। কিন্তু জার্মান জাতিকে আমি লাঞ্ছিত হতে বা তাদের দেশকে বিধ্বস্ত হতে দেব না। এবারকার সন্ধিটা সেবারকার মতো অন্যায় সন্ধি হলে আমি বাধা দেব। অর্থাৎ ভারত বাধা দেবে।"

মানস প্রীত হয়ে বলে, "তোমার সব কথা আমার না হলেও মোটের উপর আমারও সেই কথা।

জার্মানদের পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়ে দিতে হবে, যাতে ওরা তৃতীয়বার যুদ্ধ বাধাতে না চায়। কিন্তু সেটা বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। হিটলার যাদের সর্বনাশ করবে তারা তার প্রতিশোধ নেবে গোটা জার্মান জাতিরই উপর। যদি না গোটা জার্মান জাতিই সময় থাকতে হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। আর তার নাৎসীদের চরম শাস্তি দেয়। জার্মান জাতির সহানুভূতি না থাকলে কি ওরা পরের সর্বনাশ করতে পারে। দণ্ড যখন আসবে তখন জার্মানীর উপরেই আসবে। এটা কি ওরা বোঝে না? তবে এ দুর্মতি কেন?"

স্বপনদার সেই বাঁধা উত্তর। "হিস্টরিকাল ডিটারমিনিজম। ঐতিহাসিক নিয়তি। জার্মানীতে যত জ্ঞানীগুণী আছেন তত আর কোন্ দেশে? বিবেকী পুরুষেরও অভাব নেই। ইচ্ছে থাকলে উপায় থাকে। যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু এক অপ্রতিরোধ্য নিয়তি জার্মানদের জ্ঞানীগুণী বিবেকীদেরও এই বলে ভুলিয়েছে যে হিটলার তো জার্মান ভিন্ন আর কারো দেশ আত্মসাৎ করার কথা বলছেন না। সারল্যাণ্ড জার্মানীর একাংশ, অস্ট্রিয়াও জার্মানীর একাংশ, বোহেমিয়ার জার্মানভাষী অঞ্চলও জার্মানীর একাংশ, পোলাণ্ডের একাংশও জার্মানভাষী। তাঁদের ধারণা হিটলার ওখানেই দাঁড়ি টানবে। সেটা নিয়তিকে চোখ ঠারা। হিটলার এখন বাঁচবার মতো জায়গার ধুয়ো ধরেছেন। আর জায়গা না পেলে নাকি জার্মান জাতি বাঁচবে না। তা হলে যাদের জায়গা কেড়ে নেবেন তারা কি বাঁচবে? তাদের অপরাধ তারা জার্মান নয়। জার্মানীর জ্ঞানীগুণীরা বিবেকীরা চেঁচিয়ে বলছেন না যে এটা তাদের প্রতি অন্যায়। এই ইস্যুতে তারা জেলে যেতে পারতেন। অসিয়েটস্কি ছাড়া আর কেউ গেছেন বলে শোনা যায় না। তিনি তো জেলেই দেহরক্ষা করেছেন। নিয়তি! নিয়তি! নিয়তিই জার্মানদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুরুক্ষেত্র অভিমুখে। তাদের প্রতিবেশীদেরও। কেন এরকম হলো? আমার মনে হয় সারা ইউরোপটাই টোমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেনে'র সেই স্যানিটারিযাম। যেখানে সকলেই অসুস্থ। অথচ সকলেই চালাক চতুর, ভোগসুখে রত। সভ্যতাই যেন একটা ব্যাধি। ইউরোপ সভ্যতার ব্যাধিতে ভুগছে, ডেথ উইশ কাজ করছে। যুদ্ধই ইউরোপের নিয়তি। যুদ্ধের করোলারি বিপ্লব। বিপ্লবও তার নিয়তি। যদিও তৎক্ষণাৎ নয়।"

এর পর যে যার ঘরে শুতে যায়।

মানসের পুরাতন সতীর্থ বিজন বর্ধন সাত ঘাটের জল খেয়ে কলকাতায় বদলী হয়েছেন। সে এখন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়াটে কোন্ একটা ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। তার বাসগৃহ পায়ে হেঁটে গেলে দশ মিনিটের পথ। মানস পরের দিন স্বপনদাকে একা রেখে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোয় আধ ঘণ্টার জন্যে। বিজনকে একটা চমক দেয়। সে তখন ড্রেসিং গাউন পরে তার বাসগৃহের লন্‌এ পায়চারী করছে। সেটাই তার একমাত্র ব্যায়াম। মানসকে দেখে ছুটে এগিয়ে এসে হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁকানি দেয়।

"কবে এলে? কই, আমাকে তো খবর দাওনি? কোথায় উঠেছ? কী উপলক্ষে আসা? যূথিকাকেও সঙ্গে এনেছ নাকি? তোমার তো এখন বদলীর কথা নয়। কে যেন বলছিল তুমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছ। পাগল!" এক নিঃশ্বাসে বলে যায় বিজন আর মানসকে ধরে নিয়ে যায় ড্রয়িং রুমে। মানস উত্তর দিতে দিতে যায়।

একটু পরে গৃহকর্ত্রী উদ্দিতার উদয়। যথারীতি চায়ের আয়োজন। পারিবারিক কুশলপ্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন। ওরা ওদের একমাত্র সন্তান সুজনকে দার্জিলিং এর সেন্ট পল্‌সে ভর্তি করে দিয়ে এখন ঝাড়া হাত পা। যেখানে খুশি যতবার খুশি বদলী করুক সরকার। ওরা সবসময় তৈরি।

ওদের বিয়েতে মানসেরও একটা ভূমিকা ছিল। কনে দেখার জন্যে জহুরী হিসাবে সঙ্গে করে নিয়ে যান বিজনের বাবা বর্ধন মশায়। মানস প্রশংসা করে। কর্তা নাকি ইতিমধ্যে তিনশোটি মেয়ে দেখে নাকচ করেছিলেন।

ওদিকে মানসের বিয়েতেও বিজনের একটা ভূমিকা ছিল। বিয়ের আগে ততটা নয়, পরে যতটা। দুই বন্ধুর যৌথ গৃহস্থালীর ভার বিজন যূথিকাকেই ছেড়ে দেয়। আর নিজের বিয়ের তারিখ ছ'মাস এগিয়ে দিতে তৎপর হয়।

এইসব পুরনো কাসুন্দী ঘাঁটতে ঘাঁটতে আর হাসাহাসি করতে করতে আধঘণ্টা কেটে যায়। তখন বিজন তার ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ী বার করতে হুকুম দেয়।

কথায় কথায় ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের প্রসঙ্গ ওঠে। বিজন বলে, "এখানকার ইউরোপীয়ানদের সকলের ধারণা এই যুদ্ধে গান্ধীজী একজন ডিফিটিস্ট। তিনি নাকি প্রকাশ্যেই সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন যে এযাত্রা ইংরেজদের জয় অনিশ্চিত। এমন লোকের সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে শাসকদের আন্তরিক আপত্তি। তবে গান্ধীজীর উপর আস্থা না থাকলেও কংগ্রেস নেতাদের উপরে তাঁদের ভরসা আছে। তাঁরা সহযোগিতায় রাজী, যদি সরকার তাঁদের শর্ত অনুসারে পুনর্গঠিত হয়। এটা একটা নেগোশিয়েবল ব্যাপার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তাঁদের উপরে মিস্টার গ্যাণ্ডীর অপরিসীম প্রভাব। তাঁরা কি তাঁর হাতের মুঠোর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন? ইতিমধ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পাইকারী পদত্যাগ করে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের সম্ভাবনার পথে কাঁটা দিয়েছেন। প্রদেশগুলিতেও যদি কোয়ালিশন না হয় তবে কেন্দ্রে কোয়ালিশন হবে কী করে? একই দল কি কেন্দ্রে শাসক পক্ষ হবে, প্রদেশে বিরোধী পক্ষ হবে? কিংবা প্রদেশে শাসক পক্ষ, কেন্দ্রে বিরোধী পক্ষ? যুদ্ধকালে এই গণ্ডগোল ডেকে আনার চেয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই শ্রেয় নয় কি? গান্ধীজী তাঁর মুঠো আলগা করলেও জিন্না সাহেব নাছোড়বান্দা।"

মানস স্বীকার করে। তাঁর মন্তব্য শুধু এই যে, "লণ্ডনের নিউ স্টেটসম্যানের মতে গান্ধীজী একজন রেভোলিউশনারি ডিফিটিস্ট। যেমন ছিলেন লেনিন। গত মহাযুদ্ধে। ভারতেও তেমনি কিছু ঘটতে পারে, সম্রাট যদি যুদ্ধে হেরে যান।"

মানসকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে তার সঙ্গে এক বাক্স খাবার দেয় উদিতা। বলে, "দীপক আর মণির জন্যে তাদের মাসিমার স্নেহের নিদর্শন।"

"সুজনকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো", বলে মানস বিদায় নেয়।

স্বপনদা খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে মানসকে দেখে বলেন, "এই তোমার আধঘণ্টা! জানি ওরা চা না খাইয়ে ছাড়বে না। এখন ব্রেকফাস্টের জন্যে সবুর করতে হবে। নতুন কথা কী শুনে এলে বর্ধনের ওখানে?"

"গান্ধীজী এই যুদ্ধে ডিফিটিস্ট বলে সরকার ওঁর সঙ্গে নেগোশিয়েট করবে না। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে করবে, যদি ওঁরা গান্ধীজীর মুঠো থেকে বেরোন। তার মানে নদীর মাঝখানে ঘোড়া বদল করেন।" মানস ব্যাখ্যা করে।

"প্রশ্নটা হচ্ছে কে কার পেছনে ধাওয়া করবে। বড়লাট গান্ধীজীর পেছনে না গান্ধীজী বড়লাটের পেছনে। যুদ্ধে সহযোগিতাটা কার পক্ষে অত্যাবশ্যক। সরকারের পক্ষে না গান্ধীজীর পক্ষে। আমি শুনেছি যে গান্ধীজীর শিবির থেকে কংগ্রেস নেতাদের ভাঙিয়ে নেবার একটা চেষ্টা চলেছে। কয়েকজন বরের ঘরের পিসী আর কনের ঘরের মাসী জুটেছেন, তাঁরাই এ ব্যাপারে সচেষ্ট। বৃথা চেষ্টা। গান্ধী ওঁদের উপর নির্ভর করেন না, ওঁরাই করেন গান্ধীর উপর নির্ভর। কংগ্রেস নেতারা কখনো গান্ধীজীকে অমান্য করবেন না, যদিও ক্ষমতার জন্যে ছটফট করবেন। যুদ্ধ একটা ছেলেখেলা নয়। ভারত যদি এতে জড়িয়ে পড়ে তা হলে মানুষের দুঃখকষ্ট বেড়ে যাবেই। অভিশাপটা পড়বে নেতাদের উপরে, যদি তাঁরা ক্ষমতার ভাগী হন। আবার উল্টো দিক থেকেও বিচার করতে হবে। ভারত যদি সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য না করে ইংরেজ একা লড়তে পারবে না। গুর্খা শিখ আর পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্য তার চাইই

চাই। কিন্তু এদের সাহায্য পেতে হলে কংগ্রেসকে ক্ষমতার ভাগ না দিলেও চলে। গান্ধীজীর তো এদের সঙ্গে যোগাযোগই নেই। কেন তা হলে সরকার কংগ্রেসের পেছনে বা গান্ধীজীর পেছনে ধাওয়া করবে?" এই পর্যন্ত বলে স্বপনদা আবার কী মনে করে বলেন, "তবে হ্যাঁ, লড়াই যদি চার পাঁচবছর গড়ায় তবে দেশের লোক খেতে পরতে পাবে না, তখন দেশের নেতাদের ডাক পড়বে দায়িত্বের ভাগ নিতে। বড়লাট ধাওয়া করবেন নেতাদের পেছনে। গান্ধীজীর পেছনে। অপেক্ষা করতে গান্ধীজী প্রস্তুত। কিন্তু নেতারা প্রস্তুত নন। এঁদের মুখ চেয়ে একটা আন্দোলন আরম্ভ করতেই হবে তাঁকে। জানিনে কবে ও কী আকারে।"

"ব্যাপক আকারে নিশ্চয়ই।" মানস ধরে নেয়।

"ব্যাপক আকারে করলে কি বেশী লোক সাড়া দেবে? এই যে বাংলাদেশ এর অর্ধেক লোক তো মুসলমান। তাদের একজনও কি কংগ্রেসী আন্দোলনে ঝাঁপ দেবে? বাকী অর্ধেক লোক যদিও হিন্দু তাদের অধিকাংশই এখন গান্ধীবিমুখ, সুভাষ অভিমুখ। অহিংসার উপরে তাদের লেশমাত্র বিশ্বাস নেই। গান্ধীজীর আন্দোলনের আড়ালে ওরা হিংসাত্মক কাণ্ড কারখানা করে যাবে। ফলে সরকার হবে আরো নিষ্ঠুর। যুদ্ধকালে কেউ দয়ামায়া দেখায় না। কোর্ট মার্শাল করে ঝুলিয়ে দেয়। এর দায়িত্ব কি গান্ধীজীর উপরেও অর্শাবে না? একই কথা খাটে পাঞ্জাবের সম্বন্ধেও। সেখানেও অর্ধেক মুসলমান। কেউ ঝাঁপ দেবে না। অর্ধেক হিন্দু-শিখ। অধিকাংশই অহিংসাবিমুখ। মার্শাল রেস বলেই তাদের গর্ব। বাকী থাকে সিন্ধু প্রদেশ। সেখানে মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুর জান অতিষ্ঠ। আন্দোলনটা মাঠে মারা যাবে।" স্বপনদা আফসোস করে বলেন, "সেই যে একটা কথা আছে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। গান্ধীজীর দশা হয়েছে তাই। বিশবছর আগে তাঁর যে অথরিটি ছিল, এমন কী দশবছর আগেও যে অথরিটি ছিল, সে অথরিটি আজ নেই। তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। আগে তাঁকে তাঁর অথরিটি পুনরুদ্ধার করতে হবে। তার পরে ব্যাপক আন্দোলন।" স্বপনদার অনুমান।

ব্রেকফাস্টের মাঝখানে আচমকা দুই কন্যার আবির্ভাব। জুলি আর বাবলী। স্বপনদা শশব্যস্ত হয়ে বলেন, "চা না কফি? পরিজ না ফোর্স? অমলেট না পোচ? না, বেকন আমার এখানে চলে না। আমার মুসলমান বাবুর্চির শুচিবাতিক আমাকে মানতে হয়।"

"আমরা কিন্তু খেতে আসিনি, স্বপনদা।" জুলি তাঁর একপাশে বসে, বাবলী তাঁর অপর পাশে। "আমাদের অনুরোধ — আবদারও বলতে পারো — ছোটবোনদের আবদার — তোমাকে টুর্গেনিভের মতো আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল' লিখতে হবে। তুমি 'না' বলতে পারবে না। এটা তোমার ঐতিহাসিক দায়িত্ব।" জুলির অনুনয়।

স্বপনদা মানসের দিকে তাকিয়ে কপট ভয়ে বলেন, "তুমি তো জজ না ম্যাজিস্ট্রেট। তুমি আমাকে এই দুই বিপ্লবী নায়িকার হাত থেকে উদ্ধার করো।"

"আমিও তো ওদেরি পক্ষে। তোমাকে দিয়ে জোর করে না লেখালে তুমি কি কোনো কালে লিখবে?" মানস জুলিকে ও বাবলীকে উসকে দেয়।

"আপনার উপর আমরা জোর জুলুম করব না, দাদা। আপনি আপনার খুশিমতো লিখবেন। আমরা যদি জেলের বাইরে থাকি মাঝে মাঝে আপনাকে তাগাদা দেব। কী লিখলেন, কতখানি লিখলেন চেয়ে নিয়ে দেখব।" বাবলী বলে মিষ্টি করে।

"এই দুটি নাবালিকা কিশোরীকে নিয়ে উপন্যাস জমানো যায় না। এদের নিয়ে বড়জোর রূপকথা লেখা যায়।" স্বপনদা বলেন মানসকে। "এই যে জুলি, এর নাম মিস ক্যারামেল। আর এই যে বাবলী এর নাম মিস চকোলেট। এদের দু'জনের অ্যাডভেঞ্চার লিখলে সেটাও একটা অমর কীর্তি হবে। যেমন 'অ্যালিস্ ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'। কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা যারা হবে তাদের জীবনে চাই আরো বেশী

ম্যাচিওরিটি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স না হলে, দু'তিনবার প্রেমে না পড়লে বা বিবাহের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে না গেলে তাদের নিয়ে যা লেখা হয় তা নেহাৎ পান্‌সে বা প্যানপ্যানে। তার জন্যে আমাকে কলম ধরতে হবে কেন? দেশে কি কলমগীরের অভাব? না উপন্যাসের অভাব?"

বাবলী আর জুলি প্রথমটা খুশি হয় নাবালিকা কিশোরী কমপ্লিমেণ্ট পেয়ে। পরে রেগে যায় প্রেমের ও বিবাহের উল্লেখ শুনে। তার পর প্রকৃতিস্থ হয়।

"আমরা কি বলেছি যে আমাদের নিয়েই নভেল লিখতে হবে?" বাবলী তর্ক করে। "আমাদের বাদ দিলেই আমরা কৃতার্থ হব, দাদা। কিন্তু 'ভার্জিন সয়েলে'র বৈশিষ্ট্য হলো বিপ্লব শুধু পুরুষদের ব্যাপার নয়। নারীরও তাতে সক্রিয় ভূমিকা। আর নারীর উপর টুর্গেনিভের যত দরদ তত তাঁর আগে আর কারো নয়। অনেকটা আপনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সেইজন্যেই তো আপনার উপর পক্ষপাত।"

স্বপনদা আপ্যায়িত হয়ে বলেন, "পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। অ্যাঁ! আমি অবাক হচ্ছি হে, মানু, কী করে এরা আমাকে খুঁজে বার করল। কেমন করে এরা টের পেলো যে আমার জীবনেও একজন মাদাম ভিয়ার্দো আছেন, যাঁর জন্যে আমিও আমার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি, বিনা প্রতিদানে। হ্যাঁ, তিনিও দেশবিখ্যাত গায়িকা। ইতিহাস একদিন বলবে যে তিনি গানের জগতে যত বড়ো আমি সাহিত্যের জগতে তার চেয়েও বড়ো। তা না হলে আমাকে বিয়ে না করে তিনি আরেকজনকে বিয়ে করলেন কেন? টুর্গেনিভের সঙ্গে মিল আমার ওই পর্যন্তই। ওর বেশী নয়। তাঁর মতো আমার কোনোও অবিবাহিতা পত্নী বা প্রাকৃতিক কন্যা নেই।"

হঠাৎ যেন বোমার আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে বাবলী আর জুলি। মুখদুটি ফ্যাকাসে দেখায়। লক্ষ করে মানসও তটস্থ।

মেয়েরা চুপ মেরে যায়। স্বপনদা মৃদু হেসে বলেন, "তোমরা যখন আরো বড়ো হয়ে বিশ্বসাহিত্য পড়বে তখন জানবে বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকরা কেউ সামাজিক মানুষ ছিলেন না। সামাজিক মাপকাঠি দিয়ে তাঁদের বিচার হয় না। হয় সাহিত্যিক মাপকাঠি দিয়ে। সেদিন থেকে টুর্গেনিভ অনেক উঁচুতে। আর আমি অনেক নিচুতে। 'ভার্জিন সয়েল' লিখতে পারি তেমন অভিজ্ঞতা কি আমার আছে!"

"আমাদের পাঁচজনের অভিজ্ঞতা আপনার কাছে আমরা তুলে ধরব, স্বপনদা, আপনার যদি অরুচি না থাকে।" বাবলী বলে সসঙ্কোচে।

"তোমরা যদি পূর্ণ সত্য বলো তবে তা দিয়ে একটা মূল্যবান দলিল তৈরি করতে পারি, কিন্তু দলিলকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করব কী করে? মিথ্‌ ও লেজেণ্ড দিয়ে তাকে সাধারণের আকর্ষণীয় করা যায়, কিন্তু তা হলে সে টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র পর্যায়ে উন্নীত হবে না। চাই প্রেম, চাই করুণা, চাই দুই বিবদমান পক্ষের বিচিত্র মানবিক গুণাগুণ। কেবলমাত্র হিংসাদ্বেষকে অবলম্বন করে তো মহাকাব্য বা মহা উপন্যাস হয় না। যেখানে বিষ আছে সেখানে অমৃতও আছে, এটা যদি রূপায়িত করতে না পারি তবে আমি ব্যর্থ হব, বোন।" স্বপনদা আবেগের সঙ্গে বলেন।

"আমরা মাঝে মাঝে আসব, যে যা জানি শোনাব। তার থেকে আপনি যা নিতে পারেন নেবেন। যদি কিছু মিশোল দিতে চান দেবেন। আমরা যে পুরোপুরি নির্দোষ তা তো নয়। আমাদের বিবেকের দংশন আছে। আমি তো ক্ষমা করতে পারিনি আমার কৃতকর্মকে। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী, এই যা সান্ত্বনা। না, আমি হীরোইন নই! হতেও চাইনে। আমাকে যে শক্তি চালিত করেছিল সে শক্তির নাম হিংসাদ্বেষ নয়, তা দেশপ্রেম। সে শক্তি আর কিন্তু আমাকে সেই পথে চালিত করে না। তার জায়গা নিয়েছে আরো এক শক্তি। এর নাম সামাজিক ন্যায়।" বাবলী আপনার কথা বলে যায়।

"গতস্য শোচনা নাস্তি। যা ঘটে গেছে তা ঘটে গেছে।" স্বপনদা আশ্বাস দেন। "কিন্তু যেটা ঘটাতে চাও সেটা একটা মায়া। একটা মরীচিকা। তুমি যতই তাঁর দিকে এগোবে সে ততই দূরে সরে যাবে।

একদিন দেখবে যে দেশে বিপ্লব বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। শুধু তুমিই ওল্ড মেড হয়েছ। আর তুমিও।" এই বলে স্বপনদা জুলির দিকে তাকান।

মানস ও বেচারিদের পক্ষ নিয়ে বলে, "ওরা কেন ওল্ড মেড হবে, তুমিই হবে ওল্ডে ব্যাচেলর। যদি না তোমরা ওই মাদাম ভিয়ার্দোর জাদুমন্ত্র কাটাও। তোমরা মেয়েরা যদি নাছোড়বান্দা হও স্বপনদা তোমাদের একজনকে বিয়ে করবেন, আর নয়তো তোমাদের এড়াবার জন্যে আর একজনকে।"

"দূর! আমরা কি বিয়ের জন্যে এসেছি না আসতে চাই? অমন কথা বললে আর আমরা আসব না কিন্তু।" জুলি ঠোঁট ফোলায়।

"বিয়ে আমাদের জন্যে নয়। আমরা বিপ্লবের কাছে অর্পিত হয়ে রয়েছি। বিপ্লবের পরে যদি সুযোগ পাই বিপ্লবী কমরেডের সঙ্গেই বিয়ে হবে। বুর্জোয়া বরের সঙ্গে নয়। কোন্ বুর্জোয়া বরই বা আমাদের বিয়ে করতে রাজী হবে! বিয়ে করে পুলিশের নেকনজরে পড়বে!" বাবলী উদাসীন।

"এই দুই উদাসিনী রাজকন্যাকে নিয়ে দিব্যি একখানা উপন্যাস লেখা যায়, মানু। তা তোমরা তোমাদের গুপ্তকথা আমাকে জানাতে পারো, বাবলী আর জুলি। উপন্যাসটা কিন্তু বৈপ্লবিক হবে না। হবে রোমান্টিক।" স্বপনদা কথা দেন।

বাবলী ভুরু কুঁচকে বলে, "তাতে কি বিপ্লবের দিন ত্বরান্বিত হবে, দাদা? তা যদি না হয় তবে কাজ কী অমন রোমান্টিসিজমে? আমরা চাই ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা। ফুল নয়, ফল আমাদের লক্ষ্য।"

"ত্বরান্বিত!" স্বপনদা ফোঁস করে ওঠেন। "সম্ভব হলে বিলম্বিত করতুম। যারা প্রাদেশিক সরকার চালাতে গিয়ে দুটো বছরও টিকতে পারল না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি করে যুদ্ধের অজুহাতে পদত্যাগ করল, তাদের হাতে কেন্দ্রীয় সরকার পড়লে খেয়োখুয়ি করে ছ'মাসের মধ্যেই নতুন এক অজুহাতে আবার দৌড় দেবে। বিপ্লব হলে দেশকে সামলাবে কিনা এদের চেয়ে আরো অনভিজ্ঞ আরো বয়ঃকনিষ্ঠ বামপন্থী দল। বিপ্লব কি ছেলেখেলা না জেলেপাড়ার সঙ্! বোনদের সামনে বলতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলে উপায় নেই যে, বিপ্লব হচ্ছে দেশের বা সমাজের প্রসবযন্ত্রণা। যার থেকে নবজন্ম হয়। আর সেই প্রসবযন্ত্রণারও পূর্বে থাকে শতাব্দীকালের গর্ভযন্ত্রণা। ফ্রান্সের ইতিহাস পড়েছ? রাশিয়ার ইতিহাস পড়েছ? পড়ে না থাকলে আমার লাইব্রেরীতে এসে পড়তে পারো। আমি পড়াব। এর কোনো শর্টকাট নেই, বোন। বিপ্লব হঠাৎ একদিন হয়, সেকথা সত্যি। কিন্তু সেই হঠাতের পেছনে থাকে বহুকালের পটভূমিকা। গোটাকয়েক সহেব মেরে যেমন রাষ্ট্রবিপ্লব হয় না, তেমনি হাজার কয়েক জমিদার মহাজন ব্যবসাদার বধ করেও সমাজবিপ্লব হয় না। যেটা হবার নয় সেটার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে চাও তো করো, কিন্তু তার আগেই তোমরা ওল্ড মেড হয়ে ব্যর্থ হবে, বাবলী আর জুলি, আমার দুটি প্রিয় বোন।" স্বপনদার স্বর কাঁপে।

ওরা দু'জনে নির্বাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কী যেন বলার আছে, অথচ ভাষা ফোটে না।

"আমি জানি তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ।" স্বপনদা বলেন ধরা গলায়, "কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে চাই বৃহৎ প্রস্তুতি। চুরি করে, ডাকাতি করে, খুন করে, ফেরার হয়ে কি বৃহৎ কোনো প্রস্তুতি হয়? মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত বীরত্বের পূর্বাভাষ কোথায় ও কতটুকু? বিপ্লব কি ভারতের মাটিতে কখনো এর আগে হয়েছে? তার ঐতিহ্যই আমাদের জনমানসে নেই। বিদ্রোহ মাঝে মাঝে ঘটেছে, সিপাহী বিদ্রোহও তেমনি এক ঘটনা। সব চেয়ে বড়ো। কিন্তু ফরাসী বা রুশ বিপ্লবের পর্যায়ে পড়ে তেমন বিপ্লব যদি চাও তো ত্বরান্বিতের আশা ছেড়ে দাও। বরং বিলম্বিতের জন্যেই মনটাকে তৈরি করো। তা হলে অযথা আত্মত্যাগ করতে হবে না। তোমাদের মতো মেয়েদের ভাববিহ্বল আত্মত্যাগ আমাকে মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে, কিন্তু বেদনায় অভিভূত করে তার চেয়ে বেশী।

তাই তোমাদের দুর্ভোগ নিয়ে আমি ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা লিখতে পারিনে। লিখলে রোমান্টিক রচনাই লিখব। কিন্তু এখন নয়। এখন আমার উপরে ক্লাসিক সৃষ্টির বরাত। যতদিন না লিখতে পারছি ততদিন আমার শান্তি নেই, বোন। তার আগে না যুদ্ধ এসে পড়ে। তা হলে আমার ঘরবাড়ী লাইব্রেরী সামলানোই দায় হবে। এ যুদ্ধ যে কতকাল গড়াবে, কতদূর গড়াবে তা কে বলতে পারে।"

জুলি ফরফর করে বলে, "ওটা ইংরেজদের ব্যাপার। আমাদের নয়।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ইংরেজরা যদি হেরে যায় আর তাদের শত্রুরা এদেশে এসে হানা দেয় তবে আমাদের ব্যাপারও হতে পারে।" মানস কণ্ঠক্ষেপ করে। "কিন্তু, স্বপনদা, বাবলী আর জুলি কচি খুকি নয়, এরা জেলফেরৎ বীরাঙ্গনা, আর বাবলী তো জেলখানায় বসে এম. এ. পাশও করেছে। তুমি এদের পড়াবে কী। এরা সব পড়েছে।"

স্বপনদা তাঁর দুই বোনের পিঠে দুই থাপ্পড় দিয়ে মাপ চান। "এর পরে আবার যেদিন আসবে সেদিন এক বাক্স ক্যারামেল আর এক বাক্স চকোলেট পাবে। আমার চোখে তোমরা নাবালিকা কিশোরী ছাড়া আর কিছু নও। তোমাদের জন্যে গোটা দুই রূপকথা লিখব কিনা ভাবছি। রূপকথার শেষে কী থাকে জানো তো? 'দে ম্যারেড অ্যাণ্ড লিভ্ড হ্যাপিলি এভার আফটার'। তোমরা যদি গুপ্তকথা শোনাতে চাও শুনব, কিন্তু গুপ্ত চক্রান্তের মধ্যে আমি নেই। নীতিহিসেবে ওটা বন্ধ্যা। রূঢ়তা মাফ কোরো, ওর মধ্যে সমাজের বা সমষ্টির না আছে গর্ভযন্ত্রণা না প্রসবযন্ত্রণা। নবজন্মের জন্যে আমিও ব্যাকুল। কিন্তু যা নেই তাকে নিয়ে আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল' লিখতে পারিনে। অন্য কেউ যদি পারেন তাঁকে আমি শিরোপা দেব। বাবলী আর জুলি, আমার আদরের দুটি বোন, তোমরা গুপ্ত পন্থার চোরাগলি ছেড়ে দাও। রাজপথ দিয়ে চল, তা হলে হয়তো একদিন আমি 'এরোইকা'র মতো কিছু লিখতে প্রেরণা পাব।"

বিদায়ের পূর্বে জুলি সুধায়, "মানসদা কি আজকেই ফিরে যাচ্ছ? সৌম্যদা কিন্তু আরো দিনকয়েক থাকছে। গান্ধীজী নাকি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বেরোবেন। তার জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। একদল নাকি ক্ষেপেছে তাঁকে মারতে। আপনিও কিছু করবেন না, আর-কাউকে কিছু করতে দেবেন না। বসে বসে চরকা কাটবেন। লোকে তো যা তা বলবেই। সাম্রাজ্যবাদের দালাল, ধনতন্ত্রের দালাল, এমনি কত কথা। আমরা এদিকে হাঁ করে বসে আছি কবে উনি গণসত্যাগ্রহের সঙ্কেত দেবেন। আগ্নেয়গিরি লাভা বর্ষণ করবে। তা নয়, উনি কিনা চললেন পদ্মানদীর জলযানবিহারে।"

"অমন কথা মুখে আনতে নেই, জুলি।" মানস ব্যথা পায়। "অনেকদিন আগে থেকেই স্থির হয়ে রয়েছে যে গান্ধী সেবাসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন এবার ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের স্বগ্রামে বসবে। গান্ধীজীর যোগদান একান্ত আবশ্যক। কী যেন এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বোধহয় যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে গঠনকর্মীদের নীতিনির্ধারণ। এসব দায়দায়িত্ব চুকিয়ে না দিয়ে কি আন্দোলনের ডাক দেওয়া যায়? এতই যদি তোমাদের তাড়া তবে তোমাদের বামপন্থী নেতারা তাঁর অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন?"

বাবলীই এর জবাব দেয়। "নেতায় নেতায় গুরুতর মতভেদ। কেউ বা তাকিয়ে আছেন গান্ধীজীর দিকে, কেউ বা কমরেড স্টালিনের দিকে। সুভাষচন্দ্রের ভক্তেরা তৃতীয় একদিকে। এন এন রায়ের শিষ্যরা চতুর্থ একদিকে।"

স্বপনদা মুচকি হেসে বলেন, "আর জনগণের দিকে তাকিয়ে আছেন কে?" উত্তর না পেয়ে নিজেই মন্তব্য করেন, "শ্রমিক শক্তি যদি তৈরি না থাকে, কৃষক শক্তি যদি প্রস্তুত না থাকে, সৈনিক শক্তি যদি স্বপক্ষে না থাকে তবে বিপ্লব দূর অস্ত্। গান্ধীজী যদি বিপ্লব চাইতেন তা হলে তিনি অক্ষম হতেন। তিনি চান বিপ্লব নয়, স্বরাজ। যেটা রাশিয়ায় ছিল, ভারতে নেই। স্বরাজই হচ্ছে প্রথম ধাপ, একে ডিঙিয়ে

বিপ্লবের ধাপে পা রাখা যায় না। স্বরাজের জন্যেও জনগণ সব রকম কষ্ট সইতে প্রস্তুত নয়। ইংরেজ কি ঘাড় মটকে না দিয়ে ঘাড় থেকে নামবে? সব চেয়ে যেটা খারাপ সেটার জন্যেও জনগণকে তৈরি করে নিতে হবে। বামপন্থী নেতারা বরাবরই গান্ধীজীর আড়াল থেকে লড়েছেন, তাই তাঁদের দায়িত্ববোধ জন্মালে টের পাবেন যে কুম্ভকর্ণকে অকালে জাগাতে নেই। জাগলে নিশ্চিত পরাজয়।"

জুলি জ্বলে ওঠে। "তার মানে কি এই যে, যুদ্ধের সময় বিপ্লবের সময় নয়?"

স্বপনদা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করেন, "হতেও পারে, না হতেও পারে। কে জানে কোন্‌টা আমাদের ঐতিহাসিক নিয়তি! গান্ধীজীও কি জানেন?"

।। চব্বিশ ।।

বিদায় নিতে গিয়ে বাবলী বলে, "দাদা, আপনি কিন্তু আমাদের হাতে মোয়া ধরিয়ে দিয়ে নিরাশ করলেন।"

স্বপনদা স্মিত মুখে বললেন, "আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি, এদেশের মাটিতে সত্যিকার বিপ্লব যেদিন ঘটবে সেদিন আমি যদি বেঁচে থাকি ও আমাকে যদি লিখতে দেওয়া হয় তবে আমি সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করব। কিন্তু রাম না জন্মাতে রামায়ণ রচনা আমার দ্বারা হবে না। তাতে করে তোমাদের বিপ্লবেরও তেমন কোনো সুরাহা হবে কিনা সন্দেহ। উল্টে আমাকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্যারিসে আশ্রয় নিতে হবে। তোমরা কি মনে করেছ টুর্গেনিভ ও বই রাশিয়ায় বসে লিখেছিলেন?"

জুলি মানসকে বলে, "ফিরে গিয়ে যূথিকাকে আমার প্রীতি জানাবেন আর দীপক ও মণিকাকে ভালোবাসা। চিঠি আমি ইচ্ছে করেই লিখিনে, লিখলে সে চিঠি পুলিশের হাতে পড়বে। যূথিকাও সন্দেহভাজন হবে।"

মানস তাকে অভয় দেয়। "আমি তো স্বেচ্ছায় রাজকর্ম থেকে অপসরণ করতে যাচ্ছি। ওটা না হয় একটু ত্বরান্বিত হবে।"

"ত্বরান্বিত!" স্বপনদা তেড়ে আসেন, "বিলম্বিত বলো। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। কী করতে পারো তুমি দেশের ও বিশ্বের এই সঙ্কটে? অসি তোমার আমার জন্যে নয়। মসীই আমাদের হাতিয়ার। কিন্তু এ দিয়ে যুদ্ধও করা যায় না, যুদ্ধ নিবারণও করা যায় না, আমরা অক্ষম। আমাদের পক্ষে শ্রেয় আমাদের যেখানে ক্ষমতা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকা। অর্থাৎ সাহিত্যের অন্দরমহলে।"

"কিন্তু," মানস আপত্তি জানায়, "এই বাবলী জুলিদের সাজা দিতে কি আমাদের হাত উঠবে? বিবেকে বাধবে না? আর এরাও কি আমাকে সাজা না দিয়ে ছাড়বে? এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে কে?"

"কী যে বলো মানসদা," জুলি প্রতিবাদ করে। " আমরা ধরা পড়লে তো তুমি আমাদের সাজা দেবে? এবার আমরা হুঁশিয়ার হয়ে গেছি।"

বাবলি আশ্বাস দেয়, "আর যদি ধরা পড়ে সাজা পাই তো অনিচ্ছুক বিচারকদের আমরা বাঁচতে দেব। ওঁরাও তো নিমিত্তমাত্র।"

ওদের বিদায়ের পর স্বপনদা বলেন, "ওদের থীসিসটাই ভুল। কিন্তু কী করে একথা ওদের মুখের উপর বলি? ওদের ধারণা ক্ষমতা চলে আসবে মধ্যবিত্তদের ডিঙিয়ে সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর হাতে। গণতন্ত্র এড়িয়ে সমাজতন্ত্রের হাতে। সেটা হবার নয়। হবার যেটা সেটা দুই দফায় হবে। প্রথমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র। তার পরে শ্রমিক সমাজতন্ত্র। মাঝখানে হয়তো ত্রিশ চল্লিশ বছর ব্যবধান। অসময়ে কুম্ভকর্ণকে জাগাতে নেই। জাগাতে গেলে যেটা হবে সেটা ফাসিজম বা নাৎসীজম। ইউরোপে চার বছর থেকে এটাই আমি দেখে ও ঠেকে শিখেছি। এদের শিক্ষা তো পুঁথিগত। মার্কস বলো এঙ্গেলস বলো

লেনিন বলো কেউ কি ফাসিজম বা নাৎসীজমের সম্ভাবনা কল্পনা করেছিলেন? তাঁদের শাস্ত্রে এই পর্বটি বাদ গেছে। এবারকার যুদ্ধে ক্যাপিটালিজম খতম হবে না, সেটা একটা ভ্রান্তি। খতম হবে ইম্পীরিয়ালিজম। সেবারকার যুদ্ধে গোটা চারেক সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। রাশিয়ান, জার্মান, অস্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান, টার্কিশ। এবারেও গোটা পাঁচেক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে পারে। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, বেলজিয়ান, ডাচ, পর্তুগীজ। হয়তো জাপানীজও। তার মানে সাম্রাজ্যবাদের যুগ যাবে। কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের যুগ সেইসঙ্গে যাবে না।"

"আমাদের কর্তব্য তা হলে কী?" মানস জানতে চায়।

"ব্রিটেনকে রক্ষা করা, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নয়। ফ্রান্সকে রক্ষা করা, কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যকে নয়। ব্রিটেনকে ও ফ্রান্সকে আমরা ভালোবাসি, কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যকে নয়। সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্যে আমরা প্রাণ দিতে নারাজ, ধন দিতে নারাজ। ওই জুলি পাগলীর ভাষায়, না একো রুপেয়া না একো জওয়ান। ওদের সাম্রাজ্য যদি ওরা মানে মানে গুটিয়ে নেয় তা হলে হিটলারের হাত থেকে ব্রিটেনকে বাঁচানোর জন্যে, ফ্রান্সকে বাঁচানোর জন্যে, আমরা যে যা পারি তা করতে ছুটে যাব। তুমি, আমি, জবাহরলাল, এমন কী, গান্ধীজী— আমরা সবাই ইংরেজদের ভালোবাসি, কিন্তু চাপরাশি খানসামার মতো নয়। চাপরাশি খানসামার সঙ্গে আমরা রাজভক্তির প্রতিযোগিতায় নামতে পারব না। বড়লাট যদি আমাদের তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খেতে ডাকেন তা হলে আমরা সমান মর্যাদার সঙ্গে বসব, খিদমদগারের মতো তফাতে দাঁড়িয়ে থেকে সাহেবলোকের খানা জুগিয়ে দেব না। আমাদেরও তো মানসম্মান আছে। কী দরকার, বাবা, লাটবাড়ীর তল্লাট মাড়াবার? সেখানকার খানার টেবিলে বসবার জন্যে ধস্তাধস্তি করাও হীনতা। কেন আমরা বড়লাটের নিমন্ত্রণ প্রত্যাশা করব? না গেলে কুস্তি শুরু করে দেব? সংঘর্ষের ভিতরে একটা ঘৃণার ভাব আছে। এমন কী, অহিংস আন্দোলনও ঘৃণামুক্ত নয়। ব্যাটাদের হাতে না মেরে ভাতে মারব, গলাধাক্কা দিয়ে না তাড়িয়ে ধোপানাপিত বন্ধ করে তাড়াব, এটাও তো ঘৃণার অভিব্যক্তি। যাদের আমি ভালোবাসি তাদের আমি ঘৃণা করি কী করে? গান্ধীজী না হয় পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে নয়, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বাধীন জনগণ কি অত সূক্ষ্ম বিচার করতে পারে? ওদের যদি তাতিয়ে তোলা হয়, মাতিয়ে তোলা হয়, ইংরেজদের সবাইকে ওরা ঘৃণা করবে। এই যুদ্ধের মাঝখানেও তাদের বিব্রত করবে, আশ্চর্য হব না যদি গায়ে হাত দেয় বা দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়। আগুন নিয়ে খেলার সময় এটা নয়। তবে সরকার যদি জোর করে টাকা আদায় করে, যুদ্ধের জন্যে জওয়ানদের ধরে নিয়ে যায়, আগুন আপনি জ্বলে উঠবে। আমরা কেউ নেবাতে যাব না। তোমার ডিউটি, তুমি যেতে বাধ্য, আমি কিন্তু নীরব দর্শক।"

"আমি যাতে বাধ্য না হই সেইজন্যেই তো আগে থেকে চাকরি ছাড়তে চাই, স্বপনদা। শোনা যাচ্ছে চেম্বারলেনের বদলে চার্চিল নাকি প্রধানমন্ত্রী হবেন। ওঁর এমন অহঙ্কার যে গান্ধীজী যখন রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে রাজ অতিথি হয়ে বিলেতে যান তখন উনি তাঁকে ইন্টারভিউ পর্যন্ত দেন না। তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হলে গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া হবার নয়। অথচ চার্চিল প্রধানমন্ত্রী না হলে হিটলারের সঙ্গে মোকাবিলা সহজ হবে না। আমি তো চোখে আঁধার দেখছি, স্বপনদা। সাম্রাজ্য পাশ দৃঢ় করাই চার্চিলের লক্ষ্য। সাম্রাজ্য পাশ ছিন্ন করাই গান্ধীজীর লক্ষ্য। কী করে দু'পক্ষের মতের মিল হবে? মতভেদ থেকে পথভেদ। পথভেদ থেকে সংঘর্ষ। ঘৃণা এড়াতে পারবে ক'জন। ঘৃণার ভাব প্রবল হলে ভালোবাসার ভাবও দুর্বল হবে। আমরা যারা ব্রিটেনকে ভালোবাসি, ফ্রান্সকে ভালোবাসি, তারা একদিন কোণঠাসা হব। দুই পক্ষই আমাদের ভুল বুঝবে। একপক্ষ ভাববে রাজদ্রোহী, অপরপক্ষ ভাববে দেশদ্রোহী। আমার মনের শান্তি যাবে। আমি কি বেঠোভেনের মতো বধির যে সেই গোলমালের মধ্যেও নিবিষ্ট চিত্তে সৃষ্টির কাজ করতে পারব? না, চাকরি থেকে বেরিয়ে এলেও না। নীরব দর্শক হওয়া আমার স্বভাবে নেই। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।"

স্বপনদা সব শুনে বলেন,"ওয়েট অ্যাণ্ড সী।"

কথাটা মানসের মনে ধরে। দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। ওদিকে যুদ্ধ যাদের মাথার উপরে তাদের তো মাথাব্যথার লক্ষণ নেই। যত মাথাব্যথা কি ভারতের রাজনীতিক তথা ভাবুকদের? তাছাড়া যুদ্ধের সঙ্গে স্বাধীনতাকে বন্ধনীভুক্ত কি না করলেই নয়? আর স্বাধীনতার সঙ্গে বিপ্লবকেই বা বন্ধনীভুক্ত করা কেন? তলে তলে চলেছে পাকিস্তানের উদ্যোগ, যাতে স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে দশ কোটি মুসলমানকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা যায়। ওরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে পরে হিন্দুরাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যুদ্ধের পরেও টিকে যেতে পারে, কিন্তু ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি ইতিমধ্যেই ধোঁয়া হয়ে যাবে।

স্বপনদা তা শুনে বলেন,"আমিও একদা ভাবপ্রবণ ছিলুম, মানু। কিন্তু চার বছর ইউরোপে বাস করে ক্রমে ক্রমে মোহমুক্ত হই। দেশ যতদিন পরাধীন থাকে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম মানুষকে মহৎ হবার প্রেরণা দেয়। আদর্শবাদী নরনারীতে শিবির ভরে যায়। কিন্তু যেই স্বাধীনতা অর্জিত হলো অমনি ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি ও হানাহানি। সেই আদর্শবাদীদেরই কুৎসিত এক চেহারা। যারা শহীদ হলো তারা যদি বেঁচে থাকত তারাও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অংশ নিয়ে মহত্ত্ব খোয়াত। অতদূর যেতে হবে কেন, এই ভারতেরই আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গঠিত হবার পর থেকে আদর্শবাদীদের চরিত্র বদলে গেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাঁদেরও চেহারা মলিন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার হলে পরে দেখবে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাঁদের চরিত্রভ্রষ্ট করবে। তখন তাদের চেহারা দেখে তুমি শিউরে উঠবে। কংগ্রেস যদি আবার সংগ্রামে নামে তা হলে তার ইমেজ কতকটা ফিরে পাবে। কিন্তু সে সংগ্রাম যদি দীর্ঘমেয়াদী না হয়, যদি তার আগেই দম ফুরিয়ে যায়, যদি ক্ষমতার ছিটেফোঁটা পেয়েই দক্ষিণপন্থীরা রণে ভঙ্গ দেয় আর বামপন্থীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে না লড়ে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়ে তা হলে তোমারও মোহভঙ্গ হবে। ইংরেজীতে আরো একটা বচন আছে। 'থিঙ্গ্স আর নট হোয়াট দে সীম'। এই যুদ্ধে ইংরেজ বা ফ্রান্স ধোয়া তুলসী পাতা নয়। জার্মানীও নয় গুয়ে গ্যাঁদাল পাতা। চেম্বারলেনও নন দেবতা। হিটলারও নন অসুর। যুদ্ধটা যে ডেমোক্রাসীর ইস্যুতে ডিকটেটরশিপের সঙ্গে হচ্ছে এটাও উপর থেকে দেখতে, আসলে তা নয়। স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত। তুমি আমি কেন এতে জড়িয়ে পড়তে যাই? তবে এটাও আমি বলব যে ইংরেজদের হেরে যেতে দেখলে আমি গভীর ব্যথা পাব, ফরাসীদের বেলাও তাই। না, আমি এদের পরাজয় চাইনে।"

"আর জার্মানদের হেরে যেতে দেখলে?" মানস জেরা করে।

"দ্যাখ, জার্মানদের বিশবছর ধরে খোঁচানো হয়েছে। জখমী বাঘকে বার বার খোঁচালে সে তো মরীয়া হয়ে মরণকামড় দেবেই। তা হলেও তাকে হারানো সহজ হবে না, যদি না রাশিয়া বা আমেরিকা বা উভয়েই তার শত্রু হয়। এখন থেকে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করব না। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। শেষপর্যন্ত যদি জার্মানী হেরে যায় তার জন্যে আমিও গভীরভাবে ব্যথিত হব। বাখ্ আর বেঠোভেন, গ্যেটে আর শিলারের জাতির পরাজয় কত বড়ো একটা ট্র্যাজেডী। একে নিবারণ করতে পারলেই সভ্যতার প্রতি যথাকর্তব্য করা হতো। কই, পারলেন কি কেউ নিবারণ করতে? ইউরোপে কি মহান ব্যক্তিত্বের অভাব? রলাঁ আর রাসেল পর্যন্ত এবারকার যুদ্ধে শান্তিবাদী নন। একমাত্র শান্তিবাদী গান্ধীজী। কিন্তু তাঁর পেছনে যদি রাজশক্তি না থাকে তবে তিনি কেমন করে মধ্যস্থতা করতেন বা করবেন? আর তাঁর নিজের সেরকম অভিপ্রায় থাকলেও তাঁর সহকর্মীদের সে মনোভাব কোথায়?" স্বপনদা সংশয় প্রকাশ করেন।

মানস বিষণ্ণ মুখে বলে,"মহাত্মার পক্ষে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এর সম্মুখীন হতে তিনি ইচ্ছুক। কিন্তু অন্তত একটি নেশনকে নিরস্ত্র হয়ে দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে যে নিরস্ত্র হয়েও আত্মরক্ষা করা যায়। সেই নেশনটি ভারত ভিন্ন আর কে? তাঁর শিষ্যদের হাতে ক্ষমতা এলে তাঁরা কি দেশকে নিরস্ত্র করতে রাজী হবেন? একজন কি দু'জন হয়তো গুরুর মুখ চেয়ে সম্মতি দেবেন, কিন্তু অধিকাংশেরই তাতে অমত।

হিটলার, চার্চিল, স্টালিন কেউ কর্ণপাত করবেন না। কেউ ঝুঁকি নেবেন না। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস যে অস্ত্রপরীক্ষায় তিনিই জিতবেন, তাঁর প্রতিপক্ষ পরাস্ত হবে। মহাত্মাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে। স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট থাকলে তাঁকেও। যুদ্ধরত সব ক'টা নেশনই তো খ্রীস্টান। জাপান যদি যোগ দেয় সেও তো বৌদ্ধ। অথচ একটিরও অন্তঃপরিবর্তন সম্ভবপর নয়। এ যুদ্ধ চলছে, চলবে, দাবানলের মতো ছড়িয়ে যাবে। কে হারবে, কে জিতবে, সেটা এখন থেকে বলা যায় না। যদি হিটলার হারে তবে স্টালিনকে রুখবে কে? বিপ্লবের রক্তস্রোতে সারা জার্মানী লাল হয়ে যাবে। তার পরে সারা কন্টিনেন্ট। আর হিটলার যদি জেতে তবে ফরাসী বিপ্লবের মতো রুশ বিপ্লবও স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে। তুমি কি খুশি হবে?"

"খুশি হব!" স্বপনদা চমকে ওঠেন। "না, মানু। জার শাসিত রাশিয়ার সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না, তাই বিপ্লবই ছিল উদ্ধারের একমাত্র উপায়। তা বলে সব দেশেই বিপ্লব হবে, কোথাও আর কোনো পথ খোলা নেই, এটা একটা কুযুক্তি। ক্যাথলিকদের মতো কমিউনিস্টদের এটাও একটা ডগমা। গোটা পৃথিবী দূরের কথা গোটা ইউরোপও পুরোপুরি ক্যাথলিক হয়নি, যারা পুরোপুরি ক্যাথলিক হয়েছিল তাদের একভাগও পরে একদিন প্রটেস্টান্ট হয়ে যায়। মার্কসবাদীদেরও সেই দশা হবে। ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতার পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদেরও একটা সুযোগ দেবে, যাতে তারা শোষিত বঞ্চিত জনগণকে বিনা বিপ্লবেই বিপ্লবের সুফল জোগাতে পারে। সেইজন্যেই আমি বিপ্লবকে বিলম্বিত করতে চাই। ত্বরান্বিত করতে নয়। কে না জানে যে বিপ্লব মানে মহতী বিনষ্টি? রাশিয়ায় কত লক্ষ মানুষ মরেছে, কত লক্ষ মানুষ উৎখাত হয়েছে, কত লক্ষ মানুষ বন্দীশালায় বেগার খাটছে, খবর রাখো? আমি সেটা এড়াতে পারলেই খুশি হব। কিন্তু ইতিহাস যাদেব একটা সুযোগ দেবে তারা যদি তার সদ্ব্যবহার না করে তবে বিপ্লব ভিন্ন আর কোন্ পথ খোলা থাকবে, তুমিই বলো?"

মানস চিন্তা করে। বলে, "যে দেশের রেনেসাঁস হলো না, রেফরমেশন হলো না, এনলাইটেনমেন্ট হলো না, সে দেশে রেভোলিউশন হবে, এটাও কতকগুলো ধাপকে ডিঙিয়ে যাওয়া। রেভোলিউশন হলে তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে বেশীদিন লাগবে না। গুরু পুরোহিত মোল্লা মৌলবীরাই ঘুরিয়ে দেবে। আমি চাই ধাপে ধাপে এগোতে। শেষ ধাপটা হয়তো রেভোলিউশন। ওটাকে আমি অসম্ভব বলব না, অবশ্যম্ভাবীও বলব না। সব দেশেই রেভোলিউশন ও ভায়োলেন্স সমার্থক হয়ে গেছে। ভারতেও যদি হয় তবে আশ্চর্য হব না। যদি না হয় তা হলেই বরং আশ্চর্য হব। গান্ধীজীর শিক্ষা জনগণের অন্তর জয় করলে বিপ্লবের দিন তারা অহিংস থেকে ইতিহাসে এক আশ্চর্য নজির সৃষ্টি করবে। সেদিন হবে এক নবযুগের সূচনা। আমি যে গান্ধীজীর উপর ভরসা রাখি তার কারণ ভারতের জনগণকে তিনি নতুন একটা পথে চালিত করছেন, যে পথের একটি ধাপ পরাধীনতামুক্তি, আরেকটি ধাপ শোষণমুক্তি। নতুন বলতে বোঝায় অহিংস উপায়ে। কিন্তু সেইসঙ্গে রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেন্টও চাই। তিনি যে এসব বিষয়ে অচেতন বা নিষ্ক্রিয় তা নয়। কেউ যদি ভগবান না মানে, কিন্তু সত্যকে মানে তা হলেও সে তাঁর প্রিয় হতে পারে, কারণ তাঁর বিচারে সত্যই ভগবান। এদিক থেকে তিনি একজন ধর্মসংস্কারক। সমাজসংস্কারেও তিনি তৎপর। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর অক্লান্ত অভিযান। স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিবাহেও তাঁর আশীর্বাদ আছে। এই তো সেদিন সেরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু যেখানে তাঁর সঙ্গে আমার অমিল সেটা হচ্ছে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র। সেক্ষেত্রে গান্ধীপন্থীদের গতি সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। শৃঙ্খলা সেক্ষেত্রে শৃঙ্খলের নামান্তর। তবে তাঁর চিন্তাপ্রণালী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। সেদিক থেকে তিনি রেনেসাঁসের ধারাবাহক।"

স্বপনদা যথাসময়ে মানসকে ট্রেনে তুলে দেন। বলেন, "আবার এসো। ক্লাবটার একটা হিল্লে করতে হবে। লিকুইডেশনে আমার মন সায় দিচ্ছে না। যে বৃক্ষ আমি স্বয়ং রোপণ করেছি সে যদি

বিষবৃক্ষও হয় তবু তার মূলোচ্ছেদ করতে মায়া করে। ভাবছি ওটাকে ক্রমে ক্রমে ফোর আর্টস ক্লাবে রূপান্তরিত করলে কেমন হয়। হ্যাঁ, মহিলারাও আসবেন, স্ক্যাণ্ডাল দুটো একটা হবে, কিন্তু বিয়ে যাঁদের হচ্ছে না বিয়েও তো তাঁদের হতে পারে।''

মানস ফিক করে হেসে বলে,''যেমন তোমার। যেমন বাবলীর, জুলির। যদিও ওরা আর্টের ধার ধারে না তবু ওদের গেস্ট করে নেওয়া যেতে পারে। অমনি করে ওরা আর্টের সমজদার হবে। কী বলো, স্বপনদা?''

স্বপনদা হাসেন। ''না, ওদের মতো বিপ্লবী নায়িকাদের আসতে দেওয়া হবে না। ওরা ঘরে ঘরে বিপ্লব ঘটাবে। বিবাহিত পুরুষদেরও মাথা ঘুরিয়ে দেবে। তাঁদের সহধর্মিণীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবে। সেবারকার অভিজ্ঞতার ফলে আমি হুঁশিয়ার হয়েছি। সাবধানের মার নেই। পঞ্চশরের শরে।''

স্বস্থানে ফিরে গিয়ে মানস যূথিকাকে সব কথা জানায়। জুলির সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার বান্ধবী বাবলীর সঙ্গেও, ঘটনাচক্রে সৌম্যদার সঙ্গেও। আপাতত কেউ জেলে যাচ্ছে না, জেল এড়াবার জন্যে পাতাল প্রবেশ করছে না। কলকাতার রাজনীতিক আবহাওয়া থমথমে। বুদ্ধিজীবী যাঁদের বলা হয় তাঁদের বেশীর ভাগই নাৎসীদের বিপক্ষে। কিন্তু হিটলারের পক্ষেও একভাগ আছেন। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা ব্রিটেনের পরাজয় কামনা করেন। কিন্তু এসব ডিফিটিস্ট তো গান্ধীপন্থী নন। গান্ধীজীকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তিনি এঁদের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত না হন। তাঁকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হবে।

''তারপর তোমার স্বপনদার সমাচার কী?'' যূথিকা কৌতূহলী হয়। তোমার মুকুলদার কী খবর? ওই দুই চিরকুমার কি ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? তা হলে দেশের কুমারীদের কী ভবিষ্যৎ? ওরা কি বরের অভাবে চিরকুমারী হবে?''

''স্বপনদা এখন কবি য়েটসের মতো পরিতাপ করছেন। এত বয়স হলো, এখনো পিতৃঋণ শোধ করা হলো না। য়েটসের জীবনে যেমন মড গন্ স্বপনদার জীবনে তেমনি বকুল চক্রবর্তী। কী চোখে যে ওঁকে দেখেছেন আর কোনো মেয়েকে চোখে লাগে না। মডের মতো বকুলের বিয়ে হয়ে গেছে কবে! মডের মতো বকুলও ফিরে তাকান না। রোমান্সের ঘোর তবু কাটে না। জীবনে দ্বিতীয় এক রোমান্স ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! না ঘটলে উনি বিয়ে করবেন না। ওই প্রথম প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেন। তা নিয়ে একটা ক্লাসিকও লিখবেন। কিন্তু কোনোদিক থেকেই সফল হচ্ছেন না। পেশার দিক থেকেও না। কেবলি হা হুতাশ করছেন। 'আমি ফেল'।'' মানস বলে যায়।

যূথিকা দুঃখিত হয়। ''আর মুকুলদা?''

''মুকুলদার কেসটা বিপরীত। তাঁকে ভালোবাসেন এক বিবাহিতা মহিলা। পতিপরিত্যক্তা। কিন্তু হিন্দু মতে ডিভোর্সের উপায় নেই। সুতরাং পুনর্বিবাহেরও আশা নেই। এই হতাশাকে দু'জনেই মহিমান্বিত করেছেন। নিষ্কাম সাধনায়। মানবিক প্রেম পরিণত হয়েছে ভাগবত প্রেমে। মুকুলদার তেমন কোনো অভাববোধ নেই। গানের মধ্যেই তিনি তাঁর জীবনের অর্থ পাচ্ছেন। সংসারী মানুষের মতো তাঁর অর্থচিন্তা নেই। আশ্রমে বাস করেন। আশ্রমই তাঁকে চালায়। গান করে যদি কিছু মেলে তবে তা নিজের নামে নয় আশ্রমের নামে গ্রহণ করেন। অথচ তিনি সন্ন্যাসী নন। মুকুলানন্দ স্বামী বললে তিনি রাগ করেন। সবাই তাঁকে ডাকে মুকুলদা বলে। তাতেই তাঁর আনন্দ। তাঁর সঙ্গে দেখলুম দুই গোরা সন্ন্যাসী। কৃষ্ণপ্রাণ আর হরিপ্রাণ। হিমালয়ে তাঁদের আশ্রম। নিবেদিত আত্মা।''

যূথিকা রসিকতা করে। ''আরো দুটি ওল্ড মেড সৃষ্টি করা হলো!''

এর পরে মানস জানতে চায় তার অনুপস্থিতিতে নতুন কিছু ঘটেছে কি না। বাড়ীতে কিংবা শহরে।

''ক্যাপটেন মুস্তাফী এসেছিলেন মিলির চিঠি নিয়ে। বেডফোর্ড নাকি ওকে পরের বছর ভর্তির

আশা দিয়েছে। যুদ্ধের জন্যে কারো মনে এতটুকু আতঙ্ক নেই। বরং সকলেই দেশের জন্যে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে চায়। মিলির গায়েও ত্যাগের বাতাস লেগেছে। রোমে এলে রোমানদের মতো আচরণ করতে হয়। মিলিও এখন একজন রোমান। ভারতের স্বাধীনতার নিরিখে ইংলণ্ডকে বিচার করতে তার ইচ্ছে করে না। যতই অন্যায় করে থাকুক না কেন এখন ওরা বিপন্ন। বিপন্নকে বিব্রত করা উচিত নয়। ওদের একদিন সুমতি হবে। তার জন্যে অপেক্ষা করাই শ্রেয়। এ কী কথা শুনি আজ মালতীর মুখে! লঙ্কায় যেই যায় সেই রাক্ষস হয়। মিলির এই অধঃপতন কি তার বিপ্লবী বান্ধবীরা সুনজরে দেখবে? জুলি কী মনে করবে? সৌম্যদা কী মনে করবেন? তবে আমার কথা যদি বলো আমি মিলির এই পরিবর্তন সঙ্গত মনে করি। যে দেশে ওকে বাস করতে হবে সে দেশের বিপদে ওরও তো বিপদ। যে ডালে বসেছে সে ডাল কাটা গেলে ওরও তো পতন। ভারতের স্বাধীনতার ভাবনা ভারতবাসীদের। ব্রিটেনবাসিনীর নয়। ক্যাপটেন মুস্তাফীরও সেই মত। দর কষাকষি যদি করতে হয় দেশের রাজনীতিকরা করবেন। মিলির কাজ বিনা শর্তে যুদ্ধের কাজে সহায়তা করা। সেবা প্রতিষ্ঠানে তালিম পেয়েছে, সেবার কাজটাও তো সে করতে পারে। অস্ত্র যদি ধরতে হয় তো সুকুমার ধরবে।'' যূথিকা শোনায়।

''বিলেতে থাকলে আমিও তাই করতুম। তুমিও।'' মানস মন্তব্য করে।

''অগত্যা। কিন্তু প্রথম সুযোগেই আমি দেশে চলে আসতুম ও বিলেত সম্বন্ধে দায়মুক্ত হতুম। মিলি বেচারি সবে ওদেশে গেছে। ফেরারও পথ বন্ধ। টর্পেডোর ঘায়ে জাহাজডুবি হবে। এদেশে থাকলে জেলে যেতে হতো। মনে করো ওটাও ওর কারাবাস। কয়েদীর মতো খেটে মরতে হবে।'' যূথিকা আফসোস জানায়।

''আমি হলে উদ্দীপনা বোধ করতুম, জুঁই। এমন সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী। মিলি যদি উপন্যাস লেখে চাইকি আর একটা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' লিখতে পারবে। আমি তো পারব না। আমি ওকে ঈর্ষা করি। ওকে আমার অভিনন্দন জানিয়ো। সুকুমারকেও, সেও যদি অস্ত্র হাতে নেয়।''

দিনকয়েক পরে সৌম্য এসে হাজির। বলে, ''সব ঠিক। বাপু তোমার জন্যে বিশে ফেব্রুয়ারি সকালবেলা পনেরো মিনিট সময় নির্দিষ্ট করেছেন। এখন সেই পনেরো মিনিটের জন্যে তোমাকে রাত একটার ট্রেন ধরতে হবে। ট্রেন থেকে স্টীমার। স্টীমার থেকে নেমে মাইল খানেক পদযাত্রা। তার পরে গান্ধী কুটীর। দুপুরে তুমি সেবাসঙ্ঘের অতিথিশালায় পঙ্ক্তি ভোজনে বসবে। তারপর আবার পদযাত্রা। আবার স্টীমার। আবার ট্রেন। বাড়ী ফিরতে রাত দশটা। আমি যাবার বেলা তোমার সহযাত্রী হব, কিন্তু আসবার বেলা নয়। আমাকে সেবাসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে হবে। গান্ধীজীর প্রস্থানের পর আমারও প্রস্থান। সিদ্ধান্ত কী হলো জানা আমার দরকার। গুরুতর সঙ্কট।''

মানস সৌম্যর সঙ্গে যাবে, এটা তো একরকম আগে থাকতেই স্থির ছিল। কবে, কখন, কেমন করে আগে জানত না, এখন জেনে নিশ্চিত হওয়া গেল। ইংরেজী মতে যেদিন রওনা হবে সেইদিনই ঘুরে আসবে। একটা পুরো দিনও লাগবে না। গান্ধীজীকে তো আর কখনো এত নিভৃতে পাওয়া যাবে না। মানস রাজী হয়। ''গুরুতর সঙ্কট।'' শুনে তার কৌতূহল বেড়ে যায়।

''সঙ্কট কি গণসত্যাগ্রহ নিয়ে?'' মানস জিজ্ঞাসা করে।

''না, ভাই। সেটা গান্ধীজীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কাউকে তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবেন না কবে, কোন্ ইস্যুতে গণসত্যাগ্রহ ঘোষণা করবেন বা আদৌ করবেন না। সেটাও তো একপ্রকার যুদ্ধ। যুদ্ধের নৈতিক বিকল্প। একপ্রকার বিপ্লবও বলতে পারো। বিপ্লবের নৈতিক বিকল্প। নীতিগতভাবে সেটা ঠিক কি ভুল এ বিচার তাঁরই সাজে, আর কারো নয়। আমরা কেউ তাঁর উপর চাপ দিতে চাইনে। এই

অধিবেশনটা গান্ধী সেবাসঙ্ঘের ঘরোয়া ব্যাপার। আমরা যারা তার সদস্য তাদের উপর চারিদিক থেকে আক্রমণ আসছে এই বলে যে আমরা নাকি আমাদের নতুন খ্রীস্টের নামে নতুন এক খ্রীস্টীয় চার্চ পত্তন করেছি। গান্ধীয়ান চার্চ। একদিন এই গান্ধীয়ান চার্চ ইণ্ডিয়ান স্টেটকে নিজের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করবে। এর যিনি পোপ হবেন তিনিই হবেন ভারতভাগ্যবিধাতা। রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করবেন তিনিই। কংগ্রেস হবে তারই পরোক্ষ প্রভাবাধীন। ইউরোপের ইতিহাসে এ নিয়ে যে অনর্থ ঘটে গেছে এদেশেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আমরা এই আক্রমণের উত্তর দিতে মিলিত হচ্ছি। কিন্তু কী উত্তর দেব তা নিয়ে আমাদের মন ভারাক্রান্ত।" সৌম্যকে চিন্তান্বিত দেখায়।

"আমি তো এর একটা আভাস দিয়েছি তোমাকে", মানস মনে করিয়ে দেয়। "রাষ্ট্রের বাইরে তোমরা একটা চার্চ গঠন করছ, চার্চই হবে রাষ্ট্রের নিয়ন্তা। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের কথা ভেবেই ওকথা বলেছি, সেবাসঙ্ঘের কথা ভেবে নয়। সেবাসঙ্ঘ তো একটা অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।"

"যথার্থ। আরম্ভটা সেইভাবেই হয়েছিল।" সৌম্য ব্যাখ্যা করে, "কিন্তু কংগ্রেস যখন পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম নিয়ে মেতে ওঠে তখন কংগ্রেসের বামপন্থী পক্ষ দক্ষিণপন্থী পক্ষের সঙ্গে সেবাসঙ্ঘকেও অভিন্ন মনে করে। আসলে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গেও আমাদের আসমান জমিন ফারাক। ওঁদের কাছে অহিংসা একটা পলিসি। আমাদের কাছে অহিংসা একটা প্রিন্সিপ্ল। কংগ্রেস একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তার দরজা খোলা। যে-কোনো ব্যক্তি চার আনা পয়সা দিয়ে কংগ্রেসের সদস্য হতে পারে। ভোটের অধিকারী হতে পারে। অধিকাংশের ভোটে কংগ্রেস একদিন পলিসি হিসাবেও অহিংসা বর্জন করতে পারে। তার মানে গান্ধীকে বিসর্জন দিতে পারে। ছলে বলে কৌশলে যে-কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখল করা বাম দক্ষিণ কারো পক্ষে মূলনীতিবিরুদ্ধ নয়, এর পূর্বাভাষ লক্ষ করে গান্ধীবাদীরা কংগ্রেসের থেকে স্বতন্ত্র একটি সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করেন। কোনো অবস্থাতেই তাঁরা গান্ধীজীকে বিসর্জন দেবেন না, অহিংসা ও সত্য বর্জন করবেন না। ক্ষমতার উপরে তাঁদের লোভ নেই, সেটার উপরে অঙ্কুশ প্রয়োগ করাই তাঁদের কাম্য। গান্ধী সেবাসঙ্ঘ প্রথম দিকে বেশী লোকের ব্যাপার ছিল না, কিন্তু কংগ্রেস যেদিন থেকে পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করে সেদিন থেকে এই সঙ্ঘের ভিতরেও ঘোলা জল প্রবেশ করে। কাউকে আমরা বহিষ্কারও করতে পারিনে, কারো উপর নিষেধাজ্ঞাও জারী করতে পারিনে। ভদ্রতার ফল হয়েছে এই যে আমরাও পার্লামেণ্টারিয়ানদের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছি। লাভ তাঁদেরই হয়েছে, আমাদের হয়েছে বদনাম। পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে, কিন্তু জড় রয়ে গেছে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা গদী ছেড়েছেন, কিন্তু আইনসভার কংগ্রেস সদস্যরা আসন ছাড়েননি। ইংরেজদের সঙ্গে ফয়সালা হলে কংগ্রেস যে-কোনো দিন পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম পুনরারম্ভ করতে পারে। তখন সেবাসঙ্ঘে আরো ঘোলা জল ঢুকবে। অর্থনীতিক্ষেত্রে যেমন গ্রেশামের আইন ধর্মনীতিক্ষেত্রেও তেমনি একটা অলিখিত আইন আছে। মেকী টাকাই আসল টাকাকে তাড়াবে। গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছেন। সেবাসঙ্ঘ থেকেও নাম কাটিয়ে নেবেন। তা হলে কাকে নিয়ে আমরা থাকব? কী নিয়ে আমরা থাকব?"

মানসের সময় লাগে ব্যাপারটাকে অনুধাবন করতে। সে বলে, "তোমরা তোমাদের মতবাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাও। অথচ স্বতন্ত্র হয়েও স্বকীয়তা রক্ষা করতে পারছ না। লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তা হলে তাকে লবণত্ব দেবে কে? গান্ধীজী কি চিরায়ু? তা তোমরা বেছে বেছে সদস্য কর না কেন?"

"আমরা গঠনকর্মে বিশ্বাসী দেখলেই সদস্য করি। সাধারণত তাঁরা সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁদের কেউ যদি কংগ্রেসী মন্ত্রী বা বিধায়ক হন তাঁদের বাধা দেব কী করে? আর যাঁরা মন্ত্রী বা বিধায়ক তাঁরা যদি সেবাসঙ্ঘের সদস্য হতে চান তাঁদেরই বা ঠেকিয়ে রাখি কী বলে? যদি তাঁদের গঠনকর্মে রুচি থাকে। তাঁরা কি মদ্যপান নিবারণ করেননি? খাদির প্রসারে সাহায্য করেননি? সবাইকে

নিয়ে কাজ করাই গান্ধীজীর অভীষ্ট। অথচ ভেকধারী ভণ্ড সাধুও তো বিস্তর। কংগ্রেসে বেনো জল ঢুকলে কংগ্রেস সামলে নেবে। রাজনীতি জিনিসটাই ঘোলা জল। কিন্তু সেবাসঙ্ঘ হলো সাধুজনের শাসিত মঠবাড়ীর মতন। এখানে মেজরিটির ভোট খাটে না। এখানে মঠাধ্যক্ষেরই অথরিটি। অথচ তা যদি বলবৎ হয় সঙ্ঘ ভেঙে যায়।''

যূথিকা মানসকে বলে, ''তুমি যে বাপুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ সরকার এর জন্যে জবাবদিহি তলব করতে পারে। তুমি সৌম্যদার মতো স্বাধীন নও। যেতে চাও তো মনঃস্থির করে যাও যে সরকার অসন্তুষ্ট হলে মানে মানে পদত্যাগ করবে।''

''মনঃস্থির কি আমি করিনি, জুঁই? দেশ যদি দুই শিবিরে বিভক্ত হয় আমি সৌম্যদার বিপরীত শিবিরে থাকব না। তাকে জেলে পুরব না। তবে স্বপনদা যা বলেছেন সেই কথাই শিরোধার্য। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। যুদ্ধকালে ইংরেজকে বিব্রত না করলে ইংরেজও বিরক্ত করবে না। একটা ফয়সালাও হয়ে যেতে পারে।''

''তুমি আমাকে জেলে পুরলে আমি একটুও দুঃখিত হব না, মানস। বরং না করলেই দুঃখিত হব। আমরা তো দেশের জন্যে দুর্ভোগ সইতেই চাই। না সওয়াটাই তো কাপুরুষতা। তবে মরতে এখনো মনঃস্থির করিনি।'' সৌম্য হাসে।

।। পঁচিশ ।।

স্টীমার থেকে নামতেই দূর থেকে আওয়াজ কানে আসে। ''গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক।'' ''গো ব্যাক, গান্ধী।'' ''উই ডোণ্ট ওয়াণ্ট গান্ধী।'' কখনো ইংরেজীতে, কখনো বাংলায়।

''মহাত্মা এখন আর বাংলাদেশে স্বাগত নন। এখন তিনি মহাত্মাই নন।'' সৌম্য আফসোস করে।

''তাঁকে ওরা আসতে বারণই করেছিল, ভয়ও দেখিয়েছিল। কিন্তু না এলে লোকে ভাবত তিনি ভীরু, তিনি দুর্বল।''

মানস আফসোস করে। ''বাংলাদেশ এমনি করে আপনাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে। বাঙালীর যেমন সেন্টিমেন্ট আছে অবাঙালীরও তেমনি সেন্টিমেণ্ট আছে। সেবাসঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধিরা কী মনে করছেন! খবরটা যখন সারা ভারতে রটে যাবে তখন বাঙালীও কি অন্যত্র স্বাগত হবে?''

সৌম্য সেবাসঙ্ঘের শিবিরের অভিমুখে এগোতেএগোতে বলে, ''তবু ভালো যে ওরা গান্ধীকে ধ্বংস করতে চায় না, তাঁর মতবাদকেই ধ্বংস করতে চায়। ওরা কি বোঝে ওঁর মতবাদটা কী? আমাদের কর্তব্য ওদের বোঝানো। আমরা যারা বাপুজীর সহকর্মী ও সেবাসঙ্ঘের সেবক।''

''তোমরাও কি পারবে বোঝাতে? তোমরা কেবল 'চরকা', 'খদ্দর', 'স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম' ইত্যাদি নিয়েই আছ। এই যদি হয় গান্ধীবাদ তো এই কলকারখানার যুগে গান্ধীবাদ তো আপনা থেকেই ধ্বংস হচ্ছে।'' মানস সহানুভূতির সঙ্গে বলে।

সৌম্য তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। ''দ্যাখ, মানস, পৃথিবীতে ইভিল যতদিন থাকবে তার সঙ্গে লড়াইও ততদিন চলবে। কিন্তু লড়বে যে সে নিজেই যদি হয় ইভিল আর যে হাতিয়ার নিয়ে লড়বে সেটাও যদি হয় ইভিল তা হলে পৃথিবীতে ইভিলই জয়ী হবে। গান্ধীজী এই শিক্ষা দিতে পৃথিবীতে এসেছেন যে ইভিলের সঙ্গে লড়াই নিশ্চয়ই চলবে, কিন্তু চালাবে যারা তারা নিজেরা হবে না ইভিল আর তাদের হাতিয়ারও হবে না ইভিল। তুমি যদি নাৎসীদের সঙ্গে লড়তে চাও এই কারণে যে ওরা ইভিল তা হলে তোমাকেও হতে হবে ইভিল থেকে মুক্ত আর তোমার হাতিয়ারকেও করতে হবে ইভিল থেকে

বিযুক্ত। সেটা যদি তুমি না করো তবে তোমার জয়ও ইভিলের জয়। বড় জোর দাবী করতে পারো যে তোমারটা কম ইভিল। তোমার সঙ্গে আমার এই তফাৎ যে আমারটা আদৌ ইভিল নয়।"

"কিন্তু তুমি তো নাৎসীদের সঙ্গে লড়তেই চাইছ না। ওদের পথ ছেড়ে দিচ্ছ। ওরা এবার পশ্চিমমুখো হয়ে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ফ্রান্স আক্রমণ করবে। ফ্রান্সের ভিতরে নাকি ওদের পঞ্চম বাহিনী সক্রিয়। এটা কেবল নেশনে নেশনে যুদ্ধ নয়, মতবাদে মতবাদে যুদ্ধ। কমিউনিজম বনাম ফাসিজম। ফ্রান্সে যেমন একদল ফাসিস্ট সক্রিয় তেমনি একদল কমিউনিস্টও। ফাসিস্টরা নাৎসীদের পথ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে আসবে, কমিউনিস্টরা কোতল হবে। এমন পরিস্থিতিতেও ভারত লড়াইতে নামবে না। নামবে, যদি ব্রিটেন কংগ্রেসের শর্তে রাজী হয়। ষাট মণ ঘি পুড়বে, তারপর রাধা নাচবে।" মানস সৌম্যকে খোঁচায়।

"কংগ্রেস নাচবে, কিন্তু গান্ধীজী নাচবেন না। তিনি তাঁর নিজস্ব সময়ে নিজস্ব উপায়ে নিজস্ব প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়বেন। লড়বেন তিনি ঠিকই, কিন্তু এখন নয়, বন্দুক হাতে নয়, জার্মানদের সঙ্গে নয়।" সৌম্য বুঝিয়ে বলে, "কংগ্রেস ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়ে সমান শর্তে স্বাধীন মিত্রের মতো লড়তে পারে। তিনি কিন্তু নৈতিক সমর্থনের চেয়ে বেশী কিছু দেবেন না।"

"কেন?" মানস বিস্মিত হয়। "তিনি কি দেশের স্বাধীনতার চেয়েও আরো বেশী কিছু চান?"

"না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে তাঁর দাবী ওর চেয়ে বেশী বা কম নয়। কিন্তু তিনি কি কেবল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী? তার চেয়েও বেশী কিছু নন? তিনি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অহিংসার প্রয়োগে বিশ্বাসী শান্তিবাদী। যুদ্ধ জিনিসটারই তিনি বিপক্ষে। সেটাকে ছড়াতে দিতে নয়, থামিয়ে দিতেই তিনি চান। এটাই তাঁর জীবনের মিশন।" সৌম্য তার বক্তব্য পরিষ্কার করে।

মালিকান্দায় সেদিন পাঁচখানা গ্রামের হিন্দু মুসলমান সমবেত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেবাসঙ্ঘ সদস্যদেরও সুবৃহৎ সমাবেশ। মানসকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কক্ষে বসতে বলে গান্ধীজীকে সংবাদ পাঠায় সৌম্য। একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে দুই বন্ধুকে তাঁর পর্ণকুটীরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

"বাপুজী," সৌম্য মানসের পরিচয় দিয়ে বলে, "মাসকয়েক আগে আমার বন্ধুর পুত্রবিয়োগ হয়। শোকে সান্ত্বনার জন্যে তিনি অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু কোথাও পান না সেই রহস্যের নিরসন যার জন্যে নচিকেতা হয়েছিলেন যমরাজের অতিথি। একালে এ জগতে আপনার চেয়ে বড়ো সত্যদ্রষ্টা কে? তাই আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।" কথাবার্তা ইংরেজীতেই হয়।

মহাত্মা অন্তরের অতলে তলিয়ে যান। তাঁর চোখে ফুটে ওঠে এক অসাধারণ দ্যুতি। চোখের তারা যেন আকাশের তারা। অনেকক্ষণ মৌন থেকে করুণাঘন কণ্ঠে বলেন, "মৃত্যুর উপরে কার হাত আছে? ইজ দেয়ার এনি হেল্প?"

মানস উপলব্ধি করে যে তিনিও তার সহানুভবী। বেদনায় তাঁর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর। সান্ত্বনার বাণী তাঁর কণ্ঠে নেই। মনে হয় তিনি একজন স্টোইক। দুঃখশোক অকাতরে বহন করতে অভ্যস্ত। কিংবা গীতাকথিত স্থিতপ্রজ্ঞ। সুখ দুঃখ দুই তাঁর কাছে সমান। যেন মূর্তিমান বুদ্ধ। মানবমহিমায় অবিচলিত।

মানস তাঁকে একমনে নিরীক্ষণ করে। তার হয়ে সৌম্যই আবার বলে, "দেশ যখন দুই বিপরীত শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ইংরেজের আর কংগ্রেসের, তখন আমার বন্ধু বিপরীত শিবিরে থেকে দমননীতির ভাগী হতে অনিচ্ছুক। তাই সরকারী চাকরি থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছেন।"

গান্ধীজী খোঁজ করেন মানস এখন কোন্ পদে অধিষ্ঠিত। তার উত্তর শুনে শুধু তার উক্তির পুনরুক্তি করেন। নিজের মতামত ব্যক্ত করেন না।

মানসের ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার এইখানেই ইতি। সে আর মহাত্মার সময় নষ্ট করাতে চায় না। শুধু জানিয়ে দিতে চায় যে তারও হিংসার উপর বিশ্বাস টলেছে। "মহাত্মাজী, ব্রিটেনের কী হবে জানিনে, কিন্তু ফ্রান্স তো মনে হচ্ছে চিৎ হবে। ভায়োলেন্স কোন্ কাজে লাগল!"

"আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করি। ভায়োলেন্স কোন্ কাজে লাগল!" তিনি মানসের উক্তির পুনরুক্তি করেন। তাঁকে অন্যমনস্ক দেখায়।

সে কুটীরে আরো একজন ছিলেন। তিনি বাপুর সহধর্মিণী কস্তুরবা। তিনি বসেছিলেন ঘরের এক কোণে। দেখতে যেন কনে বউটি। সম্পূর্ণ নির্বাক। আর বাপু বসেছিলেন দেয়ালের দিকে পিঠ করে একটি নিচু ডেস্কের সামনে মেজেতে মাদুরের উপর। সৌম্য ও মানসের মুখোমুখি।

যূথিকা মানসকে মানা করেছিল রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে। তা হলেও একটা কথা তার মাথায় ঘুরছিল। পনেরো মিনিট কেন, দশ মিনিট না হতেই সৌম্যর ইঙ্গিতে সে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে সবিনয়ে নম্রভাবে নিবেদন করে, "মহাত্মাজী, আমার অন্তরের প্রার্থনা আপনি আরো সাত আট বছর বেঁচে থেকে ফেডারেশনটা হাসিল করে দিয়ে যান।"

তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে মৃদু হেসে হাত যোড় করেন। মানস আর সৌম্য তাঁকে ও কস্তুরবাকে প্রণাম করে কুটীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। গান্ধী দর্শন যেন গঙ্গায় অবগাহন। দেহমন পবিত্র হয়।

সৌম্য এর পরে মানসকে আরো কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাঁদের একজন সর্দার বল্লভভাই পটেল। প্যাটেল নয়। তেল মেখে গামছা কাঁধে পদ্মাস্নানে যাচ্ছেন। খুবই নম্র ও বিনীতভাবে মানসের সঙ্গে কথা বলেন। দেখে মালুম হয় না যে আটটি প্রদেশের হর্তাকর্তা ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীদের পদত্যাগের পর কেমন যেন চুপসে গেছেন। মনে হয় যেন মাটির মানুষ।

"স্ট্রিক্ট শুধু নয়, স্ট্রিক্টলি অনেস্ট।" সৌম্য আড়ালে গিয়ে বলে, "বাপুর দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু পার্লামেণ্টারি ব্যাপারে। সে ব্যাপার তো আপাতত শিকেয় তোলা। কমসে কম সাত বছরের জন্যে। এবার যে পর্ব আসছে তাতে তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত নন। সত্যাগ্রহের তো শুধু বারডোলি তালুকায় নিবদ্ধ থাকবে না। ভারতময় প্রসারিত হবে। দক্ষিণ হস্ত যিনি হবেন তাঁকে হতে হবে কট্টর অহিংসাবাদী ও নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী। এর কোনোটাই দক্ষিণপন্থীরা নন। বামপন্থীরা তো ননই। বৃথাই দু'পক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্ব।"

এর পরে ওরা ভোজনশালায় গিয়ে হাজার জনের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসে। মানসের এপাশে একজন চাষী মুসলমান, সৌম্যের ওপাশে একজন চাষী নমশূদ্র। জাত ধর্মের বিচার নেই। পুরীর শ্রীক্ষেত্রের চাইতেও উদারতর মিলনক্ষেত্র। পবিবেশকরা কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান, হরিজনও তাদের মধ্যে আছে। তেমনি পাচকদের মধ্যেও। তবে আহার্য বলতে খিচুড়ি ও ঘোঁট, সঙ্গে একটা চাটনী। সমস্তটাই নিরামিষ।

খেতে খেতে সৌম্য জিজ্ঞাসা করে, "বাপুজীকে কেমন দেখলে?"

"আর একটি ধ্যানীবুদ্ধ। দশ মিনিটের মধ্যে সাত মিনিট কি আট মিনিটই নীরব শ্রোতা। বাক্য উচ্চারণ করেছেন সবসন্ধ চারটি কি পাঁচটি। এটা কি শুধু আমাদেরই বেলা না সকলের বেলা?" মানস উত্তর দেয়।

"ক্রমেই তিনি ভিতর থেকে ভিতরে সরে যাচ্ছেন। যে যা বলে মন দিয়ে শোনেন। কিন্তু ধরাছোঁয়া দেন না। হ্যাঁ, ধ্যানীবুদ্ধ। এবার আসছে তাঁর চূড়ান্ত পরীক্ষা। হিংসা যখন তুঙ্গে তখন তিনি অহিংস থাকতে পারবেন কি না। দেশকে, দেশের লোককে অহিংস রাখতে পারবেন কি না। ভারতের বৈশিষ্ট্য তো এই অহিংস নীতিতেই। ভারত যদি তার বৈশিষ্ট্য হারায় তবে তাঁর জীবনের মিশন ব্যর্থ। তিনি সাত-আট বছরও বাঁচবেন না মানস, দেশ যদি হিংসায় উন্মত্ত হয়। ফেডারেশন এখন বিশ বাঁও জলের তলে। রাজন্যরা চান না, লীগপন্থী মুসলমানরা চান না, কংগ্রেসের বামপন্থীরা চান না, দক্ষিণপন্থীরাও যে চান তাও নয়। আমরা এখন ওসব তর্ক কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির উপর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেছি। যা স্থির হবে তা উপর থেকে স্থির হবে না, নিচের থেকে স্থির হবে। সর্বসাধারণের ভোটে। সর্বসাধারণ একটি শব্দই বোঝে। সে শব্দটি স্বরাজ। ফেডারেশন বললে ওদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। ওটা

আপাতত ধামাচাপা থাক। ইতিমধ্যে ওরই প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান বলে আরো একটি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ক্রিয়া থাকলে প্রতিক্রিয়া থাকে। ফেডারেশন থাকলে পাকিস্তান। একটাকে ধামাচাপা দিলে অপরটাকেও ধামাচাপা দেওয়া হয়। স্বরাজ ছাড়া আমাদের আর কোনো লক্ষ্য নেই। সত্যাগ্রহ ছাড়া আমাদের আর কোনো সংগ্রামপদ্ধতি নেই। গান্ধী ছাড়া আমাদের আর কোনো নেতা নেই। কিন্তু আমরাই তো সমগ্র দেশের সমূহ জনগণ নই। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হলে তারা যেখানে থাকে সেইখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতে হবে, কাজ করতে হবে।'' সৌম্য মানসকে স্টীমারে তুলে দিয়ে সভায় যায়।

বাড়ীতে ফিরতে রাত এগারোটা। যূথিকা খাবার নিয়ে বসে আছে, নিজেও খায়নি। ছেলেমেয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

''কেমন দেখলে বাপুকে?'' যূথিকা সুধায়।

''ছাই ঢাকা আগুন। আবার জ্বলে উঠবে। ওঁর ভিতর একটা শক্তির রিজার্ভ রয়েছে। সেটা কায়িক নয়, মানসিক ও আত্মিক। এটাও আরেক রকম ইস্পাত। সামনে আসছে ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঠোকাঠুকি। একপক্ষে ইংরেজ অপর পক্ষে কংগ্রেস।'' মানস যতদূর দেখতে পায়।

''ঠোকাঠুকির সময় তুমি কোন্ শিবিরে থাকবে, এ নিয়ে তোমার নৈতিক সঙ্কটের কথা বলেছিলে?'' যূথিকা জানতে চায়।

''সৌম্যদাই আমার হয়ে বলে। বাপু তা শুনে খোঁজ নেন আমি কোন্ পদে অধিষ্ঠিত। জেনে নিয়ে নীরব থাকেন। বোঝা গেল না তাঁর কী মত। চাকরি ছাড়ব কি ছাড়ব না।'' মানস উত্তর দেয়।

''তার মানে তিনিও চিন্তা করছেন ঠোকাঠুকি আদৌ বাধবে কি না। ফয়সালা হয়ে যেতে পারে। দক্ষিণপন্থীরা বেঁকে বসতে পারেন। তোমাকে 'হ্যাঁ' বললেও ধরাছোঁয়া দেওয়া হতো, 'না' বললেও তাই। তাঁর সিদ্ধান্তটা তিনি হাতে রেখেছেন। সেটাও এক অর্থে রিজার্ভড।'' যূথিকা এই বোঝে।

দিন পনেরো ষোল বাদে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে যাবার মুখে সৌম্য মানসের সঙ্গে আবার দেখা করে। বিষণ্ণ বদন।

''অত বিমর্ষ কেন! মুখে নাই হর্ষ কেন।'' মানস সুকুমার রায়ের নাটকের ভাষায় কৌতুক করে। ''তোমাকে তো কখনো এমন বিরস দেখিনি।''

''গান্ধীবাদ ধ্বংস হয়নি, গান্ধী সেবাসঙ্ঘেরই কার্যত বিলোপ ঘটেছে। বাপুর ইচ্ছায় নয় জন বাদে আর সকলের সদস্যপদ গেছে। ধরে নেওয়া হয়েছে তাঁরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। আমিও। এতদিন ধরে যেটা আমরা সবাই মিলে গড়ে তুললুম সেটা এখন থেকে শুধু অহিংসা তত্ত্ব নিয়ে নিবিড়ভাবে গবেষণা করবে। পরিচালনা করবেন নয় জন নৈকষ্য কুলীন। নির্বাচিত নয়, মনোনীত। গান্ধীর সব চেয়ে আস্থাভাজন। রাজনীতির নিরিখে নয়, ইডিওলজির নিরিখে। অহিংসায় যাঁদের অটল ও অগাধ প্রত্যয়। এঁরা পরে নিয়ম কানুন তৈরি করে আরো সদস্য নিতে পারবেন। এঁদের নীতিপরীক্ষায় নিকষে আমি উত্তীর্ণ হব কি না কে জানে!'' কণ্ঠস্বরে বিষাদ।

''আমি যতদূর অনুমান করতে পারছি এটা একপ্রকার পার্জ। এর দ্বারা সঙ্ঘের ভিতর থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে বল্লভভাই ও তাঁর গোষ্ঠীকেও সুকৌশলে অপসরণ করা হলো। এতে গান্ধীবিরোধীদের গায়ের জ্বালা মিটবে। তাঁরা আর আওয়াজ তুলবেন না যে গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক। গান্ধীসঙ্ঘ ভাঙল, কিন্তু গান্ধীবাদ বাঁচল। তোমার তো খুশি হবারই কথা।'' মানস সান্ত্বনা দেয়।

যূথিকা হেসে বলে, ''যিনি সুভাষচন্দ্রকে একভাবে কংগ্রেস থেকে সরিয়েছেন তিনিই বল্লভভাইকে আরেকভাবে সেবাসঙ্ঘ থেকে সরালেন। বামপন্থীদের দাবার বিনিময়ে দক্ষিণপন্থীদের দাবা খোয়া গেল।''

''এসব কথা আমার মাথায় আসেনি,'' সৌম্য আশ্চর্য হয়। ''বাপু যে কী ভেবে কোন্ চাল দেন তা

তিনিই জানেন।"

"আমি এই ভেবে খুশি হচ্ছি যে এর পরে তাঁকে কেউ পোপ বলে অপবাদ দেবে না। আর তাঁর সঙ্ঘকে চার্চ বলে।" মানস তাঁর প্রশংসা করে।

সামনে রামগড় কংগ্রেস। সেখানে কী হয় না হয় তা নিয়ে সৌম্যর মন ভারাক্রান্ত। সুভাষপন্থীরাও ঠিক সেইখানেই আপসবিরোধী সম্মেলন বসাবেন। দুই পক্ষে হাতাহাতি না বেধে যায়।

সৌম্য সেদিন তাড়াতাড়ি ওঠে। রামগড় থেকে ফিরে আবার আসবে। ওর ধারণা এইবার একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার হয়ে যাবে। ভারত ব্রিটেনকে যুদ্ধের সময় কী দেবে না দেবে। কংগ্রেস সহযোগিতা করবে না সংগ্রাম করবে। গান্ধীজী সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক হবেন কি হবেন না।

"দ্যাট ওলড্ ম্যান," শেফার্ড একদিন মানসকে বলেন, "কংগ্রেসের পিঠ থেকে নামবেন না। যেমন সিন্ধবাদ নাবিকের পিঠ থেকে সেই বৃদ্ধ। সব চেয়ে আফসোস হয় নেহরুর জন্যে। এরই মধ্যে তিনি উল্টো সুরে গাইতে শুরু করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের বিরুদ্ধেই তাঁর সংগ্রাম, নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানেই তো জার্মানীর পক্ষে সংগ্রাম। শত্রুর শত্রু মানেই তো মিত্র।"

মানস আশা করেছিল ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট হবে। তাতে জবাহরলাল তো থাকবেনই, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজগোপালাচারীও থাকবেন। কয়েকটা পদ না হয় ইংরেজদের জন্যে সংরক্ষিত, সেসব তাঁরা অভিজ্ঞ বলে। কয়েকটা অবশ্য লীগপন্থীদেরও প্রাপ্য। কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁদেরও তো ভোটবল আছে। কিন্তু ঘটনার স্রোত ক্রমে ব্রিটেনের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও যুদ্ধকালে ব্রিটেন কেন্দ্রীয় সরকারে বড়োরকম রদবদল করতে নারাজ। যুদ্ধের পরেও যে ভারতকে তার কনস্টিটিউশন রচনা করার অধিকার দেবে তাও নয়। ওদিকে মুসলিম লীগও শোর তুলেছে যে নতুন কোনো কনস্টিটিউশন রচনা করলে মুসলিম 'নেশনের' জন্যে ভারতের দুই প্রান্তে দুটো হোমল্যাণ্ড বানিয়ে দিতে হবে। সেখানে তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। ইংরেজ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট কি সম্ভব? ইংরেজ মন্ত্রীরা কি নেশনের অন্তর্গত? লীগ মন্ত্রীরা কি নেশনের বহির্ভূত? না ওটা তিন নেশনের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক? যার একমাত্র যোগসূত্র যুদ্ধকালে ব্রিটেনের পক্ষে ভারতের যোগদান। কংগ্রেসকেই তো জনসাধারণের ঠেলা সামলাতে হবে। সৈন্যসংগ্রহে বিরোধিতা, অর্থসংগ্রহে বিরোধিতা, রসদসংগ্রহে বিরোধিতা। কংগ্রেস ভেঙে চৌচির হয়ে যেতেও পারে।

শেফার্ড একদা কংগ্রেসবিরোধী ছিলেন, কিন্তু এখন কংগ্রেসের উপর তাঁর আস্থা জন্মেছে। কংগ্রেস প্রমাণ করে দিয়েছে যে সে দায়িত্বশীলভাবে শাসনকার্য চালাতে পারে। বিশেষত রাজাজী আর গোবিন্দবল্লভ পন্তের উপর তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা। তা বলে তিনি লীগপন্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ চান না। নাজিমউদ্দিনকে তাঁর বিশেষ পছন্দ। আর সিকন্দর হায়াৎ খান্ তো তাঁর মনের মানুষ। যদিও তিনি লীগপন্থী নন, ইউনিয়নিস্ট। জিন্না সাহেব তাঁর নিজের দলটিকে একমাত্র মুসলিম দল বলে দাবী করলেও শেফার্ডের কাছে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দলটিও ফেলনা নয়। যুদ্ধকালে তারও গুরুত্ব আছে। মোট কথা ইংরেজ রাজনীতিকরা কংগ্রেসের খাতিরে লীগকে বেহাত করবেন না। তাহলে কি তাঁরা কংগ্রেসকে বেহাত করবেন? না, সেটাও তাঁদের মনের বাসনা নয়, কিন্তু রাগটা তাঁদের মিস্টার গ্যাণ্ডীর উপরেই। কোথায় অহিংসা। কে মানে অহিংসা। একজন কংগ্রেসীও অহিংসা মানে না। কংগ্রেস আমলে গুলীও চলেছে, দাঙ্গাও বেধেছে।

"আমাকে বিশ্বাস করুন," শেফার্ড একদিন মানসকে অন্তরালে বলেন, "আমি কংগ্রেসের বন্ধু। কিন্তু ওই 'অসহযোগ' আর 'সত্যাগ্রহ' আর সাম্রাজ্যের বাইরে 'স্বাধীনতা' আমি ভালো মনে করিনে। আমরা যে চিরকাল কর্তৃত্ব করতে চাই এটা ঠিক নয়, আমরা তো ইতিমধ্যেই প্রদেশগুলোর উপর কর্তৃত্ব

শিথিল করেছি। কেন্দ্রের উপর শিথিল করার জন্যেই তো ফেডারেশন পরিকল্পনা। কিন্তু তার জন্যে চাই কংগ্রেস, লীগ, রাজন্য এই ত্রিপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিলে মিশে কাজ করার আগ্রহ। অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ নয়। তার কিন্তু কোনো লক্ষণ দেখতে পাইনে। সেটা দেখবার জন্যেই আমরা থাকছি। সেটা দেখতে পেলেই চলে যাব। কিন্তু চলে যাবার সময় জেনে যাব যে ভারত কখনো ব্রিটেনের সঙ্গে শত্রুতা করবে না, ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না, ব্রিটেনের শত্রুদের ঘরে ডেকে আনবে না, ঘাঁটি দেবে না। অপর পক্ষে ব্রিটেনও ভারতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। গৃহযুদ্ধে দেশ বিদীর্ণ হলেও আমরা ছুটে আসব না। দেশ আক্রান্ত হলে অবশ্য অন্য কথা। সেক্ষেত্রে আমাদের ছুটে আসতেই হবে, নয়তো রাশিয়া বা জাপান এদেশ গ্রাস করবে। আত্মরক্ষা করতে পারবেন ততখানি ক্ষমতা কি কংগ্রেস বা লীগ নেতাদের বা রাজরাজড়াদের আছে? স্বাধীনতার পরেও কি থাকবে? ব্রিটেনের সঙ্গে ডিফেন্স প্যাক্ট করতেই হবে। আমরা আসব আপনাদের পক্ষে লড়তে। আপনারা যাবেন আমাদের পক্ষে লড়তে। হ্যাঁ, আমাদেরও চাই গুর্খা, ডোগরা, শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্য। আমাদের সদর দরজার নাম বেলজিয়াম। সেখানে ওরাই দারোয়ান হবে। যুদ্ধের সময়, অন্য সময় নয়। এসব কথা এখন কংগ্রেস নেতাদের বোঝায় কে? দ্যাট ওল্ড ম্যান, মিস্টার গ্যাণ্ডী, ওদের মাথা খেয়েছেন।"

মানস তর্ক করে না। কথাগুলো তো অযৌক্তিক নয়। নেতারা যে বোঝেন না তাও নয়। কংগ্রেস তো সহযোগিতার জন্যে হাত বাড়িয়েই রয়েছে। দিল্লী যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও। গান্ধীজী যে অমন চিন্তাকুল তার মূল কারণও তো এই।

"আপনি যদি কিছু মনে না করেন," মানস বলে, "সব কিছু নির্ভর করছে আপনাদেরই উপরে। ফেডারেশন কবে হবে, আদৌ হবে কি না, তার জন্যে অপেক্ষা না করে আজকের এই সঙ্কটের ক্ষণেই বড়লাটের শাসনপরিষদের রদবদল করা হোক। যাতে লোকের ধারণা জন্মায় যে ওটা তাদের নিজেদের ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট। সেটা যে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট হবে এমন কথা কেউ বলছেন না। তবে সেখানে বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আবুল কালাম আজাদ, জবাহরলাল নেহরুকে আসন দিতে হবে। এঁরা কেউ ছোট মাপের নেতা নন যে প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব পেলেই হাতে স্বর্গ পাবেন। ভুলটা তো হচ্ছে এইখানে যে, এঁদের উপযুক্ত কাজে ব্যবহার করতে পারা যাচ্ছে না। তাই এঁরা গান্ধীজীর চারিদিকে ঘুর ঘুর করছেন। তিনিই বা এঁদের কী দিয়ে ব্যাপৃত রাখবেন? অসহযোগ আর সত্যাগ্রহ ছাড়া আর কী আছে তাঁর ভাণ্ডারে?"

"কিন্তু ওই চারজনকে শাসন পরিষদে নিতে হলে মুসলিম লীগ থেকেও দু'জনকে নিতে হয়। জিনা আর লিয়াকৎ আলী। শিখদের একজনকেও নিতে হয়। তা হলে বাকী থাকে একটিমাত্র আসন। সেটি তো জঙ্গীলাটকে দিতেই হবে। আইনে তার নির্দেশ আছে। তা হলে আই. সি. এসদের বেবাক বাদ দিতে হয়। আহা, আমরা কেন তাতে রাজী হব? হোম ডিপার্টমেণ্ট আমরা ছাড়া আর কে চালাতে পারবেন? আর মুসলিম লীগের নেতারা কি কংগ্রেস মুসলিমকে সহ্য করবেন? এই দুই প্রশ্নের উত্তর পেলেই বড়লাট তাঁর শাসন পরিষদের রদবদলের কথা ভেবে দেখবেন।" শেফার্ড আশ্বাস দেন।

এর পর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। শেফার্ড মানসকে চাকরি ছাড়তে বারণ করেন।

রামগড় থেকে ফিরে সৌম্য আবার দেখা করতে আসে। তার মুখ উজ্জ্বল। "কংগ্রেস এখন একটি সুসম্বদ্ধ সেনা। তার সেনাপতি — একমাত্র ও একচ্ছত্র সেনাপতি — এখন বাপুজী। সবাইকে তার ডিসিপ্লিন মেনে নিতে হবে। নয়তো সেনা থেকে সরে যেতে হবে। এটাও একপ্রকার পার্জ। কংগ্রেস কমিটিমাত্রেই হবে সত্যাগ্রহ কমিটি। তার কাজ হবে সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি চালানো। ডাক আসবে একদিন, যদি তার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন না-ও হতে পারে। কে জানে, ব্রিটেনের যদি সুমতি হয়! যুদ্ধকালে

ব্রিটেনকে বিব্রত করতে আমাদের সকলেরই অনীহা। তা বলে আমাদের সংগ্রাম আমরা শিকেয় তুলে রাখতে পারিনে। সংগ্রাম বাধবেই এমন কথা বললে ভুল হবে, কিন্তু যদি বাধে তা হলে সে সংগ্রাম ততদিন চলবে যতদিন ব্রিটেনের অন্তঃপরিবর্তন না হয়। কে জানে, হয়তো সাত আটবছর। আমি আপাতত রিজার্ভে। গঠনের কাজই আমার নিত্যকর্ম। ক্ষমতার রাজনীতি আমার জন্যে নয়। মুসলিম লীগ তো ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছু বোঝে না। কংগ্রেসও যে আর কিছু বোঝে তা নয়। তাই কংগ্রেসকে নিয়ে হয়েছে আমাদের মুশকিল। ক্ষমতা হাতে পেলে কংগ্রেস যা গড়ে তুলবে তা ওই ব্রিটিশ ধাঁচের সোনার ঠাকুর মাটির পা। শক্তিশালী কেন্দ্র, দুর্বলতম গ্রাম। বিত্তশালী শিল্পপতি শ্রেণী, দীনতম ক্ষেতমজুর শ্রেণী। যুদ্ধকালে কংগ্রেসের সহযোগিতা মানেই ধনীকে আরো ধনী আর গরিবকে আরো গরিব করা। কংগ্রেসকে নিবৃত্ত করাই হচ্ছে সমস্যা। ব্রিটেন এতে সহায়তা করছে কংগ্রেসের প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে। জিন্না সাহেব সহায়তা করছেন কংগ্রেস মন্ত্রীদের ফিরতে দেবেন না বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে। বামপন্থীরাও সহায়তা করছে আপসহীন বিরামহীন সংগ্রামের জন্যে রামগড়েই পাল্টা কনফারেন্স করে। আমরা এখন সোনার ঠাকুর হস্তান্তরের কথা ভুলে মাটির পায়ের দিকেই দৃষ্টি ফেরাব। মাটির পা'কেই পাথরের পা করতে হবে।"

মানস হেসে বলে,"আর সোনার মাথাকে কিসের মাথা করবে? সোনার অঙ্গকে কিসের অঙ্গ? বড়লাটের শাসন পরিষদ্, গভর্নরদের মন্ত্রীমণ্ডল, এসব যদি পুরোপুরি কংগ্রেসের হয় কংগ্রেস কি এসব ঢেলে সাজাবে? যাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়? কিন্তু থাক ওসব কথা। তোমরা মৌলানা সাহেবকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করে এ কী কাণ্ড করলে? এ যে এক ঢিলে দুই পাখী মারা! জিন্না সাহেব কোনোদিন ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন না। জিন্নার ভয়ে বড়লাটও না। তা হলে কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট হবে কী করে? শাসন পরিষদের রদবদল হবে কী করে? না, সেটা তোমাদের অভিপ্রেত নয়? তোমরা যুদ্ধকালে অসহযোগ করবেই!"

সৌম্য অবাক হয়! "না, না। আমাদের তেমন কোনো অভিপ্রায় নেই! আমরা শুধু এইটুকু বোঝাতে চাই যে কংগ্রেস মুসলমানদেরও আপনার প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কংগ্রেসের সংগ্রামে মুসলমানদেরও যোগ দেওয়া উচিত। ওরা যেন সংগ্রাম থেকে সরে না দাঁড়ায়। যেটা ব্রিটিশ রাজের পলিসি। তথা মুসলিম লীগেরও পলিসি। তাস খেলার টেবিলে বড়লাট ও জিন্না দু'জনে দু'জনার পার্টনার। একই পলিসি দুই পার্টনারের। দুনিয়াকে ওঁরা দেখাতে চান যে কংগ্রেসের সংগ্রামটা কেবল হিন্দুদেরই সংগ্রাম। মুসলমানদের নয়। মৌলানা সাহেবকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করে আমরাও দুনিয়াকে দেখাতে চাই যে আমাদের সংগ্রাম হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয়দের সকলের সংগ্রাম। স্বাধীনতা সকলেরই লক্ষ্য। মৌলানা সাহেবের মতো অত বড়ো একজন মুসলিম শাস্ত্রবিদ্‌কে কাফের বলার ধৃষ্টতা কার হবে? আর কেউ না দিক সীমান্তের মুসলমানরা সাড়া দেবে ঠিক।"

কংগ্রেসের রামগড় প্রস্তাবের দিন চারেক পূর্বেই মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব। প্রস্তাবক ফজলুল হক সাহেব। মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। একটি উত্তর-পশ্চিম, অপরটি উত্তর-পূর্বে। পাকিস্তান নামটি অনুল্লিখিত। তবু পাকিস্তান নামটিই প্রচারিত।

খোন্দকার জাফর হোসেনের মুখে চোখে হর্ষ। "ফেডারেশন হবে না, মল্লিক। হতো, যদি রাজন্যরা যোগ দিতে রাজী হতেন। যোগ দিয়ে কংগ্রেস ও লীগের ব্যালান্স রাখতেন। তাঁরা বিমুখ না হলে লীগও বিমুখ হতো না। ব্যালান্স রক্ষার জন্যেই অত্যাবশ্যক হিন্দু নেশনের জন্যে হিন্দুস্থান আর মুসলিম নেশনের জন্যে পাকিস্তান। নইলে ইংরেজকেই চিরকাল থেকে যেতে হয়। নো পার্টিশন, নো ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স।"

মানসের চোখে মুখে বিষাদ। "পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদেরই জয় হয়েছিল, খ্রীস্টানদের নয়। তাদের রাজত্বকে লোকে ইংরেজ রাজত্ব বলেই জানে, খ্রীস্টান রাজত্ব বলে নয়। ইংরেজের সঙ্গে লড়তে

হলে ভারতীয় বলেই পরিচয় দিতে হয়, হিন্দু বা মুসলমান বলে নয়। দুই শতাব্দী ধরে আমরা এই লাইনেই ভেবেছি, কাজ করেছি। ইংরেজ চলে গেলে আমরা দুই শতাব্দী পেছিয়ে যেতে পারিনে। সেটা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। পাকিস্তান প্রস্তাব হচ্ছে মধ্যযুগে ফিরে যাবার প্রস্তাব। লীগপন্থীরা মধ্যযুগের সম্মোহনে মুগ্ধ হতে পারেন, কিন্তু মুসলমানরা সবাই তো লীগপন্থী নন। কংগ্রেসপন্থী আছেন, ইউনিয়নিস্ট আছেন, কমিউনিস্ট আছেন। তাঁরা তো আধুনিক যুগেই থাকতে চান, রাজপরিবর্তনকে তাঁরা মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন মনে করেন না। পাকিস্তান হলে সেটা হবে এঁদের গোরস্থান। এঁদের অনুগামীরা কি রাজী হবেন, হোসেন?"

নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে মানস অস্থির হয়ে উঠেছিল। আপাতত চার মাসের ছুটিতে যাবে, শান্তিনিকেতনে গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করবে ছুটির পরে চাকরি ছাড়বে না রাখবে।

"সেই ভালো।" সৌম্য তা শুনে সমর্থন করে। "অত বড়ো একটা ব্যাপারে মনঃস্থির কি পরিণাম চিন্তা না করে করা উচিত। আমরাও কি পারছি মনঃস্থির করতে? এ যাবৎ আমরা যতবার লড়েছি একটি ফ্রন্টেই লড়েছি। আবার যদি লড়তে হয় তো লড়তে হবে দুটি ফ্রন্টে। ব্রিটিশ ফ্রন্টে তথা মুসলিম লীগ ফ্রন্টে। লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্যই হলো দ্বিতীয় ফ্রন্টের হুমকি । আমরা যদি ভয় পেয়ে রণে ভঙ্গ দিই তবে ইংরেজ রাজত্ব থেকে গেল। তখন কোথায় স্বাধীনতা আর কোথায় পার্টিশন। যদি ভয় না পেয়ে সংগ্রামে নামি তবে শুধু রাজশক্তির সঙ্গে নয়, মুসলিম জনতার সঙ্গেও মোকাবিলা করতে হবে। মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেসকে মুসলিমশূন্য করতে। বকশিষ, ওদের জন্যে সেপারেট ইলেকটোরেট। এবার তার ভূমিকা কংগ্রেসের সংগ্রামকে মুসলিমশূন্য করা। বকশিস, ওদের জন্যে সেপারেট স্টেট বা স্টেটস। বাপু তো বলেছিলেন একমাসের মধ্যেই সংগ্রামের ডাক দেবেন। এখন বলছেন তার আগে হাজারবার ভাববেন। আমরাও তাই কূলে বসে ঢেউ গুনছি। ডাক এলেই ঝাঁপ দেব।"

"তা হলে জুলির কী হবে, দাদা?" যূথিকার সেই একই ভাবনা।

"জুলি যদি আমার হয়ে থাকে তবে আমার অনুব্রতা হবে। কিন্তু ওর দাদাদের যা মতিগতি ওঁরা বোধ হয় এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ওঁদের কথায় জুলিও।" সৌম্য একটু থেমে আবেগের সঙ্গে বলে, "যুদ্ধকালে বিপ্লবীদের বিচার তো ফৌজদারী আদালতে হয় না। হয় সামরিক আদালতে। তারপরে ফাঁসী কী দ্বীপান্তর।"

"না। না। না।" যূথিকা কাতর স্বরে অনুনয় করে। "তুমি ওর হাত চেপে ধরো, সৌম্যদা।"

—

ক্রান্তদর্শী

দ্বিতীয় পর্ব

ভূমিকা

কবিগুরুর মতো আমারও বলতে ইচ্ছা করে,

"এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।"

প্রবন্ধে আমার কথা আমি অবাধে বলতে পারি,কিন্তু উপন্যাসে আমি যা খুশি লিখতে পারিনে। বাইরের আদেশে নয়, অন্তরের নির্দেশে আমি এমন সব কথা লিখি যা আমার কথা নয়, যা চরিত্রের কথা। তারা আমার সৃষ্ট হলেও আমার হাতের পুতুল নয়। যে যার স্বভাবের অনুসরণ করে। যার যা নিয়তি। আমি নিজেই ওদের ব্যাপার স্যাপার দেখে বিস্মিত। ওরা আমার ইচ্ছামতো বাঁচবে না, যে যার ইচ্ছামতো বা বিধাতার ইচ্ছামতো বাঁচবে। আমি আমার মনটাকে খোলা রেখেছি।

এক বন্ধু প্রথম পর্ব পড়ে প্রশ্ন করেন, "এইসব চরিত্র কি আপনি মডেল দেখে এঁকেছেন?" এর উত্তরে আমি বলি, " কোনো একটি চরিত্রের মডেল কোনো একজন নয়। একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে তিল তিল করে সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। তাই কাউকে চিনতে পারা যাবে না। চিনলে সেটা ভুল হবে! কিন্তু এমন কথা আমি বলব না যে এঁরা সবাই আমার কপোলকল্পিত।"

বই চার পর্বে শেষ হলে আমি আরো একটা স্বীকারোক্তি করব। তার দেরি আছে। আগে তো দেখি কার কী গতি হয়। আমিও কি জানি?

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আমি জানি। কিন্তু ব্যক্তির জীবনের ক্রমপরিণতি আমি জানিনে। লিখতে লিখতে জানতে পারব। উপন্যাস লেখাও একটা নিরুদ্দেশযাত্রা। এটা ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। আরম্ভের পূর্বে এর থীম্ ছিল রিনিউয়াল। পুনর্নবীকরণ। লিখতে লিখতে তার থেকে সরে এসেছি। উপন্যাস তার নিজের নিয়মেই চলে। আমাকেও সে নিয়ম মানতে হবে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

॥ এক ॥

দীপিকা বৌদির আদরের কুকুর এল্‌ফ স্বপনদার পায়ের কাছে চোখ বুজে শুয়েছিল। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। প্রথমটা গরর গরর করে, তার পরে ঘেউ ঘেউ করে দরজার দিকে তেড়ে যায়।

দরজার ওপার থেকে আওয়াজ আসে, "আসতে পারি?"

স্বপনদা ফরাসী ভাষায় উত্তর দেন, "আঁত্রে।" উনি তখন মনে মনে প্যারিসে বাস করছিলেন। টেবিলের উপর একরাশ ফরাসী পত্রিকা খোলা। সেসব তিনি জার্মান দখলী ফ্রান্স থেকে বাঁকা পথে সংগ্রহ করেছেন।

বাবলী ঘরে ঢুকে বলে, "এটাকে তো আমি আগে কখনো দেখিনি। বাপ রে! কী বিকট গর্জন! যেন চোর কি ডাকাত পড়েছে।"

"ওঃ তুমি!" স্বপনদা চেয়ার ছেড়ে উঠে বাবলীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলেন, "আমার প্রিয় বোন চকোলেট। আমার প্রিয় বোন চকোলেট।" বলতে বলতে আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়। চোখে জল এসে পড়ে।

"কই, বৌদি কোথায়?" বাবলী তার হাত থেকে ফুলের সাজি নামিয়ে রেখে বলে, "তোমাদের বিয়েতে আমি যোগ দিতে পারিনি। জেলের বাইরে থাকলেও ওসব বুর্জোয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিইনে। যাক, বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন অভিনন্দন জানাতেই হয়। সেইসঙ্গে দিতে হয় কিছু উপহার। আমরা প্রোলিটারিয়ানরা ফুলই দিই। কই, তিনি কোথায়?"

"তিনি!" স্বপনদা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "তিনি আমাকে তাঁর পেয়ারের কুকুরের বেবী সিটার করে বসিয়ে রেখে বাজার করতে বেরিয়েছেন। বাড়ীতে একটা পার্টি আছে। তোমার যদি অন্য কোনো এনগেজমেন্ট না থাকে তবে যেয়ো না, থেকে যাও। আমাদের সঙ্গে খাবে। বিয়েতে তুমি যোগ দিতে না, কিন্তু বৌভাতে তো দিতে। তোমাকে আমি খুব মিস করেছি। তোমার বান্ধবী ক্যারামেলকেও। সেও কি ছাড়া পেয়েছে?"

"না, টুর্গেনিভদা।" বাবলী বিষণ্ণ মুখে বলে, "সে অনেক কথা। কিন্তু তোমাকে আর আমি টুর্গেনিভদা বলব না। টুর্গেনিভ যাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে গিয়ে সারাজীবন অবিবাহিত থেকে গেলেন। আর তুমি! বিশ বছর না বাইশ বছর একনিষ্ঠ থাকার পর সবাই যা করে তুমিও তাই করলে। কোথায় রইল তোমার প্রেমের আদর্শ। তোমার অসাধারণত্ব! পারবে কি তুমি কখনো আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল' লিখতে? তুমি আমাকে হতাশ করলে, স্বপনদা।"

"আগে তো শোন সব কথা। তার পরে যা বলতে চাও বলো।" স্বপনদা চাকরকে ডেকে চায়ের হুকুম দিয়ে জমিয়ে বসেন।

"বেশ তো, শুনব।" বাবলী এল্‌ফের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে। ইতিমধ্যে তার সঙ্গে

ভাব হয়ে গেছে।

"চকোলেট তোমাকে আমি বার বার বলেছি আমি টুর্গেনিভ নই। আমার গুরু ফ্লোবেয়ার। বহুদিন থেকে চেষ্টা করে আসছি আর একখানা 'মাদাম বোভারি' লিখতে। তাঁর মতো অবিবাহিত রয়েছি। এটা আর্টের প্রতি একনিষ্ঠতা। প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠতা নয়। হ্যাঁ, প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু সেটা কতকাল একতরফা থাকতে পারে বলো? দশ বছর অপেক্ষা করেছি, বিশ্বাস করেছি যে ওর ছেলে বড়ো হলে ও আমার কাছে চলে আসবে। এদেশ না হোক ওদেশে গিয়ে আমরা বিয়ে করব। আমাদের ফোর আর্টস ক্লাবে এর নজির আছে। বুঝতে পারি আমাদের বেলায় তা হবার নয়। বৃথা অপেক্ষা। তখন ইস্ট ওয়েস্ট ক্লাব গড়ে তুলি। এখানেও মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ। কিন্তু মন দেওয়া নেওয়া হলো না। আমি যাঁকে চাই তিনি আমাকে চান না। যিনি আমাকে চান আমি তাঁকে চাইনে। আমি তো বিয়ের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম। এমন সময় বাবার পরলোকের সমন আসে। তিনি আমাকে ডেকে বলেন, আমি আর বেশী দিন নেই। আমার একটা সাধ অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সেটা ছিল তোমার মায়েরও সাধ। তিনি থাকলে তিনি তোমার উপর চাপ দিতেন। আমি কখনো চাপ দিইনি ও দেব না। কিন্তু আমি আশা করেছি ও করব যে তুমি তোমার পূর্বপুরুষের বংশলতিকায় ছেদ পড়তে দেবে না। প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে চাও করো, কিন্তু বিয়ে করলেই পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবে। নয়তো নয়। একথা শুনেই আমি মনঃস্থির করে ফেলি। ক্লাব তখন ভাঙনের মুখে। যুদ্ধ নিয়ে নানা জনের নানা মত। কারো কারো মত ক্লাবের মূলনীতিবিরোধী। নাৎসীদের বিরোধীতা করতে গিয়ে আমি বাখ্ বেঠোভেন গ্যেটে শিলারের বিরোধিতা করতে পারিনে। কেউ কেউ আবার নাৎসীদের জয় কামনা করেন। পুলিশ শুনতে পেলে রক্ষে আছে। আমার সঙ্গে যাঁর মতের মিল তিনিই হন তোমার বৌদি। তাঁর একটিমাত্র শর্ত। লাভ্ মী, লাভ্ মাই ডগ। তাঁকে ভালোবাসলে তাঁর কুকুরকেও ভালোবাসতে হবে।" স্বপনদা হাসেন।

"এমন শর্ত কোনো কালেই শুনিনি। ধন্য বৌদি!"বাবলীও হাসে।

"শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। পুরূরবা যখন উর্বশীকে বিয়ে করতে চান তখন উর্বশী বলেন, আমার শয্যার পাশে পুত্রবৎ প্রিয় দুটি মেষ বাঁধা থাকবে ও এরা কখনো অপহৃত হবে না। পুরূরবা বলেন, বেশ, তাই হবে। একদিন রাত্রিকালে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু মেষ দুটিকে হরণ করেন। উর্বশী তাদের উদ্ধার করার জন্যে কান্নাকাটি করলে পুরূরবা শয্যা থেকে উঠে বিবস্ত্র অবস্থায় বিশ্বাবসুর পশ্চাদ্ধাবন করেন। উর্বশীর আরো এক শর্ত ছিলো পুরূরবাকে যেন তিনি কখনো বিবস্ত্র না দেখেন। হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানিতে তাঁর সেই রূপ দেখে উর্বশী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যান।" স্বপনদা বলতে বলতে এল্‌ফের উপর কড়া নজর রাখেন।

বাবলী ভয় পেয়ে বলে, "এল্‌ফ যদি চুরি যায়?"

"ভাবনার কথা বৈকি। তবে আমাদের বেলা তেমন কোনো শর্ত হয়নি। আমি শুধু ভালোবেসেই খালাস।" স্বপনদা অভয় দেন।

"তা ভলোবাসার মতো কুকুর বটে। কোন্ জাতের?" বাবলী সুধায়।

"পোমেরানিয়ান। তার মানে জার্মান।" স্বপনদা বলেন।

"তা হলে আমি একে ভালোবাসতে পারব না। জানো তো তোমার প্রিয় জার্মানরা আমার প্রিয় রাশিয়ানদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রাশিয়া যদি হেরে যায় সর্বনাশ হবে, স্বপনদা। বিপ্লব ব্যর্থ হবে। রাশিয়ায় ব্যর্থ হলে ভারতেও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তা হলে আমি কী নিয়ে বাঁচব। রুশকে তার চরম সঙ্কটের দিন যে-ই মদত দেবে সে-ই আমার মিতা। সে যদি ইংরেজ হয় তবে সেও আমার মিত্র। আমাদের থীসিস বদলে গেছে। তাই আমাদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জুলি তা শুনে রেগে আগুন। বলে, তোমরা দেশদ্রোহী। দেশের চরম সঙ্কটের দিন যে-ই মদত দেবে সে-ই আমার মিত্র। সে যদি হিটলার হয় তো

সেও আমার মিতা। একথা শুনলে কেই বা ওকে মুক্তি দেবে? ওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, স্বপনদা। মনটা খারাপ বলে খারাপ। একযাত্রায় পৃথক ফল।" বাবলী আফসোস করে।

স্বপনদা স্তম্ভিত হয়ে বলেন, "বিচ্ছেদ! ও যে বড়ো অলক্ষুণে কথা! আমার প্রিয় বোন চকোলেটের সঙ্গে আমার প্রিয় বোন ক্যারামেলের বিচ্ছেদ। না, না, কথাটা অতি রূঢ়। বলতে পারো মতান্তর। মনান্তর কখনো নয়।"

"জুলি আমাকে শাসিয়েছে আমাদের মিতা ইংরেজরা যেদিন লাথি খেয়ে সমুদ্রের জলে ভেসে যাবে সেদিন আমরাও লাথি খেয়ে এক নৌকায় ভাসব। এদেশে আমাদের ঠাঁই হবে না। আমাদের পিতৃভূমি রাশিয়া। সেইখানেই আমাদের শেষ আশ্রয়। যদি সে তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে।" বাবলীর কণ্ঠরোধ হয়।

"পারবে। পারবে। আলবাৎ পারবে।" স্বপনদা সুনিশ্চিত। "হিটলারের দশা হবে নেপোলিয়নের মতো। হিটলার কি নেপোলিয়নের চেয়েও বড়ো? কেঁদো না, বোন চকোলেট। কেউ মদত দিক আর নাই দিক, রাশিয়া আত্মরক্ষা করবেই। ইংরেজ কেন ওকে মদত দিতে ছুটে গেছে, জানো? ইংরেজের আশঙ্কা রাশিয়া কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়ে আবার না একটা ব্রেস্ট-লিটোভস্ক সন্ধি করে। তখন হিটলার আবার মোড় ঘুরে ইংরেজের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।" স্বপনদারও সেই আশঙ্কা।

"অসম্ভব। জায়গা ছেড়ে দিয়ে সন্ধি। অসম্ভব। সন্ধিই অসম্ভব। একবার যে চুক্তি ভঙ্গ করেছে আবার সে তাই করবে। হিটলারকে টিট করতে হবে। তার জন্যে যদি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয় তাও সই। জুলি একথা শুনে আরো ক্ষেপে যায়। বলে, মিলির মতো তুমিও আগে থাকতে বিলেতে পালিয়ে যেতে পারো। বিয়ে করে সুখে থাকবে।" বাবলী কাঁদো কাঁদো স্বরে শোনায়।

"মিলি! মিলিটি কে?" স্বপনদা উৎসুক হন।

"নামকরা বিপ্লবী নায়িকা মধুমালতী মুস্তাফী। বিয়ের পর দত্তবিশ্বাস। স্বামী বহুদিন থেকে লণ্ডনের অধিবাসী। অগত্যা মিলিও বিয়ের পর সেখানকার বাসিন্দা। আগে থাকতে পালিয়ে গেছে এ কী রকম কথা! ইংরেজরাও কি ভারত থেকে পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? বিপ্লবের ঢের দেরি। আগে তো রুশ বিপ্লব নিষ্কণ্টক হোক। রাশিয়া রাহুমুক্ত হোক। তার পরে আমরা দিকে দিকে আগুন জ্বালাব। আপাতত আমাদের হাতের তাস হাতে রাখতে হবে। লোকে বলবে আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচর। সেইজন্যেই আমাদের জেল থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। লোকের ভয়ে আমিও তো আজকাল বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকি। তোমার কথা আলাদা। তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না, স্বপনদা।" বাবলী মিনতি করে।

"আরে না। আমি কি আমার বোনদের ভুল বুঝতে পারি! তোমাকেও না, ক্যারামেলকেও না। তোমাদের দিক থেকে তোমরা দুজনেই ঠিক। মানুষের মনটা উকিল। বলে গেছেন পরমহংসদেব। আমরা হাইকোর্টে গিয়ে নিত্য দু'পক্ষে দাঁড়িয়ে দু'পক্ষের হয়ে মামলা লড়ি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র তো আদালত নয়। সেখানে দুই পক্ষ নয়, আরো এক পক্ষ। তার নাম নিয়তি। ডেস্টিনি। তোমাদের দুই পক্ষের যুক্তিই ভুল প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। তখন তোমরা দুজনেই আবার কোলাকুলি করতে পারো। এ বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ নয়। কেউ কি জানত যে বিপ্লবী নায়িকা মধুমালতী মুস্তাফী রাতারাতি ভোল পালটে বিলেত গিয়ে হাজির হবেন! নিয়তি। ডেস্টনি। এই যুদ্ধের শেষ কী ভাবে হবে তা তুমিও জানো না, জুলিও জানে না, আমিও জানিনে, কেউ জানে না। হিটলারও না, স্টালিনও না, চার্চিলও না।" স্বপনদা চায়ের পেয়ালা বাড়িয়ে দেন। হস্‌টেসের অনুপস্থিতিতে তিনিই হস্‌টেসের স্থলে অভিষিক্ত।

"চার্চিল!" চার্চিলের কথায় বাবলীর মনে পড়ে, "মিলি এখন চার্চিলের পরম ভক্ত। অমন নেতা নাকি হয় না। ব্রিটেনকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সেবার পার্টির সদস্যরাও ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

"চার্চিল।" স্বপনদা উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, "পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। লেবারপার্টির অত বড়ো শত্রু কি আর আছে? শুধু লেবার কেন টোরি পার্টির অধিকাংশ সদস্য ওঁর উপর বিরূপ। যতবার মন্ত্রী হয়েছেন প্রত্যেকবারই মারাত্মক সব ভুল করেছেন। কত লোক যে ওঁর জন্যে যুদ্ধে বৃথা প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধের সময় আর কত অর্থ যে বরবাদ হয়েছে! এ যুদ্ধের আগের দশটি বছর ধরে ওঁর বনবাস। একজন ইংরেজও বিশ্বাস করত না যে ওঁর কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আছে। ইংরেজদের একটা মস্ত গুণ যুদ্ধের সময় ওরা দলবাজি ভুলে যায়। লেবার পার্টির সদস্যরা বলেন চার্চিল যদি প্রধানমন্ত্রী হন তা হলেই ওঁরা কোয়ালিশনে রাজী হবেন। আর টোরিদের অধিকাংশ ওঁর উপরে বিরূপ হলেও আর-কোনো নেতাকে পান না যিনি লেবারকে বাদ দিয়ে এককভাবে যুদ্ধ চালাতে পারবেন। নিয়তি! একেই বলে নিয়তি। নইলে দু'বছর আগেও কি কেউ বিশ্বাস করত যে চার্চিল আবার মন্ত্রী হবেন? প্রধানমন্ত্রী হওয়া তো দূরের কথা। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা সোভিয়েট রাশিয়ার এত বড় শত্রু আর ছিল না। সেই মহাশত্রু কেমন করে মিত্র হলেন সে এক দুর্ভেদ্য রহস্য। আমি যেটুকু বুঝি সেটুকু এই যে, রাশিয়া তো কোনোদিন ব্রিটেন আক্রমণ করবে না, করলে জার্মানীই করবে। কোনোদিন ফ্রান্স আক্রমণ করবে না, করলে জার্মানীই করবে। সুতরাং জার্মনীই এক নম্বর শত্রু। তার বিরুদ্ধে যুঝতে হলে পূর্ব দিকেও মিত্র চাই, শুধু পশ্চিম দিকে নয়। পূর্ব দিকের সেই মিত্র ছিল পোলাণ্ড। সে তো একমাসের মধ্যেই কুপোকাৎ। রাশিয়াই একমাত্র শক্তি যে জার্মানীকে রুখতে পারে। যদি প্রয়োজনমতো অস্ত্রশস্ত্র পায়। হলোই বা সে কমিউনিস্ট। বিপদে পড়লে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়। ক্যাপিটালিস্টের সঙ্গে কমিউনিস্টের এটা সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। সেই চার্চিল আর সেই স্টালিন। ভাবতে পারো একথা? ইতিহাসের পরিহাস। একদিন যেটা ছিল অসম্ভব আজ সেটা সম্ভব। আসলে যুদ্ধ ব্যাপারটা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ নয়, শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত। আর সে শক্তিকে বলতে পারো ইম্‌পার্সনাল। যেমন সাইক্লোন বা ভূমিকম্প। ব্যক্তি সেখানে নিমিত্তমাত্র। তা বলে চার্চিলের জায়গায় চেম্বারলেনকে বসিয়ে দিলে চলত না। তেমনি স্টালিনের জায়গায় ট্রটস্কিকে। বিপ্লবের দিন ট্রটস্কির ভূমিকা ছিল স্টালিনের চেয়ে বড়ো। ট্রটস্কি না হলে রেড আর্মির সৃষ্টি আর কেউ করতে পারতেন না। পরে ওঁর উপর দারুণ অন্যায় করা হয়েছে, তা তুমি স্বীকার করো আর নাই করো, বোন। কিন্তু আজকের দিনে স্টালিনই ভরসা।"

"যা বলেছ। আমরা উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে আছি তাঁরই মুখের দিকে। এতদিন তিনি পার্টির কর্ণধার ছিলেন। এখন সরকারের কর্ণধার হয়েছেন। শাসনযন্ত্র এখন তাঁর মুঠোর মধ্যে। যুদ্ধ পরিচালনার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। হিটলার তাঁর তুলনায় কী! আঙুল ফুলে কলাগাছ। কিন্তু জার্মান সেনা যে হারে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আতঙ্কের কারণ না থেকে পারে না। মস্কোর পতন আসন্ন। লেনিনগ্রাডের পতন অদূরে। আমরা কি স্থির থাকতে পারি, সম্ভব হলে ফ্রন্টে গিয়ে লড়তুম। মনটা পড়ে আছে মস্কোতে, লেনিনগ্রাডে। দেহটা কলকাতায়। তুমি তো টুর্গেনিভ নও, তুমি কী বুঝবে আমার যাতনা। অবশ্য কমিউনিস্ট তুমি কোনো কালেই ছিলে না। বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি, এইটুকুর জন্যেই তোমার কাছে আসি। তা তুমি কি তোমার মাদাম ভিয়ার্দোর সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই কাটিয়ে দিলে? ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, কিছু মনে কোরো না।" বাবলী ফুলুরি খেতে খেতে বলে। স্বপনদার প্রিয় ভোজ্য।

"বান্ধববান্ধবী সম্পর্ক যেমন ছিল তেমনি আছে। কিন্তু প্রেমিকপ্রেমিকা সম্পর্ক আর থাকতে পারে না। বহুদিন থেকেই নেই। মানুষের হৃদয় এক বিচিত্র বস্তু। একবার যদি হারায় তবে সহজে তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। যতদিন না তাকে ফিরে পাচ্ছি ততদিন আর কাউকে হৃদয় দিতে পারিনে। হৃদয় না দিয়ে দেহ দিলে সেটা হতো ব্যভিচারিতা। সেইজন্যে আমি বাবাব পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও বিয়ে করিনি। একটা না একটা অজুহাতে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু ক্রমেই উপলব্ধি করছিলুম যে এমনভাবে চলতে পারে

না। দেবতা বলো, মানুষ বলো, পশুপাখী বলো সকলেরই জোড় আছে। জুটি আছে। একক কেউ নয়। আমিই বা কেন ব্যতিক্রম হতে যাই? ফ্লোবেয়ারের মতো একনিষ্ঠ আর্টিস্ট হতে চাই বলে? এটা উনবিংশ শতাব্দী নয়। ফরাসী সমাজও নয়। ও রকম একটা ক্লাসিক লিখলে সেটা না হবে কালোপযোগী, না দেশোপযোগী। এখন আমি ভাবছি একখানা নাটক লেখার কথা। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যার অভিনয় দেখছি তারই আদলে লিখলে সেটাই হবে আমার 'ফাউস্ট'। ও বই লিখতে গ্যেটের ক'বছর লেগেছিল, জানো? চল্লিশ বছর। আমার বয়সেই তিনি আরম্ভ করেন। সমাপ্ত করেন আমার বাবার বয়সে। এর জন্যে চাই একটি নারী। এই বয়সেই তিনি নারী গ্রহণ করেন। তাকে গির্জায় গিয়ে বিয়ে করেন সতেরো বছর বাদে। ও কী! চমকে উঠলে যে!" স্বপনদা বিস্ময়ের ভান করেন।

"রুশো যা মানতেন না, ভলতেয়ার যা মানতেন না, গ্যেটে স্বয়ং তাঁর যৌবনে যা মানেননি বৃদ্ধ বয়সে তাই মেনে নিলেন! গির্জায় গিয়ে মন্ত্রপাঠ করে সমাজসম্মত কনভেনশনাল ম্যারেজ! চমকে উঠব না?" বাবলী উত্তর দেয়।

"তোমরা কি তা হলে বিবাহও তুলে দিতে চাও?" স্বপনদা সুধান।

"না, বিবাহ তুলে দেব না। তবে আইনের কড়াকড়ি রাখব না, ধর্মীয় অনুষ্ঠান রাখব না। ইচ্ছা হলো একসঙ্গে থাকলুম, ইচ্ছা হলে সঙ্গত্যাগ করলুম। বিবাহ হবে বন্ধুতার মতো।" বাবলীর জবাব।

"ছেলে কার তা নিয়ে যদি বিরোধ বাধে সম্পত্তির উত্তরাধিকার কার উপর বর্তাবে?" স্বপনদা জেরা করেন।

"এক্ষেত্রে মায়ের সাক্ষ্যই শেষ কথা।" বাবলী গম্ভীরভাবে বলে।

"দ্যাখ, চকোলেট, সবাই তোমার মতো সত্যবাদিনী নয়। মিথ্যাবাদিনীও আদালতে দেখেছি। সব চেয়ে ভালো হচ্ছে সম্পত্তি বলে কিছু না থাকা। উত্তরাধিকার বলে কিছু না রেখে যাওয়া। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়াতেও সম্পত্তি রেখে যাওয়া ও জন্মসূত্রে পাওয়া ফিরে আসছে। রাষ্ট্রের কাছে সব সন্তানই সমান, অবৈধ কেউ নয়। কিন্তু সমাজের চোখে কে কার সন্তান এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। সমাজটা যদি মাতৃতান্ত্রিক হতো তা হলে কেউ কেয়ার করত না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের দেশেও সমাজ এখনো পিতৃতান্ত্রিক। কমিউনিস্টরা যখন 'সমাজ', 'সমাজ' বলে চিৎকার করে তখন ওরা যা বলতে চায় তা 'রাষ্ট্র', 'রাষ্ট্র'। বিবাহের বেলা কড়াকড়ি গোড়ায় ছিল না। এখন একটু একটু করে ফিরে আসছে। এর জন্যে পুরুষদের দায়িত্বহীনতাও দায়ী। বাপ হবে, ছেলের দায়িত্ব নেবে না। সব দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র কাঁহাতক সহ্য করবে। ফরাসী বিপ্লবের দিনেও এই দায়িত্বহীনতা দেখা দিয়েছিল। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তখন প্যারিসে। যাঁর সঙ্গে বাস করেন তাঁর একটি কন্যা হয়। সেই কন্যাকে কবি তার মায়ের দেশে ফেলে যান। জীবনে কোনো দিন স্বীকৃতি দেননি। সম্প্রতি এই তথ্য আবিষ্কার করা গেছে। কবির মহিমা এতে খর্ব হয়নি, কিন্তু তিনি তো কেবল কবি নন, তিনি ঋষি।" স্বপনদা কটাক্ষ করেন।

বাবলী তো হাঁ। "বলো কী, স্বপনদা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ।"

"হ্যাঁ, বোন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিবসে তিনি বিপ্লবের মোহে মুগ্ধ ছিলেন। সেকথা স্মরণ করে লিখেছিলেন—

'Bliss it was in that dawn to be alive
And to be young was very heaven.'

বিপ্লব যখন সন্ত্রাসের রাজত্বে পরিণত হয় তখন আরো অনেকের মতো তাঁরও মোহভঙ্গ হয়। তিনিও কোতল হতেন, যদি না দেশে ফিরে যেতেন। ব্রিটেনও দিনে দিনে বিপ্লববিরোধী হয়ে ওঠে। নেপোলিয়নের আমলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ফ্রান্সবিরোধীও হয়। আদিপর্বের কথা গোপন রাখাই তো তখন নির্বিরোধী কবির আত্মরক্ষার পথ। তোমার মনে যা নিয়ে খটকা বাধছে তা এই বিবাহবহির্ভূত সন্তান। তখনকার

দিনে বিবাহমাত্রেই ছিল যাবজ্জীবন বিবাহ। বিপ্লবীদের পক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বিবাহবিচ্ছেদ আইনসম্মত হয় তার অনেক পরে। তুমি যদি পুরুষমানুষ হতে আর তোমার বান্ধবী ক্যারামেল যদি হতো তোমার ধর্মপত্নী তা হলে এই যুদ্ধের ইস্যুতেই তোমাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যেত। নয়তো তোমরা দু'জনেই জ্বলে পুড়ে মরতে। সন্তান থাকলে তার যে কী দশা হতো অনুমান করতে পারো।"

জুলি আমাকে কী বলে শাসিয়েছে, শুনবে?" বাবলী কাঁদো কাঁদো সুরে বলে, "ইংরেজদের সঙ্গে আমরা যদি এক জাহাজে যাত্রা না করি তবে দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনী বলে আমাদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে খাড়া করা হবে। এক রাশিয়া যদি স্বাধীন ভারতকে স্বীকৃতি দেয় তবে গুলী না করে আন্দামানে পাঠানো হবে।"

স্বপনদা সমবেদনা জানিয়ে বলেন, "ক্যারামেলটা একটা পাগলী। ওর কথা ধরতে নেই, বোন। স্বাধীন ভারতেও আইন আদালত উকীল ব্যারিস্টার থাকবে। আমরা তোমাকে নতুন সরকারের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনব। তবে ক্যারামেলকে ছাড়িয়ে আনবে কে জানিনে, স্বাধীনতার কিছুদিন বাদে যদি অক্টোবর রেভোলিউশন হয় আর তোমরাই ওর দলের সবাইকে ধরে ধরে ফায়ারিং স্কোয়াডে খতম করো বা অপরাধ লঘু হয়ে থাকলে দ্বীপান্তরে পাঠাও। তখন আমরাও বেকার। আদালতও ফাঁকা। তোমরা যেভাবে রাশিয়ার মাছিমারা নকল করে চলেছ তাতে শ্রমিক কৃষক ভিন্ন আর সকলের আতঙ্কের যথেষ্ট কারণ আছে। রাতারাতি ভোল পালটালেও ধনীরা কেউ প্রাণে বাঁচবে না, মধ্যবিত্তরাও মধ্যপদলোপী হবে। তুমি হয়তো তোমাদের এই দাদাটিকে বাঁচাতে চাইবে, কিন্তু আপনি বাঁচবে কি-না সন্দেহ। এক মাছের ভেড়ি থেকেই তোমাদের বছরে লাখ টাকা আয়।"

বাবলী অপ্রতিভ হয়ে বলে, "ওটা তোমার ভুল ধারণা। এদেশের কমিউনিস্টরা কখনো ওদেশের মাছিমারা নকল করবে না। এদের সবাই তো মধ্যবিত্ত। নিজেদের শ্রেণীটিকে লোপ করতে হাত উঠবে কেন? তবে, হ্যাঁ, প্রাইভেট প্রপার্টির উপর পাবলিকের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের মাছের ভেড়ি পাবলিক প্রপার্টি হতে পারে। তার বদলে আমরা যদি ক্ষতিপূরণ না পাই তবে খোরপোষ পেতে পারব। মধ্যবিত্তদের এমন দাপট থাকবে না তা ঠিক। কিন্তু এমন বেকারিও থাকবে না। সব ছেলের চাকরি জুটবে। সব মেয়ের বর জুটবে। নয়তো চাকরি। অকারণ নরহত্যা মহান স্টালিনও করেননি। করেছেন বিরোধীদের মূলোচ্ছেদ করতে। বাধ্য হলে এদেশের বড়কর্তাও তাই করবেন। তার জন্যে বিরোধীরাই দায়ী।"

স্বপনদা হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "স্টালিন দ্য গ্রেট। যেমন পিটার দ্য গ্রেট। ক্যাথারিন দ্য গ্রেট। আচ্ছা, ইংরেজরা কতদিন তোমাদের সহযোগিতা পাবে?"

"যুদ্ধ যতদিন শেষ না হয় ততদিন। তার আগে ওদের আমরা নড়াতে চাইনে।" বাবলীর সাফ জবাব।

"খুব ভালো কথা। কিন্তু লোকে যদি খেতে না পেয়ে দলে দলে মারা যায়, মেয়েরা যদি পরতে না পেয়ে দলে দলে বেআব্রু হয়ে ঘুরে বেড়ায় তার দায়িত্ব নেবে কারা? যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজার কুলীমজুরের দরকার হয়, সিপাহীর তো হয়ই। তাদের অনিচ্ছা থাকলে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভবপর। এর দায়িত্ব নেবে কারা? যুদ্ধের খরচ জোগানো কি কঠিন সমস্যা নয়? মুদ্রাস্ফীতি ছাড়া এ সমস্যার আর কী সমাধান আছে? টাকার কোনো দাম থাকবে না, তাই জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হবে। তার দায়িত্ব নেবে কারা? ইংরেজরা তো অপ্রিয় হবেই, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও। তুমিও কি আর সে-রকম সমাদর পাবে!" স্বপনদা ঘাড় নাড়েন।

"সব বুঝি, দাদা। আমিও ভেবে দেখেছি। কিন্তু রাশিয়া যদি হেরে যায় তবে বিপ্লবেরও সমাধি হবে। বিপ্লবী বলে আমি পরিচয় দেব কোন্ মুখে? আমি তো ভূতপূর্ব হয়ে যাব। রাশিয়ার হারজিৎ

আমার পক্ষেও জীবনমরণ সমস্যা। জুলির কথা আলাদা। সেও বিপ্লবী, কিন্তু কৃষক শ্রমিকের কেউ নয়। সেও জনগণের কথা আওড়ায়, কিন্তু জমিদারের বিরুদ্ধে মহাজনের বিরুদ্ধে লড়বে না। দ্রৌপদীর মতো সে বেণী বাঁধবে না, যতদিন না দুঃশাসনের নিধন হয়। কিন্তু তার পরে পাণ্ডবরা ভারতময় চোর পোষণ করবে। ও যদি জেলখানায় আরো চার পাঁচবছর কাটাতে চায় আমি বলবার কে? ওর থীসিসটাই ভুল। এ যুদ্ধে ইংরেজ হারতে পারে না। ইংরেজকে হারতে দেখলে আমেরিকা ছুটে আসবে। একদিকে রাশিয়া, আরেকদিকে আমেরিকা, এদের সঙ্গে লড়াই করে নাৎসীরা যে কেমন করে জিতবে তা আমার মাথায় আসে না। কিন্তু বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর। জুলির বিশ্বাস হিটলার জিতবেই। ব্রহ্মচর্যের জয় হবেই, নিরামিষ আহারের জয় হবেই, আর্যত্বের জয় হবেই। স্বস্তিকচিহ্নের জয় হবেই। স্টালিনের সঙ্গে দু'বছরের অনাক্রমণ চুক্তি ছিল বলে আমি জুলির সঙ্গে তর্ক করিনি। মুখ বুজে সহ্য করে গেছি। কিন্তু চুক্তির খেলাপ করে হিটলারের সৈন্য যখন সোভিয়েট পিতৃভূমি আক্রমণ করে তখন কি আর চুপ করে সব কথা মেনে নিতে পারি। ঘরে আগুন লাগলে এক বালতি জল নিয়ে যে ছুটে আসে সে যদি এককালে শত্রু হয়ে থাকে তবু আজ তো সে বন্ধু। চার্চিল অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা পছন্দ করেন না, কিন্তু আমরা কেন ধরে নেব যে যুদ্ধের পরেও চার্চিল থাকবেন? তখন যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি যদি ভারতের স্বাধীনতা মঞ্জুর না করেন আমরাই সকলের আগে মুক্তিযুদ্ধে নামব। শ্রমিক কৃষক একজোট হয়ে দিকে দিকে লাল ঝাণ্ডা তুলবে। সৈনিকরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লাল কেল্লা দখল করবে। কংগ্রেসকে দিয়ে আপস ছাড়া আর কিছু হবার নয়। গান্ধীর দৌড় তো দেখা গেছে। আর সুভাষ বোস তো হাওয়া। শুনছি উনি নাকি জার্মানীতে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করছেন। কিন্তু সেদেশে থেকে এদেশে আসবেন কোন্ পথে? রাশিয়া তো দুয়ার বন্ধ করেছে। স্বপনদা, জুলির জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত। ও বেচারী খামোখা জেলে পচছে। পারো তো তুমি ওকে জেল থেকে বার করে নিয়ে এস। বিচ্ছিন্ন হলেও আমি ওর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।" বাবলী একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

"আচ্ছা, বোন চকোলেট, আমি ওর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ওর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইব। তবে ওর যা জেদ! না একো রুপেয়া না একো জওয়ান। জেল থেকে বেরিয়ে ও যদি আবার ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে ওই ধুয়ো ধরে তা হলে ওকে ওরা এবার কোর্ট মার্শাল করবে। এবার আর বিনা বিচারে আটক নয়, সামরিক বিচারে ফাঁসী বা দ্বীপান্তর বা কারাবাস। যুদ্ধের সময় যে-কোনো গভর্নমেণ্ট নির্মম। ইংরেজরা দিন দিন কঠোর হচ্ছে।" হুঁশিয়ারি দেন স্বপনদা।

বাবলী এবার অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে। "আচ্ছা, স্বপনদা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কি খুব রাগ করবে? তোমার বিয়েতে মাদাম ভিয়ার্দো কিছু মনে করেননি?"

স্বপনদা গম্ভীর হয়ে যান। "দ্যাখ চকোলেট, আমি টুর্গেনিভ নই, তিনিও মাদাম ভিয়ার্দো নন। বিয়ের আগে বাঁশরিকে আমি চিঠি লিখে খবরটা দিয়েছিলুম বইকি। লিখেছিলুম পিতার অন্তিম ইচ্ছা, আমারও অনিচ্ছা নয়। এর উত্তরে বাঁশরি কী লেখেন শুনবে? তোমার মুখে একটি কথা শোনার জন্যে আমি বছরের পর বছর কান পেতে রয়েছি। সেই কথাটি না বলে তুমি বিদেশে চলে গেলে, ফিরলে চার বছর বাদে। বাঙালীর মেয়ের বিয়ের বয়স একবার পার হয়ে গেলে পরে তার পাত্র জোটে না। বাপ মা জোর করে বিয়ে দিয়ে দেন। লেখাপড়া তো তেমন শিখিনি যে চাকরি করব। শিখেছি ছবি আঁকতে। সেই সুবাদে দাদার সঙ্গে তোমাদের ফোর আর্টস ক্লাবে যাওয়া আসা করি। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়। তুমি আমার ছবি দেখতে আমাদেব বাড়ী আসতে শুরু করো। ওসব ছবির সমঝদার যত ছিল খরিদ্দার তত ছিল না। আমিও পেশাদার আর্টিস্ট হতে চাইনি। তোমাকে চিঠি লিখে জানাই যে আমার গুরুজন আমার বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, পাত্রও পেয়েছেন। পাকাপাকি এখনো হয়নি, এখনো সময় আছে। কিন্তু তার আগে তোমার ফিরে আসা চাই। তুমি লিখলে ব্যারিস্টার না হয়ে দেশে ফিরলে তোমার জীবন ব্যর্থ হবে। তা

তো ঠিকই। পুরুষমানুষের কাছে তার জীবিকাই পরম পুরুষার্থ। প্রেম তার তুলনায় গৌণ। আর নারীর কাছে প্রেমই মুখ্য, যদিও তার গুরুজন সেদিকে দৃক্‌পাত করেন না, ধরে বেঁধে বিয়ে দেন। তখন নারীর জীবন ব্যর্থ। বিদেশ থেকে ফিরে তুমিই আমাকে বলেছিলে যে তুমি আমার জীবন ব্যর্থ হতে দেবে না। আমাকে উদ্ধার করবে। ও বিয়ে বিয়েই নয়। সত্যি সত্যি তুমি অপেক্ষা করেছিলে। আমি কিন্তু সন্তানের জননী হয়ে আরো বেশী করে জড়িয়ে পড়ি। আমার ছবি আঁকার পাট উঠে যায়। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিই। তখন তুমি যদি বিয়ে করতে আমি আশ্চর্য হতুম না। আশ্চর্য হচ্ছি এই কথা ভেবে যে তুমি এতকাল যুদ্ধ করার পর অবশেষে প্রেমের যুদ্ধে হার মানলে। প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও। আমার কথা ভুলে গেলেই আমি সুখী হব।"

"তার পরে?" বাবলী আরো শুনতে চায়।

"তার পরে আর কী? আই অ্যাম আ ডিফিটেড ম্যান। আমি একজন পরাজিত পুরুষ। আমার অহঙ্কার ছিল যে আমি অপরাজিত। মহাত্মা যেমন বলেন অহিংসার অসাধ্য কিছু নেই আমিও তেমনি বলতুম প্রেমের অসাধ্য কিছু নেই। আমার প্রেমই একদিন শ্যামের বাঁশরির মতো আমার প্রিয়াকে টেনে নিয়ে আসবে। ওর বিবাহবিচ্ছেদ যদিও সহজ নয় তবু অসম্ভব নয়। কিন্তু সন্তানের মায়া ও কাটিয়ে আসবে কী করে? আমি হেরে গেছি। এমন এক সময় ছিল যখন এটা নিবারণ করতে পারা যেত। কিন্তু বিলেত না গিয়ে আমার স্বস্তি ছিল না, ইউরোপ না দেখে আমার শান্তি ছিল না, ব্যারিস্টার না হয়ে আমার মর্যাদা ছিল না। আমার জন্যে বাঁশরির জীবনটাও ব্যর্থ হলো। নিয়তি। ডেস্টিনি। এ ছাড়া তুমি আর কী ব্যাখ্যা দেবে? এখন এ ভাঙা জীবন জোড়া দিতে পারলে বাঁচি। দীপিকা যদি আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো হয়।" স্বপনদা আবেগের সঙ্গে বলেন।

এল্‌ফ হঠাৎ এক লাফে বাবলীর কোল থেকে নেমে এক ছুটে নিচের তলায় গিয়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দেয়। না, চোর নয়, ডাকাত নয়, বাড়ীর গৃহিণী। পেছনে বাড়ীর চাকর রামদীন। তার সঙ্গে বাজার থেকে কেনা লটবহর। এল্‌ফ তাঁর আগে আগে সিঁড়ি ওঠে। আজকাল দোতালাতেই স্বপনদারা থাকেন। যেখানে এতদিন থাকতেন অধ্যাপক গুপ্ত। অধুনা স্বর্গীয়।

॥ দুই ॥

স্বপনদার স্বভাবই হলো গড়িমসি করা। যেটা আজ করার কথা সেটা তিনি কাল করবেন। যেটা কাল করবার কথা সেটা পরশু। যেটা বিলেত যাবার আগে করার কথা সেটা করবেন বিলেত থেকে ফিরে। অমনি করেই বাঁশরি দেবীকে হারালেন। দীপিকা দেবীকেও হারাতেন, যদি না পরলোকের ডাক শুনে বাবা অন্তিম ইচ্ছা জানাতেন। আর বেশী দিন নেই সেটা ডাক্তারদেরও ধারণা।

তাঁর পাতানো বোনদের তিনি "আমার প্রিয় বোন" বলে ডাকতেন। বাবলী ও জুলির মতো তাঁর প্রিয় বোনদের সংখ্যা ছিল সাত কি আটজন। এঁদের কারো কাছে বিবাহের প্রস্তাব করা তাঁর পক্ষে অশোভন হতো। প্রস্তাব শুনে অপর জন যদি বলে, "ছি"! দীর্ঘদিনের পরিচয়ের ফলে একজনকে তিনি "আমার প্রিয়তম বোন" বলতেও শুরু করেছিলেন। ক্লাবের অধিবেশন পালা করে যাঁদের বাড়ীতে বসত তিনিও ছিলেন তাঁদের একজন। সেইসূত্রে গুরুজনদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় নিবিড় হয়েছিল। কারণে অকারণে দু'জনই দু'জনের বাড়ী গিয়ে ক্লাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা করতেন। কুকুরকে যদিও স্বপনদা যমের মতো ডরাতেন তবু দীপিকাদের বাড়ী গেলে এল্‌ফকে বিস্কুট দিয়ে ভোলাতেন।

ক্লাবের নিয়ম ছিল ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান ফের্তা না হলে কেউ সদস্য হতে পারতেন না। ওটা কেবল পূর্ব পশ্চিমের মিলনের সেতু নয়, নরনারীর মেলামেশারও সোপান। গত সাত আট

বছরের মধ্যে কয়েকটি শুভবিবাহের ঘটনাও ঘটেছে। দীপিকার গুরুজন আশা করেছিলেন যে সেরকম ঘটনা তাঁদের বাড়ীতেও ঘটবে। কন্যা ইতিহাসে অক্সফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু এমনি এদেশের সমাজ যে এর উপরেও পণ যৌতুক নিয়ে দরাদরি করে। গুরুজন নরম হলেও দীপিকা পাথরের মতো শক্ত। তাঁরও একটা পণ আছে। তাঁকে ভালোবাসলে তাঁর কুকুরকেও ভালোবাসতে হবে। তাঁর পণে তিনি অটল। তাই বছরের পর বছর যায়, সমবয়সিনীদের সকলেরই বিয়ে হয়ে যায়, ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েও দীপিকা অনূঢ়া। তখনকার দিনে অভাবনীয় ব্যাপার। হ্যাঁ, হিন্দু সমাজে।

বাবার জন্যে স্বপনদা কিছুই করেননি, ছেলের জন্যে বাবা সব কিছুই করেছেন। একথা মনে আসতেই মনটা হু হু করে ওঠে। দু'চোখ জলে ভরে যায়। বিয়ে যদি কোনোদিন করতেই হয় তবে আজ নয় কেন? কাল অবধি বাবা যদি না বাঁচেন! কিন্তু কাকে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন এমন সময় দীপিকার প্রবেশ। ক্লাবের মায়া যেন কাটতেই চায় না। সেই উপলক্ষে আগমন।

"আমার প্রিয়তম বোন দীপিকা", স্বপনদা না ভেবে চিন্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ফেলেন, "আমি যদি বোন কথাটা বাদ দিই, তুমি কি আমাকে ঘৃণা করবে?"

"এতদিন দাওনি কেন সেইটেই আমাকে ভাবায়। কিন্তু, জানো তো, আমি পাথর দিয়ে তৈরি। আমার একটা শর্ত আছে। লাভ মী, লাভ মাই ডগ।" দীপিকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"তা হলে চলো আমার সঙ্গে বাবার ঘরে। দু'জনে মিলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করব।" স্বপনদা বলেন।

"কিন্তু অমন করে আমার শর্তটা এড়িয়ে গেলে চলবে না। পরিষ্কার বলতে হবে আমার এল্‌ফকে তুমি ভালোবাসবে। আমার শোবার ঘরে সারা রাত ও ছাড়া থাকে। ও আমাকে পাহারা দেয়, আমিও ওকে পাহারা দিই।" দীপিকা বলেন।

স্বপনদার মনে পড়ে শতপথ ব্রাহ্মণের উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যান। ওটা দীপিকাকে শোনান। "তুমি কি পূর্বজন্মে উর্বশী ছিলে? আর এল্‌ফ ছিল তোমার ভেড়া? তা নইলে এমন উদ্‌ভট শর্ত কার মাথায় আসে? কিন্তু ওই একটি শর্তেই আমি রাজী। ওর বেশী না।"

"না, আমার আর-কোনো শর্ত নেই। আমি তোমার, তুমি আমার আর এল্‌ফ আমাদের।" দীপিকা সম্মতি দেন।

তখন থেকেই এ বাড়ীর এই রীতি। এল্‌ফ রাত্রে ছাড়া থাকে। আর কর্তাগিন্নীর শোবার ঘর ওরও শোবার ঘর। অন্যান্য ঘরেও ওর অবাধ প্রবেশ।

বৌদি ঘরে ঢুকতেই বাবলী তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাতে ফুলের তোড়া ধরিয়ে দেয় আর তাঁর গলায় পরিয়ে দেয় ফুলের মালা। তিনি চিনতে না পেরে স্বপনদার দিকে তাকান।

"অপরাজিতা সেন। ডাক নাম বাবলী। আমার প্রিয় বোন চকোলেট। সম্প্রতি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের বিয়ের খবর শুনে অভিনন্দন জানাতে ছুটে এসেছে। আমি ওকে থাকতে বলেছি, আমাদের পার্টিতে যোগ দেবে। মনে করো এইটেই বৌভাত।" স্বপনদা বলেন।

দীপিকা বাবলীর গালে বিলিতী কেতায় চুমু খেয়ে বলেন, "হাউ সুইট অভ ইউ! আমার প্রিয় ননদ। কিন্তু জেলে ধরে নিয়ে গেল কেন?" দীপিকা জিজ্ঞাসু।

"যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে।" বাবলীর জবাব।

"তা হলে ছেড়ে দিল কেন?" দীপিকা বুঝতে পারেন না।

"আমাদের থীসিসটা বদলে গেল বলে। এ যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়। এটা সোভিয়েট রাশিয়ার জনযুদ্ধ। অতএব আমাদেরও।" বাবলী বোঝায়।

"ও মা তাই নাকি!" দীপিকা কৌতুক বোধ করেন। "ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরামের দল জনযুদ্ধে নামবে। ইংরেজরা ছত্রভঙ্গ করবে না?"

"আহা! তা কেন করতে যাবে? ওরা তো ইংরেজের শত্রু নয়, মিত্র। ওদের যুদ্ধ হচ্ছে ওদের আর ইংরেজদের কমন এনিমির বিরুদ্ধে। বর্বর ফ্যাসিস্টদের বর্বর নেতা হিটলারের বিরুদ্ধে। সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্যে এই যুদ্ধ। এখানে ইংরেজরা আর আমরা এক শিবিরে।" বাবলী প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে।

"আচ্ছা, আমি যখন অক্‌সফোর্ডে পড়াশুনা করতুম সে-সময় ওখানকার বাঙালী ছাত্রদের মুখে শুনেছিলুম অপরাজিতা সেন বলে একটি কলেজের ছাত্রী হিজলী বন্দীশালার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার এক ক্লাবে ঢুকে এক সাহেবকে গুলী করে। সাহেব বেঁচে যান। মেয়েটির শাস্তি হয়। তবে ফাঁসী কি দ্বীপান্তর নয়। কী দুর্জয় সাহস। আর কী জ্বলন্ত দেশপ্রেম। কোথায় যে নিবে গেল মেয়েটি! কেউ আর ওর নাম করে না। তোমার নামের সঙ্গে ওর নামের মিল আছে, বাবলী।" দীপিকা বলেন।

"চরিত্রের সঙ্গেও মিল আছে।" স্বপনদা মন্তব্য করেন। আগুন। আগুন! আমার প্রিয় বোন চকোলেট আগুন দিয়ে তৈরি।"

"এত যদি মিল তবে তুমি কি সেই অপরাজিতা?" দীপিকা অবাক হন।

"হ্যাঁ, বৌদি, আমিই সেই।" বাবলী উত্তর দেয়। "ইংরেজদের উপর আমার রাগ পড়ে গেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার এই জীবনমরণ সংগ্রামে স্বাধীন ভারতেরই উচিত সর্বতোভাবে সাহায্য করা। তা যখন সে পারছে না তখন যে পারছে তার সঙ্গে সহযোগিতা করাই তো যুদ্ধজয়ের পূর্ব শর্ত। ওরা আমাকে অশেষ কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু অসম্মান কখনো করেনি। এবার তো রানীর হালে ছিলুম। যুদ্ধের পরে আবার ওদের সঙ্গে মোকাবিলা হবে। আপাতত যুদ্ধজয়ই একমাত্র লক্ষ্য; স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে।"

"রানীর হালে ছিলে বলছ, কিন্তু তোমার চেহারা দেখে তা মনে হয় না। তোমার কি অসুখ করেছিল?" বৌদি মমতার সঙ্গে সুধান।

"অসুখ নয়, বৌদি। অ-সুখ। আমার অন্তরে সুখ নেই। আমি অসুখী। আমার মতো অসুখী আর নেই।" বাবলী ভাবাবেগে ভেঙে পড়ে।

"কেন, ভাই বাবলী? কী তোমার দুঃখ?" বৌদি গলে যান।

"দুশমনরা চুক্তির খেলাপ করে অতর্কিতে রুশ পিতৃভূমি আক্রমণ করেছে, তা জানেন। মস্কো বিপন্ন, লেনিনগ্রাড বিপন্ন। আমরা কি আপাতত ওসব ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যাব? টাইমের বদলে স্পেস বিনিময় করব? টাইম পেলে তৈরি হয়ে পালটা আক্রমণ করব? স্পেস কেড়ে নেব? জনগণমন অধিনায়ক রুশভাগ্যবিধাতা মহামতি স্টালিন কী চিন্তা করছেন বলতে পারব না। কিন্তু মস্কো লেনিনগ্রাডের বাসিন্দাদের জন্যে আমরা দিবারাত্রি চিন্তিত। এ তো গেল আমাদের কমরেডদের সকলের মাথাব্যথা। এর উপর আমার নিজের বুকে ব্যথা। আমার বান্ধবী জুলির সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। মতামতের দিক থেকে আমরা এখন উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু। যুদ্ধের ফলাফলের জন্যে সবুর না করে ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াতেই হবে। এই হলো ওর মত। তা হলে ইংরেজ কেমন করে রাশিয়াকে মদত দেবে? কে জানে কেমন করে? তা হলে রাশিয়া যুদ্ধে জিতবে কী করে? কে জানে কী করে? আচ্ছা, দেশ যদি আজ এখনি স্বাধীন হয় সে কি রাশিয়াকে মদত দেবে? না, তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে রাশিয়া কবে কী করেছে যে ভারত ন্যায়ত বাধ্য? এখন এই অবোধ বালিকার সঙ্গে আমি কাঁহাতক তর্ক করব! আমি শুধু বলেছি যে, জুলি, যদি হিটলার আর স্টালিন এই দু'জনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হয় তুমি কাকে বেছে নেবে? ও বলে, হিটলারকে। আর তুমি? আমি বলি, স্টালিনকে। ব্যস্! এক কথায় তালাক। আমার মতো অসুখী আর কে?" বাবলী থামে।

"সত্যি আমি এত দুঃখিত!" বৌদি বলেন দরদের সঙ্গে।

"এই সব নয়, বৌদি।" বাবলী আরো বলে, "আমার বড়ো সাধ ছিল যে স্বপনদা হবেন বাংলার টুর্গেনিভ,আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল' লিখবেন আমাদের জন্যে ও আমাদের নিয়ে। অমর করে দেবেন আমাদের। ওঁকে তো আমি টুর্গেনিভদা বলে ডাকতে শুরু করেছিলুম। উনি আমাদের হতাশ করেছেন। উনি টুর্গেনিভ নন। উনি আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল' লিখবেন না। লিখবেন আর একখানা'ফাউস্ট'। জার্মান ক্লাসিকই এখন ওঁর আদর্শ। রুশ ক্লাসিক নয়। সহানুভূতিটা মনে হয় জার্মানদের প্রতি। ওই যে ফাউস্ট ও হিটলার ছাড়া আর কে? শয়তানের সঙ্গে কার অমন চুক্তি? ফাউস্টকে আখেরে জিতিয়ে দেওয়া মানে হিটলারকে আখেরে জিতিয়ে দেওয়া। স্বপনদা, তুমি আমাকে হতাশ করলে। আমার মাথাব্যথা আর বুকে ব্যথার উপর হাড়ে ব্যথা।" বাবলী নালিশ করে।

"আমার প্রিয় বোন চকোলেট, তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে।" স্বপনদা হতভম্ব হয়ে বলেন, "হিটলার তো বর্বর। আমি যার কথা লিখতে চাই সে সভ্য মানুষ। যে মানুষ ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে মানবপ্রগতির ধ্বজাবাহক। সে মানুষ যে একটার পর একটা মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে এটা কি সে সাম্রাজ্যবাদী বা সাম্যবাদী বলে? না আছে এর কোনো গভীরতর ব্যাখ্যা? যেমন ফাউস্টের মতো শয়তানের সঙ্গে চুক্তি? শয়তান মানে অশুভ শক্তি।"

"বাবলী, তুমি তোমার দাদাকে ভুল বুঝেছ। উনি জার্মানদের ভালোবাসলেও হিটলারকে ও তার দলবলকে নয়। হিটলারের জয় উনি কামনা করেন না," বৌদি বলেন।

"দাদা," বাবলী নরম হয়ে বলে, "তা হলে তুমি টলস্টয়ের মতো আর একখানা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' লেখ। তাতে রাশিয়ার জিৎ দেখানো হবে।"

"তা হলে তো আমাকে অবিলম্বে মস্কো যেতে হয়। ইংরেজ সরকার আমাকে পাশপোর্ট দেবে, না রুশ সরকার ভিসা দেবে? আমরা এদেশের লোক বহুকাল যুদ্ধবিগ্রহ দেখিনি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হলে এদেশের পটভূমিকাতেও অমন উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। এই বাল্যবিবাহের দেশে তুমি নায়িকা পাচ্ছ কোথায়? আগে তো সামাজিক পরিবর্তন হোক। কাল্পনিক চরিত্র দিয়ে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' হয় না। আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই, বোন। তুমি বলতে পারো, কেন? 'ফাউস্ট'? সেটাও কি আমার উচ্চাভিলাষ নয়? ওই নাম আমি ব্যবহার করব না। ও কাহিনীও না। আমি শুধু অনুসরণ করতে চাই থীম্‌টা; মানুষ সভ্য হতে গিয়ে তার আত্মাকে বিকিয়ে দিচ্ছে। পরিবর্তে যা পাচ্ছে তা পার্থিব উন্নতি। যত উচ্চে উঠুক না কেন, অসন্তোষ ওর কপালে লেখা। অশান্তি ওর নিত্য সহচর। ত্রাণ করতে পারে ওকে ঐশী করুণা। আর নারীর প্রেম। আমারও মৌল বিশ্বাস ওই দুটিতে। মানুষকে বাঁচানো মানুষের সাধ্য নয়। সে যদি বাঁচে তো বাঁচবে ঐশী করুণায়। তোমরা কমিউনিস্টরা তো ঈশ্বর মানবে না। আমিও কি মানতুম? আমি হিউমানিস্ট। কিন্তু পাশ্চাত্য মানবিকতার ভিতর থেকে এখন দানবিকতা বেরিয়ে এসেছে। আকাশ থেকে বোমা ফেলে এখন নির্বিচারে নারী শিশু বধ করছে। তার জন্যে এতটুকু বিবেকের দংশন নেই। এই আসন্ন প্রলয়ের দিন যদি আমি ঐশী করুণায় বিশ্বাস করি সেটা আমার প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়। আর নারীর প্রেম? এ জগতে তাব মতো আর কী আছে? আমরা পুরুষরা কি যোগ্য?" বলতে বলতে স্বপনদার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে আসে।

বাবলী স্তব্ধ হয়ে শোনে। "হ্যাঁ, লেখবার মতো থীম বটে। ঐশী করুণা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু নারীর প্রেমের বেলা আমরাও তোমার সঙ্গে একমত। তবে নারী ও পুরুষ এখন পরস্পরের কমরেড। আমাদের দলের ছেলেরা আমাকে 'দিদি' বলে ডাকে না। বুড়োরাও 'বোন' বলে ডাকেন না। সকলের কাছেই আমি 'কমরেড'। আমিও সবাইকে বলি 'কমরেড'। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে। নরনারীর বাছবিচার একটা বুর্জোয়া কুসংস্কার। তা বলে প্রেম একটা কুসংস্কার নয়। আমাদের পরিকল্পিত

সমাজেও প্রেম থাকবে।"

"বাঁচালে। অন্তত একটা জায়গায় তোমাদের সঙ্গে আমার মিল থাকবে। বুর্জোয়া বলে আমার লেখা অপাঙ্‌ক্তেয় হবে না।" স্বপনদা দীপিকার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে বাবলীর দিকে তাকান।

হঠাৎ এল্‌সা তেড়ে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেয়। কলিং বেল বাজবার আগেই টের পায় কারা যেন আসছেন।

"আরে এস, এস।" স্বপনদা দরজার সামনে গিয়ে সিঁড়ির সামনে দাঁড়ান। পার্টির অতিথিরা একে একে বা জোড়ে জোড়ে হাজির হন।

"ব্যাপার কী হে! আজকের এই পার্টি কেন? তোমাদের কারো জন্মদিন নয় তো। উপহার আনা হয়নি।" বলেন সুবিনয় তালুকদার।

"না, তেমন কোনো উপলক্ষ নেই। এমনি একটু আড্ডা দিতে খেয়াল হলো। ক্লাব উঠে গেছে। ভাব বিনিময় তো উঠে যায়নি। তোমরা যদি রাজী হও আমরা ক'জন মিলে ছোট একটা গ্রুপ গঠন করতে পারি। কালচারাল গ্রুপ। যুদ্ধবিগ্রহের দিনে কেবল যে মানুষ ধ্বংস হয় তা নয়, তার সৃষ্টিও ধ্বংস হয়। আমাদের কাজ হবে নতুন সৃষ্টির নক্‌শা তৈরি করা। যাতে শূন্যতা পূরণ হয়।" স্বপনদা নিবেদন করেন।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে সুবিনয় বলেন, "এই নিয়ে ক'বার হলো? সেই স্কুলজীবন থেকেই তুমি একটার পর একটা গ্রুপ গঠন করে আসছ। পারলে কি একটাকেও বাঁচিয়ে রাখতে? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একবার একটা বাণী দিয়েছিলেন। তাতে ছিল, বাঙালীর উৎসাহ খড়ের আগুনের মতো দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া দপ করিয়া নিভিয়া যায়। তখন মানতে চাইনি। এখন মানতে হচ্ছে। আড্ডা দিতে বাঙালীর জুড়ি নেই। আমরা আবার আড্ডা দেব। কিন্তু নতুন সৃষ্টির নক্‌শা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করা বৃথা। তার জন্যে চাই দৃষ্টি। দৃষ্টি আমাদের সীমিত। ইংরেজ এদেশে না এলে আরো সীমিত থাকত। ওরা চলে গেলে আমরা আমাদের পুরানো গণ্ডীতে ফিরে যাব। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোজগতে। ওরা লুটই করতে এসে থাকুক আর রাজত্বই করতে, ওরা নিয়ে এসেছিল আস্ত একটা যুগকে। যুগটাও যদি ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় তবে আমরা আবার পদাবলী আর মঙ্গলকাব্য আর পাঁচালী লিখব। নতুন সৃষ্টির নক্‌শা? তার রূপায়ণ করবে কারা? কাদের জন্যে? তোমার আমার দিন গেছে বলেই ধরে নাও। আমরা কেবল বাঙালী নই, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের ফসল। ফসল থেকে ফসিল। আমাদের সম্বন্ধে লেখা হবে, ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। এমনটি আগেও হয়নি, পরেও হবে না।"

"তার মানে," স্বপনদা টিপ্পনী কাটেন, "ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের অস্তিত্বও শেষ হয়ে এল। তার শূন্যতা পূরণ করবে মধ্যযুগের পুনরাবর্তন। কিন্তু আমি যা নিয়ে ভাবছি তা কেবল ভারতের ভবিষ্যৎ নয়, বিশ্বের ভবিষ্যৎ। মানবজাতির ভবিষ্যৎ। মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ। এই যুদ্ধ যে শূন্যতা রেখে যাবে সেই শূন্যতার পূরণ। আমরা ক'জন কি শুধু বাঙালী, শুধু ভারতীয়? আমরা কি মানুষ নই? এ সঙ্কট মানবিকতারও সঙ্কট। মুসলমানরা যেমন বলে, ইসলাম ইন ডেঞ্জার, তেমনি আমারও বলতে ইচ্ছা করে, হিউমানিজম ইন ডেঞ্জার। আমরা এমন কিছু হারাতে যাচ্ছি যা পাঁচশো বছর ধরে ইউরোপকে সৃষ্টিশীল রেখেছে, দেড়শো বছর ধরে ভারতকেও, বিশেষ করে বাংলাকেও। এই যুদ্ধ যদি আরো সংক্রামক হয়, যদি রাশিয়া থেকে এশিয়ায় ছড়ায়, যদি ইরান হয়ে ভারতেও ঢোকে তা হলে আমরাও হব যুদ্ধক্ষেত্রের সামিল। মহাযুদ্ধ হচ্ছে মহাসংক্রমণ। দেশ স্বাধীন হলেও যে যুদ্ধ এড়াতে পারত তা নয়। এটা কোনো একটি নেশনের একক সাধ্যের অতীত। কিন্তু এই মহামারীর পরে যারা বেঁচে থাকবে তারা মানুষ বলে পরিচয় দিলেও হিউমানিজমের মহিমা উপলব্ধি করবে না। এইসব চিন্তা করেই আমি আবার এক গ্রুপের পত্তনে উদ্যোগী হয়েছি।"

"ওদিকে আরো একটা গ্রুপের পত্তন হয়েছে।" ইন্দ্রজিৎ রাহা সংবাদ দেন। "মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট গ্রুপ। হিউমানিজমকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় তাঁকে র‍্যাডিকাল করা। কিন্তু আমাদের যা ঐতিহ্য তা লিবারল হিউমানিস্ট ঐতিহ্য। এর থেকে একচুল সরে গিয়ে যদি আমরা র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট হই তবে আরো একচুল সরে গিয়ে কমিউনিস্ট হিউমানিস্ট হব না কেন? তাই গোলে হরিবোল দেবার জন্যে রব উঠেছে সবাইকে হতে হবে অ্যান্টিফাসিস্ট। আরে, অ্যান্টিফাসিস্ট তো মোল্লা মৌলবী গুরু পুরোহিতরাও। যারা হিউমানিজমের ধার ধারে না তারাও। যারা বলে লিবারল হিউমানিজমের যুগ গেছে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা অ্যান্টিফাসিস্ট হতে রাজী নই। আমি বরাবর লিবারল হিউমানিস্ট ছিলুম এখনো তাই, পরেও তাই থাকব। যুগ যদি যায় যাবে। তাকে আটকে রাখার দায় আমার নয়। আমাদের গ্রুপেরও নয়। আচ্ছা, একটা ম্যানিফেস্টো বার করলে কেমন হয়? কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মতো লিবারল হিউমানিস্ট ম্যানিফেস্টো। না, না, হাসির কথা নয়। আমি সীরিয়াস।"

বাবলী এতক্ষণ উসখুস করছিল, এবার দীপিকা বৌদির কানে ফিস ফিস করে বলে, "মাফ কোরো, বৌদি, আমার একটু কাজ আছে। আরেকদিন আসব।"

"সে কী!" স্বপনদা টের পেয়ে বলেন, "তুমি উঠছ কেন? তোমাকে তো বলেছি আজ এটা তোমার খাতিরে আরেকবার বৌভাত। লুচি, পোলাও, মাছ, মাংস, চাটনি, মিষ্টি সব কিছুই পাবে। শুধু একটু ধৈর্য ধরতে হবে। সেইজন্যে কথাবার্তা চালু রাখা দরকার। তোমাকে তো কেউ লিবারল হিউমানিস্ট হতে বলছে না। তুমি কমিউনিস্ট হিউমানিস্ট, আমরা লিবারল হিউমানিস্ট। আধাআধি মিল তো আছে; অমিল যেটা সেটা আপাতত চাপা পড়ছে। তবে আমরা ওই অ্যান্টিফাসিস্ট ভেক ধারণ করতে নারাজ। আমাদের পক্ষে ওটা হবে ভণ্ডামির ভেক। ভাগনার (Wagner) আমার প্রিয় সঙ্গীতকার। আমার যখন খুশি তখন আমি ভাগনার বাজাব। ওদিকে জার্মানীতে বসে হিটলারও তাই করছেন। হিটলার ভাগনার ভালোবাসেন। ওঁর সঙ্গে আমার এইখানে একটা মিল রয়েছে। গুপ্তচরের ভয়ে আমি এটা গোপন করতে পারব না। আরো জোরে 'সিগফ্রিড' বাজাব। যে সঙ্গীত দেশোত্তর ও কালোত্তর তাকে ফাসিস্ট বলে চিহ্নিত করা মূর্খতা। আমি সেই মূর্খতার পায়ে আত্মসমর্পণ করব না। আমি জানতে চাই ক'জন অ্যান্টিফাসিস্টের এ সাহস আছে।"

এটা যেন বাবলীর প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। বেচারি একলা পড়ে গেছে, ওর নিজের দলবল এখানে নেই। মস্কো বিপন্ন, লেনিনগ্রাড বিপন্ন, ঠিক এই মুহূর্তে যদি কেউ 'সিগফ্রিড' বাজায় তাতে জার্মান পক্ষের মনের জোর বাড়ে, রুশ পক্ষের মনের জোর কমে। সঙ্গীতের উপরে হার জিৎ নির্ভর করে বইকি। বাবলী বলে, "স্বপনদা, তুমি কি কখনো চাইকোভস্কির 'নাটক্র্যাকার' বাজাও না?"

"বাজাই বইকি। রিমস্কি-কোরসাকোভও আমার প্রিয়।" স্বপনদা উত্তর দেন।

"তা হলে আমি শুনতে আসব, যেদিন বার্লিন বিপন্ন হবে সেদিন। ওঁরা কেউ কমিউনিস্ট ছিলেন না। ওঁদের সঙ্গীতও দেশোত্তর ও কালোত্তর। তা হলে তো কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। সেদিন ধরা পড়বে তোমার নিজের সেন্টিমেন্ট কোন্ দিকে। তবে আমার মিনতি শোন। বুক ফুলিয়ে ভাগনার বাজাতে যেয়ো না। ওতে আমাদের শত্রুপক্ষের উল্লাস বাড়বে। আমাদের মিত্রপক্ষের বিষাদ গাঢ় হবে।" বাবলীর কণ্ঠস্বর কাঁপে।

"সঙ্গীতের কী অসামান্য প্রভাব!" অনীতা তালুকদার বলেন। "আমাদের দেশেই আমরা দেখেছি 'বন্দে মাতরম্' কেমন করে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সংগ্রামের বল জোগায়। আচ্ছা, মিস সেন, 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে আপনাদের কী মত? ওটা কি অ্যান্টিফাসিস্ট সম্মেলনে গান করতে পারা যাবে?"

"ওতে মুসলমান কমরেডদের আপত্তি আছে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' ওরা আমাদের

সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে পারে না। সেটাও আরেক রকম ভণ্ডামি। ওর বদলে 'জনগনমন'র প্রস্তাব উঠেছে। 'ভারতভাগ্যবিধাতা' কে? কেউ বলে ব্রিটিশ রাজরাজেশ্বর, কেউ বলে ঈশ্বর। আমরা কমিউনিস্টরা ঈশ্বরবিশ্বাসী নই। তাই আমাদের আপত্তি ঈশ্বরে। আর জুলিদের আপত্তি ব্রিটিশ রাজরাজেশ্বরে। তৃতীয় কোনো সঙ্গীত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 'ইন্টারন্যাশনাল' আজকাল রাশিয়াতেও অচল। ওরা নাকি নতুন একটা সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে, যেটা ওদের দেশোপযোগী। ওদের এখন দেশভক্তির জোয়ার এসেছে। দেশ বাঁচলে তো ধর্ম বাঁচবে। ধর্ম বলতে ওদেশে কমিউনিজম বোঝায়। 'পিতৃভূমি'র জন্যে ওরা প্রাণ দিচ্ছে। ওদেশেও তো কতক লোক আছে যারা কমিউনিস্ট নয়। ওরাও সমানে প্রাণ দিচ্ছে। মতবাদের দিক থেকে যে যাই হোক না কেন, দেশরক্ষার বেলা সবাই ওরা পেট্রিয়ট। পেট্রিয়টিক সঙ্গীতই ওরা আজকাল বাজায়।'' বাবলী বিশদ করে।

''আমরা ভারতীয়রাও তো পেট্রিয়ট। আমাদের মাতৃভূমি বিপন্ন হলে আমরা কী বাজাব? এমন কোন্ সঙ্গীত আছে যাতে মুসলমানদের আপত্তি হবে না, কমিউনিস্টদের আপত্তি হবে না? অ্যান্টিফাসিস্ট বলে যাঁরা সম্মিলিত হচ্ছেন তাঁদের পায়ের তলায় কোন্ দেশের মাটি? কথাটার মধ্যে দেশের তো নামগন্ধ নেই। মতবাদেরও কি আছে? অ্যান্টিফাসিস্ট বললে কেবল যে কমিউনিস্ট বোঝায় তা নয়, লীগপন্থী মুসলমান, মহাসভাপন্থী হিন্দুও বোঝায়। অমন এক জগাখিচুড়ির জন্যে জান দেবে ক'জন। দেশ যদি বিপন্ন হয়।'' জিজ্ঞাসা করেন আদিত্য বর্মণ।

বাবলী উত্তর দিতে গিয়ে হিমশিম খায়। দীপিকা বৌদি তার দশা দেখে মুখ খোলেন। ''এ বেচারি সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। এর কাছে জবাবদিহি প্রত্যাশা করা অন্যায়। তা ছাড়া জবাবদিহির দায়টা তো কেবল কমিউনিস্টদের নয়। ন্যাশনালিস্টরাও কি হিটলারবিরোধী মুসোলিনিবিরোধী তোজোবিরোধী নন? তাঁদেরও জবাবদিহি করতে হবে। টার্কি যদি জার্মান শিবিরে যোগ দেয় তবে হিটলারের ফৌজ অনায়াসে ইরানে ঢুকবে, ইরান পেরিয়ে বেলুচীস্থানে। মুসলমানদের মতিগতি কোন্ দিকে তা তো এখন থেকেই আঁচতে পারা যাচ্ছে। ওরা চায় পাকিস্তান। হিটলারবাহিনী যেদিন বেলুচীস্থানে ঢুকবে সেদিন সেখানে পাকিস্তানের নিশান উড়বে।''

অতিথিরা সকলেই দমে যান। টুঁ শব্দটি করেন না। খবর আসে, খাবার তৈরি। আজ দেশী মতেই রান্না। সাহেবী মতে নয়।

বাবলী না থাকলে মহিলার সংখ্যা কম পড়ত। জোড় মিলত না। ও মেয়েকে বসিয়ে দেওয়া হয় ওরই মতো অবিবাহিত একজন পুরুষমানুষের পাশে। ওই আদিত্য বর্মণ। স্বপনদার অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চান। কালচারাল গ্রুপ গঠন করতে উৎসাহী। বাবলীকেও সঙ্গে পেলে সুখী।

''নো কমিটমেন্ট। আপনার দিক থেকেও না। আমাদের দিক থেকেও না। আপনাকে আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করতে বলব না। আপনিও আমাদের স্বধর্ম ত্যাগ করতে বলবেন না। আমরা কেউ ফাসিস্ট নই। তা বলে অ্যান্টিফাসিস্ট বলে নাম জাহির করতেও চাইনে। ওর মধ্যে একটা রাজনৈতিক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। যাঁরা অ্যান্টিফাসিস্ট বলে পরিচয় দিচ্ছেন তাঁরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কমিটেড। আমরা কমিটেড নই। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে কেন আমরা আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছে অপ্রিয় হতে যাই? ওঁদের অনেকেই এখন জেলে। ওঁরা কী মনে করবেন, আমরা যদি রাশিয়ার স্বার্থে ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলাই! ভারতের স্বার্থ বলতে কি স্বতন্ত্র কিছু নেই?'' বর্মণ সুধান।

''ভারতের স্বার্থ বলতে যদি বোঝায় ভারতের কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ, যারা শতকরা আশিজন, তা হলে ভারতের স্বার্থ এ যুদ্ধে কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্বরক্ষা। এ লড়াই ভারতের কৃষক শ্রমিকদেরও লড়াই। তাই এর নাম জনযুদ্ধ। ইংরেজরা এর শরিক বলে মহাভারত

অশুদ্ধ হয় না। ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও আমাদের জাত যায় না। ওদের সঙ্গে আমাদের পাণ্ডব কৌরব সম্পর্ক। আপৎকালে পাণ্ডব ও কৌরব মিলে একশো পাঁচ ভাই। আমার প্রাণের বন্ধু মঞ্জুলিকাকে আমি কিছুতেই এ তত্ত্ব বোঝাতে পারিনি। ও বেচারি জেলে পড়ে আছে। কী করা যায়, বলুন। শতকরা আশিজনের স্বার্থটাই তো বড়ো। সোভিয়েট রাশিয়ার বিপদে ওদেরও বিপদ। দেশ মানে কি খালি দেশের মাটি? না দেশের অধিকাংশ মানুষ?" বাবলীর পালটা প্রশ্ন।

বাবলীর ডানদিকে বসেছিলেন সুবিনয় তালুকদার। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দেন। "এমনও তো হতে পারে যে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থবিরোধী। তেমন ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজিপতির হাত থেকে পরিত্রাণই কি সর্বপ্রথমে প্রার্থনীয় নয়? এটা কি স্পষ্ট নয় যে ইংরেজরা ইংলণ্ডের বাইরে লড়ছে ভারতীয় জওয়ানদের কাঁধে চড়ে? গতবারের যুদ্ধে তেরো লাখ জওয়ান ওদের কাঁধে চড়িয়ে লড়েছিল। ক্যাজুয়ালটি এক লাখের উপর। কী লাভ হলো তাদের জাতভাইদের? তাদের শ্রেণীভাইদের? কী করে আমরা জানব যে এবারকার যুদ্ধের পর ইংরেজ আবার আমাদের ভাঁওতা দেবে না? একনম্বর ভাঁওতাবাজ ওই চার্চিল মহাপ্রভু! ওঁর নীতি হচ্ছে কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। ওঁর অনিচ্ছুক মুষ্টি থেকে স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হবেই যুদ্ধের পরে। যদি ওঁর দেশ জয়ী হয়। তা হলে যুদ্ধের মাঝখানে কেন নয়? এটাই হলো ভারতের পেট্রিয়টদের যুক্তি। রাশিয়ার পেট্রিয়টদের যুক্তির সঙ্গে এর অমিল কোথায়? রাশিয়ানরাও এখন পেট্রিয়ট হিসাবেই লড়ছে। ভারতীয়রাও পেট্রিয়ট হিসাবে লড়তে রাজী। যদি ইংরেজরা তাদের কাঁধ থেকে নামে। কংগ্রেস যদি স্বাধীন হয়ে সমান হয়ে লড়তে পারে তবে রাশিয়ার পক্ষেই লড়বে, মিস সেন।"

"দেশ যদি আজ এখনি স্বাধীন হয় আমিই সব চেয়ে সুখী হব, দাদা। কিন্তু এর জন্যে আমি ইংরেজকে জেরবার করতে পারব না। জেরবার হলে সে কেমন করে সোভিয়েটের শত্রুর সঙ্গে লড়বে? একবছর আগে আমরাও তো যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপে যোগ দিয়েছি ও জেলে গেছি। তখন ইংরেজ আমাদের শত্রু ছিল। এখন সে মিত্র। অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবস্থার পরিবর্তন।" বাবলী কৈফিয়ৎ দেয়।

স্বপনদা বিরক্ত হয়ে বলেন, "এরই নাম কালচারাল গ্রুপ! প্রাথমিক অধিবেশনেই রাজনীতি! চকোলেট, তুমি খাবারে মন দাও।"

"উনি নিজেই তো একটি খাবার!" রসিকতা করেন অদিতি বাহু। "অমন রসনারোচন নাম রাখল কে?"

"ওটা আমারই কীর্তি।" জবাব দেন স্বপনদা। "ওরা দুই বান্ধবী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বাবলী আর জুলি। আমার চোখে ওরা দুই বিপ্লবী নায়িকা নয়, দুটি নিরীহ নাবালিকা। আমি ওদের একজনকে খেতে দিই চকোলেট, আরেকজনকে ক্যারামেল। সেই থেকে ওদের ডাকনাম দাঁড়িয়ে যায় মিস চকোলেট আর মিস ক্যারামেল। ফী বার অবশ্য চকোলেট আর ক্যারামেল জোগাতে পারিনে। তবে ওরা যখনি আসে তখনি কিছু না কিছু খেতে পায়। দুঃখের বিষয় ক্যারামেলকে আর দেখতে পাচ্ছিনে। সে এখন জেলে বসে লপসী খাচ্ছে।"

"না, দাদা।" বাবলী শুধরে দেয়। "দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। ওখানে ওর যা দাপট ওয়ার্ডাররাই মেমসাহেব বলে সেলাম ঠুকছে। ওদের মনে ত্রাস জন্মেছে, প্রাণহানির নয়, চাকরিহানির। জুলি ওদের এই বলে শাসিয়েছে যে দেশ তো স্বাধীন হবেই,তখন সে যার যার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে তার তার চাকরি যাবে। ওর হাতে নোটবই দেখলেই ওরা ত্রাহি ত্রাহি করে। লপসী খাবে কে? জুলি? পরিজ ছাড়া ওর ব্রেকফাস্ট হয় না। কোয়েকার ওটস। আমেরিকায় তৈরি।"

"এই তোমাদের স্বদেশিয়ানা!" স্বপনদার মুখে হাসি। "অবশ্য আমরাও তাই দিয়ে ব্রেকফাস্ট করি। লোকে বলে সেটা সাহেবিয়ানা।"

"এখন তো ইংরেজ তোমাদের মিত্র। তোমরাও দেশের ঘরে ঘরে সাহেবিয়ানা চালাও।" পরামর্শ দেন বৌদি।

"শুধু সাহেবিয়ানা কেন? রুশিয়ানা।" জুড়ে দেন অদিতি রাহা। "ভাই, তুমি আমাকে একটা সামোভার কিনে দেবে?"

।। তিন ।।

সামোভার যে কী বস্তু আর কোথায় কিনতে পাওয়া যায় এ বিষয়ে বাবলীর বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। মেয়েটি ঠাট্টাও বোঝে না। ভাবনায় পড়ে যায়।

"চায়ের কেটলী হচ্ছে বিদেশিয়ানা। ওকে বর্জন করতেই হবে। কিন্তু সামোভার তো স্বদেশিয়ানা নয়। আচ্ছা, চা জিনিসটাও তো বিদেশী। দেশ স্বাধীন হলে চা কফি সিগারেট থাকবে, না ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে? তোমরা কি হুঁকো ফিরিয়ে আনবে? সিদ্ধি খাবে?" কৌতুকের সঙ্গে সুধান বর্মণ।

"আমাদের এটা একটা আন্তর্জাতিক গ্রুপ। এখানে চা কফি সিগারেটও চলবে, কেটলীর মতো সামোভারও চলতে পারে। হুঁকো আর সিদ্ধি কিন্তু অচল, কারণ অনাধুনিক। আমরা রিভাইভালিস্ট নই।" স্বপনদা বিধান দেন।

"সামোভার চলুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দোহাই আপনার, মিস সেন, কমিউনিজমের নামে আপনারা রাশিয়ানিজম ডেকে আনবেন না।" হাত জোড় করেন তালুকদার। "আজকাল কেউ কেউ বলতে ও লিখতে শুরু করেছেন সোভিয়েট রাশিয়া নাকি তাঁদের পিতৃভূমি। বিদেশ যদি কারো কাছে স্বদেশ হয় তবে স্বদেশও তাঁর কাছে বিদেশ। এঁরা কি তবে বিদেশী? অধ্যাপক চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

"চ্যাটার্জি?" বর্মণ বলেন, "তাঁর পিতৃভূমি যদি সোভিয়েট রাশিয়া হয় তবে তো তিনি চ্যাটারস্কি। আর তাঁর কমরেডরা ঘোস্কি, বোস্কি, মুখারস্কি, ব্যানারস্কি।"

"এ প্রসঙ্গে স্বপনমোহন তপনোভিচ গুপ্তোভ কী বলেন?" রাহা বানিয়ে বানিয়ে প্রশ্ন করেন। "আর দীপিকা নরেশোভ্না গুপোভা?"

হাসির ধুম পড়ে যায়। এ এক মজার খেলা। স্বপনদা প্রতিবাদ করেন। "সে কী কথা! আমরা যে ভারতের প্রাচীনতম রাজবংশ। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আমাদের পূর্বপুরুষ। তবে কালক্রমে আমরা বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করেছি।" স্বপনদার নিবেদন।

"ধন্বন্তরি গোত্রটাও কি কালক্রমে বর্তেছে?" রহস্য করেন রাহা।

"আর এই যে বাবলী দেখছ এঁদের বংশ আরো প্রাচীন। কংসের পিতা উগ্রসেন এঁদের পূর্বপুরুষ। কালক্রমে এঁরাও বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন।" স্বপনদার বক্তব্য।

"না, দাদা, আমরা বৈদ্য নই, কায়স্থ।" বাবলী সংশোধন করে।

"এখন কথা হচ্ছে," রাহা বলেন, "রুশিয়ানা চলতি হলে চ্যাটার্জি যদি হয় চ্যাটারস্কি, গুপ্ত যদি হয় গুপ্তোভ, সেন হবে কী? সেনিন?"

"তা হলে দাঁড়াবে অপরাজিতা শিবশঙ্করোভ না সেনিনা।" বর্মণের উক্তি।

বাবলী বিব্রত হয়ে বলে, "আমি বাঙালীই থাকব। কমিউনিজম্ আর রাশিয়ানিজম এক জিনিস নয়।"

"এই কথাটাই আপনার মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নিতে চেয়েছি আমরা। কিছু মনে করবেন না, বোন।" তালুকদার বলেন, "এদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ রকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। ইসলাম ধর্মে

দীক্ষা নিয়ে যাঁরা মুসলমান হলেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আরবী নাম নিয়ে হজরত মোহাম্মদের স্বজাতি বনে গেলেন। আরব দেশই হলো তাঁদের স্বদেশ আর ভারত তাঁদের বিদেশ। তাঁরা এখন নিজ বাসভূমে পরবাসী। তাঁদের জন্যে চাই পাকিস্তান। আরবরা তাঁদের স্থান দেবে না। তেমনি কমিউনিজমে দীক্ষা নিয়ে আপনারাও যদি সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান কালচার গ্রহণ করেন তবে হয়তো একদিন আপনাদের জন্যেও একটা আলাদা হোমল্যাণ্ড দাবী করবেন। মক্কা আর মদিনার মতো আপনাদের পবিত্র তীর্থ তো মস্কো আর লেনিনগ্রাড। মস্কো আর লেনিনগ্রাড বিপন্ন বলে আপনারা তেমনি মর্মাহত হয়েছেন যেমন উতলা হয়েছিলেন মক্কা আর মদিনা খলিফার শাসনে থাকবে না শুনে ভারতের মুসলমানরা। তাদের সেই যে খেলাফৎ আন্দোলন তাতে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে আমরাও জড়িয়ে পড়েছিলুম। পড়াশুনা ছেড়ে জেলে গেছলুম। এবারেও আপনাদের বিপদে আমাদের সহানুভূতি আছে, তবে জেলে যেতে আপনারাও বলছেন না, আমরাও রাজি নই। এক জীবনে দু'বার একই ভুল হয় না। আমরা কেউ বা ন্যাশনালিস্ট, কেউ বা র‍্যাশনালিস্ট, কেউ বা সোশিয়ালিস্ট। কিন্তু কেউই বিদেশকে স্বদেশ আর স্বদেশকে বিদেশ বলে ভ্রম করিনে।"

বাবলী বেচারি কোণঠাসা হয়ে বৌদির দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকায়। তিনি তার পক্ষ নিয়ে বলেন, "ওটা কিন্তু ঠিক হলো না, সুবিনয়দা। খেলাফৎ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে আপনাদের জেল হয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল স্বরাজ আন্দোলন। মুসলমানরা বিনা শর্তে স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিত না। হিন্দুরা বিনা শর্তে খেলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিত না। দুই নৌকায় পা রেখে যাত্রা করলে যা হয়। পা ফসকে যে যেদিকে পারে ভেসে যায়। মুসলমানরা ভাসতে ভাসতে এখন পাকিস্তানে কূল খুঁজছে। হিন্দুরা স্বাধীন ভারতের জন্যে সত্যাগ্রহে নেমেছে। অবশ্য হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানও আছে। কমিউনিস্টরাও থাকত, যদি না রাশিয়ার বিপদে ইংরেজরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। কে যে আজকের দিনে ভুল করছে আর কে যে ঠিক করছে তা বলবার সময় আসেনি। রাশিয়া যদি জার্মানদের রুখতে না পারে তবে ওরা কি টার্কি ও ইরান ভেদ করে ভারতের ঘাড়ে এসে পড়বে না, সুবিনয়দা? মস্কো আর লেনিনগ্রাডের জন্যে সহানুভূতি অহেতুক নয়। ওতে আমাদের স্বার্থ আছে। তা বলে আমরা রাশিয়ান বনে যাব না। বাবলীও খাঁটি বাঙালীই আছে ও থাকবে। তবে সামোভার একটা আমিও কিনবই। আমাদের এটা একটা আন্তর্জাতিক গ্রুপ। কেটলী আর সামোভার উভয়ের স্থান আছে।"

"আমার বক্তব্য হলো, ইসলাম গ্রহণ করলে আরব্য কালচার গ্রহণ করতে হবে, খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে ইউরোপীয় কালচার গ্রহণ করতে হবে, কমিউনিজম গ্রহণ করলে রুশ কালচার গ্রহণ করতে হবে এটা একটা ভ্রান্তি। মাইকেল মধুসূদন এর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। নইলে 'মেঘনাদবধ' হতো না। বাংলার কমিউনিস্টদের একথা মনে রাখতে হবে। রুশ সাহিত্য আমার কাছে ইংরেজীর মতোই প্রিয়। টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, চেকভ, গোর্কি এঁরা আমার আপনজন। রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতি আমার পক্ষে সহজাত। তা বলে রাশিয়াকে আমি পিতৃভূমি বলে ওর জন্যে লড়তে যাব না। যদি না রুশরাও আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে লড়ে।" তালুকদার সুস্পষ্ট করেন।

বাবলী যে অস্বস্তি বোধ করছে এটা আঁচতে পেরে স্বপনদা বলেন, "তুমি রজ্জুতে সর্পভ্রম করছ, সুবিনয়। আমার এই প্রিয় বোনটিকে আমি চকোলেট বলে ডাকি, তাই বলে বোনটি কি ইংরেজ বনে গেছে? এ কখনো রাশিয়ান বনে যাবে না, তুমি দেখো। তবে রাশিয়ার দুর্দিনে তার প্রতি সহানুভূতি না জানিয়ে পারে না। আমিও সহানুভবী। রাশিয়া তো জার্মানী আক্রমণ করেনি। জার্মানী কেন রাশিয়া আক্রমণ করতে যায়? তবে মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আছে এর তাৎপর্য। মহাযুদ্ধ হচ্ছে একপ্রকার মহামারী। ছড়িয়ে পড়াই তার স্বভাব। মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে রাশিয়াই যে আফগানিস্থান ভেদ করে ভারতে এসে হাজির হবে না তাই বা কে বলতে পারে? রিবেনট্রপের সঙ্গে মলোটভের কোলাকুলি দুটো

বছরও টিকল না। চার্চিলের সঙ্গে স্ট্যালিনের কোলাকুলি সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। চকোলেটকে সাবধান থাকতে বলি। কালকের শত্রু আজকের মিত্র। আজকের মিত্র কালকের শত্রু। আবার কখন জেলে ধরে নিয়ে যায় কে জানে!"

এর থেকে ওঠে জুলির প্রসঙ্গ। জুলি এখনো জেলে। বিনা বিচারে আটক। ওর জন্যে কী করা যায় সে এক সমস্যা। বিচার দাবী করলে বিচারে দণ্ড হবেই। ক্ষমা ভিক্ষা করলে জুলি নিজেই মারতে আসবে। এক যদি কর্তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুক্তি দেন। কেনই বা দেবেন, যদি মুক্তি পেয়ে ও মেয়ে আবার যুদ্ধবিরোধিতা করে? ও কি মুচলেকা দিতে রাজী আছে আর অমন কর্ম করবে না? ওর হয়ে ওর মাও কি রাজী আছেন? মুশকিল হচ্ছে ওর মা ওর গার্জেন নন। ওর নিজস্ব আয় আছে। শ্বশুরবাড়ী থেকে মাসোহারা আসে। বিধবার জীবনস্বত্ব।

"চকোলেট আর ক্যারামেল দুই আমার কাছে সমান মিষ্টি। কে কমিউনিস্ট, কে ন্যাশনালিস্ট সেটা আমার গণনা নয়। আমি তো লঘুচেতা নই। আমার বসুধৈব কুটুম্বকম্। চকোলেটের জন্যে আমার দুর্ভাবনা গেছে, ক্যারামেলের জন্যে আছে। ও যদি ছাড়া পায় তবে আরো একদিন ওর খাতিরে বৌভাত হবে। কী বলো, বৌ?" স্বপনদা সুধান। তিনি সত্যিই চিন্তিত।

"বেশ তো। আমি খুশি হব।" বধূর উত্তর।

"আমি কিন্তু ওর সঙ্গে সম্মুখ সমরে নারাজ।" বাবলী সন্ত্রস্ত স্বরে বলে। "দেশদ্রোহী বলে ও আমাকে সকলের সামনে অপমান করবে। আমি যে গায়ে পেতে নেব তা নয়। দেশ কি শুধু বুর্জোয়াদের দেশ? শতকরা আশিজন শ্রমিক কৃষকের দেশ নয়? ওদের স্বার্থেই আমি লড়ছি, এখনো লড়ছি। আজকের লড়াইটা রাশিয়ান ফ্রন্টে। আমার হয়ে আমার রুশ কমরেডরা লড়ছে।"

দুই রণরঙ্গিণীর দ্বন্দ্ব দেখতে কারো উৎসাহ ছিল না। এটা একটা কালচারাল গ্রুপ। রাজনীতির আখড়া নয়। স্বপনদা খেদ প্রকাশ করেন।

"কী দুর্ভাগ্য আমাদের!" তালুকদার বলেন, "একদিকে কংগ্রেস লীগ বিরোধ। তার মানে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ। আরেকদিকে কংগ্রেস কমিউনিস্ট বিরোধ। তার মানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ। ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে রাজত্ব সঁপে দিয়ে যায় তবে নতুন সরকারকে একহাতে মুসলমানদের দমন করতে হবে, আরেক হাতে কৃষক শ্রমিকদের। যদি না তারা দেশের স্বার্থকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের তথা শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়।"

"দুরাশা! দুরাশা! দুটোই দুরাশা!" রাহা হাহাকার করেন।

"কংগ্রেস সরকার দু'দিন বাদে পদত্যাগ করবে। কংগ্রেস নেতারা তিনদিন বাদে জেলে ফিরে যাবেন। দেশ শাসন করবে কে? যে শাসন করতে পারবে সে। আমি যতদূর দেখতে পারছি ওই ইংরেজ।" বর্মণ বলেন।

"ওরাও আমাদের ছাড়বে না, আমরাও ওদের ছাড়ব না। অথচ ঝগড়াও করব। এটাও এক প্রকার দাম্পত্য কলহ।" তালুকদার পরিহাস করেন।

"সেই সঙ্গে দুয়ো সুয়োর কোন্দল।" বর্মণ হাসি চাপেন।

"চিরন্তন ত্রিভুজ। ইংরেজ থাকতে এ কোন্দল মিটবে না। এ কোন্দল না মিটলে ইংরেজ যাবে না। নিয়তি। আমাদের নিয়তি। ভাবাতেই পারা যায় না যে ইংরেজ নেই, হিন্দু মুসলমান শান্তিতে আছে।" স্বপনদার বদ্ধমূল ধারণা।

বাবলী তা শুনে সবাক হয়। "এর একমাত্র প্রতিকার ডিকটেটরশিপ অভ দ্য প্রোলিটারিয়াট। তখন কে হিন্দু কে মুসলমান! সবাই একবাট্টা। এখন যেটা দেখছি সেটা একদল বুর্জোয়ার সঙ্গে আরেকদল বুর্জোয়ার বিবাদ। দু'পক্ষই জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। জনগণকে কাঁঠালের একটি কোয়াও

খেতে দিচ্ছে না।"

চমকে ওঠার মতো ব্যাপার নয়। কমিউনিস্টরা তো ওকথা হামেশাই বলে থাকে। তবু অপ্রত্যাশিত বলে সকলেই সকলের মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন।

"কিন্তু, চকোলেট, তোমার যুক্তির সঙ্গে তোমার কর্মের সামঞ্জস্য কোথায়? চার্চিলের চেয়ে বড়ো কাঁঠালখোর কে? তাঁর মতো আরেক কাঁঠালখোরের সঙ্গে সংগ্রামে প্রলিটারিয়ানদের ডিকটেটর নিচ্ছেন তাঁরই দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র। আর তোমরাও সেই একনম্বর কাঁঠালখোরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ। প্রতিকারের জন্যে তোমাদের দিকে তাকাবে কোন্ হিন্দু, কোন্ মুসলমান?" স্বপনদা সংশয়ান্বিত।

"আর প্রতিকার যাকে বলছ তা ব্যাধির চেয়েও খারাপ।" দীপিকা বৌদি বলেন। "বুর্জোয়ারা নির্মূল হলে দেশের কালচার রক্ষা করবে কারা? সেই সম্পদকে বাড়িয়ে তুলবে কারা? রুশদেশে কি সে সম্পদ বেড়েছে। অন্তত রক্ষা পেয়েছে? এই তো সেদিন পর্যন্ত চেকভ পড়তে পাওয়া যেত না। ডস্টয়েভস্কি তো এখনো অপ্রাপ্য। রাশিয়ার জনগণের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থেকে ডস্টয়েভস্কিকে বাদ দিলে জনগণেরই ক্ষতি। বুর্জোয়া বলে তোমরাও কি বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেবে না? হিন্দু মুসলিম বিরোধের প্রতিকার কি এই যে ধর্ম জিনিসটাকেই আফিং বলে নিষিদ্ধ হবে? এ যেন মাথাব্যথা সারানোর জন্যে মাথাটাকেই কেটে বাদ দেওয়া।"

"না, বৌদি। সে রকম অভিসন্ধি আমাদের কারো নেই। আমরা সংস্কৃতিও রাখব, ধর্মও রাখব। কিন্তু বুর্জোয়া আধিপত্য রাখব না। তা হলেই দেখবেন হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে বাস করছে, কথায় কথায় মারামারি করছে না। আর সংস্কৃতিরও তখন রূপান্তর ঘটবে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ চাষী মজুরের ঘরে ঘরে জন্মাবে। ওরা উঠতে চায়, ওদের উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। উপর থেকে জগদ্দল পাথরের চাপ সরে গেলে ওরাও মাথা তুলে দাঁড়াবে। 'বল বীর, চির উন্নত মম শির।' কাজী নজরুল ইসলাম তার নমুনা।" আশ্বাস দেয় বাবলী।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটেছে। সভ্যতার সঙ্কটে তাঁর শরীর মন ভেঙে পড়েছিল। নাৎসীদের রুশ আক্রমণ জুন মাসে। কবিগুরুর মহাপ্রয়াণ আগস্ট মাসে। একটার সঙ্গে আরেকটার সম্বন্ধ ছিল বলে স্বপনদার ধারণা।

"রবীন্দ্রনাথ থাকতেও, কাজী নজরুল থাকতেও বাংলার হিন্দু মুসলমানকে মেলানো গেল না। আজ তো রবীন্দ্রনাথও নেই। নজরুলেরও শুনেছি মানসিক দুরবস্থা। একদিন দেখতে যেতে হবে।" স্বপনদা বলেন।

"দু'পক্ষের কাগজগুলো পড়ে দেখছ, স্বপন? দাঙ্গার পূর্বাবস্থা। যেকোনোদিন বেধে যেতে পারে।" রাহার কণ্ঠে আতঙ্কের সুর।

"তখন আমরা ভালোমানুষ সেজে বলব ইংরেজের চালবাজি। একই নিঃশ্বাসে বলব, মুসলমানদের বজ্জাতি।" বর্মণ বলেন, "আশ্চর্যের ব্যাপার, যারাই সব চেয়ে উগ্র ব্রিটিশবিদ্বেষী তারাই সব চেয়ে উগ্র মুসলমানবিদ্বেষী।"

তালুকদার মন্তব্য করেন, "তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁদের প্রতিপক্ষ পলাশীর পরাজয়ের জন্যে হিন্দুদেরই দায়ী করেন, আর বিজেতাদের হাত থেকে নবাবী ফিরে পেতে চান। নবাবী বলতে অবশ্য মীর জাফরের নবাবী, সিরাজের নবাবী নয়। ইংরেজের সঙ্গে লড়তে হয় লড়বে হিন্দুরা। মরতে হয় মরবে হিন্দুরা। মুসলমান ওর মধ্যে নেই।"

"বাঙালী যদি দুই ভাগ হয়ে যায় বাংলাও দুই ভাগ হয়ে যেতে পারে।" স্বপনদা হুঁশিয়ারি দেন। "কাগজ যারা লেখে তাদের কি মতিভ্রংশ হয়েছে। এ হলাহল পান করার মতো নীলকণ্ঠ হতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। তাঁদের বদলে পান করবে কে? আমি তো অক্ষম।"

"ওকে স্বপন," তালুকদার বলেন, "তুমি তো ইংলণ্ড, ফ্রান্স,জার্মানী তিনটি দেশেই দীর্ঘকাল বাস করেছ। তুমি কি লক্ষ করনি যে ইংলণ্ডে প্রটেস্টান্টদের একাধিপত্য, ফ্রান্সে ক্যাথলিকদের একাধিপত্য, জার্মানীতে এ সমস্যার সমাধান হয়নি বলেই জার্মানী এক নয়, দুই? তার অপরভাগের নাম অস্ট্রিয়া। জার্মান একীকরণের জন্যে অস্ট্রিয়া থেকে এসেছেন হিটলার, তিনি জোর করে দুই রাষ্ট্রকে এক করেছেন, কিন্তু প্রটেস্টান্ট বা ক্যাথলিক কোনো এক সম্প্রদায়কে একাধিপত্যের সুযোগ দেননি। দুই সম্প্রদায়ই সমান সমান বলে দুই পক্ষের জোড়াতালিও দেননি। তাঁর সমাধান হচ্ছে কেউ ক্যাথলিকও নয় কেউ প্রটেস্টান্টও নয়, এমন কি খ্রীস্টানও নয়; সকলেই আর্য আর টিউটন। যাদের প্রাচীন উপকথা অবলম্বন করে ভাগনার তাঁর অপেরা পর্যায় রচনা করেছেন। ধর্মের নামে জার্মানরা কি কম লড়াই করেছে? তাতে কোনো সম্প্রদায়েরই জয় হয়নি। হয়েছে জার্মান জাতির বিভাজন ও বলক্ষয়। অত বড়ো গুণবান জাতি কি আর আছে? আত্মকলহের ফলে ওরাই ইংরেজ ফরাসীর তুলনায় বলহীন। জার্মানদের দিকে তাকাও। তা হলে বাঙালীদের আত্মকলহের অর্থ খুঁজে পাবে। এর অর্থ হিন্দু মুসলমান ক্যাথলিক প্রটেস্টান্ট সমান সমান। কেউ কারো একাধিপত্য সহ্য করবে না। ফিফটি ফিফটি মেনে নিলেও প্রশ্ন ওঠে তৃতীয় পক্ষ চলে গেলে গভর্নর হবেন কাদের লোক? প্রধানমন্ত্রী হবে কাদের লোক? দ্বিমত হলে সালিশী করবেন কে? সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কেমন করে? এক পক্ষ সরকার চালাবেন, অপর পক্ষ অপোজিশনে থাকবেন, এটা কি পালা করে হওয়া সম্ভব? চাই মিশ্র দল। তাও যথেষ্ট নয়। চাই হিন্দু মুসলিম বিভেদের উর্ধ্বে উঠে প্রাচীন বাঙালীত্বের উদ্বোধন। চাই একজন ভাগনার। যিনি পুরাতনকে নতুন রূপ দেবেন।"

"এর পরে তুমি বলবে, চাই একজন হিটলার।" উপহাস করেন বর্মণ।

"হিটলার! হিটলার কি বাংলার হিন্দু মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে সেইখানেই থাকবেন। বৃহত্তর বঙ্গের দাবীতে আসাম আক্রমণ করবেন না, বিহার আক্রমণ করবেন না? আর ভাগনার? ভাগনার কি লাউসেনকে নিয়ে, ময়নামতীকে নিয়ে গীতিনাট্য রচনা করতে পারবেন?" বিশ্বাস হয় না রাহার।

"ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?" বাবলী বৌদির দিকে তাকায়।

"কেন, ভয় কিসের? আমরা কেউ পুলিশে রিপোর্ট করব না।" তিনি আর-সকলের হয়ে অভয় দেন ওকে।

"হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, শতকরা আশিজন বাঙালী হচ্ছে চাষী আর মজুর। একজন বাঙালী হিটলার এদের কতটুকু উপকার করতে পারে? উপকার যা করবার ওই বিশজন বাঙালীরই করবে। কয়েকটা ভেলকি আর ভোজবাজি দেখিয়ে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করার পর হঠাৎ একদিন জামশেদপুর চড়াও হবে। কারণ তার কয়লায় ঘাটতি। তার পরে আরেকদিন আসাম আক্রমণ করবে। কারণ তার পেট্রল না হলে চলবে না। এসব জায়গায় বাঙালী আছে। সেটাই হবে তার অজুহাত। কিন্তু শতকরা আশিজনকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে কদ্দিন! শত্রুর হাতে যদি পরাজিত না হয় তো বিপ্লবীদের হাতেই নিপাত যাবে। জেলে বসেই আমি হিটলারের প্রশংসা শুনেছি। বেরিয়ে এসে যা শুনছি তা কেবল প্রশংসা নয়। তা জয়ধ্বনি। এখন আমি যদি বলি, বাঙালীর যাঁকে প্রয়োজন তিনি একজন হিটলার নন, তিনি একজন স্টালিন, তা হলে আমি একঘরে হব।" বাবলী ভয়ে ভয়ে বলে।

"আরে, না, না। একঘরে কেন? তোমাদের দলটিও কম ভারী নয়। দলের অধিকাংশই বুর্জোয়া। কিন্তু হিটলারের যেমন ভাগনার স্টালিনের তেমন কে? এ তো বড়ো রঙ্গ, বোন, এ তো বড়ো রঙ্গ। নাম যদি বলতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।" স্বপনদা বৌদির দিকে আড়চোখে তাকান। দু'জনেরই গাল লাল হয়ে ওঠে।

"আমার অত বিদ্যে নেই, স্বপনদা।" বাবলী কবুল করে। "স্টালিনের সঙ্গীত প্রীতির কথা কোথাও পড়িনি। জারের আমলের সঙ্গীতের উপরে বিপ্লবীদের স্বাভাবিক বিরাগ। ব্যালের খাতিরে যেটুকু সহ্য

করতে হয় সেটুকুই করে। ব্যালে ওদের সবার প্রিয়। তোমার প্রশ্নের জবাব বোধহয় চাইকোভস্কির 'সোয়ান লেক।' না, বৌদি?"

"কী জানি, বাপু। তোমরা ভাইবোনে কে কার সঙ্গে যাবে আমি কী করে জানব? আমি আর আমার এল্‌ফ। এই জেনেছি সার।" এল্‌ফ তাঁর পায়ের কাছে।

"চকোলেট, তুমি বলতে পারলে না? হিটলারের যেমন ভাগনার স্টালিনের তেমন কেউ থাকলে তো? ওটা একটা কালচারাল গ্যাপ। বিপ্লবও ওটা পূরণ করেনি।" স্বপনদা বৌদির মুখরক্ষা করেন।

."কালচারাল গ্যাপ।" বাবলী গ্রাহ্য না করে বলে, "সেটা এমন কী জরুরি? বিপ্লব যে তার জন্যে আটকায় না এটা তো রাশিয়ার বেলা প্রত্যক্ষ। ভাগনারের মতো কেউ ছিলেন না, কিন্তু পুশকিন ছিলেন, টুর্গেনিভ ছিলেন, গোর্কি ছিলেন। সেইজন্যেই তো আমরা তোমার কাছে এসেছিলুম। তুমি গ্যাপ পূরণ করতে স্বপনদা।"

"আমি!" স্বপনদা নিঃস্পৃহভাবে বলেন, "জন্ম রোমান্টিক। আমার কাছে তোমরা আশা করো বিপ্লবের রোমান্টিক চিত্র। ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার দিকে রোমান্টিসিজম যদি বা কিছু ছিল রুশবিপ্লবের আগাগোড়া রোমান্টিকতাবর্জিত। বিপ্লববাদীদের মধ্যে রোমান্টিক যাঁরা ছিলেন তাঁরা হয় আত্মহত্যা করেছেন, নয় কোতল হয়েছেন, নয় মৌন ব্রত নিয়েছেন, নয় পালিয়ে বেঁচেছেন। মানুষের জীবনে কেবল রিয়ালিজম থাকবে, তাও শুধু সোশিয়াল রিয়ালিজম, এ যেন একপ্রকার ইসলামী ফতোয়া। যার ফলে আরবী সাহিত্য হয়েছে আরব মরুভূমির মতো আরেক মরুভূমি। এখানে ওখানে দুটো একটা ওয়েসিস যে নেই তা নয়, কিন্তু মরক্কো থেকে বাগদাদ পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ড রসের অভাবে খাঁ খাঁ করছে। অথচ ইসলামের মতো বৈপ্লবিক ধর্ম আর কোথায়!"

বাবলী একেবারে চুপ। তালুকদার বলেন, "অর্ধেক বাঙালী বৈপ্লবিক ধর্ম ইসলাম মেনে নিয়েছে। বাকী অর্ধেকও বৈপ্লবিক মতবাদ কমিউনিজম বরণ করবে, ইংরেজ যদি দেশছাড়া হয়। আর কংগ্রেস যদি গদী না পায়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিও হবে আরেক মরুভূমি। আমাদের হাতে খুব বেশী সময়ও নেই, স্বপনমোহন। এই যুদ্ধে রাশিয়া যদি জেতে কমিউনিজমও দিকে দিকে ছড়াবে। অর্ধেক বাঙালী কমিউনিস্ট বনে গেলে আশ্চর্য হবার কী আছে। আগে যেমন মুসলমান বনে গেল। এটা তো একদা বৌদ্ধদের দেশ ছিল। বৌদ্ধরা আজ ক'জন!"

"তোমার ওটা বাড়াবাড়ি!" রাহা প্রতিবাদ করেন। "অর্ধেক মুসলমান হতে সাতশো বছর লেগেছে। অর্ধেক কমিউনিস্ট হতে তার চেয়ে কম সময় লাগবে না। যদি না বলপ্রয়োগ হয়। বলপ্রয়োগ হলে সেটা একতরফা থাকবে না, জেনে রেখো। আমরা গৃহযুদ্ধ এড়াতেই চাই। কিন্তু এঁরা যদি গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দেন তবে আমরাও বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়ব না। তার মানে আমাদের প্রাইভেট প্রপার্টি।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দাদা, ব্যাপার ততদূর গড়াবে না। মালিকরা পা দিয়ে ভোট দেবেন। গ্রামকে গ্রাম খালি হয়ে যাবে।" বাবলীর মুখে হাসি।

"কিন্তু শহর তো আমাদেরই শক্ত ঘাঁটি।" রাহা তর্ক করেন।

"সেকথা ঠিক। শহরের বেলা অন্য স্ট্রাটেজি।" বাবলী সেটা ফাঁস করে না।

"ওই শহরগুলোই হবে এদেশের ওয়েসিস। যদি টিকে থাকে।" স্বপনদা বলেন।

"কিন্তু কথা হচ্ছিল কালচারাল গ্যাপ সম্বন্ধে।" তালুকদার খেই ধরিয়ে দেন। "বিপ্লব মানেই তো একটা ক্লীন ব্রেক। একটা পরিষ্কার ছেদ। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। পূর্বতনের সঙ্গে অধুনাতনের। জীবনের অন্যান্য বিভাগে যদি ছেদ পড়ে তো সংস্কৃতিই কি হবে একমাত্র ব্যতিক্রম? কালচারাল গ্যাপ অনিবার্য। নয়তো ওটা বিপ্লবই নয়। রেভোলিউশন নয়, রিফর্ম। স্বপন, তুমি একজন রিফর্মিস্টের মতো কথা বলছ। মিস্ সেন তোমার ফাঁদে পা দেবেন কেন? তিনি যে একজন রেভোলিউশনিস্ট।"

স্বপনদা হেসে বলেন, "আমি হচ্ছি কচ্ছপ আর আমার এই বোনটি হচ্ছে খরগোস। ওর ধারণা ও আমার আগে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে। ও তো জানে না যে পরিবর্তনেরও একটা অন্তর্নিহিত নিয়ম আছে। যে দেশ বা জাতি যত পুরাতন সে দেশ বা জাতি তত ধীরে ধীরে বদলায়। রাশিয়া কি পাঁচ হাজার বছরের পুরানো দেশ? রাশিয়ানরা কি পাঁচহাজার বছরের পুরানো জাতি? ওরা তো এগিয়ে যাবেই। কিন্তু আমরাও যে চিরকাল পেছনে পড়ে থাকব তা নয়। আমরাও ওদের ধরে ফেলব ও ছাড়িয়ে যাব। কী, বোন? তোমার বিশ্বাস হয় না? দেখবে কার কথা ফলে।"

"তোমরা বুর্জোয়ারা কচ্ছপের মতোই মন্থর। কিন্তু ওই রেটে এগোলে তোমরা কোনো কালেই লক্ষস্থলে পৌঁছবে না, স্বপনদা। এ যুগটা তোমাদের যুগ নয়। তোমাদের যুগ ছিল মার্কসপূর্ব দুই তিন শতাব্দী। এখন এটা মার্কসোত্তর শতাব্দী। ইতিহাস তোমাদের মহাপ্রস্থানের দিন ধার্য করে দিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য যেদিন অস্ত যাবে সেদিন তোমাদের উপরেও অন্ধকার নেমে আসবে। অ্যারিস্টোক্রাসী, ব্যারিস্টোক্রাসী প্লুটোক্রাসী সব একধার থেকে ফৌত হবে।" বাবলীর মুখে চোখে হাসি।

"দ্যাখ, চকোলেট।" স্বপনদা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, "আমরা এদেশের বুর্জোয়ারা এদেশে ন্যাশনালিজম আর ডেমোক্রাসী এই দুই মহাতত্ত্বের প্রবক্তা। আমরা না থাকলে এদেশে এসব তত্ত্ব কোনোদিন গজিয়ে উঠত না। আরো একটি মহাতত্ত্ব সোশিয়াল জাস্টিস। এতেও আমাদের অনীহা নেই। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ আমাদের কিছু কিছু প্রপার্টি আছে। তার মায়া কাটানো মুখের কথা নয়। আমরা যদি তোমাদের মতো সর্বহারা হতে না চাই তবে সেটা আমাদের অপরাধ নয়। প্রাইভেট প্রপার্টি মাত্রেই শোষণলব্ধ নয়। আমার বাবা প্রাণপণ পরিশ্রমে যা অর্জন করে গেছেন তা পারিশ্রমিকের পর্যায়ে পড়ে। আর আমিও কি কম পরিশ্রম করি?"

বাবলী একটু ভেবে নিয়ে বলে, "তোমাদের পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে, স্বপনদা। তোমাদের আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব করব না। কেমন ব্যবহার তোমরা পাবে সেটা নির্ভর করবে কেমন ব্যবহার তোমরা করবে তারই উপরে। তোমরা যদি শত্রুতা করো তবে আমরাও শত্রুতা করব। তোমরা যদি মিত্রতা করো তবে আমরাও মিত্রতা করব। প্রাইভেট প্রপার্টির বৈধতা স্বীকার না করলেও আমরা আমাদের মিত্রদের প্রাইভেট প্রপার্টি বেদখল করব না, বাজেয়াপ্ত করব না। তবে তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জন্মগত অধিকার অবাধ হবে না। জন্মস্বত্ব বলে কারো কিছু থাকবে না। যেটা থাকবে সেটা কর্মগত অধিকার সবাইকে কাজ দেওয়া হবে। সবাইকে খোরপোস দেওয়া হবে। উন্নতির সোপানও খোলা থাকবে। যারা কাজের লোক হবে তারা উচ্চতর সোপানে উঠবে।"

"আমি তো শুনেছিলুম যোগ্যতা অনুসারে নয়, প্রয়োজন অনুসারেই যে যা পাবে। যে দশ টাকা মজুরির যোগ্য নয় সে বিশ টাকার ভোগ্য উপকরণ দাবী করতে পারবে। যেহেতু তার কাচ্চাবাচ্চা বেশী।" তালুকদার হাসেন।

"কাচ্চাবাচ্চার ভার রাষ্ট্র নেবে। রাষ্ট্র যদি বলে তাদের সংখ্যা কমাও তবে সে নির্দেশ মান্য করতে হবে। প্রয়োজন যদি অপদার্থতার পোষক হয় তবে সেটা গ্রাহ্য হতে পারে না।" বাবলী ব্যাখ্যা করে।

তালুকদার গম্ভীরভাবে বলেন, "দেখুন, মিস সেন, আপনাদের সব চেয়ে প্রবল বাধা আসবে বুর্জোয়াদের দিক থেকে নয়। কৃষকদের দিক থেকেই। প্রাইভেট প্রপার্টি ওরা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। আর কাচ্চাবাচ্চা তো ওদের অগুনতি। কাচ্চাবাচ্চার ভার ওরা রাষ্ট্রের জিম্মায় সঁপে দেবে না। গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে এই দুটি ইস্যুতেই। সম্পত্তি আর সন্তান।"

বাবলী না থাকলে আলাপ আলোচনা সংস্কৃতিকে ঘিরেই চলত। তা নয়, বার বার কক্ষচ্যুত

হচ্ছে। দীপিকা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন লক্ষ করে স্বপনদা মোড় ঘুরিয়ে দেন।

"নতুন রেকর্ড আর আসছে না কিছুদিন থেকে।" স্বপনদা বলেন, "তাই পুরানো রেকর্ড বাজিয়ে সঙ্গীতের তৃষ্ণা মেটাতে হচ্ছে। চকোলেট কী মনে করবে, জানিনে। আমার তো ইচ্ছে করছে ভাগনারের 'মাইস্টারসিঙ্গার্স' বাজিয়ে শুনতে ও শোনাতে। সেকালে আমাদের দেশের মতো জার্মানীতেও কবির দল ছিল। সেইরকম একটি দলের মূল গায়েন এক মুচি। নাম হান্‌স সাক্‌স। ভাগনার তাই নিয়ে একটি অপেরা লেখেন, অপেরাটি এখনো জনপ্রিয়। মিউনিকে মানস আর আমি দেখে মুগ্ধ হয়েছি।"

মানসের উল্লেখ শুনে বাবলী জানতে চায়, "মানসদা এখন কোথায়? আর তাঁর বন্ধু সৌম্যদা?"

"মানস চাকরি ছাড়বে কি ছাড়বে না তাই নিয়ে হ্যামলেটের মতো দোনোমনো করছিল। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থেকে সব দিক বিবেচনা করে বুঝতে পারে যে চাকরির বিকল্প বেকারি। অগত্যা চাকরিতেই ফিরে গেছে। কলকাতার পশ্চিমের এক জেলায়। কিন্তু যেখানেই যাক ওর সেই একই ভাবনা। সেবার ছিল পোলাণ্ডকে নিয়ে, তারপর ফ্রান্সকে নিয়ে, তারপর ব্রিটেনকে নিয়ে, অবশেষে রাশিয়াকে নিয়ে। ও কি নীরব সাক্ষী হবে, না যুদ্ধেঝাঁপিয়ে পড়বে? অবশ্য হিটলারের বিপক্ষে। কিন্তু ওকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিচ্ছে কে? বড়লাট তো সিভিল অফিসারদের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে কাউকেই যুদ্ধে যেতে দেওয়া হবে না। ইংরেজদেরও না। মানস ন যযৌ ন তস্থৌ। আর তার বন্ধু সৌম্য? সেও তো ছটফট করছিল ব্যক্তি সত্যাগ্রহে যোগ দিতে। কিন্তু গান্ধীজী ওকে মনোনয়ন দেননি। অযোগ্য বলে নয়, অন্য কারণে। গঠনকর্মে যারা নিযুক্ত তারা যেন সিভিল অফিসার। তাদের থাকতে হবে স্বস্থানে। সত্যাগ্রহ তো একপ্রকার যুদ্ধ। নৈতিক যুদ্ধ। তাতে যারা অংশ নেবে তাদের যেতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। অর্থাৎ কারাগারে। সৌম্য যদি জেলে যায় তবে গঠনকর্ম পরিচালনা করবে কে? সেটাও কি কম আবশ্যক? মাঝে মাঝে কলকাতা এলে দেখা করে যায়। কিন্তু ওর আশ্রম ওই পদ্মাপারে। ওর দাড়ি এখন আরো বর্ধিষ্ণু হয়েছে।" স্বপনদা মুচকি হাসেন।

"মুসলমান বলে ভুল হয়।" বাবলী মুখ টিপে হাসে।

"হ্যাঁ, হিন্দু মুসলিম একতার ওটাও পূর্বশর্ত।" স্বপনদা পরিহাস করেন।

"যতই যাই করো ভবী ভুলবে না।" তালুকদার মন্তব্য করেন। মুসলমান ভুলবে না যে সে একদিন এদেশের বাদশা ছিল। আবার হবে, যদি চাকা ঘুরে যায়। তখন কোথায় তোমার স্বরাজ আর কোথায় তোমার বিপ্লব।"

স্বপনদা উঠে গিয়ে গ্রামোফোনে ভাগনারের রেকর্ড চাপিয়ে দেন। আর সবাইকে বলেন, "এখন মন দিয়ে শোন।"

এল্‌ফ তা শুনে ঘেউ ঘেউ করে আপত্তি জানায়। দীপিকা তাকে কোলে করে নিয়ে শোবার ঘরে চলে যান ও দরজা বন্ধ করে ফিরে আসেন। সেও আস্তে আস্তে চুপ করে।

কিন্তু বাবলীকে ধরে রাখা যায় না। হিটলারের প্রিয় ভাগনার। অতএব বাবলীর অপ্রিয়। স্বপনদা যতই বোঝান ও মেয়ে অবুঝ। তখন বলেন, "আরেকদিন এসো, শালিয়াপিনের ভল্‌গা বোটম্যান শোনাব।"

।। চার ।।

মনীষীদের কারো কারো মতে রুশবিপ্লব কবে ফুরিয়ে গেছে, এখন যেটা চলছে সেটা বিপ্লবের পরবর্তী নেপোলিয়নীর পর্যায়। নেপোলিয়ন পরাস্ত হলে বুরবঁরা ফিরে আসবেন। তার মানে আবার রোমানোভ বংশের আমল। কেউ বিশ্বাস করেন না যে রোমানোভরা গণতন্ত্র প্রবর্তন করে প্রজাদের হাতেই শাসনক্ষমতা

ছেড়ে দেবেন।

"এই মনীষীরা ধরে নিয়েছেন যে স্টালিনই একালের নেপোলিয়ন। এটা কিন্তু ঠিক নয়।" মানস বলে তার জেলার সিভিল সার্জন ডাক্তার ঘটককে।

"আমার মেয়ে ঝরনাও তো তাই মনে করে।" ডাক্তার ঘটক বলেন।

"আচ্ছা, তা হলে ঝরনাকে মনে করিয়ে দেবেন যে নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের তারিখ ছিল ২৩শে জুন। আর হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের দিন ২২শে জুন। প্রায় কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে। নেপোলিয়নের দুই দিকে ছিল দুই মহাকন্টক। তাদের নির্মূল না করে তিনি নিষ্কণ্টক হতে পারছিলেন না। কিন্তু ব্রিটেনকে আক্রমণ করতে গিয়ে দেখেন নৌবল নেই। যতদিন না নৌবল গড়ে ওঠে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে স্থলসৈন্য দিয়ে রাশিয়াকে হারিয়ে দেওয়া যেতে পারে। রাশিয়ার পরে ব্রিটেন। গত শতাব্দীতে নেপোলিয়নের সেই যে সিদ্ধান্ত এই শতাব্দীতে হিটলারের সিদ্ধান্তও তাই। হিটলার যদি নেপোলিয়নের মতো নিষ্কণ্টক হতে চান তবে তাঁকেও প্রথমে রাশিয়াকে ও পরে ব্রিটেনকে হারিয়ে দিতে হবে। ব্রিটেন সেটা বোঝে। সেইজন্যে রাশিয়াকে মদত দিয়ে জোরদার করছে। রাশিয়া যে কমিউনিস্ট আর ব্রিটেন যে ক্যাপিটালিস্ট এ গণনা আপাতত শিকেয় তোলা রয়েছে। ইউরোপের কন্টিনেন্ট যাঁর একচ্ছত্র শাসনাধীন তিনিই নেপোলিয়ন। যেমন সেকালে তেমনি একালে। তিনি কে? তিনি হিটলার? ভবিষ্যতে যদি ইউরোপের কন্টিনেন্ট স্টালিনের একচ্ছত্র শাসনাধীন হয় তবে স্টালিনই হবেন নেপোলিয়ন। কিন্তু তখন ব্রিটেন হবে তার প্রধান অন্তরায়। আমেরিকাও ব্রিটেনের পেছনে দাঁড়াবে। তখন ক্যাপিটালিস্ট বনাম কমিউনিস্ট মতবাদের সংঘাত। সন্ধিও হতে পারে।" মানস অনুমান করে।

এর পর ডাক্তার সাহেব চলে যান তাঁর পারিবারিক প্রসঙ্গে। "ঝরনাকে নিয়ে আমরা কী মুশকিলেই না পড়েছি, মিস্টার মল্লিক! ওর বিয়ের বয়স পেরিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু ম্যাচ করে যদি বিয়ে দিতে যাই তবে ওর বর হবে হাজার টাকা মাইনের চাকুরে। তার কম হলে ও বিয়ে করবে না। যদি করে প্রেমে পড়ে বিয়ে করবে। কিবা হাড়ি কিবা ডোম।"

মানস হেসে বলে, "ঝরনার মতো গুণবতী কন্যার প্রার্থীর অভাব হবে না। আর তাঁর বয়স এমন কী হয়েছে। যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান।"

"না, না, মিস্টার মল্লিক, ব্যাপার অত সহজ নয়। আমরা ওকে পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে দিইনি। আমরা কো-এডুকেশনকে ভয় করি। কিসে থেকে কী হয় কে বলতে পারে। প্রেমের নামে কত মেয়ের সর্বনাশ হচ্ছে। আমরা চিরকাল ঘটকালি করেই বিয়ে দিয়ে এসেছি। সেটাই ছিল আমাদের পেশা। মেয়ে এখন বায়না ধরেছে যুদ্ধে যাবে। উইমেন্স অক্জিলারি কোরে যোগ দিয়ে ওয়াকি হবে।" ডাক্তারের চোখে মুখে ত্রাস।

"ভালোই তো। মন্দ কী?" মানস উৎসাহের সঙ্গে বলে, "যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা কত বড়ো একটা সৌভাগ্য! একভাবে না একভাবে অংশ নেওয়া কত বড়ো একটা সুযোগ! আপনি ডাক্তার, আপনারই তো কর্তব্য অ্যাকটিভ সার্ভিসে নাম লেখানো। ফিরে এলে হতেন ক্যাপটেন ঘটক। ঝরনা যদি যান ওঁকেও হয়তো ক্যাপটেন র‍্যাঙ্ক দেওয়া হবে। বিয়েও হয়ে যেতে পারে কোনো এক অফিসারের সঙ্গে।"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ডাক্তার সাহেব বলেন, "গতবারের যুদ্ধটা শেষ হয়ে না গেলে আমাকেও ফ্রন্টে যেতে হতো, মল্লিক সাহেব। ফ্রন্টে যাইনি, ক্যান্টনমেন্টে কাজ করেছি। তার আশে পাশে থাকে লালবাজার। লালবাজারে কী বিক্রী হয়, জানেন? নারীদেহ। যুদ্ধে যারা প্রাণ দিতে যায় তাদের সঙ্গদানের জন্যে নারীরও প্রয়োজন হয়। কোন্ ভদ্রঘরের মেয়ে যেতে রাজী হবে? যায় ওই লালবাজারের পণ্যরাই। প্রচুর অর্থ পায়। মিলিটারি বাজেটে ওটাকে দেখানো হয় এনটারটেনমেন্ট কস্ট হিসাবে। এবারকার

যুদ্ধের নূতনত্ব হচ্ছে অফিসারদের বিনোদনের জন্যে সমান ঘরের ওয়াকি প্রবর্তন। ক্লাবে গিয়ে তাস খেলা, টেনিস খেলা, গ্রামোফোন বাজানো, হাত ধরাধরি করে নাচা, একসঙ্গে বসে ডিনার খাওয়া। এইসব আর কী! তফাতের মধ্যে ক্লাবের বদলে মেস। কলকাতায় বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। ধনীকন্যারাও অগ্রণী হয়েছেন। গভর্নমেন্ট সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছেন। কিন্তু আগুন আর ঘি একসঙ্গে রাখলে যা হবার তা হবেই। নজর রাখবে কে? বিয়ে যাদের হবে তারা কলঙ্ক এড়াবে, কিন্তু তাদেরও তো বৈধব্যের ভয় থাকবে।"

ভাবনার কথা বইকি। মানস শুধু বলে, "হুঁ।"

ঝরনার মা এখন শয্যা নিয়েছেন। মিসেস মল্লিক যদি একবার দেখতে যান তো বড়ো উপকার হয়। সব চেয়ে ভালো হতো যদি মেয়েকে রাতারাতি পাত্রস্থ করতে পারতুম। চেষ্টা যে করছিনে তা নয়। কিন্তু ওই হাজার টাকা মাইনের লক্ষ্য ভেদ করবে কে? আমার নিজেরই মাইনে তার চেয়ে অনেক কম। এতদিন চাকরি করেও আই . এম. এস হতে পারলুম না। আই . এম. এসের বদলে আই . এম. ডি। যেন আমের বদলে আমড়া।" ডাক্তার সাহেব কাষ্ঠহাসি হাসেন।

"আই . এম. এস. হতে চান তো এখনি তার মওকা। যুদ্ধে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা আই . এম. এস. হয়ে ফিরবেন।" মানস আশা দেয়।

"ক্ষেপেছেন! কোথায় পাঠাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। হয়তো লিবিয়ায় কি সাইরেনাইকায়। এবার টার্কদের খপ্পরে নয়, জার্মানদের খপ্পরে। বাপ রে বাপ, রমেল। রমেলের সঙ্গে লড়তে পারে তেমন ইংরেজ কে আছে! ঈজিপ্ট গেল বলে ধরে নিন। ইংরেজ জেতে কি না সন্দেহ।" ডাক্তার ঘটক কানে কানে বলেন।

"দেখুন, ডাক্তার সাহেব, ইংরেজদের সী পাওয়ার আছে। সী পাওয়ার থাকতে কেউ তাদের পরাস্ত করতে পারবে না। ওরা সাময়িকভাবে হটে আসবে। যেমন ডানকার্কে। কিন্তু অপসরণ তো পরাজয় বরণ নয়। আপনি হয়তো কিছুদিনের জন্যে বন্দী হবেন। কিন্তু পরে সেটাই হবে আপনার প্রমোশনের সোপান। এখনো সময় আছে।" মানস উৎসাহ দেয়।

"তাতে আমার পারিবারিক সমস্যার কোনো সুরাহা হবে না, মল্লিক সাহেব। ঝরনা জেদ ধরেছে ওয়াকি হবেই। তাতে আর কিছু না হোক অফিসার র‍্যাঙ্ক ও র‍্যাঙ্কের উপযোগী মাইনেও তো হবে। আমার নিজের মাইনের চেয়ে কম নয়। একটা মফঃস্বল শহরে ভেরেণ্ডা ভাজার চেয়ে মিলিটারি ক্যাম্পে দহরম মহরম করাও ভালো। চরিত্র যে সকলের নষ্ট হয় তা নয়। ও নিজের ইজ্জৎ নিজে রাখতে জানে। বরাবরই সাহসী মেয়ে। ঘোড়ায় চড়ত কম বয়সে। আমাদের তো পুত্রসন্তান নেই। দুই মেয়ের পর ওই আমাদের ছেলে। কিন্তু তা বলে তো ওকে ছেলেদের সঙ্গে কলেজে পড়তে দিতে পারিনে। ওর মা ওকে চোখে চোখে রেখেছেন।" ডাক্তার সাহেব বলেন।

"তা যদি বলেন, আজকাল ছেলেদের কলেজে মেয়েদের যাওয়া তো নতুন কিছু নয়। আমাদের প্রতিবেশী রিটায়ার্ড জজ রায় বাহাদুর সুবোধকুমার ভদ্র তো তাঁর মেয়ে শীলাকে ছেলেদের কলেজে পাঠাচ্ছেন।" মানস দৃষ্টান্ত দেখায়।

"আপনি বোধহয় জানেন না যে শীলার বিয়ে ঠিক হয়েই রয়েছে। ছেলেটি পুলিশ ট্রেনিং কলেজ থেকে ফিরলেই শুভকর্ম সারা হবে। স্টার্টিং পে আড়াইশো। ঝরনা হলে পত্রপাঠ খারিজ করত।" ডাক্তার সাহেব একটু পরে জুড়ে দেন, "যদি না প্রেমে পড়ে বিয়ে সম্ভব হতো।"

"ঝরনার চোখে প্রেমের মূল্য বিত্তের চেয়ে চারগুণ বেশী। এখন এদেশের যুবকদের চোখে ঝরনার প্রেমের মূল্য কয়গুণ বেশী কী করে বোঝা যাবে? আপনাদের উচিত ওকে যুবকদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া। এই মফঃস্বল শহরে সেটার সুযোগ কোথায়? দিন না ওকে বাইরে যেতে।" মানস

আবেদন করে।

"তা হলে ওর মা মনের দুঃখে মারা যাবে। আর বাবা চাকরি ছেড়ে বৈরাগী হয়ে যাবে। এই যুদ্ধ বাঙালীর সমাজে অধঃপতন ডেকে আনছে। শুনছি ওয়াকির জন্যে ভদ্রঘরের কন্যাদের আগ্রহ ডেকেন্দীর চাইতেও বেশী। যাদের ধনসম্পদের অভাব নেই তাদেরও। যুদ্ধক্ষেত্র যেন একটা রোমান্সের কেলিকানন। সোসাইটি গার্লদের প্রত্যেকের ধারণা একজন কর্নেল বা মেজরের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। অবশ্য প্রাণে বেঁচে ঘরে ফিরে এলে। এদের চেয়ে কত ভালো সেইসব যুদ্ধবিরোধী মেয়েরা যাদের স্লোগান হলো 'না একো রুপেয়া, না একো জওয়ান।' কেন যে ওদের ধরে ধরে জেলে দেওয়া! জেলখানায় গিয়ে অমন কত মেয়ে দেখলুম।" ডাক্তার সাহেব আক্ষেপ করেন।

"কিন্তু ওদের মধ্যেও তো নাৎসীদের রুশ আক্রমণের পর দু' মত দেখা যাচ্ছে। কলকাতা থেকে আমার বন্ধু স্বপনদা লিখেছেন বাবলী সেন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এখন যুদ্ধের পক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।" মানস জানায়।

"কিন্তু বাবলী সেন ঝরনা ঘটকের মতো এত বোকা মেয়ে নয় যে ওয়াকি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। অবশ্য সরকারও ওকে বিশ্বাস করে যুদ্ধে যেতে দেবে না। দেশীয় জওয়ানদেরকে ও হয়তো ইংরেজের বিরুদ্ধেই হাতিয়ার বাগাতে ভজাবে। আর-একজন জোন অফ আর্ক।" ঘটকের উপহাস।

"কিন্তু ও যে রাশিয়ার বন্ধু কমিউনিস্ট।" মানস বিস্মিত হয়।

"আমরা তো জানি ও বর্ণচোরা ন্যাশন্যালিস্ট।" ঘটক মুচকি হাসেন।

"পুলিশের লোক ওকে চোখে চোখে রেখেছে।"

"সব কমিউনিস্ট কি তাই?" মানস সুধায়।

"আরে, না, না। সবাই কেন হবে? ওই যারা আগে টেররিস্ট ছিল ওরা ওদের দীক্ষা ভুলে যায়নি। দীক্ষা কি কেউ ভোলে? টেররিজম ছেড়েছে, কিন্তু ন্যাশনালিজম ছাড়েনি। তবে এটাও ঠিক যে ওরা এখন রাশিয়ার জয় চায়। সুতরাং ইংরেজের পরাজয় নয়।" ডাক্তার খোলসা করেন।

মানস এর পরে জিজ্ঞাসা করে,"আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব, আপনি তো নানান জেলায় জেলখানার ভিতরে গেছেন। সেটা আপনার ডিউটির সামিল। বাবলীর বন্ধু মঞ্জুলিকা সোম বলে একটি মেয়েকে কি দেখেছেন?"

"শুধু জেলখানায় কেন, বৈঠকখানায়ও দেখেছি। ওর বাবা ক্যাপটেন সিন্‌হা ছিলেন আমার সীনিয়র। আহা, অমন ভালো মানুষ আমি দেখিনি। কিন্তু মানুষ ভালো হলেই ডাক্তার ভালো হওয়া যায় না। আবার ডাক্তার ভালো হলে মানুষ ভালো হওয়াও নিশ্চিত নয়। যাক, জুলির কথা হচ্ছিল।" ঘটক স্মরণ করে বলেন, "ও হলো বিলেতফের্তা পরিবারের বিলেতফের্তা মেয়ে। ইংরেজদের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা একই কালে প্রেম-ঘৃণার সম্পর্ক। লাভ-হেট রিলেশনশিপ। সাহেব মেমদের ও যত বেশী ভালোবাসে তত বেশী ঘৃণা করে। সাইকোলজিক্যাল কেস।"

"এরকম কেস আপনি আর ক'টা দেখেছেন?" জানতে কৌতূহল হয় মানসের।

"শত শত। তার জন্যে বিলেত যেতে হয় না। ইংরেজী লেখাপড়া যারাই শিখেছে তারাই ইংরেজকে ভালোবেসেছে। কিন্তু বর্ণবৈষম্য যেই দেখেছে অমনি ইংরেজকে ঘৃণা করেছে। প্রত্যেকটি সার্ভিসেই বর্ণবৈষম্য। আপনিও ভুক্তভোগী, আমিও তাই। আপনার কথা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমার বয়স হয়েছে, প্রেম বা ঘৃণা কোনোটাই আমার হৃদয়ে এখন আর তেমন প্রবল নয়। যেমন ছিল ত্রিশ বছর আগে। ইংরেজের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারতুম। বাঙালী পলটনে যোগ দেবার জন্যে বাড়ী থেকে পালিয়েছি পরে ধরা পড়ে ফিরেছি। বাবার চেয়ে মায়ের বেশী অমত। একই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে আমার মেয়ে ঝরনার বেলা। সেও কি বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবে, পরে ধরা পড়ে ফিরবে? কী

জানি! আমার তো ভালো মালুম হচ্ছে না।" ডাক্তারের মুখ আঁধার হয়ে আসে।

মানস অভয় দেয়। "না, না, মেয়েরা একা পালিয়ে যায় না। গেলে আর কারো সঙ্গে যায়। ঝরনার সঙ্গে আর কেউ থাকলে তো!"

"আপনি আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলেন, মল্লিক সাহেব। আমি ভাবছি আর কে হতে পারে!" ঘটক বিদায় নেন।

ক্লাবটা শুধুমাত্র টেনিস খেলার জন্যে। সঙ্গে একটা লাইব্রেরী আছে, সেটা খুব মূল্যবান। সেখানে পাওয়া যায় এমন সব পুরানো ইংরেজী বই যা অন্যত্র দুর্লভ। যেমন গ্যেটের আত্মচরিত। টলস্টয়পত্নীর দিনলিপি। মানস নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। টেনিসের পরে লাইব্রেরীতে বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা। সেদিন আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

"আজ এত দেরি হলো যে?" যূথিকা কৈফিয়ৎ চায়।

"সিভিল সার্জনের মেয়ে ঝরনা ওয়াকি হতে চায়। মা শয্যাশায়ী। বাপ চিন্তিত। এই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল।" মানস জবাবদিহি করে।

সমস্ত শুনে যূথিকা বলে, "ঝরনা হচ্ছে এদেশের নিউ উওম্যান। শীলা তা নয়। শীলাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু ঝরনাকে শ্রদ্ধা করি। হাজার টাকার নীলাম্বর ও যদি দিয়ে থাকে তবে এটা ভালো বিয়ের জন্যে নয়, বিয়ে আদৌ নয়ের জন্যে। সোজা কথা মনের মানুষ না পেলে ও বিয়ে করবে না। আর মনের মানুষ তো চাইলেই মেলে না। অকস্মাৎ মিলে যেতেও পারে, যেমন মিলির বেলা। নয়তো অনন্তকাল প্রতীক্ষা করতে হয় শবরীর মতো।"

মিলির প্রসঙ্গ ওঠে। "দত্তবিশ্বাস কি মিলির মনের মানুষ? হা হা হা!" মানস হেসে উড়িয়ে দেয়। এসেছিল জুলিকে বিয়ে করতে। জুলি প্রত্যাখ্যান করে। তখন মিলিকে হাতের কাছে পেয়ে প্রস্তাব জানায়। মিলি সম্মতি দেয়।"

"কে জানে, ঝরনার জীবনেও ঘটনাচক্রের ঘটকালি ঘটতে পারে। আর না ঘটলেই বা কী? যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সুযোগ পায় ক'জন মেয়ে! তেমন একটা সুযোগ যদি আমার জীবনে আসত আমিও কি যেতে চাইতুম না? বিয়ে করেছি, মা হয়েছি, এখন আমার হাত পা বাঁধা।" আফসোস করে যূথিকা।

"সেই হোমারের যুগ থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সুযোগ পাচ্ছে মেয়েরা।" মানস গম্ভীরভাবে বলে, "কিন্তু ইলিয়াড মহাকাব্যের শুরুতেই দেখতে পাবে আকিলিসের সঙ্গে আগামেমননের নারীঘটিত বিবাদ। মেয়েরা ছিল যুদ্ধের প্রাইজ। একালের ওয়াকিদের নিয়েও যে এক অফিসারের সঙ্গে আরেক অফিসারের বিবাদ বাধবে না তা নয়। ঝরনাকে নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়তে পারে। এতদিন তো জানতুম গণিকাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হতো। এখন ওয়াকিদের কেন?"

যূথিকা ফিক করে হেসে বলে, "সোভিয়েট রাশিয়ায় শুনছি প্রমীলা বাহিনী আছে। প্রমীলারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নাৎসী যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধের প্রাইজ বলে বিবাদ বাধাবেন না তো?"

"বলা যায় না। ওরাও তো নিউ উওম্যান। তবে স্টালিন শুনলে রক্ষে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে কোতল। সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন হলে অন্য কথা ছিল। তিনি নিজেই হয়তো প্রমীলাদের প্রাইজ কেড়ে নিয়ে নিজের শোবার ঘর সাজাতেন।" মানস রুশদেশের ইতিহাস থেকে সম্রাজ্ঞীর প্রকৃতি বর্ণনা করে।

"রাশিয়া দেখছি সব ব্যাপারে এগিয়ে রয়েছে। স্টালিনের পরে একদিন হয়তো ডিকটেটর হবেন তেমনি জাঁদরেল এক মহিলা। পৃথিবীতে স্বর্ণযুগ আসবে। কিন্তু তার আগে যুদ্ধে জেতা চাই। লঙ্কার ওই প্রমীলা বাহিনী কি কিষ্কিন্ধ্যার বানরবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পারবে? আচমকা নাৎসী আক্রমণের পর থেকে ভাবছি সোভিয়েট সেনা কি ধাক্কা সামলাতে সক্ষম হবে?" যূথিকা গালে হাত দেয়।

"সেই আশঙ্কায়ই তো ইংরেজরা ছুটে গেছে রাশিয়ানদের মদত দিতে। এখনকার মতো ওরা

শত্রু নয়, মিত্র।" মানস বোঝাতে চায়।

"ইংরেজের মতো লাকি জাত কি আর আছে? সেই যে একটা প্রবাদ আছে, ইংরেজরা লড়ে শেষ ফরাসীটি পর্যন্ত। এবার লড়বে শেষ রাশিয়ানটি পর্যন্ত। এতদিন লড়া হয়েছে শেষ ভারতীয়টি পর্যন্ত।" যূথিকা পরিহাস করে।

"হাসির কথা নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজের মিটমাট হলে ভারতীয় সৈন্যরাও ছুটে যেত রাশিয়ানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে। মওলানা আজাদ তো বলে রেখেছেন তিনি দরকার দেখলে কন্‌স্ক্রিপশন করবেন। মানবভাগ্য নির্ভর করছে রুশজার্মান যুদ্ধের ফলাফলের উপরে। নাৎসীরা যদি জেতে তবে সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবে।" মানস এ নিয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তিত।

"কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট হলে এমন ঘটতে পারে যে ক্যাপটেন কৃষ্ণকলি ঘটক তাঁর উইমেন্স অক্‌জিলিয়ারি কোর নিয়ে কৃষ্ণসাগর পারে অবতীর্ণ হবেন। সব লাল হো জায়েগা নয়, সব কালা হো জায়েগা।" যূথিকা রঙ্গ করে।

"কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি মিটমাট কোনোদিন হবার নয়, জুঁই। সবাই এটা এতদিনে সমঝে গেছে। মাঝে রয়েছে মুসলিম লীগ। তাকে ডিঙিয়ে মিটমাট করতে গেলে সে খাস বিলেতের টোরি পার্টির সব চেয়ে রক্ষণশীল সদস্যদের কাছে দরবার করবে। ওঁরা সায় না দিলে এই অচল অবস্থার অবসান হবার নয়। ওঁরা সায় দেবেনও না, যদি না মুসলিম লীগ সায় দেয়। আর মুসলিম লীগের যা শর্ত তাতে কংগ্রেস কোনোদিন রাজী হবে না।" মানস খেদোক্তি করে।

"তা হলে ক্যাপটেন কৃষ্ণকলি ঘটকের ওয়াকিরা কৃষ্ণসাগরপারে যাচ্ছেন না। কোথায় যাচ্ছেন বলতে পারো? পদ্মার ওপারে দেখেছি চট্টগ্রাম বা আরাকান অভিমুখে সৈন্য চালনা। ক্যাপটেন লাহা তো সিঙ্গাপুরের কথাও বলেছিলেন। ওয়াকিরা কি তা হলে বঙ্গোপসাগর পার হবে? সেটা এমন কিছু দূর নয়। সিঙ্গাপুরে বিস্তর বাঙালী আছে। ঝরনার খবর আমরা তাঁদের কাছ থেকে পাব। প্রাণের ভয় নেই। ভয় যেটা সেটা ওই আকিলিসের সঙ্গে আগামেমননের কাড়াকাড়ির। শুম্ভ নিশুম্ভতে মিলে তিলোত্তমাকে ওরা দু'টুকরো না করে। তবে সান্ত্বনা এই যে তিলোত্তমা এক্ষেত্রে একজন নয়, একদল।" যূথিকা হাসি চাপে।

"একবার মিসেস ঘটকের সঙ্গে দেখা করলে হতো না?" মানস বলে।

"নিশ্চয়। কিন্তু ঝরনার পক্ষ নেব।" যূথিকা উত্তর দেয়।

ঝরনা আর ওর মা দু'জনেরই ধনুর্ভঙ্গ পণ। ঝরনা ওয়াকি হবে, নয়তো গৃহত্যাগ করবে। ওর মা ওকে ওয়াকি হতে দেবেন না। হলে দেহত্যাগ করবেন। ওয়াকিদের সম্বন্ধে যূথিকার ধারণা স্পষ্ট নয়। ওরা কি অফিসারদের মন জোগাতে গিয়ে খারাপ হয়ে যাবেই, ভালো থাকতে পারবে না? তাই যদি হয়ে থাকে তবে তো মিসেস ঘটকের আপত্তির কারণ আছে। কী করে সে আপত্তি খণ্ডন করা যায়? অথচ ঝরনাকেও আগে থেকে সন্দেহ করা অনুচিত। সে গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। বেশী কথা বলে না। লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে নিয়ে পড়ে। সীরিয়াস বিষয়ের বই। মাঝে মাঝে টেনিস খেলতে আসে। কব্‌জির জোর আছে। ওর রাজনৈতিক মতামত কাউকেই জানতে দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চায়, এর থেকে ধরে নেওয়া যায় না যে সে সাম্রাজ্যবাদী। বাঙালীদের একটা পুরানো নালিশ তাদের সৈন্যদলে নেওয়া হয় না, অসামরিক জাতি বলে অবজ্ঞা করা হয়। সেই অপবাদ ক্ষালনের জন্যেও বহু যুবক সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছে। তাই বলে কি তারা সাম্রাজ্যবাদী? মেয়েরা যখন ছেলেদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করছে তখন ওয়াকি দলে ভর্তি হওয়াও তো সমান অধিকারের পর্যায়েই পড়ে।

"মাসিমা," যূথিকা ডাক্তার গৃহিণীকে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধে, "আপনি শয্যাশায়ী শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে দেখতে এসেছি।"

"তোমরা সবাই ভালো আছো তো, মা?" তিনি উঠে বসেন।

"আপনার আশীর্বাদে ও ডাক্তার সাহেবের সৌজন্যে।" যূথিকা ভদ্রতার খাতিরেই বলে। কল্প দেবার সময় দেয় দাশরথিবাবুকে। এই স্টেশনে আগে যেবার এসেছিল তখন থেকেই চেনাশোনা।

"আমি এখন মহাবিপদে পড়েছি। সবই আমার নিজের কর্মফল। আমার ছোট মেয়েকে আমি ষোল বছর বয়সেই পরের ঘরে দিতে পারতুম। পাত্রপক্ষই ঝোলাঝুলি করছিল। আমি তখন অন্ধ। ঝরনা আমার কোলের মেয়ে। ও যদি পরের ঘরে যায় আমার কোল খালি হবে। তখন কি জানতুম যে দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষছি! যে আমাকেই দংশন করবে। আমার সর্বাঙ্গ এখন বিষের জ্বালায় জ্বলছে। কে আমাকে বাঁচাবে। কেউ পারবে না। তুমিও না। এই শয্যাই আমার শেষ শয্যা। ডাক্তারের ডাক্তারি বাইরে। ঘরে কি ওঁর ক্ষমতা আছে? ক্ষমতা থাকলে ওই সোমত্ত মেয়ের বিয়ে দিতেন না? ধারকর্জ করে প্রোভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তুলে ও মেয়েকে যেমন করে হোক পাত্রস্থ করা চাই। মেয়েমানুষের প্রকৃত স্থান বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, ছেলের বাড়ী। তা তো নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। বলি, যুদ্ধক্ষেত্রে কি কেউ চিরকাল থাকে? বছর দু'তিন বাদে ফিরে আসতে হবে না? তখন কে ওকে বিয়ে করবে? চাকরিই বা জোগাবে কে? সরকার কি তেমন কোনো ভরসা দিচ্ছে? আর এরা যদি যুদ্ধে হেরে যায় তা হলে এদের দেওয়া ভরসার কি মূল্য আছে!" শেষের কথাগুলি তিনি ফিস ফিস করে বলেন।

ভদ্রমহিলা সত্যিই বিপন্ন। তবে শয্যাশায়ী বলে অনাহারে জীর্ণশীর্ণ নন। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। শুয়ে শুয়েই তিনি ঘরসংসার চালান। তাঁর হাঁক ডাক শুনে ঝি চাকর ছুটে আসে। ফরমাস খাটে। যূথিকার জন্যে সন্দেশ ও সরবৎ এসে হাজির।

"নিজের সন্তানকে আপনি কালসাপ বলছেন, শুনে দুঃখ পেলুম, মাসিমা। এ সন্দেশ কি আমার গলা দিয়ে নামবে? আপনি এত অসহিষ্ণু কেন? আরো কত মেয়ে ওয়াকি হচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া মানে প্রাণ দিতে যাওয়া নয়। মেয়েদের যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্বে রাখা হবে। যেমন ডাক্তার ও নার্সদের। আর একালের মেয়েদের প্রকৃত স্থান কি কেবল রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘর আর ঠাকুরঘর? দিনকাল বদলে গেছে। মেয়েরা এখন জেলে যাচ্ছে, মন্ত্রী হচ্ছে, আপিস করছে, মোটর চালাচ্ছে।" যূথিকা তর্ক করে।

মিসেস ঘটক চুপ করে থেকে বলেন, "আমারই নিজের কর্মফল। দুটি মেয়ে হওয়ার পর আমি আশা করেছিলুম তার পরেরটি হবে ছেলে। হলো আবার মেয়ে। তখন সেই মেয়েকেই ছেলের মতো করে মানুষ করি। হাফ প্যান্ট পরে ইস্কুলে যায়, দৌড়ঝাঁপ করে। খেলাধূলায় চ্যাম্পিয়ন। যেখানেই বদলী হন ওর বাবা ওকে টেনিস খেলার জন্যে ক্লাবে নিয়ে যান। টেনিসে ওকে হারিয়ে দেয় কার সাধ্যি? তোমাদের এখানে আসার আগে একজন অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসে একবছর ছিল। রোজ টেনিস খেলতে খেলতে ওদের দু'জনের মধ্যে এমন ভাব হয় যে আমরা তো ধরে নিই এইবার আসছে বিবাহের প্রস্তাব। ওমা, কোথায় প্রস্তাব। ও ছেলে ধরাছোঁয়া দেবার নাম করে না। বিলেতে বহুকাল কাটিয়েছে। কত মেয়ের সঙ্গে টেনিস খেলেছে। ঝরনা নাকি ওর সেইরকম এক গার্লফ্রেণ্ড। শুনে আমার সর্বাঙ্গ শরীর রাগে রি রি করে। গার্লফ্রেণ্ড কী। ছেলেতে মেয়েতে ফ্রেণ্ডশিপ হতে পারে কখনো। তোমার বিলেতে কী হয় তা কি আমরা জানিনে? খবরদার! আমি বলি, খবরদার, ঝুনু, খবরদার, তুই ওই বাঁদরের সঙ্গে মিশিস্‌নে। বাঁদরের গলায় মুক্তার হার। সেই থেকে মেয়ের আমার মুখ ভার। ভালো করে কথা বলে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। টেনিসও যে নিয়মিত খেলতে যায় তা নয়। কালেক্টর সাহেবের মেম ওকে বার বার ডেকে পাঠান। উনিও টেনিসের ভক্ত। কিন্তু যাবে না। উনি তো ওর বয় ফ্রেণ্ড মনোজ্ঞ বাগচী নন।"

"টেনিসে আমারও অনুরাগ ছিল, মাসিমা। কিন্তু কাচ্চাবাচ্চাদের সঙ্গ দেওয়া তার চেয়েও জরুরি।

আমরা নিজেদের কুঠিতেই ব্যাডমিন্টন খেলি। আমরা মানে আমি আর আমার প্রতিবেশিনীরা। ঝরনাকেও নিমন্ত্রণ করেছি। ও একদিন কি দু'দিন গিয়ে আর ওমুখো হয়নি। ওর সমকক্ষ থাকলে তো যাবে। এখন বুঝতে পারছি ও চায় পুরুষ প্রতিপক্ষ। কিংবা পুরুষ পার্টনার। আমরা তো পুরুষদের খেলতে ডাকিনে। আমার স্বামীকেও না। এখন বোঝা যাচ্ছে ঝরনা কেন ধরাছোঁয়া দেয়নি। সত্যি, আপনাদের ভাবনার কারণ আছে। তা বলে অমন করে মেয়েটাকে পর করে দেবেন না। বিয়ের পরে তো এমনিতেই পর হয়ে যাবেই। যে দু'দিন বাপের বাড়ীতে আছে মা বাপের সঙ্গে মনের সুখে থাকুক। আপনি ওর সঙ্গে মিটমাট করে ফেলুন, মাসিমা। ইচ্ছে থাকলে উপায় থাকে। ওয়াকি সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল নই, হ্যাঁ কি না কোনোটাই বলব না। কিন্তু যুদ্ধের হিড়িকে কতরকম চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে। একটা না একটা জুটে যেতে পারে। তবে তার জন্যে কলকাতার ঝি দিল্লীতে যেতে হবে। মেয়েকে আপনারা চোখে চোখে রাখতে পারবেন না। সে কার সঙ্গে মিশবে? মিশলে তা আপনাদের এলাকার বাইরে। শাস্ত্রেই তো লিখেছে বিবাহের বয়স হলে পিতা যদি কন্যার বিবাহ দিতে না পারেন তবে কন্যা নিজেই নিজের পতি বরণ করবে।" যূথিকা পথনির্দেশ করে। মুখ ফুটে বলে না যে সে আপনি তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।

"ওসব বিলিতী প্রথা এদেশে চলবে না, মা যূথিকা। আমরা জাতকুল গণগোত্র মানি। মনোজ্ঞ বাগচীর বেলা সামান্য ব্যতিক্রম হতো। ওরা বারেন্দ্র, আমরা রাঢ়ী। ঝরনা যদি আমাদের মুখ হাসায় আমরা ওকে ত্যাজ্য কন্যা করবো।" ডাক্তার গৃহিণী কঠোর কণ্ঠে বলেন।

যূথিকা মর্মে ব্যথা পায়। ত্যাজ্য কন্যা সে নিজেও তো হয়েছে। কিন্তু সেকথা জানায় না। বেচারি ঝরনার ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যাকুল হয়। পরের দিন ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে ঝরনাকে আসতে দেখা গেল যূথিকাদের কুঠির লন্-এ। অনেকদিন বাদে দেখা।

"কী ভাই? কেমন আছো?" যূথিকার প্রশ্ন।

"শারীরিক ভালো। মানসিক ভালো নয়। শখ্ করে যদি কেউ ইনভ্যালিড হয় তবে তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে আটকা থাকা কি খুব সুখের?" ঝরনার উত্তর।

"তা হলে তুমি আজ ছাড়া পেলে কী করে?" যূথিকা আশ্চর্য হয়।

"আপনার সুবাদে। আপনি কাল মাকে কী বলেছেন জানিনে। ফলে তাঁর সুর অনেকটা নরম হয়েছে। আমাকে উনি ওয়াকি হতে দেবেন না, কিন্তু কলকাতা গিয়ে অন্য কোনো চাকরির জন্যে চেষ্টা করতে দেবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে দেবেন না, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যেতে দেবেন। শুনেছি যুদ্ধের প্রয়োজনে কলকাতাকে কেন্দ্র করে রকমারি অসামরিক বিভাগ খোলা হচ্ছে। ফ্রন্টে যেতে হবে না। ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। মিসেস গোস্বামী আমাকে সুপারিশ করে কয়েকজনের নামে চিঠি দিচ্ছেন। আপনিও কি — " ঝরনা ইতস্তত করে।

"আলবৎ। তোমাকে সুপারিশ করব না তো কাকে করব? এ শহরে তোমার মতো যোগ্য আর কে আছে? তোমার অক্ষমতা তো এই যে তুমি পুরুষ নও, নারী। কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে। নারীও পুরুষের সঙ্গে সমান। তোমাকে আমি মিলিটারি ইউনিফর্মে দেখলেও অবাক হতুম না। তা সিভিল ইউনিফর্মই ভালো। মা বাপের মনে কষ্ট যদি দিতেই হয় তবে এখন এই ইস্যুতে নয়। পরে আর কোনো ইস্যুতে।" যূথিকা দুষ্টু মিষ্টি হাসি হাসে।

"তেমন কোনো ইস্যুর সম্ভাবনা নেই, যূথিকাদি।" ঝরনা রঙিন হয়ে বলে, "বাঙালীর ছেলেরা দারুণ সেয়ানা। অবশ্য মানসদা বাদে।"

যূথিকা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, "মানসদার মতো বোকাসোকা ছেলে আমরা অনেক আছে। তোমাকে ছাড়তে হবে শুধু জাতের অহঙ্কার, কুলের গরব। কেন, বাঙালী ছাড়া কি আর বর হয় না? যে তোমাকে ভালোবাসবে, যাকে তুমি ভালোবাসবে সেই তোমার বর। সীতার মতো তোমার চারদিকে

গণ্ডী আঁকার অধিকার কোন্ লক্ষ্মণের আছে? সেই গণ্ডীর ভিতরেই জীবনসঙ্গী বরণ করতে হবে, তাও করে দেবেন গুরুজন, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও এক প্রকার যুদ্ধ। এই ইস্যুতে আপস করতে নেই। বাপ মা ত্যাজ্য কন্যা করলেও না।'' যূথিকার হাসি মিলিয়ে যায়।

ওয়াকির প্রস্তাবটা এসেছিল মিস্টার গোস্বামীর কাছ থেকে। এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর। সরকারী কাগজপত্র তাঁর দফতরে পৌঁছেছিল। দিল্লী থেকে কলকাতা হয়ে। ভারত সরকার ভারতে যুবকযুবতীদের জন্যে এক এক করে সব ক'টা দরজা খুলে দিচ্ছেন। সাড়াও পাচ্ছেন সব ক'টা প্রদেশ থেকে। ওয়াকিতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদেরই সাড়া বেশী। ফ্রন্টে যেতে ওদের ভয়ডর নেই। না প্রাণের ভয়, না চরিত্রের ভয়। শত শত ইণ্ডিয়ান অফিসার ফ্রন্টে যাচ্ছে, তারা যদি ইণ্ডিয়ান মহিলাদের সাহচর্য না পায় তবে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাদের সাহচর্য পাবে। কেউ কেউ বিয়েও করবে।

শহরের গণ্যমান্যরা প্রাচীনপন্থী। সিভিল সার্জনের মেয়ে যে পুরুষদের সঙ্গে টেনিস খেলতে যায় এটাও তাঁরা সুনজরে দেখেন না। কিন্তু আগে থেকে এর নজির আছে। মিসেস গোস্বামীও তো মাঝে মাঝে খেলতে আসেন। স্বাস্থ্যের জন্যেই টেনিস খেলা। আমোদের জন্যে নয়। পাষাণ প্রতিমার মতো মুখ। কথা বলেন খুব কম। হাসি পেলে হাসি চেপে রাখেন। ঝরনারও সেই ধরণধারণ। প্রাচীনপন্থীদের এটা গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু ওয়াকি! সর্বনাশ!

।। পাঁচ ।।

কথা ছিল মিলি লণ্ডনে গিয়ে বেডফোর্ড কলেজে জুলির জায়গায় ভর্তি হবে। কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষ তাতে রাজী নন। বলেন নতুন করে দরখাস্ত করতে ও একবছর অপেক্ষা করতে। একবছর পরে ব্রিটেনের উপর আকাশযুদ্ধ। প্রাণ বাঁচাবে না পড়াশুনায় মন দেবে? প্রাণ বাঁচানো বলতে কেবল নিজেরটি বোঝায় না। মিলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ত্রাণকার্যে যোগ দেয়। দেশে থাকতে ওর সেবাকর্মের অভিজ্ঞতা ছিল। সহজেই নাম করে। এমনিতেই ও মেয়ে অসমসাহসী। সাইরেন শুনে ও শেলটারে ঢোকে না। যেখান থেকে ডাক আসে সেখানে ছুটে যায়। জখমীদের নিয়ে যায় হাসপাতালে।

সুকুমার গা বাঁচিয়ে চলে। ওর সুটের ক্রীজ নষ্ট হবে এটাই ওর কাছে উদ্বেগের বিষয়। তবে ও নীরব দর্শক নয়। বি.বি.সি'র ইণ্ডিয়ান সার্ভিসে ওর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকদের কর্তব্য এই যুদ্ধে মিত্র পক্ষের জয় কামনা করা। ভুল, ভুল, অত্যন্ত ভুল এই ধারণা যে ইংলণ্ডের দুর্যোগ হচ্ছে ভারতের সুযোগ। কে বাঁচবে, যদি ইংলণ্ড মরে? কে মরবে, যদি ইংলণ্ড বাঁচে?

ওর আফসোস মিলি ওর ব্রডকাস্ট শোনে না। বলে, ''ব্রিটিশ প্রোপাগাণ্ডা আমি শুনতে চাইনে। জিতবে ওরা ঠিকই, কিন্তু জয়ের ভাগ ভারতকে দেবে না। তা বলে আমরা ওদের দুর্যোগের সুযোগ নিতে চাইনে। সেটা অধর্ম হবে। ওরা প্রাণের দায়ে লড়ছে। তা তো আমি স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। হিটলারের পায়ে আত্মসমর্পণ করলে বেঁচে যেত। কিন্তু তেমন বাঁচা কি মরার চেয়ে খারপ নয়? চার্চিল তাঁর দেশবাসীর অপরাজেয় আত্মা। ধন্য তাঁর নেতৃত্ব। কিন্তু এটাও আমি জানি যে আমরা যদি তাঁর মামার দেশের মতো স্বাধীনতার জন্যে লড়তে না পারি তো অন্য কোনো উপায়ে স্বাধীন হতে পারব না। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধই অন্যান্য উপনিবেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের আদর্শ। দেশ এর জন্যে তৈরি নয়।''

সুকুমার লেবার পার্টির সর্দারদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের ভজায় যে ভারত তার সমস্ত শক্তি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে মুখিয়ে রয়েছে, যদি কংগ্রেস নেতাদের অগৌণে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর বড়লাটের শাসন পরিষদকে ব্রিটেনের মতো ওয়ার ক্যাবিনেটে পরিণত করা হয়। স্বাধীনতা

এই মুহূর্তে কেউ চাইছেন না। সেটা সবুর করতে পারে। সুকুমারের বিশ্বাস লেবার পার্টির চাপে চার্চিল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যে দূত পাঠাবেন।

মিলি ওর কথায় কান দেয় না। বলে, "অমন একটা পাপেট গভর্নমেন্ট যদি কংগ্রেসের নেতারা গঠন করেন তো দেশের লোক ছি ছি করবে।"

আকাশযুদ্ধে নাৎসীরা জয়ী হয় না। হিটলার উপলব্ধি করেন যে আকাশ পথে ব্রিটেন আক্রমণ করা নিষ্ফল। করতে হবে সমুদ্রপথে আক্রমণ। কিন্তু নৌযুদ্ধে কি ব্রিটেনকে পরাস্ত করা সম্ভব, যতদিন না জার্মানীর জাহাজের সংখ্যা ও শক্তি বাড়ে? তার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে যুদ্ধের মোমেন্টাম নষ্ট হবে। মোমেন্টাম বজায় রাখতে হলে অবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে রাশিয়ার উপরে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। একটার নাম তো সোভিয়েট ইউনিয়ন। অন্যটার নাম বোলশেভিক বিপ্লব। দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি মান্য করতে জার্মানী ন্যায়ত বাধ্য। কিন্তু দশ বছর সময় পেলে যে বিপ্লব চিরস্থায়ী হবে, সে এক দারুণ ঝুঁকি।

জার্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করার পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মিলির বিশেষ কিছু করবার থাকে না। সকলেই বলাবলি করে যে এ যাত্রা ফাঁড়া কেটে গেছে। যা শত্রু পরে পরে। হিটলার আর এ মুখো হবে না। হলে নেপোলিয়নের মতো ওয়াটারলু। আপাতত রাশিয়াকে মদত দেওয়াই সুবুদ্ধি। ইংরেজের হয়ে ওই লড়বে।

যূথিকাকে লেখা মধুমালতীর চিঠিতে এসব তো ছিলই, ছিল আরো অনেক কথা। ওয়াটারলুর আগে ইংরেজরা তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে ঢিলে দেবে না। উৎপাদন জোর কদমে চলছে। কেউ বেকার নয়। ধর্মঘট স্বপ্নের অতীত। কেউ কারো চেয়ে বেশী খেতে পায় না, এমনি কঠোর রেশন প্রথা। যা রেশনে দেয় তাতে পেট না ভরলে তুমি যে শিকার করে পেট ভরাবে তারও জো নেই। এক মন্ত্রীর চাকরি গেল একটা না দুটো খরগোস শিকার করতে গিয়ে। পোশাক সম্বন্ধেও কড়াকড়ি। পোশাকেই তো উচ্চনিচ ভেদ বোঝা যেত। সেটা যাতে না বোঝা যায় সে ব্যবস্থাও হচ্ছে। লিখিতভাবে না হলেও অলিখিভাবে এটাও একপ্রকার সাম্যবাদ। বোলশেভিকদের মদত দিতে যাওয়াও তো একহিসাবে সাম্যবাদকে স্বীকৃতি দেওয়া। শ্রেণীবৈষম্য ক্রমেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাচ্ছে। ধনীদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে বলা চলে না, কিন্তু গরিবদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে। ঘর বাড়ীর অভাব, এটাই ওদের সব চেয়ে জোরালো অভিযোগ।

চিঠির বয়ান শুনে মানস চমৎকৃত হয়। কিন্তু ওর যা স্বভাব। সমালোচনা করবেই। মিলিকে চিঠি লিখলে জিজ্ঞাসা করবে, "মদটা কি কেউ কম খাচ্ছে?"

"যুদ্ধের অনুরোধে মানুষ সব পারে। ওটাই বা না পারবে কেন?" যূথিকার প্রশ্ন।

"ইতরভদ্র সকলের মধ্যেই ওর ব্যাপক প্রচলন। অমন লাভজনক ইণ্ডাস্ট্রি আর নেই। যদি না অস্ত্রশস্ত্রের নির্মাণকে তার মধ্যে ধরো।" মানস ক্ষীণ হাসে। "তবে আছেন ওদের মণ্টগোমরির মতো সেনাপতি। যিনি সুরা স্পর্শ করেন না।"

"হিটলারও সুরা স্পর্শ করেন না, শুনেছি।" যূথিকা বলে।

"লোকটার গুণ আছে। শুনেছি একান্ত ভদ্র। সম্পূর্ণ সৎ। কতকগুলো নৈতিক গুণ না থাকলে মানুষ শ্রদ্ধা করবে কেন? তা বলে গোঁয়ারতুমিটা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দুই ফ্রণ্টে লড়াই করতে বিসমার্ক পর্যন্ত বারণ করে গেছেন। দুই ফ্রণ্টে লড়াই করতে গিয়ে কাইজারের হার হলো। হিটলার কি বিসমার্কের চেয়েও বুদ্ধিমান? বলতে পারো পশ্চিমমুখে আর এগোনোর উপায় ছিল না।" মানস স্বীকার করে।

যুদ্ধটা নতুন এক মোড় নেওয়ায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জল্পনাকল্পনার সীমা ছিল না। কে জিতবে?

জার্মানী না রাশিয়া? জার্মানীর পক্ষেও বেশ কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা একটু চাপা গলায় বলেন, "মস্কো দূর অস্ত্ নয়। ইংরেজদের সাধ্য নেই যে মস্কোতে গিয়ে যুদ্ধ করে।" তার সঙ্গে জুড়ে দেয় "আর মস্কোই তো রাশিয়ার মাথা। মাথা কাটা গেলে কি ধড়টা বাঁচতে পারে?"

ভাবনার কথা বইকি। মানস রোজ রাত্রে তার কুঠির চারদিকের প্রশস্ত বারান্দায় পায়চারি করতে করতে পাক খায়। তার পরে প্রশস্ত লনের এক প্রান্তে ডেকচেয়ার পেতে আকাশের দিকে চেয়ে চিন্তা করে। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' মনে পড়ে। রুশরা আবার মস্কোর ঘরবাড়ী দোকানপাট পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে শহর খালি করে দিয়ে যাবে। নাৎসীরা এককোঁটা জলও খেতে পাবে না। একটি মানুষও সহযোগিতা করবে না। রুশদের এই 'পোড়া মাটি' নীতি অপূর্ব ও অনন্য। জার্মানরা দখল করতে পারে, কিন্তু ভোগ করতে পারবে না। নিজেরাই নাকাল হবে।

কিন্তু মজার কথা, রুশ কমিউনিস্টরা এই বিপদে মার্কস এঙ্গেলসের শরণ নিচ্ছেন, স্মরণ করছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল সেনাপতি কাউণ্ট সুভোরোভকে। সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের প্রিয়পাত্র। বিপ্লবী ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠানো হয়েছিল যাঁকে ইটালীতে তিনিই কিনা হবেন বিপ্লবী রুশ সৈন্যের পূর্বসূরী। করতে হবে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ। সাম্যবাদ নয়, জাতীয়তাবাদই এখন যুদ্ধের প্রেরণা।

কখন কোন্ তাসখানা খেলতে হয় স্টালিন সেটা জানেন। তাই জাতীয়তাবাদের তাসখানা খেলছেন। ফলে স্বদেশের বুর্জোয়াদের সহযোগিতা পাচ্ছেন। আর বিদেশী জাতীয়তাবাদীদেরও। রুশ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের মিতালি গতবারের মহাযুদ্ধেও বিদ্যমান ছিল। জাতীয়তাবাদী হিসাবেই রুশরা কম বিপজ্জনক, সাম্যবাদী হিসাবে বেশী। নইলে চার্চিল কেন সাহায্য পাঠাবেন? ক্রিপ্স তো মস্কোতেই বসে আছেন। স্টালিনকে তিনিই সতর্ক করে দেন যে হিটলারের ফৌজ আক্রমণ করতে উদ্যত। স্টালিন তো প্রথমটা বিশ্বাসই করতে চাননি। পরে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন। ওরা নাই বা হলো কমিউনিস্ট। ফাউস্ট তো শয়তানের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছিলেন।

স্বপনদা গ্যেটের 'ফাউস্টে'র মতো একখানা ক্লাসিক লিখতে ইচ্ছা করেছেন। তাঁর হাতে সেটা হয়তো নেবে উপন্যাসের রূপ। হবে শুধু যুগোপযোগী নয়, দেশোপযোগী। এর জন্যে তাঁকে খুব ভাবতে হচ্ছে। ছোটখাটো একটা গ্রুপের পত্তন করেছেন। মানস যদি মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে গ্রুপের আড্ডায় যোগ দেয় তো খুশি হবেন। ওঁর ওখানেই উঠবে।

স্বপনদা লিখেছেন, "যুদ্ধ তো ক্রমেই বিশ্বযুদ্ধের আকার ধারণ করছে হে! তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেখানেই যুদ্ধক্ষেত্র। তোমাকে প্রত্যক্ষদর্শনের জন্যে দূর দেশে যেতে হবে না। জানো তো, আমি ফেটালিস্ট। কপালে যদি মরণ লেখা থাকে তো ঘরে বসেই মরব। পালিয়ে বাঁচব না। আর পালাবই বা কোথায়? ওদিক থেকে তেড়ে আসছে নাৎসীরা। রাশিয়ানরা যদি রুখে না দাঁড়ায়, শহরকে শহর ছেড়ে দেয় তবে জার্মানরা ককেশাস পেরিয়ে ইরানে ঢুকবে। তার পর ভারতে। এদিকে যদি জাপানীরা এসে হানা দেয় তবে ইংরেজরা কেমন করে দুই দিক সামলাবে? ইতিমধ্যে বিস্তর ব্রিটিশ সৈন্য আমদানী হয়েছে, কিন্তু কাদের সঙ্গে লড়তে এসেছে তারা? বিদ্রোহী ভারতীয়দের সঙ্গে নয় তো? যাক, আমি বাপু, এর মধ্যে নেই। কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধে যোগ দিলেও আমি রণছোড়। ল্যাণ্ডর যা বলেছেন আমিও তাই বলি, একটুখানি বদলে দিয়ে —

"I strove with none; for none was worth my strife
Woman I loved and, next to Woman, Art."

আজকের দিনে কিছুই নিশ্চিত নয়। জীবনও নয়, সম্পত্তিও নয়, সভ্যতাও নয়, সংস্কৃতিও নয়। নিশ্চিত বলতে সত্যি যদি কিছু থাকে তবে সেটা হলো ধর্ম। গীতা উপনিষদ্, বাইবেল কোরান, বৌদ্ধ ও জৈন

ধর্মগ্রন্থ, পার্শীদের আবেস্তা। কিন্তু আমরা যারা আর্টিস্ট বা ইনটেলেকচুয়াল তাদের মন মেজাজ সংশয়বাদীর। তাই আমাদেরই এত মাথাব্যথা। চাষী বা মজুর হলে বলতুম, গোল্লায় যাক সভ্যতা, ধ্বংস হোক সংস্কৃতি, মা কালী তো থাকবেন, আর শিবলিঙ্গ। এঁদের কি বিনাশ আছে? না, এঁরা আদিম যুগ থেকে রয়েছেন, অন্তিম যুগ পর্যন্ত থাকবেন। তবে যুদ্ধ করতে করতে মানুষ জাতিটাই যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে এঁদেরও বিলোপ ঘটবে। ধর্ম এক্ষেত্রে অসহায়। মানুষ জাতির অন্তর্ধানে ধর্মেরও অন্তর্ধান।"

স্বপনদা ও দীপিকা বৌদি স্থির করেছেন যে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি নিরীহ মানবশিশুকে এ জগতে আনবেন না। যুদ্ধ শেষ হলে পরে ওকথা ভাবা যাবে। এই সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের কম কষ্ট হয়নি। কিন্তু আরো কষ্ট হতো যদি যুদ্ধের বিভীষিকার মাঝখানে এত বড়ো একটা দায়িত্ব নিয়ে হিমশিম খেতেন।

স্বপনদার চিঠির শেষের দিকে ছিল আসল কথা। "তার পর, শোন, শুনে হেসো না। আমরা যদিও টুলী স্ট্রীটের তিন দর্জি তবু আমাদেরও একটা ম্যানিফেস্টো চাই। মার্কস এঙ্গেলস যখন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা করেন তখন তাঁরা ক'জন ছিলেন? সেদিনকার সেই ক্ষুদ্রতম বীজ আজ এক বিশাল বটবৃক্ষ। মাঝখানে এক শতাব্দী ব্যবধান। আমাদেরও দিন আসবে। এ শতাব্দীতে নয়, একবিংশ শতাব্দীতে। অবশ্য মানবজাতি যদি আত্মঘাতী না হয়। আমরা যা ঘোষণা করতে চাই তা সংক্ষেপে এই যে, একজন মানুষ কেবল বাঙালী নয়, সে ভারতীয়। সে কেবল ভারতীয় নয়, সে মানুষ। মানুষহিসাবে সে সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকারী। সমগ্র বিশ্ববিজ্ঞান, বিশ্বদর্শন, বিশ্বসাহিত্য, বিশ্বসংস্কৃতিই তার উত্তরাধিকার। তাকে তার এই উত্তরাধিকার সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। তার সঙ্গে নিজেরও কিছু যোগ করতে হবে। যোগফল দিয়ে যেতে হবে উত্তরপুরুষের হাতে। এটা প্রাচ্য ওটা পাশ্চাত্য এ গণনার দিন গেছে। এটা ভারতীয় ওটা অভারতীয় এ গণনাও অবাস্তব। এখনকার গণনা হচ্ছে কোন্‌টা মানবিক, কোন্‌টা অতিমানবিক, কোন্‌টা অমানবিক। আমরা মানবিকবাদী। বন্ধুরা তার পূর্বে একটা বিশেষণ জুড়ে দিতে চান। উদার মানবিকবাদী। লিবারল হিউমানিস্ট। পার্থক্য সূচনা করতে আর একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে। তাঁরা র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট।"

যূথিকা জিজ্ঞাসা করে, "টুলী স্ট্রীটের তিন দর্জি মানে কী?" মানস হেসে বলে, "কোনো এক অখ্যাত শহরের অখ্যাত রাস্তার তিনজন অখ্যাত দর্জি এক ইশতাহার জারি করেছিল। তাতে ছিল উই দ্য পীপল অভ্ ইংল্যাণ্ড।"

"কিন্তু স্বপনদা তো অখ্যাত শহরের অখ্যাত রাস্তার অখ্যাত দর্জি নন। ওঁর নাম একালের বাঙালী পাঠকরা সবাই জানে।" যূথিকা তাঁর পক্ষ নেয়।

রাত অনেক হয়েছে। মানস তার অভ্যাসমতো তার কুঠির চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দায় পায়চারি করার পর বাইরের প্রশস্ত লনে মুক্ত আকাশের তলে ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে। দৈনন্দিন কাজকর্ম চুকিয়ে দিয়ে এই সময়টায় সে উর্ধ্বতর ভাবনাচিন্তায় বিভোর হয়। খুব দেরি দেখলে যূথিকা তাকে ডাকতে আসে।

"দ্যাখ জুঁই, স্বপনদা আর আমি এক পথের পথিক হলেও পুরোপুরি একমত নই। ঈশ্বর যদি না থাকেন, অমরত্ব যদি না থাকে তবে বাকী থাকে প্রকৃতি আর মানবজাতির পার্থিব ভবিষ্যৎ। কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষ কতটুকু নির্ভর করতে পারে? ভূমিকম্প বা মহাপ্লাবন বা তুষারপ্রবাহ বা সৌরজগতের দূরবর্তী ঘটনা যে-কোনোদিন মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তা ছাড়া এটাও তো সম্ভব যে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে উষ্ণতা হারাবে। তখন প্রাণধারণ করাই কষ্টকর হবে। হিউমানিস্টরা ধরে নিয়েছেন যে প্রকৃতি চিরকাল প্রাণের অনুকূল থাকবে ও মানবজাতির বিকাশ সর্বতোমুখী হবে। এই দুটি ধারণার উপর স্বপনদারা আর একটি ধারণা স্থাপন করতে যান। সেটা 'লিবারল' জীবনদর্শন। কারো সঙ্গে দ্বন্দ্ব

থাকবে না। না ধনিকদের সঙ্গে, না শ্রমিকদের সঙ্গে। না জমিদারদের সঙ্গে, না চাষীদের সঙ্গে। হিংসা দূরের কথা, অহিংসাও সংগ্রামের উপায় হবে না। আইনসঙ্গত উপায়ে যতদূর হবার ততদূর হবে। কী করে ওঁর সঙ্গে একমত হই, বলো?'' মানস চিন্তান্বিত।

''ঈশ্বর আর অমরত্ব, এ দুটি কি আরো গোড়ার জিনিস?'' যূথিকা সুধায়।

''হ্যাঁ, জুঁই। সেই উপনিষদের যুগ থেকেই মানুষ এ দুটিকে মূলগত প্রশ্ন বলে উত্তরের অন্বেষণ করে এসেছে। এই অনিশ্চিত বিশ্বে এই দুটি নিশ্চিতি যদি না থাকে তবে জীবন অর্থহীন।'' মানস কাতরকণ্ঠে বলে।

যূথিকা তার স্বামীর হাতে হাত রেখে মিষ্টি সুরে বলে, ''তা তুমি রোজ রাত্রে আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে কিসের উত্তর খুঁজে পাবে, মানস? একটি কবিতা মনে পড়ছে। শোন। ফ্রান্সিস টমসনের লেখা।''

এই বলে সে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে —

''O world invisible, we view thee,
O world intangible, we touch thee,
O world unknowable, we know thee,
Inapprehensible, we clutch thee,
Does the fish soar to find the ocean,
The eagle plunge to find the air —
That we ask of the stars in motion
If they have rumour of thee there?''

মানস নীরবে শুনে যায়। এটি তার নিজেরও একটি প্রিয় কবিতা। জানত না যূথিকার কণ্ঠস্থ।

''এইরকম একটি ভাব কবিরের দোঁহাতেও মেলে। 'পানীমে মীন পিয়াসী।' চারদিকে জল, মাছ তবু জলের জন্যে তৃষিত। আমরা ঈশ্বরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বেঁচে আছি। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি আছেন ও তিনি আছেন বলেই আমরা আছি।'' যূথিকা বলে যায়, ''তোমার যা হয়েছে তার নাম বিশ্বাসের সঙ্কট। তুমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ।''

''আর অমরত্ব?'' মানস তার দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর শুনতে চায়।

''আত্মা অমর, দেহ অমর নয়। দেহও যদি অমর হতো দেহীদের ভার পৃথিবী বহন করতে পারত না। মৃত্যু বন্ধ হলে জন্মও বন্ধ হতো। জন্ম বন্ধ হলে নরনারীর মিলনও নিষ্প্রয়োজন হতো। নরনারী বলে দুটি ভাগও থাকত না। আত্মার তো স্ত্রীপুরুষ ভেদ নেই। দেহেরই আছে। দেহের অস্তিত্ব মেনে নিলে জন্ম মৃত্যুর ভারসাম্যও মেনে নিতে হয়। যতগুলি জন্ম ততগুলি মৃত্যু। মৃত্যু আছে বলে দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু এই যে মায়ের কোল খালি করে নিরীহ নিষ্পাপ শিশু অকালে চলে যায়। জানি সে অমৃতের সন্তান, তার আত্মা অমর। তবু তার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল। সেও কি মাকে ছেড়ে থাকতে পারে?'' যূথিকার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

''প্রকৃতির কোল থেকে যে গেছে ঈশ্বরের কোলে সে আছে। এখানেও যে প্রেম সেখানেও সেই প্রেম। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বিশ্বাসের জোর খুঁজে পাচ্ছিনে। বেশী রকম ইনটেলেকচুয়াল হওয়ার এই পরিণাম।'' আক্ষেপ করে মানস।

''সারাজীবন আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে চেয়ে রাত কাটালেও তুমি বিশ্বাসের জোর পাবে না। ওপার থেকে কেউ কোনোদিন ফিরে আসেনি, আসবেও না, যাকে দেখে তোমার বিশ্বাস হবে যে সে অমর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ কি সব ক্ষেত্রে সম্ভব? অন্তরে উপলব্ধি করতে হয়। আমার অন্তরের উপলব্ধি

আমাকে অভয় দিচ্ছে যে আমার দেহ চলে গেলেও আমার অস্তিত্ব চলে যাবে না, আমার অস্তিত্বই আমার অমরত্ব। দেহের সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়ও যাবে, আমাকেও কেউ চিনতে পারবে না, আমিও কাউকে চিনতে পারব না, তা সত্ত্বেও আমি থাকব। তোমার ভালোবাসা আমার কাছে পৌঁছবে। আমার ভালোবাসা তোমার কাছে। ভালোবাসাই মৃত্যুকে জয় করতে পারে। তাই ভালোবাসার জন্যে মানুষ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে। দেশপ্রেমও এর মধ্যে পড়ে।" যূথিকা নিঃসংশয়।

রাতের বেলা মুক্ত আকাশের তলে যে শান্তি তেমন শান্তি মানস আর কোথাও পায় না। তাই রোজ একবার শান্তির সন্ধানে আসে।

"বাইবেলে পড়েছি ভগবান মানুষকে নিজের আদলে বানিয়েছেন।" মানস বলে, "কিন্তু বাস্তবে দেখছি মানুষই ভগবানকে আপনার আদলে বানিয়েছে। আর মানবসৃষ্ট ভগবানের কাছে ইচ্ছাপূরণ প্রত্যাশা করেছে। হতাশ হলে ভাবছে ভগবানই নেই। ভগবান যদি থাকেন তবে এত অন্যায় কেন, এত অত্যাচার কেন? এত দুঃখ, এত ব্যর্থতা কেন? কিন্তু ভগবান না থাকলেও এসব থাকত। প্রতিকারের জন্যে মানুষ কার কাছে যেত? যার কাছে যেত তার চেহারা তো সর্বশক্তিমানের মতো নয়। তার হৃদয় তো সর্বজনের প্রতি প্রেম ও করুণায় পরিপূর্ণ নয়। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা যদি শক্তিমান হয়ে থাকেন তো প্রেমময় বা করুণাময় নন। যদি প্রেমময় বা করুণাময় হয়ে থাকেন তো শক্তিমান নন। ব্যক্তিকে ছেড়ে যারা সমাজের দিকে তাকাচ্ছে তারা কি দেখতে পাচ্ছে এমন এক সমাজ যে একাধারে শক্তিমান ও প্রেমময় বা করুণাময়? কই, সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তাকালে তেমন লক্ষণ তো দেখতে পাইনে। শক্তির সঙ্গে জ্ঞান মিশ খেতে পারে, কিন্তু প্রেম বা করুণা কি মিশ খায়? ইতিহাসে এর একটি কি দুটি দৃষ্টান্ত আছে। একটি তো আমাদের সম্রাট অশোক। হাজার বছরে হয়তো তেমন একজন ব্যক্তি জন্মাবেন। কিন্তু সমাজ বা সমষ্টি কি তাঁর অনুরূপ হবে?"

"না বোধহয়। তবু সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হবে।" যূথিকা মানসকে ভরসা দেয়। "ভাবীকালের মানবসমাজ কেবল শক্তিমান ও জ্ঞানবান হবে না, প্রেমময় ও করুণাময়ও হবে। কিন্তু তা বলে ভগবানের স্থান নিতে পারবে না। ভগবান ভগবান। মানুষ মানুষ। পরমাত্মা পরমাত্মা। জীবাত্মা জীবাত্মা। পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে জীবাত্মা নয়। আর সৃষ্টিকে বাদ দিলে স্রষ্টাই বা কাকে নিয়ে থাকবেন? তাই জীবাত্মাও অমর। কিন্তু জীবদেহ অমর নয়।"

"সেইখানেই তো দুঃখ। যাকে ভালোবাসি তাকে হারাতে কে চায়? তবু হারাতেই হয়। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরে একদিন। নিজেকেও তো একদিন এই মর্ত্যভূমি থেকে বিদায় নিতে হবে। এর পরে কোথায় আবার গতি হবে কেউ জানে না, জানতে পায় না, যে যা খুশি কল্পনা করে। কেউ পরজন্ম, কেউ পরলোক। কেউ নির্বাণ, কেউ মোক্ষ, কেউ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যুগল মিলন।" মানস উদাস কণ্ঠে বলে যায়।

"আজ বাদে কাল কী হবে তাও মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি। ইহকালের পর কী গতি হবে বা ইহলোকের পর কোথায় গতি হবে সে তো আরো দূরের কথা। এসব ভাবনা বৃথা ভাবনা। এসব নিজে না ভেবে তাঁকেই ভাবতে দাও যিনি তোমাকে ইহলোকে পাঠিয়েছেন। তুমি তো নিজের ইচ্ছায় জন্মাওনি।" যূথিকা মানসকে শুতে নিয়ে যায়।

ঘরে পা দিয়ে মানস বলে, "গৃহ থাকলে গৃহী থাকে, গৃহী থাকলে গৃহ থাকে : জগৎ থাকলে ব্রহ্ম থাকে, ব্রহ্ম থাকলে জগৎ থাকে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মায়া যেমন অসঙ্গত তেমনি অসঙ্গত জগৎ সত্য ব্রহ্ম মায়া। আমরা ইনটেলেকচুয়েলরা জগৎ সত্য মানি, ব্রহ্মের বেলা সন্দিহান। কেউ কেউ তো সোজাসুজি নাস্তিক। অপর পক্ষে মানবসৃষ্ট ভগবান আর মানতে পারা যাচ্ছে না। মানুষের আদলে ভগবান নয়, মানুষ যত বড়োই হোক। মানুষের মাপে তাঁকে মাপা যায় না, সেটা বৃথা।"

রায় বাহাদুর মাঝে মাঝে আলাপ করতে আসেন। তিনিও তো একদা জজ ছিলেন, অবসর নিলেও আইন আদালত সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখেন। হাইকোর্টের রিপোর্ট তাঁর নিত্য পাঠ্য। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সময় কেটে যায় শাস্ত্রচর্চায়। শাস্ত্র বলতে কেবল হিন্দুদের নয়, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান, মুসলমান, পার্শীদের শাস্ত্রও। সমান শ্রদ্ধা ও জিজ্ঞাসা নিয়ে। মানস তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে তাঁর বাড়ীতেও যায়। ধর্মের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য শোনে। নিজের সমস্যা শোনায়।

"দেখুন, মল্লিক সাহেব," রায় বাহাদুর বলেন, "মানুষ সাধনা করলে দেবতার স্তরে পৌঁছতে পারে, বুদ্ধ হতে পারে, খ্রীস্ট হতে পারে, কিন্তু ওই দুটি রহস্য ভেদ করা তার সাধ্যাতীত। মৃত্যুর পর কী হয় তা সে মৃত্যুর ওপারে না গেলে জানতে পাবে না, এপার থেকে জানা অসম্ভব। মৃত্যু থেকে অমৃতে যাবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। এইটুকু পৃথিবীর এইটুকু জীবনই যে একমাত্র জীবন তা মেনে নিতে মন বিমুখ। একপ্রকার না একপ্রকার পরকাল একভাবে না আরেকভাবে ধর্মপ্রাণদের সকলেরই স্বীকৃত। ওপারে যে কিছুই নেই এটা এপার থেকে কেউ দেখবেই বা কী করে? আছে, এই প্রত্যয় মানুষকে ধর্মে মতি দেয়। এটা আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান কেউ কারো চেয়ে কম ধর্মপ্রাণ নয়। যে যার পথে চলে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করছে। সে পাথেয় তার চাইই।"

"কিন্তু যেখানে যাবার জন্যে পাথেয় সংগ্রহ সে যদি শূন্য হয়ে থাকে তবে তো পাথেয় সংগ্রহ বৃথা। যা আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব? মৈত্রেয়ীর মতো এই প্রশ্ন আমারও প্রশ্ন।" মানসকে এ ভাবনা জর্জর করে।

"এখানে অমৃত হচ্ছে এমন এক উপলব্ধি যার পরে আর কোনো উপলব্ধির প্রয়োজন থাকে না। বলা যেতে পারে পূর্ণত্বের উপলব্ধি। এই জীবনেই সেটা সম্ভব। সন্তদের জীবনে সে রকম ঘটে বলে শুনেছি। কিন্তু সবাই তো আর সন্ত নয়, হতেও পারে না। সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের কর্তব্য দিব্য জীবনের দিকে এক পা এগিয়ে থাকা। কালক্রমে মানুষ জাতটাই দেবতার স্তরে উন্নীত হবে, যেমন হয়েছে পশুপাখীর থেকে মানুষের স্তরে। তার জন্যে হয়তো হাজার হাজার বছর লাগবে। লাখ লাখ বছরও লাগতে পারে। বিবর্তনের ইতিহাসে লাখ লাখ বছর তো খুব বেশী সময় নয়। আসল কথাটা হলো মানবজাতির লক্ষ্য কী। সব মানুষই যদি একই সঙ্গে নির্বাণ লাভ করে তা হলে মানবজাতি বলে কারো অস্তিত্ব থাকবে না। আর সবাই যদি শেষ বিচারের দিন স্বর্গে বা নরকে যায় তা হলেও মানবজাতির অস্তিত্বলোপ। সমগ্র মানবজাতির দিক থেকে যদি ভাবি তবে ক্রমবিকাশের পথে এগোতে এগোতে দেবজাতিতে পরিণত হওয়াই লক্ষ্য। পশু থেকে মানুষ যদি সম্ভব হয়ে থাকে তবে মানুষ থেকে দেবতাও সম্ভব নয় কেন? ততদিন আমরা অপেক্ষা করতে পারব না, এই যা দুঃখ।" রায় বাহাদুর হাসেন।

"কিন্তু আপনার সেই দেবজাতিও মরণশীল।" মানস ভোলে না। "আর বিবর্তন সেইখানেও থামবে না। তার পরেও থাকবে উচ্চতর স্তর। দেবতার চেয়েও উচ্চ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যুর অধীন। পরমায়ু দীর্ঘায়িত করেও একদিন বিদায় নিতে হবে। দেবতা বলে যম ছাড় দেবে না। স্বর্গের দেবতা তো নয়। মর্ত্যের দেবতা।"

"শ্রী অরবিন্দ যে অতিমানবের স্বপ্ন দেখেছেন সেই অতিমানবকেও তার সাধের ভূলোক ত্যাগ করতে হবে। ভূলোক চিরদিনই মর্ত্যলোক। তা সত্ত্বেও সে সাধনার মূল্য আছে। তাতে মানুষের উচ্চতা বেড়ে যায়। ব্যক্তির বেলা তো নিশ্চয়ই। জাতির বেলাও কি না যথাকালে দ্রষ্টব্য।" রায় বাহাদুর দ্বিধান্বিত।

"ব্যক্তি নিয়েই তো জাতি। জাতির উচ্চতাও বাড়বে ক্রমে ক্রমে। হয়তো কয়েক শতাব্দী লাগবে। কিন্তু দেহত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই অতিমানবত্ব শেষ। তার পরে আর বিকাশ নেই, বৃদ্ধি নেই। তখনো সেই প্রশ্নই উঠবে, যা আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব?" মানস ভোলে না। নিশ্চিতি

চায়।

"ওই যে বলেছি। অমৃতত্ব মানে পূর্ণতার উপলব্ধি। কতক মানুষের বেলা এটা সত্য হয়েছে, অনেক মানুষের বেলাও সত্য হবে, এই লাইনে যদি প্রগতি হয় তো অধিকাংশ মানুষের বেলাও সত্য হবে। সব মানুষের বেলাই বা নয় কেন? যদিও সাধারণ লোকের তাতে আগ্রহ আছে মনে হয় না। ওরা চায় এপারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে ওপারে টেনে নিয়ে যেতে। ওদের কামনা স্বর্গ। ওদের ভীতি নরক। ধর্মও ওদের সেই শিক্ষা দিচ্ছে। উচ্চকোটির সাধকরা অবশ্য স্বর্গনরকের চেয়ে আরো উচ্চ লোক আকাঙক্ষা করেন। এপারে না হোক ওপারে তাঁরাই উচ্চতায় উপনীত হন। তাঁদের লক্ষ্য পরমাত্মার সঙ্গে সাযুজ্য। পরমাত্মা সম্বন্ধে যাঁরা নীরব তাঁরা সর্ববিধ বাসনা কামনার নির্বাণকেই পরমাত্মার সঙ্গে সাযুজ্যের সমান মূল্য দেন। ইতি ইতি করে সাধক যেখানে পৌছন নেতি নেতি করেও সেইখানে পৌছতে পারেন। উপনিষদের 'পূর্ণ' আর বৌদ্ধশাস্ত্রের 'শূন্য' একই সত্য বলে মনে হয়। তা নইলে বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরবাদী না হয়েও এত মহান হতো না। ধর্মমাত্রই ঈশ্বরবাদী নয়। আবার সোজাসুজি নিরীশ্বরবাদীও নয়। ঈশ্বরকে বাদ দেওয়া মানে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা নয়। অস্বীকার যারা করেছে তারা কোনোরকম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেনি। একালের মার্কসবাদীরাও পারবে না।" রায় বাহাদুর রায় দেন।

হঠাৎ মার্কসের নাম শুনে চমকে ওঠে মানস। বলে, "মার্কসও তো একজন প্রোফেট। ইতিমধ্যেই তাঁর প্রোফেসী ফলে গেছে দুনিয়ার সুবৃহৎ একটি ভূখণ্ডে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও যদি ধর্ম হয় তবে মার্কসবাদও এক প্রকার ধর্ম। বৌদ্ধদের যেমন বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি মার্কসবাদীদেরও তেমনি মার্কসং শরণং গচ্ছামি মার্কসবাদং শরণং গচ্ছামি পার্টিং শরণং গচ্ছামি। সর্বহারার প্রতি ন্যায়ধর্মই ওদের ধর্ম। ঈশ্বরকে যদি একজন ব্যক্তি বলে না ভাবি, একটি স্পিরিট বলে ভাবি, তবে সে স্পিরিট মার্কস, লেনিন প্রমুখ প্রোফেটদের মাধ্যমেও কাজ করছে। তাঁদের পশ্চাতে যে প্রেরণা সে প্রেরণাও স্পিরিচুয়াল। তা না হলে কোটি কোটি লোক প্রাণ দিতে ছুটে যায় কেন? তা কি শুধু খেতে পরতে পাবার জন্যে? ঈশ্বরকে যদি একটি নৈর্ব্যক্তিক বিধান বলে ভাবি তবে সে বিধান সামাজিক ন্যায়ের পশ্চাতেও সক্রিয়। সামাজিক ন্যায়ের স্বপ্ন বুদ্ধ যীশু মহম্মদেরও ছিল। তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রসারের মূলেও সেই নৈতিক বিধান। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের অনুগামীদের মধ্যেও সামাজিক অন্যায় এসে পড়েছে। তাই পরম খ্রীস্টভক্ত রুশ দেশের জনগণও খ্রীষ্টকে ছেড়ে মার্কসকে ধরেছে।"

"Man does not live by bread alone. সমাজব্যবস্থা নিখুঁত হলেও মানুষ তাই নিয়ে পরিতৃপ্ত হবে না। এই দেখছেন না আমার কিসের অভাব? কেন তবে আমি ক্ষুধিত ও তৃষিতের মতো ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে সার সত্য গ্রাস করি? কারণ আমি অনুভব করি যে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। এর আড়ালে আছেন একজন যাঁর নাম নিয়ে রূপ নিয়ে হাজারও মতভেদ, কিন্তু যাঁর অস্তিত্ব আমার অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুই অস্তিত্বই একই অস্তিত্বের ভিতর বাহির। জীবনের সার্থকতা ধনসম্পদে বা পরাক্রমে বা জ্ঞানবুদ্ধিতে নয়, ভগবানকে ও তার সৃষ্টিকে আপনার করে। কবির কথায়, দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা। আমার ব্যক্তিগত সাধনাও এই যুগল প্রেমের সাধনা। এই সাধনায় এ জন্মে যদি এগিয়ে থাকি তবে পরজন্মের কথা পরজন্মে হবে।" রায় বাহাদুর শেষ করেন।

।। ছয় ।।

আরেক দিন কথাপ্রসঙ্গে রায় বাহাদুর মানসকে একটা চমক দেন।

বলেন, "এই যে যুদ্ধ এটাও লীলাময়ের লীলা। যুদ্ধক্ষেত্র তাঁর লীলাভূমি। বৃন্দাবনেও যিনি

কুরুক্ষেত্রেও তিনি। শ্যামের বাঁশি শুনে যারা রাসলীলায় মেতেছিল তারাই মেতেছে রক্তরাঙা হোলিখেলায়। তাদের কাছে 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' মল্লিক সাহেব, মরণেরও একটা আনন্দ আছে। প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের আনন্দ। তা নইলে পতঙ্গেরা কেন স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেয়? সেই আগুনই তাদের কাছে শ্যাম সমান। পারেন কি আপনি পতঙ্গদের নিবৃত্ত করতে? গোপীদের নিবৃত্ত করতে? তা হলে পারবেন কেন সৈনিকদের নিবৃত্ত করতে?''

মানস বলে, ''এমন আজব কথা কখনো আমি শুনিনি। যিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ তিনি কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কি না এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিমত আছে। সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র কেমন করে বৃন্দাবনের মতো লীলাভূমি হতে পারে? সৈনিকরা কেমন করে গোপী হতে পারে? মরণমারণ কেমন করে হোলিখেলা হতে পারে? শ্মশান কেমন করে কুঞ্জবন হতে পারে?''

''যেখানেই তিনি সেখানেই তাঁর লীলা, সেখানেই তাঁর লীলাসহচর সহচরী। যুদ্ধক্ষেত্রই বা ব্যতিক্রম হবে কেন? আপনাকে আরো গভীরে প্রবেশ করতে হবে, মিস্টার মল্লিক। আমি যুদ্ধবিগ্রহের পক্ষপাতী নই, সাত্ত্বিক মানুষ। কিন্তু কিসের আকর্ষণে পতঙ্গের মতো শত সহস্র লোক লড়াই করতে ছুটে যাচ্ছে প্রাণের মায়া না রেখে? তা জার্মানরাই হোক আর রাশিয়ানরাই হোক আর ইংরেজরাই হোক আর ভারতীয়রাই হোক। আপনাদের ওই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাই সব কথা নয়। মতবাদভিত্তিক ব্যাখ্যাতেও মন মানে না। খুঁজতে হবে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। গীতা পড়ে আমি এর একটা মানে পাই। কিন্তু গীতার সঙ্গে ভাগবতকেও মিলিয়ে পড়ি । কুরুক্ষেত্র আর বৃন্দাবন একই লীলাময়ের দুই লীলাভূমি।'' রায় বাহাদুর তাঁর এই ধারণায় অটল।

''কিন্তু, রায় বাহাদুর,'' মানস নিবেদন করে, ''সেকালে সৈনিকরাই কেবল যুদ্ধে যেত। যুদ্ধক্ষেত্র বলে একটা স্থানও নির্দিষ্ট থাকত। এখন তো যে কোনো মানুষের উপর যে কোনো জায়গায় বোমা বর্ষণ হতে পারে। মরবার আগে সে বলতেও সময় পাবে না যে, 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান'। সেকালে উভয়পক্ষের হাতে অস্ত্র থাকত।একালে আপনার বা আমার হাতে অস্ত্র নেই, তবু অতর্কিতে আমরাও আক্রান্ত হতে পারি। লীলাময়ের এ কেমনতরো লীলা। গীতায় বা ভাগবতে বা অন্য কোনো শাস্ত্রে এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্জুনের হাতে অস্ত্র ছিল, কাজেই তাঁকে বলতে পারা যেত, হে অর্জুন, যুদ্ধ করো। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী। কিন্তু যাদের হাতে অস্ত্র নেই, যারা যোদ্ধা নয়, সাধারণ নাগরিক, তাদের প্রতি সে রকম অনুজ্ঞা কি পরিহাস নয়? যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে আমিও একপ্রকার ব্যাকুলতা অনুভব করি । মরণের সঙ্গে মিলনের জন্যে নয়, অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্যে। অশুভ শক্তির সঙ্গে শুভ শক্তির বিরোধ আদিকাল থেকে চলে আসছে। প্রাচীনেরা তাকে বলতেন দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। ফ্যাসিস্টরাই আজকের দিনে অশুভ শক্তির প্রতিরূপ। ভারতের উপরেও যে ওদের নজর নেই তা নয়। রাশিয়া যদি হেরে যায় ওরা স্থলপথে ভারতে এসে হাজির হবে। তখন তো লড়তেই হবে। না আবার আমরা পরাধীনতা বরণ করব? লীলাময়ের লীলা বলে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, রায় বাহাদুর। আমি গভীরভাবে চিন্তিত।''

''আপনি অকারণে চিন্তা করছেন, মিস্টার মল্লিক।'' রায় বাহাদুর আশ্বাস দেন। ''ইংরেজ এখনো শক্তিমান। তাকে হারাতে পারে এমন শক্তি কার আছে?''

প্রসঙ্গটা রাজনীতির দিকে মোড় নেয়। মানস বলে, ''যুদ্ধকালে সবকিছুই তো অনিশ্চিত। ইংরেজ যে হারবে না এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় কী করে? সেদিন ডানকার্কে ইংরেজের কী দশা দেখা গেল?''

''ওটা পরাজয় নয়, পশ্চাদ্ অপসরণ। যুদ্ধকালে অমন কতবার হয়, কতবার হবে। পুলিশ সাহেব রবিন্‌স সেদিন আমাকে বলছিলেন, 'আমরা প্রতিটি যুদ্ধে হারব, কিন্তু শেষ যুদ্ধে জিতব। অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ড্‌স ওয়েল।' এই হলো ওদের জাতীয় দর্শন। রবার্ট ব্রুসও তো বার বার লড়েছিলেন, বার বার হেরেছিলেন, আখেরে জিতেছিলেন। ওটা স্কচদেরও জাতীয় দর্শন। ব্রিটিশ বলতে স্কচও বোঝায়। আপনি

নিশ্চিত বলে ধরে নিতে পারেন যে ওরা অবশেষে জয়ী হবে।'' রায় বাহাদুর নিঃসংশয়।

''স্কটল্যাণ্ডের লোকদের স্কচ বললে ওরা অপমান বোধ করে, রায় বাহাদুর।'' মানস শুধরে দিয়ে বলে, ''স্কচ নয়, স্কটস। যেমন আসামী নয়, অসমীয়া। উড়ে নয়, ওড়িয়া।''

''ওঃ তাই নাকি?'' রায় বাহাদুর জিব কেটে বলেন, ''তা হলে তো ম্যাক্‌ফারসনকে আমি না জেনে অপমান করেছিলুম। ঢাকায় যখন উনি জেলা জজ তখন আমি সাব-জজ। অমন অমায়িক ভদ্রলোক আমি দেখিনি। হিন্দু আইন নিয়ে খটকা বাধলে আমার চেম্বারে ছুটে আসতেন। জুডিসিয়াল সেক্রেটারি হয়েই আমাকে ডেকে পাঠান। বলেন, আমার অধীনে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হতে আপনার আপত্তি আছে? শুনুন কথা! ন্যাড়াকে বলছেন, ন্যাড়া, পরমান্ন খাবি? ন্যাড়া বলছে, আঁচাব কোথায়? সাহেবের আগ্রহ দেখে আমি দর হাঁকি, আমার নিচে যাঁদের স্থান তাঁরা প্রমোশন পেয়ে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ হবেন, আর আমিই কিনা সময়ে সুযোগ পাব না। একেই কি বলে ব্রিটিশ জাস্‌টিস? সাহেব মুচকি হেসে বলেন, আমি থাকতে আপনাকে সুপারসীড করে কার সাধ্যি! এর মানে তখন বুঝতে পারিনি, মিস্টার মল্লিক। ম্যাক্‌ফারসন কিছুদিন বাদে হাইকোর্টের জজ হয়ে যান। তখন আমি গিয়ে অভিনন্দন জানাই। তখন কী বলেন, শুনবেন? বলেন, আপনার জন্যে আমি যা করার করেছি। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। সত্যি, অমন ভালো মানুষ আর দেখা যায় না। অ্যাডিশনাল না হয়ে সরাসরি ডিসট্রিক্ট জজ। বছর না ঘুরতেই রায় বাহাদুর। সাহেবই প্রথম অভিনন্দন জানান। লেখেন, হিন্দু আইন তো আমি আপনার সৌজন্যেই শিখেছি। শুনুন কথা। আমি নিজে কতটুকু বা জানি। হিন্দু আইন যে অনন্ত পারাবার।'' রায় বাহাদুর থামেন।

''আমাকেও দেখছি আপনার কাছে পাঠ নিতে হবে, রায় বাহাদুর। যদি আপনার অবসর থাকে।'' মানস সবিনয়ে বলে।

''ঢালা নিমন্ত্রণ রইল। যখন খুশি শুভাগমন করবেন। তবে আইনিচর্চায় আজকাল আমার মন নেই। এখন আমার ইহলোকের পাট গুটিয়ে নেবার সময়। যেদিন ডাক আসবে সেদিন যেন বকেয়া পাট কিছু না থাকে। দারাসুত কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে এই সংসার। মনে হবে এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্ন দেখছিলুম। মা বলতেন এটা মায়ার সংসার। কেউ কারো নয়। সেই কথাই মনে পড়ছে আজকাল। মা অনেকদিন আগে চলে গেছেন। কোথায় আছেন জানিনে। কে জানে হয়তো পরলোকে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। কিংবা পরজন্মে আবার তাঁর কোলে জন্মাব। বুঝতে পারছি এটাও একপ্রকার মায়ার বন্ধন। কে কার মা, কে কার ছেলে! শঙ্করাচার্য বলে গেছেন কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। আগে তাঁকে মায়াবাদী বলে আমল দিইনি। এখন মনে হচ্ছে তিনি সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। আমিও একটু একটু করে উপলব্ধি করছি।'' রায় বাহাদুর বিমনা হন।

মানস নীরব হয়ে ভাবে। তার পরে বলে, ''আপনি আমি থাকি না থাকি মানবজাতি থাকবেই। মানবজাতি থাক না থাক প্রাণীলোক থাকবেই। প্রাণীলোক থাক না থাক নক্ষত্রলোক থাকবেই। নক্ষত্রলোক থাক না থাক স্পেস টাইম থাকবেই। স্পেস টাইম যদি থাকে বিবর্তন বন্ধ থাকবে না। জড় থেকে আবার বিবর্তিত হবে জীব, জীব থেকে মানুষ বা মানুষের মতো বা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো সত্তা। এইপর্যন্ত আমি বুঝি। এইপর্যন্ত আমি নিশ্চিত। কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি স্পেস টাইমের বাইরে চলে যাই তা হলে আমি আদৌ থাকব কি না, থাকলে আবার স্পেস টাইমের ভিতরে ফিরে আসব কি না এর উত্তর আমি জানিনে। এক্ষেত্রে যুক্তির নয়, বিশ্বাসের আশ্রয় নিতে হয়। আর সে বিশ্বাসও ভিত্তিহীন নয়। ইনটুইশনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার ইনটুইশন আমাকে বলছে যে আমি স্পেস টাইমের ভিতরেও যেমন আছি বাইরেও তেমনি আছি। আছি এই মুহূর্তেই। থাকব পরের মুহূর্তেও। মাঝখানে ছেদ পড়বে না, পড়তে পারে না। মৃত্যুও ছেদ ঘটাবে না, ঘটাতে পারে না। কিন্তু মৃত্যুর পরে কী, কোথায়, কোন্ রূপে, কোন্

নামে, কোন্ লোকে এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো পাইনি, যাঁরা পেয়েছেন ও লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁদের কথার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাঁরাই যে শেষ কথা বলে গেছেন তা নয়। সামনে রয়েছে আরো শত শত বৎসর, সহস্র সহস্র বৎসর। মানুষ জাতটাই যদি আত্মঘাতী না হয় তবে আরো কত মুনি ঋষি সাধু সন্ত বুদ্ধ জিন প্রোফেট জন্মাবেন। তাঁদের বাণীও লিপিবদ্ধ হয়ে মানুষের এইসব প্রশ্নের উত্তর জোগাবে।"

"কিন্তু আমার সামনে তো শত শত বৎসর নেই, সহস্র সহস্র বৎসর তো দূরের কথা। বড়ো জোর দশ বছর। মানুষের পরমায়ুর বাইবেল নির্দিষ্ট সীমা। অনাগতদের অজানা উত্তর শোনার বা পড়ার সৌভাগ্য আমার হবে না। সামনের পাঁচ দশ বছরে নতুন আর কী শুনব বা পড়ব! আপনারা মানবিকবাদী, মানুষের কাছে আপনাদের অফুরন্ত প্রত্যাশা। বিজ্ঞানের দিক থেকে, রাজনীতির দিক থেকে, অর্থনীতির দিক থেকে, সমাজনীতির দিক থেকে সে প্রত্যাশা সত্যিই অপরিসীম। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে মানুষ আর একটি পা-ও এগোতে পারবে বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে যেসব মহাপুরুষ জন্মাবেন তাঁরা পূর্ববর্তীদের উত্তরবর্তী। পূর্বতনের যে অংশটা পুরাতন সেটাকে তাঁরা নতুন রূপ দেবেন, কিন্তু যে অংশটা চিরন্তন বা সনাতন সেটার হেরফের কী করে সম্ভব? ইটারনাল ভেরিটি তিন হাজার বছর আগে যেমন ইটারনাল ছিল আজও তেমনি ইটারনাল, তিন হাজার বছর পরেও তেমনি ইটারনাল থাকবে। সত্য আর অহিংসা, প্রেম আর সৌন্দর্য, ক্ষমা আর করুণা, মোহ আর নির্বাণ, শৈলশিখরে যীশুকথিত beatitude, এসব হলো চিরন্তন বা চিরনূতন। পরে যাঁরাই আসবেন তাঁরাই এইসব কথা বলবেন। নতুন করে বলবেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সত্যিকার নূতনত্ব আমি প্রত্যাশা করিনে, মিস্টার মল্লিক, তবে চিরন্তনত্ব নব নব উন্মেষ লাভ করতে পারে।" রায় বাহাদুর বিশ্বাস করেন।

"পুরাতন আর নূতন ছাড়া আরো একটি 'তন' আছে। চিরন্তন। মানসও এটা জানত ও মানত। তাই তর্ক করে না। শুধু যোগ করে, নৈতিকতার দিক থেকে প্রগতির প্রয়োজন আছে, রায় বাহাদুর। সামাজিক ন্যায় রুশদেশে বিপ্লব ডেকে এনেছে। বিপ্লবের ভয়ে জার্মানরা যুদ্ধ বাধিয়ে বসেছে। গত শতাব্দীতে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ক্রীতদাসদের প্রতি সামাজিক ন্যায়ের প্রয়োজনেই হয়েছিল। ভারতের ঘরেও সামাজিক অন্যায় প্রতিকারের জন্যে কাঁদছে। একদিন গৃহযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। আমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে অধ্যাত্মচর্চা করতে পারি? সুখের বিষয় মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে সজাগ ও সক্রিয়। নিছক রাজনৈতিক মুক্তি তাঁর অম্বিষ্ট নয়।"

"একথা মানতেই হবে যে আমরা হিন্দুরা আধ্যাত্মিকতাকে যত উচ্চে স্থান দিয়েছি নৈতিকতাকে তত উচ্চে নয়। মহাত্মা গান্ধীকে সেইজন্যেই আমি বুদ্ধ ও যীশুর সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু সমাজের বাইরে সঙ্ঘ বা চার্চ গঠন করা এক জিনিস আর সমাজব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত রূপ দেওয়া আরেক জিনিস। যাদের হাতে শস্ত্র, যাদের হাতে শাস্ত্র আর যাদের হাতে উৎপাদনের উপায় তারাই দেশে দেশে যুগে যুগে সমাজের ব্যাবস্থাপনা করেছে। নীতিবিদ্‌দের কথায় কান দেয়নি। তাঁরা তাঁদের মঠবাড়ীতে বসে জপতপ করেছেন ও তাঁদের গৃহীশিষ্যদের দৃষ্টি ইহলোকের থেকে পরলোকের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আর ইহকালের থেকে পরকালের দিকে। কার্ল মার্কস এসে ভরসা দেন যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এই জগতেই ও এই জন্মেই সম্ভব। কিন্তু তাঁর শিষ্যরাও দেখছি শস্ত্রব্রত ও শাস্ত্রব্রত, ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ। তফাতের মধ্যে এই যে তাঁদের সমাজে বৈশ্য নেই, উৎপাদনের উপায় বৈশ্যদের হাতে নেই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি অন্য নামে থেকে যান তবে শূদ্রদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবেন।" রায় বাহাদুর সন্দেহ করেন।

"কিন্তু গান্ধীজী তো শস্ত্র বা শাস্ত্রের উপর নির্ভর করছেন না। সঙ্ঘ গঠনেও তাঁর অনিচ্ছা। গান্ধী সেবাসঙ্ঘ নিজের হাতেই একরকম ভেঙে দিয়েছেন। কংগ্রেসকেও তিনি স্বাধীনতা অর্জনের বাহন হিসাবে দেখেছেন, সামাজিক ন্যায় সংস্থাপনের বাহন হিসাবে নয়। তা হলে তাঁর শক্ত ঘাঁটি কোথায়?

ওই সেবাগ্রামের আশ্রম?" মানস ভেবে পায় না।

রায় বাহাদুর এর উত্তরে বলেন, "কেন? বিড়লা আর বাজাজ? ভারতের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়? এঁরা স্বোপার্জিত ধনের ট্রাস্টী হবেন। তা হলে রাশিয়ার মতো এঁদের নিকেশ করতে হবে না। দেখুন, মিস্টার মল্লিক, গান্ধীজীর মতবাদ যত মহৎ হোক না কেন তিনি ডাইনীর হাতে তাঁর শিশুকে সঁপে দিয়ে যাচ্ছেন। ধনিকরা কখনো ট্রাস্ট্রী হতে পারে না। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, ওয়াকফ সব কিছুই দেখেছি। সেসবও তো ট্রাস্ট্রীদের হাতে সঁপে দেওয়া সম্পত্তি। যে যার নিজের বংশের কোলে ঝোল টানে। আদালত না থাকলে কারো কাছে জবাবদিহির দায় থাকত না। গান্ধীজী তো আবার আদালত পছন্দ করেন না, পুলিশ পছন্দ করেন না, জেল পছন্দ করেন না। শুধুমাত্র ব্যক্তির মহত্ত্বের উপর ছেড়ে দেওয়া ও মাঝে মাঝে তার শোষণের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা এভাবে কি নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে? রাশিয়ায় দেখছি নিউ সোশিয়াল অর্ডার হয়েছে, কিন্তু সেটা নিউ মরাল অর্ডার নয়। নিউ মরাল অর্ডার না হলে ওর নৈতিক ভিত্তি দুর্বল। স্বাধীনতার পরে আমাদের নেতারাও যেটা গড়বেন সেটা যদি ধনিকদের মহত্ত্বনির্ভর হয় তো সেটাকেও আমি মরাল অর্ডার বলতে পারব না। ব্রিটিশ সরকারও তো দাবী করেন যে তাঁরা ভারতীয় প্রজাদের ট্রাস্ট্রী। তাঁদের সেই হাতীর খোরাক জোগাতে গিয়ে ভারতের জনগণ নিঃস্ব। আর সেটার প্রতিকার করতেই তো গান্ধীজীর অভিযান। বিদেশী ট্রাস্ট্রীরা থাকবে না, কিন্তু স্বদেশী ট্রাস্ট্রীরাতো থাকবেন। তাঁরা থাকতে সেটা নিউ সোশিয়াল অর্ডার হতে পারে কি? মহাত্মার কাছে এই হবে আমার প্রশ্ন। না, এই মুহূর্তে নয়। স্বরাজের পরে। যদি স্বরাজের পর তিনি ও আমি বেঁচে থাকি।" রায় বাহাদুর অতটা নিশ্চিত নন।

"থাকবেন, থাকবেন, বেঁচে থাকবেন।" মানস আশ্বাস দেয়। সে বিলেত থেকে দত্তবিশ্বাসের চিঠি পেয়ে জানতে পেরেছে চার্চিলের মন্ত্রীমণ্ডলীর কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য এখন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্যে তাঁর উপর চাপ দিচ্ছেন। রাশিয়ার জন্যে লড়তে হলে ভারতের সঙ্গে মিটমাট শ্রেয়। নইলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেও লড়তে হবে। তার মানে আরো একটা ফ্রন্টে।

বিলেত থেকে চিঠিপত্র আসা বন্ধ হয়ে যায়নি, বিলম্বিত হয়েছে। দত্তবিশ্বাস কালেভদ্রে লেখে। লেখে মানসকে। আর মিলিও যে সম্পূর্ণ নীরব তা নয়। যূথিকাকে নিজের ঘরসংসারের খবর জানায় ও তার ছেলেমেয়ের কুশল জানতে চায়।

দত্তবিশ্বাস আজকাল ভারত থেকে বইয়ের অর্ডার পায় না বলে দোকানটা বিক্রী করে দিয়েছে। যুদ্ধের মরসুমে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে একটা গণ্যমান্য পদ তদ্বিরের জোরে জোগাড় করে নিয়েছে। পোশাক তো তার বরাবরই নিখুঁত ছিল, চোদ্দ বছর বিলেতে বাস করে সে তার ইংরেজী উচ্চারণটাকেও সাহেবদের মতো করেছে। বি. বি. সি. ওটার উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। কর্মসূত্রে বহু পদস্থ ইংরেজের সঙ্গে তার মেলামেশা। সাধারণত মদের গেলাসের উপরে। এ ছাড়া লেবার পার্টির পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কৃষ্ণ মেননের সঙ্গেও তার দীর্ঘকালের বন্ধুতা।

"মাই ডিয়ার মালিক," ইংরেজীতে লিখেছে দত্তবিশ্বাস, "বেশীর ভাগ ইংরেজই এখন ভারতীয়দের সঙ্গে মিটমাট করতে ব্যগ্র। কিন্তু স্বাধীনতা মানে কি দায়ীত্বহীনতা? যে দেশ স্বাধীনতা পাবে সে কি তার সব দায়দায়িত্ব অস্বীকার করবে? যুদ্ধ যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন যুদ্ধের দায়িত্বও স্বীকার করতে হবে। যেমন ব্রিটেনকে তেমনি ভারতকে। ফ্রান্সের মতো বেইমানী করলে চলবে না। ফরাসীরা তাদের আধখানা দেশ জার্মানদের ছেড়ে দিয়েছে। বাকী আধখানায় তাঁবেদার সরকার গঠন করেছে। ভারতীয়রা যদি তেমন কিছু করে তো সর্বনাশ। ইণ্ডিয়া অফিস সন্দেহ করছে যে কংগ্রেস নেতাদের একভাগ শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করবার স্বাধীনতা হাতে রাখতে চান। গান্ধীজীর ঝোঁকটাও শান্তির জন্যে সন্ধির দিকে।

যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত বলে তিনি যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে নারাজ। তাঁর যেমন অসামান্য প্রভাব তিনি সরে দাঁড়ালে নেহরুও সরে দাঁড়াবেন। ভিতরে ভিতরে অনেকেই যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে রাজী। কিন্তু গান্ধী যদি বলেন, 'না', তা হলে সকলেই বলবেন, 'না'। একজন কি দু'জন বাদে। কংগ্রেসের সঙ্গে যদি মিটমাট না হয় তো লীগের সঙ্গেই বা মিটমাট হবে কী করে? মেজরিটিকে বাদ দিয়ে মাইনরিটির সঙ্গে মিটমাট হয় না। কিন্তু মেজরিটির সঙ্গে মিটমাট যেদিন হবে সেদিন মাইনরিটির সঙ্গেও মিটমাট হওয়া চাই। মাইনরিটিকে বাদ দিয়ে মেজরিটির সঙ্গেও মিটমাট হয় না। বিশেষ করে সে মাইনরিটি যখন ইণ্ডিয়ান আর্মির শতকরা চল্লিশ জন। আমি মুসলমানদের কথাই বলছি। শিখদের জড়ালে শতকরা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যায়। ওরা সবাই লড়তে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু ওদের স্বার্থ বলি দিলে ওরা লড়বে কেন? আর ওরা যদি না লড়ে তবে আফ্রিকায় আর পশ্চিম এশিয়ায় শত্রুপক্ষই জিতবে। এর পরে জাপান যদি যুদ্ধে নামে তা হলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেও শত্রুপক্ষের জিৎ। অন্ধ গান্ধীভক্তদের এসব বোঝায় কে?"

এর উত্তরে মানস লেখে সুকুমারকে, "বোঝাবেন তিনিই যিনি রাশিয়ায় গিয়ে স্টালিনকে বুঝিয়েছেন। তার মানে সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স। ক্রিপ্‌স যদি ভারতকেও রাশিয়ার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দেন তা হলে তাঁকে একবার এদেশে পদার্পণ করতে হয়। তার আগে গান্ধীজীর সহকর্মীদের জেল থেকে খালাস হওয়া চাই। নইলে তিনি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন কী করে? হাজার হোক, গান্ধীজী একজন গণতান্ত্রিক নেতা। যুদ্ধকালে চার্চিল যেদিকে যান সকলেই সেদিকে যান। তেমনি সত্যাগ্রহকালে গান্ধীজী যেদিকে যান সকলেই সেদিকে যান। সত্যাগ্রহও তো একপ্রকার যুদ্ধ। কংগ্রেস নেতারা সত্যাগ্রহ করতে চাননি। গান্ধীজীও তাঁদের যতদিন সম্ভব নিরস্ত করেছেন। যুদ্ধকালে মিটমাট হবে না শুনেই ওঁরা সিভিল লিবার্টির দাবীতে সত্যাগ্রহে নেমেছেন। মিটমাট যদি যুদ্ধকালে না হয় তো কোনো কালেই হবে না। যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তি আরো নিরঙ্কুশ হবে। এটাই কংগ্রেস মহলের ধারণা। যুদ্ধবিগ্রহ কি কেবল সৈনিকদের নিয়েই হয়? সারা ভারতে অসামরিক জনগণকে অনাহারে রেখে, অর্ধনগ্ন রেখে, যুদ্ধ জয় করতে গেলে যা হয় তা গত মহাযুদ্ধের সময় জারশাসিত রাশিয়ায় দেখা গেছে। তার নাম বিপ্লব। ভারতের অসামরিক জনগণকে বিপ্লবের মুখে ঠেলে দেওয়াটা অন্ধ চার্চিল ভক্তদের অদূরদর্শিতা। বিপ্লব একবার আরম্ভ হয়ে গেলে গান্ধীজীরও আর কোনো ভূমিকা থাকবে না। কংগ্রেসেরও না। সুতরাং সময় থাকতে তাঁদের ভূমিকা তাঁরা সেরে রাখছেন। মাইনরিটির ধুয়ো তুলে ব্রিটেনের রক্ষণশীলরা যত বেশী কালহরণ করবেন তত বেশী অনুতাপ করবেন। তখন তাঁদের সরাসরি মুখোমুখি হতে হবে সহিংস বিপ্লবীদের। মাঝখানে গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীরা থাকবেন না। জিন্না ও মুসলিম লীগ থাকতে পারে, কিন্তু বিপ্লবের তোড়ে তাদেরও ভেসে যেতে কতক্ষণ!"

মানস জানত যে চার্চিলকে কেউ এসব কথা বোঝাতে পারবে না। তিনি ভারতীয় জনমতকে গ্রাহ্যই করেন না। সৈন্য সামন্ত পেতে অসুবিধে না হলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তবু ইংলণ্ডের জনমতের উপরে তার ভরসা ছিল। সেদেশের জনমত অনড় অচল নয়। তার প্রমাণ গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট। সেই নজীরে একদিন গান্ধী-লিনলিথগাউ প্যাক্টও সম্ভবপর। মানস আশাবাদী।

ওদিকে যূথিকাকে লিখেছিল মধুমালতী, "গত শরৎকালের ব্যাটল অভ ব্রিটেনে ইংরেজ জাতির সাহস, শৃঙ্খলা ও মনোবল প্রত্যক্ষ করে আমি উপলব্ধি করেছি যে ওরা অপরাজেয়। এ যুদ্ধের ফলাফল আর যাই হোক ব্রিটেনের পতন নয়। ফ্রান্সের সঙ্গে এইখানেই এদের তফাৎ। বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স। এ কী তার পরিণাম! তা হলে আমাদের দেশের বিপ্লবীদের কী আশা! যাক, যুদ্ধটা তো আগে শেষ হোক, তার পর দেশে ফিরে গিয়ে ভাবা যাবে। ইতিমধ্যে আমি পড়ে গেছি একটু মুশকিলে। আমার ধারণা ছিল এদেশে কেউ আমাকে চেনে না। আমি অপরিচিতা। কিন্তু আমাদের সেই সার জন অ্যাণ্ডারসন এখন এখানকার হোম সেক্রেটারি। সবাই জেনে গেছে তাঁর আমলে আমি ছিলুম বেঙ্গল টেররিস্ট। ভারতকর্তা

ইংরেজ সাহেব মেমরা আমাকে ও আমার কর্তাকে নিমন্ত্রণ করে দেশী বিলিতী খানা খাওয়ান। আর একান্তে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'হোয়্যার ইজ চন্দ্র বোস?' আমি তো প্রথমটা ধরতেই পারিনি যে চন্দ্র বোস হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বোস। আমার কর্তা আমাকে বুঝিয়ে দেন যে ইংরেজদের কাছে দ্বিতীয় নামটাই প্রথমটার চেয়ে প্রধান। ওদের নিজেদের বেলা ওরা তাই করে। এখন এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিই কী করে? আমি কি সবজানতা? 'জানিনে' বললে ওরা বিশ্বাস করবে না। ওদের ধারণা বোস এখন জার্মানীতে। আমি বলি, সেটা কেমন করে সম্ভব? যুদ্ধকালে কি কেউ ভারত থেকে বাইরে কোথাও যেতে পারে? চারদিকে কড়া পাহারা। জলপথে অসম্ভব, আকাশপথে অসম্ভব। স্থলপথ বলতে তো খাইবার পাস। পাঠান ছাড়া সে পথে কেউ যাওয়া আসা করতে পারে না। চন্দ্র বোস কি পাঠানের মতো দেখতে? তাঁর কোথায় দাড়ি, কোথায় গোঁফ? কোথায় পাঠানের মতো পোশাক? গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে খাইবার পাস ভেদ করা শিবের অসাধ্য। তা সত্ত্বেও আমাকে বাড়ী বয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, হোয়্যার ইজ চন্দ্র বোস? আমি বলি, জানিনে। জানলেও আমি বলতুম না। তোমরা যেমন তোমাদের দেশকে ভালোবাস আমরাও তেমনি আমাদের দেশকে ভালোবাসি। চন্দ্র বোস যদি জার্মানীতে গিয়েই থাকেন তবে জার্মানদের স্বার্থে নয়, পরাধীন স্বদেশবাসীদের স্বার্থে। আমিও পালটা সুধাই, জেনারল দ্য গল কী করতে এদেশে এসেছেন? পরাধীন ফ্রান্সকে মুক্ত করতে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কী করতে ফ্রান্সে গেছলেন? পরাধীন উপনিবেশকে স্বাধীন করতে। অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার। ওদের মুখ চুণ। তবে আমি সত্যি জানিনে সুভাষদা এখন কোথায়? শুনছি নিরুদ্দেশ।"

যূথিকাও জানে না। জানলেও লিখত না। কে জানে কার হাতে পড়ত! মানসকে জিজ্ঞাসা করে, "হোয়্যার ইজ চন্দ্র বোস?"

মানস বলে, "হিমালয়ের কোনো এক দুর্গম গুহায় অজ্ঞাতবাস করছেন। পুলিশ তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে হন্দ হয়ে গেছে। কড়া সেনসরশিপ। যারা জানে তারাও প্রকাশ করে না। ওটা এখন একটা মিলিটারি সীক্রেট।"

ও চিঠি ছিল হিটলারের রুশ অভিযানের আগেকার। এর পর মিলি লেখে, "বৌদি, অলৌকিক ঘটনার যুগ যায়নি। অঘটন আজো ঘটে। নাৎসীরা যে কমিউনিস্টদের নিজের রাজ্যে হানা দেবে এটা তেমন চমক লাগাবার মতো ঘটনা নয়, অসময়ে ঘটেছে এই যা আশ্চর্য। কিন্তু কেউ কি ভাবতে পেরেছিল যে রুশ বিপ্লবকে যিনি আঁতুড়ে গলা টিপে মারতে অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি প্রতিবিপ্লবীদের পাঠিয়েছিলেন তিনিই এখন তাকে রক্ষা করার জন্যে মিতালি পাতিয়েছেন তাঁর পরম বৈরী স্টালিনের সঙ্গে? হ্যাঁ, বৌদি, সেই চার্চিলই আজ এই চার্চিল। আমরা সবাই হকচকিয়ে গেছি। আমার কর্তা তো কতরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু একবারও বলেননি যে ইংলণ্ডের রক্ষণশীলরা রাশিয়ার বিপ্লবীদের জিতিয়ে দেবে। নাটের গুরু হবেন কিনা চার্চিল স্বয়ং। কোথায় শ্রেণীসংগ্রাম! শ্রেণীশত্রুই এখন শ্রেণীমিত্র। মার্কসবাদীদের মুখ চুণ। কনসারভেটিভরাও এখন সোভিয়েটদরদী। রাজনীতি চিরদিনই রাজনীতি। ওর মধ্যে নীতির সন্ধান যেন অন্ধকার ঘরে কালো বেড়ালের সন্ধান, যে বেড়াল সেখানে নেই। আমি তাজ্জব বনে গেছি। অহিংসাবাদী না হলেও আমি ছিলুম নীতিনিষ্ঠ মানুষ। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় মার্কসবাদ হয়তো জয়ী হবে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনও তো আসবে। তখন দেখবে নিজেই সাম্রাজ্যবাদী সেজে বসে আছে।"

মিলি আরো লিখেছে "সাধারণ ইংরেজ এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। হিটলার যদি স্টালিনকে হারিয়ে দেনও তবু এত বেশী বলক্ষয় করবেন যে তার পরে আর ইংরেজের সঙ্গে বলপরীক্ষায় নামবেন না। ততদিনে ইংরেজের বিমানশক্তি তার নৌশক্তির মতো দুর্বার হয়ে থাকবে। আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে জার্মানীর সব ক'টা শহরকে ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে ছাড়বে। ওদের এয়ারফোর্সে এখন বাঙালী যুবকদেরও

নিচ্ছে। যারা এদেশে পড়াশুনা করেছে তাদের কয়েকজন এয়ারফোর্সে যোগ দিয়ে সমান ব্যবহার পাচ্ছে। ওদের যোগ্যতার জোরে ওদের যদি পদোন্নতি হয় তা হলে ওরা হবে ওদের অধীনস্থ ইংরেজ ক্যাডেটদের উপরওয়ালা। আর কেউ বলতে পারবে না যে বাঙালীরা অসামরিক জাতি। সেই অপমানের প্রতিবাদেই না সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। তবে কাজটা ভীষণ বিপজ্জনক। এর মধ্যেই একটি সোনার চাঁদ ছেলে প্রাণ হারিয়েছে। ওর মা ওকে বারো বছর বয়স থেকে বিলেতে এনে মানুষ করেছিলেন। একমাত্র সন্তান। ওঁকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। দিনরাত ঠাকুরঘরে বসে প্রার্থনা করছেন। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল ফুরিয়ে গেছে। সরকার থেকে একটা মেডেল পাঠিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধের ডেস্‌পাচে সুপর্ণ হাজরার বীরত্বের সম্মানসূচক উল্লেখ আছে। বেঁচে থাকলে সুপর্ণ একদিন এয়ার মার্শল হয়ে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করত। বাঙালীর কেন বলছি, ভারতীয়ের। এদেশে আমরা সবাই ইণ্ডিয়ান।"

এ চিঠি পড়ে যূথিকা কেঁদে আকুল। বিদেশে বিভুঁইয়ে অপঘাতে মারা গেল ছেলেটি। আহা রে! ওর মা বাবা কেমন করে প্রাণ ধরে সহ্য করবেন।

"ছেলেটিকে আমি দেখেছি।" মানস বলে, "আমার বোর্ডিং হাউসেই ওঁরা তিনজনে এসে ওঠেন। বাবা আই. এম. এস. অফিসার। ছুটির শেষে দেশে ফেরেন। ছেলে ভর্তি হয় এক নামকরা প্রাইভেট স্কুলে। মা কাছাকাছি বাসা নেন। আমিও বাসাবদল করি। দিব্যি সপ্রতিভ ছেলে। ওই বয়সেই বন্দুক চালাতে শিখেছে। কী করা যায়, বলো! যুদ্ধ মানেই প্রাণ নিয়ে জুয়াখেলা। দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন দেখবে তোমার ছেলেকেও দরকার হলে কন্‌স্ক্রিপ্ট করবে। স্বাধীনতা আর দায়িত্ব একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একটা স্বাধীন জাতিকে কী পরিমাণ মূল্য দিতে হয় তা তো ইউরোপে গিয়ে দেখেছি। অক্‌সফোর্ড কেমব্রিজের প্রত্যেকটি কলেজে উৎকীর্ণ রয়েছে সেইসব সোনার চাঁদ ছেলের নাম যারা যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসেনি। দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। তাদের জন্যে যারা অপেক্ষা করেছিল সেইসব মেয়েদের আর বর জোটেনি। জুটবেও না। তারা চিরকুমারী হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে। আলাপও হলো তেমন কয়েকজনের সঙ্গে। একদিক থেকে যেমন ওদের ক্ষতি হলো তেমনি আরেক দিক থেকে লাভ। মেয়েদের জন্যে অনেকগুলি বন্ধ দরজা খুলে গেছে। আফিসে আদালতে কলকারখানায় স্কুল কলেজে সর্বত্র ওদের দেখতে পাওয়া যায়। পার্লামেন্টেও। ক্যাবিনেটেও। তবে আর্মি নেভি এয়ার ফোর্সে ওদের প্রবেশ নিষেধ। সিভিল সার্ভিসের উচ্চতম পর্যায়েও তাই। অক্‌সফোর্ড কেমব্রিজে মেয়েদের জন্যে আলাদা কলেজ। সাধারণ কলেজে ঢুকতে দেয় না। কারণ কলেজমাত্রই রেশিডেনশিয়াল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেখানেও মেয়েরা চড়াও হবে।" মানস মুচকি হাসে।

যূথিকা শিউরে ওঠে। "না, না, অত বেশী অবাধ স্বাধীনতা ভালো নয়। ছেলেদের হস্‌টেলে মেয়ে! মেয়েদের হস্‌টেলে ছেলে! ভাবতে পারা যায় এর জের কতদূর গড়াবে? এর ফল কী হবে?"

মানস কৌতুক করে বলে, "ফল কিছুই হবে না। বার্থ কন্ট্রোল আজকাল কারো অজনা নয়। আর ফল হলেই বা কী? ওদেশের সমাজ আগের চেয়ে উদার হয়েছে। এর পর আরো উদার হবে। তুমি কি জানতে যে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ছিলেন কুন্তীপুত্র? তাতে তাঁর রাজ্যলাভ আটকায়নি। তাঁর স্ত্রীভাগ্যও ছিল ঈর্ষার বিষয়। তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন গ্ল্যাডস্টোন বংশের কন্যা।"

যূথিকা উদার হলেও অত বেশী উদার হতে অনিচ্ছুক। তার মধ্যে মাতৃমাতামহীর সংস্কার যথেষ্ট সক্রিয়। বলে, " ছেলেদের সাত খুন মাফ বলে মেয়েদেরও সাত খুন মাফ, এটা ওদেশের সমাজ মেনে নিলেও এদেশের সমাজ মেনে নেবে না। ছেলেদের কী? মেয়েরাই পশতাবে। সব দরজা খুলে যাচ্ছে, যাক। খুলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু তুমিই তো বলেছ, স্বাধীনতা আর দায়িত্ব একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যারা স্বাধীনা হবে তারা দায়িত্বশীলাও হবে। সন্তানের দায়িত্ব নেবে না, এমন কথা যদি কোনো মেয়ে ভাবে তবে সে কোনোদিন মা হবার আনন্দ পাবে না। সে হয়তো এবেলা আফিস করবে, ওবেলা

পার্টিতে যাবে, যখন খুশি দেশে বিদেশে ঘুরবে। কিন্তু তার কোল শূন্য। তাব দোলনা শূন্য। তাব নার্সারি শূন্য। তার জীবন অপূর্ণ।"

মানসের মনে পড়ে স্বপনদা একবার চার্লস ল্যাম্বের 'ড্রিম চিলড্রেন' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। "The children of Alice call Bertram their father."

"স্বপনদার জীবনটাও চার্লস ল্যাম্বের মতো অপূর্ণ থেকে যেতে পারে।" মানস আক্ষেপ করে।

" কেন? কেন?" যূথিকা জানতে উৎসুক হয়।

"কারণ ওকে বাবা বলবার মতো কেউ নেই।" মানস উত্তর দেয়।

।। সাত ।।

পুজোর ছুটিতে মানস কলকাতায় যায় ও স্বপনদার অতিথি হয়। এবার আলাপ হয় দীপিকা বৌদির সঙ্গে। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আরো একজন আলাপ করতে আগুয়ান হয়। "এল্‌ফ" নাম শুনে মানসের মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার ইংরেজী প্রাইমারের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ছবি। একটি কুকুর। তার মুখে একটা ছাতা।

"এ নাম আপনি কোথায় পেলেন, বৌদি?" মানস জানতে চায়।

"আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এ নামটা আপনার চেনা। আগে তো শুনি আপনি কোথায় চিনলেন।" বৌদি ধরাছোঁয়া দেন না।

"আমার চেনা এল্‌ফের মুখে ছিল একটা ছাতা। নামে মিলছে। জাতে মিলছে না। না, জ্যান্ত কুকুর নয়, ছবির কুকুর। বইখানার নাম বোধহয় রয়াল রীডার। স্পষ্ট মনে আছে ওকে। কিন্তু এ কুকুর সে কুকুর নয়।" মানস ঘাড় নাড়ে।

বৌদি হাসি চেপে বলেন, " সে কুকুর কি এতকাল বেঁচে থাকতে পারে! তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন। ও বই আমিও পড়েছি। ও নাম আমার মনে ছিল। তাই ওই নামই এই বাচ্চারও রাখি। ওটা ছিল বোধহয় টেরিয়ার। ফক্স টেরিয়ার। এটা হলো পোমেরানিয়ান। কিন্তু একে আমি ছাতা ধরাতে পারিনি। বিষম অবাধ্য।"

তা শুনে এল্‌ফ ঘেউ ঘেউ করে প্রতিবাদ ঘোষণা করে।

"দ্যাখ, মানু, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল। এখন কুকুরকে ছেড়ে একটু মানুষেব দিকে নজর দাও দেখি। তোমার স্মৃতিশক্তি কত প্রখর তার পরীক্ষা তুমি দিয়েছ। বোঝা যাচ্ছে তোমার বৌদি আর তুমি সমবয়সী।"

"তাই তো মনে হচ্ছে। তবে আমি এক বছর অসুখে ভুগে পেছিয়ে পড়েছিলুম। হয়তো সেই কারণে আমিই বয়সে বড়ো। যদিও সম্পর্কে তিনিই বড়ো। তা ছাড়া আমার স্কুলে ভর্তি হতেও বছরখানেক দেরি হয়েছিল।" মানস বিবৃত করে।

"এখন আমার কথাটা মন দিয়ে শোন দেখি।" স্বপনদা বিষয়ান্তরে যান।

"বলো, কী বলতে চাও।" মানস উৎকর্ণ।

"ক্যারামেলকে জেলখানায় দেখে এসেছি। ও মেয়ে কিছুতেই বাড়ী আসবে না। বলে, জেল থেকে মুক্তি অর্থহীন উক্তি। গোটা দেশটাই তো ইংরেজের জেল। ওরা একটা মশা মাছিকেও ভারতের বাইরে যেতে দেয় না। এমন কড়া পাহারা। শুনছি একমাত্র সুভাষদাই ওদের ছোট বড়ো দু'রকম জেল থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। তা আমি তো ওঁর মতো সন্ন্যাসিনী সেজে মহাপ্রস্থানের পথে নিখোঁজ হতে পারব না! ওঁকে নাকি শেষ দেখা গেছে বদরীনাথে। যত সব কক অ্যাণ্ড বুল স্টোরি। সুভাষ আমার

সহপাঠী। ওকে আমি ভালো করেই চিনি। যদিও ইদানীং যোগাযোগ ছিল না। ও এখন পুরোপুরি রাজনীতির লোক। ছাত্রবয়সে একবার সন্ন্যাসী হবার জন্যে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল শুনেছি। তা বলে ও সন্ন্যাসী নয়। দেশ যতদিন না স্বাধীন হয়েছে ততদিন ব্রহ্মচর্যব্রতধারী। তার মানে আরো পনেরো বছর। যখন পলাশীর দ্বিশতবার্ষিকী ও সিপাইবিদ্রোহের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে ইংরেজকে নড়ানো যাবে না। যদি না ইউরোপে ওরা ঘোরতরভাবে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্রোত যদি না ঘোরালো হয়।'' স্বপনদা যতদূর বোঝেন।

মানস দুঃখিত হয় জুলির জন্যে। স্বামী নেই, সংসার নেই, দায়দায়িত্ব নেই। কিসের আকর্ষণে জেলের বাইরে আসতে চাইবে? আজকাল জেলটাও তো একটা ক্লাব। ভদ্রঘরের মহিলারাও সে ক্লাবের মেম্বর। তবু ওটা জেল, ওর চারদিকে বেষ্টনী।

''তুমি যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও তো ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ও মেয়ে এই এল্‌ফের মতোই অবাধ্য।'' স্বপনদা আফসোস করেন।

এল্‌ফ ততক্ষণে মানসের পায়ের কাছে গা এলিয়ে দিয়েছে। এবার শুধু ল্যাজ নেড়ে মৃদু প্রতিবাদ জানায়। মানস তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। কী নরম লোম!

''আমার জেলা হলে আমি পদাধিকার বলে যেতুম। এখানে আমি পদাধিকারী নই। কোন্ সুবাদে যাব? তুমি যেতে পারো আসামীপক্ষের কৌসুলী পরিচয়ে। তা ছাড়া আরো কয়েকটা মাস সবুর করলে তো ওরা সবাই ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসবে।'' মানস দত্তবিশ্বাসের উপর বিশ্বাস রেখে আভাস দেয়।

''কই, এমন কথা তো খবরের কাগজে লিখছে না?'' স্বপনদা বিস্মিত হন।

''লিখছে আমার নিজস্ব সংবাদদাতা। লণ্ডন থেকে। ওখানকার নেতারা এখানকার নেতাদের সঙ্গে একটা আঁতাত করদিয়াল কামনা করেন। কথাবার্তা চালাতে হলে তাঁদের জেল থেকে খালাস দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনুচরদের। সেইসূত্রে আমাদের জুলিকেও। যার নাম রেখেছ ক্যারামেল।'' মানস খোলসা করে।

'' তা হলে তো আনন্দের বিষয়। কিন্তু আজকাল আমি রাজনৈতিক ব্যাপারে সীনিক বনে গেছি। যেই শুনব ওদেশের নেতাদের সঙ্গে এদেশের নেতাদের আঁতাত করদিয়াল হয়েছে অমনি শুনব আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে আত্মপ্রকাশ করেছেন বামপন্থী মহানায়ক সুভাষচন্দ্র। আবার তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে দাঁড়াবেন। বাধা দিলে আর কাউকে দাঁড় করাবেন। আপসবিরোধী সংগ্রাম চালাবেন। বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের খেদিয়ে কংগ্রেস ক্যাপচার করবে। তখন কোথায় থাকবে তোমার আঁতাত করদিয়াল? তা নয় তো কংগ্রেস ভেঙে দু'ভাগ হবে। একভাগ সরকারের পক্ষে, আরেকভাগ সরকারের বিপক্ষে। গান্ধীজী কি কংগ্রেসকে ভেঙে দু'ভাগ হতে দেবেন। দক্ষিণপন্থীদের বলবেন পদত্যাগ করে জেলে ফিরে যেতে। তখন বামপন্থীরাও ফিরে যাবেন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে।'' স্বপনদা ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

''তা হলে জুলি বেচারির কী আশা।'' দীপিকাদি মুখ খোলেন।

''কিছুমাত্র না। ওর কপালে জেল কিংবা আণ্ডারগ্রাউণ্ড। ও তারজন্য প্রস্তুত। ওর চেয়ে ঢের বেশী প্র্যাকটিকাল বাবলী। যার নাম দিয়েছি চকোলেট। ও ভালো করেই বোঝে যে যুদ্ধ শেষ না হলে স্বাধীনতা হবে না। হতে পারে কেন্দ্রে রদবদল। সেটা স্বাধীনতা নয়। সেটার জন্যে জেলে যাওয়া নিরর্থক। আণ্ডারগ্রাউণ্ড তো আরো বিপজ্জনক। চকোলেট এখন ওর কমবেডদের নিয়ে কমিউন গঠনের কাজ হাতে নিয়েছে। ওরা কেউ বাড়ীতে থাকে না। থাকে ভাড়াটে বাসায়। বাইরে তার নাম সঙ্ঘ। ভিতরে তার নাম কমিউন। পুলিশ জানে। কিন্তু হস্তক্ষেপ করে না। ওরা তো শত্রুপক্ষের চর নয়, মিত্রপক্ষের লোক। চকোলেট মাঝে মাঝে আসে। তোমার বৌদির সঙ্গে ওর খুব ভাব। এল্‌ফকে আদর করে। চুমু খায়। বৌদি ওর হাতে একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দেন। চকোলেট কিনে খেতে। কথাবার্তা চোখে

চোখে হয়।" স্বপনদা হাসেন।

"এসব গোপন কথা তুমি ফাঁস করছ কোন্ আক্কেলে? তোমার বন্ধু ঠাওরাবেন আমিও একজন কমিউনিস্ট। আমার কুকুরকে যে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি। তোমাকে বলেছি, লাভ্ মী, লাভ্ মাই ডগ। বাবলীকে বলেছি লাভ্ মাই ডগ, লাভ্ মী। ওটা ভালোবাসার পুরস্কার।" দীপিকাদিও হাসেন।

মানস তা শুনে এলফের কপালে একবার মুখ ছুঁইয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। তিনজনেই হেসে ওঠে। আর এলফ ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ে।

স্বপনদা বলেন, "জানো তো, চকোলেটের সঙ্গে ক্যারামেলের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ক্যারামেল চকোলেটকে বলে স্টালিনের স্পাই। চকোলেট ক্যারামেলকে বলে হিটলারের স্পাই।"

মানস গভীর বেদনা বোধ করে। বলে, "এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে! কোথায় হিটলার আর স্টালিন! কোথায় বাবলী আর জুলি! ওরা লড়াই করে মরছে বলে এরাও লড়াই করে মরবে!"

"না, না, মরবে না।" স্বপনদা অভয় দেন। "আমার কাছে আসবে। চকোলেট আর ক্যারামেল খাবে। ক্যারামেল কখনো হিটলারের চর হতে পারে না। সে তার স্বদেশকে ভালোবাসে। চকোলেটও কখনো স্টালিনের চর হতে পারে না। সে তো দেশের জন্যে সাহেব মেরে ফাঁসী যেতে তৈরি হয়েছিল। মুশকিল হয়েছে এই যে বামপন্থীদের দুই গোষ্ঠীর দুই বিপরীত পলিসি। এক গোষ্ঠী দেশের স্বাধীনতার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অসহযোগ করবে। আরেক গোষ্ঠী রুশের স্বাধীনতার জন্যে ফাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। দেশের স্বাধীনতা আগে না রুশের স্বাধীনতা আগে? এই নিয়ে আড়াআড়ি।"

"আড়াআড়ি থেকে ছাড়াছাড়ি। ছাড়াছাড়ি থেকে মারামারি।" মানস ভয় দেখায়। "ক্ষমতা হাতে পেলে একপক্ষ অপরপক্ষকে অংশ দেবে না। বিরোধিতা করলে জেলে পুরবে। সশস্ত্র বিরোধিতা করলে প্রাণে মারবে।"

স্বপনদার মনে পড়ে যায় বাবলী ওঁকে জানিয়েছিল জুলি নাকি ওকে শাসিয়েছে যে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলীতে মারা হবে।

"ওটা নিছক তামাশা করে বলা। সীরিয়াস ভাবে নিতে নেই। চকোলেটকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। ক্যারামেলকেও ঠাণ্ডা করব।" স্বপনদা কথা দেন।

"কিন্তু ওদের গোষ্ঠীদের তুমি কী করে বোঝাবে? এ তো আরো একটা কুরুক্ষেত্রের সূচিমুখ। ইংরেজদের বিদায়ের পরে ফাল হয়ে বেরোবে। তখন তুমি জুলিকে বাঁচাতে পারবে না, বাবলীকেও না।" মানস শিউরে ওঠে।

"আরো একটা কুরুক্ষেত্র?" স্বপনদা জেরা করেন। "কোন্‌টার কথা ভেবে একথা বলছ, মানু?"

"কেন? হিন্দু মুসলমানের শরিকী দ্বন্দ্ব? কে না জানে সেটা চরমে উঠবে, যেদিন ইংরেজ বিদায় নেবে? যদি না ইতিমধ্যে একটা মিটমাট হয়। কিংবা সঙ্গে সঙ্গে।" মানস ব্যাখ্যা করে।

"সেইজন্যেই তো আমি সহসা ইংরেজবিদায়ের পক্ষপাতি নই। আগে সব দিক সামলাও। তারপর ওদের বিদায় দাও। ওরা তো এতদিন সব দিক সামলেছে। কুরুক্ষেত্র বাধতে দেয়নি। যতদিন থাকবে, দেবেও না।" স্বপনদার দৃঢ় বিশ্বাস।

"সহসা ইংরেজবিদায় আমিও কি চাই?" মানস বলে, "কিন্তু সব দিক সামলানো পনেরো বছর পরেও সুগম হবে না, স্বপনদা। পলাশীর দ্বিশতবার্ষিকীর দিন যদি ওরা বিদায় হয় তো সেইদিনই বাধবে শরিকী দ্বন্দ্ব থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। যদি না ইতিমধ্যে একটা সর্বসম্মত সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।"

"তা হলে সেটাই আমাদের নিয়তি। বছর পনেরোর মধ্যে যদি সমাধান না মেলে তবে কোনোদিনই মিলবে না। পনেরো বছরের পর একটা দিনও আমি অপেক্ষা করব না। কুরুক্ষেত্রের ঝুঁকি নেব।"

স্বপনদার ধৈর্যেরও সীমা আছে।

"তোমার মতো কূর্ম অবতার আমি নই।" দীপিকাদি উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন। "যুদ্ধের সুযোগ নিতে যদি না চাও তো যুদ্ধের পরেই বিদায়ের নোটিশ দিয়ো। যুদ্ধ সারা হতে কি পনেরো বছর লাগবে?"

"ঐতিহাসিক নিয়তি বলে যদি কিছু থাকে তবে শতাব্দীর ছাপ্পান্ন সাতান্ন সালই ভারতবর্ষের নিয়তিনির্ধারক। পলাশীর যুদ্ধের একশো বছর আগে শাহ্ জাহানের পুত্রদের শরিকী যুদ্ধ। তার একশো বছর আগে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ।" স্বপনদা বিবরণ দেন। তার পরে যোগ করেন, "তেমনি পলাশীর একশো বছর পরে সিপাইবিদ্রোহ। তার একশো বছর বাদে ব্রিটেন থেকে রোমান অপসরণের মতো ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ অপসরণ।"

"তোমার ও থীসিসটি চমৎকার। তার জন্যে তোমাকে ডক্টোরেট দেওয়া উচিত।" উপহাস করেন দীপিকাদি। "কিন্তু তোমার ওই হিস্টরিক্যাল ডিটারমিনিজম যুক্তিনির্ভর নয়। এমনও হতে পারে যে এই যুদ্ধে রাশিয়ানদের হারিয়ে দিয়ে জার্মানরা ইরানের পথে ভারতে ঢুকবে। কিংবা জার্মানদের হারিয়ে দিয়ে রাশিয়ানরা ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া করে আফগানিস্থান দিয়ে ভারতে ঢুকবে। সেটাও হবে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক আক্রমণগুলোর মতো বহিঃশত্রুর আক্রমণ। তখন ইংরেজরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা সঁপে দিয়ে ভারতরক্ষার দায় এড়াতে পারে। নয়তো তখন ভারতীয়রাই ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ভারতরক্ষার দায় বহন করতে পারে। এর জন্যে পনেরো বছর অপেক্ষা করতে হবে কেন? যা হবার তা সাত আট বছরের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

স্বপনদা কোণঠাসা হয়ে মানসের দিকে তাকান। মানস বলে, "রাশিয়া ভারত আক্রমণ করবে না। তার দৃষ্টি পশ্চিমমুখী। পশ্চিমে রয়েছে আমেরিকা। আর জার্মানী? সে যখন ভারতের পথে তুরস্কে বা ইরানে পদার্পণ করবে তখন দেখবে ইংরেজরা ও ভারতীয়রা সেখানে গিয়ে বসে আছে। যেমন জাপানের পথরোধ করতে সিঙ্গাপুরে ও মালয়ে গিয়ে বসে আছে। ওরা চলে ডালে ডালে তো এরা চলে পাতায় পাতায়। এদের সামনে খোলা রয়েছে কেবল ভারতের মানচিত্র নয় গোটা পৃথিবীর মানচিত্র। দাবাখেলার ছকের উপরে যে যার ঘুঁটি সাজিয়ে বসেছে। একপক্ষ চাল দিলে অপরপক্ষ পালটা চাল দিচ্ছে। আমরা সবটা দেখতে পাচ্ছিনে। কারণ আমরা কেবল স্বদেশের মানচিত্রই দেখছি। আর আমাদের দাবা খেলার ছক যুদ্ধের নয়, সত্যাগ্রহের।"

"বাঁচা গেল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ সুদূরপরাহত। তা হলে দীপিকার থীসিসটা কেঁচে যায়। ওকে কেউ ডক্টোরেট দেবে না।" স্বপনদা পরিহাস করেন।

"তা বলে ইংরেজ রাজত্ব আরো পনেরো বছর! গান্ধী, জিন্না, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ততদিন বেঁচে থাকবেন!" দীপিকাদি অধীরতা প্রকাশ করেন।

"একটা নেশনের জীবনে পনেরো বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। গান্ধী, জিন্না, বল্লভভাই বেঁচে না থাকতে পারেন, নেহরু, বোস, আজাদ বেঁচে থাকবেন। দেখতে হবে শাহ্ জাহানের পুত্রদের মতো শরিকী যুদ্ধ যাতে না বাধে। তা ছাড়া দু'শো বছরের একটা সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিতে যদি পনেরো বছর সময় লেগে যায় সেটা কি খুব বেশী সময়? তার কমে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা স্বাভাবিক। দক্ষিণ বামের অন্তর্দ্বন্দ্বটাও উপর থেকে তল পর্যন্ত ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে। কংগ্রেসের কি আর সেই সংহতি আছে? যাঁরা একজোট হয়ে একটা পার্টি চালাতে পারেন না তাঁরা একজোট হয়ে একটা মহাদেশ চালাবেন! রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপ যত বড়ো একা ভারতবর্ষ তত বড়ো আর তত বিচিত্র। পনেরো বছরের মধ্যে যদি এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর না হয় তো হিন্দু মুসলিম গৃহযুদ্ধের মতো বাম দক্ষিণ গৃহযুদ্ধও অরাজকতা ডেকে আনবে। পরাধীনতার পরিবর্তে অরাজকতা, স্বরাজ বলতে কি এই বোঝায়? বুঝলে, রানু, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো। ইংরেজ থাকতে সোয়াস্তি আছে। এখনো ওরা একটা বড়ো মাপের দুর্ভিক্ষ হতে

দেয়নি। একটা বড়ো গোছের দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতে দেয়নি। মাথা তুলতে দেয়নি দেশীয় রাজাদের। নাক গলাতে দেয়নি বাইরের শত্রুদের। ওদের ত্যক্ত সিংহাসনে যাঁরা বসবেন তাঁরা কি এসব কর্তব্য পালন করতে পারবেন? বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন ভোজরাজের জন্যে নয়।" স্বপনদা স্মরণ করেন।

পরের দিন স্বপনদা মানসকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, "আচ্ছা, তুমিও কি কথায় কথায় বল না, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো? তোমার বৌ কি সেটা গায়ে পেতে নেয়, রাগ করে, খোঁটা দেয়, রাতে জাগিয়ে রাখে, সকাল না হতেই কুকুরকে বেড়াতে নিয়ে যায়? তা হলে শোন, বলি। তোমার বৌদির ধারণা তিনি আমাকে সুখী করেননি, শুধু সোয়াস্তি দিয়েছেন। তাঁর অপরাধ তিনি তো বাঁশরি নন। আমি ওঁকে কি করে বোঝাই যে ওঁর ধারণাটা ভুল। বাঁশরির সঙ্গে বিয়ে হলেও আমি সুখী হতুম না, যদি আমাকে বিলেত যেতে না দেওয়া হতো, জার্মানীতে ও ফ্রান্সে থাকতে না দেওয়া হতো, ব্যারিস্টার হতে না দিয়ে ফিরিয়ে আনা হতো। আমি কি তেমনি মানুষ যে বৌ আর বাচ্চা নিয়েই সুখী হতে পারি? আমি সব চেয়ে সুখী হই যখন সৃষ্টিকর্তার মতো সৃষ্টি করি। অথচ সে সুখ যেন দশমাস গর্ভধারণের পর প্রসবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির সুখ। আমার সুখদুঃখের নিরিখই আলাদা। তুমি তো তখন এখানে ছিলে না, থাকলে দেখতে আমি দরজা জানলা বন্ধ করে চব্বিশ ঘণ্টা কেবল কেঁদেছি। জল ছাড়া আর কিছু খাইনি।"

মানস চমকে ওঠে। "কেন? কী ব্যাপার? দাম্পত্য কলহ?"

"আরে, না, না। তোমার বৌদি তখন কোথায়? বিয়ের আগের ঘটনা। প্যারিসের পতন। মনে আছে ফ্রাঙ্কোপ্রাশিয়ান ওয়ারের সময় ফরাসীরা চারমাস কাল প্রাশিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখে। শহরে ঢুকতে দেয় না। গত মহাযুদ্ধে তো জার্মানদের প্যারিসের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয়নি। শহর থেকে বহুদূরে জবর লড়েছে। এবার কোথায় লড়াই? কোথায় কী? রাজধানীটা বিনা যুদ্ধেই ছেড়ে দিল। ছাড়ল যদি তো রাশিয়ানদের মতো পুড়িয়ে দিয়ে গেল না কেন? মনে আছে রাশিয়ানরা নেপোলিয়নের সৈন্যদের বেলা কী করেছিল? ওদের মস্কো দখল করতে দিল তা ঠিক, কিন্তু ওদের সঙ্গে একজনও সহযোগিতা করল না। সে এক গৌরবময় দিন। এবারেও রাশিয়ার লোক হিটলারের সৈন্যদের মস্কো ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু তার আগে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে। একজনও সহযোগিতা করবে না। ফরাসীরা প্যারিস ছেড়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে দেয়নি, নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এ দুঃখ আমার যাবে না। আমি যে মনে প্রাণে ওদের একজন হতে চেয়েছি।" বলতে বলতে স্বপনদার গলা ধরে আসে। তিনি রুমাল ধার করে চোখের উপর রাখেন।

মানস তাকে সমবেদনা জানায়। "ফরাসীরা এবার তৈরি ছিল না। হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে যায়। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর স্রোত সৈন্য চলাচলে বাধা দেয়। তবে এটাও ঠিক যে ওরা প্রাণ ধরে প্যারিসকে পুড়তে দিত না। আগুন নেভাতে প্রাণ দিত। প্যারিস যে ওদের প্রাণকেন্দ্র। মস্কো সেই অর্থে রাশিয়ানদের প্রাণকেন্দ্র নয়। তবে এটাও ঠিক যে রাশিয়ানরা তখনো সহযোগিতা করেনি, এখনো করবে না। ওরা হাজার মাইল হটে যেতে পারে, কিন্তু সহযোগিতা কিছুতেই না।"

"আর শুনেছ? রম্যা রলাঁ এতকাল নাৎসীদের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ করে অবশেষে ফিরে গেছেন নাৎসী অধিকৃত এলাকায় স্বগ্রামে? বেঠোভেনই তাঁর শেষ অবলম্বন। যেমন ছিল আদি অবলম্বন। নাৎসীরা কেন বাদ সাধবে? বেঠোভেন তো জার্মানদেরই। বড়ো দুঃখ হয় ওঁর কথা ভেবে। প্রথম মহাযুদ্ধে 'above the battle'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও যুদ্ধের ঊর্ধ্বে নন, ফাসিস্টবিরোধী। কিন্তু ফ্রান্সের পরাজয়ের পর নির্বিরোধী।"

"তুমিও তো তাই।" মানস রলাঁর পক্ষ নেয়।

"এই যুদ্ধে আমিও above the battle, যুদ্ধের ঊর্ধ্বে। তা বলে কি ফাসিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ

ফরাসীদের উচিত হয়েছে?"

"তবে প্রতিরোধের সংবাদও আসছে ফ্রান্সের সারস্বত মহল থেকে।" মানস বলে।

"তুমি কি বুঝতে পারছ না, মানু, যে গোটা প্যারিস শহরটাই এখন নাৎসীদের হাতে হস্‌টেজ? ওদের গায়ে আঁচড়টি লাগলে সারা শহরটাকেই ওরা পুড়িয়ে দেবে। ফরাসীরা যমকেও তত ভয় করে না, যত ভয় করে সংস্কৃতির স্মৃতিলোপকে। প্যারিসের প্রত্যেকটি পাথরের একটা ইতিহাস আছে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে প্রতিশোধটা ডেকে আনা হবে তার ভয়ে সংস্কৃতিসচেতন মানুষমাত্রেই কাতর। নাৎসীদের বর্বরতা সেকালের সেই গথদের পথ ধরেছে। সেবার ঘটে রোমের পতন। এবার ঘটেছে প্যারিসের পতন। আমার কাছে এটি একটি প্রতীকী ঘটনা। একালের রোম তো লণ্ডন বা ওয়াশিংটন নয়, প্যারিস। সামরিক অর্থে নয়, সাংস্কৃতিক অর্থে। প্যারিস আজ যা ভাবে, আজ যা আঁকে, আজ যে ফ্যাশন ডিজাইন করে অবশিষ্ট পৃথিবী কাল তা ভাবে, কাল তা আঁকে, কাল তা অনুকরণ করে। কমিউনিস্ট রাশিয়াও বাদ যায় না। তা যদি হয় তবে প্যারিসের পতন হচ্ছে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পতন। আর সেটা তো একমাত্র আধুনিক সভ্যতা। প্রাচ্য সভ্যতামাত্রেই প্রাচীন। আমরা একটি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক হতে চাইলে আমাদের মুখ ফেরাতে হয় পশ্চিম দিকেই। রামমোহন বলো, কেশবচন্দ্র বলো, বিবেকানন্দ বলো, অরবিন্দ বলো, গান্ধী বলো, রবীন্দ্রনাথ বলো, প্রাচ্য সভ্যতার কোন্ প্রতিনিধি পাশ্চাত্য অভিমুখে যাত্রা করেননি ও আধুনিকতার আলোকে প্রাচীনের পুনর্বিচার করেননি? কিন্তু প্যারিসের পতনের পর প্রতিক্রিয়ার সূচনা হতে পারে। রিভাইভালিজম মাথা চাড়া দিতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়ে সতীদাহ ফিরিয়ে আনতে পারে।" বলতে বলতে আঁতকে ওঠেন স্বপনদা।

"না, না, স্বপনদা, গান্ধী থাকতে, নেহরু থাকতে সেটা সম্ভব হবে না। নারীশক্তিও কুণ্ডলিনীশক্তির মতো জাগ্রত।" মানস রসিকতা করে।

"সেটা শুধু স্বামীদের জাগিয়ে রাখার জন্যে।" স্বপনদাও রসিকতা করেন। গম্ভীর হয়ে বলেন, "গান্ধী, নেহরু কি আরো পনেরো বছর বেঁচে থাকবেন।"

"তুমি দেখছি ধরে নিয়েছ যে ছাপ্পান্ন কি সাতান্ন সালের আগে ভারতের মুক্তি নেই। এটা কিন্তু আধুনিক মনের যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস নয়, এটাও এক প্রকার দৈববাদ। গণশক্তি জাগ্রত হলে আরো আগে ভারত স্বাধীন হতে পারে। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা, বিনা ত্যাগসে স্বরাজ। গণসত্যাগ্রহ হচ্ছে ত্যাগশক্তির পরীক্ষা। দেশের লোক ত্যাগশক্তির পরীক্ষা একটার পর একটা দিয়ে এসেছে, এখনো একটা কি দুটো বাকী। ইংরেজরা কি চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষা না দেখে যাবে?" মানস বিষণ্ণ বোধ করে।

দীপিকাদি বাড়ী ফেরেন। এলফ পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে।

"তোমরা দু'জনে মিলে নতুন কী ম্যানিফেস্টো রচনা করতে যাচ্ছ, মার্কস আর এঙ্গেলস?" দীপিকাদি সন্দেহ করেন।

"ভালো কথা, মানু, তুমি কি লিবারল হিউম্যানিস্ট ম্যানিফেস্টো সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ? খুব মনে করিয়ে দিয়েছ রানু।" স্বপনদার মনে ছিল না এতক্ষণ।

"ভাবা কঠিন, লেখা তার চেয়ে কঠিন, কাজে পরিণত করা তার চেয়েও কঠিন। আমাদের আস্তে আস্তে এগোতে হবে।" মানস উত্তর দেয়। "বৌদি, আমরা এখন যা নিয়ে আলোচনা করছি তা ম্যানিফেস্টো নয়, তা দেশের স্বাধীনতা আর কতকাল পরে বা আগে।"

"ওঃ সেই হিস্‌টরিকাল ডিটারমিনিজম।" দীপিকাদি বিদ্রূপ করেন।

স্বপনদা উত্তপ্ত হয়ে বলেন, "ইংরেজের পরেই প্লাবন। চতুর্দশ লুই যেমন বলেছিলেন নিজের সম্বন্ধে।"

"অর্থাৎ প্লাবনকে তুমি আরো পনেরো বছর ঠেকিয়ে রাখতে চাও। তুমি সুধীন দত্তের 'উটপাখী'। তোমাকে লক্ষ করেই কবি বলেছেন 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে!' তোমার ধারণা ঘটনার স্রোত আরো পনেরো বছর অপেক্ষা করবে।" দীপিকাদি যেন চ্যালেঞ্জ করেন। আর মানসের দিকে তাকান।

"না, প্রলয় বন্ধ থাকবে কেন? প্রলয়ই যদি আমাদের নিয়তি হয়ে থাকে প্রলয় ঘটবে। আমার ভূমিকা দর্শকের ভূমিকা। আমি বালিতে মাথা গুঁজে থাকব না, একটু নিরাপদ দূরত্ব খুঁজে নিয়ে নাটকটা দেখব। ট্র্যাজেডী ছাড়া ওটা আর কী হতে পারে। স্বাধীন হলেই যদি ট্র্যাজেডী এড়ানো যেত তা হলে প্যারিসের পতন হতো না, ফ্রান্স দ্বিখণ্ড হতো না, একখণ্ড জার্মান অধিকৃত হতো না। দেখে শুনে আমি সীনিক বনে গেছি। কত বড়ো আদর্শবাদ নিয়ে ইউরোপে গেছলুম! ফিরে যখন আসি তখন অর্ধেক আদর্শবাদ। বাকীটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে আছি। সেটা কিন্তু ইংরেজদের মুখ চেয়ে। স্বদেশকে ওরা রক্ষা করতে পেরেছে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে, ওরাও যদি হেরে যায় তো সভ্যতার সঙ্কট আরো গভীর হবে। আমেরিকার উপরেই বর্তাবে উদ্ধারের দায়। ভারতের উপর নয়। ভারত বলতে ভারতের মুসলমানও বোঝায়। আমার প্রতিবেশী ওরা। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সদুত্তর পাইনে, পাওয়ার ভ্যাকুয়াম হলে সেটা পূরণ করবে কে? কংগ্রেসকে ওদের মজ্জাগত অবিশ্বাস। কংগ্রেস নাকি বর্ণচোরা হিন্দু। হিন্দু রাজত্বে ওরা বাস করবে না, ওদের জন্যে চাই মুসলিম রাজত্ব। যার এলাকা পাকিস্তান। আমিও তার মধ্যে পড়ি।" স্বপনদা করুণ স্বরে বলেন।

মানস তাঁকে অভয় দেয়। "ক্ষমতা যখন আসবে তখন দায়িত্ববোধও আসবে। কোনো দায়িত্বশীল মুসলমান কখনো পাকিস্তানের দাবী তুলে গৃহযুদ্ধ বাধাতে চাইবে না। তবে মাইনরিটির একটা স্বাভাবিক শঙ্কা আছে। ভোটের জোরে মেজরিটি একাই শাসন করবে এইখানেই শঙ্কার বীজ। হিন্দুরা যেখানে মাইনরিটি সেখানে তারাও শঙ্কিত। আন্তরিক প্রয়াস পেতে হবে স্বাভাবিক শঙ্কা দূর করতে। এটা তোমার আমার মতো লিবারল হিউমানিস্টদেরই কাজ। তাই দর্শকের ভূমিকা আমাদের নয়। প্রলয় নিবারণে আমাদেরও অংশ আছে।"

স্বপনদা স্বীকার করেন না। "না, ভাই, আমার কোনো অংশ নেই। আমার টাকা আমি বিলিতী ব্যাঙ্কে রাখি। সময় থাকতে আমার অ্যাকাউন্ট আমি বিলেতে ট্রান্সফার করে দেব। তার পরে বিলেতে গিয়ে প্র্যাকটিস করব। তোমার বৌদিকে নিয়েই দোটানা। উনি বরং দেহত্যাগ করবেন তবু দেশত্যাগ করবেন না। আমি কিন্তু অন্ধকার দেখছি। আলো যা এসেছিল ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। ওরা যেদিন চলে যাবে সেদিন ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবে। হাইকোর্টের তখন এ মহিমা থাকবে না, ব্যারিস্টারেরও এ মর্যাদা থাকবে না। হিন্দী বা উর্দুতে সওয়াল করা আমার কর্ম নয়। বাংলাকে কি কেউ আমল দেবে ভেবেছ? সব ক'টা পার্টিই তো অল ইণ্ডিয়া পার্টি। পার্টির উর্ধ্বতম স্তরে কোনো মেম্বর কি বাংলায় কথা বলেন? তুমি তো জানো আমি ছেলেবেলায় ছিলুম বাঙালী জাতীয়তাবাদী। আমার সেন্টিমেন্ট বাংলাদেশকে ঘিরে, ভারতকে ঘিরে নয়। ভারত একটা মহাদেশ। যেমন ইউরোপ। ইংরেজ ফরাসীরা যেমন ইউরোপীয় আমিও সেইরকম ভারতীয়। আর ওরা যেমন ইংরেজ ফরাসী আমিও তেমনি বাঙালী। আজকাল স্বাধীন বাংলার কথা কেউ বলেন না। আমিও মনে করি সেটা ধোপে টিকবে না। কারণ আমরা বাংলাদেশের চারদিকের সীমান্ত রক্ষা করতে পারব না। ফরাসীরাও কি পারল? ওদের তবু সৈন্যবল ছিল। আমাদের সৈন্যবল কই? এবারকার যুদ্ধে বেঙ্গলী রেজিমেন্ট নেই, লক্ষ করেছ? বাঙালীদের দিক থেকে দাবীও নেই।"

মানস ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বলে, "কথাটা ঠিক। এবার বেঙ্গলী রেজিমেন্ট অদৃশ্য। তা বলে বাঙালী রিক্রুটমেন্ট বন্ধ থাকছে না। বিস্তর লোক যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। মোল্লারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মসজিদে মীটিং করে মুসলমানদের দলে দলে আর্মিতে ভর্তি করে পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় পাঠাতে

সাহায্য করছে। ফিরে এসে ওরা পাকিস্তানের জন্যে লড়বে।"

"কই, এসব কথা তো কাগজে লেখে না?" বৌদি অবাক হন।

"যাহা নাহি কাগজে তাহা নাহি বাস্তবে।" মানস মশ্‌করা করে। "কিন্তু, বৌদি, বাঙালী আর রণবিমুখ নয়। যদি মুসলমানদের বাঙালী বলে গণ্য করেন। আর নয়তো ওরা একদিন পাকিস্তানী বলে গণ্য হতে বাধ্য হবে। ওদেরও তো একটা সেন্টিমেন্ট আছে। তার খবর রাখে ক'জন হিন্দু?"

"পরিতাপের বিষয়, মানছি।" বৌদি বলেন, "ওরা যদি ভারতবিমুখ হয় আমি ওদের দোষ দেব না, কারণ ভারত সত্যিই হিন্দুপ্রধান দেশ, হিন্দুপ্রধানই থাকবে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে তো সেকথা বলা চলে না। এ প্রদেশ মুসলিমপ্রধান। মুসলিমপ্রধানই থাকবে। বাঙালী মুসলমানের পক্ষে বাঙালী জাতীয়তাবাদই স্বাভাবিক। এতদিন ছিলও তাই। ইদানীং কেমন যেন মনে হচ্ছে যে ওরা আর বাঙালী বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নয়। বৃহত্তর মুসলিম সমাজে আসন পেতে হলে বাঙালী বলে পরিচয় দেওয়া যেন হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়া। যেন বাংলাভাষাটাও হিন্দুর ভাষা। উর্দুটাই মুসলমানের নিজস্ব। আমাদের প্রতিবেশীরাও বাংলায় কথা বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেন। তবে মীর সাহেবের কথা আলাদা। উনি প্রথমেই বাঙালী। ওঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওঁর বনিবনা হয় না। ওঁরা প্রথমেই মুসলমান।"

মীর সাহেবের মতো বাংলাপ্রেমিক মুসলমান কোনোদিনই পাকিস্তানী হবেন না। মানস সুনিশ্চিত। "কিন্তু তাঁর আপন সম্প্রদায়ে তিনি মাইনরিটিতে। এককালে যারা দলে দলে মুসলমান হয়ে যায় এখন যদি তারা দলে দলে পাকিস্তানী বনে যায় তো আমরা নিরুপায়। এ সমস্যা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

"আমার কথা যদি বল আমি বাঙালী মুসলিম রাজত্বে বাস করতে রাজী আছি, কিন্তু পাকিস্তানী মুসলিম রাজত্বে বাস করতে নারাজ।" স্বপনদা বলেন। "আশা করি সে রকম পরিস্থিতি কোনোদিন উদয় হবে না।"

"তা হলে ইংরেজকে পনেরো বছর কেন, আরো একশো বছর মাথায় করে রাখতে হয়। আমি তাতে নারাজ।" বৌদি সাফ কথা শুনিয়ে দেন।

"স্বাধীনতা বলতে পাকিস্তানী স্বাধীনতাও বোঝায়, রানু। দশ কোটি মানুষ যদি আলাদা হবার স্বাধীনতা চায় তবে তাদের সে স্বাধীনতা কি অস্বীকার করা যায়? স্বাধীনতা বলতে যেমন বিবাহের স্বাধীনতা বোঝায় তেমনি বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতাও কি বোঝায় না? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন ওরা এত অবুঝ হবে যে বিচ্ছেদ শ্রেয় মনে করবে? ধর্মের টানই কি সব? নাড়ীর টান কি তারই মতো একটা টান নয়? বাংলাদেশ, বাংলাভাষা, বাঙালী জাতিদেরই এসব কি কেবল হিন্দু টানে? মুসলমানদেরও টানে না? মায়ের দুই ছেলে সমান নয়, একজন বড়ো, একজন ছোট। কিন্তু মা তো দু'জনেরই মা? মাকে শুদ্ধু অস্বীকার করার প্রবণতা এল কোন্‌খান থেকে?" স্বপনদা সুধান।

"এল পাঞ্জাব থেকে। পাঞ্জাবী মুসলমানরাই এর উদ্‌গাতা। বিশেষ করে মহাকবি ইকবাল। আইডিয়াটা তাঁর, নামকরণটা রহমৎ আলী বলে একটি ছাত্রের। ইংরেজী বর্ণমালা থেকে প্রদেশের আদ্য অক্ষর নিয়ে একত্র গেঁথে হয়েছে পাকি, তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে স্তান। কিন্তু বাংলার 'ব' অক্ষর বর্জিত।" মানস উত্তর দেয়।

॥ আট ॥

ব্রেকফাস্টের পর স্বপনদা বলেন, "চল, আমরাও একটু বেড়িয়ে আসি। মীর আবদুল লতিফ সাহেবকে তো চেনো।"

মানস বলে, "একটা সভায় আলাপ হয়েছিল। চিঠিপত্রের সে আলাপ হৃদ্যতায় পরিণত হয়েছে।

উনিও সাহিত্যিক, আমিও সাহিত্যিক। আমার লেখার উনি পাঠক। ওঁর লেখার আমি। বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায়ও বহুদর্শী।"

"কিন্তু ওঁর প্র্যাকটিস তেমন জমল না। তাই পার্টটাইম চাকরি নিতে হয়েছে। ল কলেজে পড়ান। আমারও তো সেই দশা।" স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

মীর সাহেব তাঁর বৈঠকখানায় বসে তাঁর এক সম্পাদক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। বেল শুনে বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বলেন, "আইয়ে হুজরৎ, তশরিফ লাইয়ে।"

স্বপনদা অবাক হয়ে সুধান, "হঠাৎ উর্দু কেন?"

"আরে, সেইটেই তো আজকের দিনের জ্বলন্ত প্রশ্ন। তাই নিয়েই তো আমার সম্পাদক বন্ধু কামালউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। কী খাবেন, বলুন?" মীর সাহেব তাঁর খানসামাকে ডাক দেন।

"থাক, আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছি।" স্বপনদা আপত্তি করেন।

মীর সাহেব নাছোড়বান্দা। বাড়ীর তৈরি মোরব্বা খেতে হবে।

"পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।" স্বপনদা হাসেন।

কামালউদ্দীন সাহেব বলেন, "কথাটা মিথ্যে নয়। খানা খাইয়ে সায়েস্তা খান্ আমার পূর্বপুরুষকে ব্রাহ্মণ থেকে যবন করেন। হিন্দুরা তখনকার দিনে আমাদের যবনই বলত। মুসলমান বলে চিহ্নিত করা হয় ইংরেজ আমলেই।"

মীর সাহেব বলেন, "ওরা আমাদের যবন করেছে, কিন্তু জবান তো কেড়ে নেয়নি। আমরা চিরকাল বাংলায় কথা বলে এসেছি, বড়জোর দু'চারটে আরবী ফরাসী কথা ব্যবহার করেছি। জলকে 'পানী' তো হিন্দু পানীপাঁড়েরাও বলে। বিহারে গেলেই শোনা যায়। 'জী' বলে জবাব দেওয়া তো বিহারী হিন্দুদেরও অভ্যাস। আমরা যদি নবীজী বলি তো সেটা রামজী, গুরুজীর অনুসরণে। ধর্মে আমরা মুসলমান, ভাষায় বাঙালী। কিন্তু কলকাতার মুসলমান সমাজে দেখছি আমরা বাঙালী বলে পরিচয় দিলে যাকে বলে কল্কে পাইনে। উর্দুতে বাৎচিৎ করে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা যথার্থই মুসলমান। নয়তো কাফের। বাংলা নাকি কাফেরদের জবান।"

স্বপনদা কামালউদ্দীন সাহেবের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকান।

"মীর সাহেব বলতে সঙ্কোচ বোধ করবেন, তাই আমিই বলি, শুনুন। তাঁর পূর্বপুরুষ সুলতানী আমলের রইস। পাবনা জেলার একটি খানদানী বংশ। সারা উত্তরবঙ্গে সবাই ওঁদের এক ডাকে চেনে। কিন্তু ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতায় বসার পর থেকে তাঁকে কলকাতার মুসলমান সমাজে ব্যারিস্টার হিসাবে পরিচয় দিতে হয়েছে। বংশ পরিচয় কেউ জানেও না, জানতেও চায় না। এখন এই ব্যারিস্টার সাহেবের ডাক্তার ছেলে কলকাতার অভিজাত পরিবারেই বিয়ে করবে বলে বদ্ধপরিকর। তা করুক। মীর সাহেব ও তাঁর বেগম সায় দিলেন। বিয়ের পর দেখা গেল বৌমা শ্বশুরশাশুড়ীর সঙ্গে উর্দুতে কথা বলবেন, বাংলায় বললে তাঁর মানহানি হয়। কলকাতায় দু'পুরুষ বসবাস করে ওরা উর্দুভাষী বনে গেছে। নইলে ওদের আদিনিবাস তো নদীয়া মেহেরপুরে। কলকাতার বাঙালী মুসলমান এখন বাঙালী বলে পরিচয় দিতে নারাজ। তা হলে সে কী? বিহারী? পাঞ্জাবী? না, সে শুধু মুসলমান। মুসলমান কি একটা জাতির নাম? জিজ্ঞাসা করলে বলে, মুসলমানরা একটা জাতি, একটা নেশন। যেমন হিন্দুরা একটা জাতি, একটা নেশন। তাহলে বাঙালী কোথায় দাঁড়ায়? এর উত্তরে বলবে, বঙ্গালী তো হিন্দু। ও লোগ হিন্দু হ্যায়। আমরা এখন দোটানায় পড়েছি, গুপ্ত সাহেব। শ্যাম রাখি না কুল রাখি? ধর্ম রাখি না ভাষা রাখি? ধর্ম রাখতে হলে ভাষা ছাড়তে হবে। মীর সাহেব অবশ্য উর্দু ভালো জানেন, কিন্তু তাঁর বেগম তো এত বয়সে উর্দু শিখতে পারবেন না। তাঁর টুটি ফুটি উর্দু শুনে বৌমা তো হেসে খুন। শাশুড়ীর

হাড় জ্বালিয়ে বৌমা সেই যে বাপের বাড়ী গেছে, আর ফেরার নাম নেই। ছেলেটা বিষম অসুখী। না পারে মাকে উর্দু শেখাতে, না পারে বৌকে বাংলা ধরাতে। শেখাতে হবে না ওকে। ও বাংলা ভালোই জানে। কিন্তু বলবে না। পাছে কেউ ভাবে ও বাঙালী হিন্দু কাফের। আমাদের এখন কর্তব্য কী? ছেলের আবার বিয়ে দেওয়া? এবার আর কলকাতায় নয়। উত্তরবঙ্গের অভিজাত মুসলিম সমাজে?'' কামালউদ্দীন সাহেব সুধান।

''আরে, না, ও কথা ভাবা যায় না।'' মীর সাহেব শিউরে ওঠেন। ''আমি বহুবিবাহে বিশ্বাস করিনে। আর দ্বিতীয় বিবির জন্যে প্রথম বিবিকে তালাক দেওয়াও আমার মতে অধর্ম। তালাক কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা নয়। ছেলের জন্যে আমি অন্য বাসার বন্দোবস্ত করছি। বৌ নিয়ে ও আলাদা থাকবে। ওদের বাসায় ওরা কোন্ ভাষায় কথা বলবে ওরাই ঠিক করুক। তবে ছেলেও তার মায়ের মুখ রক্ষা করতে এক তৃতীয় পন্থা উদ্‌ভাবন করেছে। সে বাংলাতেও না, উর্দুতেও না, ইংরেজীতে কথা বলবে। তার বৌ অবশ্য ইংরেজীশিক্ষিতা। ইচ্ছা করলে ইংরেজীতে কথা বলতে পারবে। কিন্তু পাকিস্তান যদি একদিন হাসিল হয় তবে উর্দু জবান ফরজ হবে। ইংরেজী হবে হারাম। তখন কী উপায়?''

এবার মানস মুখ খোলে। পাকিস্তান যদি হাসিল হয় তাতে বাংলার মুসলমানদের কী? পাকিস্তানের ডেফিনিশনে তো বাংলাদেশের উল্লেখ নেই। ওটা মুসলমানদের হোমল্যাণ্ড হতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্র এক হোমল্যাণ্ড। সেখানকার ভাষা বাংলা না হয়ে উর্দু হবে কোন্ যুক্তির জোরে?''

''যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন তারা এক নেশন। সুতরাং একভাষী। বাঙালী বিহারী বলে কোনো ভেদ নেই, বাংলাভাষী উর্দুভাষী বলে ভেদ থাকবে কেন? আমার জন্ম চাষী পরিবারে। আমি চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দিয়েছি। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করি। আমার কাছে হিন্দু চাষী আর মুসলিম চাষী বলে দুই পৃথক শ্রেণী নেই। কিন্তু মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মতে মুসলমানদের মধ্যে চাষী ও জমিদার বলে দুই পৃথক ভাগ নেই। সবাই ভাই ভাই। সকলেরই এক স্বার্থ। সেটা মুসলিম স্বার্থ। তার বিপরীত স্বার্থ হিন্দু স্বার্থ। অতএব দেশভাগ করতেই হবে। পাকিস্তানই মুসলমানদের নিজস্ব বাসভূমি। এখন আমার কাগজ চালানো দায়। যদি বলি এটা ঠিক নয় তা হলে কাগজ চলবে না। দলেও ভাঙন ধরেছে। ইতিমধ্যেই অনেকে মুসলিম লীগে নাম লিখিয়েছে। পাকিস্তান চাই বললে ভোট পাবার সম্ভাবনা বেশী। চাইনে বললে সম্ভাবনা কম। পাকিস্তানের ডেফিনিশনে বাংলাদেশের উল্লেখ নেই, সেটা একটা স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড, এটাই লাহোর প্রস্তাবের মর্ম। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের বোলচাল বদলে গেছে। স্বতন্ত্র বঙ্গ বললে যত লোক ভোট দেবে স্বতন্ত্র পাকিস্তান বললে তার চেয়ে ঢের বেশী লোক ভোট দেবে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় যাঁরা মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচিত হবেন তাঁরা জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে পাকিস্তান পসন্দ্ দল হিসাবেই কাজ করবেন।'' কামালউদ্দীন উত্তর দেন।

মোরব্বা খেতে খেতে স্বপনদা বলেন, ''দুঃস্বপ্ন! দুঃস্বপ্ন! পাকিস্তান একটা দুঃস্বপ্ন! ইকবাল দেখতে চেয়েছিলেন। দেখতে পেলেন না। কিন্তু নজরুল যেন না দেখেন।''

''নজরুল এখন প্রকৃতিস্থ নয়। বেচারার বড়ো দুর্দিন যাচ্ছিল। সংসার চিন্তাই ওকে পাগল করে দিয়েছে। এর উপর যদি আসে পাকিস্তানের চিন্তা তা হলে ওর পাগলামি আর সারবে না।'' মীর সাহেব বলেন উদ্বেগভরে।

''ওর নিজের বাড়ীতেই তো দুই নেশন।'' মানস কটাক্ষ করে।

''ওর মতো বাঙালী জাতীয়তাবাদী আর কে? বাঙালী জাতিটাই আজকাল অপ্রকৃতিস্থ। বাঙালী হিন্দুরা যখন বাঙালীর গৌরবে আত্মহারা হন তখন বাঙালী মুসলমানদের অস্তিত্ব ভুলে যান। যেন ওরা

বাঙালীই নয়। ব্যতিক্রম একমাত্র নজরুল। কিন্তু খোঁজ করলে দেখবেন আরো ব্যতিক্রম আছেন। তাঁরা বাঙালী হিন্দুদের চোখে মুসলমান, আর বাঙালী মুসলমানদেব চোখে হিন্দু। তাঁদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁরা মাছমাংসেই খান না, গোমাংস তো দূরের কথা। আর হিন্দুত্বের সংজ্ঞাও আজকাল এমন হয়েছে যে যারা দেবদেবী মানে না তারা হিন্দুই নয়। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদের অবস্থাও আমারই মতো। না ঘরকা না ঘাটকা।" আফসোস করেন মীর সাহেব।

"মানসের ও আমারও তো একই অবস্থা।" স্বপনদা বিলাপ করেন।

"দেখুন, গুপ্ত সাহেব, তলে তলে এক প্রকার পোলারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে। একদিকে তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বাঙালী হিন্দু। আরেক দিকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত তথাকথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদী বাঙালী মুসলমান। বাংলার বাইরে বাঙালীমাত্রেরই প্রভাব প্রতিপত্তি ত্রিশ বছর আগে তুঙ্গে উঠেছিল। কবিগুরু যখন নোবেল প্রাইজ পান। তার পর গান্ধীজীর সূর্য যখন পশ্চিমে উদয় হয় তখন বাঙালীর সূর্য পূর্বদিকে হেলে। এই সেদিন অস্তাচলে গেল। কবিগুরুর জন্যে আমরা কি কম অশ্রুপাত করেছি? তাঁকেই আমরা ভালোবাসি, ইকবালকে নয়। কিন্তু হঠাৎ দেখছি ইকবালই হয়েছেন মুসলমানদের 'জাতীয়' কবি। রবীন্দ্রনাথ নাকি প্রচ্ছন্ন পৌত্তলিক।" মীর সাহেব মুষড়ে পড়েন।

"আমার তো মনে হয় এটা একটা সাময়িক আত্মবিস্মৃতি। যেমন হিন্দুর পক্ষে, তেমনি মুসলমানের পক্ষে। নইলে 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়ে সিরাজের জন্যে কাঁদেনি কোন্ বাঙালী হিন্দু? কেউ কি চেয়েছিল পলাশীতে নবাবের হার হয়? তখন তো কারো আপত্তি ছিল না মুসলিম নবাবের অধীনে বাস করতে। মুসলিম বাদশাকে আনুগত্য জানাতে। রাজপুতরা বিদ্রোহ করেছিল, মরাঠারা বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু বাঙালী হিন্দুরা বিদ্রোহ করেননি। অর্থনীতি তো তাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। আর পশ্চিমা জৈন শেঠদের। রাজ্যহারা হয়ে মুসলমানদের যদি দুর্গতি হয়ে থাকে অর্থহারা হয়ে হিন্দুদেরও তেমনি দুর্গতি। ইংরেজ আমলে কেউ বা কয়েকটা চাকরি বেশী পেয়েছে, কেউ বা কয়েকটা কম। কিন্তু তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ নয়। সব ক'টা চাকরি হারাতেও আমাদের আপত্তি থাকত না, যদি আমরা বাণিজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতুম। তার পর কৃষিকর্মে। ঝগড়াটা তো হচ্ছে চাকরি বাকরির ইস্যুতে। সেটাকেই ঢাকা দেওয়া হচ্ছে পাকিস্তানের ইস্যু দিয়ে। যেমন শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।" মানস বিশ্লেষণ করে বলে।

"সেইরকমই ছিল দশ বছর আগে। কিন্তু ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এসে হিন্দুদের মনে দারুণ আঘাত হেনেছে। এর জন্যে ওরা ইংরেজকে তো ক্ষমা করেইনি, মুসলমানকেও দায়ী করেছে। 'আমরা একা লড়ে মরেছি আর তোমরা কিনা আমাদের লড়াইয়ের ফল ভোগ করছ।' হিন্দুদের ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে যে রাজার শত্রু বলে ওদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আর রাজাব মিত্র বলে মুসলমানদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে ওদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের স্থান বিরোধীদের আসনে। সরকারগঠনে নয়।" মীর সাহেব দুঃখিত।

"আমার ছেলেবেলায় আমি ছিলুম বাঙালী জাতীয়তাবাদী। সেটা ছিল স্বদেশী আন্দোলনেব যুগ। বড়ো হয়ে হই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। সেটা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। আরো বড়ো হয়ে ইউরোপে বাস করে আমি হই উদার মানবিকবাদী। আমার পক্ষে এখন পেছন ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, মীর সাহেব। বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা যদি হিন্দু মুসলমানের মিলিত বাসভূমি চায় তো তাকে পাকিস্তান বলে আখ্যায়িত করলেও সে গোলাপের মতো তেমনি সুগন্ধ বিতরণ করবে, কিন্তু তার যদি স্বতন্ত্র একটা কেন্দ্র হয়, সে কেন্দ্র যদি হয় বাংলাদেশের বাইরে কোনো এক শহরে, তার ভাষা যদি হয় উর্দু আর কর্তারা হন পাঞ্জাবী ও গুজরাটী মুসলমান, তবে সেই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের মতো এটাও হবে আরেক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। কেমন করে এর আমি সমর্থন করি, বলুন? তা হলে কি আমি এর বিরোধিতা করব? না, সেটাও আমার স্বভাবে নেই। আমি নির্বিরোধী। আমি ঘরবাড়ী বেচে দিয়ে বিলেত

চলে যাব। সেখানেই প্র্যাকটিস করব। ভাবনা কেবল আমার ঘরণীকে নিয়ে। ঘর ফেলে যেতে পারি ঘরণীকে তো ফেলে যেতে পারিনে। আমি যদি তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে না পারি তবে তিনিই আমাকে টেনে রাখবেন এখানে। এই কলকাতা শহরে। কিন্তু পাকিস্তান তিনি মেনে নেবেন না। ইংরেজরা যাকে ইচ্ছে তাকে পুরস্কার দিক, কিন্তু তাঁর অধিকারে ঘা লাগলে তিনিও ঘা দেবেন। হিন্দুর জন্মভূমিতে হিন্দুর কোনো অধিকার নেই, একমাত্র অধিকারী মুসলমান, এটা রাজনীতি হতে পারে, সুনীতি নয়। নৈতিক সমর্থন জোর করে আদায় করা যায় না। জোর করে আদায় করা যায় বশ্যতা। তার আগে যুদ্ধে জিততে হবে। গৃহযুদ্ধে। যেটা এই সাতশো বছরে ঘটেনি। কী আফসোস!" স্বপনদা কফিতে চুমুক দেন।

"আপনার সঙ্গে আমি একমত, গুপ্ত সাহেব। পাকিস্তানকে আমি বলি গোরস্থান। জিন্নাকে বলি জিন। বাঙালী মুসলমান যদি স্বতন্ত্র একটা নেশন হিসাবে স্বতন্ত্র একটা বাসভূমি চায়, যেটা পাঞ্জাবের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা আর যেটার রাজভাষা উর্দূ, তা হলে আমিও প্রতিবাদ করব। কিন্তু ঘরবাড়ী ছেড়ে বিলেত যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেশে আমার গরিবখানা আছে। কলকাতা শহরেও ছোট্ট একখানা এমারত কিনেছি। আর আমার বেগম সাহেবা তো বাংলা ভিন্ন আর কোনো ভাষা বোঝেন না। গৃহত্যাগ না গৃহিণীত্যাগ আমার সমস্যা নয়। আমি পাকিস্তানেই থেকে যাব ও সুদিনের অপেক্ষা করব। একদিন না একদিন বাঙালী মুসলমান তার ভুল বুঝতে পারবে। আপনি সব মানুষকে কিছুদিনের জন্যে বোকা বানাতে পারেন, কিছু মানুষকে সব দিনের জন্যে বোকা বানাতে পারেন, কিন্তু সব মানুষকে সব দিনের জন্যে বোকা বানাতে পারেন না, জিন্না সাহেব। আর ওই ইংরেজের কৃপায় পাকিস্তান। ওটা যেন গোরু মেরে জুতো দান। পলাশীতে যাদের মার খেয়েছি তাদের হাত থেকে মীর জাফরের ইনাম।" মীর সাহেব খেদোক্তি করেন।

কামালউদ্দীন নীরবে শুনছিলেন। বলেন, "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। ইংরেজ কি রাজত্বের মায়া কাটিয়ে ফকিরী নিচ্ছে? যুদ্ধে জিতলে আবো গ্যাঁট হয়ে বসবে। যুদ্ধে হারলে জার্মানদের হাতে সঁপে দেবে। আসলে এটা নির্বাচনে মুসলিম লীগকে জিতিয়ে দেবার ফন্দী। কেবল বাংলাদেশে নয়, আর সব প্রদেশে। পাকিস্তানের মোহে সবাই চোখ বুজে ভোট দেবে। পাকিস্তানের ডেফিনিশন এখনো খোলা রয়েছে। ওর মধ্যে আসামও পড়তে পারে। দিল্লীও। কিন্তু লীগওয়ালারা ধরে নিয়েছেন যে শিখেরা রণজিৎ সিংহের রাজ্য বিনা যুদ্ধে পাকিস্তানের বাদশাদের চরণে সমর্পণ করবে। শিখদের সম্মতি না নিয়ে মুসলমানদের পুরস্কার দিতে গেলে আবার এক সিপাইবিদ্রোহ।"

"সেকথা ঠিক। ইংরেজরা কেন সে ঝুঁকি নেবে?" মানস মন্তব্য করে।

স্বপনদা বলেন, "শিখদের পুরস্কার দিতে হবে। তাদের মতো রাজভক্ত কারা? সিপাইবিদ্রোহেও তারা অংশ নেয়নি। তাদের চটালে নির্ঘাত সিপাইবিদ্রোহ।"

"আমাদের এক পাঞ্জাবী সহকর্মী পাঞ্জাব থেকে ফিরে এসে বলেছেন সেখানে নাকি এক টুকরো লোহা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। হিন্দু মুসলমান শিখ সবাই কিনে নিয়ে গোপনে হাতিয়ার বানাচ্ছে। প্রত্যেকেরই দাবী গোটা পাঞ্জাব। ইতিহাসের যতগুলো বড়ো বড়ো যুদ্ধ সব ক'টাই তো পাঞ্জাবেই ঘটেছিল।" মানস বলে।

"সেসব যুদ্ধ সৈনিকে সৈনিকে। জনতায় জনতায় নয়। সশস্ত্র জনতার সঙ্গে সশস্ত্র জনতার যুদ্ধ একটিমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকবে না। যেমন পানিপথে বা তরাইনে। সারা প্রদেশ জুড়েই হানাহানি কাটাকাটি লুটপাট ঘর জ্বালানি চলবে। নারী হরণও বাদ যাবে না। এর নজীর জার্মানীর সপ্তদশ শতাব্দীর ত্রিশ বছরের যুদ্ধ। যে যুদ্ধে তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ মারা যায়। দেশ ছারখার হয়। খোপে খোপে বিভক্ত হয়। যদিও উপরে একজন সম্রাট তবু তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।" স্বপনদা ইতিহাস স্মরণ করেন।

"বাংলাদেশেও তো সেরকম ঘটতে পাবে।" মানস আর্তস্বরে বলে।

"না, বাঙালীরা পাঞ্জাবীদের মতো ধর্মান্ধ নয়।" মীর সাহেব আশ্বাস দেন। "পাঞ্জাবে শিখদের উপর যে রকম উৎপীড়ন হয়েছিল বাংলাদেশে তার কোনো তুলনা নেই। ফলে শিখরা হয়ে ওঠে সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় কৃপাণধারী। ডাক দিলে সকলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সংগ্রামে। বাংলাদেশের ঐতিহ্য অসামরিক। আমরা বাঙালীরা অসামরিক জাতি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ব না। আপস করব।"

কামালউদ্দীন সাহেব বলেন, "ধর্মান্ধতা না থাকলেও এখানে ধর্মের নামে রাজনীতি আছে। কৃষক প্রজার যে ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ তা সে মুসলমান বলে নয় বা হিন্দু বলে নয়, সে শোষিত ও বঞ্চিত বলে। কিন্তু ভোটের দালালরা তাদের বোঝাচ্ছে তারা মুসলমান বলেই হিন্দু জমিদার ও মহাজন কুলের হাতে এই দুর্ভোগ। যেন মুসলিম জমিদার ও কাবুলী মহাজনকুল তাদের খাজনা ও সুদ মাফ করে। খাজনা বাকী পড়লে জমি খাস করে না, সুদ বাকী পড়লে লাঠিপেটা করে না। আরেক দল ভোটের দালাল এখন হিন্দুদের বোঝাচ্ছে হিন্দুর ধন মান প্রাণ বিপন্ন। কংগ্রেস তাকে রক্ষা করবে না। সে তো কেবল মুসলমানদের তোয়াজ করতেই জানে। গান্ধী তো মুসলমানদেরই আপন জন। হিন্দুকে বাঁচাবেন একমাত্র বীর সাভারকর। এই যে ধর্মের নামে রাজনীতির খেলা এর উদ্দেশ্য যদিও ক্ষমতার রাজনীতি, তবু ভোটাভুটির মধ্যেই এটা নিবদ্ধ থাকবে না। তার পরের পর্যায় লাঠালাঠি। যার জমি নেই সে জমি কেড়ে নেবে, যার আছে সে হিন্দুধর্মের দোহাই দেবে। অমনি করে বেধে যাবে ধর্মীয় সংঘর্ষ। গরিব হিন্দুকে মারবে গরিব মুসলমান। দুর্বল মুসলমানকে মারবে দুর্বল হিন্দু। বৃথা স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখছেন মীর সাহেব। ধর্মের থেকে রাজনীতিকে পৃথক করতে না শিখলে হিন্দু বা মুসলমান কোনো পক্ষই নিরাপদ নয়। ধর্মও ভালো, রাজনীতিও ভালো, কিন্তু ধর্মের ভেক পরে রাজনীতি ভালো নয়। আমাদের পরীক্ষার দিন আসছে।"

"তা বলে ধর্মবর্জিত রাজনীতিও কি ভালো?" মীর সাহেব প্রশ্ন করেন। "ধর্মবর্জিত মার্কসবাদ আর তার প্রতিবাদী ধর্মবর্জিত ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদ আজ সারা ইউরোপকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। জাপান যদি যোগ দেয় তো সারা বিশ্বকেও। ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হলে রাজনীতি একটা অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে, কামাল সাহেব। রাজনীতি থেকে মহাত্মা গান্ধী বা মওলানা আজাদকে বিদায় দিলে লাভ যতটুকু হবে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশী।"

"মীর সাহেব," মানস বলে, "অষ্টাদশ শতাব্দীতে বার্ক বলেছিলেন, শিভালরির যুগ শেষ হয়ে গেছে। এই শতাব্দীতে আমিও তেমনি বলতে পারি, ধর্মমিশ্রিত রাজনীতির যুগ শেষ হয়ে গেছে। গান্ধীজীর পেছনে যেটা আছে সেটা ধর্মের জোর নয়, নীতির জোর। তিনি নিজেই একটা মরাল ফোর্স। যেদিকে তিনি সেদিকেই জয়। তাঁর সহকর্মীরা ঈশ্বর না মানলেও তিনি কিছু মনে করেন না, কিন্তু সত্য মানতে হবে, অহিংসা মানতে হবে, ত্যাগ মানতে হবে, সংযম মানতে হবে। আগে তিনি বলতেন, ঈশ্বরই সত্য। এখন বলেন, সত্যই ঈশ্বর। যারা সত্যাগ্রহী তারা ঈশ্বরবিশ্বাসী না হলেও ঈশ্বরবিশ্বাসীর সমান। ধর্মবর্জিত রাজনীতি ভালো না হতে পারে, কিন্তু নীতিবর্জিত রাজনীতি নিশ্চয়ই মন্দ। এই পার্থক্যটা সহজে লোকের চোখে পড়ে না বলে ধর্মকেও নীতির খাপ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং সবাইকে বলা হচ্ছে ভালো হিন্দু বা ভালো মুসলমান বা ভালো খ্রীস্টান বা ভালো শিখ হতে। অর্থাৎ ভালো মানুষ হতে। গান্ধীজীও একজন মানবিকবাদী। একজন হিউমানিস্ট।" মানসের সিদ্ধান্ত।

"হিউমানিস্ট আজকাল কে নয়?" স্বপনদা বলেন, "মার্কসও হিউমানিস্ট। লেনিনও হিউমানিস্ট। সেইজন্যে তার সামনে একটা বিশেষণ বসাতে হয়। কী রকম হিউমানিস্ট? লিবারল হিউমানিস্ট, না র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট, না সোশিয়াল ডেমোক্রাটিক হিউমানিস্ট, না রেভোলিউশনারি হিউমানিস্ট, না ন্যাশনালিস্ট হিউমানিস্ট? হিটলার মুসোলিনিও হিউমানিস্ট বলে দাবী করছেন। যদিও আমার মতে

ওঁরা হিউমানিস্টই নন, ওঁরা বিভাইভালিস্ট। মুসোলিনি চান রোমান এম্পায়াবের পুনরাবৃত্তি। নিজেই হবেন সীজার। আর হিটলার চান হোলি রোমান এম্পায়ারের পুনরাবৃত্তি। নিজেই হবেন সম্রাট অটো দ্য গ্রেট। ইটালীও আসবে ওঁর পদতলে। পোপও হবেন ওঁর আজ্ঞাধীন। যে যার খুশিমতো পার্টি গঠন করেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একপ্রকার না একপ্রকার মতবাদ। মতবাদীদের বলা হয় ফাসিস্ট বা নাৎসী। হিউমানিজমের বিকৃত রূপ। তার প্রায় সবটাই অন্ধ বিশ্বাস ও বিদ্বেষ। সেই সঙ্গে কিছু সদর্থকও আছে। সেটা জার্মানীর ও ইটালীর নব নির্মাণ। বেকার বলে কেউ নেই। অভুক্ত বলে কেউ নেই। জনতা যা পেয়ে তুষ্ট — ব্রেড আর সার্কাস। রোমানদের মতো।"

"একই রকম খোয়াব দেখছেন আমাদের লীগপন্থী বন্ধুরাও।" কামাল সাহেব বলেন। "ওঁরা বিশ্বে হোলি খেলাফৎ এম্পায়ার ফিরিয়ে আনবেন। পাকিস্তান তার শেষ নয়, তার শুরু। হিটলার, মুসোলিনির মতো জিন্নার পেছনেও গড্ডলিকাপ্রবাহ। তফাৎ শুধু এই যে হিটলার, মুসোলিনির রাজনীতি ধর্মবর্জিত। ধর্মের স্থান নিয়েছে নাৎসী ও ফাসিস্ট মতবাদ। তাদেরও শাস্ত্র আছে। শাস্ত্রী আছেন। শুধুমাত্র শস্ত্র নয়, শস্ত্রধারী নয়। লীগপন্থীরাও একদল উলেমাকে তাঁদের পক্ষে পেয়েছেন। একদল ইনটেলেকচুয়ালকেও। জমিদার, তালুকদার, ধনিক, বণিকরা তো তাঁদের পক্ষে আছেনই। আছেন ইংরেজ মুরুব্বিরাও। আমাদের সাধ্য কী যে আমরা তাঁদের প্রোপাগাণ্ডার মুখে দাঁড়াতে পারি। প্রোপাগাণ্ডাই তো অর্ধেক যুদ্ধ। আমার কাগজ উঠে যাবে। মীর সাহেবের লেখাও আর কোথাও বেরোবে না। উল্টো ফল হবে যদি হিন্দুদের পত্রিকায় বেরোয়। উনি জাতীয়তাবাদী মুসলমান আর আমি কৃষক প্রজাদরদী মুসলমান। আমাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নয়। আমরা একনৌকায় এতদিন ভেসেছি। কিন্তু হোলি খেলাফৎ এম্পায়ার যদি ফিরে আসে আমরা একনৌকায় ডুবব।"

"না, না, ইংরেজ থাকতে ওটা কখনো সম্ভব নয়। আর ইংরেজ কি বিনা পরাজয়ে যাবে?" মীর সাহেব এককথায় উড়িয়ে দেন।

স্বপনদা কথাবার্তার মোড় ফিরিয়ে দেন। "আজ আমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলুম, মীর সাহেব। আমাদের ছোটখাটো একটা গ্রুপ আছে। আমরা তার নাম রেখেছি 'লিবারল হিউমানিস্ট গ্রুপ'। বারো জনের বেশী মেম্বর থাকবেন না। তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন মুসলমান। আপনাকে তো অবশ্যই, আপনার বন্ধুকেও আমাদের সঙ্গে পেলে প্রীত হই।"

"কিন্তু আমার কথাবার্তা শুনে কি মনে হয় আমি লিবারল হিউমানিস্ট? তা যদি হয় তো আমি সানন্দে সম্মত।" মীর সাহেব বলেন।

"আমারও সেই কথা।" কামালউদ্দিন সাহেব যদি'র উপরে জোর দেন। "মীর সাহেব আপনাদের মতোই বুর্জোয়া। আমি সমাজের পুনর্বিন্যাসে বিশ্বাসী।"

স্বপনদা ভেবে বলেন, "সমাজের পুনর্বিন্যাস নির্বিরোধেও হতে পারে। আপনি আসুন, এসে আমাদের কনভার্ট করুন। ইসলামে নয়, পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদেও নয়, সব মানুষ যে সমান এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসে।"

মীর সাহেব জানতে চান গ্রুপের মূল বক্তব্য কী।

"আপনাকে আমাদের সঙ্গে বসে একটা ম্যানিফেস্টোর খসড়া মুসাবিদা করতে হবে, মীর সাহেব। আপনাকেও কামাল সাহেব। আমরা সেটাকে বলব লিবারল হিউমানিস্ট ম্যানিফেস্টো।" স্বপনদা বলেন। "আমাদের প্রথম কথা 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। সে নারী না পুরুষ, হিন্দু না মুসলমান, ইউরোপীয় না ভারতীয়, বাংলাভাষী না উর্দুভাষী, জমিদার না চাষী, ধনিক না শ্রমিক, আর্য না অনার্য এসব হলো মানুষ নামক সত্যের উপরে নয়, নিচে। দ্বিতীয়ত, মানুষের স্বধর্ম মনুষ্যত্ব, যেমন সিংহের সিংহত্ব, অশ্বের অশ্বত্ব, ময়ূরের ময়ূরত্ব, সর্পের সর্পত্ব। মনুষ্যত্ব যদি আমার থাকে তবে দেবত্ব

নেই বলে আমি ছোট হয়ে যাব না। মানব হিসাবেই আমার বিচার, দেব হিসাবে নয়। আমার কাছে পারফেকশন প্রত্যাশা করা অনুচিত। মানুষকে প্রকৃতি পারফেক্ট না করেই বানিয়েছে। সে হয়তো একদিন সাধনা করতে করতে অপেক্ষাকৃত পারফেক্ট হবে। তখন হয়তো দেখবে যে অনবদ্য পারফেক্শন আরো সুদূর। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বই আমাদের অন্বিষ্ট। কিন্তু পরিমিত পরমায়ুর মধ্যে তা কি কারো পক্ষে সম্ভব? প্রকৃতি অনুকূল না হলে, সমাজ অনুকূল না হলে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব কারো আয়ত্তগম্য নয়। তা হলেও সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। তৃতীয়ত, শাদা আর কালো এই দুটি ছাড়া আরো অনেকগুলি রং আছে, আকাশের দিকে তাকালেই আমরা তা দেখতে পাই। মানুষের চরিত্রেও তেমনি অশেষ বৈচিত্র্য। ভালো আর মন্দ এই দুটি ভাগে তাকে বিভক্ত করা চলে না। ভালো মানুষেরও মন্দ দিক আছে, মন্দ মানুষেরও ভালো দিক আছে, কেউ নিপট ভালো নয়, কেউ নিছক মন্দ নয়। মানুষ এক জটিল সত্তা, তাকে সরল করতে গেলে সত্যতা হানি হয়। দেবত্ব ও দানবত্ব আরোপ করে রামের ও রাবণের সত্যতা হানি ঘটালে রামায়ণ আর মহাকাব্য থাকে না। হয়ে যায় ধর্মগ্রন্থ। রামও মানুষ, রাবণও মানুষ। দেবত্ব ও দানবত্ব হচ্ছে কাল্পনিক।"

মীর সাহেব স্মিত হেসে বলেন, "বুঝেছি। এর জন্যে লাঠির বাড়ি খেতে হবে। কে কে রাজী আছেন সেটা আগে জেনে নিয়ে তার পরে ম্যানিফেস্টো বার করা যাবে।"

'লাঠির বাড়ি' শুনে স্বপনদার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, "ও গড!"

"ভগবানকে ডাকছেন যে।" মীর সাহেব সশব্দে হেসে ওঠেন, "হিন্দুরা তত নির্দয় নয়। আপনি লাঠির বাড়ি খাবেন না। কিন্তু আমাকে খেতে হয়েছে। আবার খেতে হবে। মুসলমানদের হাতে। কেন আমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চান, গুপ্ত সাহেব?"

মানুষের ব্যাপারে ভগবানকে টেনে এনে স্বপনদা স্ববিরোধী কাজ করেছিলেন। সামলে নিয়ে বলেন, "কেউ কারো চেয়ে কম নির্দয় নয়, মীর সাহেব। হিন্দুরা তাদের ছেলেদের ত্যাজ্যপুত্র করে, বাড়ীতে এলে তাদের খেতে দেয় উঠোনে চাকরদের সঙ্গে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর স্বগ্রামে গিয়ে দান খয়রাত করে ফেরার সময় গাঁয়ের লোক তাঁর পাল্কীর গায়ে ঢিল ছোঁড়ে আর বিধবারাই তাঁকে শাপান্ত করে, 'তোর বৌ বিধবা হোক।' জোরসে পাল্কী চালিয়ে না দিলে হয়তো সেইদিনই শাপ ফলে যেত। তাঁর স্ত্রী বিধবা হতেন। হিন্দুর নির্দয়তার কি তুলনা আছে। সতীদাহ তো ওরা হাজার হাজার বছর ধরে চালিয়ে গেছে। সিপাইবিদ্রোহের অন্যতম কারণ হলো ফিরিঙ্গীরা কেন সতীদাহ বন্ধ করে দিয়েছে।"

মীর সাহেব হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে কিছুক্ষণ ওকালতী করেন ও স্বপনদা মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে ব্যারিস্টারি। তার পরে দু'জনে মানসের রায় মেনে নেন। সে বলে, "দু'পক্ষেরই ব্যাধি হলো পরাধীনতা ও তার আনুষঙ্গিক অজ্ঞতা। ব্যাধির প্রতিকার স্বাধীনতা ও তার আনুষঙ্গিক চিৎপ্রকর্ষ।"

স্বপনদা খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। খেই হাতে নিয়ে বলেন, "আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি, মীর সাহেব ও কামাল সাহেব। ফরাসী বিপ্লবের যুগ থেকে বিশ্বমানব শুনে আসছে একটি নতুন মন্ত্র। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বা লিবার্টিই সকলের আগে। তার পরে ইকুয়ালিটি বা সাম্য। তার পরে ফ্র্যাটারনিটি বা মৈত্রী। সেই আদিকাল থেকে মানুষ মানুষকে দাস করে রেখেছিল, ধর্মও তার উচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। কিন্তু লিবার্টি যেই মানবজীবনের মূলমন্ত্রের অন্যতম হলো অমনি ক্রীতদাসপ্রথার মূলে আঘাতের পর আঘাত পড়ল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে তার পরিসমাপ্তি। এখানে ওখানে তার শিকড় এখনো থেকে গেছে। বিশেষত আফ্রিকার বুকে। স্লেভারি যদি যায় তো ওয়েজ স্লেভারি কেন থাকবে? বণ্ডেড লেবার কেন থাকবে? শ্রমিকের গতিবিধির উপর অন্যায় বিধিনিষেধ কেন থাকবে? ক্রমে ক্রমে এসবও উঠে যাচ্ছে। একটি দেশের দ্বারা আর একটি দেশের লিবার্টি কেন রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকবে? তাই একটির পর একটি দেশ স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে গেছে ও সফল হয়েছে। বিবাহিত জীবনে নারী কেন

পুরুষের সেবাদাসী হয়ে থাকবে? এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের সূচনা হয় লিবার্টির দাবীতে। সে বিদ্রোহ এখন এদেশেরও ঘরে ঘরে। মুসলিম নারীসমাজও পেছিয়ে থাকবে না দেখবেন।"

"এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?" মীর সাহেব অট্টহাস্য করেন।

"লিবার্টির জল অনেকদূর গড়িয়েছে। তারপর ইকুয়ালিটির জোয়ার। কালো মানুষ চায় শাদা মানুষের সঙ্গে সাম্য, ভারতীয় চায় ইউরোপীয়ের সঙ্গে সাম্য, মুসলমান চায় হিন্দুর সঙ্গে সাম্য, শ্রমিক চায় ধনিকের সঙ্গে সাম্য, নারী চায় পুরুষের সঙ্গে সাম্য। সাবালকমাত্রেরই ভোটদানের অধিকার এখন প্রায় সব দেশেই মেনে নেওয়া হচ্ছে। এদেশেও হবে। তার তাৎপর্য সব নাগরিকই সমান। নাগরিকাও বাদ যায় না। এই যে সাম্যের জোয়ার একে বাধা দিতে গেলেই সমাজবিপ্লব। সময় থাকতে যতদূর সম্ভব স্বীকার করাই সুবুদ্ধি। সে সুবুদ্ধি ব্রিটেনের উচ্চতর শ্রেণীর আছে। সেইজন্যেই আমার বিশ্বাস ব্রিটিশ কর্তারা শেষপর্যন্ত ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে মিটমাটে রাজী হবেন। তবে যুদ্ধের মাঝখানে নয়। তা হলেও আমি পনেরো বছর সময় হাতে রেখেছি। ইতিমধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণগুলো দূর করতে হবে। নইলে শরিকে শরিকে লড়াই।" স্বপনদা ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাঁর মুখ অন্ধকার।

"তা হলে সেটা হবে গোরস্থানের ইকুয়ালিটি।" মীর সাহেব মন্তব্য করেন।

।। নয় ।।

বিজন বর্ধন মানসের প্রথমে প্রতিযোগী, তার পরে সহযাত্রী ও সতীর্থ। বিলেত থেকে ফিরে ওরা একসঙ্গে একবাসায় কাটায়। বিজনের কনে দেখায় মানসেরও একটু ভূমিকা ছিল। আর মানসের বিয়েতে না হোক বিয়ের পরে বিজনের একটু ভূমিকা। মানস ও যূথিকার হানিমুনের সে নীরব দর্শক। কথা ছিল সে সেটলমেণ্ট ট্রেনিং শেষ করে তার পরে বিয়ে করবে, কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকায় ক্লান্ত হয়ে সে অকস্মাৎ মত পরিবর্তন করে। ক্যাম্পে যাবার আগেই তার শুভকর্ম সারা হয়। ফলে বিজনের বধূ উদিতা মানসের প্রতি কৃতজ্ঞ। যূথিকার সঙ্গেও তার প্রীতির সম্পর্ক। কলকাতায় ওরা একসঙ্গে এলে বিজনদেব অতিথি হয়।

স্বপনদার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে মানস বিজনের ওখানে হাজিরা দেয়। উদিতা ওকে রিসিভ করে। অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে আসে বিজন। ছুটির দিনেও ওর ছুটি নেই। সেক্রেটারিয়াটের সে একজন হোমরা চোমরা আমলা। পদভার তাকে ভারিক্কি করেছে। অর্থনীতি বিশারদ বলে সরকার তাকে সমীহ করেন। কিন্তু উপরওয়ালারা তো ওর পরামর্শে চালিত হবার পাত্র নন। তাই বিরোধ বাধে।

"মানস, আমি চোখে আঁধার দেখছি।" বিজন কথাপ্রসঙ্গে বলে।

"কেন, ভাই বিজন? মুসলিম মন্ত্রীরা কি খুব বেশী কমিউনাল?" গভর্নর কি ঠুঁটো জগন্নাথ?" মানস জেরা করে।

"না, না, ওঁদের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিযোগ নেই। সমস্যাটা সাম্প্রদায়িক নয়, অর্থনৈতিক। যুদ্ধকালে খাদ্য বস্ত্র ঔষধপত্র দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়, এটাই তো মানব অভিজ্ঞতা। ইংলণ্ডে ওরা সময় থাকতে র‍্যাশনিং প্রবর্তন করেছে। আর সেই র‍্যাশনিং দস্তুরমতো কড়া। এক মন্ত্রীর চাকরি চলে গেল তিনি নিজের পরিবারের জন্যে গোটা দুই খরগোস শিকার করে এনেছিলেন বলে। যাকে যা র‍্যাশন দেওয়া হবে তাই খেয়েই তাকে বাঁচতে হবে। তার বাইরে এক আউন্সও নয়। হোর্ডিং একটা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। যারা হোর্ড করে তারা মোটা মুনাফা করে। এটাও মানব অভিজ্ঞতা। নিজের ব্যবহারের জন্যেও হোর্ড করা বারণ। লণ্ডন থেকে কাগজপত্র আনিয়ে আমি একটা নোট পেশ করে বলি অবিলম্বে কলকাতা শহরে পুরো র‍্যাশনিং প্রবর্তন করা হোক। আর মফঃস্বলে আংশিক র‍্যাশনিং। বড়ো অন্যায়

করেছি?'' বিজন তার মোটা চশমার কাঁচ দিয়ে মিট মিট করে তাকায়।

"না, অন্যায় নয়। ঠিকই তো করেছ।" মানস সমর্থন জানায়।

"কে শোনে কার কথা! আমার বস্ মিস্টার বেনেট আমার নোটের উপর লেখেন, ক্যালকাটা ইজ নট লণ্ডন, বেঙ্গল ইজ নট ব্রিটেন। দেয়ার উইল বি নো ইনভেসন, নো শর্টেজ, নো হোর্ডিং, নো ব্লাক মার্কেটিং। র‍্যাশনিং উইল বি ইমপসিবল টু এনফোর্স। তিনি আমাকে দয়া করে ডেকে পাঠান। বলেন, ইউ মে বি আ গ্রেট স্কলার। বাট আই অ্যাম আ প্র্যাকটিকাল ম্যান। কেমব্রিজের ছাত্ররা বিদ্বান হয়, অক্সফোর্ডের ছাত্ররা চৌকষ। তবে অক্সফোর্ডের পড়াশুনা শেষ করার আগেই আমাকে যুদ্ধে যেতে হয়। যুদ্ধশেষে আমাকে নমিনেট করে বেঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। তখন থেকেই আমি হাতে কলমে শাসনকার্য শিখে চুল পাকিয়েছি। আর আপনি তো সেদিনকার ছেলে। আমরা যদি এখন র‍্যাশনিং প্রবর্তন করি বাজারে প্যানিক সৃষ্টি হবে। স্টক মার্কেটে শেয়ার ফল করবে। ক্লাইভ স্ট্রীট আমাদের পেছনে লাগবে। আর মাড়োয়ারীরা একধার থেকে হোর্ড করবে। ডোণ্ট টেক ইট টু হার্ট, ইয়াং বার্ডান। আমি মুখ বুজে শুনে যাই।" বিজন মাথায় হাত দিয়ে বসে।

মানস মিস্টার বেনেটের অধীনে মহকুমা হাকিম হিসাবে কাজ করেছে। তিনি একজন সৎ ও সুদক্ষ শাসক। তিনি যদি র‍্যাশনিং প্রবর্তনের প্রয়োজন না দেখেন তো সেটা বোধহয় সত্যিই নিষ্প্রয়োজন। কই, কেউ তো সে রকম প্রস্তাব কোথাও তুলছেন না। না খবরের কাগজে, না জনসভায়।

"কী এমন ক্ষতি হবে, যদি অবিলম্বে র‍্যাশনিং প্রবর্তন না করা হয়?" মানস বিজনকে সংশয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

"আজ থেকে কাজ শুরু করলে একবছর লাগবে স্কীমটাকে ঠিকমতো চালু করতে। তা যদি না করি তবে পরে যুদ্ধের মাঝখানে খুব বেশী দেরি হয়ে গিয়ে থাকবে। খেতে না পেয়ে হাজার হাজার মানুষ মরবে, লাখে লাখেও মরতে পারে। আবার সেই ছিয়াত্তরে মন্বন্তর। সে সময়ও তো প্র্যাকটিকাল ম্যানের অভাব ছিল না। যেটার অভাব ছিল সেটা অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ। আমাদের সামনে আছে এক ভয়ঙ্কর আকাল। একটা ডিজাস্টার।" বিজন ম্লান মুখে বলে।

মানসের বিশ্বাস হয় না। সে বলে, "যুদ্ধ কোথায় যে লোকে যুদ্ধের ভয়ে র‍্যাশনিংএ রাজী হবে? যুদ্ধক্ষেত্র বহুদূরে। জাপান যুদ্ধে নামবে বলে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সে তো আর আমাদের এদিকে আসছে না।"

বিজন উত্তর দেয় না। কী যেন চিন্তা করে। তার বদলে উদিতা কথাবার্তা চালায়। চা এসে পড়ে। চায়ের সঙ্গে কেক।

"আমার এক বোন সবিতা এখন ওয়াকি হয়েছে। তার চিঠি মাঝে মাঝে পাই। তার সাথীদের একজনের নাম ঝরনা ঘটক। তার বাবা আমাদের সিভিল সার্জন ছিলেন পাবনা শহরে। সেইসূত্রে মেয়েটিকে আমরা চিনি। মাসকয়েক আগে ডাক্তার ঘটক হঠাৎ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, ঝরনা বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। সে এখন কোথায়? জানতুম না যে পালিয়ে এসেছে, দুঃখিত হই। কিন্তু কেমন করে বলব সে এখন কোথায়। বলি, যেখানেই থাক সবিতার সঙ্গে আছে। সবিতার চিঠিতে শিবিরের ঠিকানা থাকে না। শুধু থাকে পোস্ট অফিস আর্মি বেস্। ওকে চিঠি লিখলে আর্মি বেস্ পোস্ট অফিসের ঠিকানায় লিখি। যতদূর বুঝতে পারি ওরা এখন আরাকানে। নাম করে না। বর্ণনা করে। বর্ণনাটা আরাকানের সঙ্গে মিলে যায়। আকিয়াবে আমার এক মামা থাকতেন। তাঁর মুখে বর্ণনা শুনেছি। ছবিও তাঁর আলবামে দেখেছি।" উদিতা বলে যায় অযাচিতভাবে।

মানস তো শুনেছিল যে ঝরনাকে তার মাসী না পিসী কলকাতায় নিজের কাছে রেখেছেন, তার বিয়ের চেষ্টা চলছে। তার পিতামাতা তার সম্বন্ধে বিস্ময়কর রূপে নীরব। সে তা হলে সত্যি সত্যি

ওয়াকি হয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। সম্ভবত আরাকানে। ঘটকরা কি একথা জানেন?

"না, আমরা তো জানাইনি। ঝরনা যদি জানিয়ে থাকে। জানালেও মিলিটারি সীক্রেট ফাঁস করবে না। অবস্থানটার নাম করবে না। ঘটকরা যদি আকিয়াব না ভেবে চট্টগ্রাম ভেবে থাকেন তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আর আমিও যে সুনিশ্চিত তাও তো নয়। রেঙ্গুনেও হতে পারে।" উদ্দিতা চাপা দেয়।

"আচ্ছা, ওদের আসল কাজটা কী?" মানস বেফাঁস প্রশ্ন করে।

"ওয়াকিদের?" উদ্দিতা ফিক করে হেসে বলেন, "না, যা শুনেছেন তা নয়। বিলেতের মেয়েদের যুদ্ধের কাজে অংশগ্রহণের জন্যেই উইমেন্স অগ্‌জিলিয়ারি কোর গঠন করা হয়। তার সঙ্গে ইণ্ডিয়া জুড়ে দিলে যা হয় তারই সংক্ষিপ্ত নাম ওয়াকি। বিলেতের ফ্রন্ট অনেক ছোট। ভারতের ফ্রন্ট অনেক বড়ো। ওয়াকিদের ভারতের বাইরেও কাছাকাছি কোথাও পাঠানো হয়। তবে প্রধান কাজ শত্রুপক্ষের বেতার বার্তা আড়ি পেতে শোনা ও শুনে নোট করা। তার জন্যে শত্রুপক্ষের ভাষাও শিখতে হয়। সেটাকে ইংরেজীতে তর্জমা করার মতো বিদ্যেও চাই। সবিতাকেও তালিম দেওয়া হয়েছে। ঝরনাকেও। ওরা অফিসার না হলেও যা পায় তা লোভনীয়। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের চেক আসে সবিতার তরফ থেকে। তার নির্দেশ অনুসারে। সে টাকা জমা হচ্ছে আলাদা একটা অ্যাকাউন্টে ওর বিয়ের খরচবাবদ। ঘটকরাও কি পাচ্ছেন না ও রকম একটা চেক? মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবেই। থাকা স্বাভাবিক। বিশেষত সে যখন শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন। ধরা পড়লে কি আর রক্ষে আছে?" উদ্দিতা দু'হাতে মুখ ঢাকেন।

মানসেরও কান্না পায়। সে আর কথা বাড়ায় না। শুধু বলে "মেয়েরাও যদি ইকুয়ালিটি চায় তবে ইকুয়াল রিস্ক নিতে হবে।"

"না, না, ইকুয়াল রিস্ক নয়। নারীর পক্ষে ওটা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ। অযোধ্যার লোক সীতার মতো মহীয়সীকেও বিশ্বাস করেনি। ওঁর মহান স্বামীও না! সবিতার জন্যে আমি রোজ রাত্রে প্রার্থনা করি। ওকে তো আপনি দেখেছেন। কী ডানপিটে মেয়ে! ওর হাতে রিভলভার থাকলে ও আত্মরক্ষা করবে। আর নয়তো আত্মহত্যা। হ্যাঁ, ওদের রিভলভার রাখতে দেওয়া হয়।" উদ্দিতা বলে।

কলকাতা থেকে ফিরে ঝরনা সম্বন্ধে এসব খবর মানস যূথিকাকে শোনায়। সে স্তম্ভিত হয়। তার চোখে জল এসে পড়ে।

"কিন্তু খবরদার!" মানস ওকে সাবধান করে দেয়। "ঘটকেরা যেন জানতে না পান যে আমরা এর বিন্দুবিসর্গ জানি। আর শহরের লোকের স্বভাব তো সেই অযোধ্যার লোকেরই মতো। ওরা যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।"

"দ্যাখ, ওরকম একটা কানাঘুষা নতুন নয়। ছ'মাস কেটে গেল। মেয়ে একবারও মা বাবাকে দেখতে আসে না। মা যদিও অসুস্থ। এটা যত বড়ো সীক্রেট মনে করেছ তত বড়ো নয়। তা ছাড়া আর্মি বেস্ পোস্ট অফিস থেকে ডাক্তার সাহেবের নামে চিঠি আসে এটাও কি কারো নজরে পড়েনি? দুই আর দুই মিলে চার হয়। তবে আমি অতটা ভেবে দেখিনি।" যূথিকা হাসি চাপে।

দু'জনেই স্থির করে যে ডাক্তার দম্পতির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে ঝরনার প্রসঙ্গ ওরা এড়িয়ে যাবে। ওঁরা যদি আপনা থেকে কিছু বলেন সেকথা আলাদা।

মাসকয়েক বাদে একদিন ডাক্তার সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। বলেন, "শুনেছেন নিশ্চয়ই? উল্লাসের এত কী আছে? মনে হচ্ছে সারা শহর উথাল পাথাল। বেশীর ভাগ লোকই জাপানের বীরত্বের প্রশংসা করছে। আরে, এটা কি একটা বীরত্বের নমুনা হলো? যুদ্ধঘোষণা না করেই অতর্কিতে পার্ল হারবারে হানা দিয়ে সব ক'টা জাহাজকে ডুবিয়ে দেওয়া কি একটা বাহাদুরি না ট্রেচারি?"

মানসের রেডিও ছিল না। চাকরি ছেড়ে দেবে বলে সে আর বিলাসিতা বাড়ায়নি। খবরের কাগজ কলকাতা থেকে দেরিতে আসে। পার্ল হারবারের খবরটাও তার দেরিতে পাবার কথা। সে চমকে উঠে বলে, "এ যে সাংঘাতিক খবর! জাপান কি বুঝতে পারছে না যে আমেরিকাও একদিন চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবে? যুদ্ধ শুরু করে দিতে যে কোনো দেশ পারে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ করা তার হাতে নয়।"

ডাক্তার সাহেব এর পরে আসল কথাটা পাড়েন। "আপনার কি মনে হয় ওরা অমনি অতর্কিতে বার্মায় ইংরেজদের ঘাঁটিতে হানা দেবে?"

"দিতে পারে। কিন্তু অমনি অতর্কিতে নয়। সিঙ্গাপুর গেলে তো বার্মার পালা। সিঙ্গাপুর যাবে না। মালয় যাবে না। বার্মাও দুর্ভেদ্য।" মানস অভয় দেয়। সে বুঝতে পারে যে ঝরনা কোথায় আছে সেটা তার বাপের অজানা নয়।

সেদিন ডাক্তার ঘটক ভেঙে বলেন না যে তাঁর কন্যার জন্যেই তিনি চিন্তিত, বার্মার জন্যে নয়। মানস তাঁকে আভাস দেয় না যে ঝরনা সম্ভবত বার্মায়। মাস দুই বাদে তিনি আবাব ছুটে আসেন। রাগতভাবে বলেন, "আপনি, মশায়, একজন ফল্‌স প্রোফেট। সিঙ্গাপুরে জাপানীরা মালয়ের জঙ্গল ভেদ করে ঢুকেছে। এটা কারো মাথায় আসেনি। মিলিটারি ইন্‌টেলিজেন্স হচ্ছে নো ইন্‌টেলিজেন্স। আগে থেকে জানলে ডানকার্কের মতো অপসরণ করতে পারা যেত। জাহাজের তো অভাব ছিল না। শুনেছেন তো চৌষট্টি হাজার সৈনিক আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে সতেরো হাজার ব্রিটিশ, পনেরো হাজার অস্ট্রেলিয়ান, বত্রিশ হাজার ভারতীয়। হলদে মানুষের কাছে শাদা মানুষের মাথা হেঁট হয়েছে বলে শহরের অধিকাংশ লোক আনন্দে আত্মহারা। এদিকে যে কালো মানুষেবও মাথা নতুন করে হেঁট হলো — এবার হলদে মানুষের কাছে — তার জন্যে বেদনাবোধ নেই। আমার অবস্থাটা এখন চোরের মায়ের মতো। ডাক ছেড়ে কাঁদতেও পারিনে। আমি কি পাগল হয়ে যাব?"

"কেন? কেন?" মানস আঁতকে ওঠে।

"এতদিন কাউকেই জানতে দিইনি যে আমার মেয়ে ঝরনা আমার অমতে ওয়াকিতে যোগ দিয়েছে। সব চেয়ে খারাপটাই তো লোকে ভাবে। কী করে ওদের বোঝাব যে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যারাও দেশের বিপদে সাড়া দিয়েছে? দেশের বিপদ নয় তো কার বিপদ? ইংলণ্ডের বিপদ? এই যে সিঙ্গাপুর গেল এটা কি ভারতের পূবদিকের গেটওয়ে নয়? কত বড়ো একটা মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করতে মা আমার বার্মায় উপস্থিত হয়। মালয় গেছে, এরপরে বার্মাও যাবে। আহাহা! মল্লিক সাহেব, আমি আর সইতে পারছিনে। নারীর প্রাণের বাড়া তার মান ইজ্জত।" ডাক্তার সাহেব চোখে রুমাল দেন।

"আপনি কেমন করে জানলেন যে ঝরনা এখন বার্মায়।" মানস সুধায়।

"ওর শেষের দিকের চিঠিগুলোতে তার ইঙ্গিত ছিল।" তিনি উত্তর দেন।

জাহাজ ডুবছে দেখলে সকলের আগে মহিলাদের ও শিশুদের লাইফবোটে চাপিয়ে চালান দেওয়া হয়। এ নিয়ম যুদ্ধক্ষেত্রেও কি পালন করা হবে না? মানস ধরে নেয় যে সময় থাকতে ওয়াকিদেরও জাহাজে করে জাপানীদের নাগালের বাইরে চালান করে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার সাহেবকে অভয় দিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিতে যায়। শুনতে পায় ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ। ঝরনার মা কাঁদছেন।

কান্নার আওয়াজ থেকেই শহরময় রাষ্ট্র হয়ে যায় যে ইংরেজদের পরাজয়ের সঙ্গে ডাক্তার পরিবার জড়িত। দুই আর দুই মিলে চার হয়। ঝরনা ঘটক ওয়াকিদের একজন। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ছুটি নিয়ে কলকাতা রওনা হন। ফিরে আসেন না। শোনা যায় তাঁকে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে। আরো বড়ো জেলায়।

যূথিকা বলে, "জানতে ইচ্ছে করে ঝরনার কী হলো।"

"জানতে পাবে যুদ্ধের পরে। মাঝখানে নয়। মিলিটারি সীক্রেট। লোকে অবশ্য যতরকম উড়ো

গুজব রটাবে।" মানস গুজবে কান দেয় না।

এর পরে শোনা গেল জাপানীরা মালয় থেকে বার্মায় ঢুকেছে। এক এক করে শহর দখল করছে। ইংরেজরা তৈরি ছিল না। হটে আসছে আর হটবার সময় ঘরবাড়ী, জলের কল, পথঘাট, নদীর পুল, কলকারখানা, তেলের খনি, চালের গুদাম ধ্বংস করে দিয়ে আসছে। যাতে জাপানীদের ভোগে না লাগে। এর নাম ডিনায়াল পলিসি। গুজব শোনা যাচ্ছে খনি ধ্বংস করার সময় খনির ভিতরে যারা কাজ করছিল তাদেরও ধ্বংস করা হয়েছে। এর ফলে ইংরেজবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বার্মা থেকে শরণার্থীরা পালিয়ে আসছে, কেউ জলপথে, কেউ স্থলপথে। বার্মা সরকার নিজেই শরণার্থী।

বার্মা থেকে পলাতক এক ভদ্রলোকের মুখে শোনা গেল জাপানীরা নাকি বার্মার লোকদের বলছে, "আমরা এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসিনি, এসেছি তোমাদের শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে মুক্তি দিতে। তোমরা তোমাদের নিজস্ব সরকার গঠন করো। সে সরকার হবে আমাদের মিত্রপক্ষ।" সে রকম সরকার নাকি গঠন করা হয়ে গেছে। পাওয়ার ভ্যাকুয়াম ঘটেছিল মাত্র দু'দিন কি তিনদিনের জন্যে। সেই ক'টা দিন এক বিভীষিকা। চোর ডাকাতদের অবাধ রাজত্ব। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ওরা অবাধে খুন করেছে। জাপানী সৈনিকরাও যা করেনি। তেমনি এক বিভীষিকা আসামে ও বাংলাদেশে ঘটতে পারে। আর যেটা ঘটবার কথা সেটা জাপানীদের নয়, ইংরেজদের পোড়ামাটি নীতির প্রয়োগ। জাপানীদের বঞ্চিত করতে গিয়ে ওরা ভারতীয়দেরই বঞ্চিত করবে। জামশেদপুরকে ওরা জাপানীদের কাজে লাগাতে দেবে না। হাওড়া ব্রিজকেও না। বালী ব্রিজকেও না।

জাপানীরা যে কোন্ পথ দিয়ে ঢুকবে, কোথায় হানা দেবে, কারো জানা নেই। ইংরেজদেরও না। কোথায় বার্মা আর কোথায় মাদ্রাজ। মাদ্রাজের ব্রিটিশ গভর্নর সদলবলে শহর ছেড়ে মফঃস্বলে আশ্রয় নেন। কোথায় বার্মা আর কোথায় মেদিনীপুরের উপকূল। মেদিনীপুর থেকে রেকর্ড সরানো হয় বাঁকুড়ায়। কোথায় বার্মা আর কোথায় কলকাতা! কলকাতা থেকে অফিস সরানো হয় কৃষ্ণনগরে। ওদিকে নোয়াখালী চট্টগ্রামের নৌকা আর শাম্পান আগে ভাগে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পাছে জাপানীরা নদী পারাপার করে। চালের বস্তাও নাকি জলে ফেলে দেওয়া হয়, পাছে জাপানীরা খেতে পায়। সকলেই ভাবতে শুরু করে যে ইংরেজরা আসাম ও বাংলাদেশ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। যেমন ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে সিঙ্গাপুর, মালয় ও বার্মা থেকে। সৈন্যেরা অভাবে নয়, বেকায়দায় পড়ে। লণ্ডনে কেন্দ্রীভূত মিলিটারি হাই কম্যাণ্ড পৃথিবীময় ছড়ানো সাম্রাজ্য রক্ষা করতে অক্ষম। বিকেন্দ্রীকরণ চাই। কিন্তু সেটা কি তারা প্রাণ ধরে করবে? ভারতীয়দের উপর ভার দিলে ফল অন্যরূপ হতে পারত।

"একেই বলে, ডগ ইন দ্য মেন্‌জার। তোমরাও লড়বে না, আমাদেরও লড়তে দেবে না।" আক্ষেপ করেন কলকাতা থেকে পলাতক এক জমিদার, সুরেশ রায় চৌধুরী। এঁরা বাসা নিয়েছেন জজ কুঠির উল্টো দিকে। এঁদের ছেলেমেয়েরা মানসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে আসে। কিন্তু এঁরাই বা কদ্দিন এখানে তিষ্ঠতে পারবেন, যদি জাপানীরা এ জেলায় এসে হাজির হয়?

মানসের সঙ্গে দু'জন মিলিটারি অফিসারের আলাপ হয়। দু'জনেই ইংরেজ। মানস জিজ্ঞাসা করে, "আপনারা হটতে হটতে আর কতদূর পেছোবেন? কোথায় লাইন টানবেন?"

"আমরা একটার পর একটা লাইন টানছি, কিন্তু আসল লাইনটা হচ্ছে রাঁচীর আশে পাশে। ডিফেন্সের দিক থেকে ওটাই আমাদের পক্ষে অনুকূল।" তাঁরা উত্তর দেন।

মানসের রাগ হয়। কিন্তু ঝগড়া করতে পারে না। যার কর্ম তারে সাজে। ওঁরা মিলিটারি অফিসার। ওঁরা জানেন কোন্ লাইনটা ডিফেন্সের যোগ্য। কোন্‌টা নয়। জাপানীদের বিহার পর্যন্ত এগোতে গিয়ে যথেষ্ট বলক্ষয় হয়ে থাকবে। ওঁরা তার আগে কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি টানবেন।

একদিন সরকারের কাছ থেকে এক গোপন সারকুলার আসে মানসের নামে। তাতে একটা স্কীম

দেওয়া হয়েছে আপৎকালে ইভাকুয়েশনের। প্রধান অফিসারগণ যে যার কাজের ভার পরবর্তী উচ্চতর কর্মচারীদের হাতে সঁপে দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ব্রিটিশ শাসিত এলাকায় প্রস্থান করবেন। সব শেষে যাবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জাপানী কমাণ্ডারের হাতে চার্জ দিয়ে। কমাণ্ডার অনুরোধ করলে তিনি থেকে যাবেন।

মানসের মনে খেদ ছিল যে তাকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে সরিয়ে জেলা জজ করা হয়েছে। স্তোক দেওয়া হয়েছে, "দেশ শাসন করতে হলে ভালো জজও তো চাই।" এখন ওই সারকুলারখানা পড়ে ওর বিশ্বাস হয় যে ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। ভাগ্যিস্ ওকে যুদ্ধকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়নি। জাপানীরা যদি আসে তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আটক থাকতে হবে না, কমাণ্ডারের হাতে চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে না, তিনি অনুরোধ করলে তাঁর অধীনে কাজ করতে হবে না। অনুরোধ তো নয়,আদেশ। একেই বলে চেঞ্জ অভ্ মাস্টার্স। প্রভুবদল। জাপানীরা একটা দেশী সরকার গড়তে বলবে। কিন্তু তা বলে তারা মুক্তিদাতা নয়। মাঞ্চুরিয়া বা মাঞ্চুকুও তার নমুনা। জাপানীরা এলে মানসকে বিহারে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে সপরিবারে।

ওর এক বন্ধু বিহার সরকারে কাজ করে। সেও একটি গোপন সারকুলার পায়। তাতে ছিল ইভাকুয়েশন স্কীমের বিপরীত অংশ। আপৎকালে টেলিগ্রাম যাবে, "বেঙ্গল কামিং।" সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে শরণার্থী বাংলাদেশ সরকারের দফতর ও বাসস্থানের। শরণার্থী অফিসারদের উপযুক্ত পদের ও গৃহের। অবশ্য বাংলাদেশ থেকে বিহারে যাওয়া একটা সমস্যাই নয়। এককালে তো বাংলা, বিহার, ওড়িশা একটাই প্রদেশ ছিল। তখন বদলী না হতো কে? কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে যাঁরা শরণার্থী হয়ে যাবেন তাঁদের মানসম্মান থাকবে না। তাঁরা হবেন অতিথি অফিসার। কিছুদিন পরে অবাঞ্ছিত অতিথি।

"ছুটিই নিতে হবে, দেখছি। পুরো বেতনের ছুটি যথেষ্ট না হলে আধা বেতনের ছুটি। যদি সত্যিই জাপানীরা আসে।" মানস বলে যূথিকাকে।

"ওদের আসতে দেওয়া হবে না। ইংরেজরা যদি আসতে দেয় তবে ইংরেজদেরই বিদায় করতে হবে। জাপানীরা ওদের বিদায় করার আগে দেশের লোকই ওদের বিদায় করবে। বার্মার পুনরাবৃত্তি বাংলাদেশে নয়।" যূথিকার চোখে আগুনের আভা।

"তুমি কী বলতে চাও, জুঁই? বিপ্লব না বিদ্রোহ?" মানস চমকে ওঠে।

"কমিউনিস্টরা করলে বিপ্লব। ন্যাশনালিস্টরা করলে বিদ্রোহ। দেখা যাক কে কার আগে করে। করবেই, কেউ না কেউ করবেই। এটা সিঙ্গাপুরও নয়, মালয়ও নয়, বার্মাও নয়। এটা বাংলাদেশ। কী আস্পর্দ্ধা ইংরেজের। বলে কিনা ওদের পিছু পিছু বিহারে গিয়ে আশ্রয় নিতে। ছুটি নিতে চাও, নাও। কিন্তু বাংলার বাইরে যেয়ো না। তুমি বাঙালী সাহিত্যিক। সুখে দুঃখে বাঙালীর সঙ্গেই থাকবে। ছুটির বেতন না পেলেও সংসার চলবে। পলায়ন যদি করো তবে কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও প্রেস্টিজ যাবে। ইংরেজদের উচিত ছিল পালিয়ে না এসে প্রাণপণে লড়া। জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণের গ্লানি কি কোনোদিন মুছবে? মাঝখান থেকে ঝরনাটাকে বিসর্জন দিয়ে থাকবে। বেচারি এখন কোন্ জাপানীর কবলে পড়েছে কে জানে!" যূথিকার চোখ দিয়ে আগুন ছোটে, জলও ঝরে।

"না, না, ঝরনার কিছু হবে না।" মানস আশা করে।

"হবে গো হবে। এর নাম যুদ্ধ। এতে সব কিছু হয়। জাপানীদের আমি একরত্তি বিশ্বাস করিনে। বাংলাদেশকে কিছুতেই ওদের কবলে পড়তে দেওয়া চলবে না। ইংরেজদেরই তার আগে হটাতে হবে।" যূথিকার প্রতিজ্ঞা।

"জানিনে সৌম্যদা কী ভাবছে। ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। ও যদি একবার এদিকে আসত!"

মানস স্মরণ করে।

"ওরই তো বিপদ সকলের আগে। জাপানীরা আর এক পা এগোলেই ওর অঞ্চল।" যূথিকা মনে করিয়ে দেয়।

জাপান যেদিন পার্ল হারবারে হানা দেয় তার দিনকয়েক আগে চার্চিল সরকার স্থির করেন যে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের বিনা শর্তে মুক্তি দেবেন। বিশেষ করে নেহরু ও আজাদকে। কারণ মিটমাটের কথাবার্তা প্রধানত এঁদের সঙ্গেই চলবে। এঁরা যদি যুদ্ধে সহযোগিতায় রাজী হন কংগ্রেসও রাজী হবে। গান্ধীজী তো যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী। কেউ যদি তাঁকে রাজী করাতে পারেন তো নেহরু ও আজাদ।

তা ছাড়া গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্তার প্রচ্ছন্ন শর্ত এই যে মিস্টার জিন্নাকেও তাঁর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করতে হবে। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার একচ্ছত্র অধিকার গান্ধীজীর নেই, কারণ কংগ্রেসই ভারতীয় প্রিন্স তথা পীপলদের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান নয়। হ্যাঁ, 'পীপলদের'। একবচন নয় বহুবচন। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবে মুসলিম লীগ। লীগের তরফে জিন্না সাহেব। এটা অপ্রমাণ করবার জন্যে কংগ্রেস তার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করেছে মৌলানা আজাদকে। কথাবার্তা বলতে হলে কংগ্রেসের পক্ষে আজাদই বলবেন, লীগের পক্ষে জিন্না। গান্ধীজী কংগ্রেসের হয়ে কথা বলবেন না, কারণ যতবারই কথা বলতে গেছেন ততবারই জিন্নার সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হয়েছেন। জিন্না যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হন তবে গান্ধীও হয়ে যান কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বা অমুসলমান সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি। তাতে তাঁর বদ্ধমূল আপত্তি। কারণ তিনি সমগ্র ভারতের সর্বসাধারণের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত। বড়লাট যদি এটা স্বীকার না করেন তো বড়লাটের সঙ্গে তিনি কথাবার্তায় যোগ দেবেন না। কংগ্রেসকে ডাকলে কংগ্রেসের হয়ে আজাদ সাড়া দিতে পারেন। কিন্তু তাতে আবার উল্টো ফ্যাসাদ। আজাদ সাড়া দিলে জিন্না সাড়া দেবেন না। জিন্না সাড়া না দিলে ব্রিটিশ সরকার ফাঁপরে পড়বেন। কেবলমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট তাঁদের মূলনীতি নয়। মিটমাট হলে একই কালে লীগের সঙ্গেও হবে। নয়তো কারো সঙ্গে নয়। বড়লাট তাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁব শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত করে কংগ্রেস তথা লীগের জন্যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। দরজা খুলবেন যুদ্ধের পরে। নির্দলীয় সদস্যরাও জাঁকিয়ে বসেছেন।

সত্যাগ্রহীদেব মুক্তি দিলেও মাসের পর মাস যায়, জাপান এক এক করে সিঙ্গাপুর নেয়, মালয় নেয়, বার্মা নেয়। এর পরে আসাম নেবে, বাংলাদেশ নেবে। বড়লাটের টনক নড়লেও হাত পা বাঁধা। গান্ধীজীকে তিনি ডাকবেন না। এঁদের বাদ দিয়ে জিন্নাকেও না। তা ছাড়া তাঁর নিজের ক্ষমতা খর্ব হোক এটাও তিনি চান না। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা গিয়ে গভর্নরদের ক্ষমতা খর্ব করেছেন। কেন্দ্রেও কি তাই হবে না? লিনলিথগাউ নাকি চার্চিলকে জানিয়ে দেন যে তিনি এতে নাবাজ। তিনি বরং পদত্যাগ করবেন।

গড়িমসি করতে করতে রেঙ্গুনের পতন হয়। তখন চার্চিল সরকার বড়লাটের মারফৎ কথাবার্তা চালানো নিষ্ফল বুঝতে পেরে সার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে পাঠান। সমাজতন্ত্রী বলে জবাহরলালের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। উভয়েই ফাসিস্ট বিরোধী। বড়লাটের মতো তাঁর হাতপা বাঁধা নয়। তিনি নেহরুকে তো আমন্ত্রণ করলেনই, আজাদকেও করলেন। নইলে নেহরু কংগ্রেসকে রাজী করাতে পারতেন না। ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে তাঁরা হয়তো রাজী হয়ে যেতেন, কিন্তু গান্ধীজী সরাসরি জানিয়ে দেন তিনি ওতে নারাজ।

ক্রিপ্‌স প্রস্তাবকে তিনি বলেন, "A post-dated cheque on a crashing bank." ফেল করতে যাওয়া ব্যাঙ্কেব উপরে আগাম তারিখ দেওয়া চেক।

প্রস্তাবের সারমর্ম মহাযুদ্ধের পর ভাবতীয় ইউনিযন যদি ইচ্ছা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হতে পারবে। কোনো একটি প্রদেশ বা দেশীয় বাজ্য যদি ইচ্ছা করে সেও ভাবতীয় ইউনিয়ন থেকে

আলাদা হতে পারবে। যে যার ইচ্ছামতো সংবিধান রচনা করতে পারবে। আপাতত যুদ্ধের মাঝখানে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতির নেতাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠন করা হবে, সামরিক ব্যতীত যাবতীয় অসামরিক বিষয় তাঁদের হাতে অর্পণ করা হবে। তাঁরাও জাপানকে প্রতিহত করার জন্যে সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সামরিক তথা নৈতিক তথা বৈষয়িক।

কংগ্রেস নেতারা বলেন, "যুদ্ধের দায়দায়িত্ব যদি ভারতীয় সদস্যদের হয় তবে সামরিক দফতরটাও তাঁদের একজনকে দেওয়া উচিত। ইংরেজ সেনাপতি যথারীতি কাজ করবেন। কিন্তু শাসনপরিষদের সদস্য হতে পারবেন না।"

ক্রিপ্‌স বলেন, "ইণ্ডিয়ান আর্মি আসলে ব্রিটিশ আর্মিরই একটা অঙ্গ। ব্রিটিশ আর্মির কণ্ট্রোল ব্রিটিশ মিলিটারি হাই কমাণ্ডের হাতে। যুদ্ধের মাঝখানে হাত বদল করা বিপজ্জনক। ব্রিটিশ সরকার কিছুতেই সে কণ্ট্রোল হাতছাড়া করতে রাজী হবেন না।"

কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তার সূত্র ছিন্ন হয় এই ইস্যুতেই। কিন্তু এহো বাহ্য। শুধু সামরিক নয়, অসামরিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতেও ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ এস্টাব্লিশমেন্টের আন্তরিক আপত্তি ছিল। ব্রিটিশ সৈনিকরা তো নয়ই, ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরাও ভারতীয় কর্তাদের অধীনে চাকরি করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। জাপান আসছে তো কী হয়েছে? জাপানকে কয়েকটা প্রদেশ ছেড়ে দিয়েও তো অবশিষ্ট ভারতের উপর প্রভুত্ব করা যায়। পরে জাপানের কবল থেকে ফেরৎ পাওয়া যায়। জাপানীরা তো দিল্লী সিমলা পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে তো স্থানচ্যুত করছে না, স্থানচ্যুত হলে হবে আসাম সরকার তথা বাংলা সরকার।

ক্রিপ্‌সের প্রস্থানের পর রায় বাহাদুর বলেন, "স্রোতের মাঝখানে কেউ ঘোড়া বদল করে? ইংরেজরা যে করবে না এটা আমি জানতুম। গান্ধীজীও জানতেন। বেনিয়াকে বেনিয়াই চেনে। ইংরেজও বেনিয়া। গান্ধীও বেনিয়া। আর তা যদি বলেন, জিন্নাও বেনিয়া। সত্যিকার ক্ষমতা কংগ্রেসকে হস্তান্তর করলে মুসলিম লীগ অসহযোগ করত। মুসলিম রেজিমেন্টগুলো বিগড়ে যেত। তা ছাড়া ক্রিপ্‌স প্রস্তাব মেনে নিলে এটাও তো মেনে নেওয়া হতো যে মহাযুদ্ধের পরে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকেও ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। শিখেরা শাসিয়ে রেখেছে ওরা মারামারি করবে। আমাদের রক্ত অত গরম নয়,তা বলে আমরাও কি বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে সহজে রাজী হব? ক্রিপ্‌স সাহেব প্রকারান্তরে মুসলমানদের উস্‌কে দিয়ে গেলেন, মিস্টার মল্লিক। বলে গেলেন, ওরা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যায় তোমরাও ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেয়ো। কংগ্রেসকেও নোটিস দেওয়া হলো, সাবধান। আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করলে ফল হবে হিতে বিপরীত!"

মানস বড়ো আশা করেছিল যে কেন্দ্রে একটা বড়োরকম রদবদল হবে। ইংরেজ ও ভারতীয়, হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে মিলে মিশে জাপানীদের সঙ্গে লড়বে। নেতৃত্ব নেবেন নেহরু। স্টালিন যদি মার্শল স্টালিন হতে পারেন নেহরু কেন হবেন না মার্শল নেহরু? নেহরু যেমন করে দেশকে জাগাতে পারেন তেমন আর কে? যুদ্ধের জন্য অবশ্য। শিয়রে সংক্রান্তি। জাপান যে-কোনো দিন আসাম নেবে, পূর্ববঙ্গ নেবে। হিন্দুও বিপন্ন, মুসলমানও বিপন্ন। এটা কি হিন্দু মুসলিম বিবাদের সময়? ইংরেজ বিপন্ন, ভারতীয়ও বিপন্ন। এটা কি ইঙ্গ ভারতীয় বিরোধের সময়?

।। দশ ।।

রঙ্গমঞ্চে হতে যাচ্ছে 'হ্যামলেটে'র অভিনয়। থাকছেন না তাতে ডেনমার্কের যুবরাজ। হতে যাচ্ছে ভারতের বুকের উপর দিয়ে যুদ্ধ। থাকছেন না তাতে জবাহরলাল নেহরু। ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তথা চীনদেশের সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাইশেক পর্যন্ত বিচলিত। জাপানকে আরো বাড়তে দিলে তাঁদেরও তো বিপদ। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে রুজভেল্ট স্বয়ং চিঠি লেখেন। অনুরোধ করেন ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে তার নেতাদের যুদ্ধের অংশীদার করতে। কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। যুদ্ধের মাঝখানে ব্রিটিশ পলিসির হেরফের হবে না। যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকারের। সুতরাং ক্ষমতাও সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরই।

ভারত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। হাজার হাজার ব্রিটিশ সৈন্য মার্কিন সৈন্য প্রতিদিন আমদানী হচ্ছে। তাদের বাসস্থান জোগাবার জন্যে কলকাতার নাগরিকদের ঘরবাড়ী দখল করা হচ্ছে। তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে গ্রামের চাষীদের জায়গাজমি কেড়ে নিয়ে বিমানবন্দর তৈরী করা হচ্ছে। তাদের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থার নামগন্ধ নেই। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে পরে একসময়। কাগজের টাকায়।

এই নাট্যাভিনয়ে গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতাদের ভূমিকা কি নীরব দর্শকের? গঠনকার্যে মন দিতে বললে কেউ মন দেয় না। একদল প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীতে ও আইনসভায় ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল। আরেকদল জাপানীদের সহযোগিতায় ইংরেজদের খেদিয়ে নিয়ে যেতে উদ্‌গ্রীব। এমন কথাও কেউ কেউ বলছেন যে ইংরেজরা যে অঞ্চল থেকে অপসরণ করবে সে অঞ্চলে জাপানীদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ছিন্ন করে নো ম্যান্‌স ল্যাণ্ড বা মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করতে হবে। সেখানে স্থাপিত হবে জাতীয় সরকার। সেখানে উড়বে জাতীয় পতাকা। জাপানকে সেখানে পাদপরিমাণ ভূমি দেওয়া হবে না। আর ব্রিটেনকে প্রত্যাবর্তনের ছল।

যারা রাজনীতির ধার ধারে না, ছাঁ-পোষা লোক, তারা মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে জাপান রাজকে স্বাগত জানাবার জন্যে। যুগে যুগে এই কাজটি তারা করেছে। যে রাজা হবে তাকে তারা খাজনা দেবে। রাজভক্তি নিবেদন করবে। তাদের মতে —

"এক রাজা যাবে আর অন্য রাজা হবে
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

দেশের স্বাধীনতার মর্ম তারা বোঝে না। গণতন্ত্রও তাদের কাছে অর্থহীন। তারা শান্তিতে থাকতে চায়। যুদ্ধে যোগ দেওয়া না দেওয়া তাদের কাছে একটা প্রশ্নই নয়। পেশাদার সৈনিক যারা তারাই যুদ্ধ করবে। সে রকম লোক আর ক'জন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। তারা সেই উলুখড়। তবে প্রাণ যাবার আগে তারা একবার পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছে বিস্তর লোক। বোমার ভয়ে। তাঁদের মধ্যে জ্ঞানীগুণীও আছেন।

একদিন আগাম খবর না দিয়ে সৌম্য এসে হাজির। দু'বছর বাদে দুই বন্ধুতে দেখা। মানস জিজ্ঞাসা করে, "তুমিও কি পলাতক?"

সৌম্য হেসে বলে, "কোথায় পালাব, বল তো? যেখানেই পালাই জাপানীরা তো সেখানেও ধাওয়া করবে। তোমার ইংরেজ সেনাই তো দৌড় দেবে। আপাতত যেখানেই ইংরেজ সেখানেই নিরাপত্তা। কিন্তু আখেরে?"

"কিন্তু ওরা এক জায়গায় না এক জায়গায় দাঁড়াবেই, সৌম্যদা। আমি জানি ওরা রাঁচীতে লাইন টানবে স্থির করেছে।" মানস জানায়।

"হা হা। জাপানীরা রাঁচী বাইপাস করে সরাসরি দিল্লীর দিকে যাবে। সেখানে গিয়ে দিল্লীর শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ্ জাফরের বংশধরদের একজনকে সিংহাসনে বসাবে। মাঞ্চুরিয়ায় যা করেছে তারই অনুকরণে। বার্মাতেও একটা তাঁবেদার সরকার তৈরি করেছে। সর্বঘটে বার্মার লোককে বসিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকের উপদেষ্টা হয়েছে একজন জাপানী।" সৌম্য সংবাদ দেয়।

"তা হলে তোমাদের ভূমিকাটা কী? তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে ইংরেজদের অপসরণ, জাপানীদের অধিগ্রহণ, দিল্লীর সিংহাসনে বাদশাহের অভিষেক। তোমাদের ভূমিকা তা হলে নীরব দর্শকের।" মানস কাতরস্বরে বলে।

"কী করি, বলো? আমাদের তো ঢাল নেই, তলোয়ার নেই। আশা করেছিলুম জাপানীরা আসছে শুনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আমাদের নেতাদের হাতে ঢাল তলোয়ার দেবেন। কিন্তু তাঁর দূত সার স্টাফোর্ড ক্রিপস স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে মিলিটারির উপর খবরদারি যাঁদের হাতে আছে তাঁদের হাতেই থাকবে। তার মানে বড়লাটের সভাসদ্ হয়েও নেতারা হবেন নীরব দর্শক বা সাক্ষীগোপাল। ইংরেজ যদি পূর্ববঙ্গ থেকে হটে আসে নেতারাও হটে আসবেন, ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে এগোতে পারবেন না। আমরাও কি সঙ্গে সঙ্গে হটে আসব? তা হলে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াবে কারা? আমরা হটে এলে জনগণও কি প্রাণের দায়ে হটে আসবে না? কিংবা ঘরবাড়ীর মায়ায় জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না? পরে হয়তো ইংরেজরা যুদ্ধজাহাজ থেকে চট্টগ্রামে ল্যাণ্ড করবে ও পাল্টা আক্রমণ করবে। তখন দেশ হবে যুদ্ধক্ষেত্র। আর আমি যদি সেখানে থাকি আমি হব দুই আগুনের মাঝখানে কাসাবিয়াঙ্কা।"

যূথিকা তা শুনে বলে, "ওমা! তুমি কেন কাসাবিয়াঙ্কার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পুড়ে মরবে ও তলিয়ে যাবে?"

এই বলে সে আবৃত্তি করে ছেলেবেলায় পড়া ইংরেজী কবিতা —

"The boy stood on the burning deck.
Whence all but he had fled....."

মানস বলে, "ছেলেটির বাবা ওকে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ করেছিলেন। বেঁচে থাকলে তাকে সরে যেতে বলতেন। কিন্তু তিনি শত্রুর গোলায় মারা যান। ছেলেটি তা জানে না। বার বার বাবাকে ডাকে। সাড়া পায় না। কী শোচনীয় পরিণতি! তা তুমি কেন কাসাবিয়াঙ্কা হতে যাবে? কার আদেশে?"

"আমারও তো একজন বাবা আছেন। যাঁর নাম বাপু। বাপুর আদেশ ও ছাড়া আর কী হতে পারে! আমার আশ্রমই হচ্ছে সেই ডেক যেখানে আমাকে খাড়া থাকতে হবে। তাঁর হুকুম না পেলে আমি সেখান থেকে নড়তে পারব না। ইংরেজ বা জাপানী কেউ না কেউ পোড়ামাটি নীতি মেনে শহরটাকে পোড়াবে। আশ্রমও পুড়বে। আমিও পুড়ব। এর থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় দেশটাকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে না দেওয়া। ভারতকে বার্মা হতে না দেওয়া। সেটা হয়তো সম্ভব হতো চার্চিল যদি আমাদের নেতাদের বিশ্বাস করে মিলিটারি পাওয়ার দিতেন। কিন্তু তাঁর মনে একটা সন্দেহ কাজ করছে।" সৌম্যর অনুমান।

"কী সন্দেহ?" মানস কৌতূহলী হয়।

"অহিংসাবাদী গান্ধীর পরামর্শে যদি ওঁরা জাপানের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি করে যুদ্ধ থামিয়ে দেন সেটা হবে ব্রিটেনের দিক থেকে আরো বড়ো ক্ষতি। তার মনোবল ভেঙে পড়বে। গান্ধী না থাকলে

কংগ্রেসকে পোষ মানানো তত কঠিন হতো না। ওই ক্রিপস প্রস্তাবেই সে রাজী হয়ে যেত। যত দোষ নন্দ ঘোষ ওই গান্ধী। কংগ্রেস নেতাদেরও কারো কারো ধারণা তিনি থাকতে কোনোদিন তাঁরা ক্ষমতার আসনে বসতে পারবেন না, যাঁরা আসন ছেড়েছেন তাঁরা ফিরতে পারবেন না। গান্ধীজী সেটা জানেন। দেখে এলুম তিনি আরো বেশী নিঃসঙ্গ।" সৌম্য দুঃখ প্রকাশ করে।

পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে গান্ধীজী যাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন সৌম্যও তাদের অন্যতম। আপাতত তিনি নীরব শ্রোতা। তাঁর একমাত্র উপদেশ যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। সবাইকে স্বস্থানে থাকতে বলবে। যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালিয়ে কারাবরণ আর নয়। সে অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। নতুন অধ্যায় কী হবে তা কেউ জানে না। তিনিও চিন্তামগ্ন। সেগাঁও ইতিমধ্যে সেবাগ্রাম হয়েছে।

"অনেকদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আবার কবে হবে তা কে বলতে পারে? যদি কাসাবিয়াঙ্কা হতে হয় তো এই শেষ দেখা। তাই সেবাগ্রাম থেকে ফেরবার পথে ট্রেন বদল করে দেখা করতে এলুম।" সৌম্য যেন শেষ বিদায় নিতে চায়।

"শুনব না, শুনব না তোমার ওকথা।" যূথিকা রাগ করে। "ফের যদি অমন কথা মুখে আনো আমি অনশন করব, সৌম্যদা। এমন কিছু করতে হবে যাতে জাপানীরা আদৌ আমাদের দেশে না আসে। যদি আসে তবে এমন কিছু করতে হবে যাতে ইংরেজরা তার আগে আমাদের নেতাদের হাতে সামরিক ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা একটা কাজের কথা নয়। জুলি এ বিষয়ে কী ভাবছে?"

জুলির নাম শুনে সৌম্য মিষ্টি হাসে। "জুলি? ও কি কোনোদিন কিছু ভেবেছে যে আজ ভাববে? ওর যখন যেটা খেয়াল তখন সেই অনুসারে কাজ। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধীজীর শ্রাদ্ধ করে বেড়াচ্ছে। ও কী বলে শুনবে? ও বলে, জোয়ার যখন এসেছিল তখন তোমরা তরী ভাসাওনি। তীরে দাঁড়িয়ে লগ্ন বইয়ে দিলে। পরে একটা লোক-দেখানো আন্দোলন করলে। ব্যক্তি সত্যাগ্রহ। কেন, গণ সত্যাগ্রহ নয় কেন? তার বেলা ভয়ে পেছিয়ে গেলে। জনতাকে ভয়। পাছে ওরা সেই সুযোগে বিপ্লব বাধিয়ে বসে। নেতৃত্ব কেড়ে নেয়। এখন হাজার মাথা খুঁড়লেও সেই জোয়ার আর ফিরবে না। নতুন জোয়ারের জন্যে প্রতীক্ষা করতে গেলে দল ভেঙে চৌচির হবে। রাজাজী তো প্রকাশ্যে বেঁকে বসেছেন। ভিতরে ভিতরে আরো অনেকে। তিন মাস পরে দেখবে মন্ত্রীরা যে যার পদে ফিরে গেছেন। কেন্দ্রেও পণ্ডিতজী যোগ দিয়েছেন জাপানের ভয়ে। তোমরা হেরে গেছ, সৌম্যদা। আমি নিরুত্তর।"

যূথিকা বিস্মিত হয়ে বলে, "পণ্ডিতজীর উপর জুলি এমন বিরূপ কেন?"

সৌম্য হেসে বলে, "জুলির বিপ্লবী গোষ্ঠীর মতে পণ্ডিতজী হচ্ছেন এদেশের কেরেনস্কি। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।"

"তা হলে এদেশের লেনিন কে?" যূথিকা সুধায়।

"লেনিন হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র। তিনি বিপ্লবের স্বার্থে যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন। এখন তিনি লেনিনেরই মতো কোথায় যেন আত্মগোপন করেছেন।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"বা! জুলির গোষ্ঠী যদি হয় এদেশের বোলশেভিক গোষ্ঠী তবে বাবলীর গোষ্ঠী কী?" যূথিকা প্রশ্ন করে।

"বোন, আমাকে জেরা করবে কী হবে? আমি কী করে বলব বিপ্লবীদের কে কোন্ ধারা অনুসরণ করে? সব ক'টাই তো বিদেশী ধারা। পুঁথি থেকে পাওয়া। পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে বিপ্লব কবে কোন্ দেশে হয়েছে? বাবলীর কথা যখন উঠল তখন বলি বাবলীর সঙ্গে জুলির এখন গলাগলি বন্ধুতা নয়। চুলোচুলি শত্রুতা। এই মারে তো ওই মারে।" সৌম্য দুঃখিত।

"বিবাদটা কি মতবাদ থেকে? না আরো গভীর কারণ আছে? ব্যক্তিগত ঈর্ষাদ্বেষ নয় তো!"

মানস উদ্বিগ্ন।

"না। দু'জনেই তার উর্ধ্বে। জুলির মতে স্বাধীনতা পেতে হলে এই তার মওকা। সুতরাং আগে ভারত, তার পরে রাশিয়া। বাবলীর মতে বিপ্লব যদি রাশিয়ায় ব্যর্থ হয় তবে ভারতেও ব্যর্থ হবে। সুতরাং আগে রাশিয়া, তার পরে ভারত। ওটা মতবাদের দ্বন্দ্ব।" সৌম্য আশ্বাস দেয়।

"অথচ মজা এই যে দু'জনেই ওরা বিপ্লববাদী, দু'জনেরই মহাগুরু লেনিন। আমি মনে করি ওটাও একপ্রকার ধর্মান্ধতা। ফ্যানাটিসিজম।" মানস আক্ষেপ করে।

"মজা! তোমার কেবল সবতাতেই মজা। ওই যে দুটো মেয়ে চুলোচুলি করছে ওটা তোমার কাছে মজার বিষয়।" যূথিকা বকুনি দেয়।

"না, না, ঠিক চুলোচুলি নয়।" সৌম্য শুধরে দিয়ে বলে, "চিল্লাচিল্লি। স্বপনদা ওদের থামাতে পারেন না।"

"স্বপনদা! স্বপনদার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক।" যূথিকা অবাক হয়।

"স্বপনদা ওদের দু'জনকেই ডিনারে ডেকেছিলেন, যেমন আগেও ডাকতেন। ঘটনাক্রমে আমি সেদিন জুলিদের বাড়ীতে অতিথি। জুলি আমাকেও ডিনারে নিয়ে যায়। টেবিলে আরো কয়েকজন ছিলেন। শুনলুম ওঁরা লিবারল হিউমানিস্ট। আলাপ আলোচনা রাজনীতিবর্জিত। কিন্তু কখন একসময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ওঠে। তার থেকে ইংরেজ বনাম জাপানী। অমনি বাবলী বলে ওঠে, জাপানকে রুখতে হবে। রাইফেল চাই। সঙ্গে সঙ্গে জুলি চেঁচিয়ে ওঠে। রাইফেল দিয়ে কাকে মারবি? ইংরেজকে না জাপানীকে? বাবলী বলে, ইংরেজকে নয়, সে এখন রাশিয়ার জন্যে লড়ছে। আর যায় কোথা? বেধে যায় তর্কাতর্কি। গালাগালি। চিল্লাচিল্লি। স্বপনদা থামাতে পারেন না। আমার দিকে তাকান। আমি জুলিকে ঠাণ্ডা করি। তখন বাবলীকে ঠাণ্ডা করেন দীপিকা বৌদি। এর পর স্বপনদা বাবলীকে জেরা করেন। স্টালিনের মুখে সুভোরভের নাম কেন? সুভোরভ তো অষ্টাদশ শতাব্দীর জার আমলের সেনাপতি। ফিউডাল সামন্ত। ভূমিদাসদের দুশমন। বাবলী নির্বাক। তখন স্বপনদা বলেন, ওটা হচ্ছে রুশজাতির অতীত গৌরবের প্রতি আবেদন। সেক্ষেত্রে শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদবুদ্ধি নেই। মতবাদে মতবাদে সংঘর্ষ নেই। আগে দেশ, তার পরে অন্য কথা। তা শুনে জুলির কী উল্লাস! ওপাশে বাবলীর মুখখানা শুকিয়ে যায় দেখে স্বপনদা সেই সঙ্গে জুড়ে দেন, সব দেশই মানুষের দেশ। ফ্রান্স যদি আমার আপনার হয়ে থাকে জার্মানী কি আমার পর? না, জার্মানীও পর নয়। জার্মানী যদি পর না হয় তবে রাশিয়া কি আমার পর? না, রাশিয়াও আমার পর নয়। রাশিয়ার জন্যেও আমার দরদ। তা শুনে বাবলী গলে যায়। কিন্তু জুলির চোখে তিরস্কার।" সৌম্য বিবরণ শোনায়।

"স্বপনদার ভবিষ্যতে সতর্ক হওয়া উচিত। একজনকে ডাকলে আরেকজনকে ডাকতে নেই। ওরা এখন আর মানিকজোড় নয়।" মানস মন্তব্য করে।

যূথিকা হাঁফ ছেড়ে বলে, "বাঁচা গেল। ওদের ঠাণ্ডা না করলে ওরা হয়তো ছুরি কাঁটা নিয়ে খুনোখুনি করত।"

"না, না, অতদূর যেত না।" সৌম্য হেসে বলে, ডিনারের পর দেখা গেল ওরা দিব্যি খোশগল্প জুড়ে দিয়েছে। স্বপনদাও ধরিয়ে দিয়েছেন একজনের হাতে চকোলেট। আরেকজনের হাতে ক্যারামেল। বলছেন, নারীর শত্রু আর কেউ নয়, টাইম। একদিন দেখবে যৌবন চলে গেছে। রূপ ঝরে গেছে। কেউ তোমাদের ধারে কাছেও আসছে না। তোমরাও ঝগড়াঝাটি করে কাউকেই কাছে টানতে পারছ না। রাইফেল, রিভলভার, জেল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড তোমাদের জন্যে নয়। তোমাদের জন্যে পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি। যুদ্ধ বা বিপ্লবের পরেও এসব থেকে যায়। ধরে রাখে মেয়েরাই। যাও, বয়স থাকতে বিয়ে থা করো, মা হও। গান গাও, বাজনা বাজাও, নাচন নাচো, ছেলেছোকরাদের নাচাও। বাবলী আর জুলি

খিলখিল করে হাসে। কে বিশ্বাস করবে যে একটু আগে এরাই দুই বিশ্রীর মতো চিল্লাচিল্লি করছিল? জুলিকে সঙ্গে নিয়ে আমি ওদের বাড়ী ফিরি।"

"স্বপনদা হৃদয়বান পুরুষ, তবু পুরুষ তো! নারীকে তিনি তার নিজের জায়গায় রাখতে চান। যেমন ইংরেজরা ভারতীয়দের। তিনি ভাবতেই পারেন না বিপ্লবেও নারীর স্থান আছে, যেমন রোজা লুকসেমবুর্গের। যুদ্ধেও কি নারীর স্থান নেই, যেমন জোন অভ আর্কের? বিপ্লবকে, যুদ্ধকে এঁরা উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন। তাই যদি হয় তবে বাবলীকে বা জুলিকে বয়স থাকতে বিয়ে থা করতে, মা হতে বলা কেন? বিয়ে করতে চাইলেই কি বর পাওয়া যায়? এই যেমন জুলির বর। বানপ্রস্থের বয়স না হলে কিছুতেই কি তিনি বিয়ে করতে রাজী হবেন? বাবলীর ইতিহাস আমার জানা নেই। কিন্তু এদেশে ক'জন যুবকের এমন বুকের পাটা যে বাপ মার অমতে ওর মতো একটি খুন করতে উদ্যত মেয়েকে বিয়ে করবে! হ্যাঁ, একজন জোয়ানের মতো জোয়ান বটে সুকুমার দত্তবিশ্বাস। মিলির অমন অপরাধের রেকর্ড আর অসুখের রেকর্ড শুনেও পেছিয়ে গেল না। এক কথায় বিয়ে করে বিলেতে নিয়ে গেল। ভালো কথা, দাদা, মুস্তাফীদের খবর কী? জাপানীরা এলে তাঁরা কী করবেন?" যূথিকা চিন্তাকুল।

"তাঁরা সেবাপ্রতিষ্ঠান ফেলে কোথাও যাবেন না, যদিও কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব বাড়ী রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, কলকাতার বিপদ আরো বেশী। তার চেয়ে গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থাকা নিরাপদ। জাপানীদেরও তো ডাক্তারের দরকার হবে, ওষুধপত্রের দরকার হবে। ভালো কথা, শুনেছ বোধহয় ওঁদের একটি নাতি হয়েছে। হ্যাঁ, মিলিরই ছেলে।" সৌম্য সানন্দে শোনায়।

"ওমা, কবে?" উৎফুল্ল হয় যূথিকা। "চিঠিপত্রে আভাসটুকুও দেয়নি। কেমন আছে ওরা? মা আর ছেলে?"

"ভালোই।" সৌম্য যতদূর জানে।

"লণ্ডনে বোমাবর্ষণ থেমেছে। না, মানস? আমি ভাবছি ওরা কি সেখানে নিরাপদ?" যূথিকার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

"কলকাতার চেয়েও নিরাপদ। হিটলার এখন আর ওমুখো হবে না। যখন হবে তখন নেপোলিয়নের মতো রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে। তার পর আর একটা ওয়াটারলু।" মানস অতীতের সঙ্গে মিলিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে।

যূথিকা ভোজের আয়োজন করতে যায়। মিলি ও তার বাচ্চার সম্মানে। নিজের বাচ্চাদের সন্ধানেও লোক পাঠায়। ওরা গেছে পাড়ায় খেলা করতে।

"আচ্ছা, সৌম্যদা, সেবাগ্রামে যাবার পথে তুমি তো কলকাতায় দিনকয়েক কাটালে। কেমন দেখলে জুলির মনোভাব? ও কি বাবলীর মতো জাপানকে রুখবে? না জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজকে তাড়াবে?" মানস সুধায়।

"না, জুলি বাবলীর মতো জাপানকে রুখবে না। ও বলে, দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ রাজত্বের মূলোৎপাটন করতে হলে জাপানের মতো বহিঃশত্রুর কাঁধে ভর দিয়ে লড়তে হবে। আমেরিকানরা লড়েছিল ফ্রান্সের কাঁধে ভর দিয়ে। ইতিহাসে আরো নজীর রয়েছে। জাপানীরা যদি জাঁকিয়ে বসতে চায় তাদের বিদায় করা তত কঠিন হবে না। জাপান যে এতদূর এসেছে সেটা আকস্মিক ঘটনা নয়, দৈবপ্রেরিত সুযোগ। আমরা যদি ওদের রুখতে যাই আমাদেরই ক্ষতি। বাবলীরা যদি রুখতে চায় ইংরেজদের কাঁধে ভর দিয়ে লড়বে। কিন্তু তাতে লাভ হবে সাম্রাজ্যবাদীদেরই। কমিউনিস্টদের কী! এসব যুক্তি অবশ্য জুলির নিজের নয়। ওর দাদাদের। তেমনি বাবলীর যুক্তিগুলোও ওর নিজের নয়। ওর কমরেডদের। দেশের জনগণের সঙ্গে ওদের কোনো পক্ষেরই নাড়ীর যোগ নেই। জনগণ যদি জাগে তবে তাদের আত্মশক্তিই যথেষ্ট। জাপানীদের বা ইংরেজদের কাঁধে ভর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।" সৌম্যর বিশ্বাস।

মানস চিন্তান্বিত হয়। "তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর, সৌম্যদা, যে ভারতের জনগণ দুই হাতে দুই ফ্রন্টে লড়তে পারবে? এক হাতে জাপানীদের সঙ্গে, আরেক হাতে ইংরেজদের সঙ্গে? এই ধরো, পূর্ববঙ্গ যদি ইংরেজরা ছেড়ে দেয় আর জাপানীরা কেড়ে নেয় তবে সেখানকার লোকজন জাপানীদের সঙ্গে লড়তে গেলে শুনবে তারা ইংরেজদের পঞ্চম বাহিনী। ধরা পড়লে কোতল হবে। পশ্চিমবঙ্গের লোকজন লড়বে ইংরেজদের সঙ্গে। তখন শুনবে এরা জাপানীদের পঞ্চম বাহিনী। এরা হয়তো কোতল হবে না, কিন্তু এদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে বেলুচীস্থানে বা সিন্ধে বা আজমীরে। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বহুদূরে ও তাদের অজ্ঞাতসারে। সেটাও একপ্রকার জীবন্ত সমাধি। জুলিদের যুক্তি বুঝতে পারি, যদিও সমর্থন করিনে। বাবলীদের যুক্তিও বোধগম্য। যদিও সমর্থন করা শক্ত। সমর্থন করলে পোড়ামাটিও সমর্থন করতে হয়। জাপানীদের বঞ্চিত করার নামে ওরা জামশেদপুরের ইস্পাতের কারখানাও ধ্বংস করতে পারে। কমিউনিস্ট দোস্তরা বারণ করলে কি মিলিটারি হাই কমাণ্ড গ্রাহ্য করবে? যাতে গ্রাহ্য করতে বাধ্য হয় সেইজন্যেই তো কংগ্রেস নেতারা মিলিটারির উপর কণ্ট্রোল দাবী করেছিলেন। ভারতের স্বার্থ ওই কারখানাটাকে অক্ষত রাখা। জাপানীদের বঞ্চিত করতে গিয়ে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা কি উচিত? এটা অসম্ভব নয় যে জাপানীরা জামশেদপুর পর্যন্ত ধাওয়া করে আসবে ও টাটার কারখানাটা নিজেদের কাজে লাগাবে। কিন্তু তার দ্বারা জয়পরাজয় নির্ধারিত হবে না। জয়পরাজয় নির্ভর করবে প্রশান্ত মহাসাগরের জলযুদ্ধের উপর। ভারত ভূখণ্ডের স্থলযুদ্ধের উপর নয়। পার্ল হারবারের জাহাজগুলো জাপান ডুবিয়ে দিয়েছে বলে সব ক'টা জাহাজ ডুবিয়েছে তা নয়। জার্মানরা কাবু হলে আমেরিকার আটলাণ্টিক নৌবহর প্যাসিফিকে চলে আসবে। তার সঙ্গে যোগ দেবে ব্রিটেনের নৌবহর। হিটলারের বরাতে যেমন আরেকটা ওয়াটারলু তোজোর কপালে তেমনি আর একটা ট্রাফলগার। জাপানের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়িত করে আমরা জয়গৌরবের ভাগী হব না, সৌম্যদা। জুলিকে এটা বুঝিয়ে দিয়ো তুমি। পরাজয়ের গ্লানির ভাগ নিয়ে আমাদের লাভ কী হবে? আর বাবলীকে বোঝানো কারো সাধ্য নয়। ওর কমরেডদের কাছে নির্দেশ আসছে মস্কো থেকে লণ্ডন হয়ে। ওর আক্কেল হবে যখন দেখবে ধনিকদের পৌষমাস শ্রমিক-কৃষকদের সর্বনাশ। সেই সর্বনাশ থেকে বিপ্লব গজালে বিপ্লবের ফলভাগী হবে কংগ্রেসের বামপন্থী দল। কমিউনিস্ট দল নয়। তখন দ্বিতীয় বিপ্লবের জন্যে দিন গুনতে হবে। কে জানে কতকাল। ওরা যদি রাশিয়ার জয় নিয়েই সন্তুষ্ট হতে চায় তো ওদের সাধ মিটবে। কিন্তু ভারতের জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পাবে না। ভারতের স্বাধীনতা যাদের কাছে জীবনমরণ প্রশ্ন তাদের দৃষ্টি এখন গান্ধীজীর উপরে। দেখা যাক তিনি কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেটাই হোক সেটা অবিলম্বে গ্রহণ করা চাই। জাপানের পরবর্তী পদক্ষেপের পূর্বেই। নইলে তোমাকে হতে হবে কাসাবিয়াঙ্কা। কী ভয়ানক কথা!"

সৌম্য স্বভাবত শান্ত ও স্থিতধী পুরুষ। কিন্তু কাসাবিয়াঙ্কা হবার সম্ভাবনা তাকেও ভিতরে ভিতরে দোলা দিয়েছে। সে তার আধ্যাত্মিক সঞ্চয় থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে। সে পালাবে না, মাথা হেঁট করবে না, জাতীয় পতাকা নামাবে না, আত্মসমর্পণ করবে না। জাপানীরা যদি তাকে বন্দী করে তবে বন্দী হবে, যদি গুলী করে তবে প্রাণ দেবে। সহযোগিতা নৈব নৈব চ। তথাকথিত স্বাধীনতার বিনিময়েও নয়। সে যুদ্ধবিরোধী। সর্বপ্রকার যুদ্ধবিরোধী। তার মধ্যে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলতে কেবল ব্রিটেনের নয়, জাপানেরটাও বোঝায়। তার স্থান দুই আগুনের মাঝখানেই।

"দ্যাখ, মানস, আমাদের যুদ্ধকালীন পলিসি আমরা পুরো একবছর ধরে ভেবে চিন্তে দেড়বছর আগে স্থির করেছি। সেই অনুসারে ব্যক্তিসত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দিয়েছি। সেটা কি আমরা প্রত্যাহার করেছি? না, সেটা বহাল রয়েছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি কথা মুখ ফুটে বললে আগে আমাদের গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হতো। এখন দশটি কথা বললেও কেউ আমাদের গায়ে হাত দেয় না। এটাও একপ্রকার স্বাধীনতা। এমন স্বাধীনতা কি আর কোনো দেশের নাগরিকদের আছে? আমরা কি এ স্বাধীনতা

স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারি? তার আগে ওজন করে দেখতে হবে কী আমরা পাচ্ছি। তুমিই বিচার করে বলো, ভারতের অপরিমেয় লোকবল থাকতে রোজ শত শত ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য আমদানী করা হচ্ছে কিসের প্রয়োজনে? যুদ্ধজয়ের, না বিদ্রোহদমনের? তাদের থাকবার জায়গা জোগানোর জন্যে কলকাতা প্রভৃতি শহরের শত শত ঘরবাড়ী চব্বিশ ঘণ্টা নোটিসে দখল করা হচ্ছে কেন? তারা কি তাঁবুতে থাকতে পারত না? দেশে কি তাঁবুর আকাল? বাইরে থেকে আনিয়ে নেওয়া যেত না? তাদের ভোগের জন্যে একহাতে গোমাংস ও আরেক হাতে নারীমাংস খরিদ করা চলেছে। আমরা ভারতীয়রা টাকার লোভে বিক্রী করছি। সে টাকাও আমাদেরই রক্তনিংড়ানো টাকা। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে বহুলোকের চাষের জমিও দখল করা হচ্ছে। সেখানে নাকি বিমান বন্দর হবে। চাষের জমি গেলে ফসল ফলবে কোথায়? ভারতের অভাব হবে না? লোকে খাবে কী? চট্টগ্রাম নোয়াখালীর নৌকা আর শাম্পান জোর করে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাছে জাপানীরা ব্যবহার করে। এদিকে ইংরেজের প্রজারাও যে ব্যবহার করতে পারছে না। তাঁদের মাল চলাচল বন্ধ। নিত্য প্রয়োজনীয় তেল নুন লকড়ির অভাব হবে না? প্রতিবাদ করতে গেলে কড়া সেনসরশিপ। সব ক'টা কাগজই এখন কর্তাভজা। এক গান্ধীজীর 'হরিজন' বাদে। সেটা তো এতদিন বন্ধই ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে বলে খুলেছে। কথাবার্তা বন্ধ হলেই আবার বন্ধ হবে। দেশের কোথায় কী ঘটছে তা জানবার কি জো আছে? রাতের বেলা যেমন বোমার ভয়ে ব্ল্যাক আউট দৈনিক পত্রিকায় তেমনি দিনের বেলা ব্ল্যাক আউট। সত্য হয়েছে প্রথম ক্যাজুয়ালটি। কংগ্রেস নেতারা যদি সরকারে যোগ দেন এ ক্যাজুয়ালটি রোধ করা তাঁদেরও সাধ্য নয়। এই ইস্যুতেই বাপুকে কারাবরণ করতে হবে। এর থেকে তাঁকে টলানো যাবে না। সত্য আগে। আর-সব পরে। এমন কী, অহিংসাও। বাপুকে দেখে এলুম। তিনি ইস্পাতের মতো শক্ত। সত্য বলতে হবে, পূর্ণ সত্য বলতে হবে, কোনো কথা গোপন করা চলবে না। যেমন তোমার আদালতের শপথ। আমাদের হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই। সত্যই আমাদের অস্ত্র। যুদ্ধকালে সত্যই ব্রহ্মাস্ত্র। নেহরু বা আজাদ কারো মুখ চেয়ে এ অস্ত্র আমরা ত্যাগ করব না। শর্তে যদি বসে জাতীয় সরকার হোক। আমরা বাদ সাধব না। কিন্তু আমাদের সত্যের মুখে বল্‌গা পরানো চলবে না। নেহাৎ যেগুলো মিলিটারি সীক্রেট সেগুলো আমরা ফাঁস করব না। কিন্তু এখন তো সব কিছুই যুদ্ধের নামে নিষিদ্ধ। সরকার পক্ষের প্রচারকার্য বাদে। সেটা তো মিথ্যার বেসাতি।" সৌম্য কিছুক্ষণ দম নেয়।

"কী করা যায়। যুদ্ধের প্রয়োজনে মিথ্যা তো সেই যুধিষ্ঠিরের আমল থেকেই দুনিয়ার নিয়ম। বোধহয় আরো আগে থেকে। গান্ধীজী যদি এ নিয়ম মেনে নিতে না চান তাঁকে কারাগারেই পাঠাতে হবে। কংগ্রেস নেতারা যদি এতে নারাজ হন তবে ক্ষমতার মায়া কাটাতে হবে। যুদ্ধ যতদিন সুদূর ছিল ততদিন আমি যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহের মহিমা উপলব্ধি করেছি। যুদ্ধ এখন দেশের দোরগোড়ায়। এটা কি সত্যাগ্রহের সময়?" মানস মাথা নাড়ে।

"তা হলে সিভিল লিবার্টির অর্থ কী? কেন তবে ইংরেজ ফরাসী আমেরিকানরা সিভিল লিবার্টির এত বড়াই করেন? কোন্ মুখে তাঁরা জার্মান ও রাশিয়ানদের নিন্দা করেন? এদেশে যারা শান্তিবাদী তারা শান্তির জন্যে কাজ করলে যদি তাদের কারাগারে পাঠাতে চাও তো পাঠাও। কিন্তু তখন হয়তো দেখবে জনগণ তাদের কারামুক্ত দেখতে চায়। গান্ধীজীকে কারাগারে রেখে কংগ্রেস এদেশ শাসন করতে পারবে না। তা ছাড়া আরো কথা আছে। যে-কোনো দেশের পক্ষে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো যুদ্ধ ও শান্তির সিদ্ধান্ত। যুদ্ধের সিদ্ধান্তটা ভারতের উপর ছেড়ে না দিয়ে ইংলণ্ড নিজেই নিয়ে বসে আছে। তার লীগাল রাইট থাকতে পারে, কিন্তু মরাল রাইট আছে কি? গান্ধীজীর আপত্তি সেইখানে। এখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত যদি নিতে হয় নবগঠিত ভারত সরকারই নেবার মালিক। ভারতের জনমত এখনো জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেনি। জাপান বলছে না যে সে ভারতের শত্রু। সরকারী

মহল যা খুশি বলুক, ভারতের জনগণ জাপানের সঙ্গে লড়াইতে জড়িয়ে পড়তে রাজী নয়। জাপান যদি গায়ে পড়ে আক্রমণ করে সেকথা আলাদা, কিন্তু তাকে খুঁচিয়ে শত্রু করে তোলাও উচিত নয়। প্রথম সুযোগে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়াই বিজ্ঞতা। বাপু তো বলেছেন এই বুড়ো বয়সেও তিনি জাপানে যেতে রাজী। প্রাণপণে চেষ্টা করবেন যাতে যুদ্ধ থামানো যায়। এর মানে কি ইংরেজের বা মার্কিনের পরাজয়? না, এতে কোনো পক্ষেরই পরাজয় নয়, উভয় পক্ষেই সম্মানজনক সন্ধি। স্বাধীন ভারত যুদ্ধের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ব্রিটেনের উপর ছেড়ে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু শান্তির মতো আরেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারে না। যদি সেটা সম্মানজনক হয়। এই মহাযুদ্ধে শান্তিবাদীরা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে তাকে শান্তির অভিমুখে পরিচালনার দায় মহাত্মার মতো শান্তিবাদীর। তিনি বেঁচে থাকতে দেশকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে দেবেন না। কারাগারেই অনশনে মৃত্যুবরণ করবেন। এবার তাঁর সংকল্প কেবল কারাবরণ নয়, অনিবার্য হলে অনশনে মৃত্যুবরণও।" সৌম্য আবার দম নেয়।

"শোন, সৌম্যদা, বিশ্ব রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তোমাকে জ্ঞান দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তোমাকে বলে রাখি বিশ্বযুদ্ধের দিন একতরফা সন্ধি স্থাপনের অধিকার কোনো যুদ্ধরত দেশেরই নেই। না ইংলণ্ডের, না আমেরিকার, না রাশিয়ার, না ভারতের, ভারত যদি মাঝখানে স্বাধীন হয়। গত মহাযুদ্ধে লেনিনই সে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, সেটা সম্ভব হয়েছিল দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলে। ততদিনে রুশ সৈন্যরা রণক্লান্ত হয়েছিল। আর জনগণও শান্তির জন্যে অধীর। এবারকার মহাযুদ্ধের মাঝখানে যদি বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে, তাও শুধু প্রথম বিপ্লবের নয়, দ্বিতীয় বিপ্লবেরও, তা হলে হয়তো একতরফা সন্ধি স্থাপন সম্ভব হবে। নয়তো নয়। দ্বিতীয় বিপ্লব দূরের কথা, প্রথম বিপ্লবও দূর অস্ত্। এটা রাশিয়া নয় ভারত।" মানস মনে করিয়ে দেয়।

"তুমি যাই বলো, ভাই, সংগ্রাম যখন আরম্ভ করে দিয়েছি তার মোমেন্টাম আমরা হাতছাড়া করব না। চার্চিল তাঁর শেষকথা বলে দিয়েছেন। রুজভেল্টও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সংগ্রাম এখন তার আপন মোমেন্টামে চলবে। জাপানের আসা না আসা অবাস্তব। জাপান যদি আসে জাপান অধিকৃত অঞ্চলেও আমরা শান্তির জন্যে লড়ব। স্বাধীনতা ও শান্তি একসঙ্গেই অবতীর্ণ হবে। যদি বেঁচে থাকি বাঁচা সার্থক হবে। যদি মারা যাই মরা সার্থক হবে।" সৌম্যর শেষ কথা।

এমন সময় মণিকা এসে ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর দীপক এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। পেছনে ওদের মা।

।। এগারো ।।

সৌম্য এবার দীপকের জন্যে এনেছে একখানা অটোগ্রাফের বই। তাতে মহাত্মা প্রমুখ নেতাদের স্বাক্ষর। আর মণিকার জন্যে একখানা আলবাম। তাতে তাঁদের ফোটোগ্রাফ। বলে, "তোমরা এখন থেকে দেশের জন্যে একটু একটু ভাবতে শেখো। আমাদের তো যাবার সময় হলো।"

যূথিকা বিষম রাগ করে। "অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই। তুমি আরো অনেকদিন বাঁচবে। দেশকে স্বাধীন করবে। তার পর জুলিকে বিয়ে করে গৃহস্থ হবে। জুলিরও একটি খোকা হবে। যেমন মিলির হয়েছে।"

সৌম্য হেসে বলে, "তার পর একটি খুকি হবে না? যেমন তোমার?"

"হবে, হবে। তার জন্যেও বেঁচে থাকতে হবে।" যূথিকার আবদার।

"বেঁচে থাকা না থাকাটা আমার হাতে নয়, বোন। আমার সামনে এক অগ্নিপরীক্ষা। সীমান্তে বাস

করছি। যে-কোনোদিন কামানের মুখে পড়তে পারি। আমাদের মানসমোহন যে ফ্রণ্টে যাবার স্বপ্ন দেখছিলেন সেই ফ্রণ্ট এখন হাতের নাগালে পৌঁছেছে। তবে জার্মান নয়, জাপানী, এই যা তফাৎ। তাঁর ভাগ্য ভালো, তিনি এখন নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু কে জানে, সরকার যদি তাঁকে আবার ম্যাজিস্ট্রেট করে সীমান্তে পাঠিয়ে দেয়। জুজিয়ন্তী ওঁর ভালো লাগে না। এবার সামলাবেন ঠেলা জাপানী অভিযানের। রেঙ্গুনে কী হয়েছিল, শুনবে? ম্যাজিস্ট্রেটকে চার্জে রেখে আর সকলে চম্পট। মায় পুলিশ অফিসার, জেল অফিসার। কয়েদীরা ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে। বেপরোয়া ভাবে লুট করে, ধর্ষণ করে, খুন করে, ঘরে আগুন দেয়। সাক্ষীদের উপর প্রতিশোধ নেয়। ম্যাজিস্ট্রেট কী করতে পারেন? সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, ইংরেজরা আগেভাগে সরিয়েছে। পাছে ধরা পড়ে বন্দী হয়। শেষে জাপানী কমাণ্ডারের হাতে চার্জ সঁপে দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে রেঙ্গুন থেকে বিদায়। তিনি তাঁকে আটকে রাখতেও পারতেন। শাসন চালানোর জন্যে। তা হলে তো আরো মুশকিলে পড়তে হতো। জাপানীরা জারি করে মার্শাল ল। ম্যাজিস্ট্রেট হন সাক্ষীগোপাল। মানস যাকে বলে নীরব সাক্ষী। সে রকম নীরব সাক্ষী হবার চেয়ে নিষ্ক্রমণই শ্রেয়। কিন্তু আমার কি সেই সৌভাগ্য হবে? 'চাচা, আপনা বাঁচা' হাকিমদের নীতি হতে পারে, সেবকদের নীতি নয়। আমরা লোকসেবক, আমরা লোকের সঙ্গে বাঁচব, লোকের সঙ্গে মরব। ওদের পেছনে ফেলে পালাব না।'' সৌম্য মন খুলে বলে।

''তুমি যে আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে, সৌম্যদা। সরকার যদি অমাকে আবার ওই জেলায় বদলী করে, এবার ম্যাজিস্ট্রেট পদে, তা হলেই গেছি। আমি যে অ্যাণ্টিফাসিস্ট। কেউ না কেউ সে কথাটা ওদের কানে তুলবে। আমি এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ নই। সত্যের সঙ্গে আমি আপস করতে পারব না। যা থাকে কপালে। তবে আমাকে যদি বদলী করে জুঁইকে আর বাচ্চাদের সঙ্গে নেব না। বিহারে বন্ধুর বাড়ী পাঠিয়ে দেব। না, ছুটি চাইব না। সেটা কাপুরুষতা। ফ্রণ্টে যেতে চেয়েছিলুম, ফ্রণ্টেই যাব, নীরব সাক্ষী হব না। তবে জাপানীরা যদি সত্যি সত্যি আসে, আমাকে আটকে রাখে, মার্শাল ল জারি করে, তা হলে কিন্তু আমি নাচার। মহাত্মা নই যে অনশনে প্রাণ দেব।'' মানসও বলে প্রাণ খুলে।

যূথিকা উত্তেজিত হয়ে বলে, ''তুমি কি ভেবেছ তোমাকে আমি একলা যেতে দেব? অত বড়ো বিপদের মুখে? বাচ্চাদের আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। ওদের ছেড়ে থাকতে পারব না। এ রকম হবে জানলে তোমাকে বলতুম, চাকরি ছেড়ে দাও। একবছর আগে চাকরি ছাড়লে কেউ বলত না যে বিপদ এড়ানোর জন্যে চাকরি ছেড়েছ। এখন ছাড়লে সকলেই ছি ছি করবে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে দেশের জন্যে ছেড়েছ। হ্যাঁ, এটা একটা অগ্নিপরীক্ষাই বটে। যেমন সৌম্যদার তেমনি তোমার, তেমনি আমার। রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে?''

''আমার মনে একটুও খেদ থাকত না, সৌম্যদা, আমার বদলীটা যদি জাতীয় সরকারের নির্দেশে হতো। জানো তো ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যুদ্ধ ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে সেনাপতিদের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। মন্ত্রীদেরই পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহির দায়। ভুলচুক হলে মন্ত্রীরাই লোকের আস্থা হারাবেন। সরকার পদত্যাগ করবে। এটা যদি ব্রিটেনের বেলা খাটে তবে ভারতের বেলাও খাটবে না কেন? যুদ্ধটা তো ব্রিটেনের দোরগোড়ায় নয়, ভারতেরই দোরগোড়ায়। সেনাপতিদের উপর চোখ বুজে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে কে? যাদের দেশ তারা নয়, যারা সাত সমুদ্রপারের বিদেশী রাজমন্ত্রী। এই মুহূর্তেই ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন নেতাদের ডেকে নিয়ে সিভিল তথা মিলিটারি উভয়প্রকার ক্ষমতার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাঁরা যদি যুদ্ধের দায়িত্ব নেন তাঁদেরই উপর বর্তাবে জবাবদিহির দায়। অবশ্য সেনাপতিদেরও যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস যেটা দাবী করছে সেটা অযথা নয়। এমন কথা কি কংগ্রেস বলছে যে যুদ্ধ দফতরের ভার কংগ্রেসের একজনকে দিতে হবে? লীগের একজনকে দিলে তিনিও দেশের স্বার্থ দেখবেন। রেঙ্গুনের পুনরাবৃত্তি চট্টগ্রামে নাও

হতে পারে। মণিপুরে নাও হতে পারে। আমি শান্তিবাদী নই, কংগ্রেসও শান্তিবাদী নয়, লীগও নয় শান্তিবাদী। জাপানকে রুখতেই হবে। রুখতে হবে সীমান্তেই। নইলে সে কলকাতা বাইপাস ধরে সটান দিল্লীতে গিয়ে হাজির হবে। তখন তো সরকার বদল হবেই। তার আগে নয় কেন?'' মানস উত্তেজিত।

''আমারও সেই প্রশ্ন। তার আগে নয় কেন? কংগ্রেস, লীগ যেই যুদ্ধ দফতরের ভার নিক না কেন সেটা ভারতের স্বার্থে। সেক্ষেত্রে গান্ধীজী সরে দাঁড়াবেন। তবে তাঁর যুদ্ধবিরোধী মতবাদ শিকেয় তুলে রাখবেন না। সেটা তাঁর অন্তরাত্মার আদেশ। তাঁকে সে স্বাধীনতা দিতে হবে। নয়তো জেলে পুরতে হবে। তিনিও নেতাদের যুদ্ধে যোগ দেবার স্বাধীনতা দেবেন। সেটা যদি হয় তাঁদের অন্তরাত্মার নির্দেশ। এই সন্ধিক্ষণে আমরা কেউ কাউকে বাধা দেব না, বাধ্য করব না। তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার। তুমি অ্যান্টিফাসিস্ট। আমি অ্যান্টিওয়ার। অ্যান্টিওয়ার বললে অ্যান্টিফাসিস্টও বোঝায়। কিন্তু সামরিক অর্থে নয়। আমরা সত্যাগ্রহ করব। যেমন ব্রিটিশ অকুপেশনের বিরুদ্ধে তেমনি জাপানী অকুপেশনের বিরুদ্ধে। কিন্তু অসময়ে নয়। যথাকালে। কেউ যেন না ভাবে আমরা ইংরেজদের শত্রু, আর জাপানীদের মিত্র। শান্তিবাদীরা সকলেরই মিত্র। কারো শত্রু নয়। আরো একটা কথা, মানস। জাপানীরা যেদিন বার্মার মতো আসাম কিংবা বাংলা দখল করবে সেদিন সারা ভারত বিদ্রোহ করবে। সেটা হবে স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থান। দিল্লীর সরকারের পতন অবধারিত। সে সরকার যদি কংগ্রেস লীগ সরকার হয়ে থাকে তবে সে সরকারেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। অপসরণ ও পোড়ামাটি এই যদি হয় পলিসি তবে সরকার বদল বৃথা।'' সৌম্য হুঁশিয়ারি দেয়।

''সেইজন্যেই তো সেনাপতিদের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিতে নেই।'' মানস বলে।

''আমিও সেটা মানি। কিন্তু আমাদের যে আরো একজন সর্বাধিনায়ক। তিনি গান্ধীজী। আমাদের যে আরো একপ্রকার যুদ্ধ। গণসত্যাগ্রহ। যুদ্ধের সেটা নৈতিক বিকল্প। আমরা সেটা জোর করে কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাব না। শুধু এইটুকু চাইব যে উপযুক্ত লগ্ন উপস্থিত হলে আমরা যেন সেটা প্রয়োগ করার স্বাধীনতা পাই। যুদ্ধ এ পৃথিবীতে অনেকবার হয়েছে, অনেকবার হবে। যুদ্ধকালে গণসত্যাগ্রহ একবারও হয়নি। তার জন্যে সর্বাধিনায়কও মেলেননি। ইতিহাস কি আমাদের একবারও সুযোগ দেবে না? এবার যদি সুযোগ না পাই কবে আবার পাব? গান্ধীজী কি চিরজীবী? আমরাও কি চিরায়ু?'' সৌম্যর কণ্ঠস্বরে আকুলতা।

মানসের মনে পড়ে কোথায় যে পড়েছিল ইংরেজদের অপসরণের আর জাপানীদের অনুসরণের মধ্যবর্তী ব্যবধানে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার কল্পনা। জিজ্ঞাসা করে, তার কি কোনো সম্ভাবনা আছে?

''আছে বইকি। সেটা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া চাই। সোভিয়েটের মতো পঞ্চায়েৎও আপনা আপনি গজিয়ে উঠবে। যদি টেকে আপন প্রাণশক্তির জোরেই টিকবে। আমরা গিয়ে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু উদ্যোগটা স্থানীয় লোকদের। মুশকিল হচ্ছে স্থানীয় লোকেরা যেখানে প্রধানত মুসলমান সেখানে ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে জাতীয় পতাকা ওড়াতে গেলে আপত্তি উঠবে। ওরা হয়তো লীগ নিশান ওড়াবে। এই নিয়ে মতান্তর থেকে মনান্তরও ঘটতে পারে। পাশাপাশি দুটি গ্রাম হয়তো হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। সে কী রকম মুক্তাঞ্চল। আমার আশ্রমের শাখা প্রশাখা বিভিন্ন গ্রামে। আমি কি পাকিস্তানী মুক্তাঞ্চলে বিদেশী বলে গণ্য হব? কাজেই সাবধান হতে হবে।'' সৌম্য মনে মনে বামপন্থীদের হুঁশিয়ারি দেয়।

নৈশভোজনের সময় যূথিকা সুধায়, ''দাদা, তুমি কি আজকেই ফিরে যাবে? রাতের ট্রেনে কষ্ট হবে না?''

''কলকাতায় কাল সকালে আমার একটা কাজ আছে।'' সৌম্য উত্তর দেয়।

''জুলির সঙ্গে দেখা হবে তো?'' যূথিকা জানতে চায়।

''হবে সন্ধ্যার দিকে, যদি ওদের ওখানে যাই।'' সৌম্য জানায়।

"তা হলে ওকে বোলো, বাঘের পিঠে চড়লে নামবার জো নেই। পিঠ থেকে নামলে পেটে যাবে। জাপানীদের কাঁধে চড়ারও একই পরিণাম। ওদের দেওয়া স্বাধীনতা আরেকরকম পরাধীনতা।" যূথিকাও হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়ে না।

"সেটা আমারও মত, বোন। কিন্তু ও কি শুনবে?" সৌম্য হাসে।

"ইংরেজীতে একটা কথা আছে, আমার শত্রুর যে শত্রু সে আমার মিত্র। জুলির শত্রু কে? না ইংরেজ। ইংরেজের শত্রু কে? না জাপানী। তা হলে জুলির মিত্র কে? না জাপানী।" মানসও হাসে।

"জুলি ভুল করছে। এটা কিছুতেই সত্য হতে পারে না যে জাপান ভারতের মিত্র। চীন তার কী ক্ষতি করেছিল? চীনকে আক্রমণ করতে গেল কেন? কোরিয়ার কী অপরাধ? দন্তের সহিতে জিহ্বার পীরিতি সুযোগ পাইলে কাটে। জাপান একদিন ভারতকেও তাঁবেদার বানাবে।" যূথিকা ভয় দেখায়।

"তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, বোন, গান্ধীজী এ বিষয়ে সতর্ক রয়েছেন। মার্শল চিয়াং কাইশেক এসে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। চীনকে সাহায্য করাই স্বাধীন ভারতের নীতি হবে। কিন্তু আপনি নিরপেক্ষ থেকে। এইখানে ইংরেজদের নীতির সঙ্গে আমাদের নীতির প্রভেদ।" সৌম্য ব্যাখ্যা করে।

"কই, কংগ্রেস তো নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না!" মানস খোঁচায়।

"সেইখানেই তো কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের মতভেদ।" সৌম্য কাটান দেয়।

মানস তা শুনে বলে, "একপক্ষ যদি হয় আক্রমণকারী ও অপর পক্ষ আক্রান্ত তবে নিরপেক্ষ থাকার অর্থ কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া নয়?"

"না, তা কেন হবে? আমরা আক্রান্তকে আমাদের সহানুভূতি জানাব, সে একেবারে নির্দোষ জানলে তাকে আমাদের নৈতিক সমর্থন জোগাব। প্রয়োজন হলে ডাক্তার পাঠাব, নার্স পাঠাব, ওষুধপত্র পাঠাব। কিন্তু তার পক্ষে অস্ত্রধারণ করব না। করলে এর পরে মধ্যস্থতা করতে পারব না। শান্তিস্থাপন করতে পারব না। আমাদের মুখে নিরস্ত্রীকরণের বুলি ফাঁকা শোনাবে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমরা অহিংসাবাদী। তা হলে এতদিন ধরে যে অহিংসার সাধনা করলুম সেটা হবে তাসের ঘর রচনা। একটি ফুঁয়ে ধসে পড়বে। না, মানস, অন্তত একজনকে এ সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। তাঁর দিক থেকে বিবেচনা করলে নিরপেক্ষতাই শ্রেয়। তবে সমগ্র দেশকে তো তিনি এখনো তাঁর সঙ্গে পাননি। সমগ্র কংগ্রেসকেও না। তাই মতভেদের উল্লেখ করেছি। দেশ যদি ইচ্ছা করে ইংরেজদের বা জাপানীদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। শুধু এইটুকু হুঁশ রাখলেই হলো যে গান্ধী তার মধ্যে নেই। তাঁর যে সাধনা সেই সাধনায় তাঁকে অটল থাকতেই হবে। আমরা যারা তাঁর সঙ্গে আছি তারা তাঁকে ছাড়ব না। নিঃসঙ্গ হতে দেব না। একলা চলতে দেব না। আমরা আর ক'জন। আমাদের সামনে বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা। উত্তীর্ণ হব কি না কে জানে! আমাদের দৃষ্টি সরকারের উপর নয়, সরকার বদলের উপর নয়। আমাদের দৃষ্টি জনগণের উপর। তাদের আত্মশক্তির উপর। তড়িৎ জাগরণের উপর। ওরা যদি হিংসায় উন্মত্ত হয় তবে আমরা জানব যে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে ব্যর্থতাই সিদ্ধির সোপান? যদি হাল ছেড়ে না দিই, হার মেনে না নিই। আমরা বিশ্বাস করি যে ইংরেজদেরও একদিন অন্তঃপরিবর্তন হবে। ওদের যদি হয় তবে জাপানীদেরও হবে। জার্মানদেরও হবে। সর্ব মানবের হবে। হিংসার যুগ শেষ হয়ে যাবে। নতুন যুগ আরম্ভ হবে।" সৌম্য ভবিষ্যদ্বাণী করে।

মানস ও যূথিকা স্তব্ধ হয়ে শোনে। তারা জানে যে এসব মুখের কথা নয়। প্রাণের কথা। অন্তরাত্মার কথা।

"তুমি তা হলে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছ?" মানস সুধায়।

"হ্যাঁ, ভাই। কে জানত যে সেটাই হবে যুদ্ধের ফ্রন্ট? আমাকে তো পাঠানো হয়েছিল হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির জন্যে। এখন দেখছি নতুন দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আরো জটিল। এবার হিন্দু বনাম মুসলিম নয়।

ইংরেজ বনাম জাপানী। ইংরেজ বনাম ভারতীয়। জাপানী বনাম ভারতীয়। ভারতীয়দের একদল ইংরেজের পক্ষে। আরেক দল জাপানীর পক্ষে। কোথায় তলিয়ে গেছে হিন্দু মুসলিম সমস্যা। কিন্তু তলিয়ে গেলেও তলে তলে সক্রিয়। জনগণ বিভ্রান্ত। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে, তারা কি উলুখড়ের মতো প্রাণে মরবে? সেও তবু ভালো, কিন্তু এক রাজা যদি আরেক রাজার হাতে তাদের নিগ্রো ক্রীতদাসের মতো বেচে দিয়ে যায় তা হলে তার চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? যেমন বার্মায় ঘটেছে। আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। মাছের রক্ত তো নয়। মানুষের রক্ত। অহিংসার বাঁধ ভেঙে যেতে চায়। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করি। বাপুকে একথা জানিয়েছি। তিনি জানেন।" সৌম্য তার বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকেও জানায়।

"বিষম জট পাকাতে যাচ্ছে। এ জট খুলতে না পারলে একে কাটতে হবে। তা বলে তোমাকে কেন কাসাবিয়াঙ্কা হতে হবে?" মানস পছন্দ করে না।

"সেটাই এই নাটকে আমার ভূমিকা। অন্য ভূমিকা যদি থাকে বাপু আমাকে জানাবেন।" সৌম্য এইখানে দাঁড়ি টানে।

বন্ধুকে বিদায় দেবার সময় মানস কাঁপা গলায় বলে, "এ দেখা শেষ দেখা নয়। আবার দেখা হবে।"

যূথিকা তার সঙ্গে যোগ করে, "জুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমার উপর। মনে রেখো সেটাও তোমার একটা দায়িত্ব।"

সৌম্য অভিভূত হয়। বলে, "সত্যাগ্রহীরা অকারণে বা তুচ্ছ কারণে প্রাণ দেয় না। প্রাণের জন্যে কঠিন মূল্য নেয়। যদি কোনোদিন শোন যে আমি নেই তা হলে জেনো আমি স্বাধীনতাকে একচুল এগিয়ে দিয়ে গেছি। অহিংসাকেও।"

এর পরে মানস বলে তার জীবনসঙ্গিনীকে, "ওর কী ভূমিকা তা ও জানে। সে ভূমিকা যত ক্ষুদ্র হোক না কেন। কিন্তু আমার ভূমিকা আমার অজানা। আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ড্রিফ্ট করে চলেছি। কোথাও আমার স্থিতি নেই। আজ এ জেলা, কাল ও জেলা, কোথাও শিকড় গাড়তে পারছিনে। চাকরি ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু এখন যদি ছেড়ে দিই পরে একদিন পশতাব। ছাড়ব সেই দিনই যেদিন মনে হবে এখন না ছাড়লে পরে পশতাতে হবে।"

যূথিকা সায় দেয়। "যে কাজ করলে অনুশোচনা জন্মায় সে কাজ না করাই ভালো। আপাতত ছেলেমেয়েরা আর একটু বড়ো হোক। সৌম্যদার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না। ও তো বিয়ে করেনি, ছেলেমেয়ের বাপ হয়নি। আর ওর পেছনে আছেন স্বয়ং গান্ধীজী। তোমার পেছনে কে আছে?"

"আমার পেছনে আছে গভর্নমেন্ট।" মানসকে স্বীকার করতেই হয়।

"তা হলে সেই গভর্নমেন্টের চাকরিতেই তোমার স্থিতি। আজ এ জেলা, কাল ও জেলা তো তোমার সার্ভিসের সকলেরই বেলা। স্থিতিশীল তো একজনও নন। অন্তত তোমার বয়সে। গতিশীল না হলে দেশকে চিনতে কী করে? স্বপনদার মতো কলকাতায় বসে? শান্তিনিকেতনে বাস করলেও তুমি দেশকে চিনতে না। তবে একঠাঁই শিকড় গাড়তে পারতে, সেটা ঠিক। কিন্তু সেই শিকড়ের তলায় কতটুকু মাটি আছে?" যূথিকার মনে সংশয়।

"যাক, স্থিতির সিদ্ধান্ত পরে নিলেও চলবে। ভূমিকার চিন্তাটাই আগে। দেশ এখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে চলেছে। আর দু'দিন বাদে জাপানীরা এসে পড়বে। তখন আমার ভূমিকা কী হবে? আদালতে বসে মামলার বিচার করতে থাকব? সেটাও একটা দরকারী কাজ। কত লোক মামলা করতে বা মামলা দেখতে আসে। সেটাও তো একপ্রকার নাটক। প্রত্যেকের মনে একটা কী হয়, কী হয় ভাব। আমি নিজেও জানিনে কোন্ মামলার পরিণাম কী হবে। বিয়োগান্ত না মিলনান্ত। সাজা পাবে না ছাড়া পাবে। হেরে যাবে না জিতে যাবে। উকীলরা এক একজন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জুন। তেমনি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আদালতও

একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানে আমি নীরব সাক্ষী নই। আমারও একটা ভূমিকা আছে। আমার সিদ্ধান্তই ভাগ্যনিয়ামক। হাতে কাজ না থাকলে বিলিতি মামলার বিবরণ পড়ি। কোথায় লাগে ডিটেকটিভ নভেল। কিন্তু এর নীট ফল হচ্ছে মানুষ জাতটার উপরেই ঘেন্না ধরে যাওয়া। কী কুৎসিত সব কেস্। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি যে আমিও খুন করে লাশ লুকিয়ে রেখেছি। আমিও একজন আসামী। আমার মনের স্বাস্থ্যের জন্যে আমি পরিবর্তন চাই। চাইলে গভর্নমেণ্ট বলে, পাবলিক ইণ্টারেস্ট আগে। পার্সনাল প্রেফারেন্স পরে।" মানস আক্ষেপ করে।

এর কিছুদিন পরে কমিশনার সাহেব আসেন জেলা পরিদর্শনে। বাঙালী সিভিলিয়ান। বয়োজ্যেষ্ঠ। সারকিট হাউসে মিস্টার কিরণময় মজুমদারের সঙ্গে আলাপ করতে যায় মানস। কথাপ্রসঙ্গে বলে জজিয়তী ওর ধাতে সয় না।

মজুমদার সাহেব একটু হেসে বলেন, "আমিও তো এককালে তাই ভাবতুম। জজের জীবন নেহাৎ একঘেয়ে। কারই বা ভালো লাগে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। আত্মসম্মানের দিক থেকে, স্বাধীনতার দিক থেকে জজের মতো পদ আর নেই। ম্যাজিস্ট্রেটদের তো উপরওয়ালাদের মুখ চেয়ে কাজ করতে হয়। শেষপর্যন্ত কমিশনার পদের উপরে উঠতে দেয় না। দিলে ইংরেজদের দেয়। তাও আজকাল প্রোভিনসিয়াল অটোনমি হয়ে অবধি গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউনসিলার পদ উঠে গেছে। উঠে না গেলে আমাদের সার্ভিসের ইউরোপীয়ান মেম্বাররাই পেতেন। আমরা নয়। আমাকে কমিশনার পদেই পাকা করবে কি না সন্দেহ। আমার দৌড় ওই তিন হাজার টাকা অবধি। জজ হয়ে আপনি ভুল করেননি। আপনি যদি মন দিয়ে কাজ করেন শেষপর্যন্ত হবেন হাই কোর্ট জজ। আপনার বেতন হবে চার হাজার টাকা। যাতে আখেরে লাভ সেইটেই তো ভালো। কেন তবে আপনি মন্ত্রীদের খিদমদ্গার হতে যাবেন? বলা যেতে পারে আগেকার দিনে যাঁরা কমিশনার হতেন তাঁরা ছিলেন তিনহাজারী মনসবদার। সে যুগ তো আর নেই। ইউরোপীয়ান অফিসারদেরও আর সে প্রেস্টিজ নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বলুন, কমিশনার বলুন, সেক্রেটারি বলুন সকলেরই ক্ষমতা ও সম্মান কমে গেছে। সেই সঙ্গে কমে গেছে টাকার দাম। এই তিন হাজার টাকা কি সেই তিন হাজার টাকা? ইউরোপীয়ান অফিসাররাও হালে পানী পাচ্ছেন না। সে জাঁকজমক আর নেই। এই যুদ্ধ আমাদের পথে বসাবে, যদি বেশীদিন গড়ায়।"

"আপনি তবে জজের পদ ছেড়ে ম্যাজিস্ট্রেট হতে গেলেন কেন? আখেরে যখন হাইকোর্ট জজ হতে পারতেন।" মানস কৌতূহলী হয়।

এর উত্তরে তিনি তাঁর জীবনের কথা বলেন। "জানেন তো, জজকে প্রয়োজন হলে প্রাণদণ্ড দিতে হয়। চরম দণ্ড দেবার আগে জজেরা যতই সাবধান হোন না কেন, এক আধটা কেসে বিচারের ভুল হয়ে থাকেই। হাইকোর্টে সেটার সংশোধন হতে পারে, সাধারণত হয়ও। কিন্তু এমন একটি কেসের কথা জানি যেখানে তা হয়নি। ছেলেটা আপীলই করেনি। করতে দেয়নি। সে মরতেই চেয়েছিল, যদিও মারেনি। তার বাপকে খুন করেছে তার সৎমায়ের প্রেমিক। তার সৎমা তাকে জড়িয়েছে। তার বাপও অন্ধকারে চিনতে না পেরে তার নাম করেছে। সে মার্সি পিটিশন পেশ করলে প্রাণদণ্ডের জায়গায় দ্বীপান্তর হতো। সেটাও সে করেনি। আমার কোর্টের কেস নয়, নইলে সে আমাকে চিরদিনের জন্যে বিবেক দণ্ড দিয়ে যেত। ওটা আমার আগে যিনি ছিলেন তাঁর কেস্। বিভিন্ন সূত্রে যা শুনি তাতে আমি হকচকিয়ে যাই। সদ্য সাবালক ওই ছেলেটিকে আমি জেলখানায় দেখতে যাই। কিছুতেই সে মার্সি পিটিশন পেশ করবে না। করলে অপরাধটা মেনে নেওয়া হবে। অমন কাজ তো সে করেনি। অপরাধ স্বীকার করে মার্সি পিটিশন পেশ করলে ছোকরা বেঁচে যেত। আর আমিও জজের পদে থেকে যেতুম। কে জানে কখন ভুল করে একজন নিরীহ মানুষকে ফাঁসির হুকুম দিই এই ভয় আমার মনে হানা দেয়। যতই জপ করি না কেন নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী, ভগবানের সেই উপদেশ আমাকে শান্তি দেয় না। ভুল করে একজন নিরীহ

মানুষকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে গীতার দোহাই দেওয়া আত্মপ্রতারণা। ছুটি নিয়ে গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও সব কথা খুলে বলি। তিনি আমাকে জুডিসিয়াল থেকে একজিকিউটিভে বদলীর আদেশ দেন। বিবেকের দায় থেকে আমি বর্তে যাই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অমন করে হাইকোর্ট হারানোর সত্যি কোনো দরকার ছিল না। এ লাইনে এসে কি আমার বিবেককে নির্মল রাখতে পেরেছি? কত ছেলেকে বিনা বিচারে ডিটেন করতে হয়েছে। পুলিশ যা বলবে তাই চূড়ান্ত। পুলিশের উপর এতখানি নির্ভরতা আগেকার দিনে ছিল না। টেররিস্টদের প্রাদুর্ভাব ইউরোপীয় অফিসারদের আর কোনো আশ্রয় রাখেনি।''

মানস তাঁর পরামর্শ চায়। ''তা হলে আপনি আমাকে কী করতে বলেন, মিস্টার মজুমদার। আমাকে তো ওঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে আমার বেলা পুনর্বিবেচনার আশা নেই। একজিকিউটিভও তো আর লোভনীয় নয়। টেররিজম গেছে, তার জায়গায় এসেছে কমিউনিজম। বিনা বিচারে ডিটেন করা বন্ধ হয়নি। যদিও এই মুহূর্তে কম। ইংরেজরা রশিয়াকে যুদ্ধে মদত দিচ্ছে। অতএব কমিউনিস্টরাও গভর্নমেণ্টকে যুদ্ধকালে শান্তি দিচ্ছে। যুদ্ধের পর আবার ধরপাকড় শুরু হবে। তার চেয়েও অপ্রিয় কর্তব্য সাম্প্রদায়িক গোলমাল থামানো। থামালেও মুশকিল, না থামালেও মুশকিল। একপক্ষ বলবে, লোকটা হিন্দুদরদী ও মুসলিমবিদ্বেষী। অপরপক্ষ বলবে, মুসলিমদরদী ও হিন্দুবিদ্বেষী। মুসলমানদের দাবী, হয় মুসলিম অফিসার পাঠাও, নয় ইউরোপীয়ান অফিসার পাঠাও। বড়ো বড়ো জেলাগুলো তো প্রায়ই পূর্ববঙ্গে। সেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। সেসব জেলায় হিন্দু অফিসারদের স্থান নেই। আর আমাকে 'হিন্দু' বলে চিহ্নিত করা হবেই না কেন? আমি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোক। আমি ইণ্ডিয়ান বলেই পরিচিত হতে চাই। যে-কোনো ইণ্ডিয়ানের যে-কোনো জেলায় কাজ করার অধিকার আছে। অকালে অবসর নিলে আমাকে পেনসন দেবে না। নয়তো অকালেই অবসর নিতে চাই, মিস্টার মজুমদার।''

''না, না, ওটা হবে নেহাৎ ছেলেমানুষী।'' কমিশনার সাহেব বলেন। ''ইংরেজরা একটা ব্যালান্স রাখার চেষ্টা করছে। একতরফা মনোভাব ওদের মধ্যে নেই। ওরা মুসলিমদরদী ও হিন্দুবিদ্বেষী নয়। তবে এটাও তো মানতে হবে যে টেররিস্টরা ছিল সকলেই হিন্দু আর কমিউনিস্টরাও প্রায় সকলেই তাই। আর গান্ধী, নেহরু, সুভাষ প্রভৃতি ন্যাশনালিস্টরাও একধার থেকে হিন্দু। কাজেই হিন্দুদের উপর ব্রিটিশ মনোভাব একটু কঠোর। আর মুসলিমরা সাধারণত সহযোগিতা করছে বলে তাদের উপর একটু নরম। ব্যালান্স সব সময় ঠিক সমান থাকছে না। যোগ্যের চেয়ে অযোগ্যের কদর বেশী। সব চেয়ে অবিচার দেখা যায় মহকুমাগুলোতে। মন্ত্রীদের ইচ্ছা তো লাটসাহেব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তা হলে আর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কী করে বলা যাবে? না, অকালে অবসর নেওয়া এর প্রতিকার নয়। সেটা একপ্রকার পলায়নী বৃত্তি। এস্‌কেপিজম। আপনি জজ হয়ে ঠিকই করেছেন। কলেক্টর হলেই ভুল করতেন। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী।''

কমিশনার সাহেব পরিদর্শন করে স্বস্থানে ফিরে যান। মাসখানেক বাদে মানস তার কুঠিতে বসে কাজ করছে, চাপরাশি এসে খবর দেয় কমিশনার সাহেবের মেম সাহেব গাড়ী থেকে নামছেন। মানস তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বলে, ''মিসেস মল্লিক বাড়ী নেই। আপনি কি একটু অপেক্ষা করবেন?''

''না, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আপনার সঙ্গেই আমার কাজ। সেটা গোপনীয়।'' তিনি আসন নিয়ে বসেন।

মানস বুঝতে পারে না কী এমন কাজ। বলে, ''আচ্ছা, শুনব।''

''দেখুন, আপনার কাছে কি ইণ্ডিয়ান ডাইভোর্স অ্যাক্ট আছে? নেই। তা হোক, আইনটা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে?'' তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান।

''আমার কোর্টে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো কেস আসেনি। তবে একটা আইডিয়া আছে।'' মানস

বিস্মিত হয়ে বলে।

"আপনি আমার ছোট ভাইয়ের মতো। আমার ছোট ভাইয়ের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। সেও তো আপনার সার্ভিসের লোক। কাউকে বলবেন না, আমি আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে ডাইভোর্স চাই।" তিনি উত্তেজনার সঙ্গে বলেন।

" সে কী! আপনার স্বামী আমার শ্রদ্ধাভাজন সিনিয়র। তাঁর বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ শুনিনি। মদ কে না খায়? বাজী কে না রাখে? তার জন্যে তো ডাইভোর্স করা চলে না?" মানস অভিমত দেয়।

"না, না, তা নয়। উনি একজন প্রচ্ছন্ন মুসলমান। ওঁর কাছে মুসলমানদের সাত খুন মাফ। উনি যেসব রিপোর্ট দেন সেসব মুসলমানদের পক্ষে। তা না হলে ওরা কমিশনার পদে পাকা করবে কেন? মুসলমানদের তোয়াজ করতে গিয়ে যে সর্বনাশটি উনি করছেন আমি একদিন তা ফাঁস করে দেব। আপিস ঘরে গিয়ে ফাইলগুলো আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" তিনি চুপি চুপি বলেন।

মানস আঁতকে ওঠে। "ভয়ানক অন্যায় করেছেন। সরকারী ফাইল পড়া একেবারে বারণ। সরকার জানতে পেলে আপনার স্বামীরই সাজা হবে। সেটা কি ভালো কাজ?" মানস তাঁকে বোঝায়।

"কিন্তু এটাও কি ভালো কাজ হচ্ছে? এইভাবে মুসলমানদের আস্‌কারা দিয়ে মাথায় তোলা? এর জন্যে কি ডাইভোর্স দাবী করতে পারিনে? আইন কী বলে? আমি আর সহ্য করতে পারছিনে।" ভদ্রমহিলার চোখে মুখে রোষ।

"না, এর জন্যে ডাইভোর্স দাবী করা যায় না। ইচ্ছা করলে আপনি জুডিসিয়াল সেপারেশন চাইতে পারেন। কিন্তু খবরদার, প্রমাণ হিসেবে ফাইল দাখিল করবেন না। কিংবা তার নকল।" মানস শাসিয়ে দেয়। তার পর বলে, "আমি যতদূর জানি উনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা ব্যালান্স চান। মুসলমানদেরকে তাদের বখরা দিতে হবে। নয়তো মুসলমানরাও তালাক দাবী করবে। তার জন্যে লড়বে। ফলে দেশ ভাগ হয়ে যেতে পারে।"

"কী জানি, ভাই! আমি অত শত বুঝিনে। না, সেপারেশন নিয়ে আমি কী করব? ওতে কী ওঁর শিক্ষা হবে? যাক, ও প্রসঙ্গ যাক। মিসেস মল্লিক কখন ফিরবেন? আমার যে, অন্য এনগেজমেন্ট আছে। আজ তা হলে উঠি। কথাটা গোপন রাখবেন কিন্তু। দু'জনকেই নমস্কার।" ভদ্রমহিলা বিদায় নেন।

মানস তাঁকে তাঁর গাড়ীতে তুলে দেবার সময় বলে, "দিদি, মনে রাখবেন, স্বামীটি আপনার, কিন্তু আপিসটি আপনার নয়। ফাইলগুলি পরকীয়।"

।। বারো ।।

ইতিমধ্যে গোস্বামীর জায়গায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে বদলী হয়ে এসেছেন মানসের বন্ধু আলী হায়দার। তাঁর পরিবার কিন্তু তাঁর সঙ্গে আসেননি। কবে আসবেন তার কোনো স্থিরতা না থাকায় মহিলা সমিতির সদস্যারা একবাক্যে জজ গৃহিণী যূথিকাকেই তাঁদের সভানেত্রী পদে বরণ করেছেন। তার ফলে ওকে দুপুরবেলাটা মহিলা সমিতি আর নারীমঙ্গল সঙ্ঘের কাজকর্ম নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয়। মহিলারা যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের জন্যে পশমের পুলোভার, মাফলার, দস্তানা, মোজা ইত্যাদি বাড়ীতে বসে বোনেন ও সমিতির মারফৎ যথাস্থানে দান করেন। আর নারীমঙ্গল কর্মীরা ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করে আসেন, সুতো কাটা হলে শাড়ী ধুতি গামছা প্রভৃতি বুনিয়ে নিয়ে সঙ্ঘের মারফৎ বিক্রী করেন ও

লাভের টাকা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। কর্মীরা অধিকাংশস্থলে পুরুষ। সচিব একজন বদান্য মাড়োয়ারী। সভানেত্রী যূথিকা। সেও চরকা কাটে, পুলোভার বোনে। ছেলেমেয়ের উপর নজর রাখার জন্যে বাসভবনেই সমিতির ও সঙ্ঘের আফিস বসায়।

"দু'বছর বাদে আবার আমাদের দেখা। এবার পশ্চিমবঙ্গে। কেমন আছেন আপনারা?" একদিন কল করতে এসে আলী হায়দার সুধান।

"শারীরিক অর্থে ভালোই, মানসিক অর্থে নয়। চোখের সামনে এ দুনিয়ায় কত কী ঘটে যাচ্ছে। আমি শুধু নীরব দর্শক।" মানস দুঃখ করে।

"নীরব দর্শক। আপনার ওই এক কথা। ফ্রন্টে যাবার জন্যে ছটফট করছিলেন। ভাগ্যিস্ যাননি। গেলে তো আপনারও পরিণাম হতো আমাদের সেই ক্যাপটেন — না, না, মেজর — ল'র মতো।" হায়দার বিষণ্ণ স্বরে বলেন।

"আমাদের সেই সিভিল সার্জন? কী হয়েছে তাঁর?" মানস উদ্বিগ্ন হয়।

"বেঁচে আছেন। কিন্তু বন্দীশালায়। সিঙ্গাপুরে। জাপানীরা ওঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করছে। বাড়ীতে চিঠি লিখতেও দিয়েছে। বাড়ীর লোক কলকাতা থেকে সে চিঠির নকল আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার কাছে তাঁর আসবাবপত্র গচ্ছিত ছিল। তাঁর কথামতো আমি সেসব বিক্রী করে তাঁর বাজার দেনা ও ক্লাবের বিল শোধ করেছি। উদ্বৃত্ত যা ছিল তা ক্যাপটেন মুস্তাফীর সেবাপ্রতিষ্ঠানে খয়রাত করেছি। ল আপনাদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানাতে বলেছেন। মুস্তাফীও।" হায়দার বলে যান।

"তার পর আর কী খবর? জাপানীরা তো পূব বাংলার দোরগোড়ায়। কবে ভিতরে পদার্পণ করবে? তবু ভালো যে আপনাকে ওদের অভ্যর্থনা করতে হবে না। হয়তো আটকই করত।" মানস সহানুভূতির স্বরে বলে।

"আমি অকুতোভয়। খোদা ভিন্ন কাউকে ডরাইনে। জাপানী তো জাপানী সাক্ষাৎ শয়তান এলেও আমি ভয় পেতুম না।" হায়দার বুক ফুলিয়ে বলেন। "আমাকে চার্জ নিতে বললে আমি চার্জ নিতুম। সেইভাবে মুসলমানদের মনের জোর জোগাতুম। শহর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসত না ওরা কেউ। তবে হিন্দুদের কথা আলাদা। ওদের আতঙ্ক জাপানীদের নিয়ে ততটা নয়, যতটা সমাজবিরোধীদের নিয়ে। রেঙ্গুনের মতো লুটপাট, নারীধর্ষণ, খুনজখমের আতঙ্ক ওদেরি যেন বেশী। আমি থাকতে ওদের মধ্যেও প্যানিক ছিল না। দোকানবাজার সুরক্ষিত। কিন্তু ধানচালের আড়ত আমরা দখল করে নিয়েছি। যাতে জাপানীদের হাতে না পড়ে। দেশের লোক বরং না খেয়ে মরবে, তবু জাপানীকে খেতে দেওয়া হবে না। এর নাম হলো ডিনায়াল পলিসি। কী করা যায়, বলুন? আমরা নাচার।"

"এইখানেই তো গান্ধীজীর আপত্তি। ডিনায়াল পলিসির শিকার জাপানীরা নয়, বাঙালীরা। আপনারা কি নৌকোগুলোও আটক করেছেন? শুনেছি কোথাও কোথাও নাকি ডুবিয়ে দিয়েছেন। নদনদীর দেশ। লোকে চলাফেরা করবে কী করে? কত লোকের রুজি রোজগার যাবে।" মানস চিন্তিত।

"সেকথা ঠিক। পাবলিক থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে। আমরাও পাবলিকের পক্ষে। কিন্তু মিলিটারি অফিসাররা কোনোরকম ঝুঁকি নেবেন না। ডিনায়াল পলিসি তো ওঁদেরই পলিসি। সিভিলিয়ান সরকারের নয়। লোকে ভুল বোঝে। যুদ্ধকালে বড়লাটের সিদ্ধান্তের উপরে জঙ্গীলাটের সিদ্ধান্ত। কী করা যায়, বলুন। এর কি কোনো প্রতিকার আছে?" হায়দার দিশাহারা।

"সেই প্রশ্নেই তো ক্রিপ্স প্রস্তাব ভেস্তে গেল। সেনানায়কদের সিদ্ধান্তের উপরে সিভিলিয়ান ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত। এটাই তো খোদ ব্রিটেনের রীতি। এ রীতি ভারতে প্রয়োগ করা হবে না কেন? নাৎসীরা যখন ব্রিটেন আক্রমণ করতে উদ্যত হবে তখন পলিসিঘটিত গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব কি সিভিলিয়ান ক্যাবিনেটের না মিলিটারি হাই কমাণ্ডের? কংগ্রেস নিজের জন্যে এ দায়িত্ব দাবী করছে

না। করছে মুসলিম লীগের জন্যেও। জিন্না সাহেব জঙ্গীলাটের উপরওয়ালা হয়ে ওই ডিনায়াল পলিসি রদবদল করতে পারতেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই ওর ভুক্তভোগী।'' মানস যুক্তি দেখায়।

''আপনার যুক্তিতে কোনো ভুল নেই, ভাই মল্লিক।'' হায়দার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ''কিন্তু কোথায় বাধছে, বলব? আট আটটি প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল দখল করার পর থেকে কংগ্রেস নেতাদের মাথা ঘুরে গেছে। তাঁরা মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার আগে জিন্না সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেননি। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার আগেও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেননি। নিজেদের খুশিমতো জেলে গেছেন। উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকার দখল। এখন দেখছেন সেটা তাঁদের একার সাধ্যে কুলোবে না। অথচ জিন্নাকেও তাঁর পাওনা দেবেন না। ওই আটটি প্রদেশে কি তাঁর কোনো পাওনা নেই? সেটা কি তিনি আগে বুঝে না নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিতে যাবেন? কেন্দ্র তাঁর অন্যতম শাসকদল হবে, অথচ বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে হবে বিরোধী দল। তাঁর নিজের প্রদেশ বম্বেতেই হবে বিরোধী দল। অন্য পাঁচটা প্রদেশের কথা নাই বা উল্লেখ করলুম। লীগ সদস্যদের কাউনসিলে তিনি মুখ দেখাবেন কী করে? কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে চাপ দিলে সুফল কতটুকু হবে, জানিনে। জঙ্গীলাট রাগ করে ইস্তফা দিতে পারেন। জিন্না তখন কার উপর হুকুম জারি করবেন? তা ছাড়া তাঁর আসল লক্ষ্যটা তো শাসনপরিষদের ভারতীয়করণ নয়।'' হায়দার বাকীটা হাতে রাখেন।

''কী সেটা?'' মানস কৌতূহল হয়।

''সেটা হচ্ছে দ্বৈরাজ্য অথবা স্বতন্ত্র রাজ্য। কংগ্রেস ও লীগ যদি একই মসনদে বসে তবে বড়ভাই ছোটভাই হিসাবে নয়, সমান শরিক হিসাবে। প্রদেশগুলোতে তিনি প্যারিটি দাবী করবেন না, সেখানকার দাবী ওয়েটেজ। কিন্তু কেন্দ্রে তাঁর পলিসি হচ্ছে ব্যালান্স অভ পাওয়ার।'' হায়দার বাকীটা দেখান।

''কিন্তু সেটা তো ইংরেজদেরই পলিসি।'' মানস শক্ পায়।

''সেটা নাচার হয়ে জিন্না সাহেবেরও পলিসি। দেশীয় রাজন্যরা যদি ফেডারেশনে যোগ দিতেন, যদি ফেডারল আইন সভায় তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের পাঠাতেন তা হলে কংগ্রেস কখনো একক মেজরিটি পেতো না। বাধ্য হয়ে লীগের দ্বারস্থ হতো। তখন লীগ দর হাঁকত। ফেডারেশন কেঁচে গেছে। কংগ্রেসের একক মেজরিটি জিন্নাসাহেব কিছুতেই মেনে নেবেন না। তার চেয়ে বরং দেশভাগ ভালো। আপনারা বলবেন লোকটার দেশপ্রেম নেই, লোকটা সাম্প্রদায়িক বাতিকগ্রস্ত। কিন্তু চিরকাল একটি সম্প্রদায় তার মেজরিটির জোরে শাসন করবে, আরেকটি সম্প্রদায় শাসিত হবে, এটাই বা কেমনতর নিয়তি! কংগ্রেসনেতারা মুখে যাই বলুন না কেন তাঁদের জোর আসলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটের জোর। মুসলিম ভোটটা বাহুল্য।'' হায়দার অভিমানের সুরে বলেন।

''কেন? ফ্রন্টিয়ারের পাঠানরা কি মুসলমান নয়?'' মানস তর্ক করে। হায়দার এর জবাব না দিয়ে বলেন, ''তারপর এটা কেমনতর ডেমোক্রাসী যেখানে চেক নেই, ব্যালান্স নেই, মেজরিটি একেবারে নিরঙ্কুশ! ইংরেজ লাটসাহেবরা থাকতেই এই! ওঁরা চলে গেলে তো বল্‌গাহীন স্বৈরাচার! জবাহরলাল তো শাসিয়ে রেখেছেন যে জমিদার ও তালুকদারদের উচ্ছেদ করবেন, ক্ষতিপূরণ দেবেন না। ধনিকদের ধনাগমের উপায় কেড়ে নেবেন। কারখানা রাষ্ট্রসাৎ করবেন। বিদেশী কোম্পানীদের তল্পিতল্পা গুটোতে হবে। রাজন্যদের রাজ্য থেকে মহাপ্রস্থান। কংগ্রেস যে বামপন্থীদের কবলে পড়বে না তেমন নিশ্চয়তা কোথায়? গান্ধীজী আর কদ্দিন! তাঁর পরেই তো তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন নেহরু। এক ঢিলে অনেকগুলি পাখী মরবে। তাঁদের মধ্যে আমরা যুক্তপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমানরাও। আমাদের মধ্যে যাঁরা দীর্ঘকাল কংগ্রেসে ছিলেন তাঁরা কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে মুসলিম লীগে ভিড়ে গেছেন। তার মানে কি তাঁরা কমিউনিস্ট? না, জিন্নাও তেমনি কমিউনালিস্ট নন। তিনি চান চেক আর ব্যালান্স। যাতে নিরঙ্কুশ বামপন্থীদেরও আইনের শিকল পরানো যায়। মুসলিম লীগের পার্টি ফাণ্ডে হিন্দু জমিদার তালুকদাররাও

চাঁদা দিয়েছেন। লীগ যদি কোয়ালিশনে যোগ দেয় তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করবে। যদি অপোজিশনে থাকে তা হলেও তাঁদের স্বার্থে লড়বে। তবে পাকিস্তানের আওয়াজ তোলার পর থেকে হিন্দু সাহায্য কমে গেছে। তেমনি মুসলিম সাহায্য বেড়ে গেছে। পদ্মার ওপারে দেখে এলুম গরিব মুসলমানরাও কৃষকপ্রজা দল ছেড়ে মুসলিম লীগে জোট বাঁধছে। কংগ্রেস থেকে অবশ্য আরো আগে থেকে বিদায় নিয়েছিল। কায়দে আজমের এমনি দুর্বার আকর্ষণ।''

মানস ক্ষুণ্ণ হয়ে মন্তব্য করে, ''জিন্না দেখছি সব মানুষের কাছে সব জিনিস। যুক্তপ্রদেশে জমিদারদের রক্ষক। বাংলাদেশে জমিদারদের ভক্ষক। কংগ্রেসীদের ভূমিকাটা ঠিক বিপরীত। যুক্তপ্রদেশে ভক্ষক। বাংলাদেশে রক্ষক।''

''তা হলে বুঝতে পারছেন তো কেন কংগ্রেস লীগের কোয়ালিশন হবার নয়। কোয়ালিশন না হলে পার্টিশন ছাড়া আর কী হতে পারে? তারই অন্য নাম পাকিস্তান। নামের মহিমায় অসংখ্য লোকের ভোট মেলে। তবে ওটার একটা কমিউনাল গন্ধ আছে, তা মানতেই হবে, মল্লিক। আমি খুব খুশি নই। এতকাল একসঙ্গে থেকে আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে যাব! আমি তো খোন্দকার জাফর নই, আমার বাড়ী তো বেঙ্গলে নয়, আমার কী লাভ! তা বলে কংগ্রেসকে কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ হতে দেওয়া যায় না। কংগ্রেস মূলত হিন্দু। এমনি এক পরিস্থিতি হয়েছিল আয়ারল্যাণ্ডের। স্বাধীনতার জন্যে একসঙ্গে সংগ্রাম চালাবার পর উত্তরের প্রটেস্টাণ্টরা স্বতন্ত্র রাজ্য চায়। তারা সমগ্র দেশের ক্যাথলিক মেজরিটির আধিপত্য মেনে নেবে না। বরং ব্রিটেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে। আয়ারল্যাণ্ড দু'ভাগ হয়ে যায়। ওটা ঠিক ইংরেজদের কারসাজি নয়। মেজরিটির উপর মাইনরিটির অনাস্থা। তার চেয়ে বরং তৃতীয় পক্ষের উপর আস্থা। সেবার আয়ারল্যাণ্ডের পালা। এবার ইণ্ডিয়ার পালা। কংগ্রেস লীগ একমত হলে অখণ্ডতা। না হলে দ্বিখণ্ডতা।'' হায়দার বলেন।

''কংগ্রেস লীগ একমত হলে অখণ্ডতা, একথা ঠিক। কিন্তু না হলে দ্বিখণ্ডতা কেন? ত্রিখণ্ডতা কেন নয়? শিখেরা কি লাহোর অমৃতসর বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেবে? আর এদিকেও তো বাঙালী হিন্দুরা আছে। তারা যে এতদিন ধরে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করে এল সেটা কি বাংলার মসনদে মুসলিম লীগকে বসাতে? ইংরেজরা থাকে কি না সন্দেহ। যাবার আগে তারা যদি দেশটাকে আস্ত রেখে যায় হিন্দু মুসলমান শিখ সবাই মিলে তাকে জাপানীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। নয়তো জাপানীরা সেকালের মগ ফিরিঙ্গীর মতো বাংলাদেশে হানা দেবে ও তার কতক অংশ দখল করে নেবে। মুসলিম লীগ কি ওদের হটাতে পারবে? যদি পারে তো সেসব অংশ পাকিস্তানে যাক। কিন্তু কলকাতা আমরা যেমন করে পারি রক্ষা করবই। জাপানীদেব হাত থেকেও, ইংরেজদের হাত থেকেও , পাকিস্তানের হাত থেকেও। লাহোরে বইবে রক্তসিন্ধু, কলকাতায় রক্তগঙ্গা। দিল্লীতে রক্তযমুনা বইতে পারে, যদি পাকিস্তানীরা দিল্লী দাবী করে। অখণ্ডতা থাকবে না এটা এখন কংগ্রেস নেতারাও বুঝতে পারছেন। কয়েকটি প্রদেশ তাঁরা আলাদা হয়ে যেতে দেবেন, কিন্তু তার আগে সীমানা কাটছাঁট করতে হবে। পৃথক হয়ে যাবার পর ওরা একত্র হয়ে পাকিস্তান গঠন করতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু নেতারা চান আজ এখনি কেন্দ্রে পুরোপুরি বদল। জাপানী আক্রমণকে প্রতিহত করতে হলে এটা অপরিহার্য। জিন্না সাহেব যদি ব্যালান্স অভ পাওয়ার চান সেটাও আপসে পেতে পারেন। কিন্তু কেবল কেন্দ্রে। প্রদেশে নয়। আগে তো কেন্দ্রে সদ্‌ভাব প্রতিষ্ঠিত হোক। পরে প্রদেশেও হবে। তখন কোয়ালিশন অবধারিত।'' মানস আশাবাদী।

''হ্যাঁ, কিন্তু একটা জায়গায় গোল বাধতে পারে, মল্লিক।'' হায়দার ইতস্তত করে বলেন, ''গান্ধীজীর যেমন ধারণা কংগ্রেস ভারতীয়দের সকলের একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি কংগ্রেসের, তেমনি জিন্না সাহেবেরও ধারণা মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি ও তিনি মুসলিম লীগের। বড়লাটের শাসন পরিষদে মুসলমানদের জন্যে যেসব আসন নির্দিষ্ট হবে তাব সব ক'টি লীগপন্থী

মুসলমানদের দিতে হবে। একটিও কংগ্রেসপন্থী মুসলিমকে না। কংগ্রেস কি এতে রাজী হবে? না হলে তো এই প্রশ্নেই কেন্দ্রীয় সরকার গঠন প্রস্তাব ভেস্তে যাবে।''

''যথার্থ। সেটা হৃদয়ঙ্গম করে গান্ধীজী বলতে শুরু করেছেন যে ইংরেজরা যদি অবিলম্বে ক্ষমতাত্যাগ না করে তবে তারা ভারত ত্যাগ করুক। সৈন্যদল সরাতে হবে না, বেসরকারী ইংরেজদের সরাতে হবে না, কিন্তু সরকারী ইংরেজদের সরাতে হবে। ইচ্ছে করলে ওঁরা কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা সঁপে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে লীগের হাতে, ইচ্ছে করলে ভগবানের হাতে বা অরাজকতার হাতে। কিন্তু আগে তো একটা শূন্যতা সৃষ্টি হোক। তার পরে শূন্যতা পূরণের পালা আসবে। যেভাবেই হোক শূন্যতা পূরণ হবেই। মুসলিম লীগ ইচ্ছে করলে পাকিস্তান জবরদখল করতে পারে, কমিউনিস্টরা ইচ্ছে করলে চীনের মতো মুক্তাঞ্চল কায়েম করতে পারে। কংগ্রেস হয়তো আটটা প্রদেশ জিতে নেবে। এসব কথা অবশ্য তাঁর একার। কংগ্রেসের নয়।'' মানস বুঝিয়ে বলে।

''তা হলে তিনি আর প্রতিনিধি হলেন কী করে?'' হায়দার হাল ছেড়ে দেন।

''তাঁকে এখন তিন তিনটি ফ্রন্টে লড়তে হবে। একটি তো আগেকার মতো ব্রিটিশ ফ্রন্ট, আরেকটি হবে জাপানী ফ্রন্ট। জিন্নাসাহেব যদি পাকিস্তানের জিগীর তুলে লড়াইতে নামেন তবে আরো একটি, মুসলিম ফ্রন্ট। এমন সঙ্কট তাঁর জীবনে আর কখনো আসেনি। তাঁর প্রাণ সংশয়। অনশনের কথাও তিনি ভাবছেন।'' মানস তাঁর লেখা পড়েছে।

হায়দার হেসে বলেন, ''জিন্না কবে লড়াইতে নেমেছেন যে এখন নামবেন? যখন জাপান আসি আসি করছে ও ইংরেজ যাই যাই করছে। তবে, হ্যাঁ, যেদিন দেখবেন যে ইংরেজরা যাবার সময় ভারতের ভার কংগ্রেসের হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছে, মুসলিম লীগকে বখরা দিচ্ছে না, আর কংগ্রেসও ইংরেজদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করছে, লীগের সঙ্গে নয়, সেদিন তিনিও একটা জেহাদের ডাক দেবেন। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। জিন্না সবুর করবেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস আরেক দফা জেলযাত্রা করতে চায়, করুক না? মুসলমানরা কংগ্রেসের পক্ষেও থাকবে না, বিপক্ষেও থাকবে না। ইঙ্গ-কঙ্গ সংঘর্ষে ওরা নিরপেক্ষ। কিন্তু ইঙ্গ-কঙ্গ সন্ধির দিন ওদের মারমূর্তি।''

মানস বেদনা বোধ করে। অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে। রায় বাহাদুর বাসুদেব হালদার কেমন আছেন? মোহিনীমোহন ধর কেমন আছেন?

''দু'জনেই বাড়ীর মেয়েছেলেদের কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা ইংরেজরা কখনো কলকাতা ছেড়ে যাবে না। বোমা দুটো একটা পড়বে, কিন্তু আক্রমণ তত সহজ নয়। জাপানীদের সম্বন্ধে দু'জনের দু'রকম মত। রায় বাহাদুর মনে করেন ওরা বাঙালীর শত্রু নয়, ইংরেজের শত্রু। বাঙালীর সঙ্গে গায়ে পড়ে শত্রুতা করবে না। বরঞ্চ মিত্রতা করবে। আর মোহিনীবাবু মনে করেন ওরা ফিরে যাবার আগে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যাবে। ধনসম্পদ, শিল্পদ্রব্য, প্রাচীন নিদর্শন। জোর করে জাপানী মাল গছিয়ে দিয়ে যাবে। তা তুমি কিনতে চাও আর নাই চাও। ওরাও সাম্রাজ্যবাদী বলে ওদের লোভ আরো বেশী। ওদের চেয়ে ইংরেজ ছিল ভালো। উনি এই সময় ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের পক্ষপাতী নন। কংগ্রেস নেতাদের কাছে আবেদন নিবেদন করছেন ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া না করতে। এ বিষয়ে রায় বাহাদুরও তাঁর সঙ্গে একমত।'' হায়দার বলেন।

''কেউ কি বলছে না দেশকে স্বাধীন করার এই হচ্ছে সুযোগ?'' মানস সুধায়।

''বলছে বইকি। তেমনি আরেক দল বলছে পাকিস্তান হাসিল করার এই তো মওকা। এরা যদি বলে, ভারত ছাড়ো, ওরা বলে, ভাগ করো আর ছাড়ো। গান্ধী ও জিন্নার ধ্বনিও প্রতিধ্বনি।'' হায়দার মুচকি হাসেন।

''যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্যের জন্যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে হচ্ছে না?'' মানস সৌম্যদার মতো

কর্মীদের সম্বন্ধে পরোক্ষে প্রশ্ন করে।

"নাঃ! যত সব ক্র্যাঙ্ক! সৌম্য চৌধুরী বলে একজন নামকরা গান্ধীবাদী আছেন। তাঁকে কিছুদিনের জন্যে আটক করা হয়েছিল। না করলেও চলত। কারণ তাঁর কথায় কেউ কান দেয় না। বহু লোক যুদ্ধের ঠিকাদারি নিয়ে রাতারাতি ফেঁপে উঠেছে। বহু লোক হাতিয়ার নাড়াচাড়া করার জন্যে স্বেচ্ছায় রিক্রুট হয়েছে। মেয়েরাও চায় ওয়াকি হতে। কিন্তু আমরা তাদের প্রশ্রয় দিইনি। দুটি একটিকে কলকাতা পাঠিয়েছি। শুনছি ওয়াকিদের বার্মা থেকে মাদ্রাজে পাঠানো হয়েছে সমুদ্রপথে, যাতে ধরা না পড়ে। যুদ্ধ ব্যাপারটা এমন ট্রেচারাস। যাদের জয় করার কথা তারাই কিনা পরাজিত। কেউ কখনো ভাবতে পেরেছে যে ইংরেজ অফিসাররা সারেণ্ডার করবেন জাপানী অফিসারদের কাছে? হলদে চামড়ার কাছে শাদা চামড়ার ইজ্জৎ রইল কোথায়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার সে অপমানের জ্বালা আমরা ভুলিনি।" হায়দার তলে তলে ইংরেজবিদ্বেষী।

"মানুষ শাদাই হোক আর কালোই হোক তার সে অপমান আমারও অপমান, আপনারও অপমান। মানুষমাত্রেরই অপমান।" মানস দুঃখ প্রকাশ করে।

এমন সময় যূথিকার প্রবেশ। খাবার সে নিজের হাতে তৈরি করেছে। বলে, "সালাম আলায়কুম, হায়দার ভাই! আপনারাও এখানে বদলী হয়ে এসেছেন জেনে দারুণ খুশি হয়েছি। কই, আমার ছোট বোনটি কোথায়?"

"আলায়কুম সালাম, ভাবীজী। আপনার ছোট বোনটি ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন জৌনপুরে আমাদের গরিবখানায়। জাপানীরা ফিরে না গেলে ওঁরা ফিরবেন না। তবে আমি পশ্চিমবঙ্গে বদলী হয়েছি শুনে ফিরে আসতে পারেন।" হায়দার কুণ্ঠিত ভাবে বলেন।

"একটু আগে শুনছিলুম আপনি নাকি অকুতোভয়।" মানস চেপে ধরে।

"আমি অকুতোভয় বলে কি আমার বিবিও তাই? যেখানে ইংরেজ ফৌজ পর্যন্ত দৌড় দেয় সেখানে নারী কী করে নিরাপদ বোধ করবে? আর পূর্ববঙ্গে নদীনালার সংখ্যা এত বেশী যে যুদ্ধকালে সেটা একটা মরণফাঁদ। মানুষ পালাতে চাইলে পালাবে কোন্ পথে? স্টীমার যদি না চলে, নৌকো যদি সরকারের হুকুমে ডুবিয়ে দেওয়া হয়? সাঁতার আমরা কেউ শিখিনি। শিখেছি ঘোড়ায় চড়তে। আমার বিবিও ঘোড়ায় চড়তে জানেন। যদিও চড়েননি বড়ো হয়ে অবধি। কিন্তু সাঁতার? কখনো কি ভেবেছি যে আমাকে বেঙ্গলে চাকরি কবতে হবে? তাও পূর্ববঙ্গে? সুখেই তো ছিলুম। খাওয়াদাওয়ার এত সুখ আর কোন্খানে? স্বর্গ যদি থাকে তো সে এইখানে, সে এইখানে, সে এইখানে। কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই, জাপানী এসে সীমান্তের ওপারে চড়াও। কী করে জানব যে জাপানীদের দৌড় এতদূর। আগে থেকে বদলী না হয়ে থাকলে আপনাদেরও একই দশা হতো, মল্লিক।"

"আমার বিবি যে আমাকে একলা ছেড়ে আসতেন না, হায়দার। ওঁর আদর্শ একসঙ্গে বাঁচা ও একসঙ্গে মরা। শুধু বাচ্চা দুটির জন্যেই যা ভাবনা। যাক, এখানে আপাতত তেমন কোনো ভয়ের কারণ নেই। আশা করি মিসেস হায়দারকে আমরা আবার দেখতে পাব।" মানস নিরাপত্তার ভরসা দেয়।

যূথিকা সকৌতুকে বলে, "আপনি তো একজন পাকিস্তানপ্রেমিক। কিন্তু জাপানীরা যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে আপনার পরিবারের আশ্রয়স্থল হবে হিন্দুস্থান।"

"ভাবীজী, আমরা সুলতানী আমল থেকেই জৌনপুরের বাসিন্দা। আমাদের প্রজারা হিন্দু। বন্ধুবান্ধবদের অর্ধেক হিন্দু। আমরা কি কখনো ভাবতে পেরেছি যে একদিন আমাদের হিন্দুস্থান ছাড়তে হবে? গান্ধী জিন্না একমত হলে আমরা যেখানকার লোক সেখানেই হবে আমাদের হোমল্যাণ্ড। নয়তো আমরা কলকাতায় কি লাহোরে ভাগ্য অন্বেষণ করতে বাধ্য হব।" হায়দার খোলাখুলি বলেন।

"কলকাতায়!" চমকে ওঠে যূথিকা। কলকাতা কি পাকিস্তানের সামিল হবে? ওমা, কোথায়

যাব।"

"হবে না? বেঙ্গল কি মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ নয়? কলকাতা কি বেঙ্গলের রাজধানী নয়?" হায়দারও বিস্মিত হন।

"না, না, হায়দার ভাই। তা কখনো হতে পারে না। আমরা মুসলমানদের ভালোবাসি। তাদের জন্যে অনেক কিছু ছাড়তে রাজী আছি। কিন্তু কলকাতা কিছুতেই নয়। কলকাতা যে বাঙালী হিন্দুর মক্কা।" যূথিকার কণ্ঠে দৃঢ়তা।

"বাঙালী মুসলমানও তো কলকাতা বলতে পাগল। ওটা ওদের দ্বিতীয় মক্কা। আগে তো জাপানকে ঠেকানো যাক। নয়তো ওরাই ফোর্ট উইলিয়ামে জাঁকিয়ে বসবে। তাতে হিন্দুর কী আর মুসলমানের কী?" হায়দার বিমর্ষ।

"তাই যদি হয় তবে দেশভাগের দাবী তুলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বানচাল করতে যাওয়া কেন? বাংলাদেশ পাকিস্তান হবে জানলে কোন্ বাঙালী হিন্দু তার জন্যে জাপানীদের সঙ্গে লড়তে রাজী হবে? যেখানে খোদ ইংরেজ সেনা দৌড় দিচ্ছে সেখানে কি মুসলিম সেনা একা ওদের রুখতে পারবে? যুদ্ধকালে যদি হিন্দু মুসলমানের এককাট্টা হবার প্রয়োজন থাকে তবে শান্তিকালেই বা সে প্রয়োজন থাকবে না কেন? যুদ্ধ কি আর কখনো বাধতে পারে না? সারা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে যদি দেশ ভাগ করতে হয় তো করা যাবে, কিন্তু এখন থেকে কেউ কথা দিতে রাজী নয়। না ইংরেজ, না কংগ্রেস। আমাদের মুসলিম বন্ধুরা আমাদের যেন ভুল না বোঝেন।" মানস ব্যথা বোধ করে।

"দেখুন, ভাই মল্লিক, আমরা এখন এমন এক যুগসন্ধিতে পৌঁছেছি যখন আমাদের ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করতে হবে। জাপান এদেশে খুঁটি গাড়তে পারবে না, যদিও গ্রাস করবে কতক অংশ। সেটা সাময়িক। কিন্তু ইংরেজ গেলে যে শূন্যতাটা হবে সেটা সাময়িক নয়, সেটা চিরস্থায়ী। সেইজন্যে চাই একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কংগ্রেস চিরস্থায়ী নয়, লীগ চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু হিন্দু চিরস্থায়ী, মুসলমান চিরস্থায়ী। মেজরিটি চিরস্থায়ী, মাইনরিটি চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী মেজরিটির সঙ্গে চিরস্থায়ী মাইনরিটির এমন কী বন্দোবস্ত হতে পারে যা চিরস্থায়ী? কেন্দ্র যদি একটাই হয় তবে আমাদের সিকিভাগ দিলে নেব না, দিতে হবে অর্ধেক ভাগ। হিন্দু মুসলমান সমান সমান। হিন্দী উর্দূ সমান সমান। শাসনক্ষমতা সমান সমান। চাকরিবাকরি সমান সমান। পেট্রনেজ সমান সমান। কিন্তু আমরা জানি যে দাঁড়িপাল্লা সমান রাখা সম্ভবপর হবে না। কার্যকালে উনিশ বিশ হবেই। তা নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাধবেই। সেইজন্যে আমাদের মতে ইংরেজ থাকতেই দেশ ভাগাভাগি হয়ে যাওয়া ভালো। হিন্দুর ভাগে পড়বে হিন্দু-মেজরিটি প্রদেশপুঞ্জ। মুসলমানদের ভাগে মুসলিম-মেজরিটি প্রদেশগুচ্ছ। হিন্দুরাই পাবে সিংহের ভাগ। তা হলে তাদের আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? শিখরা যদি আপত্তি করে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া মুসলমানরাই করবে সেটা হবে পাকিস্তানের ঘরোয়া সমস্যা। তাদের তো কোনোখানেই মেজরিটি নেই। নয়তো তাদের জন্যে আলাদা একটা শিখিস্থান তৈরী করে দেওয়া যেত।" হায়দার দুই কাঁধ তুলে অসহায়তা জানান।

"ইংরেজ থাকতেই?" মানস পরিহাস করে। "কোথায় থাকতেই? কে জানে এ যুদ্ধের পরিণতি কী হবে! ইংরেজ একটা কিছু করে দিলেই যে সেটা ধোপে টিকবে তা নয়। যাদের দেশ ভাগ হবে তাদের সম্মতি থাকা চাই। নেতারা বাঁদরকে দিয়ে পিঠে ভাগ করিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু যার ভাগে কম পড়বে সে কি চুপ করে সহ্য করবে? ততদিন বাঁদর হয়তো জাহাজে উঠে বসে আছে। তাকে দায়ী করতে পারা যাবে না। গান্ধীজী আগে থেকেই বলে রেখেছেন যে তিনি এর মধ্যে নেই। তিনি ক্ষমতা চান না। তিনি পিঠে খাবেন না। কংগ্রেস অবশ্য জোর করে কোনো প্রদেশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আটকে রাখবে না, কিন্তু উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদি লীগের চেয়ে কংগ্রেসকেই পছন্দ করে তাকে জোর করে লীগের

কোলে তুলে দেবে না। রাজাজী কাটছাঁট করার কথাও বলেছেন। কংগ্রেসনেতারা বেঙ্গল থেকে কতক অংশ কেটে রাখতেও পারেন যেমন কলকাতা। যেটা হিন্দুপ্রধান। তা ছাড়া এসব সিদ্ধান্ত তো কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে নেওয়া হবে, যেখানে ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা কেউ থাকবেন না। ভারতীয় প্রতিনিধিরাই নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া করবেন। পাকিস্তান সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ অ্যাওয়ার্ড হিসাবে সম্ভব নয়।''

''আচ্ছা, ব্রাদার, ইংরেজ যদি না থাকে কন্‌স্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আহ্বান করবে কে? ইংরেজরা কারো উপর শাসনভার দিয়ে না গেলে গান্ধীজীর বিশ্বাস কিছুদিন অরাজকতার পর একটা প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট গড়ে উঠবে। কিন্তু একটা কেন? তিনটে কেন নয়? দিল্লীতে যেটা গড়ে উঠবে সেটাকে বেঙ্গল মেনে নেবে কেন? পাঞ্জাব মেনে নেবে কেন? এরাও নিজের নিজের প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট গড়ে তুলবে। তা হলে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিও একটা নয়, তিনটে। জবাহরলাল কি মনে করেন তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই একটিমাত্র কনস্টিটিউশন তৈরি হবে? জিন্নার পরিকল্পনা অনুসারে আরো একটি নয়? কংগ্রেস কি লীগকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিয়েছে? গান্ধীজী কি মুসলমানদের প্রেমের জোরে জয় করেছেন? বাকী থাকে ভোটের জোর। সেই ভোটও তো স্বতন্ত্র ইলেকটোরেটে বিভক্ত। কংগ্রেসের ভোটের জোরে কনস্টিটিউশন হলে সবাই সেটাকে মান্য করবে কেন? একটার জায়গায় যদি তিনটে কনস্টিটিশন হয় তবে দুটো তো মুসলমানদের ভোটের জোরেই হবে। সে দুটো হবে পাকিস্তানী কনস্টিটিউশন।'' হায়দার ধরে নেন।

''তা কেমন করে মানব?'' মানস বলে, ''বাঙালী হিন্দু মুসলমান যদি তৃতীয়পক্ষের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় তবে নিজেদের ঝগড়া নিজেরাই মিটিয়ে নেবে। তখন যেটা গড়ে তুলবে সেটা পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ।''

''তাই যদি হয় তবে বুঝব ওরা সাচ্চা মুসলমান নয়। একেই তো ওরা উর্দু বলতে পারে না। মুসলমানদের পক্ষে কত বড়ো একটা গুনাহ্।'' হায়দার আফসোস করেন।

''আপনার জিন্নাও তো উর্দুনবীশ নন।'' যূথিকা ফোড়ন কাটে।

''হ্যাঁ, ভাবীজী। কথাটা ঠিক। জিন্না কিসের মুসলমান? কিন্তু আর কোনো নেতাও তো নেই আমাদের।'' হায়দার করুণ স্বরে বলেন।

দু'চার কথার পর হায়দার তদ্‌গতভাবে স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান, সর্বজনশ্রদ্ধেয়। হিন্দুরাও তাঁকে পীরের মতো মানতেন। একদিন তিনি বাড়ীর সবাইকে ডেকে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন। তারপর খাটের উপর শুয়ে পড়ে একটা চাদর টেনে নিয়ে বলেন, ''সারাজীবন যদি আমি পুণ্য কর্ম করে থাকি, যদি কখনো কারো অনিষ্ট না করে থাকি, যদি বান্দার মতো আল্লার আদেশ পালন করে থাকি তবে আজ এখুনি তিনি এ প্রাণ গ্রহণ করুন।'' এই বলে চাদর মুড়ি দেন। মুখ থেকে চাদর সরিয়ে নিতেই দেখা গেল তাঁর দেহ পড়ে আছে, তিনি নেই।

আবেগে হায়দারের কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। তিনি বলেন, ''হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁর জন্যে শোক করে। সত্যিকার ধার্মিক যে তার আত্মপর ভেদ নেই। ধার্মিক হিন্দুও তো আমি দেখেছি। তাঁদেরও আত্মপর ভেদ নেই। আমি কি বুঝিনে যে হিন্দুস্থান ছাড়লে আমার পূর্বপুরুষদের কবরকেও ছাড়তে হবে, কীর্তিকেও ছাড়তে হবে? এক কথায় অতীতকেও ছাড়তে হবে। কিসের গর্ব করবে আমার পুত্রকন্যা? অপর পক্ষে পাকিস্তান না হলে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না। কিসের স্বপ্ন দেখবে আমার পুত্রকন্যা? হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে যাবে, তলিয়ে যাবে, মাথা তুলতে পারবে না! ইংরেজরা আমাদের রাজ্য কেড়ে নিলেও আমাদের কিছু সুযোগ সুবিধাও দিয়েছিল। উর্দু এখনো আদালতের ভাষা। ওরা চলে গেলে তো উর্দুও উঠে যাবে। পাকিস্তান পেলে সেখানে আমরা উর্দুকেই রাজভাষা করব। নইলে

উর্দুর কী ভবিষ্যৎ?"

যূথিকা এর উত্তরে বলে, "তা হলে বাংলার কী ভবিষ্যৎ? আমাদেরও পুত্রকন্যা আছে, তাদের কী ভবিষ্যৎ।"

হায়দার উঠে দাঁড়ান। "বিবি এলে পরে আপনারা আসবেন একদিন।"

।। তেরো ।।

পার্ল হারবার যাদের উল্লসিত করেছিল, সিঙ্গাপুর যাদের উৎফুল্ল করেছিল, রেঙ্গুন তাদের মুখ হাসায়। তবে কি জাপানীদের লক্ষ্য বার্মার পর ভারত? না, না, ওরা চীনকেই ঘেরাও করতে চায়, তাদের লক্ষ্য চীনের দিকে। ভারতের দিকে নয়। কিন্তু একথা যারা বলে তারাও চুপি চুপি বলে যে জাপানীরা আসছে ভারত থেকে ইংরেজদের খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারতমহাসাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে। তার পর ভারতের সিংহাসনে ভারতীয়কে বসিয়ে পূর্ব মুখে প্রস্থান করতে।

জুলি তার মাকে বোঝায় জাপানীরা হচ্ছে বিজ্ঞানে যাকে বলে ক্যাটালিস্ট। সীমান্তের ওপারে ওদের উপস্থিতিটাই যথেষ্ট। ওদের সীমান্ত পার হতে হবে না। জুজুর ভয়ে এর মধ্যেই কলকাতায় ব্ল্যাক আউট। সিভিল ডিফেন্সের ধুম পড়ে গেছে। রাস্তার ধারে শেলটার খোঁড়া হচ্ছে। এসব লক্ষণ যদি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্মতৎপর করে তবে ইংরেজদের জাপানীরা খেদিয়ে নিয়ে যাবে কেন, জুলিরাই খেদিয়ে নিয়ে যাবে। সিংহাসনে কে বসবে না বসবে সেসব পরে স্থির করলেও চলবে। এখন থেকে করতে গেলে অনাবশ্যক মতভেদ। জবাহরলালকে জুলি দেখতে পারে না। তিনি নাকি ভারতের কেরেনস্কি। কিন্তু ভারতের লেনিনটি যে কোন্‌খানে আত্মগোপন করেছেন তা তিনিই জানেন। কবে আসছেন সেটাও অজানা। বাবলীরা অবশ্য তাঁকে স্বীকার করতে চায় না। কমিউনিস্টদের মতে তিনি ফাসিস্ট। এ নিয়ে দুই কন্যাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। বাবলীরা জাপানকে রুখবে। কারণ জাপানীরাও ফাসিস্ট। জুলিরা রুখবে না, তবে ওদের আসার আগেই কেল্লা দখল করবে। ভাবনা কেবল এই যে ওরা বোকার মতো কলকাতায় বোমাবর্ষণ করে সাধারণ মানুষকে উদ্বাস্তু করে তুলবে। উদ্বাস্তু হলে কি মানুষ জাপানকে ক্ষমা করবে, না জুলিদের স্বাগত জানাবে?

"জাপানের পলিসি কি তোদের কন্ট্রোলে?" জুলির মা বিনীতা সিন্‌হা উপহাস করেন। "ওদের নক্‌শা কি ওরা তোদের দেখতে দিয়েছে? লড়াইটা তো হচ্ছে জাপানী হাই কমাণ্ডের সঙ্গে ব্রিটিশ হাই কমাণ্ডের। দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে দাবাখেলার ছক। জাপানীরা আপাতত এগোচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু ইংরেজরাও যে ক্রমাগতই পেছোবে তা নয়। বোমাবর্ষণের পরে যারা ভয় পেয়ে কলকাতা ছেড়ে দিল্লী, সিমলা, কাশী পালিয়েছিল তারা একে একে ফিরছে। আরো শ্বেতাঙ্গ সৈন্য আসার পর থেকে হাওয়া একটু একটু করে বদলাচ্ছে। জাপানীরা হয়তো উপকূল অঞ্চলে হানা দেবে বা হামলা করবে। কিন্তু উপকূল থেকে বেশীদূর ঢুকতে ওদের সাহস হবে না। দেশটা তো মালয়ের মতো সংকীর্ণ নয়। বার্মার মতো বনজঙ্গলে ভরা নয়।"

"আমিও কি বলছি যে জাপানীরা বেশীদূর এগোবে? আমরাই বা দেব কেন এগোতে? ওদের ভূমিকা হলো পরিস্থিতিটাকে পাকিয়ে তোলার। যেটা আমাদের একার সাধ্য নয়। পরিস্থিতিটা যেই পরিপক্ক হবে অমনি সুযোগ বুঝে আমরা পাকা আমটি পেড়ে খাব। ছেলেবেলায় পড়েছি না— অজগর আসছে তেড়ে। আমটি আমি খাব পেড়ে। অজগর হচ্ছে জাপানী। আমটি হচ্ছে বিপ্লব।"

মিসেস্‌ সিন্‌হা মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করে বলেন, "ইঁদুরছানা ভয়ে মরে। ঈগল পাখী পাছে ধরে। ইঁদুরছানা হচ্ছে ভীতু বাঙালী। ঈগলপাখী হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতাভর্তি ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্য।"

জুলি জেল থেকে ফেরার পর আরো উদ্দাম হয়েছে। ইংরেজরা যে তাকে জেল থেকে বিনা শর্তে খালাস করে দিয়েছে এটা কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ আলোচনার আবহাওয়া তৈরি করার উদ্দেশ্যে নয়। দক্ষিণপন্থীরা তাই বলছে বটে, কিন্তু আসলে সেটা বন্দীদের অবাধ্যতার দরুন। সিঙ্গাপুরের পতনের পর থেকেই তারা বেপরোয়া। সরকার দুর্বল না হলে তাদের উৎপাত সহ্য করবে কেন?

সরকার কিন্তু সবাইকে মুক্তি দেয়নি। দাদাদের কেউ কেউ এখনো বন্দী। সব চেয়ে যাঁদের উপর সন্দেহ তাঁরা সব চেয়ে দূরে ও নির্জনে। লাহোরে বা মুলতানে। যেখানে ইংরেজ রাজের সিংহাসন অটল। জাপানীরা কি ততদূর ধাওয়া করতে পারবে? না পারলে ইংরেজ তো থেকেই গেল ভারতের এক কোণে। ইংরেজকে পেছনে রেখে জাপানী কি কোনোদিন পিছু হটবে? পাল্টা আক্রমণে নাজেহাল হবে না? দাদাদের উভয়সঙ্কট। জাপানীরা ঘরে না ঢুকলে ইংরেজরা ঘর থেকে বেরোবে না। তা হলে কি জাপানীরা আদৌ ঢুকবে না? অথবা একবার ঢুকলে সমস্ত ঘরটাই জুড়ে বসবে? তখন যদি ওরা আপনা থেকে সরে না যায় ওদের সরাবে কে? মিত্র বলে কি তারা নিঃস্বার্থ মিত্র? জুলি যদিও সরলবিশ্বাসী তবু জাপানীদের নিঃস্বার্থ অপসরণে সন্দিহান। ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ তো এক জায়গায় না এক জায়গায় ঘটবেই। সম্ভবত দিল্লীর কাছাকাছি। যেখানে ভারতভাগ্য বার বার নির্ধারিত হয়েছে। সেই কুরুক্ষেত্রে জাপানীদেরও তো লোকক্ষয় হবে। ক্ষতিপূরণ আদায় না করেই কি তারা ভারত ত্যাগ করবে? না সেটা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের অকুপেশন বজায় রাখবে? কারো কাছে জুলি যুক্তিপূর্ণ উত্তর পায় না।

গণ সত্যাগ্রহের উপর থেকে তার বিশ্বাস টলেছিল। কই, জনগণ তো সাড়া দিল না? আবার কি দেবে? জোয়ার কোথায় যে দেশ উথাল পাথাল হবে? গান্ধীজীর দৌড় দেখা গেছে। হাজার পঁচিশ লোক কারাবরণ করেছে। চল্লিশ কোটির মধ্যে হাজার পঁচিশ তো নস্যি। সব ক'টা জেলও তো তিনি ভর্তি করতে পারলেন না। অবশ্য ইংরেজরা তাতেও দমত না। জেলের বাইরে বন্দী শিবির বানাত। গণ জাগরণে জুলির বিশ্বাস একদা ছিল। কিন্তু সে বিশ্বাস আর নেই। তার স্থান অধিকার করেছে সশস্ত্র বিদ্রোহ। কিন্তু সেটা তো আর প্রকাশ্যে প্রচার করা যায় না। পুলিশ তো এখনো রাজভক্ত। সৈন্যদলও তাই। ওদের কথা হলো ওরা যার নিমক খাচ্ছে তার সঙ্গে নিমকহারামী করবে না। যত সব মান্ধাতার আমলের অন্ধসংস্কার! রাজভক্তির চেয়ে দেশভক্তি বড়ো কবে ওরা এটা বুঝবে? যে বোঝাতে যাবে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজদ্রোহের দায়ে ঝুলিয়ে দেবে। যুদ্ধকালে তো সাধারণ আদালতে নয়, সামরিক আদালতে নিয়ে গিয়ে গুলী করে মারবে।

পূর্ণযৌবনা দামাল মেয়েকে নিয়ে তার মা পড়েছেন ঘোর বিপাকে। তবে জুলির একটা গুণ সে মার কাছে কিছু লুকোয় না। রাতে মার সঙ্গেই শোয়। ছেলেবেলার মতো মাকে জড়িয়ে ধরে। তার সেই 'বেবী' নামটা এখনো ঘোচেনি। সেই নামেই তিনি তাকে ডাকেন। ওকে আলাদা ঘরে শুতে দেবার পরিণাম হয়েছিল ওর বালিশের তলা থেকে রিভলভার উদ্ধার। উচ্চপর্যায়ে তদ্বিরের দৌলতে আদালতে সোপর্দ করা হলো না। কিন্তু বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হলো যতদিন না লেডী হ্যারিংটন হস্তক্ষেপ করেছেন। সেটা অবশ্য সুকুমার দত্তবিশ্বাসের উদ্যোগে। তখন থেকে মেয়ে হয়েছে নজরবন্দী।

পাখী যেমন দিনভর আকাশে উড়ে বেড়ায়, সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে, জুলিও তেমনি ব্রেকফাস্টের পর সারাদিন বাইরে ঘোরাফেরা করে রাত ন'টা নাগাদ বাড়ী ফিরে আসে। মা ততক্ষণ ওর জন্যে খাবার নিয়ে বসে থাকেন। যদি না বাইরে নিমন্ত্রণ থাকে। তার বা ওঁর বা দু'জনের। ব্ল্যাকআউট হওয়ার পর থেকে জুলি আরো সকাল সকাল বাড়ী ফেরে। একটু ভয়ডরও ঢুকেছে ওর মনে। ব্ল্যাক আউট তো সরকার অকারণে করছে না। না করলেই বরং অন্যায় হতো। আর সিভিল ডিফেন্সও অহেতুক নয়। জুলিরও ইচ্ছে করে সিভিল ডিফেন্সের তালিমী নিতে। তাতে যোগ দিতে। কত মেয়ে তালিমী নিচ্ছে, যোগ দিচ্ছে। কিন্তু তা হলে তো প্রকারান্তরে যুদ্ধে যোগ দেওয়া হয়। যেটার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে ও

জেল খেটে এসেছে। 'না একো জওয়ান না একো রুপেয়া' এই যার স্লোগান সে হঠাৎ ভোল বদলায় কী করে? ইংরেজ কী স্বাধীনতা দিয়েছে? নেতারা কি স্বাধীনভাবে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

মা বলেন, "তুই যেমন বেবী ছিলি তেমনি বেবী রয়ে গেছিস্। তিরিশ বছর বয়সেও তোর ছেলেমানুষী গেল না। দুশো বছর ধরে আমরা পর্বতের আড়ালে আছি। নাদির শা'র পর আর কেউ এদেশ আক্রমণ করেনি। এই প্রথম আমরা আক্রমণের আশঙ্কা করছি। এই যে পর্বত যার আড়ালে আমাদের সাত পুরুষ কেটেছে সে যদি সত্যি সত্যি অদৃশ্য হয়ে যায় তা হলে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড হবে ভেবে দেখেছিস্? হিমালয় যদি হঠাৎ মৈনাকের মতো উড়ে যায় তা হলে উত্তর থেকে ঝড়ঝঞ্ঝা এসে দেশের আবহাওয়াটাকেই বদলে দেবে। দক্ষিণ থেকে মৌসুমী বাতাস এসে উত্তরে চলে যাবে। বর্ষাকালে বর্ষণ হবে না। ধানগাছ শুকিয়ে মরবে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তেমনি ব্রিটিশ রাজ হচ্ছে আমাদের হিমালয় পর্বত। একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত না করে ইংরেজরা যদি উধাও হয় তো আমাদের কপালে আছে আবার সেই বর্গীর হাঙ্গামা, পিণ্ডারী ও ঠগীর উপদ্রব। আবার সেই মোগল রাজপুত যুদ্ধ। মোগল শিখ যুদ্ধ। মোগল মারাঠা যুদ্ধ। হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ। মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ। সাধারণ মানুষ জেরবার হয়ে বলবে, ইংরেজ, তুমি ফিরে এস। ইংরেজ বোধহয় ফিরবে না। অতখানি প্রেস্টিজহানির পর কেউ ফেরে? ওই জাপানীই মোগল, শিখ, মারাঠা, রাজপুতকে একে একে হারিয়ে দিয়ে সসাগরা ভারতের অধীশ্বর হবে। জোর যার মুলুক তার। তোদের কোথায় জোর? তোরা তো এখনো, এই বিপত্তির দিনেও, একজোট হতে পারলিনে। হিন্দু মুসলমান শিখ কেউ কাউকে দেখতে পারে না। হিন্দুসমাজও ছোট ছোট গণ্ডীতে বিভক্ত। কেউ কারো হাতে জল খাবে না। অসবর্ণ বিবাহ করবে না। মুখে বলবে আমরা এক নেশন, কিন্তু কাজ দেখলে মনে হবে একশোটা নেশন কি তার চেয়েও বেশী। নেশনবোধ তো জাগিয়েছে ওরাই। ওই ইংরেজরাই। ওরা চলে গেলে কি নেশনবোধ থাকবে? মুসলিম লীগ তো এর মধ্যেই দুই নেশনের ধুয়ো ধরেছে। খুব একটা মিথ্যে নয়। কংগ্রেসের এক নেশনটাও কি খুব একটা সত্যি? আমি বলি, পর্বতকে এখন টলাতে যেয়ো না! তোমরা যদি সহযোগিতা করতে না চাও, কোরো না। বিনা সহযোগিতায় ওরা কতদূর যেতে পারে দেখা যাক। যখন দেখবে সহযোগিতা না পেলে ওদেরই সর্বনাশ তখন ওরাই সহযোগিতার জন্যে সাধবে। তখন তোমরা একমত হয়ে স্বাধীনতা চাইবে। যদি একমত না হতে পারো তা হলে সর্বনাশটা ওদের নয়, তোমাদেরই। ওদের একটা নিজস্ব দেশ আছে, ওরা পালিয়ে বাঁচবে। তোমরা পালাবে কোথায়? হয় অরাজকতা, নয় দাঙ্গাহাঙ্গামা, নয় নতুন করে পরাধীনতা। এ ছাড়া আর কী আছে তোমাদের কপালে? শুধুমাত্র পরজাতিবিদ্বেষ নিয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। কোথায় সেই স্বজাতিপ্রেম?"

একেই বলে কার্টেন লেকচার। জুলির বাবা বেঁচে থাকতে জুলির মা তাঁকে এমনি কার্টেন লেকচার শোনাতেন। তিনি তো নেই, তাঁর ছোট মেয়ের কানে এই কথামৃতবর্ষণ। জুলি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। অর্ধেক কথা ওর কানে পশে না। কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশা তো দূরের কথা।

"তোর বন্ধু বাবলী আজকাল আসে না কেন রে?" মা একদিন জানতে চান।

"ওরা এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ছোট তরফ। কোথায় গেল বিপ্লবচিন্তা। মওকা তো ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তবু ওদের হুঁশ নেই। দেশের শ্রমিক কৃষক ওদের কাছে নেতৃত্ব আশা করে, সেটা ওরা ভুলে গেছে। ওদের কেবল একমাত্র ধ্যান রাশিয়া কেমন করে জার্মানদের রুখবে। বিদেশের ওই যুদ্ধটাই নাকি এদেশের জনযুদ্ধ। এটা কি ডাহা মিথ্যা নয়?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"আমি তো শুনেছি ওরা এই সুযোগে জনগণের হাতে রাইফেল ধরিয়ে দিতে চায়। তাই যদি হয় তবে এটা জনযুদ্ধ নয় তো কী? জনযুদ্ধটা কাদের বিরুদ্ধে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। জাপানীরা তো এ তল্লাটে নেই। এলে কতক লোক তো রাইফেল নিয়ে জাপানীদের দলেও ভিড়ে যেতে পারে। যাদের

রাজভক্তির বালাই নেই, দেশভক্তির বালাই নেই তাদের আছে যেকোনো একটা যুদ্ধই জনযুদ্ধ। ধর্মের নামেও সেটা হতে পারে। অর্থের জন্যেও হতে পারে। যে যুদ্ধ সেনাপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যা অপর একটি সৈন্যদলের সঙ্গে নয়, তা তো নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর সশস্ত্র ব্যাণ্ডিটদের হাঙ্গামাও হতে পারে। যেমন মগদের হাঙ্গামা।" মা উত্তর দেন।

"তা হলে বুঝতে পারছ আমরা কেন এখন এক পথের পথিক নই। আমি তো মনে করি বাবলী ভুল পথে চলেছে। সেটাকেই বিপ্লববাদ বলে চালাচ্ছে। যেন রাইফেল হাতে পেলেই বিপ্লব হয়, রাইফেলের লক্ষ্য কে তার ঠিকানা না জানলেও চলে। আমাদের লক্ষ্য ব্রিটিশ রাজ। যার ঠিকানা দিল্লী, কলকাতা, সব বড়ো বড়ো শহর। সব বড়ো বড়ো রেল জংশন। সব বড়ো বড়ো বন্দর। ওদের লক্ষ্য যদি জাপানী আর্মি হয়ে থাকে তবে ওদের ফ্রন্টে যেতে হবে। জাপানীদের সঙ্গে লড়তে হবে। মরতে হবে। গোটাকতক জমিদার কি মহাজন মারার জন্যে অতগুলো রাইফেলের কী দরকার? আর জমিদার মহাজনরাও তো রাইফেল পেতে পারে। ওরা যুদ্ধে অর্থসাহায্য করছে না? অফিসার ক্লাস তো ওদের পুত্ররাই। ওদের সম্পত্তিতে হাত পড়লে ওদের রাইফেলের লক্ষ্য কি জাপানীরা হবে? না ওরা জাপানীদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ওদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করবে? বাবলীর সঙ্গে আমার মিল ছিল যখন আমাদের লক্ষ্য ছিল এক। এখন লক্ষ্য ভিন্ন। তাই পথও ভিন্ন। বাবলী আমাকে ভজাতে পারেনি, আমিও ওকে ভজাতেপারিনি। ও আমার প্রাণের বন্ধু, আমিও ওর। কিন্তু রুশপ্রেম আর দেশপ্রেম আজকের অবস্থায় মেলানো যায় না। বিচ্ছেদ অনিবার্য।" জুলি দুঃখের সঙ্গে বলে।

"দেখিস্ বিচ্ছেদ থেকে যেন বিরোধ না আসে।" মা সতর্ক করে দেন।

"আমরাও কি বিরোধ চাই? ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বিরোধ। রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ আমাদের কাম্য নয়। স্বাধীন হলে আমরাও রাশিয়াকে সাহায্য করব। কিন্তু তার আগে স্বাধীন হওয়া চাই। যে নিজে পরাধীন সে পরকে সাহায্য করবে কোন্ মুখে? ওরা যে রাইফেল চাইছে সে রাইফেল নিয়ে কি ওরা সাগর পারে গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে লড়তে রাজী আছে?" হেসে উড়িয়ে দেয় জুলি।

"ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই করতে হলে ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। তা চুরি করেই হোক আর লুট করেই হোক আর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নাম করেই হোক। ওদের পথে ওরা ঠিকই আছে, বেবী। সেটা ব্রিটিশ রাজও জানেন। তাই ফাঁকি দিয়ে রাইফেল পাওয়া ওদের বরাতে নেই। কিন্তু তোরাই বা কী করে আশা করছিস্ যে জার্মানী থেকে বা জাপান থেকে শস্ত্র এসে তোদের হাতে পৌছবে? এক যদি সিপাহীরা বিদ্রোহ করে তা হলে ইংরেজের দেওয়া শস্ত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাগিয়ে ধরতে পারে। কিন্তু এই স্টেন গান, ব্রেন গানের যুগে রাইফেল ওদের কতটুকু কাজে লাগবে? কামানের গোলাকে কি ওরা ভয় করে না? ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ হলে ওরা কতক্ষণ রুখতে পারবে? আর প্লেন থেকে বোমাবর্ষণ হলে ওরা কি ছত্রভঙ্গ হবে না? যেটা সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শর্ত সেটা হচ্ছে সিপাহীতে সিপাহীতে একতা। হিন্দু মুসলমান শিখ সিপাহী যদি একজোট হতো তা হলে তাদের দমন করা দুঃসাধ্য হতো। কিন্তু তার যেটুকু সম্ভাবনা একশো বছর আগে ছিল সেটুকুও এখন আর নেই। সিপাহীরা এখন হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, শিখিস্থানের স্বপ্ন দেখছে, যদি ইংরেজ সত্যি সত্যি ভারত ছেড়ে যায়। জোড়াতালি দিয়ে একটা ন্যাশনাল আর্মি খাড়া করা যায়। কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে ওদের উসকে দেওয়াও শক্ত নয়। তখন ওরাই পরস্পরকে মেরে সাবাড় করবে। বাবলীদের থীসিস যেমন অবাস্তব তোদের থীসিসও তেমনি। তোরা দু'জনেই আলেয়ার পেছনে ছুটেছিস্। দু'টো দু রকম আলেয়া।" মিসেস সিন্‌হা আবার এক লেকচার শোনান।

"তা বলে তো চুপ করে বসে থাকা যায় না। একটা কিছু করতে তো হবে। নয়তো তোমার ওই

পর্যন্ত আরো দু'শো বছর আমাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকবে। তুমি মডারেট ঘরের মেয়ে। ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে তোমার লাভ্ রিলেশনশিপ। আর আমি এক্স্ট্রীমিস্ট বাপের মেয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমার হেট রিলেশনশিপ। তবে ইংরেজ জাতির সঙ্গে তা নয়। লেডী হ্যারিংটন আমার জন্যে যা করেছেন তা কি আমি ভুলতে পারি?'' জুলি আবেগের সঙ্গে বলে।

"তা হলে তোর ওটা লাভ্-হেট রিলেশনশিপ।'' মা সস্নেহে বলেন।

"তোমার কাছে গোপন করব না, মা। ইংরেজকে মারতে আমার হাত উঠবে না। রাইফেল হাতে পেলেও না। রিভলভার হাতে পেলেও না। তবে আমি জোন্ অভ্ আর্কের মতো সৈনিকদের উদ্দীপনা দেব। প্রেরণা জোগাব। যদি কোনোদিন সুযোগ মেলে। পর্বতের আড়ালে বাস করে আমি তোমার মতো শান্তিতে ঘুমোতে পারব না। অমন শান্তি যেন কবরের শান্তি।'' জুলি বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন সৌম্য আসে দেখা করতে। এবার সে সোদপুরে উঠেছে। সেখানেই রাত কাটাবে। জুলির মা ওকে নৈশভোজনের আমন্ত্রণ জানান। তার জন্যে সে তৈরি হয়েই এসেছে। জুলিকে তো অন্য সময় পাওয়া যাবে না।

"বাবা সৌম্য, তুমি তো আমাদের পর নও। তোমার যখন খুশি তুমি এ বাড়ীতে আসবে। এখানেই উঠবে। আমরা থাকতে সোদপুরে কেন? তোমাকে দেখে আমি মনে ভরসা পাই যে আমার অবর্তমানে তুমিই জুলিকে সুপথে রাখবে। এতদিন আমি ওকে চোখে চোখে রেখেছি। আর ক'দিন পারব? এই যুদ্ধে আমার কপালে কী আছে কে আমাকে বলবে? বোমাবর্ষণ যে-কোনোদিন হতে পারে। সেই ভয়েই না ব্ল্যাক আউট।'' মিসেস সিন্‌হা অন্তরঙ্গভাবে বলেন। "অথচ কলকাতা থেকে পালাবারও জো নেই। জুলি এখান থেকে নড়বে না। অন্ধকারেই ওর আনন্দ।''

"আপনারা থাকতে সোদপুরে কেন? মাফ করবেন, মাসিমা। আমরা আশ্রমিক মানুষ, একহিসাবে শ্রমিকও বলতে পারা যায়। আমাদের অন্নশ্রম বা ব্রেড লেবার হলো চরকা কাটা। একসঙ্গে বসে করি, তাতে একটা কমিউনিয়নের ভাব আসে। বিশজন পঁচিশজন মিলে একসঙ্গে সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান এরও একটা আধ্যাত্মিক মূল্য আছে। যদিও আমরা সবাই ঈশ্বরবিশ্বাসী নই, আমাদের মধ্যে অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিকও আছেন। সত্যিকার আধ্যাত্মিকতা ঈশ্বরবিশ্বাসনির্ভর নয়। সত্যে মতি থাকলে একজন নাস্তিকও আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন হতে পারেন। গান্ধীজী দশবছর আগে নাস্তিকদের অপাঙ্‌ক্তেয় করতেন। এখন তাঁদের স্বাগত করেন। আগেকার দিনে বলতেন, ঈশ্বরই সত্য। ইদানীং বলছেন, সত্যই ঈশ্বর। সূত্রযজ্ঞে সকলেরই অধিকার আছে। সেই সূত্রে আমাদের সকলের কমিউনিয়ন হয়। তবে উপাসনার সময় সকলের যোগদান আবশ্যিক নয়। যাঁদের বিশ্বাস নেই তাঁরা সরে থাকেন। কেউ কিছু মনে করেন না। সেটাও একপ্রকার কমিউনিয়ন। পাড়ার লোকেরাও এসে যোগ দেয়। যারা গান্ধীপন্থী নয় তারাও। তা হলে বুঝতে পারছেন, মাসিমা, কেন আমি সোদপুর আশ্রমে উঠি। গতবারে তো আপনাদের এখানেই উঠেছিলুম।'' সৌম্য সবিস্তারে বোঝায়।

"দেখছি তোমারাও একজাতের কমিউনিস্ট।'' মাসিমা পরিহাস করেন।

"কমিউনিস্টও বলতে পারেন, সোশিয়ালিস্টও বলতে পারেন। তবে সেই সঙ্গে একটি বিশেষণ জুড়ে দেবেন। ননভায়োলেন্ট। ওঁদের মতো আমরাও চাই শোষণশূন্য সমাজ, শ্রেণীশূন্য সমাজ। কিন্তু রক্তস্রোতের ভিতর দিয়ে নয়। আমরা মানুষের প্রাণকে সব চেয়ে মূল্যবান মনে করি। প্রাণ নিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে আমরা সামাজিক অন্যায় দূর করতে চাই। পারব কি না জানিনে। হয়তো পারব না। সেটা আমাদের দোষ। আমাদের নীতির দোষ নয়। স্বয়ং গান্ধীজীও নিখুঁত নন।'' সৌম্য স্বীকার করে।

হুড়মুড় করে জুলি এসে ঘরে ঢোকে। কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "নিখুঁত নন তো নেতার আসন জুড়ে বসে আছেন কী করতে? ওই জাঁকালো বৃদ্ধ মানুষটি আরব্য উপন্যাসের সেই বৃদ্ধটির মতো

সিন্ধবাদ নাবিকের পিঠে লেপটে আছেন কেন? আমরা না পারি তাঁকে সরাতে, না পারি তাঁকে বইতে। বলেন বটে কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছেন, চার আনা চাঁদাও দেন না। কিন্তু লোকে তো জানে, যে গান্ধী সেই কংগ্রেস, যে কংগ্রেস সেই গান্ধী। কিছুতেই যদি সিন্ধবাদকে বৃদ্ধের বাহুপাশ থেকে ছাড়াতে পারা যেত।"

ওর মা রাগ করে বলেন, "এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। ভুলভ্রান্তির নিন্দা করতে চাস্ তো কর। দেখিয়ে দে কোন্‌খানটা ভুল। বুঝিয়ে দে কেন ভুল। তা নইলে লোকে শিখবে কী করে? তা না করে এই পার্সনাল অ্যাটাক কেন? পার্সনাল অ্যাটাকই যদি রাজনীতি হয় তবে কোন্ পার্সন তেমন অ্যাটাকের হাত থেকে নিরাপদ? ইংরেজ হলে বলত, এটা ক্রিকেট নয়।"

জুলি বকুনি খেয়ে সৌম্যর দিকে তাকায়। "তুমি কী বল?"

"তোমাদের মনের কথাটা তো এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে গান্ধীজীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক। সেটা ব্রিটিশ শাসকদেরও মনের কথা। গান্ধী না থাকলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের তাঁরা এতদিনে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকতেন। বামপন্থীরা দুর্বল হয়ে পড়তেন। ক্রিপ্‌সের দৌত্যের উদ্দেশ্যই ছিল নেহরুকে ও আজাদকে গান্ধীজীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। তাঁকে একঘরে করা।" সৌম্য উত্তর দেয়।

মিসেস সিন্‌হা হেসে বলেন, "তার মানে কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে গান্ধীজীর একটা টাগ অভ ওয়ার চলেছে। একবার শাসকরা চেষ্টা করেন ওঁদের কাছে টেনে নিতে। একবার গান্ধীজী চেষ্টা করেন তাঁর কাছে টেনে রাখতে। তাঁদেরও দোনোমনো যায় না। একবার যুদ্ধে যোগ দিতে লাফান। একবার সত্যাগ্রহে ঝাঁপ দেন। কখনো হিংসাবাদী, কখনো অহিংস্যবাদী। যখন যেমন তখন তেমন। গান্ধীজীকে দোষ দেওয়া বৃথা।"

"গান্ধীজী কায়মনোবাক্যে যুদ্ধবিরোধী। কংগ্রেস তা নয়। কংগ্রেসকেও দোষ দেওয়া বৃথা। সম্মানজনক শর্ত পেলে কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। গান্ধীজীও নেতাদের সেই কথাই বলেছেন। এ জগতে কে কাকে টেনে রাখতে পারে? মাসিমা, আপনিও কি জুলিকে টেনে রাখতে পারলেন?" সৌম্যও হাসে।

"যা বলেছ। আমার এখন একমাত্র আশা ওর বর ওকে টেনে রাখতে পারবে। ও যদি কাউকে বরণ করে।" মা আড়চোখে তাকান।

জুলি রাগের ভান করে বলে, "দিস্ ইজ নট ক্রিকেট।"

ওর মা শান্তিজল ছিটিয়ে দিয়ে বলেন, "সৌম্যকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে পাওয়া গেছে। ঝগড়া করে যেন সময় বইয়ে দেওয়া না হয়।"

"কেন? কয়েক ঘণ্টা কেন? কয়েক দিন কেন নয়?" জুলি কৈফিয়ৎ চায়।

"ওই জাঁকালো বৃদ্ধ মনুষ্যটি সিন্ধবাদ নাবিককে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। আর দেবেন না বলে বদ্ধপরিকর। এবারে তিনি নিজেই জেলে যাবেন বলে নোটিস দিয়েছেন। ওই বৃদ্ধ যদি জেলে যান আমাকেও অবিলম্বে প্রস্তুত হতে হবে। ওই বৃদ্ধ পিঠ থেকে নেমে গেলে সিন্ধবাদ মুক্ত। সিন্ধবাদকে কেউ জেলে যেতে বলছে না। সে জেলে যাবে কেন, সে যাবে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায়, লাটসাহেবদের সঙ্গে দহরম মহরম করবে। বড়লাটও তাকে তাঁর পারিষদসভায় আসন দিতে উন্মুখ। তবে তার রুচি মতো নয়। বড়লাটের তো আরো কয়েকজন পারিষদ আছেন। তাঁদের তো তিনি পথে বসাবেন না। তাঁরা আরো নির্ভরযোগ্য। তিনি হিন্দু মুসলমানে একটা ব্যালান্সও রাখবেন। তাঁর হাতে দাঁড়িপাল্লা। সিন্ধবাদ নাবিক আর সমুদ্রে ফিরে যেতে চান না, বৃদ্ধের পাল্লায় পড়ে ঢের হয়েছে। ছেড়ে দে, বুড়ো, কেঁদে বাঁচি। কিন্তু বুড়োই যে নিজের থেকে ছেড়ে দিয়ে বরাবরের মতো চলে যাচ্ছেন অকূল সাগরে। ফিরবেন কিনা সন্দেহ। খেতে না পেয়ে মরে যেতেও পারেন। ওঁর আবার এক বাতিক আছে। খেতে দিলেও যাবেন না।

আর এই পোড়া দেশের মন পড়ে থাকবে কারাগারে যেখানে বুড়ো দিন দিন শুকিয়ে মরছেন। সিন্ধবাদ দেখবে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। জনগণ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। জনগণের নজরে পড়ার জন্যে তাকেও বৃদ্ধের অনুসরণে কারাবরণ করতে হবে। খালি পেটে তবু দু'চারদিন থাকতে পারা যায়, কিন্তু খালি পিঠে একদিনও নয়। সিন্ধবাদকে ঐ বৃদ্ধের বোঝা পিঠে তুলে নিতেই হবে। বৃদ্ধ তাকে মুক্তি দিলেও সে বৃদ্ধকে মুক্তি দেবে না। যদি না বড়লাট তাকে টেনে নিয়ে মাথায় করে রাখেন ও তারই কথায় রাজত্ব চালান। বৃদ্ধের হাত থেকে সিন্ধবাদ নয়, সিন্ধবাদের হাত থেকে বৃদ্ধই চান মুক্তি। মুক্ত হয়ে তিনি একাই চালিয়ে যাবেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। স্বাধীনতা বলতে যুদ্ধ না করার স্বাধীনতাও বোঝায়। এইখানেই সিন্ধবাদের সঙ্গে বৃদ্ধের মতভেদ। সেটা পথভেদও বটে, কারণ একবার অহিংসা মেনে নিলে পরে আর আবালবৃদ্ধ বনিতার উপর নির্বিশেষে বোমাবর্ষণ চলে না। যেটা সিন্ধবাদও যুদ্ধে গেলে করবে।" সৌম্য একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

জুলির ভাবান্তর দেখা যায়। সে বলে, "তুমি কি আবার জেলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছ?"

"না, আমার উপর অন্য নির্দেশ। সেবারেও অন্য নির্দেশ ছিল, কিন্তু আমার কেবলি মনে হতে লাগল জুলি জেলে গেছে, আমি বাইরে আছি, এতে আমাদের দু'জনের সম্পর্কে চিড় ধরবে। এবার বাপু আমাকে বলেছেন জেলে যাওয়াটা খুব নরম কাজ। ওর চেয়ে কঠিন কিছু করতে হবে। দুই আগুনের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে। একদিকে জাপানী, আরেক দিকে ইংরেজ, মাঝখানে আমি ও আমার সহকর্মীরা। আমরা পালাব না, বিপদের মুখোমুখি হব। বাপুর পণ তিনি এদেশকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দেবেন না। কিন্তু ইংরেজ আর জাপানী মিলে যদি তা করে তবে দুই আগুনের মাঝখানে দাঁড়ানোই তৃতীয় পন্থা। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গুলীগোলা খাব। সেই ত্যাগ ব্যর্থ যাবে না। তার থেকেই আসবে স্বাধীনতা।" সৌম্য ব্যাখ্যা করে।

জুলি একবার সৌম্যর দিকে তাকায়। একবার মায়ের দিকে। কাতরকণ্ঠে বলে, "ও যদি আমার জন্যে জেলে গিয়ে থাকে তবে আমাকেও তো ওর জন্যে গুলীগোলার সামনে দাঁড়াতে হয়, মা।"

"তা কী করে হয়?" মা তো হতভম্ব।

"কেন হবে না, মা? তুমি কি জানো না আমাদের দু'জনের কী সম্পর্ক? বিয়েটা অবশ্য হতে পারছে না, যতদিন না দেশ স্বাধীন হয়।" জুলি সৌম্যর দিকে করুণ চক্ষে তাকায়।

"তার তো এখনো ঢের দেরি। ইংরেজকে 'ভারত ছাড়ো' বললেই কি সে অমনি ভারত ছাড়ছে? এটা কি একটা কথা হলো যে ঈশ্বরের হাতে বা অরাজকতার হাতে সঁপে দিয়ে যাবে। ঈশ্বর এ দায়িত্ব নিতে রাজী হবেন কেন? আর অরাজকতা তো দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত। বাঁকা ভাষায়, সম্রাটকে বলা হয়েছে অ্যাবডিকেট করতে। সম্রাট অ্যাবডিকেট করলে তাঁর পুত্র তাঁর সিংহাসনে বসেন। এক্ষেত্রে কংগ্রেসই হবে সেই পুত্র। কিন্তু বেঙ্গল তা মানবে কেন? পাঞ্জাব তা মানবে কেন? এরাও এক এক শরিককে মসনদে বসাবে। গান্ধী মহারাজ এক একটা আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেন আর আমরা সাধারণ মানুষ হকচকিয়ে যাই। ওদিকে জিন্নাসাহেবও প্রতিধ্বনি করেছেন, ভাগ করো আর ভাগো।" মা কোনোটাতেই কান দেন না।

"মার ধারণা তিনি পর্বতের আড়ালে আছেন ও থাকবেন। বুঝলে, সৌম্যদা, এই ধারণাও পর্বতের মতো অটল অনড়। এক জাপানীরা যদি না একে টলায় বা নড়ায়। কংগ্রেস কি পারবে? বাংলাদেশে কোথায় কংগ্রেস? তার পেছনে কি জনগণ রয়েছে? কোথায় সেই জনগণ? তুমি যদি মরতে যেতে চাও তো আমাকেও তোমার সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে। বিয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে।" জুলির কণ্ঠে বিষাদ।

"জাপানীদের আশা ছেড়ে দাও, জুলি। ওটা আশা নয়, আশঙ্কা। ওদের আসার আগেই পর্বতকে

টলাতে হবে। যেটা হবে সেটা সারা দেশ জুড়েই হবে। যদি দেশের লোক সাড়া দেয়। কিন্তু আমাকে প্রস্তুত হতে হবে আচমকা আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে। কারণ আমার বাস সীমান্তে। যুদ্ধ যদি বাধে আমি যেন কাসাবিয়াঙ্কা। তুমি আমার সঙ্গে থেকে কী করবে? যদি জোন অভ্ আর্ক হতে চাও তো তোমার কর্মক্ষেত্র ওখানে নয়, যেখানে তোমার অনুগত সৈন্যসামন্ত সেখানে। বেঁচে থাকলে বিয়ের লগ্ন আসবে। আগে তো মুক্তির লগ্ন আসুক।" সৌম্য কথা দেয়।

এটাই ওদের বাগ্‌দান। মায়ের মৌন আশীর্বাদ।

।। চোদ্দ ।।

ওদের দু'জনকে কথাবার্তার নিরিবিলি দিতে জুলির মা অন্য ঘরে যান। সেটা শোভনা দিদির ঘর।

তখন জুলি বলে, "এখানে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগছে না, সৌম্য। তুমি যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেতে তা হলেই আমি সুখী হতুম। কিন্তু জানি তোমার সে স্বাধীনতা নেই। দেশের স্বাধীনতা আগে, তোমার স্বাধীনতা পরে। কী করি? আমার কপাল।"

"কেন? তুমিও তো বিপ্লবী নায়িকা। ঘর গেরস্তালির জন্যে তোমার অবসর কোথায়? আশ্রমে থেকে কৃচ্ছ্রসাধন কারাজীবনের বিকল্প। ওখানেই বা তোমার ভালো লাগবে কেন?" সৌম্য বিচলিত হয়।

"না, ঘর গেরস্তালির কথা ভাবছিনে। সঙ্গসুখের কথাই ভাবছি। কিন্তু আমি জানি দেশের এই পরিস্থিতিতে সেটা সঙ্গত নয়। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে মায়ের সঙ্গে একবাড়ীতে বাস করা আমার পক্ষে কষ্টকর। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা তিনি পর্বতের আড়ালে আছেন। যার নাম ব্রিটিশ রাজত্ব। ইংরেজবর্জিত ভারত যেন হিমালয়বর্জিত ভারত। অথচ আমার প্রতিদিনের ধ্যান হলো এই পর্বতকে ডাইনামাইট দিয়ে ওড়ানো। জানি তুমি এর মধ্যে ভায়োলেন্সের গন্ধ পাচ্ছ। কিন্তু অসত্যের গন্ধ নিশ্চয়ই নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে আমার কলহ তো এই নিয়ে। তিনি সাধুসন্তদের একজন। যেমন নানক, কবির, চৈতন্য। হয়তো বুদ্ধ খ্রীস্টের সঙ্গে একসারিতে বসবেন। কিন্তু রাজনীতিতে নামলে অমন নীতিবাগীশ হওয়া চলে না। ফল কী হয়েছে? উনি নিষ্ক্রিয়।" জুলি নালিশ করে।

"একবার যদি মেনে নাও যে নৈতিক শক্তি বলে আরো একটা শক্তি আছে আর সে শক্তি দিয়েও পর্বতকে টলানো যায় তা হলে দেখবে ডাইনামাইট ছাড়াও ডাইনামিক অ্যাকশন হয়। তার আগে তোমাকে একটা গল্প বলি। সত্যঘটনামূলক। একজন আই. এম. এস. ডাক্তারের মুখে শোনা। বাঙালী। তিনি তখন বিলেতে পড়াশুনো করছেন। লণ্ডনের একটি ঘরোয়া বৈঠকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত গান্ধীর সঙ্গে প্রবাসী বিপ্লবী সাভারকরের বিতর্ক হয়। সেখানে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের একজন পরবর্তীকালের কর্নেল নাগ। সাভারকর বলেন, গান্ধী, মনে করো তোমার দিকে একটা বিষধর সাপ তেড়ে আসছে আর তোমার হাতে আছে একগাছা লাঠি। তুমি কি মারবে, না মারবে না? গান্ধী উত্তর দেন, লাঠিখানা আমি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব, পাছে মারতে প্রলুব্ধ হই। তা শুনে সাভারকর বলেন, গান্ধী, ধর্মে তুমি আমার গুরু হতে পারো, কিন্তু রাজনীতিতে গুরু নও।" সৌম্য সেই ঐতিহাসিক কথোপকথনের মর্ম শোনায়।

"সাপকে মারব না, লাঠি হাতে থাকলে ছুঁড়ে ফেলে দেব, এতখানি ঝুঁকি নিতে আমিও তো পারব না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটা বিষধর সাপ ছাড়া কী? ভারতবাসীর হাতে লাঠি নেই, এই যা আফসোস। তা বলে কি সাপের কামড়েই মরব? অহিংসা মন্ত্রে সাপকে বশ করার ক্ষমতা কার আছে?" জুলি বিশ্বাস করে না।

"উপমাটাই ভুল। মানুষ সাপ নয়। শক্তিমদে মত্ত হতে পারে। অহিংসামন্ত্র দিয়ে নয়, অহিংসে

আচরণ দিয়ে তাকে সংযত করা যায়, প্রকৃতিস্থ করা যায় বইকি। আর সেই অহিংস আচরণ নির্বিঘ্ন হলেও নির্বীর্য নয়। অভূতপূর্ব জনজাগরণ ঘটেছে। সহস্র সহস্র লোক কারাবরণ করেছে, শত শত লোক লাঠির বাড়ির সামনে বুক পেতে দিয়েছে। ফলে আটটি প্রদেশে আংশিক স্বরাজ সম্ভব হয়েছে। একদিন পূর্ণ স্বরাজও সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে আরো বড়ো ত্যাগের আহ্বান আসবে।" সৌম্য সুনিশ্চিত।

"আরো বড়ো ত্যাগের আহ্বান বলতে কী বোঝায়, সৌম্য? গান্ধীজী কি তার কোনো আভাস দিয়েছেন?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"যুদ্ধের মাঝখানে গণসত্যাগ্রহ মানে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরা যেন বলতে চায় এটা রাজায় রাজায় যুদ্ধ। সেই যে একটা কথা আছে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। এতকাল উলুখড়েরা কেউ প্রতিবাদ করেনি, অকারণে প্রাণ দিয়েছে, প্রাণদানের বিনিময়ে কিছু লাভ করেনি। এবার ওরা আর উলুখড় হতে রাজী নয়। ওরা দুই রাজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে বাধা দেবে। যুদ্ধ থামিয়ে দেবে। রাজশক্তি যদি মিটমাট চায় তো ওরাও রাজী। যদি মিটমাটই শ্রেয় হয় তবে সে রাস্তা সব সময়ই খোলা থাকবে। আর যদি মিটমাটের বদলে মারধরই রাজকীয় নীতি হয় তবে ওরা বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেবে, বুকে গুলী খাবে, পিঠে গুলী খাবে না। কারাবরণ নয়, মৃত্যুবরণই এবারকার বৈশিষ্ট্য। এবারকার ধ্বনি 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। করব, নয়তো মরব। ফলাফল বিধাতার হাতে। রাজশক্তি মিটমাট করতেও পারে, না করতেও পারে, বিদ্রোহীরা যুদ্ধ থামিয়ে দিতেও পারে, না দিতেও পারে। কিন্তু স্বাধীনতার দিকে দেশকে এগিয়ে দিয়ে যাবে। তাদের ত্যাগ ব্যর্থ যাবে না। তাদের মৃত্যু তাদের অমর করবে।" সৌম্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে।

জুলি ধৈর্য ধরতে নারাজ। "স্বাধীনতা আমরা অবিলম্বে চাই। তার জন্যে যদি গুলীর বদলে গুলী চালাতে হয় তাও সই। পড়ে পড়ে মার খাব কেন? আমরাও মারব।"

সৌম্য তাকে শান্ত করার জন্যে বলে, "গান্ধীজীও অবিলম্বে স্বাধীনতা চান। তিনি তো নিজেকে দস্তুরমতো ঘৃণা করেন।"

"কেন? ঘৃণা করেন কেন?" জুলি আশ্চর্য হয়।

"দেশকে স্বাধীন করতে বেরিয়েছেন বাইশ বছর আগে। এখনো সিদ্ধিলাভ করেননি। দোষটা তিনি নিজের গায়েই টেনে নিচ্ছেন। তাঁর মতো অধীর আর কে? তাঁর মতো প্যাশন আর কার?" সৌম্যও তাঁর মতো।

"বাব্বা! বাইশ বছর! বাইশ বছরে আমিও তো বুড়ী হতে চললুম। গান্ধীজীর জানা উচিত যে এই তাঁর শেষ চান্স। হয় করতে হবে, নয় মরতে হবে। এবার ব্যর্থ হলে আর বেঁচে থাকা বৃথা। নেতৃত্ব হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। এক অকৃতকার্য, অথর্ব বৃদ্ধকে দেশ আর সহ্য করবে না।" জুলি চরমপত্র দেয়।

সৌম্য আহত হয়ে বলে, "নেতৃত্ব কি তিনি কারো হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন যে আর কেউ তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেবে? তোমরা নেতৃত্বের উপর জোর না দিয়ে নীতির উপর জোর দাও। তা হলে দেখবে ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে — যাকে মহাদেশ বললেও চলে — জনগণকে জাগানোই হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ। জনগণ যদি উদাসীন থাকে তবে সিপাহী বিদ্রোহও নিষ্ফল। যেখানে সিপাহীরাও উদাসীন বা বিদেশীর অনুগত সেখানে কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর গেরিলা লড়াই বিভীষিকা উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন দখল করতে পারে না। কলকাতার মসনদও না। আর এলোমেলো সন্ত্রাসবাদ তো কেবল শহীদ সৃষ্টি করতে পারে, তাও সারা দেশে সহস্রাধিক নয়। শেষ পর্যন্ত জনগণের সুপ্ত শক্তির দ্বারস্থ হতে হবেই। সেই শক্তি যখন সমগ্রভাবে জাগ্রত হবে তখন তার পরিচালনার ভার একমাত্র গান্ধীজীই নিতে পারেন, আর কেউ নয়। আর তাঁর সংগ্রামের ধারা অহিংসই

হবে, আর কিছু নয়।"

জুলি উত্তেজিত হয়ে বলে, "মোহ! মোহ! মোহনদাসের মোহ। কোটি কোটি লোক যদি কোনোদিন জাগে তবে অহিংসার বাণী শুনবে না, যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে ছুটে আসবে। দা, কাটারি, কুড়ুল, কাস্তে, কোদাল, শাবল, গাঁইতি, দুরমুস, লাঠি, সড়কি, বল্লম, তীর ধনুক, ছুরি, ছোরা, খাঁড়া। মশাল হাতে যারা আসবে তারা আপিসে আদালতে আগুন ধরাবে। গাঁইতি হাতে যারা আসবে তারা রেল লাইন ওপড়াবে। বাগানের কাঁচি হাতে যারা আসবে তারা টেলিগ্রাফের তার কাটবে। কোথায় এত পুলিশ, কোথায় এত সিপাহী যে সব জায়গায় হাজির হবে, সব্বাইকে ঠেকাবে? ওদেরও তো দেশপ্রেম আছে। সেটুকুও কি এতদিনে জন্মায়নি? জনগণকে যদি ডাক দাও অহিংসার মন্ত্র আওড়াতে যেয়ো না। অহিংসা পরমো ধর্মঃ কে না জানে। তিন হাজার বছর ধরে শুনে এসেছে। মানেও খুব। গোমাতার বেলা। অনেকে আবার মাছমাংসের বেলাও। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের বেলা নয়। বিদ্রোহের বেলা নয়।"

"গান্ধীজী কি তাঁর দেশের লোককে চেনেন না?" সৌম্য নরম স্বরে বলে। "তাঁর চেয়ে বেশী চেনে কে? তিনি যে কেবল আদর্শবাদী তা নয়। তিনি বাস্তববাদীও। অসামরিক হিংসা খড়ের আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠে দপ করে নিবে যায়। তার পেছনে না থাকে শৃঙ্খলা, না থাকে তালিম। একটা গ্রামে মেশিন গান চললে দশখানা গ্রামের লোক উধাও হয়। কেন সরকারকে মেশিন গান চালানোর প্ররোচনা দেওয়া? তোমাদের বড়ো জোর কয়েকটা হাত বোমা আছে, রিভলভার আছে, রাইফেল আছে। কিন্তু ওদের আছে আকাশ থেকে বর্ষণ করবার মতো বোমা। কামান থেকে নিক্ষেপ করবার মতো গোলা। ঘোড়ার উপর চড়ে চড়াও হওয়ার জন্যে বেয়োনেট। এসব কথা চিন্তা করেই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন অহিংসার। যেটা তিনি প্রয়োগও করেছেন হাতে কলমে। সাধারণ লোকদের নিয়ে। প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায়, পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। এটা দপ করে জ্বলে উঠে দপ করে নিবে যায় না। তুষের আগুনের মতো দীর্ঘ কাল জ্বলতে থাকে। একে কেউ জোর করে নিবিয়ে দিতে পারে না। অধিকাংশের বেলা একটু একটু করে নিবে যায়। কিন্তু সকলের বেলা নয়। সত্যিকারের গান্ধীশিষ্যরা তাঁদের অন্তরের আগুন আহিতাগ্নির মতো সযত্নে রক্ষা করেন। তাঁদের কাছে দশ বিশ বছর কিছু নয়। তাঁরা যেন বীজধান। যা ভবিষ্যতের জন্যে তোলা থাকে। প্রয়োজনের সময় বোনা হয়। মার্কসবাদের মতো গান্ধীবাদও একটা তত্ত্ব। তত্ত্ব বিনা বিপ্লব হয় না, সেটা সহিংসই হোক আর অহিংসই হোক। তাত্ত্বিক ভিত্তি পাকা না করে যারা বিপ্লবের আসরে নামে তারা নাটক করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসটা তো নাটক নয়। তারা অ্যাডভেঞ্চার করতে পারে, কিন্তু রেভোলিউশন তো অ্যাডভেঞ্চার নয়। তুমি তোমার জনতাকে নিয়ে যেটা করতে চাইছ সেটা একপ্রকার জ্যাকেরি। সেটারও মূল্য আছে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পরিণাম দেখে মার্কসবাদীদের শিক্ষা হয়েছে যে জ্যাকেরি দিয়ে বিপ্লবের ফল পাওয়া যায় না। তোমাদেরও সেই শিক্ষা হবে, জুলি, যদি তোমরা ফরাসী বিপ্লবের পথ ধরো। আমরা কিন্তু আমাদেব তাত্ত্বিক ভিত্তি ত্যাগ করতে পারিনে। জনগণকেও জাগাতে হবে, অহিংসাকেও কাজে লাগাতে হবে। এটা একপ্রকার ক্ষুরধার পন্থা। এ পথে ফরাসীরা বা রাশিয়ানরা চলেনি। চলেননি আমাদের পূর্বপুরুষরাও। আমরাই দুর্ভেদ্য অরণ্যে পথ কেটে চলেছি। তুমি কি সঙ্গী হবে আমাদের?"

"তোমাদের নয়, তোমার। শুধু তোমারই। এর জন্যে আমি কতকাল থেকে অপেক্ষা করে আছি বলো তো? তুমি যদি আমাকে আজ এখনি তোমার সঙ্গিনী হতে ডাকো আমি আজ এখনি সাড়া দিতে রাজী। তা কি তুমি করবে? তোমার সেই ব্রতে বাধবে?" জুলি সতৃষ্ণভাবে তাকায়।

"আমাদের আশ্রমে তোমাকে মানাবে না, জুলি। আর আমাদের জেলার উপর জাপানী আক্রমণের খাঁড়া ঝুলছে। তোমাকে আমি বাঁচাব কী করে? তোমার প্রাণ আর মান দুই বাঁচাতে হবে। বিশিষ্ট নাগরিকরা তাঁদের স্ত্রীকন্যাদের পদ্মার এপারে পাঠাচ্ছেন। তোমাকে আমি অযথা সে রকম বিপদের

সম্মুখীন হতে দেব না। এটা সংসারধর্মের সময় নয়। ঘোরতর সংঘর্ষের সময়। যতদূর দেখতে পাচ্ছি সংঘর্ষটা ত্রিকোণ। জাপানীদের সঙ্গে ইংরেজদের, ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের, ভারতীয়দের সঙ্গে জাপানীদের। গান্ধীজী চেষ্টা করছেন এটাকে এককোণ করতে। জাপানীদের আক্রমণের পূর্বেই ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘর্ষ শুরু ও শেষ হয়ে যাবে। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘর্ষ যাতে না বাধে তার জন্যে তিনি প্রাণপণ করবেন। যদি ইংরেজরা আগে থেকে বাধিয়ে না থাকে। বুঝতে পারছি তো, ভারতের ইতিহাসে এমন এক সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসেনি। আমরা ইতিহাস রচনা করতে চাই। জীবন্ত ইতিহাস। হ্যাঁ, তুমিও করবে আমার সঙ্গে। কিন্তু আপাতত পৃথক থেকে। আগে তো এ পালা সাঙ্গ হোক। পালাবদলের পর মালাবদল। কী বলো, লক্ষ্মীটি? পারবে না সবুর করতে?" সৌম্য জুলির হাতে হাত মেলায়।

"পারব, যদি তোমরা এই পালা এই বছরেই সাঙ্গ করো। হঠাৎ একটা ঝড় তুলতে হবে। তিন চার মাস ধরে ঝড় বয়ে যাবে। ফরাসী বিপ্লবের দিন যাকে জাকেরি (Jacquerie) বলা হতো তা ছাড়া আর কী হতে পারে এদেশে এখন? হতে পারত রুশ বিপ্লবের দিন যা হয়েছিল, যদি বাবলীরা আমাদের সঙ্গে থাকত। কিন্তু ওরা তো জনযুদ্ধের নেশায় মেতেছে। যার মধ্যে না আছে জন, না আছে যুদ্ধ। আছে শুধু প্রোপাগাণ্ডা। যে দায় আমাদের উপর বর্তেছে ওরা তার দায়িত্ব নেবে না। ওদের মতে এটা নাকি বিপ্লবের উপযুক্ত পরিস্থিতি নয়। আমরা নাকি ভ্রান্ত । ওরাই অভ্রান্ত।" জুলি উপহাস করে।

"ওদের দিক থেকে ওরা অভ্রান্ত বইকি। রাশিয়া যদি হেরে যায় বিপ্লবের উপর প্রতিবিপ্লব জয়ী হবে। বাবলীরা বাঁচবে কিসের আশায়? ওরা যে ইংরেজের পেছনে দাঁড়িয়েছে এর কারণ ইংরেজরা রাশিয়ার পেছনে দাঁড়িয়েছে। তোমার মনে লাগছে, কারণ বাবলীও একজন বিপ্লবী নায়িকা। আমি কিন্তু ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। ওরা যদি আমাদের সংগ্রামে যোগ দিত তবে এটাকে ওরা শ্রেণীসংগ্রামে রূপান্তরিত করত। আমরাই বোকা বনে যেতুম। আমরা তোমাদের জাকেরি সহ্য করতে পারি। নিন্দুকরা বলবে আমরা অহিংসক হয়ে হিংসার প্রশ্রয় দিচ্ছি। সে নিন্দা আমরা বহন করতে পারব। তাতে তো আমাদের সংগ্রাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। তার জাতীয়তাবাদী চরিত্রও অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে তোমরা যদি বোমা, রিভলভার নিয়ে সংগ্রামে নামো আমরা তৎক্ষণাৎ সংগ্রাম বন্ধ করে দেব। যে ভায়োলেন্স স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত সে ভায়োলেন্স আমরা ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু যে ভায়োলেন্স পূর্বকল্পিত, যেটা সুসংগঠিত সে ভায়োলেন্স আমরা সহ্য করব না। সেটাই যদি তোমাদের পছন্দ হয় তবে তোমাদের আলাদা হয়ে যেতেই হবে, জুলি।" সৌম্য কঠোর স্বরে বলে।

"তা হলে তুমি আমাকে জোন অভ্ আর্ক হতে দেবে না? আমার ছেলেবেলার সাধ কোনোকালেই মিটবে না?" জুলি অভিমানে ঠোঁট উলটিয়ে বলে, "এখন বুঝতে পারছি কেন জোন বিয়ে করেননি। বিয়ে করলে তো ওর স্বামী ওকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিশতে দিতেন না। কিন্তু তোমাকে আমি নোটিস দিয়ে রাখছি, সৌম্য, বিয়ের আগে আমি দরকার দেখলে গেরিলা বাহিনী গঠন করব। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই তো কী হয়েছে? ডেভিডের হাতে কী ছিল? গোলিয়াথকে সে মারল কী দিয়ে? গুলতি দিয়ে! তুমি ভাবছ গুলীর সঙ্গে গুলতি পেরে উঠবে কেন? ওদের আমরা গুলী চালাতে বাধ্য করব। এইখানেই আমাদের জিৎ। কাগজে লিখবে, গুলতি বনাম গুলী। দারুণ লড়াই। তুমি হাসছ যে! আমার গেরিলা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হবে? আমি ধরা পড়ব, ধর্ষিতা হব? তা শুনে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না? হা অদৃষ্ট!"

"যাক, ওসব বিশ্রী কথা মুখে আনতে নেই। মনে যদি সে রকম শঙ্কা থাকে তবে ও পথে যেয়ো না। জোন অভ্ আর্ককে তো ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। বীরাঙ্গনা বলে স্বীকার করতে কয়েক শতাব্দী লেগে গেল। সন্ত বলে সম্মান করতে আরো কয়েক শতাব্দী। তোমার যদি সন্ত জুলি হবার সাধ থাকে তবে তুমি ও পথে যেতে পারো, কিন্তু তোমার গেরিলা বাহিনীর জওয়ানদের তুমি কী সান্ত্বনা

দেবে? তারাও কি বীরপুরুষ বলে স্বীকৃতি পাবে? গেরিলা নামটার একটা মহিমা আছে। কিন্তু অবোধ দেশবাসী ওদের গরিলা ঠাওরাবে। ওরাও যে চাঁদা তুলতে গিয়ে জোর জবরদস্তি করবে না তা নয়। ডাকাতিও করতে পারে। রোজকার খোরাকটি না জুটলে কোনো বাহিনীই যুদ্ধে নামে না। খোরাক ফুরিয়ে গেলে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়। তখন ওরা যুদ্ধবন্দী বলে খোরাক আশা করতে পারে। তোমার গেরিলা বাহিনীও পেটের জ্বালায় আত্মসমর্পণ করতে পারে তারপরে বন্দীশিবিরে গিয়ে খোরাক পাবে। কিন্তু খোরাকের বিনিময়ে খাটুনি জোগাতে হবে। খাটুনি থেকে তুমিও যে রেহাই পাবে তা নয়। অন্যান্যবার পেয়েছ। সেটা তোমার বাবা সিভিল সার্জন ছিলেন বলে। আর তাঁর প্রথম মহাযুদ্ধের রেকর্ড প্রশংসনীয় ছিল বলে। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে সে সুবিধাটুকু তুমি হারাবে। আরো ভয়ের কথা তোমার গেরিলা বাহিনীকে জাপানের পঞ্চম বাহিনী বলে চিহ্নিত করা হবে। মিলিটারি ট্রাইবিউনালে তোমাদের বিচার হবে। সাজা কেমন হবে তা কি তুমি কল্পনা করতে পারো না? এক যদি ইংরেজরা জাপানীদের কাছে হেরে যায় তবেই তোমাদের রক্ষে। কিন্তু কয়েকটা প্রদেশ থেকে সরে যাওয়াই তো আখেরে হেরে যাওয়া নয়। ওরাও তো পাল্টা আক্রমণ করতে পারে। ওদের কাছে জাপানীরা হেরে যেতেও তো পারে। তোমার পক্ষে সব চেয়ে যেটা খারাপ সেটাই ভেবে নিয়ে তোমাকে সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে হবে। ঝাঁপ যদি না দিলেই নয়। আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে। এটা আমার পক্ষে অ্যাডভেঞ্চার নয়। আমার তত্ত্বের প্রয়োগ। আমি অহিংসাবাদী। লোকে যাকে বলে গান্ধীবাদী। তোমার বেলা সে যুক্তি খাটে না। তুমি গান্ধীবাদীও নও, মার্কসবাদীও নও। দেশকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসাই তোমাকে জোনের মতো হতে প্রেরণা দিচ্ছে। তোমার তাত্ত্বিক ভিত্তি দুর্বল। তোমার সাংগঠনিক শক্তিও অপরীক্ষিত। অর্থবল না থাকলে তুমি দেবী চৌধুরানীর মতো দস্যুরানীও হতে পারো।" বলতে বলতে সৌম্যর কণ্ঠরোধ হয়।

"বিয়ে করে আমি চৌধুরানী হতে পারি, তা বলে দেবী চৌধুরানী হতে যাব কোন্ দুঃখে? নহি দেবী, নহি আমি সামান্যা মানবী। আমি মঞ্জুলিকা, আমি স্বাধীনা রমণী। খুনখারাপি করব না, চুরিডাকাতি করব না, কিন্তু যদি বিয়ে করো তবে তোমাকে আমি সারাজীবন জ্বালাব। তুমি হবে শিবতুল্য পুরুষ আর আমি হব শ্যামাতুল্য নারী। নৃত্যপরা রণরঙ্গিণী। পতি যার চরণতলে। সীতা সাবিত্রীর মতো ওটাও কি সনাতন ভারতীয় আদর্শ নয়? উমানাথ শঙ্কর কেন, শ্যামানাথ শঙ্কর কেন নয়?" জুলি সকৌতুকে সুধায়।

সৌম্য হো হো করে হেসে ওঠে। "নটরাজ শিব কি শুয়ে শুয়ে তাণ্ডব নাচ নাচেন? শ্যামা তাঁর তাণ্ডব সহচারী হতে পারেন। সেই অর্থে তিনি শ্যামানাথ শঙ্কর। কিন্তু সেটা বোধ হয় তোমার স্বপ্নের সঙ্গে মেলে না। তুমি চাও শিবতুল্য নয়, শবতুল্য পুরুষ।"

জুলির জানা ছিল, কিন্তু খেয়াল ছিল না যে নটরাজও শিবের অন্য এক রূপ। তাঁর তাণ্ডব নৃত্যের কাছে আর কার নৃত্য লাগে! কিন্তু সৌম্য হবে নটরাজ শিব! ভাবা যায়!

"তোমার নটরাজ মূর্তি দেখলে তো আমি ধন্য হই, সৌম্য। সামনে যা আসছে তা প্রলয়ের দিন। যুদ্ধ আর বিদ্রোহ আর বিপ্লব যেন তিন মহানদীর মতো ছুটে আসছে ত্রিবেণীতে একাকার হতে। এমন দুর্যোগও আর আসবে না, এমন সুযোগও আর মিলবে না। তোমরা যদি নটরাজ শিবের মতো আত্মহারা হয়ে তাণ্ডব নাচ নাচো তা হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে কালভৈরবের মতো তাল রেখে নাচব।" জুলি অঙ্গীকার করে।

"না, না, তোমাকে লক্ষ্মী মেয়ের মতো আত্মসংবরণ করতে হবে। আমাদের আসন্ন সংগ্রামে মেয়েদেরও একটা ভূমিকা থাকবে, কিন্তু আমরা চাইনে যে তোমরা নিহত বা ধর্ষিত বা লাঞ্ছিত হও। তেমন কিছু হলে আমাদের মনের জোর কমে যাবে। শত্রুপক্ষ আমাদের মনের জোর ভাঙবার হাতল

পাবে। তবে ইংরেজরা সাধারণত মেয়েদের গায়ে হাত দিতে সঙ্কোচ বোধ করে। ওদের শিভালরিতে বাধে। তোমরা ওদের শিভালরির উপর নির্ভর করতে যাবে কেন? তা হলে তো ওদের মহত্ত্বই জয়ী হবে। ওদের মধ্যে দুর্জনও তো আছে। ওরা যদি তাদের সংযত করতে না পারে তবে অযথা একটা জাতিবৈর সৃষ্টি হবে। ওদের প্রলোভনে ফেলা আমাদের সংগ্রামের অঙ্গ নয়। আর ওদের সৈন্যদলে যেসব ভারতীয় আছে তাদের কাছে যে তোমরা মা বোনের মর্যাদা পাবে সে বিষয়ে কি তোমরা নিশ্চিত? গণ সত্যাগ্রহে নারীদেরও যোগদানের অধিকার আছে। না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না। তবু যেখানে নারীর মর্যাদার প্রশ্ন সেখানে সতর্কতারও প্রয়োজন। আমি তো কোনো মেয়েকে বলতে পারব না যে সঙ্গে পটাসিয়াম সায়ানাইড রাখবে। দুঃশাসনের কবলে পড়লে অমনি মুখে পুরবে। আমি বলব তেমন পরিস্থিতি এড়াতে।" সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে।

জুলি ক্ষেপে যায়। "এই তোমাদের অহিংসা। তোমরা নরহত্যা করতে বারণ করবে, কিন্তু নারীকে বলবে আত্মহত্যা করতে। সেটা কি নারীহত্যা নয়? জওহর ব্রত করে রাজপুত নারীরা আগুনে ঝাঁপ দিলে তোমরা তাদের বন্দনা গাইবে। আমাদের ভুলিয়ে দেবে যে সেটাও নারীহত্যা। সহমরণ যে নারীহত্যা সেটা বোধহয় রাজা রামমোহনের আগে কারো ঘটে উদয় হয়নি। পণযৌতুক জোগাতে না পেরে কত মেয়ে যে আত্মহত্যা করেছে সেও কি আরেক রকম নারীহত্যা নয়? নারীকে আত্মহত্যার পরামর্শ দেওয়াও আইনের চোখে অপরাধ। এই একটা ভালো আইন করেছে ওরা, ওই ইংরেজরা। সত্যি, এদেশের নারীদের জন্যে ওরা যা করেছে তা আর কে কবে করেছে? ওরা যদি সহায় না হতো রাজা রামমোহন বা বিদ্যাসাগর বা কেশবচন্দ্র একা কী করতে পারতেন? মা যখন আমাকে একথা বোঝান তখন আমি বিনা বাক্যে মেনে নিই। আমার কথা যদি বলো আমি বরং সঙ্গে ছুরি রাখব, তা দিয়ে ধর্ষকের চোখ বিঁধব, তবু পটাসিয়াম সায়ানাইড খাব না। হবে তো কারাদণ্ড। প্রাণদণ্ড তো নয়। ইজ্জৎ বজায় রেখে জেল খাটতে আমি রাজী। নরহত্যায় আপত্তি আছে, বেশ। নরহত্যা নাই বা করলুম। কিন্তু নারীহত্যাই বা নিজের হাতে নিজে করব কেন? অহিংসা বলতে কি আত্মহিংসাও বোঝায়?"

এ এক দারুণ প্রশ্ন। সৌম্য জুলির চোখে চোখ রেখে বলে, "নহ তুমি সামান্যা মানবী। একদিন মহাত্মার সামনে তোমাকে নিয়ে যাব, তুমি সেকালের গার্গী মৈত্রেয়ীর মতো দুরূহ সব প্রশ্ন করে তাঁকে বিষম সঙ্কটে ফেলবে। তোমাকে আমি তোমার নিজের শুভবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেব, জুলি। স্বামীগিরি ফলাব না। তুমিও আমাকে আমার শুভবুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়ো। না, আমি কোনো অবস্থাতেই নরহত্যা করব না। করলে আমার সমস্ত থীসিসটাই কেঁচে যাবে। আমি কি কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেই লড়ছি? আমার লড়াই সব দেশের মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের সঙ্গে। স্বাধীন ভারতও যদি সেই ব্যাধিতে ভোগে তার সঙ্গেও আমি লড়ব। বেঁচে থাকলে এইসব লড়াইতেই আমার জীবন কেটে যাবে। আমার কি নির্বিরোধে ঘরসংসার করার জো আছে? তুমি আমাকে ঘর দিতে পারো, সন্তান দিতে পারো, আমার বংশে বাতি জ্বালাতে পারো, কিন্তু আমার বিবেককে শান্তি দেবে কী করে, আমি যদি একটার পর একটা লড়াইতে জড়িয়ে না পড়ি? আমার প্রাত্যহিক জপ হচ্ছে, শান্ দাও আপনার আত্মায়, শান্ দাও, শান্ দাও অবিরাম। দেশের স্বাধীনতাই আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য নয়, যদিও এই লক্ষ্য ভেদ করতে গিয়েই আমার জীবন শেষ হতে পারে। তুমি যার সঙ্গিনী হতে যাচ্ছ সে কি তোমাকে সুখী করতে পারবে? তুমি তাকে সারাজীবন জ্বালাবে, না সে-ই তোমাকে সারাজীবন জ্বালাবে? কে যে কার চরণতলে লুটিয়ে থাকবে তা এক হাস্যকর প্রহেলিকা। তবে আমি তোমাকে লক্ষ্মী দেখতেই ভালোবাসি, কালী দেখতে নয়। এটা বোধহয় পুরুষমাত্রেরই স্বভাব। কস্তুরবা রণরঙ্গিণী হলে গান্ধীজী কি মহাসত্যাগ্রহী হতে পারতেন? কিন্তু তোমাকে আমি কস্তুরবা হতে বলব না। তুমি তুমি।"

জুলি অভিভূত হয়ে বলে, "তুমি তুমি। তুমি নরোত্তম।" সহসা সৌম্যর ধরে থাকা হাতখানি

তুলে নিয়ে মুখে ছোঁয়ায়।

তখন সৌম্যকেও জুলির ধরে থাকা হাতখানি তুলে নিয়ে একই মুদ্রায় প্রতিদান দিতে হয়। সে সুদ সমেত শোধ করে। আরেকখানি হাতে আরেকটি চুম্বন।

জুলি হেসে ওঠে। " তা হলে আমিও তোমার অনুসরণ করি।"

তারপর চোখের জল মুছে বলে, "শুধু আজ নয় সারাজীবন।"

নেপথ্যে জুলির মা নজর রেখেছিলেন। তাঁর নীতি হলো, 'দাস্ ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার।' এইপর্যন্ত, এর পর আর নয়। খানাকামরায় একটা ঘণ্টা ছিল। সেটা বাজলে বুঝতে হয় যে খানা তৈরি। সেটা বেজে ওঠে।

খাবার টেবিলে বসে মা বলেন মোলায়েমভাবে, "এখন তো আমি তোমাদের দু'জনের মা। আমার কথা মন দিয়ে শোন।"

শোনবার জন্যে দু'জনেই উৎকর্ণ। আবার এক কার্টেন লেকচার।

"আমি রাজনীতি বুঝিনে। তবে বয়স তো হয়েছে। তোমাদের মতো ছেলেমানুষ তো নই। ইংরেজকে তোমরা যত তুচ্ছ মনে করো সে তত তুচ্ছ নয়। আর জাপানীকে তোমরা যত উচ্চ মনে করো সেও তত উচ্চ নয়। জাপানকে তো আরো একটা ফ্রন্টে লড়তে হচ্ছে। সেটা আমেরিকান ফ্রন্ট বা প্যাসিফিক ফ্রন্ট। তার এত বল কোথায় যে সে ইংরেজের হাত থেকে ভারতকে কেড়ে নেবে? আর ওদের দু'পক্ষের কাড়াকাড়ির মাঝখানে ঝাঁপ দিয়ে তোমরাই বা ঘোলা জলে মাছ ধরতে যাচ্ছ কোন্ হিসাবে? ওদের যেটা দুর্যোগ তোমাদের সেটা সুযোগ। এটা কি একটা সুযুক্তি, না একটা দুর্বুদ্ধি? সেই যে বলে, চাষী, এইবেলা নে ঘর ছেয়ে!" মা সেটা মনে করিয়ে দেন।

সৌম্য নীরবে শুনে যায়। জুলিই উত্তর দেয়। "চাষী, এইবেলা নে ঘর ছেয়ে, একথা যারা বল্বে, তারাই আবার একথাও বলে যে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। লড়াই করবে ইংরেজ আর জাপানী, প্রাণ যাবে বাঙালীর! কেউ মরবে বিমানের বোমায়, কেউ মরবে কামানের গোলায়, কেউ মরবে খোরাকের বিনাশে, কেউ মরবে ঘরবাড়ীর ধ্বংসে। এতে লাভটা হবে কার? যুদ্ধে জিতে ইংরেজ তো আরো দু'শো বছর খুঁটি গেড়ে বসবে। কী করে তুমি হটাবে ওদের? না তুমি চাও ওরা হিমালয়ের মতো অটল হয়ে বিরাজ করুক অনন্তকাল? আমার জন্মের আগে থেকেই আমাদের দেশের নেতারা দাবী করেছেন যে স্বরাজ আমাদের জন্মস্বত্ব। আমরা তো নতুন কোনো দাবী করছিনে। ইংরেজরা যদি এটা সময় থাকতে মেনে নিত তা হলে তো কেউ বলত না, চাষী, এইবেলা নে ঘর ছেয়ে। জাপানীরা যে বার্মা দখল করেছে এটা কি ইংরেজের দোষে না আমাদের দোষে? ওরা যদি এর পর পূব বাংলা দখল করে নেয় সেটাও কি ইংরেজের দোষে না আমাদের দোষে? আমরা যদি উলুখড়ের মতো মরতে না চাই, সময় থাকতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, করি না হয় মরি, সেটা কি ইংরেজের দুর্যোগের অন্যায় সুযোগ নেওয়া, না আমাদের দুর্যোগের ন্যায্য প্রতিবিধান করা? ওরা বলবে এটা পলিটিকাল অপরচুনিজম। আমরা বলব তোমরা মালয়ীদের মতো, বর্মীদের মতো, আমাদেরকেও নেকড়ের মুখে ফেলে দৌড় দেবে, সেটাও কি মিলিটারি অপরচুনিজম নয়? চাচা, আপনা বাঁচা এই যাদের যুদ্ধের নীতি তারা কোন্ মুখে আমাদের দোষ ধরবে? না, মা, আমরা সুবিধাবাদী নই। আমরা সংগ্রামে নামব না, যদি মিটমাট হয়ে যায়।"

।। পনেরো ।।

একদিন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার জন্ম মৃত্যু বিবাহের কলমে এনগেজমেণ্টের নিচে চৌধুরী ও সিন্হা দেখে মানস কৌতূহলি হয়। তার পর চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে সহর্ষে চিৎকার করে, "জুই! জুই!

অসম্ভব! অলৌকিক! এ কখনো সত্য হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি করো? করো তো এক্ষুণি মিষ্টির অর্ডার দাও।"

যূথিকা কাগজখানা কেড়ে নিয়ে চোখ বুলিয়ে বলে, "ওমা, আমি কোথায় যাব! সৌম্য চৌধুরী আর মঞ্জুলিকা সিন্‌হা। এ রকম মানিকজোড় কি দুনিয়ার আর একটি আছে? ওরাই। ওরাই। আমার মন বলছে ওরাই। হি হি হি হি। কী আনন্দ! কী আনন্দ! মিষ্টি পরে হবে 'খন। এই মুহূর্তেই একটা গ্রীটিংস টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও।"

"একটা নয়, দুটো। দুই ঠিকানায়। সৌম্যদা কি এতদিন কলকাতায় বসে আছে? নিজের আশ্রমে ফিরে গিয়ে সংগ্রামের জন্যে তৈরি হচ্ছে। ওর সামনে আরো একটা এন্‌গেজমেণ্ট। সেটা মৃত্যুর সঙ্গে। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।" মানস গম্ভীরভাবে বলে।

তার মনে পড়ে যায় যে এই পদটি সে তার ছেলেবেলার এক পুরস্কার সভায় উচ্চারণ করেছিল। তার উপর বরাত দেওয়া হয়েছিল টেনিসনের 'চার্জ অভ্ দ্য লাইট ব্রিগেড' আবৃত্তি করে শোনানোর।

"Theirs not to reason why.

Theirs but to do or die".

তা শুনে যূথিকা বলে, "গান্ধীজী দেখছি টেনিসনের কাছ থেকে ওটা পেয়েছেন। তা হলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে টেনিসনের দান আছে। কিন্তু ভাবতেই পারা যায় না যে লাইট ব্রিগেডের মতো সৌম্যদার দল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবে না। বেচারি জুলি পথ চেয়ে বসে থাকবে।"

"জুলিও তো একই পথের পথিক। যদিও অহিংসা মানে না। সেও করবে না হয় মরবে। বেঁচে থাকলে তো বিয়ে হবে! ভাবতে গেলে মনটা উদাস হয়ে যায়। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করা উচিত, কিন্তু না করলে মরা উচিত নয়। লাইট ব্রিগেডের যা কর্তব্য আর-সব সৈনিকেরও কি তাই কর্তব্য? লাইট ব্রিগেডে তো পাঁচশো না ছ'শো জন মাত্র সৈনিক ছিল। গান্ধীজী বলেছেন সরকারী কর্মচারীদের চাকরি ছাড়তে হবে না। স্বাধীনভাবে যে যার কর্তব্য সম্পাদন করবে, যেমন করতেন মহামতি রাণাডে। তিনিও বিচারপতি ছিলেন। নির্ভীক, স্বাধীনচেতা।" মানসেরও সেই আদর্শ।

"তোমার কাছে গান্ধীজী সেইটেই প্রত্যাশা করেন। একা একা পদত্যাগ নয়। কিন্তু তোমার যা স্বভাব। তুমি যুদ্ধের ঘোড়া। যুদ্ধ হচ্ছে শুনলে স্থির থাকতে পারবে না। গণ সত্যাগ্রহও তো একপ্রকার যুদ্ধ। যুদ্ধের মাঝখানে যুদ্ধ। এবার পোলাণ্ডে নয়, ফ্রান্সেও নয়, ভারতের পূর্বপ্রান্তে নয়, সব জায়গায়! কী করে, তুমি আপনাকে সামলাবে? আর আমিই বা তোমাকে সামলাতে পারব কী করে? সারা রাত জেগে বারান্দায় পায়চারি করবে। বাইরের লনেও। যুদ্ধের ঘোড়াকে আস্তাবলে বেঁধে রাখলে যা হয়।" যূথিকাও মানসের দশা দেখে মনে কষ্ট পায়।

মানস আত্মস্থ হয়ে বলে,"যুদ্ধের ঘোড়ার প্রাণের মায়া থাকে না। যার থাকে সে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া বা ঘোড়সওয়ারের ঘোরাফেরার ঘোড়া বা সওদাগরের মালবাহী ঘোড়া বা পশ্চিম দেশের চাষীর লাঙল টানা ঘোড়া। আমার প্রাণের ভয় আছে। আমার মতো লোকের জন্যে টেনিসনের 'ডু অর ডাই' বা মহাত্মার 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' নয়। যাদের জন্যে তারা ওই সৌম্যদা আর জুলি। সৌম্যদা তো বিশ বছর ধরে তালিম নিয়েছে। মাঝে মাঝে জেলে গিয়ে তার পরের ধাপটার জন্যে মনটাকে তৈরি করেছে। ওকেই বরং বলতে পারো যুদ্ধের ঘোড়া।"

"আর জুলি?" যূথিকার চোখে শঙ্কা।

"জুলির স্বামী বেঁচে থাকলে ও তোমারই মতো ঘরসংসার করত। মরণের মুখে পতঙ্গের মতো ছুটে যেত না। কিন্তু এ সংসারে কে আছে ওর, যার জন্যে ও বাঁচতে চাইবে? ওই সৌম্যদাই ওর একমাত্র স্বজন। সৌম্যদার যদি মরণ হয় জুলিরও সহমরণ হবে। ভগবান না করুন।" মানস তাড়াতাড়ি

জুড়ে দেয়।

"ভগবান না করুন।" যূথিকার চোখ ছলছল করে।

"তবে ওদের এনগেজমেন্টটা আশাপ্রদ। মরেঙ্গের আগে ওরা দু'বার ভাববে। করেঙ্গের বেলা ওরাও ভেবে চিন্তে করবে, যাতে মরেঙ্গে অনিবার্য না হয়। সৌম্যদা কখনও মানুষ মারবে না, এটা আমি লিখে দিতে পারি। কিন্তু জুলি যদি গুলী চালায় আমি আশ্চর্য হব না। ওর দাদারা সশস্ত্র বিদ্রোহে বিশ্বাসী। জওয়ানদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে। সেইসূত্রে অস্ত্র সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। জাপানীরাও অস্ত্র জোগাবে। এতদিনে কি আকিয়াব থেকে কক্স বাজারে হাতিয়ার এসে পৌঁছয়নি? অস্ত্রের জন্যে আজ আর জার্মানীতে বা জাপানে যেতে হয় না। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রয়োজন হয় না। জাপানীরা যদি সত্যি সত্যি চট্টগ্রাম অধিকার করে তো গোটা অস্ত্রাগারটাই জুলির দাদাদের। যদি না জাপানীরা বিরূপ হয়।" মানস সংশয় প্রকাশ করে।

"কেন? বিরূপ হবে কেন?" যূথিকা বিস্মিত হয়।

কারণ জাপানীরা তো ফিলানথ্রোপিস্ট নয়। যে ভুলটা দাদারা করেছেন। যে হাতিয়ার একদিন ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারা যাবে সে হাতিয়ার ওরা কি সহজে হাতছাড়া করবে? তার আগে ভালো করে বাজিয়ে নেবে কে আন্তরিকভাবে জাপানের শিবিরে, কে তা নয়। ওরাও হাড়ে হাড়ে সাম্রাজ্যবাদী। তাঁবেদার ছাড়া আর কাউকে ওরা অস্ত্র জোগাবে না। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা জাপানের সৌজন্যে হবার নয়।" মানস নিঃসংশয়।

যূথিকা আশ্চর্য হয়। "জুলিরা কি সেটা বোঝে না?"

"ওদের থীসিস হলো অস্ত্র বিনা স্বাধীনতা হয় না। আর অস্ত্রের জন্যে যদি শয়তানের কাছে যেতে হয় তো তাও সই। শয়তানের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে তাকেও কিছু দিতে হবে। শয়তান একদিন চেয়ে বসবে আমদানী রফতানীর অবাধ অধিকার। যেটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চেয়েছিল মীর জাফরের কাছে। তেমনি জাপানও আসবে বণিকের মানদণ্ড হাতে। দাদারা কি এটা বোঝেন না? বোঝেন ঠিকই। কিন্তু কী করবেন? ওঁদের থীসিস তো ওঁরা পাল্টাবেন না। পাল্টালে গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিতে হয়।" মানস একটু থেমে বলে, "আমি যতদূর বুঝি ওঁরা বসে আছেন জাপানীরা কবে আসবে তারই অপেক্ষায়। কিন্তু তিন মাস কেটে গেল জাপানীদের সাড়া শব্দ নেই। জাপানীরা কবে আসবে, আদৌ আসবে কি না কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। সুতরাং দাদারা আপাতত নিষ্কর্মা। করিৎকর্মা তা হলে কে? ঐ অহিংসাবাদী গান্ধী বুড়োই। উদ্যোগ যা নেবার উনিই নেবেন। ইনিশিয়েটিভ এখন ওঁরই হাতে। কংগ্রেসের জন্যে সবুর না করে উনি একাই এগিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে নেহরুকেও ডেকে নিয়ে বুঝিয়েছেন যে রুজভেল্টের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনো ফল নেই। চার্চিলের সুমতি হবে না। নেহরুও এখন একমত। এর পরে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাও একমত হবেন। পিছুটান যাঁদের আছে তাঁরা তো নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। তাঁরা পেছনে পড়ে থাকবেন। দুঃখ হয় রাজাজীর জন্যে। তিনি যে জেলকে ভয় করেন তা নয়। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস মুসলমানদের যদি পাকিস্তানের আশ্বাস দেওয়া হয় তবে তারা হিন্দুদের সঙ্গে মিলে ইংরেজদের উপর চাপ দেবে আর তাদের সেই মিলিত চাপের কাছে চার্চিল মাথা নত করবেন। তার মানে একদল যেমন জাপানীদের অপেক্ষায় নিষ্কর্মা হয়ে থাকবেন আরেকদল তেমনি মুসলমানদের অপেক্ষায়। পাকিস্তানের আশ্বাস পেলেই যে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজের উপর চাপ দেবে তেমন কোনো পূর্বলক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজরাও বলে রেখেছে যে কংগ্রেস লীগ একসঙ্গে চাইলেও তারা যুদ্ধকালে ক্ষমতার হস্তান্তর করবে না। যেখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই সেখানে পাকিস্তান মেনে নিয়ে লাভটা কী হবে? লীগপন্থীরা কি গণ সত্যাগ্রহে যোগ দেবে? চাপ আর কী ভাবে দিতে পারা যাবে? মাঝখান থেকে লীগপন্থী মুসলমানদেরকে কংগ্রেসপন্থী

মুসলমানদের উপর জিতিয়ে দেওয়া হবে। কংগ্রেস তার সুপরীক্ষিত মিত্রদের হারাবে। গণ সত্যাগ্রহে একটিও মুসলমান সহযোগী হবে না। গান্ধীজীর পক্ষে কত বড়ো ব্যর্থতা। কংগ্রেসের পক্ষে কত বড়ো দুর্বলতা।"

যূথিকা সব শুনে বলে, "জুলি যদি সশস্ত্র বিদ্রোহের অপেক্ষায় বসে থাকে তবে তাকেও নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে হবে। বাবলীর সঙ্গে ওর কোনো তফাৎ থাকবে না। এখন দেখা যাক জাপানীরা কী করে। যদি গান্ধীজীর আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে জাপানীদের আক্রমণ শুরু হয়ে যায় তবে কিন্তু জুলিই সকর্মক, যদিও অহিংসক নয়। জাপানীদের সাড়াশব্দ নেই বলে কি নির্বিকার থাকতে পারি? কলকাতা থেকে পলাতকের যাত্রা এখনো থামেনি। লোকে পা দিয়ে সরকারের বিপক্ষে ভোট দিচ্ছে। স্বয়ং লাটসাহেব হন্তদন্ত হয়ে জেলায় জেলায় প্রচারকার্য চালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই তো সেদিন আমাদের এখানেও সভা করে সবাইকে অভয় দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন মিস্টার হিটলার উইল বি সাউণ্ডলি ডিফিটেড। ওদিকে চার্চিলও বলছেন হিটলার ফার্স্ট। তার মানে হিটলার হেরে গেলে জাপানও হেরে যেতে বাধ্য। তখন বার্মা, মালয় ইত্যাদি ফিরে পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ভারতের একাংশ যদি বেদখল হয়ে থাকে তবে সে অংশও। কথা শুনে গা জ্বলে যায়। ভারতের একাংশ বেখদল হলে তোমরা তো পালিয়ে বাঁচবে, আমরা বাঁচব কী করে? সৌম্যদা তো কাসাবিয়াঙ্কার মতো মৃত্যুবরণ করবেই। যদি না এক হাতে জাপানীদের ঠেকায়, আরেক হাতে ইংরেজদের। জুলি যদি কলকাতায় বসে না থেকে সৌম্যদার সঙ্গে ওর কর্মস্থানে যেত তা হলেই জানতুম যে ও সত্যিকার সহধর্মিণী। কিন্তু তার জন্যে চাই শুধু এন্‌গেজমেন্ট নয়, বিয়ে। সেটা তো হচ্ছে না। এই যা দুঃখ।"

ইতিমধ্যে তিনজন মিলিটারি অফিসারও এখানে এসে সভা করে গেছেন। নেভীর প্রতিনিধিটি পশ্চিমা মুসলমান, আর্মিরটি শিখ, এয়ার ফোর্সেরটি পাঞ্জাবী হিন্দু। তাঁর মা বাঙালী। ছেলেমানুষ। তাঁকে দেখে যূথিকা বলে ওঠে, "বাচ্চা রে!" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গর্বও বোধ করে। 'বাঙালী নহে খর্ব।' তিন মূর্তিও অভয় দিয়ে গেলেন যে ভারত এখন লড়তে প্রস্তুত। বার্মার মতো অপ্রস্তুত নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান শিখ ভেদ নেই। অসামরিক জনগণ যেন পেছনে দাঁড়ান। হোম ফ্রন্ট মজবুত রাখেন।

ডিফেন্স বলতে এতকাল বুঝিয়েছে মিলিটারি ডিফেন্স। ইদানীং সিভিল ডিফেন্সেরও নাম শোনা যাচ্ছে। বিমান থেকে যখন বোমা পড়বে তখন সাধারণ পথচারীর জন্যে চাই নিরাপদ আশ্রয়। মাটি খুঁড়ে আশ্রয় বানাতে হবে। লণ্ডনের মতো শহরে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে আছে। বহু লোক তার প্ল্যাটফর্মে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। কলকাতায় তেমন কিছু নেই। সেখানে অন্য ব্যবস্থা। সাইরেন বাজলেই গর্তে ঢুকতে হবে। সাইরেন থামলে গর্ত থেকে বেরোনো চলবে। ইতিমধ্যেই কলকাতায় এয়ার রেডস্‌ প্রিকশনস বিভাগ সংগঠিত হয়েছে। সিভিল ডিফেন্স বলতে আরো কিছু বোঝায়। চোর ডাকাতের উৎপাত বেড়ে যেতে পারে। পথ ঘাট যখন অন্ধকার। ঘরে ঘরে নিষ্প্রদীপ। উৎপাত রোধ করার জন্যে পুলিশই যথেষ্ট নয়। হোম গার্ডস দরকার। কলকাতায় তার ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতার বাইরে বোমা বর্ষণের আশঙ্কা ক্ষীণ। তবু বলা তো যায় না। যুদ্ধ বেধে গেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। প্যানিক থেকেও নাগরিকদের রক্ষা করা চাই। সিভিক গার্ডস দরকার।

পুলিশ থেকে জজ সাহেবের কাছে অনুরোধ আসে। তিনি যেন সিভিল ডিফেন্সের জন্যে সভার সভাপতিত্ব করেন। মানস ভাবনায় পড়ে। নাগরিক হিসাবে এটা তারও কর্তব্য। সরাসরি 'না' বলতে পারে না। কিন্তু দেশের নেতারা যখন দেশের লোককে বলছেন সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের জন্যে তৈরি হতে তখন সরকার থেকে বলা হচ্ছে সিভিল ডিফেন্সের জন্যে তৎপর হতে। লোক কার কথা শুনবে?

"উলুখড়কে আত্মরক্ষা করতে বলবে এক বন্ধু। জাপানীদের হাত থেকে। আর উলুখড়কে আত্মসম্মান রক্ষা করতে বলবে আর এক বন্ধু। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে। দুই বন্ধুর মধ্যে

মনোমালিন্য দেখা দেবে না তো?" মানস সুধায় যূথিকাকে।

"আমি তো তার কোনো কারণ দেখছিনে। এটাও সিভিল ওটাও সিভিল। যারা আত্মরক্ষা করতে শিখবে তারাও এক হিসাবে সৈনিক হতে শিখবে। শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। গর্তে ঢুকলেও কয়েক মিনিট পরে গর্ত থেকে বেরিয়েও আসবে। আর যারা সত্যাগ্রহ করবে তারা তো অহিংসোবাদী সৈনিক ছাড়া আর কিছু নয়। তোমাদের দুই বন্ধুর কাজ পরস্পরবিরোধী হলে তো মনোমালিন্য দেখা দেবে।" যূথিকা আশ্বাস দেয়।

সভায় বেশ লোকসমাগম হয়েছিল। শোনা গেল সিভিল ডিফেন্সের জন্যে সময় দিতে পারেন এমন একদল নিষ্ঠাবান কর্মীর প্রয়োজন। আগুন লাগলে তাঁরা আগুন নেবাবেন, মানুষ জখম হলে বা মারা গেলে তাঁরা স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন, আত্মীয় স্বজনদের খবর দেবেন, এমনি অনেক রকম কর্মের ভার তাঁদের উপর বর্তাবে। যাঁরা কর্মী হতে পারবেন না তাঁরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। নিষ্প্রদীপের সময় একটি ঘরেও যেন আলো না জ্বলে।

মানসও সভার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর মেলায়। পালিয়ে গিয়ে ক'জন এত বড়ো একটা শহরকে খালি করে দিতে পারবে? বেশীর ভাগই তো নানা জীবিকায় নিযুক্ত। যারা পালিয়ে যাবে তাদের বাড়ীতেও কী আগুন লাগবে না? কে সে আগুন নেবাবে? তাদের সম্পত্তিও কি লুট হবে না? কে তাদের সম্পত্তি আগলাবে? এমনিতেই পুলিশের যথেষ্ট কাজকর্ম। পুলিশের উপর সিভিল ডিফেন্সের ভার চাপালে ওরা ওদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করবে কখন? পুলিশের থেকে আলাদা করে একটা সংগঠন থাকা উচিত। সেটা পাবলিকের আয়ত্তাধীন হলেই ভালো হয়।

পুলিশ সাহেব তো এতক্ষণ আকারে ইঙ্গিতে তারিফ জানিয়ে যাচ্ছি লেন। কিন্তু শেষের উক্তিটির বেলা তাঁর মুখভাবে আপত্তি ব্যঞ্জিত হয়। মানস তা অনুমান করে ভাষণ সংক্ষেপ করে। সভাভঙ্গের পর পুলিশ সাহেব এসে তার ভাষণের তারিফ করে বলেন, "পাবলিকের আয়ত্তাধীন মানে তো পলিটিসিয়ানদের আয়ত্তাধীন। আর পলিটিসিয়ান মানে তো কংগ্রেসম্যান। ওদের যা মেজাজ ওরা আমাদের ভারতছাড়া করবে। আমাদের জায়গায় যখন জাপানীরা এসে বসবে তখন নিজেরা কুকুরতাড়া হবে। ওদের ধারণা ওরা নাকি এক নেশন । হা হা হা হা। পেশওয়ারের পাঠান আর তামিল ব্রাহ্মণ এক আসনে বসে একই রকম খাদ্য খাবে! হো হো হো হো।"

পুলিশ সাহেব গান্ধীজীর মহত্ত্ব মানেন। "তাঁর সব ক'টা আইডিয়াই সঠিক কিন্তু তিনি দু'শো বছর আগে জন্মেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবেন। এ দেশটা তাঁর দেশ হতে পারে, এ যুগটা তাঁর যুগ নয়। এমন মানুষকে নিয়ে কী করা যায়, বলুন তো? ওঁকে জেলে পুরলে উনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। ওঁকে বাইরে রাখলে উনি বিদ্রোহের ডাক দেবেন। আপসের চেষ্টা কি কম হয়েছে? কিন্তু উনি চান পূর্ণ স্বাধীনতা। তাও আজ এক্ষুণি। জাপান ওদিকে ছোঁ মেরে কেড়ে নেবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে। তখন কোথায় ইণ্ডিয়ান নেশন, কোথায় তার প্রতিনিধিদের কংগ্রেস!"

মানস নীরবে শুনে যায়। বিদায়কালে জানায়, "আপসের চেষ্টা আরো একবার করতে হবে। আপনাদের আক্ষরিক অর্থে ভারত ছাড়তে কেউ বলছেন না। শুধু ছাড়তে বলছেন রাজক্ষমতা। বড়লাট যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, কিন্তু ব্রিটেনের রাজার মতো তিনি হবেন কনস্টিটিউশনাল হেড । যেমন কানাডায় বা অস্ট্রেলিয়ায়। এটা কি বেনজীর দাবী? জঙ্গীলাটকেও কেউ সরে যেতে বলছেন না, কিন্তু তাঁকে ব্রিটেনের মতো সিভিলিয়ান কন্ট্রোল মেনে নিতে হবে। কারণ জয়পরাজয়ের জন্যে জবাবদিহির দায় তো সিভিলিয়ান মন্ত্রীমণ্ডলের। তিনি যদি তাঁর বুদ্ধির ভুলে পরাজয় ডেকে আনেন সিভিলিয়ান মন্ত্রীদেরই তো দায়ী করা হবে। মনোনীত কাউনসিলারদের কোনো রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব নেই। কিন্তু নির্বাচিত মন্ত্রী তো আছে। মনোনীতদেব বদলে নির্বাচিতদের নিয়ে সবকার চালাতে হবে। কংগ্রেসের

দাবী বলতে এই। এর চেয়ে বেশী নয়, কমও নয়। ওঁরা যুদ্ধে সহযোগিতা করতে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন। জাপানীদের মোকাবিলা করতে ওঁরা সম্পূর্ণ রাজী। আপস করতে হলে আর কালবিলম্ব করা সমীচীন নয়। বিলম্ব দেখলে গান্ধীজী তাঁর শেষ চালটি চালবেন।''

পুলিশ সাহেব বলেন, ''যুদ্ধকালে ব্রিটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। করলে হেরে যেতে পারে। বৃথা আশা! বৃথা আন্দোলন। বৃথা ত্যাগস্বীকার। গান্ধী কি দেশটাকে জাপানের হাতে তুলে দেবেন বলে মনঃস্থ করেছেন? মিছিমিছি কতকগুলো মানুষকে জেলে পুরতে হবে। আমি দুঃখিত।''

''যদি কিছু না মনে করেন, দেশটাকে জাপানের হাতে তুলে দিচ্ছে কে? গান্ধী না ব্রিটিশ সরকার? বার্মায় কী দেখা গেল? জাপানীরা যদি আসে চট্টগ্রামে কী দেখা যাবে? মণিপুরে কী দেখা যাবে? আসামে কী দেখা যাবে? বার্মায় যেমন ক্ষমতার হস্তান্তর হলো ব্রিটিশেতে জাপানীতে, ভারতেও তেমনি ক্ষমতার হস্তান্তর হবে ব্রিটিশেতে জাপানীতে। তারপরে হয়তো পাল্টা আক্রমণ। হয়তো ক্ষমতার আবার হাতবদল, জাপানীতে ব্রিটিশেতে। সমস্তটাই ভারতের লোকের মাথার উপর দিয়ে। সে যা দুঃখ তার তুলনায় জেলখানার দুঃখ তো বিলাসিতা। সে যা ত্যাগস্বীকার তার তুলনায় এ ত্যাগস্বীকার তো যৎসামান্য। গান্ধীজী যদি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে আপনারা জাপানকে ভারতের এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেবেন না, ভারতীয়দের একজনকেও জাপানীদের হাতে সঁপে দেবেন না তা হলে তিনি কখনো আপনাদের যুদ্ধকালে বিব্রত করতেন না। শুধু সহযোগিতায় বিরত থাকতেন। সেটা তাঁর যুদ্ধকালীন নীতি। জাপানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ভারতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ভারতকে বিশ্বযুদ্ধে জড়িত করার প্রতিক্রিয়া যুদ্ধে অসহযোগ। ওটুকু তাঁর বিবেকের অনুশাসন।'' মানস ব্যাখ্যা করে।

পুলিশ সাহেব আমতা আমতা করে বলেন, ''যুদ্ধে অমন কত হাতবদল ঘটে। কোথাও কেউ প্রত্যেকটি ইঞ্চি রক্ষা করতে পারে না। যুদ্ধ জিনিসটাই ওই রকম। এর জন্যে ব্রিটিশকে দায়ী করছেন যাঁরা তাঁরা নিজেরাও দায়ী হতেন, যদি ক্ষমতার আসনে থাকতেন। তাঁরা যে নেই তার জন্যে আমি দুঃখিত। তবে আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে যুদ্ধের পর তাঁরা ক্ষমতার আসনে বসবেনই। আমরা নিজেরাই অনুভব করছি যে তাঁদের বাদ দিয়ে ভারত শাসন চলতে পারে না। প্রদেশে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন হয়েছে। কেন্দ্রেও হবে। সেটাই তো লজিকসম্মত পরিণতি। তার জন্যে আমরাও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছি।''

মানসও বলতে সাহস পায় না যে, যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত। কে জিতবে, কে হারবে তা নেতারাও জানেন না,মানুষ জানবে কী করে? অনিশ্চিতের উপর ভরসা রেখে নিষ্ক্রিয় থাকা যায় না। এটাই গান্ধীজীর আসল যুক্তি। কিন্তু এটা কি মুখ ফুটে বলতে আছে? ইংরেজমাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে আখেরে তার দেশ জিতবেই। মিস্টার হিটলার উইল বি সাউণ্ডলি ডিফিটেড। হিটলার ফার্স্ট। তারপরে মুসোলিনি ও তোজো। ইতিহাসে বরাবর যা হয়েছে এবারেও তাই হবে। ইংরেজরা ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র। ঠাট্টা করে বলা হয় ''দে উইল ফাইট টু দ্য লাস্ট ফ্রেঞ্চম্যান।'' টু দ্য লাস্ট ইণ্ডিয়ান। মানস মনে মনে জুড়ে দেয়।

পাবলিকের উপর আস্থা না থাকলে পাবলিকেরই বা আস্থা থাকবে কেন? সিভিল ডিফেন্স সাধারণের সহযোগিতা পায় না। উমাশঙ্কর সামন্ত বলে এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক বাস করেন। তিনি একাধারে রায় বাহাদুর তথা বিদ্যাবিনোদ। ''মহাভারতে দ্রৌপদীর ভূমিকা'' বলে তাঁর এক সন্দর্ভ তিনি মানসকে উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁকেই করা হয় সিভিল ডিফেন্সের কমাণ্ডান্ট। খাকি ইউনিফর্ম পরে তিনি প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে কুচকাওয়াজ করেন। বয়স যদিও ষাটের উপরে।

পুলিশ সাহেব তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন যে ভারতীয়রা এক নেশন। অথচ ওদিকে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট গঠনের তোড়জোড় চলেছে। নেশন কি তবে ভারতীয় নেশন নয়? তা হলে ভারতব্যাপী

তার প্রসার কেন? হিন্দু মুসলমান শিখ প্রভৃতি সবাইকে তার আহ্বান কেন? পেশাওয়ারের পাঠান আর তামিল ব্রাহ্মণ একই ফ্রন্টের সদস্য হয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে সমবেত হয় কেন?

একদিন ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের শাখা সংগঠন করতে কলকাতা থেকে সফরে আসেন মানসের সতীর্থ হিতেশচন্দ্র ভৌমিক। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি তাঁদের দেশরক্ষার ব্রতে ব্রতী করতে চান। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না। ইউনিফর্ম পরতে হবে না। মাঝে মাঝে প্রচার অভিযানে যোগ দিতে হবে। নৃত্যে গীতে চিত্রে নাট্যে ভাষণে নানা ভাবে দেশবাসীকে যুদ্ধোন্মুখ করতে হবে। দেশবাসীর মনের জোর বজায় রাখতে হবে। যুদ্ধকালে সিভিলিয়ান মরাল মিলিটারি মরালের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

"ইম্পিরিয়ালিস্ট ওয়ার ফ্রন্ট নয়, ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট।" ভৌমিক লক্ষ করতে বলেন। "এটা ইংরেজদের ব্যাপার নয়, আমাদেরই ব্যাপার। আমি আমার নেশনের কাজই করছি। আমি জাতীয়তাবাদী। সরকার এটা জানেন। জানেন বলেই আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। এটা জাতীয়তাবাদীদেরই সংগঠন। কিন্তু সাবধানে কাজ করতে হয়। পাছে লীগপন্থী মুসলমানরা বয়কট করে।"

"সাবধানে কাজ করা বলতে কী বোঝায়, ভৌমিক?" মানস প্রশ্ন করে।

"বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' নৈব নৈব চ। একটি পঙ্‌ক্তিও না। একটি পদও না। ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয়। জাতীয়তাবাদ থেকে বঙ্কিম বাদ। রবীন্দ্রনাথ নিয়েও যথেষ্ট দ্বিধা। 'জনগণমন অধিনায়ক' চলবে না। তাতে পাঞ্জাব সিন্ধু বঙ্গ থাকলে কী হবে, পাকিস্তান তো নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারত আমার' একই কারণে অচল। ভারত শব্দটাই যেন ষাঁড়ের সামনে লাল ন্যাকড়া। অতুলপ্রসাদের সেই বিখ্যাত বাণী 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে', তাতেও আপত্তি। ভারতের স্বাধীনতাও ওদের অভিষ্ট নয়। যদি না তার সঙ্গে থাকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি। অগত্যা দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' আর কাজী নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' দিয়েই সভার কাজ চালাতে হয়। আমাদের নিজস্ব সঙ্গীতও কিছু আছে। নিজেদের লোকের রচনা। শুনলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে নাৎসী ও জাপানী ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে। তবে সেগুলো জাতীয়তাবাদী না আন্তর্জাতিকতাবাদী তা বলা শক্ত। হ্যাঁ, ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে কমিউনিস্টরাও ভিড়ে গেছেন। প্ল্যাটফর্মটা তো যুদ্ধে সহযোগিতা। শয়তানও যদি সহযোগিতা করে তাকেও আমরা সঙ্গে নেব। যুদ্ধজয়ের পর ছাড়াছাড়ি হবে। আপাতত কোলাকুলি।" ভৌমিক উত্তর দেন।

ছাত্রহিসাবে ভৌমিক একদা আদর্শবাদী ছিলেন। কিন্তু চাকুরে হিসাবে উন্নতি করতে হলে কর্তাদের মন বুঝে মত বদলাতে হয়। তাই তিনি ঝালেও আছেন, ঝোলেও আছেন, অম্বলেও আছেন। মুসলিম মন্ত্রীরাও তাঁকে পছন্দ করেন। হিন্দু মন্ত্রীরা তো তাঁর স্বপক্ষে। ইউরোপীয় উপরওয়ালারাও তাঁকে বিশ্বাস করেন। ঝাল ঝোল অম্বল বলতে এই তিনকেই বোঝায়। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা কমিউনিস্ট মহলেও তিনি অপ্রিয় নন। কখনো যদি বিপ্লব ঘটে তাঁর চাকরি যাবে না। চচ্চড়িতেও থাকবেন।

ভৌমিক খুব সহজেই ভাব জমিয়ে নিতে পারেন। দীপক আর মণিকা দু'জনেই ওঁর চিরকালের চেনা হয়ে যায়। 'কাকু' যেন সত্যিকাবের কাকু। এতদিন যেন বিদেশে ছিলেন। সবে ফিরেছেন। সুটকেস থেকে বার করেন আরবদেশের বীচিবিহীন খেজুর আর সুইটজারল্যাণ্ডের চকোলেট। যা আজকের বাজারে অদৃশ্য।

সারাদিন সরকারী গাড়ী নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে তিনি সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে ফেরেন। বিশ্রামের পর যখন আহারে বসেন তখন তাঁর পরণে ধুতী পাঞ্জাবী। বলেন, "আমি দেশী রান্নাই ভালোবাসি। কাঁচা লঙ্কা যেন আমার পাতের এক কোণে থাকে। অবশ্য আপনাদের যদি অসুবিধে না হয়।"

মানস জানতে চায় ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের ডাকে সাড়া পাওয়া গেল কতখানি। এখানকার কর্মকর্তা কারা।

"রায় উমাশঙ্কর সামন্ত বাহাদুর আর তাঁর বন্ধুবান্ধব। খনির মালিক, কলওয়ালা, আড়তদার, ঠিকাদার। যুদ্ধের বাজারে ওঁদেরই তো পৌষমাস। মোটা চাঁদাও উঠেছে। এখানকার শাখা স্বনির্ভর। কলকাতা থেকে আমরা সিনেমা ফিল্ম পাঠাব। ওঁরা সিনেমা দেখাবেন। গানের দল পাঠাব। ওঁরা জলসা করবেন। একজন দেশবরেণ্য পুরুষকে সম্বর্ধনা দেবার সংকল্পও আছে। তিনি রাজনীতির ঊর্ধ্বে। তা দেখে রাজনীতিকদের সমালোচনা বন্ধ হবে। আমরা সংস্কৃতি অলম্বন করেই আমাদের কাজ করি। রাজনীতি অবলম্বন নয়। তা হলে অধ্যাপক শ্রেণীর ব্যক্তিরা ধরাছোঁয়া দেন না কেন?" ভৌমিক জিজ্ঞাসা করেন।

"কারণ যুদ্ধের বাজারে তাঁদের পৌষমাস নয়। তাঁদের সর্বনাশ না হোক সর্বনাশের ভয়। মুদ্রাস্ফীতির জলতরঙ্গ রোধ করবে কে? সঞ্চয়ের মূল্য কী থাকবে? এখানে কমিউনিস্টদের তেমন প্রভাব নেই। বেশীর ভাগই কংগ্রেসের সমর্থক। তবে তাও প্রকাশ্যে নয়। পুলিশের ভয়ে নীরব।" মানস যতদূর জানে।

"মল্লিক," ভৌমিক সুধান, "বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করার উপায় কী, বলতে পারেন?"

"খাস বিলেতেরই যুদ্ধকালীন মূলনীতি হচ্ছে ইকুয়াল স্যাক্রিফাইস। সমান ত্যাগস্বীকার। সেইভাবে একপ্রকার শ্রেণীসাম্য বিবর্তিত হচ্ছে। সকলেরই একই রকম খোরাক, সকলেরই একই রকম পোশাক। অবশ্য ধনীরা ধনীই থেকে যাচ্ছেন, তবু তাদের মুনাফা বল্‌গাহীন নয়। আর দরিদ্ররা সকলেই কাজ পেয়ে যাচ্ছে, রোজগারও মন্দ নয়। সমাজতন্ত্রের অভিমুখে এটা একটা আবশ্যিক পদক্ষেপ। টোরিদের সরকার যুদ্ধকালে অচল। লেবার এসে টোরিদের সরকারকে কোয়ালিশন সরকার করেছে। তাই এই পরিবর্তন। এদেশেও কেন্দ্রীয় সরকারে গুণগত পরিবর্তন চাই। ইকুয়াল স্যাক্রিফাইস হবে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের যুদ্ধকালীন মূলনীতি। সমান ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখলে বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে আসবেন।" মানস তার অভিমত জানায়।

ভৌমিক হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। আমার দৌড় নাচ গান নাটক অবধি। মাঝে মাঝে গুণীজন সম্বর্ধনা। এখানে একজন জ্ঞানতপস্বী আছেন শুনেছি। তিনি রাজী হবেন তো?"

"না। তিনি সভাসমিতিতে বা দরবারে যান না। তপস্যায় মগ্ন।" মানস তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে।

।। ষোল ।।

গজদন্তের মিনার না হলেও কিম্ভূত এক ইমারতে বাস করেন আচার্য নরনারায়ণ শিকদার। সেটাকে যন্তর মন্তর বলা চলে। তাঁর নিজস্ব ডিজাইন। ত্রিশ বছর সরকারী কলেজে অধ্যাপনার পর প্রায় ত্রিশ বছর ধরে অবসর ভোগী এই জ্ঞানতপস্বী রাত জেগে আকাশের গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ ও দিনভর নানা বিষয়ে গবেষণা করে আসছেন। কোথাও তিনি যান না। কেউ তাঁর কাছে আসে না। তবে যাঁরা শ্রদ্ধাবান জিজ্ঞাসু তাঁদের তিনি মাঝে মাঝে দর্শন দেন। তার জন্যে আগে থেকে তাঁর অনুমতি নিতে হয়। এই শহরে তাঁর মতো জন-অপ্রিয় ব্যক্তি দ্বিতীয় নেই। সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর খেতাব দিয়েছেন, কিন্তু সরকারী অনুষ্ঠানে তিনি অদৃশ্য। পণ্ডিতসমাজ তাঁকে দেশিকাচার্য উপাধি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি পণ্ডিত সমাবেশেও অনুপস্থিত। বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর দুর্নাম তিনি গজদন্ত মিনার অধিবাসী।

মানস যেবার তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে যায় তিনি বলেন, "যুদ্ধ আবার বেধেছে শুনছি। বাধিয়েছে কে? কাইজার?"

মানস তো অবাক। বলে, "কাইজার নয়, হিটলার।"

"হিটলার?" তিনিও অবাক। "কই, অমন কোনো শব্দ তো লাটিন ভাষায় নেই। সীজার, কাইজার, জার তিনটাই লাটিন নামের রকমফের। হিটলারও কি সীজারের প্রতিশব্দ? ওর ব্যুৎপত্তি কী? ওটা কি হিটাইট ভাষার শব্দ? অনেকের মতে হিটাইট ভাষাও আর্য ভাষা।"

মানস এসব ব্যাপারে পরম অজ্ঞ। বিদ্যে জাহির না করে অজ্ঞতা কবুল করে। "হিটলার যেমন আর্যামির জাঁক করছে তা শুনে মনে হতে পারে ওর পূর্বপুরুষ হিটাইট। তবে চার পাঁচ হাজার বছর পরে কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। যেটা সবাই জানে সেটা এই যে লোকটা রাজবংশীয় নয়, রাজমিস্ত্রি, ঘরের দেয়াল জানালা রং করত। এখন সারা জার্মানীর মাথায় চড়ে বসেছে। কাইজার নয়, ফুয়েরার।"

"ফুয়েরার?" আচার্য বার বার উচ্চারণ করেন। "গ্রীক নয়, লাটিন নয়, টিউটনের মতো লাগছে। ব্যুৎপত্তি কী ওর?"

"বুৎপত্তি জানিনে। অর্থ, মহান নেতা।" মানস যতদূর জানে।

এ হেন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করতে হলে কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্য থাকা চাই। নইলে আলাপ জমবে কেন? সে ভৌমিককে হুঁশিয়ার করে দেয়।

ভৌমিক ঘুরে এসে বলেন, " না , যতটা ভয়ঙ্কর ভেবেছিলুম ততটা নয়। সামুরাইদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, পরীক্ষায় পাশ করি। কিন্তু জেন বৌদ্ধধর্ম আর জৈনধর্মের পার্থক্য বলতে পারিনে। তিনিই আমাকে বোঝান। অসাধারণ জ্ঞানী, কিন্তু রাজনীতির ধার ধারেন না। খবরের কাগজ পড়েন না। জাপান যে শিয়রে বসে আছে তা শুনে চমকে ওঠেন। সামলে নিয়ে বলেন, ওরা তো আমাদের শত্রু নয়। আমাদের ধর্মভ্রাতা। একই বৌদ্ধধর্ম ওদের আর আমাদের ধর্ম। ওরা এলে লুম্বিনী, কপিলবাস্তু, সারনাথ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, বুদ্ধগয়া, সাঁচী আবার জেগে উঠবে। হিন্দু রিভাইভাল তো ঢের দেখলুম। এবার দেখতে পাব বৌদ্ধ রিভাইভাল। এসব কথা আমি রিপোর্ট করব না, মল্লিক। করলে ভদ্রলোকের রায় বাহাদুরি কেড়ে নেওয়া হবে। পেনসনও বন্ধ হতে পারে। তবে ইংরেজ রাজত্ব থাকলে তো?"

"তুমিও সন্দেহ করো, থাকবে কি থাকবে না? তা হলে অন্যে পরে কা কথা!" মানস রঙ্গ করে।

ভৌমিক ফিস ফিস করে বলেন, "পলাশীর পর অত বড়ো যুদ্ধ বাংলাদেশের মাটিতে ঘটেনি। দু'শো বছর আমরা বাঙালীরা বর্গীর হাঙ্গামার চেয়ে ভীষণ কিছু দেখিনি। আর পলাশীর যুদ্ধও কি একটা যুদ্ধ নাকি? এই প্রথমবার আমরা যুদ্ধের সঙ্গে মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। সবাই তো নার্ভাস হবেই। আমি কি বাঙালী নই, ইংরেজ? আর ইংরেজও যে আদৌ নার্ভাস নয় তাই বা কেমন করে মানি? ওরা বহু যুদ্ধ দেখেছে, ওরা ততটা নার্ভাস নয়। তবে জাপানীদের হাতে বন্দী হতে ও বন্দীশিবিরে বাস করতে কি ওরা প্রস্তুত? না বোধহয়। সিঙ্গাপুরে যা হাল হয়েছে ওদের। অভাবনীয়!"

"সিঙ্গাপুর থেকে পালাবার পথ থাকলে কি ওরা জাপানীদের হাতে বন্দী হতো? এদেশে পালাবার অসংখ্য পথ। বন্দী হওয়ার ভয় নেই। তবে আমরা যারা চাকুরে তাদের চাকরি হারানোর ভয় আছে। জাপানের অধীনে কাজ করলে ইংরেজ তাড়াবে। ইংরেজের অধীনে কাজ করলে জাপান খেদাবে। উকীল ব্যারিস্টার ডাক্তার কবিরাজদের কিসের ভয়?" মানস একান্তে বলে।

"সরকারী চাকরির ওই তো বিপদ। ইংরেজরা যদি বার্মার মতো বাংলাদেশ থেকে পশ্চাদ্ অপসরণ করে আমাকেও তাদের অনুগমন করতে হবে, মল্লিক। এই অনিশ্চিত অবস্থায় ওরাও মন দিয়ে শাসন কর্ম চালাতে পারছে না । রেশন ব্যবস্থা এখনো শুরু হলো না। সময় থাকতে যদি না হয় অনটন দেখা দিতে পারে। খেতে না পেলে যেমন জওয়ানরা লড়তে জোর পায় না তেমনি সাধারণ নাগরিকদেরও মনের জোর চলে যায়। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট ওদের কী করে প্রেরণা জোগাবে? কিন্তু ওটা তো আমার এক্তারে নয়।" ভৌমিক অসহায়।

গণ সত্যাগ্রহের প্রসঙ্গ ওঠে। জাপানীরা এর সুবিধে নেবে না তো? ওদের যারা পক্ষপাতী তারাও কি সুবিধে নেবে না? মানস উদ্বিগ্ন।

"অসম্ভব নয়। জনমত এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগের ধারণা ইংরেজ তো যাচ্ছেই, ওদের থাকতে সাহায্য করে কী লাভ? তার চেয়ে নবাগতকে অভ্যর্থনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আরেকভাগের বিশ্বাস জাপানীরা ইংরেজদের হারিয়ে দিলে কী হবে, মার্কিনদের কাছে হেরে যাবেই। তা হলে জাপানীদের অভ্যর্থনা করে কেন ইংরেজদের বিষনজরে পড়া? বুদ্ধিমানের কাজ যে আখেরে জিতবে তাকেই খুশি রাখা। বেশীর ভাগ লোকই বিষনজর এড়াতে চায়।" ভৌমিকের অনুমান।

"কিন্তু গণ সত্যাগ্রহের কী হবে? ওটা কি ব্যর্থ হবে?" মানসের প্রশ্ন।

"অন্যান্য প্রদেশের কথা বলতে পারব না। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে দেখছি তার জন্যে খুব কম লোকই প্রস্তুত। মুসলমানরা তো একেবারেই নয়। ওরা জানতে চায় ব্রিটিশ রাজ চলে গেলে রাজা হবে কে? কংগ্রেস রাজ হিন্দু রাজ ও তো আরো খারাপ। তার জন্যে ওরা লড়তে যাবে কেন? হিন্দুরাও সতর্ক। কায়িক নিরাপত্তার কথাই তো মানুষের প্রধান ভাবনা। জাপান কি তেমন কোনো অঙ্গীকার দিয়েছে? দিলে এত লোক পা দিয়ে ভোট দিত না। একদা যারা কান্যকুব্জ থেকে এসেছিলেন তাঁদের সন্ততি এখন কান্যকুব্জেই ফিরে চললেন। সিম্বলিকাল সত্যাগ্রহ সব সময়েই করা যায়। দশ বিশ হাজার সত্যাগ্রহী পাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু গান্ধীজীর এবারকার উদ্দেশ্য সিম্বলিকাল সত্যাগ্রহ নয়। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলতে জেলযাত্রা বোঝায় না। বোঝায় যুদ্ধযাত্রা। তার জন্যে আরেক রকম ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট চাই। কোথাও কি তার অস্তিত্ব আছে? গড়ে তোলার সময়ই বা কোথায়?" ভৌমিক ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দেন।

এর পরে ওঠে সম্বর্ধনার প্রসঙ্গ। মানস জানতে চায় আচার্য রাজী কি না।

"ক্ষেপেছেন? উনি কী বলতে গিয়ে কী বলবেন, তার পর আমার মাথা কাটা যাবে। 'এস হে আর্য, এস অনার্য' দিয়ে আরম্ভ করবেন, বলতে বলতে বলে বসবেন, 'এস হে বৌদ্ধ, এস নিপ্পন'। ওঁর কি কালজ্ঞান আছে? উনি বাস করছেন ত্রিশ বছর আগেকার যুগে। জিজ্ঞেস করছিলেন উড্রো উইলসন কি মিকাডোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন? তা কী করে হবে? ওঁরা যে পরস্পরের মিতা। না, ভাই, আমার সম্বর্ধনায় কাজ নেই। উনি রাজী হলেও আমি নারাজ। কথাটা আমি পাড়তে যাবার আগেই তাঁর মনোভাব লক্ষ করে মত পরিবর্তন করেছি। বলেন কিনা মুসলমানদের যেমন তুরস্ক পারস্য হিন্দুদের তেমনি চীন জাপান। ওদেব যোগসূত্র যেমন ইসলাম আমাদের যোগসূত্র তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম। হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ তো একদিন হবে, না হবে না? সেদিন মুসলমানের পক্ষে যদি তুরস্ক দাঁড়ায় তো হিন্দুর পক্ষে জাপান দাঁড়াবে। মুসলমানের খলিফা আছেন, হিন্দুর কে আছে? হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? ওই জাপান সম্রাট। উনিও বৃহত্তর অর্থে হিন্দু। সম্রাট অশোক যে অর্থে হিন্দু ছিলেন। খেলাফৎ আন্দোলনের মতো আমাদেরও একটা আন্দোলন চাই। মাঞ্চু সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনার জন্যে।" ভৌমিক তাজ্জব বনে গেছেন।

মানস হো হো করে হেসে ওঠে। ওর হাসি আর থামতে চায় না। বলে, "জাপান তো সেই কর্মই করছে। মাঞ্চুকুও তার প্রথম ধাপ। শেষের ধাপটি বোধহয় পালযুগের গৌড়ভূমি। ধর্মপালের দিগ্বিজয়। সাত সমুদ্র তেরো নদীতে ময়ূরপঙ্খী নাও।"

"কী মধুর স্বপ্ন! এই স্বপ্নবিলাসী জাতিটাকে রূঢ় বাস্তবের আঘাতে জাগতে হবে একদিন। জাপানীরা বৌদ্ধ নয়, জাপানী। চীনারা বৌদ্ধ নয়,চীনা। তুর্করা মুসলমান নয়, তুর্ক। ইরানীরা মুসলমান নয়, ইরানী। আজকের জগতে ধর্মকে মুখ্য স্থান দেওয়া আর চোখে ঠুলি পরে রাস্তায় চলা একই জিনিস। হিন্দু মুসলমানকে কী করে এটা বোঝাই, বলুন তো? ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কিন্তু এই প্রশ্নটাতে

মুসলমানকে এড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা জোর গলায় ঘোষণা করতে পারছিনে যে আগে জাতীয়তা, পরে ধর্ম। ইংরেজরাও খ্রীস্টান, জার্মানরাও খ্রীস্টান, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা তারা ইংরেজ, তারা জার্মান। তাই যদি হয়ে থাকে পশ্চিমের বেলা সত্য তবে প্রাচ্যের বেলাও সত্য হবে না কেন? প্রাচ্য মানেই কি প্রাচীন? কিন্তু কী করব? আমার হাত পা বাঁধা। আমাকে এমন ভাবে কাজ করতে হয় যাতে হিন্দু মুসলমান ইউরোপীয়ান সবাই তুষ্ট হন। 'যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।' এই আমার জীবনদর্শন।" ভৌমিক অকপটে ব্যক্ত করেন।

"তা হলে তুমি হয়তো একদিন জাপানীদেরও তুষ্ট করবে। যদি তারা গৌড়ভূমিতে পাল যুগ ফিরিয়ে আনে। পাল রাজাদের বংশধর কি খোঁজ করলে মিলবেন না? সাকসেসফুল সিভিল সার্ভ্যান্ট তাঁরাই যাঁরা মেরীকেও মানেন, মনসাকেও মানেন, ওলাবিবিকেও মানেন। জাপানীদের কান্ননকে মানতেও সময় লাগবে না। আসলে তিনি অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বরা না-স্ত্রী,না-পুরুষ। এঞ্জেলদের মতো। কিন্তু জাপানে গিয়ে অবলোকিতেশ্বর স্ত্রী হয়ে গেছেন। আর মঞ্জুশ্রী হয়েছেন পুরুষ। মহাত্মা গান্ধীও তো বোধিসত্ত্ব বা এঞ্জেলদের মতো না-স্ত্রী না-পুরুষ হতে সাধনা করছেন। অতি কঠোর সাধনা।" মানস প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়।

শুনে ভৌমিক তো হতবাক। "ওটা শুধু কঠোর নয়, নিষ্ফল সাধনা। অমন সাধনার পার্টনার হতে রাজী হবেন কোন্ নারী? রাজী হলে তিনিও তো হবেন না-স্ত্রী, না-পুরুষ। তাঁকে মা বলে ডাকবার জন্যে কেউ জন্মাবে না। কই, কোথাও তো পড়িনি এঞ্জেল বা বোধিসত্ত্বদের কোনো পার্টনার ছিলেন। তবে কি গান্ধীজী এমন এক স্বর্গের কল্পনা করছেন যেখানে সকলেই নিঃসঙ্গ, সকলেই নিঃসন্তান? ভারতকে সেই স্বর্গে করো উপনীত, এটাই কি তাঁর প্রার্থনা?"

"আমার মনে হয় এর একটা সূক্ষ্ম কারণ আছে। এ যুগের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সমস্যা হচ্ছে শূদ্রের জাগরণ তথা নারীর জাগরণ। গান্ধীজী শূদ্রের সঙ্গে অর্থাৎ শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে স্বেচ্ছায় কায়িক শ্রম বরণ করে নিয়েছেন। আদালতে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার বৃত্তি কী? তিনি উত্তর দেন, আমি একজন চাষী ও তাঁতী। উচ্চশ্রেণীর লোক যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অভিন্ন হয় তা হলে সমসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজন হয় না। গান্ধীই হন শূদ্রজাগরণের হোতা। তাঁর গণজাগরণও মূলত শূদ্রজাগরণ। অধিকাংশ সত্যাগ্রহীই তো শূদ্র বর্ণ থেকে উদ্‌গত। সত্যাগ্রহ সফল হলে ওরা কি আর ব্রাহ্মণ প্রাধান্য, ক্ষত্রিয় প্রাধান্য, বৈশ্য প্রাধান্য সহ্য করবে? একটা সমস্যার সমাধান তো ওই ভাবেই হবে। বাকী থাকবে আর-একটা। নেতার পক্ষে শূদ্র হওয়া যদি-বা সম্ভব হয় নারী হওয়া তো সম্ভব নয়। তা হলে নারীর সঙ্গে তিনি একাত্ম হবেন কী করে? নবদ্বীপের ললিতা দাসীর মতো নারীবেশ ধারণ করে? অবিকল নারীর মতো সাজ। নাকে নথ। নারীর মতো হাবভাব। ছলাকলা। কিন্তু মঠের কর্তাগিরির সময় তিনি প্রবলপ্রতাপ পুরুষ। গান্ধীজী চাষীর বেশ ধরেছেন, নারীর বেশ ধরেননি। কিন্তু নারীর সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে তাঁর আত্মা ব্যাকুল। নারী হওয়া যাবে না, কিন্তু নারীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসা যাবে, যদি এঞ্জেল বা বোধিসত্ত্বদের একজন হওয়া যায়। তাঁদেরি মতো সেক্স্‌লেস। আক্ষরিক বা কায়িক অর্থে নয়। ভাবার্থে। তাঁর আন্দোলনে যত নারী সাড়া দিয়েছে তত আর কারো আন্দোলনে নয়। গণ সত্যাগ্রহে লক্ষ লক্ষ নারী ঝাঁপ দেবে বলে আশা করা যায়। এরা যখন ঘরে ফিরে যাবে তখন আর বিনা বাক্যে সমাজশাসন মেনে নেবে না। সমাজশাসন মানে তো পুরুষশাসন। পুরুষশাসনেরও অন্ত হবে, যেমন ব্রিটিশ শাসনের। অমনি করে আর-একটা সমস্যারও সমাধান হবে। নেতৃত্ব করতে হবে তাঁকেই। তার জন্যে এই দুশ্চর সাধনা। স্বর্গলাভের জন্যে নয়। ইন্দ্রত্বের উপর তাঁর লোভ নেই। তিনি রাজনীতির জগতে এসেছেন ন্যায়নীতির অনুসরণে। সত্যাগ্রহের জয় হলেই তিনি বিদায় নেবেন। যদি না সত্যাগ্রহকালেই তাঁর দেহান্ত হয়। সামনেই অগ্নিপরীক্ষা।" মানস উৎকণ্ঠার

সঙ্গে বলে।

"কে না চায় তার স্বদেশের স্বাধীনতা? লাটসাহেব পর্যন্ত স্বীকার করেন যে ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জাপানকে হটিয়ে না দিলে নয়। আপাতত কংগ্রেসের উচিত বড়লাটের শর্তে রাজী হয়ে যাওয়া। বড়লাটকে সাক্ষীগোপালে পরিণত না করা। কংগ্রেস রাজী হলে মুসলিম লীগও রাজী হবে। না হলে নিজেই কোণঠাসা হবে। আমরাও ভিতর থেকে দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্যে সচেষ্ট। ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম করার জন্যে নয়।" ভৌমিক আন্তরিকভাবে বলেন।

"তা হলে আপনারা ভিতর থেকে চেষ্টা চালিয়ে যান, যেন গণ সত্যাগ্রহের আগেই মিটমাট হয়।" মানসের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

কলকাতা থেকে জাপানী বোমার ভয়ে যাঁরা স্থানান্তরিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রথিতযশা সম্পাদক ভবতোষ আচার্য। মানস একদা তাঁর পত্রিকায় লিখত। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্পাদক হবার স্বপ্ন দেখত। পরে অন্য পথে যায়, অন্য পত্রিকায় লেখে। যোগাযোগ ছিন্ন হয়। সম্প্রতি আবার সেই সম্পর্ক জোড়া লেগেছে। তিনিও মানসের আবাসে এসে বইপত্র ধার করে নিয়ে যান ও দিয়ে যান, মানসও তাঁর নিবাসে গিয়ে তাঁর খবরাখবর নেয়। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তিনি মফঃস্বলে এসেও দুনিয়ার হালচাল রাখেন। কলকাতা থেকে নিয়মিত দেশের বিভিন্ন এলাকার খবরের কাগজ পান, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে সময়মতো কলকাতার আপিসে পাঠান, যাতে নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশিত হয়। বিলম্ব তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। তাই শরীর হাজার অসুস্থ থাকলেও তিনি তাঁর লেখার টেবিলে গিয়ে বসেন। দিনের বেলা কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না। সন্ধ্যার দিকে তিনি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গল্প করেন। জমিয়ে রাখেন। একাধারে রাশভারী ও রসিক এই বর্ষীয়ান ঋষিকল্প ভদ্রলোক এখানে অরণ্যবাস করছেন। পরিবারের আর সবাই কলকাতায়।

ভৌমিককে নিয়ে মানস তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যায়। বন্ধুর পরিচয় দিয়ে বলে, "ইনি ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট গঠন করে বেড়াচ্ছেন।"

তিনি রসিকতা করে বলেন, "ইংরেজরা সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, বার্মায় ব্যাক দেখিয়ে এসেছে। ফ্রন্ট দেখাবে কোথায় ? না ওকাজটা আমাদের উপরেই ছেড়ে দিতে চায়? আমরাই লড়ে মরব?"

বৈঠকখানায় আরো কয়েকজন দর্শনার্থী ছিলেন। হাসাহাসি করেন।

ভৌমিক বলেন, "ওরা পালিয়ে বাঁচতে পারে, আমরা তো পালিয়ে বাঁচতে পারব না। পালাব কত দূরে আর কোন্ বিদেশে? কাজেই আমরা জাপানীদের কনফ্রন্ট করব। করব এক নেশন হয়ে।"

"তা হলে শুনুন একটা ছড়া বলি।" সম্পাদক মজা করে আওড়ান।

"শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ী যান।"

তার পর টিপ্পনী কাটেন। "একালের শিব ঠাকুর হচ্ছেন ব্রিটিশ রাজ। আর তিন কন্যে হচ্ছেন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ আর রাজন্যমণ্ডলী। কংগ্রেস রাঁধবে বাড়বে, অর্থাৎ সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করবে। মুসলিম লীগ খাবে, অর্থাৎ অন্যের অর্জিত ক্ষমতা ভোগ করবে। আর রাজন্যমণ্ডলী প্রস্তাবিত ফেডারেশনের সামিল না হয়ে রাগ করে বাইরে থাকবেন। অর্থাৎ একরাশ বলকান রাষ্ট্র সৃষ্টি করবেন। এটাই হলো প্যাটার্ন। এর কস্মিন্ কালে রদবদল হবে না। জাপানকে রুখতে হলে ওই কংগ্রেসই রুখবে, কংগ্রেস না রুখলে আর কে রুখবে? ইংরেজ তো পিছু হটবে। মুসলিম লীগ তো তার পিছু নেবে। রাজন্যরা তো প্রথম সুযোগেই বশ্যতা স্বীকার করবেন। কংগ্রেসের এখনো কিছু মোহ অবশিষ্ট আছে। কিন্তু গান্ধীজীর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। তিনি স্থির করেছেন শিব ঠাকুরেব সঙ্গে সম্পর্কই রাখবেন না।

শিব ঠাকুরকে বিদায় দেবেন। তার পরে তিন কন্যার মধ্যে একটা সমঝোতা হলেও হতে পারে, কিন্তু শিব ঠাকুর থাকতে হবার নয়। তাই তিনি বলছেন, ভারত ছাড়ো। শ্বশুরবাড়ী ছাড়ো।"

ভৌমিক আর সকলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেন, কিন্তু সবিনয়ে অনুযোগ করেন, "স্যার, আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে শিবঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে গেলেই তিন কন্যার মধ্যে সমঝোতা সম্ভব হবে? এক কন্যা না হয় সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, বাকী দুই কন্যা তো একভাবে না একভাবে সম্পর্ক রাখতে পারেন। তার বেলা কী উপায়? এ দেশ কি তা হলে অর্ধ-স্বাধীন ও অর্ধ-পরাধীন হবে?"

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সম্পাদক বলেন, "সেই কথাই তো আজ আমি আমার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখে ডাকে দিয়েছি। কপি রাখিনি, তাই দেখাতে পারছিনে। কংগ্রেস যদি স্বাধীনতা পায় তো আধখানা ভারতেরই পাবে। বাকী আধখানার ভাগ্য নির্ধারিত হবে গৃহযুদ্ধে। সেটা তো আর অহিংসভাবে হবে না। সুতরাং গান্ধীজীর ভূমিকা শেষ। দেশটা যদি দু'তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মৃত্যু ঘটবে। তা যদি হয় কী নিয়ে আমি বাঁচব? আমারও যে মরতে ইচ্ছে করবে। ট্র্যাজেডী! ট্র্যাজেডী! ট্র্যাজেডী!"

তাঁর মুখে হাসি নেই, কণ্ঠস্বরে কান্নার আমেজ। আর সকলেরও তাই।

মানসের মনে পড়ে লিঙ্কনের প্রসিদ্ধ উক্তি "দিস্ নেশন ক্যান নট লিভ হাফ স্লেভ অ্যাণ্ড হাফ ফ্রী।" সে সম্পাদক মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

"এ দেশটা আমেরিকা নয়, মানসমোহন। এখানকার শতকরা বাইশজন নাগরিক মুসলমান। আর্মিতে মুসলমানের অনুপাত শতকরা চল্লিশ। বোধহয় এই যুদ্ধে পঞ্চাশ। এদের সহযোগিতা না পেলে, এদের বিরোধিতা পেলে লিঙ্কনের ভূমিকায় অভিনয় করা অসম্ভব। আর তেমন ব্যক্তিত্বই বা কোথায়! তাঁর পেছনে রেপাবলিকান পার্টির মতো একটি রাজনৈতিক দলই বা কোথায়। শুধুমাত্র সৈন্যবলে বলীয়ান হয়ে তিনি গৃহযুদ্ধে জয়ী হতে পারতেন না। গান্ধীজী যে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছেন সেটা কংগ্রেসের মতো এক বৃহৎ পার্টি তাঁর পেছনে আছে বলেই।" ভবতোষবাবু যুক্তি দেখান।

মানস স্তব্ধ হয়ে শোনে। তার পর বলে, "তা হলে কি ইংরেজকে ভারত ছাড়তে আলটিমেটাম দেওয়া ভুল?"

"আলটিমেটাম না দিলে ওরা জাপানের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়বে না। আলটিমেটাম মানে আর কিছু নয়, হয় তোমরা জাপানের সঙ্গে প্রাণপণে লড়ো, নয় আমরা তোমাদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়ি। হয় তোমরা জাপানের সামনাসামনি হয়ে বল, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, নয় আমরা তোমাদের সামনাসামনি হয়ে বলি, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ভারতের ইতিহাসে এমন সঙ্কট আর কখনো দেখা দেয়নি। এই যে অভূতপূর্ব সঙ্কট এ সঙ্কটে ইংরেজ, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, রাজন্যমণ্ডলী সকলেরই কর্তব্য একজোট হয়ে জাপানের সম্মুখীন হওয়া। তার জন্যে চাই একটি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট তার বিকল্প নয়। তার অনুষঙ্গ। আপনি যে কাজ করছেন সে কাজও একটা করবার মতো কাজ, হিতেশচন্দ্র। কিন্তু ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট না হলে সেটা যেন শিবহীন যজ্ঞ।" ভবতোষবাবু ভৌমিকের দিকে তাকান।

এবার সাহসে বুক ঠুকে সম্বর্ধনার প্রস্তাব তোলেন ভৌমিক।

"বলেন কী! সম্বর্ধনা! কাকে! বোমার ভয়ে পলাতককে। আমি যে গ্লানিতে মরে যাচ্ছি। স্ত্রী নেই, কিন্তু ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি তো আছে। কলকাতায় তাদের বোমার মুখে ফেলে রেখে আমি যে পালিয়ে এসেছি এটা কি সম্বর্ধনার যোগ্য কীর্তি? আমি আসতে চাইনি, কিন্তু ওরা আমাকে মোটরে চাপিয়ে জোর করে চালান করে দিয়েছে। বৃদ্ধবয়সে আমি অসহায়।" তিনি সহাস্যে বলেন।

এর পরে তিনি গম্ভীর হয়ে স্মৃতিচারণ করেন। "তরুণ বয়সে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে জীবনে কখনো সরকারী চাকরি করব না। তাই সরকারী চাকরির সুযোগ পেয়েও সুযোগ নিইনি।

বেসরকারী চাকরিও চাকরি। তাই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছি। স্বাধীনভাবে সম্পাদকতা করেছি। অল্পে সন্তুষ্ট থেকেছি। সরকারের কাছে কোনোদিন কিছু চাইনি বা পাইনি। আজ শেষ বয়সে সম্বর্ধনা গ্রহণ করি কোন্ সুবাদে? সরকারেরই বা এই সুমতি কেন? এতে করে কি দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করা যাবে? আমি আজীবন স্বরাজের জন্যে একজন সম্পাদকের পক্ষে যা করবার তা করেছি। স্বরাজের কয়েকটা ধাপ পার হয়ে আসা গেছে। শেষেরটা বাকী আছে। ইংরেজদের কাছ থেকেই আমি সেটা চাই। জাপানীদের কাছ থেকে নয়। ইংরেজরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বরাজ দিয়েছে। আয়ারল্যাণ্ডকেও। জাপানীরা কবে কাকে স্বরাজ দিয়েছে? তাদের কাছে স্বরাজ প্রত্যাশা করা মূঢ়তা। স্বরাজ কখনো পূব দিক থেকে আসবে না। একদিন না একদিন পশ্চিম দিক থেকেই আসবে। তার জন্যে গান্ধীজী যা করেছেন তা আমি সব সময় সমর্থন না করলেও মোটের উপর অনুমোদন করেছি। এবারেও আমার মনে কিছু দ্বিধা আছে। আমার বিশ্বাস বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে একাকী দেশরক্ষা করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ সৈন্যদের উপস্থিতি অপরিহার্য। কে জানে জাপানীদের মনে কী আছে? অকস্মাৎ একদিন একটা পার্ল হারবার ঘটিয়ে বসবে। ইংরেজদের আমি যতটুকু বিশ্বাস করি জাপানীদের ততটুকুও করিনে। লক্ষ করেছেন কি না জানিনে, ইংরেজরা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সেটাই আন্তর্জাতিক প্রথা। কিন্তু জাপানীরা চীনের বিরুদ্ধে তা করেনি। ব্রিটেনের বিরুদ্ধেও না। একটা আজব তত্ত্ব শুনছি। জাপানীদের উদ্দেশ্য নাকি ব্রিটিশবিতাড়ন, ভারত অধিকার নয়। তাই ব্রিটিশ বিতাড়নের কাজটা ভারতীয় জনগণকেই আগে ভাগে করে রাখতে হবে। তা হলে আর জাপানীরা ভারত অধিকার করতে পা বাড়াবে না। এটা কি জাপানী মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত? না মহাত্মার মহত্ত্বের উপর? ভারতের ঘরে ক্ষমতার শূন্যতা দেখলে বাইরে থেকে কেউ না কেউ ছুটে আসবেই। জাপানীরা সব চেয়ে নিকটে। সুতরাং জাপানীদের দ্বারাই ক্ষমতার শূন্যতার পূরণ হবে। আমাদের কর্তব্য আমি যতটুকু বুঝি পাওয়ার ভ্যাকুয়াম আদৌ ঘটতে না দেওয়া। পাওয়ার ভ্যাকুয়াম ঘটলে কংগ্রেস একাকী তা পূরণ করতে পারবে না। সঙ্গে নিতে হবে মুসলিম লীগ তথা অন্যান্য শরিকদের। কিন্তু তারা যদি দেশের উপরে সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই উচ্চতর স্থান দেয় তবে তো মিলে মিশে শূন্যতা পূরণ করা চলবে না। আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে যে সীমান্তের ওপারে জাপান থাকতে এপারে পাওয়ার ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করা সমীচীন নয়। স্বরাজের আরো দেরি হয় হোক। 'কুইট ইণ্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি' শুনে আমি চমকে উঠি। ওটা হলো বিশ্বাসীর উক্তি, যুক্তিবাদীর নয়। ইংরেজদের অস্তিত্বই জাপানীদের ডেকে এনেছে কি-না তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু সীমান্তের ওপারে যতদিন জাপানীদের অস্তিত্ব ততদিন আমাদের আশঙ্কার কারণ রয়েছে। ইংরেজরা ততদিন থাকলে আশঙ্কাটা কমে। তবে তাদের নিরঙ্কুশ হতে দেওয়া নিরাপদ নয়। পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে কে জানে কী ধ্বংস করবে। সেইজন্যেই তো গোটা ডিফেন্স পোর্টফোলিওটা একজন ভারতীয় পারিষদের হাতে দেওয়া চাই। কংগ্রেসের দাবী অযথা নয়।"

মানস তাঁর সঙ্গে একমত হয়। তবে চার্চিলকে বোঝায় কার সাধ্য!

তা শুনে ভৌমিক বলেন, "লাটসাহেবের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, মিস্টার চার্চিল ইজ নট ইংল্যাণ্ড।"

"কিন্তু এবারকার মহাযুদ্ধে চার্চিলই তো ইংল্যাণ্ডের ভরসা। সেবার যেমন অ্যাসকুইথকে সরিয়ে দিয়ে লয়েড জর্জ প্রধানমন্ত্রী হন এবার তেমন কেউ নেই যে চার্চিলকে সরিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হবেন।" মানস যতদূর জানে।

"তবে চার্চিলও একেবারে কাস্ট আয়রন নন। দেখছেন না তাঁর পরম শত্রু স্টালিনের সঙ্গেও কোলাকুলি করছেন?" ভৌমিক তর্ক করেন।

সম্পাদক মহাশয়ও তর্কে যোগ দেন। "ইংরেজদের মস্ত বড়ো গুণ ওরা সময় বুঝে ওদের পলিসি

বদলায়। চার্চিলও একজন ইংরেজ। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে হিটলারকে হারিয়ে দিতে হলে স্টালিনকে মদত দেওয়া চাই। যদি তা সত্ত্বেও স্টালিন হেরে যান তবে কমিউনিজমও হেরে যাবে। রক্ষণশীলদের হাড় জুড়োবে। সে রকম একটা পরিস্থিতি ভারতেও দেখা দিতে পারে, যদি বামপন্থীরা ভারতীয় জওয়ানদের ভাঙিয়ে নিয়ে বিপ্লব ঘটায়। তখন চার্চিল বাবাজীর টনক নড়বে। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর চির বিরোধ ভুলে যাবেন। তবে মহাত্মা বোধহয় তাঁর সাহায্য নেবেন না। তিনি বরাবর আত্মনির্ভর।''

''কিন্তু বামপন্থীরা তো এখন পরস্পরবিরোধী।'' মানস সবিনয়ে বলে। ''একদল ঝুঁকেছে ইংরেজদের পক্ষে, যেহেতু ইংরেজ রাশিয়ার পক্ষে। আরেকদল ইংরেজের বিপক্ষে, যেহেতু ইংরেজ স্বাধীনতার বিপক্ষে। বিপ্লবটা মাঠে মারা যাবে, যদি বামপন্থীরা পরস্পরকে মেরে সাবাড় করে। জওয়ানরাও যে নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধাবে না তা নয়। হিন্দুরা হাঁকবে 'দুর্গা মায়ীকী জয়।' আর মুসলমানরা হাঁকবে 'আল্লা হো আকবর।' আর শিখেরা হাঁকবে 'সৎ শ্রী অকাল'। একজনও হাঁকবে না 'ভারতমাতাকী জয়' বা 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ'। আর বিপ্লব? যেখানে যতবার বিপ্লব ঘটেছে কেবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে নয় পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধেও ঘটেছে। পুরোহিততন্ত্রের জোর যেখানে এত বেশী সেখানে রাজদ্রোহ হতে পারে, বিপ্লব হতে পারে না। রাজদ্রোহকেই আমাদের বামপন্থীরা বিপ্লব বলে ভ্রম করেন। পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে লড়বার মতো সাহস তাঁদের নেই। ঠাকুর দেখলেই গড় করেন। বিবাহের বা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে বামুন ঠাকুরকেও তাঁদের চাই।''

সম্পাদক মহাশয় খুশি হয়ে বলেন, ''তা হলে ভেবে দেখুন আমাদের যৌবনে পৌত্তলিকতা বর্জন ও উপবীত ত্যাগ কতখানি বৈপ্লবিক ছিল। আমাকে আমার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সঙ্গে কী পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সংগ্রাম বলতে কি কেবল কারাবরণ বা সাহেব নিধন বোঝায়? বিপ্লব হচ্ছে আমূল পরিবর্তন। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে। আমরা সর্ব ক্ষেত্রে হাত দিতে পারিনি। জনবল আমাদের ছিল না। তা ছাড়া ইংরেজকে আমরা কেবল বিদেশী বা সাম্রাজ্যবাদী শত্রু ভাবিনি। মিত্রও ভেবেছি তাদের আধুনিকতার জন্যে, প্রগতিশীলতার জন্যে। জুডিসিয়াল সীস্টেমের জন্যে, পার্লামেণ্টারি সীস্টেমের জন্যে। এত বেশী ব্যক্তিস্বাধীনতা আর কোন্ রাজত্বে ছিল? ইণ্ডিয়ান বলুন, ন্যাশনাল বলুন, কংগ্রেস বলুন তিনটিই তো ওদেরই সৃষ্টি। সম্পর্কটা পরে তিতিয়ে যায়।''

।। সতেরো ।।

ভবতোষবাবুর মফঃস্বলবাস সীতার বনবাস নয়। কলকাতা থেকে তাঁর পুত্রেরা মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যান। দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা এই শহরেই বাস করেন। তত্ত্বাবধানের অভাব হয় না। তবু তাঁর মন উড়ু উড়ু। কবে ফিরে যাবেন এই তাঁর ধ্যান।

একদিন তাঁর বড়ো ছেলে পরিতোষ মানসের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন। ''আপনারা এখানে না থাকলে বাবা এখানে থাকতে চাইতেন না। মিসেস মল্লিকেরও উনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। আমরা আপনাদের দু'জনের কাছে কৃতজ্ঞ।''

তখন যূথিকাকেও তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। সে চায়ের আয়োজন করে। বলে, ''কলকাতার অবস্থা জানতে ইচ্ছে করে।''

পরিতোষবাবু বলেন, ''আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। মানুষ এমন জীব যে সব রকম অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। তা সে যুদ্ধই হোক আর দুর্ভিক্ষই হোক আর ভূমিকম্পই হোক আর মহামারীই হোক। ব্লাক আউট, তবু থিয়েটার সিনেমা একরাত্রিও বন্ধ নেই। ফটকা, জুয়া, ঘোড়দৌড়, ভাগ্যগণনা

সমানে চলেছে। মন্দির, মসজিদ, গির্জা তো জনশূন্য হতে পারে না। পলাতকরা দলে দলে ফিরে আসছে। মাথার উপর বাজ পড়লেও তারা আর পালাবে না। এই নগরেই কর্ম আমার এই নগরেই মরি।"

"তা হলে তো আপনার বাবাকেও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কেন তিনি এমন পাণ্ডবের মতো অজ্ঞাতবাস করবেন? অত বড়ো প্রসিদ্ধ জ্ঞানীকে এখানে চিনবে কে? তাঁর রেফারেন্সের বই জোগাবে কে? আমাদের সামান্য সংগ্রহ থেকে বই ধার করতে আসেন। আমরা ধন্য বোধ করি। আপনি এসে ঠিক সময়ে ফিরিয়ে দিয়ে যান। আর কেউ তো ফেরৎ দেবার কথা মনে রাখে না।" যূথিকা বলে।

"সত্যি, দরকারী রেফারেন্সের বই হাতের কাছে না পেলে বাবার মতো সবজান্তা সম্পাদকের চলে না। আমাকে লিখলে আমি নিয়ে আসতে পারতুম, কিন্তু সেটুকু দেরিও তাঁর সইত না। খাবারের মতো খবরও গরম গরম পরিবেশন করতে হয়। তেমনি খবরের উপর মন্তব্যও। তাঁর সময়োচিত মন্তব্য পড়ে গভর্নমেন্টেরও পলিসি বদলে যেতে দেখেছি। আর গান্ধীজীও সম্প্রতি বলতে আরম্ভ করেছেন যে ব্রিটিশ সৈন্য ভারতের মাটিতে মোতায়েন থাকতে পারে, যদিও ব্রিটিশ শাসনকে অপসরণ করতে হবে। অবিকল বাবার বক্তব্য।" পরিতোষবাবু দাবী করেন।

"আমিও একমত।" মানস সমর্থন করে।

"আমি কিন্তু একমত নই।" পরিতোষবাবু একটা চমক দেন।

"সে কী। আপনার বাবার সঙ্গে আপনার মতের মিল নেই। কী তা হলে আপনার মত?" মানস জানতে উৎসুক।

"দেখুন, মিস্টার মল্লিক, গান্ধীজী আর বাবা প্রায় একবয়সী। তাঁদের চিন্তাধারা মোটামুটি একই খাতে বয়। যদিও মতভেদও মাঝে মাঝে ঘটে। আমি হচ্ছি কিনা জবাহর আর সুভাষের সমবয়সী। আমাদের চিন্তাধারা আরো একেলে। এর নাম জেনারেশন গ্যাপ। আরো খোলসা করে বলি, ব্রিটিশ সৈন্য এদেশের মাটি আঁকড়ে থাকতে এ মাটির সন্তানরা কখনো স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পারে না। পূর্ণ ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে নেতারা পুলকিত হতে পারেন, কিন্তু আমরা তো নেতা নই, সাধারণ নাগরিক। আমরা তো ক্ষমতার স্বাদ পেতে পারিনে, স্বাধীনতার স্বাদই পেতে প্যারি। অরাজকতাকে আমরা ভয় করিনে। তাতেও মেলে স্বাধীনতার স্বাদ। গান্ধীজী গোড়ায় যা বলেছিলেন সেটাই ছিল আমাদের মনের কথা। পরে যেটা বলতে শুরু করেছেন সেটা বাবার মতো দরদী সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্যে গোঁজামিল। কেন, ব্রিটিশ সৈন্য থাকবে কেন? ভারতরক্ষার জন্যে ভারতীয় সৈন্যই কি যথেষ্ট নয়? দরকার দেখলে আমরা আরো রিক্রুট করব। জাপানী সৈন্যরা এখন সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারত অভিযানের জন্যে ওরা বড়ো জোর হাজার ত্রিশেক সৈন্য বরাদ্দ করতে পারে। ত্রিশ হাজারকে রুখতে তার দু'গুণ সৈন্য তৈরি। তফাৎটা শুধু এই যে জাপানীরা স্বাধীন দেশের সৈনিক,আর ভারতীয়রা পরাধীন দেশের। স্বাধীনের সঙ্গে পরাধীনের সংঘর্ষে পরাধীনের মনের জোর কম। গান্ধীজী বলেন এখন থেকে আমাদের স্বাধীন বলে ভাবতে হবে, পরাধীন বলে নয়। সৈনিকরা যেদিন অনুভব করবে যে তারাও স্বাধীন সেদিন নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে জাপানী সৈনিকদের সঙ্গে লড়বে। এইজন্যেই না আমরা চাই ব্রিটিশ সৈন্যের অপসরণ। হয় হবে অরাজকতা। নিতে হবে তার ঝুঁকি। নো রিস্ক, নো গেন। বাবাকে এ তত্ত্ব বোঝানো শক্ত।" পরিতোষবাবু চায়ে চুমুক দেন।

"তা এই যদি হয় আপনার চিন্তাধারা তবে তা আপনাদের নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন না কেন?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

"সর্বনাশ। যুদ্ধকালে কড়া সেনসরশিপ। সম্পাদককে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। কাগজ বন্ধ করে দেবে। আমরা তখন দাঁড়াব কোথায়?" পরিতোষবাবু কাতর দৃষ্টিতে তাকান।

"তা হলে লিখে কাজ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় অরাজকতা সম্বন্ধে আপনার চেয়ে আমার

ধারণা আরো পরিষ্কার। আইন অনুসারে ক্ষমতার হস্তান্তর না করে ব্রিটিশ রাজ যদি হঠাৎ উধাও হয় তবে জজ হিসাবে আমার বিচারের অধিকার থাকবে না, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনের অধিকার থাকবে না, পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্টের গ্রেপ্তারের অধিকার থাকবে না, জেলারের বন্দী আটক করার অধিকার থাকবে না, ট্রেজারি অফিসারের বেতন দেবার অধিকার থাকবে না। চোখের সামনে ট্রেজারি লুট হয়ে যেতেও পারে। লুটেরাদের ধরবে কে? বাঁধবে কে? সাজা দেবে কে? সাজা বলবৎ করবে কে? যে যার খুশিমতো একটা প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট খাড়া করতে পারে, কিন্তু সে গভর্নমেন্টের প্রতি আনুগত্য স্বতঃসিদ্ধ নয়। নিযুক্তি পত্র আসা চাই, সে নিযুক্তি পত্র সকলের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া চাই। নইলে আমরা হব গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। আজকের এই প্রেস্টিজ আর থাকবে না। গান্ধীজী বলেছেন অরাজকতা হয়তো দিন পনেরো স্থায়ী হবে। কিন্তু দিন পনেরোর ব্রেকও তো একটা ব্রেক। সেই পনেরো দিনের জন্যে আমাদের প্রত্যেকের চাকরিতে ব্রেক হবে। আমরা মাইনে পাব না। পরে হয়তো নতুন শর্তে চাকরি করতে হবে। মিলিটারিতে যারা কাজ করছে তাদের বেলাতেও একথা খাটে। পনেরো দিন যদি তারা বেকার বসে থাকে তো যুদ্ধ করবে কোন্ অধিকারে? সেই যুদ্ধবিরতির ফাঁকে জাপানীরা এগিয়ে এসে জেলার পর জেলা দখল করতে পারে। সেসব জেলার লোক কি স্বাধীনতার স্বাদ পাবে, না দ্বিতীয় পরাধীনতার স্বাদ? কেউ না কেউ গান্ধীজীকে এসব কথা বুঝিয়েছে। তাই তিনি 'কুইট ইণ্ডিয়া' বহাল রাখলেও 'টু গড অর অ্যানার্কি' বাদ দিয়েছেন।" মানস অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

পরিতোষবাবু জানতেন না যে ব্রিটিশ বিদায়েব সঙ্গে সঙ্গেই অফিসারমাত্রেরই চাকরি খতম হবে। তাঁর আপিস লুট হয়ে গেলেও থানার অফিসার-ইন-চার্জ তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন না, কারণ তিনি আর অফিসার-ইন-চার্জ নন। তিনি কেউ নন। পরিতোষবাবুদের বাড়ী পুড়ে গেলেও দমকল বাহিনী তাঁর ডাকে সাড়া দেবে না। কারণ সে বাহিনীর কার্যকাল ফুরিয়েছে। তিনি যে রেলস্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠতে পারবেন সেটাই বা কেমন করে সম্ভব হবে? যদি ড্রাইভার, গার্ড, লাইনসম্যান কেউ কাজে যোগ না দেয়। তা হলে তিনি তাঁর বাবাকে দেখতে আসবেন কী করে? মোটরে করে? পথে ডাকাত পড়ে মোটরটাই ছিনিয়ে নেবে।

"না, পনেরো দিনের অরাজকতার কথা আমি সমর্থন করিনে। অরাজকতা যদি হয় একদিন কি দু'দিনের জন্যে হবে।" পরিতোষবাবু নেমে আসেন।

"আহা, সেইটেই তো হয়েছিল রেঙ্গুনে। দিন তিনেকের জন্যে। সে ক'টা দিনের বিভীষিকার বৃত্তান্ত কি আপনারা রেঙ্গুনফের্তাদের মুখে শোনেননি? জেলখানা আর পাগলা গারদ খালি পেয়ে যারা বেরিয়ে আসে তাদের আবার জেলখানায় আর পাগলা গারদে পোরার আগে বিষম কাণ্ড ঘটে যায়। বিপ্লবের দিনেও রাশিয়ায় অরাজকতা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট গঠিত হয়। পরিবর্তনটা অধিকাংশ অফিসার মেনে নেন। মানেন না যাঁরা তাঁদের শূন্যস্থান সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়। আসলে অরাজকতার কথাটা গান্ধীজীর মাথায় আসে এইজন্যেই যে ব্রিটিশ রাজ কাউকেই তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করতে রাজী নন। কংগ্রেসকে তো নয়ই, মুসলিম লীগকেও তাঁরা ক্ষমতার আসনে বসিয়ে বিদায় নেবেন না। তা হলে তাঁরা কাউকে আসন ছেড়ে না দিয়েই বিদায় হোন। ঘটুক একটা সাময়িক শূন্যতা। পূরণ করবে হয় কংগ্রেস, নয় লীগ, নয় উভয়ে, নয় আর কেউ। কিন্তু তা যদি হয় তবে তো সেটা সেই রেঙ্গুনের মতো পরিস্থিতি। অমন এক অনিশ্চয়তার মুখে সবাইকে ফেলে দিয়ে ইংরেজরা চম্পট দিলে স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদ লাগবে মিস্টার আচার্য। ওয়ার অভ সাকসেসন বেধে যেতে পারে। কংগ্রেসে ও লীগে। হিন্দুতে ও মুসলমানে। বিশেষ করে পাঞ্জাবে ও বাংলাদেশে। দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে পারে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নামক তত্ত্ব মুসলমানদেব ক'জন মানে? জোর করে চাপাতে গেলে উল্টো বিপত্তি হবে। ওরা ইংরেজকেই আঁকড়ে ধরবে। ইংরেজও ওদের হাতে হাতিয়ার ধরিয়ে দেবে।" মানস শিউরে ওঠে।

পরিতোষবাবু অনেকটা শান্ত হয়ে বলেন, "আমরা ইংরেজদের উপর এতদূর ক্ষেপে রয়েছি যে মুসলমানদের দিকে নজর দিতে হেলা করছি। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের একটা অলিখিত চুক্তি ছিল যে ওরা আমাদের বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। সে কাজ ওরা দু'শো বছর ধরে করেছেও। কিন্তু এখন আর পারছে না। সিঙ্গাপুর, মালয় আর বার্মা হলো ভারতের তিন তিনটি গেটওয়ে বা দেউড়ি। তিনটিই ওরা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে। তার ফলে চুক্তির খেলাপ হয়েছে। তেমনি আরো একটা অলিখিত চুক্তি ছিল ওরা হিন্দুরও পক্ষ নেবে না, মুসলমানেরও পক্ষ নেবে না, হবে নিরপেক্ষ। কিন্তু কার্জনী আমল থেকে আমরা দেখে আসছি ওরা নিরপেক্ষ নয়, ওদের পক্ষপাতটা সুয়োরানীর উপরে। ব্যামফীল্ড ফুলার তো প্রকাশ্যে বলেছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ই ওঁর ফেভারিট ওয়াইফ। সুয়োরাণীর দাবী স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী থেকে শুরু করে স্বতন্ত্র বাসভূমি অবধি গড়িয়েছে। প্রথম দাবীর মতো চরম দাবীও একদিন মেনে নেওয়া হবে। তার মানে আরো এক চুক্তিভঙ্গ। কেন তবে আমরা ঘটনার স্রোতকে ততদূর গড়াতে দিই? কেন তার আগে তৃতীয় পক্ষকে বিদায় না করি? তৃতীয় পক্ষ চলে গেলেই বরং দুই পক্ষে সমঝোতা হতে পারে। তৃতীয় পক্ষ ঘরে থাকতে নয়।"

"সমঝোতা হবে, না গৃহযুদ্ধ হবে, কেমন করে জানলেন? কাগজ খুললেই তো দেখি গালিগালাজ। গালাগালি থেকেই একদিন আসবে মারামারি। ফ্রম ওয়ার্ডস দে মে কাম টু ব্লোজ।" মানস আশঙ্কা করে।

"সেটাও তৃতীয় পক্ষ আছে বলেই। ওরাই তলে তলে উস্‌কে দিচ্ছে। ওরা সরে গেলেই দুই পক্ষে মিটমাট হবে। ঝগড়া তো চিরকাল চলতে পারে না। কিন্তু ওরা যদি দেশটাকে দু'টুকরো করে দিয়ে যায় তবে দুই সমান্তরাল রেখা আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না। যেমন লাগেনি আয়ারল্যাণ্ডে। আইরিশদের উচিত ছিল বিগত মহাযুদ্ধের মাঝখানেই ইংরেজদের আয়ারল্যাণ্ড ছাড়তে বাধ্য করা। ডি ভালেরা সেই চেষ্টাই করেছিলেন, কিন্তু আইরিশদের অধিকাংশই ছিল জার্মানদের বিপক্ষে ও ইংরেজদের পক্ষে। যেমন ছিল ভারতীয়দেরও অধিকাংশ। সেই ভুলটা আমরা এদেশে করব না এই যুদ্ধে। নইলে যা হবে তা আয়ারল্যাণ্ডের পার্টিশনের পুনরাবৃত্তি। আমরা আগে খেদাব ইংরেজকে, তার পরে জাপানীকে। এইখানেই আমাদের গুরুজনদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ। তাঁরা চান আগে জাপানীদের খেদাতে, তারপরে ইংরেজদের।" পরিতোষবাবু খোলসা করেন।

তর্কটাকে থামিয়ে দেয় যূথিকা। "আমরা আপনার চেয়ে কমবয়সী। আমাদের কতটুকু অভিজ্ঞতা! কতটুকু জ্ঞান! কে যে কাকে খেদাবে, কাকে আগে আর কাকে পরে, এসব আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। আমরা শুধু এইটুকু চাই যে আমাদের যেন বিহারের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া না হয়।"

পরিতোষবাবু প্রথমটা ঠাহর করতে পারেন না। মানস তাকে বুঝিয়ে দেয় যে জাপানীরা এতদূর এলে তাকে বিহারে প্রব্রজ্যা করতে হবে, যদি না সে জাপানী সৈন্যদের তোয়াজ করতে রাজী হয়।

"আরে, না, না! আপনি কেন করবেন তোয়াজ? তবে তার আগেই যা ঘটবার ঘটবে, মিস্টার মল্লিক। একটি ছোট পাখী আমার কানে ফিসফিস করে বলেছে যে বিহারীরা এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শুধু গান্ধীজীর কাছ থেকে সিগনালের অপেক্ষা। ওরা ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেবে। মোটর চলাচলও বাধা পাবে। তখন কোথায় থাকবে ইংরেজদের পালাবার পথ! তখন বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করতে হবে। ওদের আমরা ভারত ছাড়াতে চাইনে, গদী ছাড়াতে চাই। হাতীর হাওদার গদীতে বসে আমরাই জাপানীদের তাড়াব। জাপানী এতদূর আসবে না, মিসেস মল্লিক।" অভয় দেন পরিতোষবাবু।

"ওমা, তাই নাকি।" চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা।

"চুপ। চুপ!" পরিতোষবাবু ঠোঁটে আঙুল ঠেকান।

মানস বলে, "কিন্তু ওটা তো গণ সত্যাগ্রহ নয়। যুদ্ধকালে ওর নাম সাবোটাশ।"

পরিতোষবাবু চটে যান। "আরে মশায়, রাখুন আপনার জজিয়তী! কেবল চুলচেরা বিচার। একটা নেশনের লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ স্ট্রাগল কতরকম রূপ নিতে পারে। ওটাও একটা রূপ! যারা পারবে তারা সত্যাগ্রহ করবে। যারা পারবে না তারা সাবোটাশ করবে। যদি নরহত্যা না করে তবে সেটাই হবে যথেষ্ট অহিংসা। দয়া করে বাবার কানে এসব তুলবেন না। তিনি আশা করছেন যে শেষ মুহূর্তে একটা আপস হবে। আরেকটা গান্ধী-বড়লাট চুক্তি।"

বিহারের মতো যুক্তপ্রদেশেও রেল লাইন বন্ধ করার তোড়জোড় চলছে এ রকম একটা গুজবও শোনা গেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে বেগম হায়দারের মুখে। তিনি আরো মাস খানেক দেরি করতেন, কিন্তু ট্রেন চলাচল অনিশ্চিত হতে পারে, এই গুজব শুনে ছুটে এসেছেন। যা রটে তা কিছু কিছু বটে।

আলী হায়দার মানসকে ও তাঁর বেগম যূথিকাকে নিয়ে আলাদা আলাদা ঘরে গিয়ে বসেন। যাতে প্রাণ খুলে কথা বলা সহজ হয়।

"আপনাকে তো গ্রামে গঞ্জে টুরে যেতে হয় না। আমাকে যেতে হয়। আগে তো সবাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে যমের মতো ডরাত। কিন্তু ইদানীং কী এক হাওয়া উঠেছে। যেখানেই যাই এগুা বাচ্চা ছেলে ছোকরা এসে চিল্লায়, 'কুইট ইণ্ডিয়া'। ইচ্ছে করলে ওদের আমি গ্রেপ্তার করতে পারতুম, কিন্তু করিনে। যুদ্ধে ওদের সহযোগিতা আমাদের দরকার। প্রচারকার্য করতে বেরিয়ে গ্রেপ্তারকার্য করতে পারিনে। করলে প্রচারকার্য বৃথা যাবে। সহ্য করতে হয়। হাসিমুখে বলতে হয়, আমি তো ইংরেজ নই। আমি ভারত ছেড়ে যাব কোন্ দেশে? পাকিস্তানে? অমনি ওদের মুখ চুপ। মল্লিক, গান্ধীজীর এই স্লোগান জিন্না সাহেবকেই সাহায্য করছে। তিনিও বলছেন, 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট'। ইংরেজরা কুইট করলে শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়বেই। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান পুলিশ, ইণ্ডিয়ান আর্মি — কোনোটাই আস্ত থাকবে না । উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে কন্ট্রোল করবে কারা? কেমন করে ধ্বংস করতে হয় এ বিদ্যা যাঁরা ওদের শেখাচ্ছেন তাঁরা?" হায়দার হেসে উড়িয়ে দেন। রাজনীতিকদের উপর ওঁর বিশ্বাস নেই।

মানস দুঃখ প্রকাশ করে। "আপনি রাজপ্রতিনিধি বলেই আপনাকে ওরা 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলছে। আপনি যদি পদত্যাগ করেন তা হলে আর অমন কথা বলবে না। তেমনি, বড়লাট যদি পদত্যাগ করেন তবে তাঁকেও না। আক্ষরিক বা কায়িক অর্থে একটি ব্যক্তিকেও ভারত ছাড়তে হবে না। ভারত ত্যাগ মানে পদত্যাগ। 'ভাগ করো আর ত্যাগ করো' বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু শুধুমাত্র পদত্যাগ নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে জিন্না সাহেবের তফাৎ এইখানেই। জিন্না সাহেব ইংরেজকে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ভাগ করিয়ে নেবেন। যে ইংরেজ এমনিতেই রাজ্যরক্ষা করতে অসমর্থ। যার নাকের ডগায় যুক্তপ্রদেশের ও বিহারের জনতা রেল লাইন রোধ করার সাহস পাচ্ছে। যে জাপানীদের রুখতে পারছে না সে জনতাকে রুখবে কিসের জোরে? শেষপর্যন্ত দেখা যাবে জনতাই জাপানীদের রুখছে। একই উপায়ে।"

"তার পর সেই উন্মত্ত জনতার উপর অঙ্কুশ প্রয়োগ করবে কে? না সে নিরঙ্কুশ হয়ে লুটপাট খুনখারাপি ঘর জ্বালানো চালিয়ে যেতে থাকবে? অবশেষে বহুভাগ হয়ে গিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? ইংরেজদের কিসের দায়? ওরা তো পালিয়ে বাঁচবে। জাপানীদেরই বা দায় কিসের? ওরাও ফিরে যাবে। দায় তো আমাদেরই। আমরা যদি যে যার পদে থাকি। না আমরাও পদত্যাগ করে প্রাণে বাঁচব? অরাজকতার দিনে আমাদের কর্তব্য কি 'চাচা, আপনা বাঁচা'? আমি তো মনে করি তার বিপরীত।" হায়দার শক্ত হয়ে বলেন।

"গান্ধীজীও আমাদের পদত্যাগ করতে বলছেন না। যে যার পদে অধিষ্ঠিত থেকে যে যার কর্তব্য সম্পাদন করে যেতেই বলছেন।" মানস জানায়।

"গান্ধীজী তো সেইসঙ্গে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথাও বলছেন। গ্রামে গ্রামে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট বা রেপাবলিক গঠনের নির্দেশও দিয়েছেন। এর মানে কী, মল্লিক? জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের

ক্ষমতা কি গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া যায়? জেলা জজের ক্ষমতা কি গ্রাম্য মোড়লের হাতে তুলে দেওয়া যায়? পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের ক্ষমতা কি মহল্লার সর্দারের উপর ন্যস্ত করা যায়? ক্ষমতা আর দায়িত্ব একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। দায়িত্ব পালন করতে কি এরা সক্ষম? কোন্ দিন কি হবে? ভোটের অধিকার সবাইকে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু শাসনের অধিকার, ন্যায়বিচারের অধিকার, গ্রেপ্তারের অধিকারও কি সবাইকে দেওয়া যায়? ইংরেজদের জায়গায় ভারতীয়দের বসানো যায়, কিন্তু জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবের জায়গায় যাকে তাকে বসানো স্বরাজও নয়, সুরাজও নয়, চরম অব্যবস্থা। ভারতীয়করণ ভালো। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ বলতে যদি এই বোঝায় তবে এটা ভালো নয়। আংশিক ক্ষমতা তো ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারদের উপরে। আরো কিছুর কথা ভাবা যাবে, কিন্তু আপাতত নয়।" হায়দার অভিমত দেন।

মানস চিন্তা করে বলে, "কয়েকটি অফিসারের সর্বময় কর্তৃত্ব সুশাসন হতে পারে, স্বশাসন নয়। স্বশাসনের নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার তথা দায়িত্বের পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এইপর্যন্ত আমি বুঝি। কিন্তু খুঁটিনাটি বুঝিনে। ব্রিটিশ আমলে ক্ষমতা নেমেছে উপরের দিক থেকে নিচের দিকে। স্বাধীন আমলে ক্ষমতা উঠবে নিচের থেকে উপরে। নিচের স্তরের নাগরিকরা যদি হৃদয়ঙ্গম করে যে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সাহেবের দায়িত্ব তারা পালন করতে অক্ষম তা হলে সেসব ক্ষমতা তারা জেলা স্তরে অর্পণ করবে। গান্ধীজীর স্বপ্ন এমন এক রাষ্ট্র যার চতুরঙ্গ নয় আর্মি, পুলিশ, কোর্ট ও জেল। এ স্বপ্ন স্বরাজের পরেও স্বপ্নই থেকে যাবে। তিনিও আপাতত ততদূর যেতে বলছেন না। দেশ তার জন্যে প্রস্তুত নয়।"

ওদিকে বেগম হায়দার বলছিলেন যূথিকাকে, "বর্তানিয়ার সঙ্গে জাপানের লড়াই তো থমকে রয়েছে। ওরাও আসছে না, এরাও যাচ্ছে না। ভাবছিলুম আরো কিছুদিন দেখি না কী হয়। বেঙ্গল যখন নিরাপদ হবে তখন ওঁর সঙ্গে মিলিত হব। কিন্তু শুনলুম সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই শুরু হয়ে গেলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। কে জানে কতকাল আটকা পড়তে হবে। কংগ্রেসীরা নাকি বলছে এবার ওরা জেলে যাবে না। উল্টে ওরাই জেলে পাঠাবে। কী ভয়ঙ্কর কথা। তা হলে তো মিস্টার মল্লিকও নিরাপদ নন, মিস্টার হায়দারও না। জানিনে এখানে কংগ্রেসের জোর কত। ওখানে বড়ো কম নয়। সামনে একটা এসপার কি ওসপার। ওখানেও ভয় এখানেও ভয়। ভেবে দেখলুম আমার স্থান আমার সাহেবের পাশেই। তাই আর দেরি না করে চলেই এলুম।"

"ভালোই করেছেন। তবে আমি তো ভয়ের তেমন কোনো আভাস পাচ্ছিনে। না জাপানের দিক থেকে, না কংগ্রেসের দিক থেকে। যাই ঘটুক না কেন আমি আমার কর্তাকে ফেলে আর কোথাও যাব না। তবে বলতে পারছিনে সরকার তাঁকে আর কোথাও বদলী করবে কি না, আর কোনো পদে নিযুক্ত করবে কি না। ফ্রন্টে পাঠাতেও পারে। পাঠালে উনি যাবার জন্যে লাফাবেন। আজকের জগতে উনি নীরব দর্শক থাকতে চান না। ভয়ের কারণ আছে বইকি। ভয়কে জয় করতে হবে।" যূথিকা সাহস দেয়।

"আমিও কি আমার সাহেবকে বেশীদিন ছেড়ে থাকতে চাই? ওঁকে একলা ছেড়ে দিতে চাই? কিন্তু ওঁর স্বপ্ন যদি কখনো সফল হয়, পাকিস্তান সম্ভব হয়, তবে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। পাঞ্জাবীদের শিকড় পাকিস্তানেই, তাদের তো শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে নতুন করে মাটিতে পুঁততে হবে না। তাদের অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিচ্ছেদ ঘটবে। তারা পাকিস্তান চাইতেও পারে, পেতেও পারে। কিন্তু ওদের বেলা যেটা সুখের আমাদের বেলা সেটা দুঃখের। পরম দুঃখের। সাতশো বছরের একটা বটগাছকে তার ঝুরিসমেত শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে গিয়ে আরেক জায়গায় পুঁততে পারো, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারবে না। আমাদের বংশ যুক্তপ্রদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঘরবাড়ী জমিজমা মসজিদ গোরস্থান মক্তব মাদ্রাসা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব কিছু ফেলে চলে যাব? শহরে গ্রামে

আমাদের নাম গাঁথা। রাস্তায় ঘাটে আমাদের পরিচয় আঁকা। ভাষায় সাহিত্যে সঙ্গীতে নৃত্যে আমাদের ছাপ, আমাদের প্রভাব। সব মুছে যাবে? সাতশো বছরের কালচার বিলকুল সাফ? আর পাঞ্জাবীদের কি কালচার বলে কোনো পদার্থ আছে? কালচার বলতে ওরা বোঝে এগ্রিকালচার। আর মিলিটারি সার্ভিস। মনের দিক থেকে আমরা নিঃস্ব হয়ে যাব, যদি পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করি। ওঁর কাছে যেটা হোমল্যাণ্ড আমার কাছে সেটা ওয়েস্টল্যাণ্ড।" দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বেগম হায়দার। তাঁর গলা ভারী হয়ে আসে।

"ওঁরা তো বাংলাদেশকেও পাকিস্তানের সামিল করতে চান। সেটা সম্ভব হলে কলকাতায় এসে নতুন করে শিকড় গাড়বেন। তা যদি হয় তবে কালচারের অভাব হবে না। আপনি নিশ্চয় মানবেন যে বাঙালীদের কালচার আছে। বাংলার কবি এখন বিশ্বকবি।" যূথিকা সগর্বে বলে।

"হ্যাঁ, বাঙালীদের কালচার আছে তা ঠিক। কিন্তু সেটাতে মুসলমানের দান কতটুকু? আমরা যদি আসি আমরা কি ওতে আমাদের দান মিশিয়ে দিতে পারব? যেমন গঙ্গার সঙ্গে যমুনার স্রোত? বাংলার মুসলমান তো আমাদের বাঙালী না বানিয়ে ছাড়বে না। আর আমরা যদি ওদের হিন্দুস্থানী — না, না, পাকিস্তানী — বানাতে যাই তবে আমাদের মেরে তাড়াবে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে আলমগীর বাদশা কী বলে গেছেন, জানেন? ওটা একটা নরক, যেখানে সবরকম সুখাদ্য পাওয়া যায়।" বেগম সহাস্যে বলেন।

"তা হলে এই নরকটাকে পাকিস্তানের সামিল করে স্বর্গে পরিণত করা যাবে না। অমন একটা বিদ্‌ঘুটে প্রস্তাব প্রত্যাহার করাই ভালো। আপনারা আসুন, থাকুন, দান করতে চান করুন। আমরা স্বাগত জানাব। কিন্তু এটা যদি আপনাদের হোমল্যাণ্ড হয় তো আমাদের কী হবে? ফরেন ল্যাণ্ড? না আমাদের শিকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে যুক্তপ্রদেশের মাটিতে নতুন করে পোঁতা হবে? বাঙালীকে বানাতে হবে হিন্দুস্থানী? হিন্দুয়ানী আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। হিন্দীভাবা তো পাইনি। আমরাই বা হিন্দীতে কী দান করতে পারি? হিন্দীতে লিখে কি আমাদের একজন নোবেল প্রাইজ পেতে পারবেন? বাংলাদেশ আমরা ছাড়ব না, কলকাতা তো নয়ই, তার আগে মারব ও মরব।" যূথিকা গভীরভাবে শুনিয়ে দেয়।

"আপনার সেন্টিমেন্ট আমারও সেন্টিমেন্ট। শিকড় তুলে নিতেও কষ্ট, শিকড় নতুন করে পুঁততেও কষ্ট। অকারণ এই কষ্ট!" বেগম হাতে হাত মেলান।

ওদিকে আলী হায়দার বলছিলেন মানসকে, "ইয়ে ক্রান্তিকারী জমানা হ্যায়।" জবাহরলালের হিন্দী উর্দু মেশানো ভাষায়। "এ জমানায় সব কিছুই সম্ভব। ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা, হিন্দুদের হাত থেকে পাকিস্তান, বুর্জোয়াদের হাত থেকে বিপ্লবী রাষ্ট্র। কিন্তু তার আগে জাপানকে রুখতে হবে, হটাতে হবে, হারিয়ে দিতে হবে। তাকে কোনোরকম প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অথচ সেই জিনিসটিই প্রকারান্তরে হতে যাচ্ছে। গণ সত্যাগ্রহ যদি যুদ্ধকালে না হয়ে শান্তিকালে হতো আমার তাতে আপত্তি থাকত না। কিন্তু যুদ্ধকালে গণ সত্যাগ্রহ মানে জাপানকে প্রশ্রয়দান। জাপান এই ক্রান্তিকারী জমানার সুযোগ নিয়ে আরো এক কদম এগিয়ে আসবে। গান্ধীজী অবশ্য বলে রেখেছেন যে তিনি তেমন কিছু ঘটতে দেখলে গণ সত্যাগ্রহ বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু বোতলে বন্দী দৈত্যকে একবার বোতল থেকে মুক্তি দেওয়া যত সহজ আবার বোতলে বন্দী করা তত সহজ নয়। গান্ধীজী ডাক দিলে যত লোক সংগ্রামে ঝাঁপ দেবে পরে তিনি তত লোককে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। তারা তখন উন্মাদ। তখন তাদের উপর গুলী চালাতে হবে। সেই অপ্রিয় কর্তব্যটা আমার। কিংবা তাদের ফাঁসী দিতে হবে। সেই অপ্রিয় কর্তব্যটা আপনার। গান্ধীজী তো নিজেই স্বীকার করছেন যে জনগণ এখন অহিংসার জন্যে প্রস্তুত নয়। তাই যদি হয়ে থাকে তবে কংগ্রেসের আন্দোলন অহিংস থাকতে পারে না। দিকে দিকে চৌরীচৌরার পুনরাবৃত্তি হবে। তিনি থামতে বললে কেউ থামবে না। সংগ্রামমাত্রেরই একটা মোমেন্টাম আছে। সেই মোমেন্টাম কারো হুকুমে থামবে না। রাজা ক্যানিউটের মতো অবস্থা হবে গান্ধীজীর। সমুদ্রকে তিনি হুকুম দিয়েছিলেন,

এইপর্যন্ত। এর বেশী নয়। সমুদ্র তাঁর সে হুকুম মানেনি। তাঁকে তাঁর চেয়ারসুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এযাত্রা গান্ধীজীর প্রাণসংশয়।" হায়দার করুণস্বরে বলেন।

মানস অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। সে ভালো করেই জানে যে বামপন্থীরা ওৎ পেতে বসে আছে। গান্ধীজী যেই সংগ্রামের সঙ্কেত দেবেন অমনি ওরাও সেই সংগ্রামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তাদের সহিংস কার্যকলাপ শুরু করে দেবে। জেলে যাওয়া ওদের মতলব নয়। জেলে গেলে ওরা জেলকেই ভাঙবে। জেল কর্মচারীদের ভাঙিয়ে নেবে। পুলিশ কর্মচারীদেরও। জওয়ানদেরও। দক্ষিণপন্থীরা ভালোমানুষের মতো জেলে গিয়ে দায়িত্ব এড়াবেন। গান্ধীজীকে অনশন করতে হবেই। তার আভাসও তিনি দিয়ে রেখেছেন। তাঁর পক্ষে জীবন মরণ সমস্যা। তাঁকে বারণ করতে পারেন একমাত্র বড়লাট লিনলিথগাউ। তাঁর বন্ধুপ্রতিম। কিন্তু বারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু করাও দরকার। সেটা তাঁর সঙ্গে সমঝোতা। সমঝোতা যদি না হয় তো সংগ্রাম অনিবার্য। জাপান তার সুযোগ নিতেও পারে, না নিতেও পারে। ইংরেজকে বিতাড়ন করা যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তো কংগ্রেসই সে কাজ করে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে। জাপানী সৈন্যকে মরতে পাঠিয়ে কেন তারা অনর্থক বলক্ষয় করবে?

"আমি গভীরভাবে চিন্তিত।" মানস মৌনভঙ্গ করে। "হ্যামলেটের মতো আমার জিজ্ঞাসা, টু বি অর নট টু বি। দুই দিকেই যথেষ্ট যুক্তি আছে। জোরালো যুক্তি। দুই দিকের পাল্লা যেখানে সমান সেখানে যুক্তির চেয়ে বলবান হয় বিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাসও বলতে পারেন। গান্ধীজী একজন ম্যান অভ ফেথ।"

"আমিও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। যুক্তপ্রদেশে আমার আত্মীয়স্বজনের দশা ভেবে। আমার দশা তো দেখছেনই।" হায়দার বিলাপ করেন।

।। আঠারো ।।

রায় বাহাদুর মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা আসেন, সকালবেলা কখনো নয়। জানেন যে তখন মানস ব্যস্ত থাকে। সেদিন সকাল সাড়ে আটটায় তাঁকে আসতে দেখে মানস সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে ওঠে।

"শুনেছেন? খবরটা শুনেছেন?" রায় বাহাদুর ফ্যাকাশে মুখে বলেন।

"খবর। কী খবর!" মানস চমকে ওঠে।

"বোম্বাইয়ের খবর। মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা গ্রেপ্তার। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বেশীর ভাগ সদস্য গ্রেপ্তার, অন্যেরা ফেরার। সারা ভারত জুড়ে ধরপাকড়। কংগ্রেস বেআইনী প্রতিষ্ঠান। গান্ধীজীকে আরম্ভই করতে দেওয়া হলো না। আরম্ভের পূর্বেই ইতি। উদয়ের পূর্বেই অস্ত। বড়লাট গান্ধীজীর অস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন।" রায় বাহাদুর বিচলিত।

মানস তো শুনে থ। তার বাক্স্ফূর্তি হয় না। আবেগে তার কণ্ঠরোধ হয়।

রায় বাহাদুর বলে যান, "গণ সত্যাগ্রহও তো একপ্রকার যুদ্ধ। একটা যুদ্ধের মাঝখানে তো আরেকটা যুদ্ধ বাধাতে দেওয়া যায় না। গণ সত্যাগ্রহ চলতে থাকলে যুদ্ধের কী হাল হতো? জওয়ানরা একাগ্র হয়ে লড়ত কী করে? যুদ্ধে হার হোক কোন্ ইংরেজ এটা চায়? ক'জন ভারতীয় এটা চায়? কাজেই বড়লাটকে আমি দোষ দিতে পারছিনে।"

মানস ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। "আপনি কি বুঝতে পারছেন না যিনি স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে যাচ্ছিলেন তাঁকে তাঁর বক্তব্য বলতে না দিয়ে তাঁর স্বাধীনতা হরণ করা কত বড়ো স্বেচ্ছাচারিতা? কে জানে শেষমুহূর্তে একটা সমঝোতাও হয়ে যেতে পারত। তা হলে আর গণ সত্যাগ্রহের প্রয়োজন

হতো না।"

"আপনি, মশায়, ভিতরের লোক হয়েও ভিতরের খবর রাখেন না। পুলিশ সাহেবের মুখে শুনেছি গান্ধীজীকে মিস্টার চার্চিল উগাণ্ডায় চালান করতে চেয়েছিলেন। সেখানে না হলে এডেনে। বড়লাটই তাঁকে নিবৃত্ত করেন। জল ইতিমধ্যে অনেকদূর গড়িয়েছে, মিস্টার মল্লিক। বোম্বাই থেকে কোন্‌খানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জানিনে, কিন্তু যেখানেই হোক এদেশেই তিনি থাকছেন। তাঁকে সমুদ্রযাত্রা করতে হবে না। বড়লাট তাঁর বন্ধু। বন্ধুকে বন্ধু ভারত ছাড়তে দিলেন না। যদিও নিজে ভারত ছাড়ার নোটিশ পেয়েছিলেন।" রায় বাহাদুর কটাক্ষ করেন।

"আহা, সেটা তো আক্ষরিক অর্থে নয়।" মানস বুঝাতে চেষ্টা করে। তার প্রাণে অসহ্য বেদনা। বুকে শেল বিঁধেছে।

"দেখুন মল্লিক সাহেব, যারা বার্মা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তারা বাধ্য হলে ভারতও ছাড়তে পারে। বাধ্য করলে জাপান করবে, গান্ধীজী নয়। তার আগে ওরা গান্ধীকেই ভারতছাড়া করবে। খাঁচাছাড়াও করতে পারে, যদি গণ সত্যাগ্রহ হয় গণ হত্যাগ্রহ।" রায় বাহাদুর হুঁশিয়ারি দেন।

"সেটা কার দোষে? ওঁরা যদি অহিংসাবাদীর অহিংস অস্ত্র কেড়ে নেন তবে হিংসাবাদীর সহিংস অস্ত্রই তার একমাত্র বিকল্প। অহিংসাকে দুর্বল হতে দিলে হিংসাই প্রবল হয়।" মানস যুক্তি দেখায়।

"মল্লিক সাহেব, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি, এটা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির দ্বন্দ্ব। গান্ধীজীর ইচ্ছা বনাম বড়লাটের ইচ্ছা। সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। সমঝোতা অসম্ভব।" রায় বাহাদুর উড়িয়ে দেন।

তিনি বসতে আসেননি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলেন ও বিদায়ের জন্যে পা বাড়ান। মানস তাঁকে এগিয়ে দেয়।

"আপনি আমাকে আলটিমেটাম দেবেন আর আমি আপনাকে বন্ধুভাবে রিসিভ করব। তা হয় না, মিস্টার মল্লিক। আমি রাজপ্রতিনিধি। রাজাস্থানীয়। আমারও তো প্রেস্টিজের প্রশ্ন আছে। আলটিমেটামটা অহিংসার মোড়কে মোড়া হলেও ওটা রাজশক্তিকে কুইট নোটিস। আপনি আমাকে কুইট নোটিস দিলে আমি কি আমার দরজা বন্ধ করতে পারিনে? গান্ধীজীকে সদলবলে গ্রেপ্তার করে বড় লাট যা করেছেন তাকে ইংরেজীতে বলে টেবিল ওলটানো। বড়লাট গান্ধীজীর উপর টেবিল উলটিয়েছেন। খুব খারাপ লাগছে ভাবতে। মনে করবেন না যে আমি একটুও খুশি। গান্ধীজীর একটা কেস আছে। গত মহাযুদ্ধে ইংরেজকে তিনি জয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন। স্বয়ং বড়লাট চেমসফোর্ড সভাস্থলে নিজের প্রস্তাব সমর্থনের জন্যে আর কাউকে না ডেকে গান্ধীজীকেই ডেকেছিলেন। সেটা সমর্থন করার মতো শিভালরি গান্ধীজীর ছিল। তিনি স্বরাজের শর্তে নয়, বিনা শর্তে যুদ্ধকালে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সৈন্য সংগ্রহ করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন। কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী। কোথায় স্বরাজ! তার বদলে রাউলাট অ্যাক্ট। সেই যে বেইমানী গান্ধীজী সেটা ভোলেননি। তাই এবারকার যুদ্ধে সহযোগিতা করছেন না। জানেন যে ইংরেজ এর পরিবর্তে স্বরাজ দেবে না। কাজ ফুরোলে পাজী বলবে। এবারকার ফরমুলা 'আগে তো তুমি স্বরাজ দাও, তার পর আমি তোমাকে আমার দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে তোমার সৈন্যদল নিয়ে লড়াই করতে দেব। কিন্তু আমার সৈন্যদের লড়তে দেব না।' আমার মতে গান্ধীজীর এটা বাড়াবাড়ি। আমাদের জওয়ানরা অহিংস নয়। তারা বলে, মারেঙ্গে অওর মরেঙ্গে। তাদেরকে লড়তে না দিলেই বরং তারা অসুখী হবে। লড়তে দিলে ওদের কেউ কেউ ভিক্টোরিয়া ক্রস পর্যন্ত অর্জন করবে। কতরকম মেডেল তো পাবেই। র‍্যাঙ্কও উচ্চতর হবে। এবার বহু ভারতীয়কে কমিশন দেওয়া হয়েছে। কিংস কমিশন। ভাইসরয়স কমিশন। মিলিটারি অফিসাররাও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। পুলিশ সাহেব পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধটা একটা

গোয়িং কনসার্ন। তুমি যদি ক্ষমতাসীন হও তোমাকেও এই গোয়িং কনসার্নকে গোয়িং রাখতে হবে। যতদিন না একপক্ষ জেতে, অপরপক্ষ হারে বা খেলায় দুই পক্ষের ড্র হয়। আমার মনে হয় গান্ধীজীর ইচ্ছা নয় যে ভারতীয় সৈন্যরা জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে মারামারি করে।" রায় বাহাদুর দুই পক্ষের কেস বিশ্লেষণ করে রায় দেন। যেন তিনিই এ মামলার বিচারক।

মানস তাঁকে বিদায় দেয়। বলে, "আমার তো রেডিও নেই। আপনার কাছেই তরতাজা খবর জানতে চাইব। আমিই আসব।"

কিন্তু খবর কোথায় যে কেউ জানবে বা জানাবে? 'স্টেটসম্যান' ভিন্ন আর সব কাগজ বন্ধ। রেডিওতে সামান্যই বলে। মোটের উপর নিউজ ব্ল্যাক আউট। কংগ্রেস কী করছে, জাপান কী করছে কেউ জানতে চাইলে দেখে চারদিক অন্ধকার। মানসের মনে দারুণ উদ্বেগ। গান্ধীজী বেঁচে আছেন কি না কে জানে! তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের কোর্ট মার্শাল করা হচ্ছে, না সাধারণ আদালতে হাজির করা হচ্ছে? না আদৌ বিচারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না? তাঁরা বিনা বিচারে বন্দী? বিদেশের কাগজে ও রেডিওতে তাঁদের বিরুদ্ধে জোর অপপ্রচার চলেছে। যেন তাঁরা জাপানের পঞ্চম বাহিনী। অপবাদের বিরুদ্ধে তিনি অনশন করছেন না তো?

সংবাদের সন্ধানে মানস ও যূথিকা যায় সাংবাদিক শিরোমণি ভবতোষ বাবুর সকাশে। তিনি বিমর্ষভাবে বলেন, "আমিও অন্ধকারে। এমনতর নিউজ ব্ল্যাক-আউট আমি জীবনে দেখিনি। লিখব কী, যদি লেখার মালমশলা না থাকে? ভাবনায় পড়েছি। পুরোনো কথা মনে পড়ছে। ভাবছি তারই উল্লেখ করব। আপনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে অকালে বিদায় নেবার চিন্তা করছেন, আপনার পূর্বসূরী অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে অকালে অবসর নিয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পত্তন করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট হন সেকালের যত নামকরা ব্যারিস্টার বা অধ্যাপক বা অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান বা জজ, ভারতভক্ত ইউরোপীয়, দেশভক্ত মুসলমান বা পার্শী। হিউম স্বয়ং ছিলেন সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসের জেনারল সেক্রেটারি। তখনকার দিনে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল কম। তাঁদের সবাইকে তিনি ১৮৯২ সালে একখানি চিঠি লেখেন। সে চিঠির বয়ান এখনো আমার স্মরণ আছে। কারণ তার বিষয়বস্তু অবিস্মরণীয়। এখন দেখছি হিউম সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে।"

মানস কৌতূহল প্রকাশ করে। যূথিকাও। দু'জনেই উৎকর্ণ।

"তাঁরই ভাষায় তর্জমা করে যতটা মনে আছে বলছি। সদস্যদের সম্বোধন করে তিনি লেখেন, 'আপনারা বিশেষত যাঁরা ধনী ও অবস্থাপন্ন, তাঁরা বুঝতে পারছেন যে বর্তমান শাসনব্যবস্থা কেবল যে দেশের চাহিদা পূরণের অনুপযোগী তাই নয়, এ ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে তৈরি করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে এক ভয়াবহ বিপর্যয়। এদেশের মানুষ খুবই ধৈর্যশীল, খুবই শান্তশিষ্ট। কিন্তু ফ্রান্সের মানুষও তো তাই ছিল ফ্রান্সের রাজা ও অভিজাতদের নিপাত করার মাত্র বিশ বছর — না, মাত্র দশ বছর — পূর্বেও। বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য শেষপর্যন্ত সেই ভেড়ার পালকে প্রায় রাতারাতি পরিণত করে একদল নেকড়েবাঘে। মনে করবেন না সরকার সেদিন আপনাদের অথবা নিজেকে বাঁচাতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হবার মতো হয়তো কোনো শত্রু পাওয়া যাবে না। কিন্তু রেলপথে বা সড়কে যাতায়াত অসম্ভব হবে, টেলিগ্রাফ থাকবে না, সাঁকো চুরমার হবে, সরবরাহ বন্ধ হবে। হাজার হাজার দুষ্কৃতকারী হয়তো মারা যাবে, কিন্তু তাতে কী লাভ হবে? আর নেতা? সময় হলে কি নেতার অভাব হবে?' এসব কথা আমার নয়, তাঁর।" সম্পাদকপ্রবর স্মরণ করেন।

মানস যূথিকার দিকে চেয়ে বলে, "পঞ্চাশ বছর পরে প্রায় সবটাই মিলে যাচ্ছে। কী অসাধারণ দূরদৃষ্টি।"

ভবতোষবাবু বিষণ্ণ মুখে বলেন, "সেইসঙ্গে মনে পড়ছে মহামতি রাণাডের একটি উক্তি। এদেশে আমরা কোনো কাজই করতে পারব না, আমাদের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হবে না, যদি না হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলায়। আজকের পরিস্থিতিতে হিন্দুর পাশে মুসলমান কোথায়? হয়তো দু'চার জায়গায় আছে। সেটা ব্যতিক্রম। কাজেই ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে এই বিপর্যয়ের বিসমিল্লায় গরমিল। এ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কংগ্রেস সেইসব অংশই পাবে, যেসব অংশে সে প্রবল। বাকীটা যাবে পাকিস্তানে। ইংরেজরা যদি যায়। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় কংগ্রেস তার নেতাকে মানেনি, অহিংস থাকেনি। তার আন্দোলন হিংসার দিকে বাঁক নিয়েছে। ইংরেজরা জানে কেমন করে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। জানে না শুধু অহিংসার সঙ্গে মোকাবিলার উপায়।"

এর পরে যুদ্ধের কথা। চার্চিলের মতিগতি থেকে মালুম হয় তিনি বরং জাপানীকে ভারতে ঢুকতে দেবেন, তবু ভারতীয়দের হাতে ভারতকে ছেড়ে দেবেন না। জাপানীরা নিলে তাদের হাত থেকে পরে ফেরৎ পাওয়া যাবে। কিন্তু ভারতীয়দের হাতে সম্প্রদান করলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

"কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু আরো একটা কথা আছে, সেটা না ইংরেজ না কংগ্রেস কেউ গণনার মধ্যে আনছেন না।" ভবতোষবাবু তাঁর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, "চট্টগ্রামে বা মণিপুরে জাপানী ফৌজের সামনে দাঁড়াতে না পারলে ইংরেজ সৈন্য আরেকটা ডানকার্ক করতে পারে, কিন্তু ভারতীয় জওয়ানদের আরো একটা অপশন আছে। তারা তাদের মাতৃভূমির রক্ষক। অন্তত তাদের অফিসারদের মধ্যে এ চেতনা জেগেছে। ভারতীয় ফৌজ জাপানীদের সঙ্গে সমানে লড়ে যাবে ও সফল হলে ইংরেজদের সঙ্গেও। মিউটিনির জন্যে আরো পনেরো বছর অপেক্ষা করতে হবে না। তখন কোথায় তোমার ইংরেজ আর কোথায় তোমার কংগ্রেস! ভারতীয় ফৌজের যিনি অধিনায়ক তিনিই হবেন দেশের সর্বময় কর্তা।"

মানস কখনো এ লাইনে চিন্তা করেনি। এ তো সাংঘাতিক কথা। ইংরেজও থাকবে না, কংগ্রেসও থাকবে না, গান্ধীজীও থাকবেন না, কর্তা হয়ে বসবেন অচেনা অজানা এক সামরিক নেতা। দেশ শাসন করবে তাঁর মিলিটারি জান্টা। অবশ্য ইংরেজ যদি আরেকটা ডানকার্ক করে ও যেখানে খুশি পোড়ামাটি করে দেশের লোকের হাড় জ্বালায়।

"দ্য ব্যাটল অভ্ ইণ্ডিয়া উইল বি ফট অ্যাট চিটাগং অর মণিপুর।" সে ইংরেজীতে বলে। "কিন্তু ভারতীয়রা যদি বীরত্ব না দেখায় তবে ভারতরক্ষা তাদের কর্ম নয়। দেশ শাসনও তাদের অধিনায়কের সাধ্য নয়। সুতরাং আমাদের সেকেণ্ড লাইন অভ ডিফেন্স হবে গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র বা ভিলেজ রেপাবলিক। অঞ্চলে অঞ্চলে জাতীয় সরকার। যার নির্দেশ গান্ধীজী দিয়ে গেছেন। প্রত্যেক নাগরিককেই ভাবতে হবে যে সে স্বাধীন। সে পরাধীনতামুক্ত। কোথায় ক'টা ট্রেন অচল করে দেওয়া গেল সেটা তার স্বাধীনতার পরিমাপক নয়। কোথায় ক'টা পঞ্চায়েৎ গড়ে উঠল আর সচল হলো সেটাই পরিমাপক। স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা খুন জখম দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। করতে হয় গড়ার কাজ দিয়ে।"

"শুনছি তমলুকে না কোথায় যেন জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু কাজ কেমন করছে জানিনে।" ভবতোষবাবু বলেন, "বাঙালীর যা স্বভাব। দু'দিন পরেই শুরু হবে দলাদলি। ক্ষমতার লড়াই। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত এই আমাদের জাতীয় প্রকৃতি। ইংরেজ গেলেই বা জাপানী না এলেই যে আমরা দলাদলি বা ক্ষমতার লড়াই ছেড়ে মিলে মিশে কাজ করব আমি তো মনে করি এটা একটা সুখস্বপ্ন। তবে একজন ডিকটেটর যদি মাথায় চড়ে বসেন সেকথা আলাদা। সেটা জাতীয় স্বাধীনতা হতে পারে, ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়। তেমন রাজত্বে বাস করতে আমার রুচি হবে না। যে পরিমাণ ব্যক্তিস্বাধীনতা আমরা ইংরেজ আমলে পেয়েছি তার নজীর ভারতের ইতিহাসে নেই, বাংলার ইতিহাসেও না। সেটা যদি হারিয়ে যায় তো জাতীয় স্বাধীনতাও সে ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না। চেয়ে দেখুন

ইটালীর দিকে। ইটালীও পরাধীন দেশ ছিল। আমাদের যৌবনে আমরা মাৎসিনি, গ্যারিবাল্‌দির ভক্ত ছিলুম। ইটালী তখন সদ্য স্বাধীন। কত আশা ছিল তার উপরে! সেই দেশ কিনা দেখতে দেখতে উপনিবেশের জন্যে পরের দেশ আক্রমণ করে। শেষে ফাসিস্ট বনে যায়। কে জানে কী আছে ভারতের কপালে!''

কলকাতা থেকে আসেন ভবতোষবাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে তাঁর পুত্র পরিতোষবাবু। সঙ্গে একরাশ পত্র পত্রিকা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তথা বিদেশের। ফিরে যাবার সময় নিয়ে যান পিতার সম্পাদকীয় রচনা। পরিতোষ যেবার স্বয়ং আসতে পারেন না সেবার তাঁর স্ত্রীকে পাঠান। আরতি দেবীকে।

একদিন পরিতোষবাবু ও আরতি দেবী দু'জনেই এসে হাজির হন মানসের কুঠিতে। মানস একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, ''এবার দেখছি আপনারা জোড়ে এসেছেন। ব্যাপার কী?''

''আমরা ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতা নিয়ে যেতে চাই। জাপানী বোমার ভয় কেটে গেছে। জাপানীরা এখন ভারতীয়দের মিত্ররূপে পেতে চায়। মিত্র কে? যে আমার শত্রুর শত্রু। শত্রু কে? ইংরেজ। শত্রুর শত্রু কারা, যারা রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশ স্টেশন দখল করেছে বা করতে গিয়ে গুলী খেয়েছে। যেখানে পেরেছে সেখানে প্যারালেল গভর্নমেন্ট স্থাপন করেছে। না, মিস্টার মল্লিক, কলকাতার উপর জাপানী বোমা আর পড়বে না। তা হলে বাবার এখানে পড়ে থাকার কী দরকার? আমরাই বা কতবার তাঁকে দেখতে আসব?'' পরিতোষবাবু উত্তর দেন।

মানস শুনে দুঃখিত হয় যে ভবতোষবাবুর সঙ্গ থেকে সে অচিরে বঞ্চিত হবে। ''আপনার বাবা কি যেতে রাজী হয়েছেন?''

''না, মিস্টার মল্লিক। তাঁর একটা চেঞ্জের দরকার ছিল। এই শহরে আগেকার দিনে কলকাতার লোক চেঞ্জে আসত। আজকাল আর আসে না। তিনি স্বজনবৎসলা ও স্বজেলাভক্ত। বাড়ীটাও পৈত্রিক সম্পত্তি। এখানে এসে তিনি তাঁর বাল্যকালে ফিরে গেছেন। খোলামেলায় চেঞ্জও হচ্ছে। তা ছাড়া তিনি বিশ্বাস করেন না যে এই আন্দোলন বেশীদিন চলবে। এটা থেমে গেলে জাপান আবার বোমা ফেলবে। অতএব সাবধানের মার নেই।'' পরিতোষবাবু হাসেন।

''আমরা তো এখনো অন্ধকারে রয়েছি। দেশের কোথায় কী হচ্ছে তা জানবার একমাত্র মাধ্যম সরকারী রেডিও। কিংবা ইংরেজদের 'স্টেটসম্যান'। আপনারা কী করে অতটা নির্ভয় হলেন যে জাপানী বোমা আর কখনো পড়বে না? কলকাতা যখন গোরা সৈনিকে ভরে গেছে।'' মানস প্রশ্ন করে।

· পরিতোষবাবু একটু খাটো গলায় জবাব দেন, ''অন্ধকারের ভিতর দিয়েও আমরা অনেকদূর দেখতে পাচ্ছি। বিহারে এখন গভর্নর বলতে কেউ নেই। যিনি আছেন তাঁর রাজত্ব পাটনা দানাপুরের বাইরে নয়। মেদিনীপুরের অভ্যন্তরেও ব্রিটিশ রাজত্ব বলে কিছু আছে নাকি? রামনগর থানায় এখন কংগ্রেস রাজত্ব। জাপানীরা কি এসব খবর রাখে না? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট ভারতীয় আছে। ওদের বিশ্বাস দেশকে স্বাধীন করতে হলে বিদেশীদের সাহায্য চাই। কংগ্রেসের একার সাধ্য নয়। কিন্তু কংগ্রেস আর কারো সাহায্য না নিয়ে একাকী যা করেছে তা সারা দুনিয়াকে নাড়া দিয়েছে। গত মহাযুদ্ধের মাঝখানে বোলশেভিকরা যা করেছিল তা নিয়ে বই লেখা হয়েছে ' টেন ডেইজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্লড'। এই মহাযুদ্ধের মাঝখানে কংগ্রেস যা করেছে তা নিয়েও পরে হয়তো বই লেখা হবে, 'টোয়েন্টি ডেইজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্লড'। আমাদের আক্ষেপ কেবল এই যে বড়লাট গান্ধীজীকে আরো তিন সপ্তাহ সময় দিলেন না। সেই তিন সপ্তাহে কংগ্রেসের প্রস্তুতি তিনগুণ ব্যাপক হতো। মহকুমাকে মহকুমা, জেলাকে জেলা জনতার দখলে আসত। বড়লাট সেটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই আর একটা দিনও সময় দিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এযাত্রা বর্তে গেল।''

''তা এখনো তো আন্দোলন থামেনি।'' মানস যতদূর জানে।

"থামবেও না। যতদিন না লোকে দেখতে পায় যে রাশিয়া থেকে জার্মানরা হটছে, বার্মা থেকে জাপানীরা হটছে, রাশিয়ানরা এগোচ্ছে, ইংরেজরা এগোচ্ছে। তবে এই আন্দোলনের গতিবেগ কমে আসছে। যেমন ঝড়ের গতিবেগ। সেটা তো মানুষের হাতে নয়। তেমনি এটাও। গান্ধীজী নিমিত্তমাত্র। ইতিহাসের ইঙ্গিতে তিনি একটা স্টার্ট দিলেন। মহাদেব দেশাই হঠাৎ বন্দিশালায় মারা না গেলে গান্ধীজী বোধ হয় অনশন করতেন। তাতে আন্দোলনটা হয়তো তাঁর শাসন মানত। কিন্তু তাঁকে অনুমতি না দিলে তিনি সারথির মতো চালিয়ে যেতেন কী করে?" পরিতোষবাবু সুধান।

"অনশনের আমি পক্ষপাতী নই। কিন্তু তিনি যেমন মানুষ বিবেকের তাড়নায় তাঁকে অনশন করতেই হতো। যাতে কেউ না বলে যে তিনি হিংসার সমর্থন করেন। এই আন্দোলনকে অহিংস বলা শক্ত।" মানস কুণ্ঠিত।

"আরে, রেখে দিন আপনার অহিংসা। স্বাধীনতা আগে না অহিংসা আগে? এতকাল পরে অহিংসার মোহ ভেঙেছে। আমার আফসোস কেবল এই যে আরো তিন সপ্তাহ সময় পাওয়া যায়নি। নইলে দেখিয়ে দেওয়া যেত বিদেশী সরকার তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে জনশক্তিকে কেমন করে দাবিয়ে রাখে। শেকসপীয়ারের নাটকের রাজা হেনরির মতো আমারও ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছে করছে, 'আ হর্স। আ হর্স। মাই কিংডম ফর আ হর্স।' একটি অশ্ব। একটি অশ্ব। আমার রাজ্যের পরিবর্তে একটি অশ্ব। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্ব মারা না গেলেই তিনি যুদ্ধ জয় করতেন। তেমনি, তিনটি হপ্তা। তিনটি হপ্তা। আগস্ট মাসে আরো তিনটি হপ্তা সময় পেলেই আমরা সংগ্রামে জয়ী হতে পারতুম। সংগ্রাম অবশ্য বন্ধ হবে না। এতে জয় না হোক পরাজয়ও হবে না। যেটা হবে সেটা যেন ফুটবল খেলার ড্র।" পরিতোষবাবু মনে করেন।

"তাই যদি হয় তবে স্বাধীনতার জন্যে অহিংসা গেল, অথচ স্বাধীনতাও এল না। জগৎকে ভারত নতুন পথ দেখাতে পারল না। শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের পথ। তবে এটা গণ সত্যাগ্রহ নয়। মহাত্মাজী এটার সিগন্যাল দেননি। এটা জনতার রোষের অভিব্যক্তি। নেতাদের ধরপাকড়ে রোষ।" মানস বিশ্বাস করে।

"কিন্তু এটাও তো মিথ্যা নয় যে আগে থেকে প্রস্তুতি চলছিল। সেটা গণ সত্যাগ্রহের না হোক, গণ সংগ্রামের।" পরিতোষবাবু তর্ক করেন।

আরতি দেবী এইবার মুখ খোলেন। "গণ সত্যাগ্রহের উপযুক্ত মানসিকতা ছিল না। গণ সংগ্রামের ছিল। সেটা যে সহিংস হবে কে না জানত? গান্ধীজী অবশ্য চিরকালই বলে এসেছেন যে একজন সত্যাগ্রহীই যথেষ্ট। তিনি স্বয়ং অহিংস। এটা সহিংস ও অহিংস মিশ্র সংগ্রাম। প্রকাশ্য বিদ্রোহ।"

মানস তাঁর সঙ্গে একমত হয়। বলে,"এটা তাঁর দু'বছর আগেকার ব্যক্তি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্বল্পকালীন বিরতির পর সমষ্টিগত আকারে পূর্বানুবৃত্তি। একই মোমেণ্টামের ক্রমান্বয়। শুধু এর অহিংস অংশটার জন্যেই তাঁকে দায়ী করা যায়, সহিংস অংশটার জন্যে নয়। সেটা যে কোনো গণ অভ্যুত্থানের অপরিহার্য পরিণতি।"

যূথিকা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। আরতি দেবীকে মুখ খুলতে দেখে সেও মুখ খোলে। "আচ্ছা, দিদি, আপনি কি বিনীতা সিন্‌হার নাম শুনেছেন? যাঁর স্বামী ছিলেন সিভিল সার্জন। যুদ্ধফেরৎ।"

আরতি দেবী টিপে টিপে হাসেন। "তার চেয়ে বলো না কেন, আপনি কি,আপনার মামাতো ভাইয়ের খুড়শ্বশুরের মেয়ের নাম শুনেছেন? বিনীতা সিন্‌হা হবার আগে থেকেই তিনি আমার বিনু মাসী। আহা, বেচারির কী দুঃখ। জামাইটি মারা গেল বিলেতে পড়তে গিয়ে। মেয়েটা তখন থেকেই দিশেহারা। অমন অস্থিরপ্রকৃতির মেয়েকে নিয়ে বিনু মাসী নাজেহাল। সেদিন আমাদের বাড়ী এসে জিজ্ঞাসা করেন, জুলি এখানে আছে? আমি তো আকাশ থেকে পড়ি। জুলি তো বছরে একবারও আমার খোঁজ নেয় না। হঠাৎ জুলি কেন আসবে ও থাকবে? তারপর থেকে যা শুনছি তা ভয়াবহ

ব্যাপার। ওদের নাকি একটা গুপ্ত প্রেস আছে। যারা পাঁজি ছাপে তাদের প্রেস নয়। সেই চোরা প্রেস থেকে চোরা বুলেটিন ছেপে বা সাইক্লোস্টাইল করে ওরা সাহেবপাড়ার জমাদারদের দিয়ে ঘরে ঘরে বিলি করায়। তাতে গোরা সৈন্যদের উদ্দেশ করে লেখা ঃ কুইট ইণ্ডিয়া। গো হোম অ্যাণ্ড ডিফেণ্ড ইয়োর ওন পীপল। তোমাদের লজ্জা করে না? পারলে তোমরা বেলজিয়ামকে রক্ষা করতে? ফ্রান্সকে বাঁচাতে? সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, বার্মায় তোমাদের ভূমিকাটা কী? কেন তোমরা আমাদের অন্নে ভাগ বসাতে এসেছ? আমরা কি না খেয়ে মরব? তোমরাই এর জন্যে দায়ী হবে। — এমনি কত কথা।"

যূথিকা ভয় পেয়ে বলে, "ধরা পড়লে আর রক্ষে আছে! সরাসরি কোর্ট মার্শাল। যুদ্ধকালে আইন আদালত ঠুঁটো জগন্নাথ।"

মানসের মনে লাগে। সে বলে, "হেবীয়াস কর্পাস এখনো উঠে যায়নি। তবে যুদ্ধকালে মিলিটারির গায়ে হাত দেওয়া অসম্ভব।"

আরতিদি যূথিকাকে বলেন, "বেচারি বিনু মাসী! মেয়ে তাঁকে ধরাছোঁয়া দেয় না। রোজ ঠিকানা বদল করে। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে দিনের বেলা বোরকা পরে বেরোয়। উর্দূতে বাতচিৎ করে। যত সব এঁদো গলিতে বা বড়লোকের অন্দরমহলে ওদের আস্তানা। রাতের বেলা তো ব্ল্যাক আউট। তখন ওরা নির্ভয়ে ফর ফর করে ঘুরে বেড়ায়। অঙ্গে বিভিন্ন সাজ। মুখে বিভিন্ন বুলি। বহুরূপী আর হরবোলা। সিনেমায় ঢুকে প্রচারপত্র ফেলে আসে। জওয়ানদের উদ্দেশ করে লেখা, হিন্দীতে বা উর্দূতে ঃ তোমাদের দেশ এখন একটা আগ্নেয়গিরি। লাভাবর্ষণ আসন্ন। জাপানীদের বোমাবর্ষণও এর কাছে কিছু নয়। ওদের গোলাবর্ষণও এর কাছে তুচ্ছ। তোমাদের লয়ালটি রাজার প্রতি নয়, জন্মভূমির প্রতি। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। — এসব প্রচারপত্র যদিও বেনামী তবু পুলিশ জানে কারা এসব ইস্যু করেছে। জুলির সন্ধানে ঘুরছে। যে-কোনো দিন গ্রেপ্তার করে কোথায় চালান দেবে কে জানে!"

যূথিকা শিউরে ওঠে। "কী সর্বনাশ!"

গান্ধীজীর 'প্রকাশ্য বিদ্রোহ' এখন কোন্ মাটির তলায় ঢুকেছে জানলে তিনি নির্ঘাত অনশন করতেন। কিন্তু তাঁকে তো কোনো কিছুই পড়তে দেওয়া হচ্ছে না। শুনতে দেওয়া হচ্ছে না। স্বদেশবাসীর থেকে তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। উগাণ্ডায় বা এডেনে থাকলে আরো বেশী খবর পেতেন। আগাখান্ প্রাসাদ এক অন্ধকূপ।

খবরের কাগজ পনেরো ষোল দিন বন্ধ থাকার পর আবার খুলেছে। কিন্তু কড়া সেনসরশিপ। অধিকাংশ খবরই ধামা চাপা। সেইজন্যে কারা সব একটা গুপ্ত নিউজ সার্ভিস সৃষ্টি করেছে। ফ্রী ইণ্ডিয়া নিউজ সার্ভিস। গুপ্ত সংবাদপত্র প্রতি সপ্তাহেই বেরোয়। সাইক্লোস্টাইল করা। তাতে অনেক গোপনীয় সংবাদ থাকে। সত্য মিথ্যা যাচাই করার উপায় নেই। কয়েক সংখ্যা মানসের নামেও পাঠিয়েছে। চিঠির খামের ভিতরে। বাংলা ভাষায় লেখা।

মেদিনীপুরের এক থানায় জাতীয় পতাকা ওড়াতে গিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরা বলে এক মহিলা পুলিশের গুলীতে নিহত হয়েছেন। মরেছেন, তবু পতাকা ছাড়েননি। গ্রেপ্তার করলেই চলত। গুলী করার কী দরকার ছিল? মানস মনে মনে প্রশ্ন করে। তার নিজের জেলায় তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। এই যা সান্ত্বনা।

"আমরা যথেষ্ট প্রিকশনস্ নিয়েছি, মল্লিক।" আলী হায়দার বলেন। "মেয়েদের উপর যাতে কিছুতেই কোনো অত্যাচার না হয়। পতাকা ওড়াতে চায় ওড়াক। আমরাই পরে নামিয়ে দেব। থানা দখল করে থানার কাজ চালানো কি মুখের কথা? পারবে ওরা দাগী অপরাধীদের চুরি ডাকাতী বন্ধ করতে? খুনের এজাহার লিখে নিতে! অকুস্থলে সুরতহাল করাতে, লাশ মর্গে পাঠাতে? পুলিশ যদি

সাতদিন অসহযোগ করে তো বাবুরা নিজেরাই আমার কাছে এসে নালিশ করবেন যে তাঁদের যথাসর্বস্ব লুট হয়ে গেছে। মায় ঘরের বৌঝি।"

"রেঙ্গুনে যেমন হয়েছিল।" মানস মন্তব্য করে।

"কাগজওয়ালারা সে খবরটা চেপে যায়। লোকে ভাবে লড়াই একটা তামাশা। তার সঙ্গে লুটপাট নারীধর্ষণ ইত্যাদির কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি গণসংগ্রাম একটা তামাশা। তাব সঙ্গে সমাজবিরোধী ক্রিমিনালদের কোনো সম্পর্ক নেই। জেল ভাঙার খবর শুনেছেন? আমাদের জেলায় নয়, যুক্ত প্রদেশের বলীয়া জেলায়। ট্রেজারি লুটের খবর শুনেছেন? সেটাও বলীয়া জেলায়। আমরা যদি প্রিকশন্স না নিই সরকারী ট্রেজারি খালি হয়ে যাবে, মাসের শেষে আমরা কেউ মাইনে পাব না। জেল খালি হয়ে যাবে। ফেরারী কয়েদীরা ঘরে ঘরে হানা দেবে। পুলিশ যদি গুলী না চালায় তো নিরীহ নাগরিকের সর্বস্ব যাবে। যদি চালায় তো কেউ না কেউ মরবে। তখন যত দোষ আমার।" আলী হায়দার দুই কাঁধ তুলে বিমূঢ়ভাব প্রকাশ করেন।

মানসের জেলায় হিংসাত্মক ঘটনা বড়ো একটা ঘটে না। আইন অমান্য করে মিছিল বেরোয়। তাতে মেয়েদেরই প্রাধান্য। "ভারত ছাড়ো" ইত্যাদি স্লোগানও দেওয়া হয়। পুলিশ তফাতে থাকে। ইংরেজ পুলিশ সাহেব ইচ্ছে করেই অদৃশ্য হন। নইলে জনতা হয়তো মারমুখো হবে। ফলে পুলিশও মারমুখো।

রায় উমাশঙ্কর সামন্ত বাহাদুর কিছুদিনের জন্যে পর্দার আড়ালে যান। শহরের ছেলেরা রাজভক্তদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঁদের গতিবিধি লক্ষ করে। তিনিই পরে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলেন, "ভয় নেই, আমরাই আপনাকে প্রোটেকশন দেব।"

সাহেব অট্টহাস্য করেন। বলেন, "আমরা যদি ভারত ছাড়ি তো আপনাদের প্রোটেকশন দেবে কে? উত্তরাধিকারী রেখে না গেলে সারা দেশ জুড়ে ওয়ার অভ্ সাকসেসন। দিল্লীর মসনদ নিয়ে আবার এক পানিপথের যুদ্ধ।"

।। উনিশ ।।

জার্মান সেনা অতর্কিতে তিনদিক থেকে আক্রমণ করে রুশদেশের বহু অঞ্চল অধিকার করলেও মস্কো এখনো দূর অস্ত্। লেনিনগ্রাড হাতের নাগালে এসেও নাগালের বাইরে। আর স্টালিনগ্রাডের লড়াই এই বাধে কি ওই বাধে। ভল্গা নদীর তীরেই দু'পক্ষের ভাগ্য নির্ধারণ হতে যাচ্ছে। স্টালিনগ্রাডের পতন প্রকারান্তরে স্টালিনেরই পতন। স্টালিনগ্রাডের হার প্রকারান্তরে হিটলারেরই হার। এ খেলা চড়া স্টেক রেখে খেলা। সারা দুনিয়া উৎসুক বা উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে আছে ভল্গাতটের বলপরীক্ষার দিকে।

বাবলীর তো রাত্রে ঘুম নেই। সে স্বপনদার কাছে গিয়ে একটুখানি আশ্বাস আশা করে। "কী হবে, দাদা? আমরা কি হেরে যাব?"

স্বপনদা তাঁর হাতের কাজ তুলে রেখে বলেন, "আমরা হেরে যাব মানে? ও বুঝেছি। 'আমরা কমিউনিস্টরা'। কিন্তু খোদ স্টালিনই তো তাঁর দেশের সর্বজনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে এটা পেট্রিয়টিক ওয়ার। জার আমলের মহাবীর সুভোরোভকে মার্কসের উপরে বসিয়েছেন। তবে এটাও ঠিক যে রাশিয়া হেরে গেলে তোমরাও হেরে যাবে।"

"সেইজন্যেই তো ভেবে আকুল হচ্ছি। তোমার কী মনে হয়? তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছ। টুর্গেনিভের মতো দরদী।" বাবলী শুনতে উন্মুখ।

"রাশিয়া হারবে না। রাশিয়া হারতে পারে না। যুদ্ধ তো কেবল বাহুবলের পরীক্ষা নয়। সেইসঙ্গে

আত্মিক শক্তিরও। রাশিয়াকে শক্তি জোগাচ্ছেন পুশকিন, লারমন্টোভ, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, চেকভ, গোর্কি। সাহিত্যের মতো সঙ্গীতও অন্তরকে অনুপ্রাণিত করে। রাশিয়াকে প্রাণ জোগাচ্ছেন চাইকোভস্কি, রিমস্কি-কোরসাকোভ, মুসোর্গস্কি, বোরোডিন, গ্লিঙ্কা। এঁরা সবাই ছিলেন পেট্রিয়ট। পেট্রিয়টিক ওয়ার যদি লড়তে হয় তো এঁরাই লড়তে সাহায্য করবেন। এঁরা অমর। তোমাকে আজ আমি 'ভল্‌গা বোটম্যান' বাজিয়ে শোনাব। লোকসঙ্গীত। গেয়েছেন কে, জানো? শালিয়াপিন। আমি স্বকর্ণে শুনেছি।" স্বপনদা উদ্দীপনা বোধ করেন। যেন কানে লেগে আছে তার রেশ।

"ভল্‌গা বোটম্যান? সত্যি?" বাবলীও উদ্দীপ্ত হয়। "শুনব। নিশ্চয় শুনব। ভল্‌গার তীরে স্টালিনগ্রাড। কী বিচিত্র যোগাযোগ! কিন্তু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দাও, দাদা। জার্মানীতেও তো কত মহান সাহিত্যিক, মহান সঙ্গীতকার জন্মেছেন। তাঁদের প্রেরণা কি জার্মানদের জিতিয়ে দিতে পারবে না? গ্যেটে, শিলার, বাখ্‌, বেঠোভেন?"

"আরো দশজনের নাম করতে পারতে। কিন্তু নাৎসীরা কি তাঁদের কারো মহিমা বোঝে? হাইনের মতো প্রেমের কবি বিশ্বসাহিত্যে ক'জন আছেন? তিনি জাতে ইহুদী। তাই নাৎসীদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। যীশুখ্রীস্ট আর তাঁর দ্বাদশ শিষ্যও তো জাতে ইহুদী ছিলেন। তাঁরাও বাতিল। গোটা ইহুদী খ্রীস্টান ধারাটাই বাদ। তা হলে কি গ্রীক রোমান ধারা ওদের গ্রহণীয়? না, আর্য হলেও গ্রীক রোমানরাও বিজাতীয়। বাকী থাকে টিউটন ঐতিহ্য। সে ধারা কবে থেকে লুপ্ত। ভাগনার তাকে উদ্ধার করেছেন। সেটাই ওদের সর্বস্ব। সেইটুকু প্রেরণা পেয়ে রাশিয়ানদের বা ইংরেজদের হারিয়ে দেওয়া যায় না। নাৎসীরা ওদের আদিম ধারাকেই সার করেছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রবাহ তো সেইখানেই থেমে থাকেনি। রাইন নদ দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ডানিউব নদ দিয়েও। 'ব্লু ডানিউব ওয়ালটজ' কি ওই বেরসিকরা শুনবে? স্ট্রাউস যে ইহুদী। শুনলে তোমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠবে। তুমি নাচতে চাইবে। আমি যে তোমার সঙ্গে নাচতে পারব না, বোন চকোলেট।" স্বপনদা আফসোস করেন।

বাবলীর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। সে বলে, "ওটা বৌদির জন্যে তুলে রেখো। আমার জন্যে 'ভল্‌গা বোটম্যান'।"

বৌদির নাম করতে না করতেই বৌদি এসে হাজির। তাঁর আগে আগে তাঁর আদরের এল্‌ফ। সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাবলীর দিকে এগোয়। তার কোলে হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠে।

"এই যে, বাবলী! কখন এলে? তোমাদের কমিউনের কী খবর?" দীপিকা বৌদি খোঁজ নেন।

"খবর খুব মুখরোচক নয়। কমিউনে ভাঙন ধরেছে। একটি কমরেডের বিয়ে হয়ে গেছে। সে আমাদের ছেড়ে তার বরের সঙ্গে ঘর করছে। এমনি করে যদি কমিউন খালি হয়ে যায় তো কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ কী?" বাবলী হাসে।

"তোমরা কি মনে করেছ তোমরাই কমিউন গঠনের পথিকৃৎ? সেই বৌদ্ধযুগ থেকেই ভারতে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে এসেছে। ইহুদীদের দেশে যীশুখ্রীস্টেরও আগে এসেনীদের কমিউন ছিল। খ্রীস্টানরা তাদের কাছ থেকে শেখে। দেখা গেল সারাজীবনের মতো সন্ন্যাসব্রত না নিলে কমিউন গঠন করা বৃথা। মার্কস মুনির শিষ্যরা তো সন্ন্যাসে বিশ্বাস করেন না। তা হলে তাঁদের কমিউন টিকবে কী করে? শ্রী অরবিন্দ এর একটা সমাধান বার করেছেন। ওঁর আশ্রমে বিবাহিত দম্পতিরাও বাস করছেন। কিন্তু কারো কোনো সম্পত্তি নেই। সব সম্পত্তি আশ্রমের। দেখা যাক কত দিন টেঁকে। কেউ কেউ এর মধ্যে পালিয়ে এসেছেন। পালিয়ে এসে বিষয় সম্পত্তি অর্জন করেছেন। মেয়ের বিয়ের যাতে একটা কিনারা হয়। ছেলের পেশার ভাবনাও ভাবতে হবে। আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী মাদার কি এসব জানেন না? তাঁকেই বার করতে হবে এর সমাধান। শ্রী অরবিন্দ এখন বহু উর্ধ্বে।" দীপিকা বৌদি মনে করেন।

"শ্রী অরবিন্দের কথা যখন উঠল তখন শোন", স্বপনদা বলেন, "পণ্ডিচেরী থেকে আমার বন্ধু

মুকুল লিখেছে শ্রী অরবিন্দ প্রতিদিন রেডিও থেকে যুদ্ধের খবর শোনেন। বাহুবল ও মনোবলের মতো আরো একটা বল আছে, সেটা যোগবল। শ্রী অরবিন্দ তাঁর যোগবল প্রয়োগ করছেন রাশিয়া যাতে জয়ী হয়। এ যুদ্ধ অশুভ শক্তির সঙ্গে শুভশক্তির যুদ্ধ। রাশিয়া যদিও কমিউনিস্ট তবু সেও ইংরেজ ফরাসীর মতো শুভশক্তির মিত্র। সুতরাং শুভশক্তির শরিক।"

"দাদা, তুমিও কি যোগবলে বিশ্বাস কর?" বাবলী বিস্মিত হয়ে সুধায়।

"না, বোন। মুকুলকে আমি লিখি, চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। তুমি পণ্ডিচেরীতে বাস কর। পণ্ডিচেরী ফ্রান্সের অধীন। যোগবল প্রয়োগ করে শ্রী অরবিন্দ কেন ফ্রান্সকে ত্রাণ করলেন না? সে কেন নাৎসীদের অধীন হলো? ফলে পণ্ডিচেরী এখন অধীনের অধীন।" স্বপনদা সংশয় প্রকাশ করেন।

"সত্যিই তো!" দীপিকা বৌদি সায় দেন।

'ভল্‌গা বোটম্যান' বাজিয়ে শোনবার পর স্বপনদা লক্ষ করেন চকোলেটের চোখে জল। সে বার বার চোখের জল মোছে আর হাসির ভান করে। বলে, "আরেকবার বাজাও।"

তিনবার বাজানোর পর স্বপনদা জিজ্ঞাসা করেন, "বল, তোমার চোখে জল কেন? কী তোমার দুঃখ?"

"আমার হৃদয় এখন ভল্‌গা নদীর তীরে স্টালিনগ্রাডে। নেকড়েবাঘের দলকে আমরা কি রুখতে পারব? আমিও আমার সোল ফোর্স খাটাচ্ছি। যদিও ওটা গান্ধীবাদীর মতো কাজ। ওতে কোনো ফল হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু ও ছাড়া আর কী আছে আমার? এত দূরে রয়েছি যে বোমা রিভলভার কোনো কাজে লাগবে না। তবে কি কেবল মাঠে মাঠে স্লোগান দিয়ে বেড়াব? আমরাও এক হিসাবে নিষ্ক্রিয় দর্শক। যা হবার তা যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে। জয় কিংবা পরাজয়। পরাজয় অভাবনীয়। রাশিয়ার আত্মা অপরাজেয়। চাই শুধু আত্মার বিশ্বাস। সেটা কি আমাদের আছে?" বাবলী আত্মগত হয়ে বলে।

"তত্ত্বে নেই, কিন্তু সত্যে আছে।" স্বপনদা রহস্য করেন। "বাড়ীতে কেউ মরণাপন্ন হলে ডাক্তারকে ডাকা হয়, মা কালীকেও। রাশিয়ানরাও নিশ্চয়ই মা মেরীকেও ডাকছে। এটা তো রেভোলিউশনারি ওয়ার নয়, এটা পেট্রিয়টিক ওয়ার। এতে নন্‌কমিউনিস্টরাও আছে। ওরা গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা করছে নিশ্চয়।"

"কী জানি, দাদা!" বাবলী শোকোলায় চুমুক দিয়ে বলে, "আমার হৃদয় এখন পড়ে আছে ভল্‌গা নদীর তীরে। পাখী হয়ে থাকলে উড়ে যেতে পারতুম। মানুষ হয়ে শুধু রেডিওর খবর শুনছি।" শোকোলা হচ্ছে ফরাসীদের তরল চকোলেট।

দীপিকা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার মুখ খোলেন, "ওটা তো দূরের খবর। কাছের খবর কিছু শুনেছ?"

"কোন্ খবর, বৌদি?" বাবলী শশব্যস্ত হয়ে সুধায়।

"তোমার বান্ধবী জুলির খবর কী?" বৌদি জানতে চান।

"শুনেছি স্টেটসম্যান পত্রিকায় নাকি ছাপা হয়েছে সৌম্য চৌধুরীর সঙ্গে ওর বিয়ের এন্‌গেজমেণ্ট। সে তো অতি আনন্দের কথা। কিন্তু মেয়ে নাকি মায়ের উপর গোসা করে বাড়ী ছেড়ে হাওয়া হয়ে গেছে। কে ওঁকে ফাঁস করতে বলেছিল? ছাপতে দিলেন যদি তো সাহেবদের কাগজে কেন? জানেন না ওরা এ দেশের শত্রু? বামপন্থীদের কাছে ও মুখ দেখাবে কী করে? তাই কোথায় উধাও হয়ে গেছে। ওর মা একদিন আমাদের কমিউনে এসে খানাতল্লাসী করেন। ওঁর ধারণা আমিই আমার সখীকে লুকিয়ে রেখেছি। আমি ওঁর পায়ে পড়ে বলি, মাসিমা, আপনি কি জানেন না ওর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? আমি এখন ওর চোখে দুশমন। আমি নাকি ইংরেজের গুপ্তচর। আমার অপরাধ আমি বলেছি, আগে তো জাপানীদের তাড়াও, তার পরে ইংরেজদের তাড়াবে। তোজো ফার্স্ট। ও বলেছে, না, আগে ইংরেজদের

তাড়াতে হবে, তার পরে জাপানীদের। চার্চিল ফার্স্ট। তোজো ফার্স্ট, চার্চিল ফার্স্ট, তোজো ফার্স্ট, চার্চিল ফার্স্ট, বিশ একুশবার এইরকম কথাকাটাকাটির পর ও আমার চুলের মুঠি ধরে, আমিও ওর চুলের মুঠি ধরি। এরপরে কি আমাদের মুখ দেখাদেখি হতে পারে? ও কেন আমাদের কমিউনে আসবে? অন্য কোথাও গেছে। হয়তো ওর ভাবী বরের কাছে। উনি বলেন, সৌম্যকে উনি টেলিগ্রাম করে জবাব পেয়েছেন সৌম্যও নিখোঁজ। তা হলে গেল কোথায়? একে একে প্রত্যেকটি বন্ধুর বাড়ী গিয়ে খোঁজ করেছেন। আমি তোমাদের এখানেও খোঁজ নিতে বলেছি। উনি কি এসেছিলেন?"

"এসেছিলেন বইকি। কিন্তু আমরাও তো অন্ধকারে। তা না হলে তোমাকে জিজ্ঞেসা করতুম কেন? মিসেস সিন্‌হা বুঝতে পারছেন না স্টেটসম্যানে নোটিশ ছাপিয়ে তিনি এমন কী অপকর্ম করেছেন যার নজীর নেই? ওঁদের বাড়ীর যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নোটিস তো ওই কাগজেই ছাপা হয়ে থাকে। জুলির আগের বারের বিয়ের নোটিসও তো ছাপা হয়েছিল ওই কাগজেই। ওর বাবার মৃত্যুর নোটিসও। তাঁর জামাই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশে একটা ডায়েরি করিয়ে রাখতে। যদি কোনো অঘটন ঘটে থাকে। পুলিশ অফিসার নাকি মুচকি হেসে বলেছেন, অঘটনটা আর কিছু নয়। সামনে আসছে গান্ধীজীর গণ সত্যাগ্রহ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকে গ্রীন সিগনাল দিয়েছে। এবার দেবে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি। ওঁরা বম্বেতে মীটিং ডেকেছেন। কে জানে জুলি হয়তো বম্বেতে গিয়ে ওর বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে মিশে প্রোগ্রাম ছকছে। নোটিসের জন্যে গোসা করে মাকে ধোঁকা দিয়েছে। উনি বম্বেতেও ওঁর চেনাজানা সবাইকে চিঠি লিখেছেন। উত্তর আসার সময় হয়নি। আমরাও দারুণ চিন্তিত।" বৌদির মুখে উদ্বেগ।

স্বপনদা হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, "ক্যাবামেল ওর মাকে ধোঁকা দিতে পারে কখনো? ও কি তেমনি মেয়ে? ও এই কলকাতা শহরেই আছে। পুলিশও যে না জানে তা নয়। অন্তত পুলিশের একটা সেকশন। ওদের এখন হ্যামলেটের মতো দোটানা। ধরবে কি ধরবে না? বাঁধবে কি বাঁধবে না? কে জানে যদি গণেশ ওলটায়। তখন ওই জুলিরাই তো মালিক হবে? চাকরি রাখতে হলে জুলিদেরই তোয়াজ করতে হবে। পুলিশের লোক ধরতে এলে পুলিশের লোকই আগে ভাগে হুঁশিয়ার করে দেবে। পাখী উড়ে যাবে। না, ভল্‌গা নদীর তীরে নয়। ভারতের ভাগ্য সেখানে নির্ধারিত হচ্ছে না। হচ্ছে গঙ্গানদীর তীরে, পঞ্চনদের তীরে, কাবেরী নদীর তীরে। আমি দুই নাটকেরই নীরব দর্শক। আমার সহানুভূতি আমার দুই বোনেরই দিকে। চকোলেটেরও দিকে, ক্যারামেলেরও দিকে। ওরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয়। ওটা ওদেব ভুল বোঝাবুঝির ফল। আমি তো ওদের মেলাবার চেষ্টাই করেছি। সুযোগ পেলে আবার করব।"

বাবলী সভয়ে বলে, "দাদা, এটা কি কখনো সম্ভব যে ক্ষমতা কিছুদিন বাদে জুলিদের হাতে পড়বে?"

"আজকের এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এটাও সম্ভব, সেটাও সম্ভব, ওটাও সম্ভব। কোনোটাই অসম্ভব নয়। এই কথাই গান্ধীজী তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন। তবে যেটা সম্ভবপর সেটা হচ্ছে তৃতীযপক্ষ বিদায় হলে হিন্দু মুসলমানের মিতালি, কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। আমার মতে এ রকম একটা সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। সমস্তক্ষণ মিতালির প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। সেই বুনিয়াদের উপরেই গড়ে উঠতে পারে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। নইলে সেটাও হবে একটা তাসের কেল্লা। ব্রিটিশরাজের পতনের পর হিন্দু মুসলিম রাজেরও পতন হবে। ভারতবর্ষ ইউরোপের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। এটাও তো একটা মহাদেশ। প্রাদেশিকতাই আমাদের পক্ষে স্বাদেশিকতা।" স্বপনদা রায় দেন।

বৌদি এবার দাদার দিকে ফিরে বলেন, " তোমাব সোনার বাংলা তো এখন একটা হার্টব্রেক

হাউস। এটা কি একটা সুখী পরিবার। ইংরেজ আছে বলেই ঠাট বজায় আছে। সে যেদিন যাবে সেদিন হিন্দু মুসলমানে কোলাকুলি নয়, ওই বাবলী জুলির মতো চুলোচুলি। পারবে কি তুমি ওদের চকোলেট আর ক্যারামেল দিয়ে ভাব করাতে? আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। তা বলে আমি বলব না যে ইংরেজ আরো পনেরো বছর রাজত্ব করুক। বা জাপানীরা এসে চামর ধরুক। যা আজও হলো না তা পনেরো বছর বাদেও হবে না। কারণ বাঙালী হিন্দু মুসলমানের হৃদয় এক নয়। ওদের সম্পর্কটা হচ্ছে একই কালে প্রেমের আর ঘৃণার। ইংরাজীতে যাকে বলে লাভ-হেট রিলেশনসিপ। তুমি আমি হাজার চেষ্টা করেও এটাকে বিশুদ্ধ প্রেমের সম্পর্কে পরিণত করতে পারব না। আমাদের প্রিয় বন্ধু মীর সাহেবও না। পনেরো বছরের চেষ্টাও যথেষ্ট নয়। আমাদের জীবন যত দীর্ঘ হোক না কেন আমাদের জীবনেও নয়। ইংরেজরা ভেদবুদ্ধির বীজ বুনেছে বলে তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানো বৃথা। বিষবৃক্ষ ছেদ করার সাধ্য আমাদেরও নেই। গোড়ায় আমাদেরও হাত ছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় রামমোহনকে কেউ আমল দেননি। তিনি নাকি যবন পরিবৃত হয়ে থাকতেন। হিন্দু কলেজে কোনো মুসলমান ছাত্রকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। হিন্দুকলেজ যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় তখন ইংরেজদের সে প্রস্তাবে হিন্দু প্রতিষ্ঠাতাদের কয়েকজন প্রতিনিধি বাধা দেন। তবে সকলে নয়। তার থেকে প্রমাণ হয় প্রেমও সক্রিয় ছিল। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে হিন্দু ন্যাশনালিজম মুসলমানদের দূরে ঠেলেছে আর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম তাদের কাছে টেনেছে। তার জের এখনো চলেছে। মাঝখানে উদ্‌ভব হয়েছে যার, তার নাম বেঙ্গলী ন্যাশনালিজম। ইংরেজ এতে বাদ সেধেছে। ইংরেজকে এরা হাতে মেরেছে, ভাতে মেরেছে। কিন্তু ইংরেজও এর মাজা ভেঙে দিয়েছে কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে। সেদিন যে সর্বনাশটা হলো সেটা বাঙালীমাত্রেরই। শুধু হিন্দুর বা শুধু মুসলমানের নয়। তখনি বোঝা গেল বাঙালীর যে বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তার কারণ সারা ভারতের রাজস্ব এসে কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে ভারতের রাজধানী আর কখনো পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হয়নি। হবেও না। ইতিহাসে ওটি একটি অদ্বিতীয় অধ্যায়। বাঙালীর যদি দূরদৃষ্টি থাকত তা হলে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে সে আন্দোলনে নামত না। বেঙ্গলী ন্যাশনালিজমই দ্বিধাবিভক্ত প্রদেশের মেলবন্ধন কবত। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। আমরা ভারতের রাজধানী হারিয়েছি। তা বলে আমরা প্রাদেশিকতাকেই স্বাদেশিকতা ভাবব কোন্ বুদ্ধিতে? এটা সেদিনের সেই স্বদেশী আমলের রোমন্থন। সে আমল আর কখনো ফিরবে না। ইংরেজ বিদায় হলেও না। এখনকার ভাবনা হলো ভারতীয় স্বাদেশিকতাকে ভারতীয় মুসলমানের গ্রহণযোগ্য করা। বাঙালী মুসলমানকে ভারতীয় মুসলমানের আওতার মধ্যে রাখা। পাকিস্তানের বীজ বুনে মুসলিম লীগ যা করেছে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যা করেছিল তার চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়। এর থেকে যে বিষবৃক্ষ গজাবে তা মুসলমানদেরও কম ক্ষতি করবে না। ওরা এখন স্বপ্ন দেখছে কলকাতা হবে পাকিস্তানেব সামিল। এটা নিয়ে একটা গৃহযুদ্ধ না বাধে।"

স্বপনদা অভয় দিয়ে বলেন, "গৃহযুদ্ধ পাঞ্জাবে বাধতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে কখনো নয়। এখানে ঘৃণার চেয়ে প্রেমই প্রবল।"

বৌদি কী বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বেল বেজে ওঠে। বাবলীর কোল থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায় এল্‌ফ। ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ। যত্ত বড়ো কুকুব নয় তত বড়ো গলা।

"আমি চানু লাহিড়ী। বাবলী সেন কি এ বাড়ীতে এসেছে? ওকে একটা জরুরি খবর দিতে চাই।" আগন্তুক দীপিকা বৌদিকে জানায়।

"চলুন, ভিতরে চলুন। বাবলী এই বাড়ীতেই আছে।" বৌদি ওকে দোতলায় নিয়ে যান।

"ও কে, চানু? কী ব্যাপার? 'ভল্‌গা বোটম্যান' শুনতে শুনতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে।"

বাবলী ওর বন্ধুর পরিচয় দেয়।

"তোমাকে আমি কোথায় না খুঁজেছি? শোন, লণ্ডন থেকে ট্রাঙ্ককল এসেছে, স্টালিনগ্রাড—" বলতে বলতে চানু ভেঙে পড়ে।

"বল, বল, বাকীটুকু বল। ঝুলিয়ে রেখো না।" বাবলী উৎকণ্ঠিত।

"ইনভেডেড।" চানু দুই হাতে মুখ ঢাকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাবলী। "তাই বল। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। নাৎসীদের আমরা ফিরে যেতে দেব না। ওখানেই কবর দেব। যে পথ দিয়ে মোগল এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো আর।"

"মোগল তো নয়, হায়েনা। যাক, আজ আমাদের জরুরি বৈঠক বসছে। তোমার থাকা দরকার। গান শোনবার সময় এটা নয়। কর্তব্য স্থির করার সময়। ওরা ওদিকে প্রাণ দিচ্ছে, আর আমরা এদিকে গান শুনছি।" চানু টিটকারী দেয়।

স্বপনদা যা খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসেন তা তৈরি হয়ে আসে। গরম গরম বেগুনী, ফুলুরী, পেঁয়াজী। তার সঙ্গে জিলিপী। বাবলীর ক্ষিদে পেয়েছিল। সে বিনা বাক্যে খায়। চানুকে অনুরোধ উপরোধ করতে হয়।

"তা একটু দেরি হয়ে গেলে 'ডাস কাপিটাল' অশুদ্ধ হবে না, কমরেড লাহিড়ী। খান আর খেতে দিন। লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ।" স্বপনদা বলেন।

"ওদিকে ওরা লড়ে মরছে আর এদিকে আমরা খেয়ে বাঁচছি। এর পরে কে আমাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করবে?" চানু খেতে খেতে বলে। আর বলতে বলতে খায়।

"ওরা বলছ কেন? বল আমরা।" বাবলী শুধরে দেয়। "আমরাই লড়ছি স্টালিনগ্রাডে হায়েনাদের সঙ্গে। ওরা বলতে বোঝায় নাৎসীরা।"

থিয়োরেটিসিয়ান চানু অপ্রতিভ হয়। কিন্তু ও বেচারা সত্যি ঘাবড়ে গেছে। ওর ধারণা ছিল নাৎসীরা অতদূর এগোতে পারবে না, মাঝপথে আটকা পড়বে। স্টালিনগ্রাড! এ যে প্রেস্টিজের ইস্যু। এখানে হার হলে স্টালিনের প্রেস্টিজ। কোথায় থাকবে? কিন্তু তার বদলে জয়ের জন্যে প্রস্তুতি কোথায়? যুদ্ধবিগ্রহ তো থিয়োরি অনুসারে চলে না। ইতিমধ্যেই ক্লাস ওয়ারকে পীপলস ওয়ার করতে হয়েছে। বুর্জোয়ারাও এখন পীপলের সামিল। তার উপর এটা পেট্রিয়টিক ওয়ার। রাশিয়ানদের পক্ষে। কিন্তু ভারতীয়দের পক্ষে এটাকে পেট্রিয়টিক ওয়ার বলে চালানো যায় কী করে?" এ নিয়ে চানু চিন্তান্বিত।

স্বপনদা গম্ভীরভাবে বলেন, "চকোলেট আর চানু, তোমাদের বেদনা আমারও বেদনা। হাজার হাজার যুবা ঘরবাড়ী ছেড়ে, বাপ মা ভাই বোন বৌ বা বান্ধবী ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়ে মর্ত্যভূমি ছেড়ে কোন্ মহাশূন্যে বিলীন হতে যাচ্ছে ভাবতে গেলে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। মুখে খাবার রোচে না। আবার এমনি স্ববিরোধ যে ওরা যদি জান বাঁচানোর বা শহর বাঁচানোর জন্যে রণছোড় হয় তা হলেও খাবার বিস্বাদ লাগে। ওদের ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ভালো জিনিস নয়, আবার 'চাচা, আপনা বাঁচা'ও ভালো জিনিস নয়। তবে আমার নীতি হচ্ছে সৃষ্টির জন্যে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা। যেমন চাষী আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে সবাইকে খাদ্য জোগানোর জন্যে। সে যেমন কাপুরুষ নয় আমিও তেমনি কাপুরুষ নই।"

"আমরা কি বলেছি আপনি কাপুরুষ?" চানু প্রতিবাদ করে।

"না, না, তোমরা বলনি। কিন্তু কথাটা উঠেছে। তাই আমি সাফাই দিয়ে রাখছি। তারপর শোন। তোমরা যাদের নেকড়ে বা হায়েনা বলছ তারাও তোমাদেরি মতো মানুষ। তাদেরও মা আছে বোন আছে বান্ধবী আছে। তাদের দিকটাও আমাকে দেখতে হয়। আমি একদেশদর্শী নই। বহুদেশদর্শী। জার্মানীতে আমি আমার যৌবনের দুটি বছর কাটিয়েছি। জার্মানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। ওদের সবাই কিছু

নাৎসী নয়। অনেকেই কমিউনিস্ট। আবো অনেকে সোশিয়াল ডেমোক্রাট। হিটলারের দাপটে ওদেশের চানু আর বাবলীরাও আত্মরক্ষার জন্যে হয় পালিয়েছে, নয় ভোল বদল করেছে। এখানেও তাই হবে, যদি জাপানীরা কর্তা হয়ে বসে। তোমরা হয়তো পালাবে, কিন্তু থেকেও যাবে তোমাদের বিস্তর সাথী, তারা কোর্তা বদলাবে। নয়তো মরবে। সেটা ক'জন পছন্দ করবে, বল? তা বলে কি তারা কাপুরুষ? না, কাপুরুষ নয়। সাহস ফিরে পেলে তারাও প্রতিরোধের পন্থা খুঁজবে। যেমন ফ্রান্সে এখন কতক লোক রেজিস্টান্স গড়ে তুলছে।" স্বপনদা তন্ময় হয়ে বলে যান।

"শুনেছি, দাদা।" বাবলী সমর্থন করে।

"চিনি আমি ওদের দু'চারজনকে। কেউ কমিউনিস্ট, কেউ-বা তা নয়। দেশ যেখানে পরাধীন সেখানে দেশপ্রেমও মানুষকে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করে। হোক না সে উচ্চ মধ্যবিত্ত। এই যেমন আমাদের গান্ধী, জবাহরলাল। এঁরাও প্রতিরোধ করতে যাচ্ছেন। আপাতত ব্রিটিশ অকুপেশন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে। অতঃপর প্রয়োজন হলে জাপানীজ কুইজলিং গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে। এঁদের দিক্‌টাও আমি দেখি। তবে আপনাকে সরিয়ে রাখি, যাতে বাইরে থেকে ভালো দেখতে পাই। জড়িয়ে পড়লে তো সেটা সম্ভব হবে না। তোমরা এখন রুশ জার্মান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছ, নইলে দেখতে জার্মান পক্ষেও কমিউনিস্ট ও সোশিয়াল ডেমোক্রাটরাও লড়ছে, লড়তে বাধ্য হচ্ছে। হিটলার সবাইকে কন্সক্রিপ্ট করেছে। যারা নারাজ তাদের গুলী করে মেরেছে। আইন আদালতের তোয়াক্কা রাখেনি। জার্মান শিবিরেও তোমরা আছো। তোমাদের কমরেডরা আছে। তাদের জন্যেও চোখের জল ফেলতে ভুলো না। তারা নেকড়েও নয়, হায়েনাও নয়, তারা অবস্থাচক্রে বিপরীত শিবিরে অবস্থিত। তাদের জন্যে আমিও সমবেদনা অনুভব করি। তবে এটাও জানি যে তারা জিতবে না। এ যুদ্ধে হিটলারের হার হবে। রুশদেশ আক্রমণ করে নেপোলিয়নও পার পাননি। হিটলার তো কোন্ ছার! রাশিয়া এমন এক দেশ যা মহাদেশতুল্য। পিছু হটে যাওয়াটা হেরে যাওয়া নয়। রুশ ফৌজ বার বার পিছু হটবে, কিন্তু কখনো কোণঠাসা হবে না। পাল্টা আক্রমণ করবে ও জয়ী হবে।" স্বপনদা ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

বাবলী তা শুনে বেজায় খুশি। "এক কথায় স্পেস আমাদের পক্ষে, টাইম আমাদের পক্ষে। ওদের বিপক্ষে।"

"তার উপর ব্রিটেন তোমাদের পক্ষে, আমেরিকা তোমাদের পক্ষে। কিন্তু একটা ফ্যাঁকড়া আছে। তোমরা কারা? তোমরা কি রাশিয়ান না ইণ্ডিয়ান? কাল যদি ট্রাঙ্ককল আসে 'চিটাগং ইনভেডেড' তোমরা কোন্ পক্ষে ঝাঁপ দেবে? ব্রিটিশ পক্ষে, তার মানে ইণ্ডিয়ান পক্ষে, না জাপানী পক্ষে?" স্বপনদা সুধান।

বাবলী খাঁ করে জবাব দেয়, "অবশ্যই ইণ্ডিয়ান পক্ষে।"

"এইবার পথে এস।" স্বপনদা হেসে বলেন, "জাপান তো রাশিয়ার বিপক্ষে লড়ছে না, রাশিয়াও লড়ছে না জাপানের বিপক্ষে। কিন্তু তোমরা কমিউনিস্টরা যদি জাপানের বিপক্ষে রাইফেল হাতে নিয়ে চাটগাঁ যাও আর জাপানী বধ কর তা হলে জাপান কি তোমাদের কমিউনিস্ট বলে চিনতে পারবে না? তোমাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার কাছে নালিশ করবে না? তার ফলে তোমরা কি মস্কো থেকে লণ্ডন হয়ে নির্দেশ পাবে না, রাইফেল নামাও, কোলাকুলি করো? নয়তো জাপান প্রতিশোধ নেবে ভ্লাডিভস্টক আক্রমণ করে। ট্রাঙ্ককল আসবে, ভ্লাডিভস্টক ইনভেডেড। তখন তোমাদের ইণ্ডিয়ান মুখোশটি খসে পড়বে, রাশিয়ান স্বরূপটি বেরিয়ে পড়বে। বুঝলে, চকোলেট, ব্যাপারটা অত সরল নয়। তোমার মতো সরলা অবলার রাইফেল না ধরাই ভালো। কমিউন ছাড়ো, বিয়ে করো।"

বাবলী চানুর দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকায়। তখন চানু তাকে একটা দাবড়ি দিয়ে বলে, "তুমি তো থিয়োরেটিসিয়ান নও,তুমি এসব কুটিল প্রশ্নের জবাব দিতে যাও কেন? তোমার বলা উচিত ছিল,

পার্টির সঙ্গে পরামর্শ করে জবাব দেব। আর পার্টি পরামর্শ করত লণ্ডনের পার্টির সঙ্গে, লণ্ডনের পার্টি মস্কোর পার্টির সঙ্গে। শেষপর্যন্ত কী নির্দেশ আসত জানিনে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত সোভিয়েট ইউনিয়নকে একই কালে স্টালিনগ্রাড আর ভ্লাডিভস্টক দুই জায়গায় লড়তে বাধ্য না করা। জাপানকে ভ্লাডিভস্টকে প্রতিশোধ নিতে প্ররোচনা না দেওয়া। অতএব চট্টগ্রাম থেকে শত ক্রোশ দূরে থাকা।''

''চমৎকার!'' বৌদি বলে ওঠেন, ''এ ছেলে অনেক দূর যাবে, অনেক উচ্চে উঠবে। এর হাতে গভর্নমেন্ট পড়লে আর একটা ব্রেস্ট্‌-লিটোভ্‌স্ক। এবার আধখানা বাংলাদেশ ছেড়ে দিয়ে।''

''কেন, আপনাদের শাস্ত্রেই তো লিখেছে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। লেনিনের অপরাধ কী? পরে তো তিনি ছেড়ে দেওয়া জায়গা ফেরৎ পেয়েছিলেন। জার্মানীর পরাজয়ের পরে। জাপান কি আখেরে হারবে না, বৌদি? স্বপনদা কী বলেন?'' চানু বাবলীর মতো 'দাদা' ও 'বৌদি' পাতায়।

বৌদি গলে গিয়ে ওদের ডিনারের নিমন্ত্রণ জানান। সেইদিনই। কিন্তু ওদের তাড়া ছিল। পার্টি অফিসে জরুরি বৈঠক। ডিনার আরেকদিন হবে। আগে তো ভালো খবর আসুক। তারপরে ভালো খাবার।

''জুলির জন্যে মনটা কেমন করছে, বৌদি।'' বাবলী বলে তাঁর হাতে হাত রেখে। ''যেখানেই থাকুক সে বেঁচে থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত হব। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে শুনে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মরেঙ্গে তো বিয়ের এনগেজমেণ্ট করে লাভ কী হলো? গান্ধীজী যে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছেন তাতে ঝাঁপ দিলে করেঙ্গের চেয়ে মরেঙ্গের সম্ভাবনাই বেশী।''

স্বপনদা ফোড়ন কাটেন, ''শাদী করেঙ্গের সম্ভাবনাও কম নয়।''

।। বিশ ।।

স্টালিনগ্রাডে তখন ঘোরতর সংগ্রাম চলেছে। হ্যাণ্ড টু হ্যাণ্ড ফাইট। রাস্তায় রাস্তায়। কে জিতবে, কে হারবে তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। মুকুলদা পণ্ডিচেরী থেকে স্বপনদাকে জানিয়েছেন যে শ্রী অরবিন্দ দু'বেলা রেডিও খুলে খবর শুনছেন। যুদ্ধের ধারাবিবরণী।

স্বপনদার মনে পড়ে যায় একটা ইংরেজী ছড়া। দীপিকাদিকে শোনান।

''See-saw,
Margery Daw!''

দীপিকাদি সুধান, ''হঠাৎ তোমার তক্তা খেলার শখ হলো কেন? আমি কি মার্জরি ড? আমি একবার উঠব, একবার নামব। তুমি একবার নামবে, একবার উঠবে? তেমন খেলার কি শেষ আছে?''

''আরে, সেই কথাই তো আমি বোঝাতে চাইছি। একবার জার্মানরা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ানদের, একবার রাশিয়ানরা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে জার্মানদের। এ খেলার শেষ কোথায়? আমার চিত্তও তেমনি দোলনায় চেপে দুলছে। রাশিয়ানরা সমাজে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে, তারা হেরে যাক এটা আমার কাম্য নয়। আবার জার্মানরা কত দিক দিয়ে অসামান্য। ওরা হেরে গেলেও আমি দুঃখ পাব। তা হলে কি ওরা দুই পক্ষই জিতবে? তা কী করে সম্ভব? এমন কোনো সমাধান কি হয় না যাতে দু'পক্ষেরই মান রক্ষা হয়, প্রাণ রক্ষা হয়, স্বার্থ রক্ষা হয়? মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিটমাট করতে পারে এমন কি কেউ নেই? ভারত যদি স্বাধীন হয়ে থাকত গান্ধীজীই হয়তো সেটা পারতেন।'' স্বপনদা মনে করেন।

''আগে তো ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে জয় হোক। আপনি খেতে পায় না শঙ্করাকে ডাকে। বাইরের জগতে কে মানে গান্ধীজীকে? নিজের দেশেই তাঁর ডাক শুনে সাড়া দিচ্ছে ক'জন? আর-সব প্রদেশের খবর রাখিনে, এই বাংলাদেশে মেদিনীপুর ছাড়া আর কোন্ জেলা সাড়া দিয়েছে? সাড়া বলতে

আমি বুঝি জনগণের সাড়া।" দীপিকাদি কেমন যেন নিরাশ।

এমন সময় এল্‌ফ লাফ দিয়ে ছুটে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে। তারপর চুপ করে ফিরে আসে। পেছনে বাবলী।

"এই যে, চকোলেট।" স্বপনদা আদর করে পাশে বসান। "তারপর কী খবর? কাগজে আর কতটুকু লেখে, রেডিওতে কতটুকু শোনায়?"

বাবলী কাতর কণ্ঠে বলে, "জুলিরা আমার পিঠে ছোরা মেরেছে, দাদা, বৌদি। স্টালিনগ্রাডে আমরা জিতব কী করে?"

"ওঃ সেইজন্যে তুমি এতদিন দর্শন দাওনি। হাসপাতালে ছিলে। তা একটা খবর দিতে হয়। গিয়ে দেখে আসতুম।" স্বপনদা রঙ্গ করেন।

"না, না, তামাশা নয়, দাদা। বিষম সীরিয়াস ব্যাপার। কংগ্রেস যদি সত্যি সত্যি ইংরেজকে ভারতছাড়া করে তবে সে কি রাশিয়ার এই দারুণ দুর্দিনে মদত দিতে পারবে? মদত না পেলে রাশিয়া কি একহাতে লড়ে হারানো এলাকা উদ্ধার করতে পারবে? আবার সেই ব্রেস্ট-লিট্‌ভস্ক। না, না, আমাদের জায়গা আমরা হাতছাড়া করব না। করলে আমাদের বিপ্লব ব্যর্থ হবে। ওখানে ব্যর্থ হওয়া মানে এখানেও ব্যর্থ হওয়া। কংগ্রেসই এর জন্যে দায়ী হবে, যদি এই আন্দোলন সফল হয়।" বাবলী নালিশ করে।

"কী আশ্চর্য সাদৃশ্য। ইংরেজরা বলছে কংগ্রেসওয়ালারা ওদের পিঠে ছোরা মেরেছে। তোমরাও বলছ ওরা তোমাদের পিঠে ছোরা মেরেছে। ওরা যদি সফল হয় তা হলে শুধু যে ইংরেজরা ভারতছাড়া হবে তা নয়, তোমরাও দেশছাড়া হবে। যদি দেশটা তোমাদের হয়ে থাকে। তোমাদের কথাবার্তা থেকে মনে হতে পারে তোমরা মস্কো থেকে এসেছ, যেমন মুসলিম লীগপন্থীরা মক্কা থেকে এসেছেন। এ দেশের মুক্তি কি তোমাদের কাম্য নয়? এই পরিস্থিতিতে অনুচিত হতে পারে, কিন্তু মুক্তির জন্যে সংগ্রাম কি তাই বলে একটা অপরাধ?" স্বপনদা জিজ্ঞাসা করেন।

"কাকে তুমি শোনাচ্ছ একথা?" বাবলী জ্বলে ওঠে। "যে দেশের জন্যে জীবনপণ করেছিল। আর একটু হলে ফাঁসীকাঠে ঝুলত। সাহেবটা বেঁচে যায়, সেও বেঁচে যায়। দীর্ঘকাল জেলখানায় বসে সে আরো পড়াশুনা করেছে। তাই বুঝতে পেরেছে যে ভারতের স্বাধীনতা হচ্ছে উপরতলার দশভাগের নয়, নিচের তলার নব্বইভাগের স্বাধীনতা। সেটা কংগ্রেসের লক্ষ্য নয়। কংগ্রেসনেতারা চান নিজেদের শ্রেণীর আধিপত্য। একদল গোরা ইংরেজকে তাড়িয়ে একদল কালা ইংরেজ সব ক্ষমতা ও সব ধন আত্মসাৎ করবে। যাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবে তারা যেমন শোষিত ছিল তেমনি শোষিত থাকবে। গান্ধীজীর মূল স্বরাজ কল্পনা তো ভালোই ছিল। কিন্তু জমিদার, মহাজন ও পুঁজিপতিদের টাকায় কংগ্রেস চালাতে গিয়ে তিনি পড়ে গেছেন তাদেরই শ্রেণীস্বার্থের ফাঁদে। সফল যদি হন তবে সে সাফল্য উপরতলার দশভাগের লভ্য ডিভিডেণ্ড। নিচের তলার নব্বইভাগের প্রাপ্য মজুরি নয়। এর জন্যে কেন আমি জীবনপণ করব? কেনই বা করেঙ্গে, মরেঙ্গেই বা কেন? আমার রেকর্ড কি তোমার অজানা? তুমি হাইকোর্টের পেপারবুক যদি পড়ে না থাক তবে ল রিপোর্ট নিশ্চয়ই পড়েছ। আমাকে দেশ ছাড়া করবে এত বড়ো স্পর্ধা কার। সময় যখন আসবে তখন আমিই তাদের লিকুইডেট করব। তোমার এই ব্রিটিশ আইন তাদের বাঁচাতে পারবে না।"

"যদিও এই ব্রিটিশ আইনই তোমাকে বাঁচিয়েছে।" স্বপনদা হাসেন। "দ্যাখ, চকোলেট, ইংরেজরা চিরকাল সাম্রাজ্যবাদী ছিল না। ধনতন্ত্রবাদীও ছিল না। এমন কি বুর্জোয়াও ছিল না। তাদের আইনের সূত্রপাত অতি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই হয়েছিল। প্রচণ্ড সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সে আইন প্রজাশক্তিকে রাজশক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর করেছে, সিভিল পাওয়ারকে মিলিটারি পাওয়ারের থেকে উচ্চতর করেছে, আইনের শাসনকে মাৎস্যন্যায়ের ঊর্ধ্বতর করেছে। ওদের দেশের অভিজাতরা বা ধনপতিরাও আইনের

ঊর্ধ্বে নন। বিপ্লব যদি হয় লেনিন স্টালিনকেও বিচারপতিদের রায় মানতে হবে। লিকুইডেট করতে হলে তার আগে আইন পাশ করিয়ে নিতে হবে। দীনতম ও হীনতম ইংরেজও এর মূল্য বোঝে। কোর্টের উপর তাদের অগাধ শ্রদ্ধা, কোর্টও তাদের রক্ষক। সরকারটাতে যে উপরতলার লোকের মৌরসী পাট্টা তা নয়। লেবার পার্টিও গদীতে বসতে পারে, বার দুয়েক বসেওছে। সেইজন্যেই তো ওরা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। ফ্যাসিস্টরা যাতে জিতে না যায়, জিতে গিয়ে তাদের অধিকার কেড়ে না নেয়, সেইজন্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অস্ত্র জোগাচ্ছে। ইংরেজ যাক, কিন্তু তার দেওয়া আইন আদালত, আইনসভা, গণতান্ত্রিক নির্বাচন, গণতান্ত্রিক মন্ত্রিত্ব থাকুক। কংগ্রেস যা চায় তা কেন্দ্রীয় স্তরে সম্প্রসারণ। ওই কাঠামোটা পরে তোমাদেরও কাজে লাগবে, যদি জনগণের ভোট পাও।"

দীপিকাদি এবার কণ্ঠক্ষেপ করেন। " তোমার ওসব কথা কংগ্রেসের বামপন্থীরা স্বীকার করবেন না। ওঁরা চান ইংরেজকে ঝাড়েমূলে উচ্ছেদ করতে। ইংরেজশাসনের ভালোমন্দ সব একসঙ্গে মুছে ফেলবেন। বাথ টাবের ময়লা জলের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটিকেও নর্দমায় ফেলে দেওয়া হবে। বাবলীদের সঙ্গে জুলিদের ফারাক খুব বেশী নয়। ওরা এক পালকের পাখী। তবে প্রোলিটারিয়ান একাধিপত্য জুলিরা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। প্রাইভেট প্রপার্টি ওদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। ওরা বামপন্থী হলেও মার্কসবাদী নন। সুতরাং বাবলীদের সঙ্গে গোড়ায় অমিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধা এক জিনিস। তার অন্তর্ধানের পরে তার পরবর্তী মতবাদ নিয়ে একমত হওয়া অন্য জিনিস। বিপ্লবেরও দুই দলের কাছে দুই অর্থ ও দুই রূপ। একদল হয়তো আরেক দলকে উৎখাত করবে।"

বাবলী একটু ইতস্তত করে বলে, "কিন্তু ওরা যে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, বৌদি। ওরাই যদি আমাদের আগে বিপ্লব ঘটায় তো আমরা ঘটাব কী? প্রতিবিপ্লব না অতিবিপ্লব? ওরা যদি সফল হয় তবে আমাদের আর মাথা তুলতে দেবে না। ব্রিটিশ আইন তো তখন থাকবে না। আমাদের ধরে ধরে ঝুলিয়ে দিলে আমরা কোন্ আদালতের দ্বারস্থ হব? আমাদের একমাত্র ভরসা স্টালিনের হস্তক্ষেপ, যদি তাঁর জয় হয়। জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে। আমরা এখন মহা উদ্বিগ্ন অবস্থায় দিন গুনছি, প্রহর গুনছি, ঘণ্টা গুনছি। তার জন্যে যদি শয়তানের সাহায্য নিতে হয় তো তাও নেব। সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতন্ত্রবাদীরা সাক্ষাৎ শয়তান। তবু তাদের সাহায্য আমাদের নিতেই হবে। সেইজন্যেই তো কংগ্রেসের এই আন্দোলন আমাদের পিঠে ছুরি। নইলে জুলির সঙ্গে তো ভালোবাসার সম্পর্ক। তার অমঙ্গল কে চায়। মেয়েটা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ তা জানে না। তার মা পর্যন্ত না। ও যে কী করে বেড়াচ্ছে, তাই বা কে জানে? যদি মারাত্মক কিছু করে না থাকে তবে মিলিটারি ট্রাইবিউনালে নির্ঘাত প্রাণদণ্ড। তার চেয়েও ভয়ানক কথা—"

"থাক, মুখে আনতে হবে না।" বৌদি ধমক দেন।

স্বপনদা অনুমান করেন। "না, না, ইংরেজরা তত খারাপ নয়।"

বৌদি আবার ধমক দেন। "তুমি তো সব জানো। ওরা এককালে কীই বা না করেছে! আজকাল সহজেই টি টি পড়ে যায় বলে সাবধান হয়েছে। তুমি কি জালিয়ানওয়ালাবাগের ভিতরের কারণ জানো?"

"তুমি জানো?" স্বপনদা কৌতূহলী হন।

"মিউটিনির পর থেকে ইংরেজদের সর্বক্ষণ আতঙ্ক কখন না জানি ওদের মেমসাহেবেরা ধর্ষিতা হন। অমৃতসরে একজন মেমসাহেবের উপর উপদ্রব হয়, সেটা ধর্ষণ না হলেও সব চেয়ে খারাপটাই ওদের মাথায় আসে। নেটিভদের নিবৃত্ত করার অভিপ্রায়ে জেনারেল ডায়ারের অতর্কিত গুলীবর্ষণ। যারা নিরপরাধ তাদেরই প্রাণদণ্ড হলো। ওটার জন্যে ভালো ইংরেজরা সকলেই লজ্জিত। অথচ প্রাণ খুলে ডায়ারকে অভিশাপ দিতেও পরাঙ্মুখ। তিনি নাকি ইংরেজ মহিলামাত্রেরই মানরক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই জালিয়ানওয়ালাবাগ ম্যাসাকার করেছিলেন। এসব কথা তুমি ইতিহাসে পাবে না। এটা

অলিখিত এক অধ্যায়। আমিও লিখব না। ইংরেজরা ভয় পেয়েছিল ও তার সঙ্গত কারণ ছিল এটা সত্য।" বৌদি একথা মানেন।

"ওরা সাক্ষাৎ শয়তান। তবু আমাদের দুর্দিনের মিতা।" বাবলী বলে।

"নারী! নারী!" স্বপনদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়েন। "নারীর জন্যেই লঙ্কাকাণ্ড। নারীর জন্যেই কুরুক্ষেত্র। নারীর জন্যেই ট্রয়ের যুদ্ধ। নারীর জন্যেই জালিয়ানওয়ালাবাগ ম্যাসাকার। তার থেকে অসহযোগ আন্দোলন। যার চরম পরিণতি এই 'ভারত ছাড়ো' অভ্যুত্থান। এখন ক্যারামেলের গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়। দিলে এ রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই নিয়ে পরে এক মহাকাব্য বা মহা উপন্যাস লেখা হবে। ক্যারামেল হবে তার নায়িকা।"

"তুমিও যেমন!" বৌদি পরিহাস করেন। "কেউ জানতে পেলে তো ধ্বংসলীলা শুরু করবে? যা কড়া সেনসরশিপ। কাগজে কতটুকু বেরোয়! তুমি কি জানো যে জুলির সঙ্গে যার বিয়ে হবে সেই সৌম্য চৌধুরীর মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা? যে ধরিয়ে দেবে সে পাবে।"

"ও কী! সৌম্য তো কট্টর অহিংসাবাদী। ও কোথায় কবে কী করেছে যে ওর মাথার দাম হবে পাঁচ হাজার টাকা?" স্বপনদা হকচকিয়ে যান।

"তা তো জানিনে। খবরটা আমার কানে এসেছে চুম্বক আকারে। বোধ হয় পুলিশ গেজেটে বেরিয়েছে।" বৌদি যতদূর জানেন।

"তা হলে জুলির বরও নিখোঁজ।" বাবলী দুঃখিত হয়ে বলে।

স্বপনদা সংশোধন করেন, "ভাবী বর।"

"বেচারি জুলি। কবে যে ওর বিয়ের ফুল ফুটবে তা কে বলতে পারে? করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ব্রত নিয়ে বেঁচে থাকাই দায়। আমার ভয়ানক মন কেমন করছে ওর জন্যে। ঝগড়া করেছি বলে কি আমি ওকে কম ভালোবাসি? মেয়েটা গেল কোথায়? ও তো সুভাষ বোসের ভক্ত। সুভাষ বোস যেমন নিরুদ্দেশ জুলিও তেমনি নিরুদ্দেশ। দেশের বাইরে চলে গেছে কি না কে জানে। না যাওয়াই সম্ভব। বরের টানে দেশে থেকে যেতেও পারে।" বাবলী গবেষণা করে।

"বরটাও যদি দেশান্তরী হয়ে থাকে? পাঁচ হাজার টাকা যার মাথার দাম সে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু করেছে। নইলে ফেরার হবে কেন। নেপাল। নেপাল। আমার মনে হয় নেপালে গিয়ে ওখান থেকে বিহারে বিদ্রোহ পরিচালনা করছে। শুনেছি বিহারেই ওর আসল বাড়ী।" স্বপনদার ভাষ্য।

"যত সব বাজে ভাবনা।" বৌদি এককথায় খারিজ করেন। আত্মগোপন করার পক্ষে কলকাতার মতো জায়গা আর নেই। এমন সব গলি খুঁজি আছে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় না। দিনের বেলাও ব্ল্যাক আউট। এক বাড়ীর ছাদ থেকে আরেক বাড়ীর ছাদে লাফ দেওয়া যায়। পাঁচ হাজার টাকার লোভে পুলিশ কি নিজের প্রাণ বিপন্ন করবে? যদি ওদের হাতে রিভলভার থাকে! এই যুদ্ধের মরসুমে বিস্তর রিভলভার আমদানী হয়েছে, কালো বাজারে কেনা যায়। জুলির তাতে কোনো অনীহা নেই। ওর ভাবী বরের কথা আলাদা। গান্ধীবাদী বলে শুনেছি। গান্ধীবাদীরা আত্মগোপন করে না। এ রহস্য ভেদ করা কঠিন।" বৌদি নিশ্চিত নন।

"পুলিশও আজকাল তেমন তৎপর নয়। ওরাও বোঝে ক্ষমতা একদিন কংগ্রেসের হাতেই পড়বে। আর নয়তো বার্মার মতো জাপান পসন্দ দলের হাতে। যুদ্ধের যতদিন না একটা এসপার কি ওসপার হচ্ছে ওদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি না দলের লোকেরা কেউ ধরিয়ে দেয়। এই পোড়া দেশে সেটার সম্ভাবনাই বেশী। বকধার্মিকের মতো বকস্বদেশীতে দেশ ভরে গেছে। খদ্দরের ভেক পরে ঘুরে বেড়ায়।" স্বপনদা সীনিকের মতো বলেন।

বৌদি প্রতিবাদ করেন। "বকস্বদেশী তুমি কাদের বলছ? ওরা যে মহাত্মা গান্ধীর পদাতিক সেনা।

খাদি ওদের ইউনিফর্ম। লক্ষ লক্ষ বিধবা চরকায় সুতো কেটে দুটো পয়সা পাচ্ছে, হাজার হাজার তাঁতী কাপড় বুনে দু'মুঠো ভাত পাচ্ছে। লোকে কম টাকায় মিলের ধুতী শাড়ী না কিনে খাদির ধুতী শাড়ী কিনছে। সেইভাবে দেশের জন্যে যে যেটুকু পারে ত্যাগস্বীকার করছে। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। বিনা ত্যাগসে না মিলে স্বরাজ। এত অধিকসংখ্যক ভারতবাসী এত বেশী ত্যাগস্বীকার কি এর আগে কখনো করেছে? সুবিধাবাদী আর বিশ্বাসঘাতক কোন্ সৈন্যদলে নেই? তা বলে ওদের দিয়ে দেশ ভরে গেছে এটা তোমার অত্যুক্তি।"

স্বপনদা বলেন, "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির একটা মস্ত বড়ো গুণ হচ্ছে ওরা নির্মমভাবে পার্জ করে। পার্জ করতে গিয়ে এমন কড়া পার্গেটিভ দেয় যে ময়লার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও বেরিয়ে যায়। সেটা অবশ্য মস্ত বড়ো একটা দোষ। আর আমাদের এখানে কংগ্রেসের রীতি হচ্ছে আদৌ পার্জ না করা। পাছে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়।"

বৌদি মেনে নিতে পারেন না। "তুমি যাকে পার্জ বলছ তার নামে মধ্যযুগে ছিল ইনকুইজিশন আর উইচ হাণ্ট। সেইসব জিনিস অন্য নামে ফিরে এসেছে। কমিউনিস্ট পার্টি রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতোই অসহিষ্ণু। কংগ্রেসও যদি তাই হয় তবে এদেশেও ইনকুইজিশন ও উইচ হাণ্ট শুরু হবে। এরা অবশ্য মানুষকে পুড়িয়ে মারবে না বা ফায়ারিং স্কোয়াডের সাহায্যে হত্যা করবে না। কিন্তু তার ধোপা নাপিত বন্ধ করবে, দানাপানি রোধ করবে। সে গ্রামে টিকতে পারবে না। শহরে পালিয়ে আসবে। সেখানেও আশ্রয় পাবে না। দেশান্তরী হবে। কংগ্রেসকে টোটালিটারিয়ান পার্টি না করে ডেমোক্রাটিক পার্টি হিসাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। থাক না কিছু দলাদলি। ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি। সিদ্ধান্ত যেটা হবে সেটা মেজরিটি ভোটেই হবে। কিন্তু মাইনরিটিও থাকবে। তাকেও সুযোগ দিতে হবে মেজরিটি হয়ে ওঠার। পার্জ করবে কে কাকে? কার সে অধিকার আছে? গায়ের জোরে পার্জ করলে সেটা হবে ন্যায় নয়, অন্যায়। যারা সামাজিক ন্যায়ের জন্যে বিপ্লব ঘটিয়েছে তারা কী করে বলবে যে এটা অন্যায় নয়, ন্যায়?"

"শোন, বৌদি," বাবলী এর উত্তর দেয়, "তোমার যুক্তি নির্ভুল। কিন্তু যাদের ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু, যাদের রাষ্ট্র এখনো মজবুত হয়নি, তারা যদি টের পায় যে তাদের পার্টির ভিতরেই শত্রু, তা হলে তারা প্রতিবিপ্লবের বা অতিবিপ্লবের ভয়ে কাঁটা বেছে ফেলবেই। যাতে নিষ্কণ্টক হতে পারে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। মহান স্টালিন একান্ত সহনশীল। কিন্তু তাঁর সহনশীলতারও সীমা আছে। হত্যার আদেশ যখন তিনি অনুমোদন করেন তখনকার ফোটো দেখেছ? কী করুণাঘন মুখ! ওটা আপনাকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে নয়, পার্টিকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে, সেইসূত্রে বিপ্লবকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে, শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র রাষ্ট্রকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে, আমাদের পিতৃভূমিকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে। হাসছ যে!"

"তোমাদের পিতৃভূমি শুনে।" বৌদি উপহাস করেন।

"আক্ষরিক অর্থে নয়। প্রতীকী অর্থে।" বাবলী ব্যাখ্যা করেন।

"তারপরে তোমাদের জনযুদ্ধ কতদূর?" স্বপনদা প্রশ্ন করেন।

"রাইফেল হাতে না পেলে জনযুদ্ধ চলবে কী করে? যোদ্ধারা প্রস্তুত, কিন্তু অস্ত্র কোথায়? ইংরেজদের ধারণা হাতিয়ার হাতে পেলে আমরা জাপানের সঙ্গে না লড়ে ওদের সঙ্গেই লড়ব।" বাবলী আক্ষেপ করে।

"সে ধারণা নেহাৎ ভুল নয়, চকোলেট। তোমরা প্রায় সবাই পুরাতন সন্ত্রাসবাদী। ইংরেজরা তোমাদের বিশ্বাস করবে কেন? আর জাপান তো রাশিয়ার শত্রু নয়। তার বিরুদ্ধে তো লড়ছে না। তোমরাই বা জাপানের সঙ্গে লড়বে কার স্বার্থে? তোমাদের পিতৃভূমির স্বার্থে নিশ্চয়ই নয়। তা হলে কি

রাশিয়ার মিত্র ইংলণ্ডের স্বার্থে? না, তাও তো নয়। যদি বলো মাতৃভূমির স্বার্থে তবে কেউ বিশ্বাস করবে না। ঘোড়া হাসবে।" স্বপনদা কৌতুক করেন।

"কিন্তু জাপানীরা যে ফাসিস্ট এটা তো সত্য। হিটলার, মুসোলিনী, তোজো এই তিন ফাসিস্ট ডিকটেটরই আমাদের দুশমন। হিটলার ফার্স্ট। হিটলারকে টিট করার পর তোজোর পালা আসবে। ইতিমধ্যে আমাদেরও সক্রিয় হতে হবে। আমরা প্রোপাগাণ্ডা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। অ্যান্টিফাসিস্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে। প্রত্যেকটি শহরে, প্রত্যেকটি গ্রামে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি। সাম্যবাদী সুসমাচার প্রচার করছি। পুঁথিপত্র বিতরণ করছি। মিশনারিদের মতো নামমাত্র দাম নিই। শান্তির সময় হলে ইংরেজ সরকার আমাদের কর্মীদের জেলে পুরত, পুঁথিপত্র বাজেয়াপ্ত করত। যুদ্ধকালে আমরা নিরঙ্কুশ। তুমি যদি চাও তো বলো, তোমাকে একসেট মার্কসীয় সাহিত্য এনে দেব। মার্কস, এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিন, স্টালিন সকলের বই পাবে। কিন্তু ট্রটস্কির নয়, বুখারিনের নয়।" বাবলী মাথা নাড়ে।

"কেন, ওঁরা কি মার্কসবাদী ছিলেন না?" স্বপনদা জেরা করেন।

"ছিলেন, কিন্তু পার্টি লাইন মেনে চলেননি। লাইনচ্যুত হয়েছেন। মার্কসবাদ ইন্টারপ্রেট করবার একমাত্র অধিকারী হচ্ছে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি। যার ফার্স্ট সেক্রেটারি কমরেড স্টালিন।" বাবলী জবাব দেয়।

বৌদি টিপ্পনী কাটেন, "যেমন গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ, যার প্যাট্রিয়ার্ক বাস করতেন মস্কোতে। অভ্রান্ত শাস্ত্র, অভ্রান্ত চার্চ, অভ্রান্ত প্যাট্রিয়ার্ক। সব ঘুরে ফিরে এসেছে। মানতেই হবে। না মানলে কোতল।"

"আমি হিউম্যানিস্ট। সব রকম মানবিক ব্যাপারে আমার আগ্রহ। মার্কসবাদী চিন্তাধারাও মানবিক। রোজা লুকসেমবুর্গের বই তোমার কাছে থাকলে দিয়ো। জার্মানীতে তাঁর সেই বিপ্লব সফল হলে সেখানকার পার্টি লাইন অন্যরকম হতো।" স্বপনদা মনে করেন।

"যেমন মার্টিন লুথারের প্রটেস্টাণ্ট চার্চের সাম্প্রদায়িক বিধান।" বৌদি তুলনা দেন। তাঁর মুখে বাঁকা হাসি।

"রোজা লুকসেমবুর্গকে আমি অশেষ শ্রদ্ধা করি। ওঁর বই তো এদেশে নিষিদ্ধ। আমরা যেসব বই আনাই সেসব তো রাশিয়া থেকে। রোজার বই রাশিয়া পাঠাবে না।" বাবলী অক্ষমতা জানায়।

"তার মানে মার্কসবাদীরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মতো। বৌদ্ধ ও জৈনদের মতো। আমরা লিবারল হিউমানিস্টরা গোঁড়া নই। সব সম্প্রদায়েরই বক্তব্য প্রণিধান করি।" স্বপনদা বলেন।

"ভালো কথা, তোমাদের লিবারল হিউমানিস্ট ম্যানিফেস্টোর কী হলো? মিটিং তো বসল কয়েকবার।" বৌদি জানতে চান।

"মিটিং মানে তো ইটিং। নানা মুনির নানা মত। লিবারলদের যত মত তত পথ। প্রত্যেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। যেখানে এত বেশী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সেখানে একমত হওয়া অসম্ভব। কমিউনিস্টরা গুরুবাদী। মার্কস তাঁদের গুরু। র‍্যাডিকাল হিউমানিস্টরাও গুরুবাদী। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁদের গুরু। আমাদের তেমন কোনো গুরু নেই। আমরা গুরুবাদী নই। তর্কাতর্কি করেই আমরা একমত হতে চেষ্টা করি। কোনো কোনো পয়েন্টে একমত হইও। কিন্তু মোটের উপর নয়।" স্বপনদা জানান।

এবার বাবলী প্রতিবাদ করে। "ওই যে বললে কমিউনিস্টরা গুরুবাদী ওটা তোমার ভুল ধারণা, দাদা। ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ অনুধাবন করে মার্কস এমন একটি পন্থার নিশানা দিয়ে গেলেন যা অনুসরণ করে রুশ দেশের কমিউনিস্টরা প্রমাণ করলেন যে মার্কসবাদী বিপ্লব অব্যর্থ। এর মধ্যে গুরুবাদ কোথায়? এ তো কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো যুগান্তকারী পর্যায়। আমেরিকা পাঁচশো বছর পরে যে স্তরে উপনীত হয়েছে রাশিয়া পঁচিশ বছরের মধ্যেই সেই স্তরের কাছাকাছি

পৌঁছেছে। মার্কস স্বয়ং এতটা প্রত্যাশা করেননি। মার্কসকে যদি গুরু বলতে চাও তো লেনিন হচ্ছেন তাঁর গুরুমারা চেলা। আর স্টালিন লেনিনের চেয়েও এককাটি সরেশ।"

বৌদি হেসে ফেলেন। "তা তো হবেনই। শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ। স্টালিন তো শত সহস্রমারী। তিনি ধন্বন্তরি।"

"ফরাসী বিপ্লবের ও তার পরবর্তী নেপোলিয়নী আমলের হিসাব নিকাশ করলে দেখবে যে শত সহস্রকেও ছাড়িয়ে যায়। নীট ফল ব্যর্থতা। অপর পক্ষে নীট ফল সার্থকতা। অন্তত এখন পর্যন্ত তাই। রোমানভরা আর কখনো ফিরে আসবে না, অভিজাতরাও না। বুর্জোয়ারা ফিরে এলে কৃষক শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখতে পারবেন না। গণতন্ত্র প্রবর্তন করলে দেখবেন ওদেরই ভোটের জোর বেশী। ফাসিজম প্রবর্তন করলে গৃহযুদ্ধে বিনষ্ট হবেন। পৃথিবীর অন্তত একটা অংশে চিরকালের মতো বুর্জোয়াদের যুগ অস্ত গেল। সেখানে এখন নবযুগের সূর্যোদয়। এক এক করে অন্যান্য অংশেও সূর্যোদয় হবে। চীনদেশে তার পূর্বাভাষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মহান লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন বিপ্লব যাবে পিকিং আর কলকাতার পথ দিয়ে প্যারিসে। পিকিং পর্ব সারা হলেই কলকাতা পর্ব। আমরা তার জন্যে কোদাল দিয়ে মাটি কাটছি।" সবিনয়ে নিবেদন করে বাবলী।

স্বপনদা ব্যথিত হয়ে বলেন, "ঈশ্বর ওদের ক্ষমা করুন। ওরা জানে না ওরা কী করছে। যে যুগটাকে ওরা শেষ করে দিচ্ছে সেটা লিবারল হিউমানিজমের যুগ। এখনো সে যুগের কয়েকজন শিল্পী ও সাহিত্যিক দেশান্তরে গিয়ে বেঁচে আছেন ও সৃষ্টি করে চলেছেন। রাশিয়াতে বনস্পতি বলতে কেউ নেই, থাকলেও নীরব। সেখানে এরণ্ড হয়েছেন দ্রুম। লেনিনের তবু শিল্পবোধ সাহিত্যবোধ ছিল। স্টালিন তো সে রসে বঞ্চিত। বিশ্ব সাহিত্য ও বিশ্ব শিল্প থেকে রাশিয়ার নাম মুছে গেল। টলস্টয় ডস্টয়েভস্কি টুর্গেনিভ চেকভের উত্তরসূরী রইল না। তোমরা যদি এদেশে সফল হও তবে আমরাই হব লাস্ট জেনারেশন। তা হলে এখন থেকেই সোয়ন সং লিখতে হয়।"

"সোয়ান সং মানে কী, বৌদি?" বাবলী জিজ্ঞাসা করে।

"ওদেশে একটা প্রবাদ আছে, রাজহংসের মরণ আসন্ন হলে সে তার অন্তিম গীতি শুনিয়ে দিয়ে মরে। সোয়ান সং মানে বিদায় সঙ্গীত। বড়োই করুণ।" বৌদি বুঝিয়ে দেন।

"না, দাদা, তোমাকে আমরা মরতে দেব না, বাঁচিয়ে রাখব। তবে ওই বুর্জোয়াপসন্দ উপন্যাস লেখা আর চলবে না। শ্রমিকপসন্দ কৃষকপসন্দ লিখতে হবে। তাতে তোমার লাভও হবে বিস্তর।" বাবলী অভয় দেয়।

"যাদের জীবনের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় নেই, যাদের ভাষাও আমি শিখিনি তাদের মনের মতো উপন্যাস লেখা কি আমার কর্ম? যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। পাঠকরা আমাকে লাঠিপেটা করবে। মরতে আমাকে হবেই, আক্ষরিক অর্থে না হোক সাহিত্যিক অর্থে। স্ত্রীপাঠ্য বা শিশুপাঠ্য কাহিনীর মতো শ্রমিকপাঠ্য বা কৃষকপাঠ্য কাহিনী লিখে আমি হয়তো জনপ্রিয় হব, পুরস্কৃতও হতে পারি, কিন্তু সেটা দু'দিনেই বাসি হয়ে যাবে। তোমরাই মুখ ফিরিয়ে নেবে। তার চেয়ে মানে মানে অপসরণই ভালো। তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিলে, বোন! মস্কোর পরে পিকিং তার পরে কলকাতা, তার পরে প্যারিস। তা হলে এখন থেকেই লণ্ডন যাত্রা নয় কেন? আরো কিছু দিন সময় পাওয়া যাবে।" স্বপনদা দীপিকাদির দিকে তাকান।

"তুমি তো ওদেশে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই রয়েছ। ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও প্রস্থান করবে, সে আমি জানি। কিন্তু আমি আমার এল্‌ফকে নিয়ে এই দেশেই থেকে যাব।" বৌদি এল্‌ফকে কাছে টেনে নেন।

সেও ল্যাজ নেড়ে সম্মতি জানায়। বাবলীর কোল ছাড়ে।

বাবলী অপ্রতিভ হয়ে বলে, "তোমাদের সুখের সংসার ভেঙে দিতে আমি আসিনি, বৌদি। এদেশে বিপ্লব কি এখনি হচ্ছে? আগে তো চীনদেশে হোক। তার পূর্ব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে মাওৎসে-তুংয়ের নেতৃত্বে। পিকিং এখনো দূর অস্ত্। দাদা, তুমি যা লিখতে চাও লিখে যাও। আমরা বাধাও দেব না, ফরমায়েসও করব না। তবে আশা করব যে তোমার মতো শক্তিশালী লেখক বুর্জোয়াদের অবক্ষয়ী সমাজের বর্ণনার বদলে মহৎ কিছু লিখবেন, যেটা সমাজের প্রগতিশীল শ্রেণী সানন্দে গ্রহণ করবে। টুর্গেনিভকে তো আমরা খারিজ করিনি। টলস্টয়কে তো নয়ই। বাতিল করেছি ডস্টয়েভ্স্কিকে। পাক্কা প্রতিক্রিয়াশীল। আর চেকভকে। তাঁর হৃদয় ছিল, সেটার অপাত্রে অপচয় করেছেন।"

"শুনেছি চেকভের বই আজকাল আবার ছাপা হচ্ছে। সকলের জন্যেই ছিল তাঁর দরদ। মানুষমাত্রেরই জন্যে।" স্বপনদা আবেগের সঙ্গে বলেন।

"হ্যাঁ, চেকভের নতুন করে মূল্যায়ন হচ্ছে। তিনি তো জাত বুর্জোয়া ছিলেন না। তবে ডস্টয়েভ্স্কি বরাবরের মতো বাতিল।" বাবলী যতদূর জানে।

"তা যদি হয় তবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পাঠ থেকে তাঁর স্বদেশবাসী বঞ্চিত হবে। আমি 'ব্রাদারস কারামাজভে'র কথা ভেবে বলছি। তুমি যদি না পড়ে থাক তোমার শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কোনো সাহিত্যিককে লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। এর পরে ডস্টয়েভ্স্কির দিনও আসবে।" স্বপনদা ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

বাবলী এল্‌ফকে একটু আদর করে বলে, "যুদ্ধে যদি জিতি পমেরানিয়া আমরাই দখল করব।"

।। একুশ ।।

পূজার বন্ধে কলকাতা গিয়ে মানস বিজন বর্ধনের অতিথি হয়। বিজনের গৃহিণী উদিতা জানতে চায় যূথিকা কোথায়। সে আসেনি কেন।

"যূথিকা এখন মহিলা সমিতির ভার নিয়ে হরেক রকম ধান্দায় জড়িয়ে পড়েছে। সুতো কাটা, তাঁত বোনা থেকে শুরু করে হাসপাতালে গিয়ে রোগিণীদের সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থা করা। বাচ্চাদের জন্যে দুধও নিয়ে যায়। তার উপর আছে নিজের বাচ্চাদের শিক্ষাদীক্ষার ভার। আমরা ওদের ইস্কুলে দিইনি। গভর্নেস রাখারও ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধেও যূথিকার নিজস্ব ধারণা আছে। আধুনিকতম পদ্ধতিতে শেখায়।"

উদিতা তা শুনে খুব খুশি হয়। সে নিজে এখন মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধের কাজে সহায়তা করছে। শীতকালের জন্যে পশমের মোজা গেঞ্জি পুলোভার ও কম্বল বানিয়ে নিয়ে সীমান্তে পাঠাচ্ছে। ছেলেকে দিয়েছে পাহাড়ের মিশনারী ইস্কুলে। সংসারের ভার হালকা।

বিজন আরো ভারিক্কি হয়েছে। আফিসের কাজের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকে। বাজে বই পড়ে না। বাজে কথা বলে না। পোশাক আসাকের শখ নেই। বাড়ীতে সেই বিলেতের ছাত্রজীবনের মতো গ্রে ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স আর ব্লু ব্লেজার কোট পরে থাকে। কী শীত, কী গ্রীষ্ম। বন্ধুরা হাসলে বলে, "আমি এখনো ছাত্র।"

কথায় কথায় স্ট্যাটিস্টিক্স উদ্ধৃত করে। মজুত খাদ্যের হিসাব দিয়ে বলে, "ফসল ভালো হলেও লোকের খোরাকে টান পড়বে। বিদেশী সৈন্য আমদানী চলেছে, অথচ বার্মা থেকে চাল আমদানী বন্ধ। ঘাটতি পূরণ হবে কী করে? র‍্যাশনিং ছাড়া আর কোন্ উপায় আছে?"

মানসকে মানতে হয় যে সেটাই একমাত্র উপায়।

আরো একটা ফ্যাক্টর কাজ করছে। সেটা আরো বেশী ভাবনার বিষয়। দেশে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল

রেভোলিউশন শুরু হয়ে গেছে। জাহাজের অভাবে বিলেত থেকে যা আমদানী হচ্ছে না তা এদেশেই তৈরি করে নিতে হচ্ছে। কতক মাল জাহাজ থাকলেও বিলেত থেকে সরবরাহ করতে পারা যেত না। ওদেশের কলকারখানাগুলো এখন যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণে ব্যস্ত। এদেশের পক্ষে এটা একটা মওকা। মাড়োয়ারীরা এতকাল কেনাবেচা করেই ক্ষান্ত ছিল। মওকা পেয়ে এখন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে উঠছে। ইউরোপীয়দের পার্টনার হচ্ছে। শ্রমিকরাও যে এর সুযোগ নিচ্ছে না তা নয়। ওদেরও মজুরি বেড়ে যাচ্ছে। ধর্মঘট করবে কোন্ দুঃখে? তবে, হ্যাঁ, টাকা দিয়ে যদি খাদ্য কিনতে না পায় তবে পেটের দায়ে ধর্মঘট করবেই। তখন চড়া দামে চাল কিনে মালিকরা ওদের খাওয়াবেন। গরিবরা না খেয়ে মরবে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন যে দেশেই হয়েছে সে দেশেই খাদ্যে টান পড়েছে। যদি না কৃষির জন্যে যথেষ্ট জমি থাকে, সার থাকে, পশু থাকে, পশুখাদ্য থাকে, মুনিষ থাকে, মুনিষখাদ্য থাকে। ল্যাণ্ড রিফর্মসও চাই। আর নয়তো উপনিবেশ থেকে সস্তায় খাদ্য আমদানি, উপনিবেশে মানুষ রফতানী।"

মানস এতটা চিন্তা করেনি। "তা হলে তুমি কী করতে বলো? যুদ্ধের আনুষঙ্গিক যে সম্ভবত সোশিয়াল রেভোলিউশন এইপর্যন্ত আমি জানতুম। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনও কি আনুষঙ্গিক?"

"গত মহাযুদ্ধেও এর লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। নইলে টাটা উৎসাহ পেতেন কী করে? এবার বিড়লাও পাচ্ছেন। আরো অনেকে পাচ্ছেন। এই সূত্রে যে ধনিককুল মাথা তুলছে এরাই ভাবী শাসককুলের পলিসি নির্দেশ করবে।" বিজন মৃদু হাসে।

"ভাবী শাসককুল মানে কি কংগ্রেস?" মানস প্রশ্ন করে।

"বাংলাদেশে তো নয়। এখানে মুসলিম লীগ ঘাঁটি গেড়ে বসছে। তাকে বিনা যুদ্ধে হটানো যাবে না। সার নাজিমউদ্দীনের ঘরে গেলে দেখবে, সম্মুখেতে প্রসারিত তব বাঙ্গালার মানচিত্র। একটার পর একটা মহকুমায় মুসলিম মহকুমা অফিসার পাঠানো হচ্ছে আর মানচিত্রে সেই মহকুমার উপর সবুজ নিশান পিন দিয়ে আঁটা হচ্ছে। এমনি করে মুসলিমপ্রধান মহকুমাগুলোর বেশীর ভাগই সবুজ হয়ে গেছে। এর পরে আসছে জেলার পালা। সেটা অত সহজ হবে না। ডিস্ট্রিক্ট আসলে রেভিনিউ ডিস্ট্রিক্ট। রেভিনিউ না হলে রাজত্ব চলে না। এটা আকবর বাদশাও বুঝতেন। ইংরেজ লাটসাহেবরাও বোঝেন। রাজস্বের ব্যাপারে হিন্দুরই যোগ্যতা বেশী। সার নাজিমের ইচ্ছার চেয়ে লাটসাহেবের ইচ্ছাই প্রবল। তা ছাড়া জেলার দায়িত্ব নেবার মতো মুসলিম সিভিলিয়ানই বা ক'জন? প্রোভিন্শিয়াল সার্ভিস থেকে প্রমোশন দেবার সময় জাতধর্মের সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যতারও বিচার করতে হয়। প্রমোশনের বেলা সাম্প্রদায়িক অনুপাত খাটে না। ব্রিটিশ রাজ তেমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। দিলে হিন্দু কর্মচারীদের আনুগত্য হারাবেন। কেন আমি ভূতের মতো খেটে মরব বা মরে ভূত হয়ে যাব, যদি জানি যে আমার উপরওয়ালা হবে আমারই এক অধস্তন অফিসার? এরই নাম ব্রিটিশ জাস্টিস, যার জন্যে ইংরেজরা গর্বিত? আর আমরা কৃতজ্ঞ? যা বলছিলুম, বাংলাদেশে মুসলিম লীগ ঘাঁটি গাড়ছে। ইংরেজরা একটা স্তর পর্যন্ত গাড়তে দিচ্ছে। সেটা মহকুমা স্তর। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল তো সেই স্তরেই নির্ধারিত হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মহকুমা হাকিমের নিত্য যোগাযোগ। থানা আর ইউনিয়নগুলো তাঁরই তদারকে। সার নাজিমের দলটাই জিতবে। জিতে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবে। কংগ্রেসওয়ালাদের মন্ত্রী হতে কেনই বা ডাকবে, যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে? তবে বাংলাদেশের আইনসভায় ইউরোপীয় ব্লকের ভোট না পেলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো পক্ষেরই নয়। অথচ ওরা যদি নিরপেক্ষ থাকে মুসলিম মন্ত্রীদের উপরেই বারবার শাসনভার বর্তাবে। মুসলিম লীগ চেষ্টা করবে সব ক'জনকে দলে টানতে। কংগ্রেস মুসলিম বলতে একজনও নেই। থাকলেই বা কী? কংগ্রেসের এখানে কতটুকু চান্স? খালি গোলমাল বাধালেই হলো?" বিজন আশাবাদী নয়।

এরপর গোলমালের প্রসঙ্গ ওঠে। মানস চায় তথ্য জানতে।

"মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেস ও ইংরেজ দুই পক্ষই গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসী দিয়েছে। আইনের ধার ধারেনি। একপক্ষ আইন অমান্য করলে অপর পক্ষও আইন অমান্য করে। এটা বোধহয় গান্ধীজী জানতেন না।"

মানস তো অবাক। "দুই পক্ষ বলছ কেন? কংগ্রেস তো জেলে। আর ইংরেজ নিশ্চয়ই ইংরেজ সিভিলিয়ান নয়।"

"না। এ পক্ষের 'জাতীয় সরকার' আর ও পক্ষের মিলিটারি অফিসার। মানছি এর জন্যে কংগ্রেস দায়ী নয়। গভর্নমেন্টকেও দায়ী করা যায় না। যুদ্ধকালে মিলিটারি নিরঙ্কুশ। ওরা সর্বত্র জাপানের পঞ্চম বাহিনী দেখছে। এই বা কী! বিহারে, যুক্তপ্রদেশে ও অন্য কোনো কোনো প্রদেশে যা ঘটেছে তা আরো ভয়ঙ্কর। দেড়শোটার বেশী পুলিশ স্টেশন ও অন্যান্য সরকারী ইমারত আক্রমণ করা হয়েছে। ত্রিশজনের উপর পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছে। তা ছাড়া আরো কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও সৈনিককেও। অপর পক্ষও চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিয়েছে। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। গ্রামের লোকদের বন্য পশুর মতো মৃগয়া করেছে। আকাশ থেকে প্লেন নেমে এসে উপর থেকে মেশিন গান চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করেছে। চাবুক মারা তো শত শত ক্ষেত্রে হয়েছেই, পাইকারী জরিমানাও আদায় করা হয়েছে কোটি খানেক টাকার। আন্দোলন এখনো থামেনি। রেল লাইন এখনো তুলে ফেলা চলেছে, টেলিগ্রাফের তার কাটাও। রাস্তা অবরোধ, কালভার্ট ধ্বংস এসব কর্মও। এটা হলো ইজ্জতের লড়াই। ভারত‌ও ব্রিটেনের চেয়ে খাটো নয়। ব্রিটেনও খাটো হবে না।" বিজন খুলে বলে না সে কোন্ দিকে।

"কী দরকার ছিল এই লড়াইয়ের? যখন জাপান এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। গান্ধীজীকে আচমকা না গ্রেপ্তার করলে কি এত কাণ্ড হতো? তোমার সহানুভূতি কার প্রতি জানিনে। আমার সহানুভূতি গান্ধীজীর প্রতি।" মানস ব্যক্ত করে।

"গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার না করে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালানো উচিত ছিল, একথা অনেকেই বলছেন। রামস্বামী আয়ার তো বড়লাটের শাসনপরিষদ থেকে পদত্যাগই করলেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো এই যে গান্ধীজী গণসত্যাগ্রহ করবেন বলে মনঃস্থির করেই বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তিনি ভালো করেই জানতেন যে বড়লাট তাঁকে গণসত্যাগ্রহ পরিচালনার অনুমতি দিতেন না। কিংবা তাঁকে খুশি করার জন্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন না। স্রোতের মাঝখানে কেউ ঘোড়া বদল করে? যুদ্ধকালে ক্ষমতার হস্তান্তর করে? গান্ধীজীও কি তাঁর যুদ্ধবিরোধী নীতি পরিত্যাগ করতেন? কংগ্রেস ক্ষমতার আসনে বসলেও তিনি তাঁর যুদ্ধবিরোধী নীতি অনুসরণ করে যেতেন। ফলে কংগ্রেসও তাই করত। যতদিন না কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটছে ততদিন গান্ধীই কংগ্রেস আর কংগ্রেসই গান্ধী। বড়লাট এটা মর্মে মর্মে বোঝেন। বৃথা সময় বাইরে দিয়ে বামপন্থীদের আস্কারা দিলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেত, বড়লাটের যেমন গান্ধীজীরও তেমনি। বামপন্থীদের একভাগ আবার জাপানভক্ত। যেন জাপানীরা ভারতমিত্র। আর ইংরেজরা ভারতবৈরী। এ ধারণা সম্পূর্ণ একপেশে। নিজেদের এই দুর্দিনে ইংরেজরা কেউ ভারতীয়দের শত্রু করতে চায় না। ভারতীয়রাও কেউ বিশ্বাস করে না যে জাপানী আক্রমণ ভারতের জওয়ানরা ব্রিটিশ অফিসারদের সহায়তা বিনা রুখতে পারবে।" বিজন যতদূর বোঝে।

"এই ট্র্যাজেডীর একটা অঙ্ক এখনো বাকী। গান্ধীজীর অনশনে দেহত্যাগ। ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের চিরবিচ্ছেদ। চিরশত্রুতা।" মানস কাতরস্বরে বলে।

"জোন অভ্ আর্ককে পুড়িয়ে মারার দরুন ফরাসীরা ইংরেজদের কোনো দিন ক্ষমা করেনি। করবেও না। অথচ জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধের বেলা ওরা পরস্পরের মিত্র। গরজ বড়ো বালাই। তেমন গরজ আজকের দিনে যেমন ইংরেজদের তেমনি ভারতীয়দেরও। কে জানে আবার এরকম হতে পারে।"

বিজন বাস্তববাদী।

"ভাবীকালের মুখ চেয়ে দুই পক্ষেরই কর্তব্য এ ট্র্যাজেডী নিবারণ করা। এখনো সময় আছে। কিন্তু বেশী দিন নয়।" মানস আশঙ্কা করে।

"সেটা তোমার আমার সাধ্য নয়। আমি অর্থনীতি বুঝি, রাজনীতি বুঝিনে। আর তুমি তো সাহিত্যিক, রাজনীতির কী বোঝ? চড়া স্টেক রেখে ব্রিজ খেলা চলেছে। ইংরেজে কংগ্রেসে।" বিজন শেষ কথা শুনিয়ে দেয়।

যূথিকা মানসকে বলে দিয়েছিল উদিতাকে জিজ্ঞাসা করতে ঝরনার খবর কী। যদি তার জানা থাকে। তা শুনে উদিতা বলে, "আমার বোন সবিতার খবর জানিনে। ঝরনার খবর জানব কী করে? তবে খারাপ খবর হলে সরকার থেকেই জানিয়ে দিত। বাড়ীতে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যেত।"

"কথায় বলে, নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। তা হলেও আত্মীয় স্বজনের বন্ধুবান্ধবের মন মানে না। কতরকম বিপত্তি আছে মানুষের জীবনে। বিশেষ করে মেয়েমানুষের জীবনে। কেন যে ওরা ওয়াকি হতে গেল। তখন কি জানত যে জাপানীদের কবলে পড়বে?" মানস উদ্বেগ প্রকাশ করে।

"আমাদের সবিতার জন্যে আমরাও কি কম ভাবছি? কিন্তু ভেবে এর কোনো কূলকিনারা নেই। যুদ্ধ যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন প্রকৃত সত্য কেউ জানতেও পাবে না, জানাতেও পারবে না। রেড ক্রসও নাচার। সেই যে একটা কথা আছে, ট্রুথ ইজ দ্য ফার্স্ট ক্যাজুয়ালটি ইন ওয়ার। সবিতাকে আমরা ভগবানের হাতে সঁপে দিয়েছি। সবাই ওকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল। ও নাছোড়বান্দা। আমার অনুমান ঝরনারও তেমনি জেদ।" উদিতা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখের জল মোছে।

পরের দিন মানস স্বপনদার ওখানে হাজিরা দেয়। উনি মহাবিরক্ত হন সে ওঁর ওখানে ওঠেনি বলে।

"ভ্যাকেশন জজ হয়ে এসেছি। বিজনের ওখানে টেনিসকোর্ট আছে, র‍্যাকেট আছে। কাজে লাগবে। তাছাড়া ওর সঙ্গে আমার আগে থেকে এনগেজমেন্ট ছিল। আমাদের সতীর্থদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে বসব ও কর্তব্য স্থির করব। ইংরেজরা যদি সত্যি সত্যি ভারত ছাড়ে আমাদের কর্তব্য কী হবে।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

"সেটা ভাববার সময় এসেছে। কংগ্রেসের চোখে তোমরাও দুশমন। কত লোককে জেলে দিয়েছ। শুনতে পাই মারধোরও করেছ। আর মুসলিম লীগ তো মুসলিম না হলে চাকরিতে রাখবে না। তবে ইংরেজ তোমাদের বিসর্জন দিয়ে যাবে না। সঙ্গে নিয়ে যাবে। যেমন বার্মা থেকে তোমাদের বেরাদরদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে।" স্বপনদা আশ্বাস দেন।

"সেটা কিন্তু আমার পছন্দ নয়। আমার সাহিত্যের কাজের ক্ষতি হবে। যাকে রাখো সেই রাখে। সাহিত্যকে যদি রাখি সাহিত্যই আমাকে রাখবে। তবু জানতে চাই অন্যেরা কী ভাবছে।" মানস উৎসুক।

বৌদি এসে যূথিকার কথা জিজ্ঞাসা করেন। ওর সঙ্গে তো তাঁর দেখাই হলো না। কবে হবে?

"সবই অনিশ্চিত। ইংরেজরা যদি বাংলাদেশ থেকে আরো পশ্চিমে যায় আমাদেরও পশ্চিমমুখো হতে হবে। পূবমুখো হবার সম্ভাবনা কম। নইলে বলতুম বদলীর সময় দেখা হবে।" মানস উত্তর দেয়।

"আমার মনে হয় জাপানীরা ভারতে আসবে না। ওরা বার্মা দখল করেই দাঁড়ি টানবে। লাইন অভ্ কমিউনিকেশনস বাড়িয়ে ওরা মুশকিলে পড়বে। না পারবে বজায় রাখতে, না পিছু হটতে। ওই বার্মা পর্যন্তই ওদের দৌড়। তবে বোমাবর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে।" স্বপনদা দরজা জানালার কাঁচ কালো করে দিয়েছেন। পেছনের বাগানে গর্তও খুঁড়েছেন। ওটা হবে তার শেলটার।

"তুমি যা বলছ সেটাই যুক্তিসঙ্গত। সীমান্ত থেকে কেউ যদি আসত তার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হতুম।" মানসের কলকাতা আসার সেটাও একটা উদ্দেশ্য।

স্বপনদা হঠাৎ প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, তোমার বন্ধু সৌম্য চৌধুরী এমন কী করেছে যে ওর মাথার দাম নাকি পাঁচ হাজার টাকা?"

মানস তা শুনে হতবাক্। সে বৌদির দিকে তাকায়। তিনি বলেন, "কে জানে কতদূর সত্য? বাবলীও তো শোনা কথা শুনিয়েছে।"

"কী ভয়ঙ্কর কথা। সৌম্যদার মতো অহিংসাবাদীর মাথার দাম এত! আমার তো বিশ্বাস হয় না। আর কোনো সৌম্য চৌধুরী হবে। বাবলী কি ঠিক জানে কোন্ সৌম্য চৌধুরী?" মানস জেরা করে।

"নোটিফিকেশনে ওর আশ্রমের নামও ছিল। শহরের নামও ছিল। অমন একজন মার্কামারা যুদ্ধবিরোধীকে ওরা সহজে রেহাই দেবে না। গান্ধীকে যদি বন্দী করতে পারে তো ওকেই বা করতে চাইবে না কেন? ধরা না দিলে ধরতে না চাইবেই বা কেন? তা বলে পাঁচ হাজার টাকা! টাকাটা খুব বেশী দেখেই সন্দেহ হচ্ছে।" স্বপনদা মুখ ফুটে বলেন না কিসের জন্যে সন্দেহ।

বিজনের ওখানে ফিরে যাবার পর মানস সোদপুরে টেলিফোন করে জানতে চায় সৌম্য চৌধুরী এখন কোথায়।

"জানি, কিন্তু বলব না।" যিনি বলেন তিনি হেরম্ব মৈত্রের মতো সত্যভাষী। "প্রিয়তম জনকেও বলা বারণ। দয়া করে ক্ষমা করবেন।"

মানস বুঝতে পারে এই সৌম্য চৌধুরী সেই সৌম্য চৌধুরী। কিন্তু কেন তার মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা। এ প্রশ্ন কাকেই বা করবে? কেই বা উত্তর দেবে? সোদপুরের দ্বিতীয় হেরম্বচন্দ্র কখনো নয়।

সেই ভদ্রলোকই বোধহয় মানসের কলকাতায় অবস্থানের খবরটা যথাস্থানে পৌঁছে দেন। মানসের নামে একটা চিরকুট আসে। "সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে রাস্তার অন্ধকারে দেখা হবে।" স্বাক্ষর নেই। কিন্তু হাতের লেখা থেকে মালুম হয় কে লিখেছে।

ব্ল্যাক আউট। রাস্তায় আলো নেই। মাথার উপরে চাঁদের আলোও না। কৃষ্ণ পক্ষ। লোক চলাচল খুবই কম। মুখ দেখে চেনা যায় না মানুষটা কে। টর্চ জ্বালাবার স্বাধীনতা নেই। রাম বলে যাকে আন্দাজ করলে সে হয়তো যদু। মোটর দুটো একটা আসা যাওয়া করছে, তাদের হেড লাইট কালিমাখা। গতি মন্থর।

বাড়ীর বাইরে ফুটপাথের উপর পায়চারি করছিল মানস। অন্ধকারে পিঠের উপর কে হাত রাখে। পেছন ফিরে মানস দেখে আলখাল্লা পরা এক বাউল কি ফকির। "কে আপনি? কী চান?" এই বলে পকেট থেকে টাকা বার করে। তার মাথায় আসে না যে ওটা ছদ্মবেশ।

"বাবুমশায়, আমরা ভিক্ষা নিইনে। গান শুনিয়ে পুরস্কার নিই। অধমের নাম ভজহরি দাস।" বলে বাউল তার একতারায় টুং টাং করে।

কণ্ঠস্বর থেকে মানস চিনতে পারে। সুধায়, "সৌম্যদা?"

"চুপ! চুপ! কেউ শুনতে পেলে ধরিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা ইনাম পাবে। তাতে আমার কাজের ক্ষতি হবে।" সৌম্য বলে।

"কিন্তু তুমি এমন কী করেছ যে তোমার মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা? তুমি তো সন্ত্রাসবাদী নও।" মানস আশ্চর্য হয়।

"অত জোরে নয়। চুপি চুপি কথা বলো। আমি সন্ত্রাসবাদী নই বলে কি একেবারে ক্লীব। ইংরেজরা বলে, ইভ্‌ন আ ওয়ার্ম টার্নস্। এমন কি একটা পোকাও ঘুরে দাঁড়ায়। আমরা কি পোকারও অধম? বাঙালীরা বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। আমরা অহিংসাবাদী বলে উলুখড়ের মতো প্রাণে মরতে চাইনে। কিংবা প্রাণ নিয়ে পালাতেও চাইনে। দুটোই খারাপ। আমরা দ্বান্দ্বিক

অহিংসোবাদী। ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব।"

"কিন্তু এই তো তুমি নিজেই পালিয়ে বেড়াচ্ছ।" মানস মন্তব্য করে।

"আগে তো সবটা শোনো। আমরা উলুখড় হব না বলে স্থির করেছি যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধতেই দেব না। ইংরেজরা যদি জাপানীদের দিকে এগিয়ে আসে তা হলেই তো সংঘর্ষ বাধবে। আমরা ওদের মাঝখানকার পথঘাট ধ্বংস করব। রেল লাইন উপড়ে ফেলব, সড়কের পুল উড়িয়ে দেব, গাছের গুঁড়ি কেটে রাস্তার উপর পাতব। যোগাযোগের উপায় রাখব না। টেলিগ্রাফের তার কাটব। মাঝখানকার অঞ্চলটা হবে নিরপেক্ষ অঞ্চল। কেউ বলতে পারবে না যে আমরা জাপানের পক্ষে বা ইংরেজের বিপক্ষে। দেশটা আমাদের, ওদের কারো নয়। ইংরেজদের কে ডাকছে দেশরক্ষা করতে? জাপানীদের কে ডাকছে দেশকে মুক্ত করতে? উলুখড়ই আপনি আপনাকে রক্ষা করবে, মুক্ত করবে। ভারত থেকে হাত সরাও। হ্যাণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া।" বাউলের মুখে ইংরেজী।

মানস হতচকিত হয়। "এই কি তোমার অহিংসা?"

"কেন? আমি কি একটিও প্রাণীর গায়ে হাত দিচ্ছি? রেল লাইন নির্জীব। নদীর পুলও নির্জীব। পরে আমরা ওসব যেমনকে তেমন করে দেব। লোকসান যা হবে তা ভারতের। ব্রিটেনের বা জাপানের নয়। নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় মস্কোর লোক শহর পুড়িয়ে দিয়েছিল। ক্ষতি যা হলো তা রাশিয়ার। ফ্রান্সের নয়। আমরাও বাধ্য হলে স্কর্চড আর্থ পলিসি অনুসরণ করব। সেটাও হিংসাত্মক নয়। কোনোরকম প্রতিরোধ না করে পলায়ন করা অহিংসা নয়। কাপুরুষতার চেয়ে হিংসাও শ্রেয়। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার দেখা যাবে যে ভারতের জনগণ উলুখড় নয়। তাদেরও পৌরুষ আছে। আমার কাজ হচ্ছে তাদের সুপথে চালিত করা। সেটা করতে গিয়ে আমি কর্তাদের বিষ নজরে পড়ি। আমার নামে পরোয়ানা ও হুলিয়া বেরোয়। এবার আমাদের পলিসি নয় কারাবরণ। তাই আমাকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। এইখান থেকেই আমি আমার সহকর্মীদের নির্দেশ দিই। তারাও আসে নির্দেশ নিতে। আপাতত আমি আসাম প্রান্তের ভার পেয়েছি। আসামে আমাদের কার্যকলাপ চলেছে। কলকাতা থেকেই সুবিধের। কলকাতাই পূর্ব ভারতের প্রাণকেন্দ্র। তবে মাঝে মাঝে সশরীরে আসামেও যেতে হবে। ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে। অসমীয়া ভাষা শিখছি। অ'মোর আপোনার দেশ! অ'মোর চিকুণি দেশ!" এই বলে বাউল গান ধরে।

"জুলিও কি এইসব করছে? সে এখন কোথায়?" মানস সুধায়।

"কলকাতাতেই। কিন্তু তার ঠিকানা প্রতি দিন বদলায়। কোথাও দ্বিরাত্রিবাস করে না। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। এদের প্রোগ্রাম আলাদা। কালেভদ্রে দেখা হয়। ওর সঙ্গিনীদের নিয়ে ও আজকাল বোরখা পরে বেড়ায়। ওরও ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম। ওর কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে পারব না। আমি নিজেও জানিনে।" সৌম্য এইবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

যূথিকা পই পই করে বলে দিয়েছিল যেমন করে হোক জুলির নিরাপত্তার খবর আনতে। সৌম্যদার উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে সে যায় জুলির মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বলে, "জুলির জন্যে যূথী উদ্বিগ্ন। আপনার মেয়ে ভালো আছে তো?"

"আমার মেয়ে? আমার মেয়ে কাকে বলছ, মানস?" তিনি অভিমানে ফেটে পড়েন। "আমার সঙ্গে ওর কতটুকু সম্পর্ক? বাড়ী আসে না, চিঠি লেখে না, টেলিফোন করে না, কারো হাতে খবর পাঠায় না। টোটাল ব্ল্যাক আউট। ও যে কাদের সঙ্গে মেশে, কোথায় থাকে, কী সব কাণ্ড করে এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে ইলিসিয়াম রো'তে গিয়ে গোয়েন্দা অফিসারের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে হয়। জুলি ভাবছে ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পাবে না। কিন্তু বাবারও বাবা আছে। গোয়েন্দা দফতর সব খবর রাখে। ওদেরও মহিলা গুপ্তচর আছে। তারাও বোরখা পরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু

জুলিকে গ্রেপ্তার করা ওদের পলিসি নয়। ওর ভগ্নীপতি স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল, জানো নিশ্চয়। পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম। ওদের কৌশল হচ্ছে জুলিকে না ধরে ওর দলের সবাইকে ধরে আটক করা। তা হলে জুলি একেবারে একলা হয়ে পড়বে। এ বাবা ব্রিটিশ সরকার। ছল, বল, কৌশল তিনটে পদ্ধতিতে দুরস্ত। তার উপর আরো এক পদ্ধতিতে ওস্তাদ। ভোজের বা নাচের নিমন্ত্রণ। লাটভবন থেকে আমার নামে চিঠি আসবে, গাড়ী আসবে, পদস্থ কর্মচারী আসবেন। স্বয়ং লাটগৃহিণী আমাকে অনুরোধ করবেন আমার অবুঝ মেয়েকে বোঝাতে যে ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্য যারা এসেছে তারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিল, যে যার নিজের পেশায় ফিরে যাবে। কেউ এদেশে থাকবে না। আর দেশীয় সৈনিকদের পদোন্নতির ঢালাও ব্যবস্থা হয়েছে, বর্ণবৈষম্য দূর হয়েছে, সুযোগ সুবিধে সকলের সমান। কেনই বা তারা ইংরেজদের বিপক্ষে যাবে? জাপান যদি না জেতে তো একূল ওকূল দু'কূল গেল। আর ইংরেজরা যদি কোনোরকম বন্দোবস্ত না করেই ভারত ছাড়ে তা হলে পরে যাঁরা সরকার গঠন করবেন তাঁরা যে এত লোককে চাকরিতে রাখবেন বা এতরকম সুযোগ সুবিধা দেবেন তার গ্যারান্টি কি কেউ দিচ্ছেন? সরকারের নিমক খেয়ে দলে দলে জওয়ান নিমকহারামী করবে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। দেশের স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করবে অতখানি স্বদেশপ্রেম ওদের নেই। ওরা রাজাকেই মানে, রাজার উপরেই ওদের আনুগত্য, রাজার নামেই শপথ। রাজার পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট ওদের সকলের আনুগত্য পাবেন না। হিন্দু হয়ে থাকলে মুসলমানের। মুসলমান হয়ে থাকলে হিন্দুর। তৃতীয়পক্ষ এখনো এদেশে দুই পক্ষের আস্থাভাজন। তোমার কী মনে হয়, মানস? জুলিকে বোঝালে বুঝবে? ও তো একটা কল্পজগতে বাস করে। ওর বিশ্বাস সব ইংরেজই শত্রু, সব জাপানীই মিত্র, সব ভারতীয়ই দেশের স্বাধীনতার জন্যে অধীর। ওর ডাকনাম বেবী। ও সত্যি একটা বেবী।'' ওর মা সস্নেহে বলেন।

''কিন্তু ওর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হচ্ছে কোথায় যে আপনি ওকে বোঝাবেন? আপনি কি ওর ঠিকানা জানেন, মাসীমা?'' মানস সুধায়।

''সীক্রেট এজেন্টরা জানে। মুসলমানী সেজে কলকাতা শহরের সর্বত্র আত্মগোপন করা যায় না। এটা হিন্দুপ্রধান শহর। মুসলিম মহল্লাগুলো চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে ওকে আবিষ্কার করা শক্ত নয়। ও পড়বেই ধরা একদিন। কিন্তু ওর দলের আর সকলের আগে নয়। ওটাই সরকারী পলিসি। হয়তো তার দরকারই হবে না। ও নিজেই হৃদয়ঙ্গম করবে যে ইংরেজকে যুদ্ধকালে নড়ানো যাবে না। বাবলী বলে ওর এক বান্ধবী আছে, সে কমিউনিস্ট। এই নিয়ে বাবলীর সঙ্গে জুলির আড়ি হয়ে গেছে। আমি তো মনে করি বাবলীর থীসিসটাই ঠিক, জুলিরটা ভুল। জুলি যেদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে সেদিন ওর এই অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হবে।'' ওর মা ততদিন ধৈর্য ধরবেন।

''আপনি আর উদ্বিগ্ন নন তো?'' মানস বাজিয়ে দেখে।

''হব না? কোথায় রাত কাটাচ্ছে, কাদের সঙ্গে মিশছে, সুস্থ আছে না অসুস্থ হয়েছে এসব ভাবনা কি আমাকে একটি মুহূর্তও ছেড়েছে? ও মেয়েটা হয়েছে আমার গেঁটে বাত। গেঁটে বাত কেমন কষ্ট দেয়, জানো তো? তবে আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত। পুলিশ ওকে ঘাঁটাবে না। পুলিশেরও তো ভয়ডর আছে। গুপ্তচরের কথায় বিশ্বাস করে যদি জুলি বলে অন্য কোনো মুসলিম মহিলাকে গ্রেপ্তার করে তা হলে সার নাজিমউদ্দীন ওদের চাকরী খাবেন। আর সার নাজিম যদি ওদের চাকবি না খান তো তাঁর নিজের দলের লোক তাঁর উজিরী খাবে। বোরখার একটা মস্ত বড়ো সুবিধে কেউ গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না। বোরখার আড়ালে ছুরি ছোরাও থাকতে পারে। জুলির হাতে রিভলভার থাকে। সে যদি গুলী করে মারে তার সাফাই হবে তাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল সেই পুরুষ, যাকে সে গুলী করেছে। জুলির ভয়ডর নেই, কোনোদিনই ছিল না। ও যে রিভলভার গায়েব করে ডিটেন হয়েছিল সে ইতিহাস নিশ্চয়ই শুনেছ। সাফাই দিয়েছিল যে রিভলভারটা আর কেউ ওর ঘরে ঢুকে লুকিয়ে রেখেছিল। ওর

দলের ছেলেরা ওর হাতে রিভলভার দিয়ে বলেছে আত্মরক্ষার জন্যে দরকার হলে পুলিশকে গুলী করতে, আর নয়তো নিজেকে গুলী করতে। ওই জিনিসটাকে আমি ভয় করি। হাজার হোক, বেবী তো। ওর কী পরিণামচিন্তা আছে? যা বলছিলুম, পুরুষ পুলিশ ওর কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। মহিলা পুলিশ কোথায় যে ওকে পাকড়াবে? বাইরে থেকে আনাতে হবে। যদি সে গুলী খেতে সাহস পায়। কিন্তু জুলিকে পাকড়াতে গিয়ে আয়েষাকে বা ফতেমাকে পাকড়ালে মুসলিম জনতার হাতে নিজেই পিটুনি খেয়ে মরবে।" মিসেস সিন্‌হা খুব একচোট হাসেন।

মানস অতটা আশাবাদী নয়। ফাঁদ পেতে গ্রেপ্তার করার ঘটনা সে তার কর্মজীবনে ঢের শুনেছে। পুলিশ তাতে সিদ্ধহস্ত। জুলি একদিন ফাঁদে পড়বেই। আর ওর মায়ের ওটা একটা দিবাস্বপ্ন যে লাটভবন থেকে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে চিঠি আসবে, নিয়ে যেতে গাড়ী আসবে, পদস্থ অফিসার আসবেন। দিবাস্বপ্ন যদি তাঁকে শান্তি দেয় তো স্বপ্নভঙ্গ করতে যাওয়া কেন? সে আশ্বাস দিয়ে বলে, "এই আন্দোলনটা জোর কদমে বেশীদিন চলবে না, চলতে পারে না। জাপানীরা না এলে তো জুলির উৎসাহ জল হয়ে যাবে। বামপন্থীরা স্বতন্ত্রভাবে লড়বার মতো শক্তিমান নয়। ওরা লড়ে যখন কংগ্রেস লড়ে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করেছে, তা সত্ত্বেও সরকারকে হটাতে পারেনি। আন্দোলনটা আবার জমতে পারে যদি জাপান সত্যি সত্যি আক্রমণ করে। কিন্তু আর কবে করবে! এর মধ্যে ইংরেজরাও তৈরি হয়েছে। ওই বার্মাবিজয়ই জাপানের দিক থেকে চূড়ান্ত। জুলি একদিন বাড়ী ফিরে আসবে, মাসিমা। সেটার খুব বেশী দেরি নেই। তবে এখানে তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চেষ্টা করবেন যাতে ওর বিচার মিলিটারি ট্রাইবিউনালে না হয়ে আমাদের কারো কোর্টে হয়।"

।। বাইশ ।।

স্বপনদা চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মানস গিয়ে দেখে সেটি রীতিমতো একটি চা চক্র। মীর সাহেব ছিলেন আর ছিলেন সুবিনয় তালুকদার, ইন্দ্রজিৎ রাহা, আদিত্য বর্মণ। মহিলারা অন্য ঘরে। এল্‌ফ এ ঘর ও ঘর করছিল। যেখানে যা পাবে সেখানে তা খাবে।

"আপনারা পাঁচজনে মিলে কিসের চক্রান্ত করছেন?" মানস মীর সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"চক্রান্ত কি কেউ জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফাঁস করে দেয়? ফাঁসী হয়ে যাবে না?" মীর সাহেবও রঙ্গ করেন।

"উকীল ব্যারিস্টাররা আছেন কী করতে? তাঁরা বাঁচিয়ে দেবেন না? নির্ভয়ে বলুন।" মানস অভয় দেয়।

স্বপনদা খেই ধরেন, "আমিই বলছিলুম, এঁরা শুনছিলেন। বিশ্বের মানচিত্রখানা তোমার সামনেই রয়েছে। একবার চোখ বুলিয়ে নাও। লিবারল বলে গৌরব করতে পারে এমন একটিও দেশ কি আছে? হয়তো সুইডেন কি সুইটজারল্যাণ্ড। এই যুদ্ধ কাউকে লিবারল হতে দিচ্ছে না। মুখে লিবারল হলে কী হবে, কাজে স্বৈরাচারী। যুদ্ধ জিততে হবে, তাই যুদ্ধের প্রয়োজনে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে হবে। তফাৎটা এই যে কর্তা অর্ধেকটা সত্য হাতে রেখে বাকী অর্ধেক প্রকাশ করেন তাঁর দেশের পার্লামেন্টের বা কংগ্রেসের কাছে। নিজের মন্ত্রীদের কাছেও যে ভেঙে বলেন তাও নয়। এদেশের ব্যাপারও তেমনি। বড়লাট যা জানেন জঙ্গীলাট ভিন্ন আর কেউ তা জানেন না। এমনও হতে পারে যে জঙ্গীলাটই জানেন, বড়লাট জানেন না। দু'জনেই হিজ এক্সেলেন্সী। একজনের হাতে সিভিল পাওয়ার, অপরজনের হাতে মিলিটারি পাওয়ার। সরাসরি লণ্ডনের সঙ্গে কারবার। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে কাজ দিয়েছে। তবে

মাঝেমাঝে খিটিমিটি বেধেছে। কিচেনার কার্জনকে মানবেন না। উপরওয়ালারা কিচেনারের পক্ষে। কার্জন পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যান। তবু তো সে যুগটা লিবারল ছিল। যুগের প্রভাব স্বৈরতন্ত্রী জার্মানীর উপরে, রাশিয়ার উপরেও পড়েছিল। কাইজারের পতনের পরে জার্মানী গণতন্ত্রী হলো বটে, কিন্তু রাশিয়া তা হলো না। আর জার্মানীও নাৎসীদের পাল্লায় পড়ে দ্বিগুণ স্বৈরতন্ত্রী বনে গেল। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এবারকার মহাযুদ্ধে গুরুতর সিদ্ধান্তগুলো একা একা নিচ্ছেন চার্চিল আর রুজভেল্ট। আর সকলে একের পিঠে শূন্য। অপোজিশন বলতে বিশেষ কিছু নেই। ব্যক্তিগতভাবে লিবারল অবশ্যই কতক লোক আছেন, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে দেশকে দেশ নির্বিচারে ও নির্বিবেকে একচ্ছত্রাধীন। আমার তো মনে হয় লিবারল যুগটাই অস্তাচলে গেছে। 'ফিরবে না, ফিরবে না সে গৌরবশশী। অস্তাচলবাসিনী উর্বশী'।" স্বপনদার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

"তা হলে আমাদের লিবারল হিউমানিজমের সার্থকতা কী? ভবিষ্যৎ কী? কাদের জন্যে আমরা ম্যানিফেস্টো রচনা করব?" মীর সাহেব সুধান।

"নাৎসীরা যদি হারে তা হলে আশা আছে বইকি। কিন্তু নাৎসীরা যদি হারে কমিউনিস্টরাও তো জিতবে। গোটা জার্মানী লাল হয়ে যাবে। তারপর গোটা ইউরোপ। সব লাল হো জায়েগা।" তালুকদার বলেন।

"সেইজন্যেই তো আমি কোনো পক্ষের হার চাইনে। নাৎসীরা ফিরে যাক জার্মানীতে। কমিউনিস্টরা তাদের নিজেদের এলাকার বাইরে গিয়ে বিপ্লব না ঘটাক।" স্বপনদা ফতোয়া দেন।

"সেটা যদি সম্ভব হতো এ যুদ্ধ আদৌ বাধত না। মূল কারণটা এই যে উভয় পক্ষই সম্প্রসারণ চায়। তার জন্যে একপক্ষ যাবে পূব মুখে, অপরপক্ষ পশ্চিম মুখে। সংঘর্ষ অনিবার্য। নাৎসীরা যদি পূর্ব থেকে হটে গিয়ে পশ্চিমে চড়াও হয় আর ফ্রান্সের কাছ থেকে আলসাস লোরেন কেড়ে নেয় তা হলেও সংঘাত অনিবার্য। সম্প্রসারণই ওদের ধর্ম। বৃহত্তর জার্মানীই ওদের স্বপ্ন। ওদের হারিয়ে না দিলে ওদের প্রতিবেশীরা সবাই একে একে হারবে। সেইজন্যে চার্চিলে স্টালিনে কোলাকুলি হচ্ছে। যেটা ছিল কল্পনার অতীত। এটা কিন্তু ক্যাপিটালিস্টের সঙ্গে কমিউনিস্টের কোলাকুলি নয়। থীসিস আর অ্যান্টিথীসিস মিলে সীন্থেসিস নয়। তার অনেক দেরি।" রাহা স্মরণ করিয়ে দেন।

স্বপনদা স্বীকার করেন যে এটা প্রেমের আলিঙ্গন নয়। তা বলে এ কী প্রলয় কাণ্ড চলেছে স্টালিনগ্রাডে। মানুষ মরছে লাখে লাখে। অত বড়ো যুদ্ধ কী আর কোথাও কখনো হয়েছে? কুরুক্ষেত্র তো ঐতিহাসিক নয়।

"আমি কিন্তু মনে করি কুরুক্ষেত্র নিছক পৌরাণিক নয়। কুরু পাঞ্চালের যুদ্ধই কুরু পাণ্ডবের বলে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলেও পুরোপুরি কবিকল্পনা নয়। মহাভারতের চরিত্রগুলি আশ্চর্য রকম বাস্তবানুগ। কেউ আদর্শ পুরুষ বা আদর্শ রমণী নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নন। পরবর্তীকালের ভক্তিবাদীরা তাঁকে অবতারে পরিণত করেছেন। শুধু অবতার নন, তিনিই ভগবান। আমাদের কাজ হবে মহাভারতের একটা যুক্তিবাদী সংস্করণ বার করা। রামায়ণেরও। রামায়ণের যুদ্ধ আর্য সম্প্রসারণবাদীদের সঙ্গে দ্রাবিড় প্রতিপক্ষের আত্মরক্ষার যুদ্ধ। বাকীটা কবিকল্পনা। কবিরাও চারণকবি। চারণদের মুখে মুখে পল্লবিত হতে হতে যে আকার ধারণ করে সেটাকেই মহাকাব্যের রূপ দেন বাল্মীকি ও তাঁর যারা উত্তরসূরী। ততদিনে মূল ঘটনার পর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। রামও একজন অবতার হয়ে গেছেন। তার থেকে স্বয়ং ভগবান। ভক্তিবাদ মহাকাব্যকে পরিণত করেছে ধর্মগ্রন্থে। একমাত্র ভারতবর্ষেই এটা সম্ভব।" আদিত্য বর্মণের মতে।

বর্মণের এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে বলতে হয় রামচন্দ্রও ছিলেন আর্য সম্প্রসারণবাদের অধিনায়ক। সেকালের নাৎসীদের হিটলার। বিভীষণ ছিলেন সেকালের কুইসলিং। মুসোলিনিকে সেকালের সুগ্রীব

বললে কি ভুল হবে? এখন প্রশ্ন হচ্ছে হনুমানটি কে।'' রঙ্গ করেন স্বপনদা।

''যাঁরা প্যারিস ছেড়ে দিয়ে নাৎসীদের অভ্যর্থনা করলেন তাঁদেরই একজন। আমার মতে মার্শল পেঁত্যা। প্রধান মন্ত্রী হয়ে তিনিই যুদ্ধবিরতির অগ্রণী হন। তার পর দক্ষিণে চলে যান। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ফ্রান্সের ইনটেলেকচুয়ালরা ক্ষমা করেননি। ওদেশের রেজিস্টান্সের খবর নানা দেশ ঘুরে কানে আসছে।'' রাহা প্রবেশ করেন।

স্বপনদা আহত হয়ে বলেন, ''তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকতা এক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বার্থে নয়। জাতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে। মাজিনো লাইনের উপরে অন্ধ নির্ভরতার দরুন দেশরক্ষার জন্যে ফরাসীরা বিকল্প ব্যবস্থা করেনি। পরাজয় আসন্ন। বাধা দিলে প্যারিস ধ্বংস হতো। একটা অপ্রিয় সিদ্ধান্তের আবশ্যকতা ছিল। ভার্দুনের ত্রাণকর্তা ভিন্ন আর কে পারতেন সে সিদ্ধান্ত নিতে? তাই সিদ্ধান্তটা মার্শল পেঁত্যার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি কলঙ্ক মাথায় নিয়ে জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেন। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। আধখানা ফ্রান্স জার্মানদের দখলে আসে। প্যারিস তার মধ্যে পড়ে। প্যারিসের কাছে ঠিক সেই জায়গাটিতেই সেই রেলগাড়ীর কামরায় আবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় যেখানে হয়েছিল গত মহাযুদ্ধের শেষে। সেবার নতিস্বীকার করেছিল জার্মানী। এবার সেটা করল ফ্রান্স। স্বয়ং হিটলার উপস্থিত থেকে মনের জ্বালা মেটালেন। নিয়তি! নিয়তি ছাড়া আর কী বলব একে? অকারণ রক্তক্ষয়ে কী লাভ হতো ফ্রান্সের?''

''কিন্তু ব্যাপারটা সেবারকার মতো শেষ হয়ে গেল না, স্বপনদা।'' মানস কণ্ঠক্ষেপ করে। ''নাৎসীরা সহযোগিতা দাবী করবে, পাবেও। ফ্রান্সের একাংশ এখন শিবির বদল করেছে। সেটা তার মিত্রদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। দ্য গল ব্রিটেনে গিয়ে নতুন এক সৈন্যদল গঠন করে মিত্রপক্ষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রমাণ করেছেন যে ফরাসীদের প্রতিরোধের আগুন অনির্বাণ। তা ছাড়া ইনটেলেকচুয়ালরাও তো অসি ধরেছেন। সেইভাবে দেশের মান রক্ষা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস জানতে চাইবে নেপোলিয়নের আক্রমণের মুখে মস্কোর জনগণ যেমন নগরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ফরাসী আক্রমণকারীদের জয়ের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেছিল হিটলারের আক্রমণের মুখে প্যারিসের জনগণও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল না কেন। তা না করে তারা শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করছে কেন। পঞ্চাশ বছর বাদে কেউ কি ফরাসী ভাষায় এই মহাযুদ্ধ নিয়ে আরেকখানা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' লিখবেন? গর্ব করার মতো কী আছে একালের ফরাসীদের? ফরাসী বিপ্লব আর নেপোলিয়ন নিয়ে আর কতকাল গৌরব বোধ করা চলবে? এপিক উপন্যাসের উপাদানটা কোথায়? জনগণ যোগ না দিলে এপিক উপন্যাস হয় না। ইনটেলেকচুয়ালরা তো জনগণ নন। সবটা দোষ পেঁত্যার ঘাড়ে চাপানো যায় না। যথা প্রজা তথা রাজা। একথা জার্মানদের বেলাও খাটে। জার্মানীর জনগণও হিটলারের অপকর্মের জন্যে দায়ী। জার্মান সাহিত্যের এটা একটা কুৎসিত অধ্যায়।''

স্বপনদার মুখখানা দেখে মীর সাহেবের মায়া হয়। ''ও প্রসঙ্গ থাক। আমরা আজ মিলিত হয়েছি লিবারল হিউমানিজমের ভবিষ্যৎ ভাবতে। লিবারল বিশেষণটা আজকের জগতে অর্থহীন। এখন বিচার করা যাক হিউমানিজম বিশেষ্যটা কতদূর অর্থবহ। আমি তো দেখছি ইংলিশম্যানরা ম্যান নয়, ইংলিশম্যান। জার্মানরা ম্যান নয়, জারম্যান। মুসলমানরা ম্যান নয়, মুসলম্যান। ব্রাহ্মণরা ম্যান নয়, ব্রাহ্ম্যান। যে যার বৈশিষ্ট্য নিয়েই গর্বিত, সাধারণ মনুষ্যত্ব নিয়ে নয়। কবিগুরু যেমন বলেছেন, রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি। এই উক্তি কি ওদের বেলাও খাটে না? এই মহাযুদ্ধে যেসব ভয়ানক মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে ও পরে ব্যবহারের জন্যে তৈরি হচ্ছে সেসব কি হিউমান না ইনহিউমান? এ বলে, আমায় দ্যাখ। ও বলে আমায় দ্যাখ। নির্বিচারে আবাল বৃদ্ধ বনিতার উপর বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে। সেটা এই শতাব্দীর পূর্বে কখনো ঘটেনি। এরা রাক্ষসেরও অধম।''

খাবারের প্লেট মীর সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্বপনদা বলেন, "হিউম্যানিজম মানুষকে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হবার প্রেরণা দিতে পারে, কিন্তু মানুষ যদি সেই শক্তি ও সেই জ্ঞান সর্বনাশের কাজে লাগায় তা হলে তার প্রতিরোধ বা প্রতিকার হিউমানিস্টরা জানেন না। শুনছি আইনস্টাইন নাকি রুজভেল্টকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে পরমাণুর বিভাজন এখন সম্ভব। ফলে পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করা যায়। তার মানে কী দাঁড়ায়? নাৎসীদের বিনাশ করতে গিয়ে জার্মান জাতিকেও সাবাড় করা হবে। নাৎসীরা যদি মরণ কামড় দিয়ে ইহুদী জাতিকেও উজাড় করে এর শোধ নেয় তবে ওদের রক্ষা করার কী উপায়।"

মীর সাহেব চার দিকে চেয়ে দেখেন খাবারের প্লেট সকলের হাতে দেওয়া হয়েছে কি না। হয়েছে দেখে আশ্বস্ত হন। বলেন, "মানুষের যদি ধর্মবুদ্ধি না থাকে, সে যদি খ্রীস্টের প্রেমের দৃষ্টান্ত ভুলে যায় তবে সর্বশক্তিমান হয়ে সে শক্তির অপব্যবহার করবে। সর্বজ্ঞ হয়ে করবে জ্ঞানের অপব্যবহার। অপব্যবহার যে করে সে তার নিজেরই অহিত করে। জগতের অন্তর্নিহিত নৈতিক বিধান তার শক্তি খর্ব করে, তার জ্ঞান তাকে বাঁচাতে পারে না। হিউমানিজম মানুষের হৃদয়কে প্রেমে ভরে দেয়নি। করুণায় বিগলিত করেনি। তবে চার্চের নিগড় থেকে মুক্তি দিয়েছে। সাহিত্যে ও শিল্পে নব জাগরণ এনেছে। মানুষকে নতুন করে অনুসন্ধান করতে, চিন্তা করতে শিখিয়েছে। কিন্তু মন্ত্রশক্তির বদলে যন্ত্রশক্তিকে মহামূল্য ভাবতে প্রবৃত্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে তন্ত্রশক্তি। গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি হরেক রকম তন্ত্র। মানুষ তান্ত্রিক বনে গেছে। তান্ত্রিকরা কোনো কালেই নিঃস্বার্থ ছিল না। ব্যক্তির পক্ষে স্বার্থপরতা যেমন জাতির পক্ষে স্বার্থপরতাও তেমনি।"

মানস জিজ্ঞাসা করে, "আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয় যে আপনি লিবারলও নন, হিউমানিস্টও নন, আপনি আর কিছু। সেই আর কিছুটা কী, মীর সাহেব? মানবোত্তর স্তরে উপনীত হতে চান? একা নয়, সবাইকে নিয়ে? আমরাও আপনার মতো এক একজন অতিমানব হব।"

"আরে না, না।" মীর সাহেব হেসে বলেন, "আমার বক্তব্য শুধু এই যে আধুনিক যুগের হিউমানিজম মধ্যযুগের খ্রীস্টধর্ম বা ইসলামের চেয়ে কম রণোন্মাদ বা কম মানববিদ্বেষী নয়। এই দুই মহাযুদ্ধকে যদি একই মহাযুদ্ধের দুই অঙ্ক বলে ধরে নেওয়া যায় তবে এটাও একটা ক্রুসেড। এবার খ্রীস্টান বনাম মুসলমান নয়, জার্মান বনাম ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়ান, আমেরিকান। এটাও একটা থার্টি ইয়ার্স ওয়ার। এবার ক্যাথলিক বনাম প্রটেস্টান্ট নয়, ফাসিস্ট বনাম অ্যান্টিফাসিস্ট। হিউমানিস্ট তো এরা সবাই। খ্রীস্টান কি কেউ আছে? ইউরোপের ধর্মের যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। গির্জাগুলো খালি। কিন্তু হিউমানিজমের যুগও তো সারা হয়ে আসছে। মহাযুদ্ধের তৃতীয় অঙ্কে হিউমানিজমেরও যবনিকা পতন। অতিমানব। আমার সে যোগ্যতা নেই। এ জীবনে হবেও না। সত্যিকার মানব হতে চাই। মানবরূপী দানব নয়। মনে হচ্ছে মানব হবে মানবাসুর। আরেক জাতির ডাইনোসর। তারই মতো নির্বংশ হবে। পরস্পরের সঙ্গে লড়তে লড়তে।"

"নাৎসীদেরও কি আপনি হিউমানিস্ট বলবেন?" মানস বিস্মিত হয়।

"দর্শনে বিজ্ঞানে জার্মানদের স্থান সকলের উপরে। সঙ্গীতে ওরা অদ্বিতীয়। তা হলে ওরা হিউমানিস্ট নয় কেন?" মীর সাহেব সুধান।

"সেকথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু জার্মান হলেই কি ফাসিস্ট হয়? নাৎসীরা ক্ষমতা দখল না করলে যারা হিউমানিস্ট বলে গণ্য হতেন তাঁরা যদি পালাবাব পথ না পেয়ে যদি আপস করে থাকেন তবে কি বলতে হবে যে তাঁরাও ফাসিস্ট! ফাসিস্ট বলে পরিচয় দিলেও তলে তলে তাঁরা হিউমানিস্ট। রোমান ক্যাথলিক চার্চের কাছে নতি স্বীকার করেও যেমন ছিলেন গালিলেও। সবাই কি ব্রুনো হবার সাহস রাখেন? আগুনে পুড়ে মবাব সাহস। ইনকুইজিশনের যুগ আবার ফিরে এসেছে।" মানস বিষণ্ণ

কণ্ঠে বলে।

"নাৎসীদের হুকুমে যাঁরা নাৎসীদের মতো আচরণ করছেন তাঁরা একদা হিউমানিস্ট বলে গণ্য হলেও এখন স্বধর্মভ্রষ্ট মানবাসুর। আসুরিক উপায়ে শত্রু ধ্বংশ করার নিত্য নতুন কলকৌশল বার করে হিটলারকে উপহার দিচ্ছেন। ওদিকে রুশ হিউমানিস্টরাও স্বধর্ম ভ্রষ্ট হয়ে তাই করছেন। অন্যত্রও তাই দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্র হয়তো প্রাণে মরবে না, ভাতে মরবে। মল্লিক সাহেব, এটাও এক প্রকার ইনকুইজিশন। ব্রুনো হবার সাহস ক'জনের আছে? গালিলেও হবেন প্রায় সকলেই। এবার চার্চের হুকুমে নয়, স্টেটের হুকুমে। কে ভেবেছিল যে স্টেটও সমান নির্মম হবে?" মীর সাহেব খেদোক্তি করেন।

"ওটা শুধু যুদ্ধকালে।" তালুকদার বলেন।

"যুদ্ধ পাঁচবছর চলবে বলে কি মানুষ খাওয়া দাওয়া বন্ধ করতে রাজী হবে? মরে যাবে না?" মীর সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দেন। "মুসলমান তার নামাজ বন্ধ রাখবে? হিন্দু তার দোল দুর্গোৎসব বন্ধ রাখবে? হিউমানিজম যাদের কাছে ধর্মের মতো ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল তাঁরাও তেমনি তাঁদের সৃষ্টিকর্ম, গবেষণাকর্ম, দার্শনিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা বন্ধ রাখতে পারেন না। সেসব লিপিবদ্ধ করতে হবে, প্রকাশ করতে হবে। যাতে আর সকলে আলোচনা করতে পারে, সমালোচনা করতে পারে। মানবদেহের রক্ত চলাচলের মতো মানবমনেরও ভাব বিনিময় চাই। নইলে মন কখনো সুস্থ থাকতে পারে না। মানুষ মানসিক অসুখে ভোগে। এই যে আমরা অবাধে আলাপ আলোচনা করতে পারছি এটা সোভিয়েট রাশিয়া হলে অসম্ভব হতো। নাৎসী জার্মানী হলেও অসম্ভব হতো। অন্যান্য দেশেও ক্রমে অসম্ভব হবে, যদি যুদ্ধের ফলাফল দেশের বিপক্ষে যায়। লেখনীর মুখ তো আমাদের দেশেও বন্ধ হয়ে গেছেই। কথা বলার মুখও বন্ধ হবে, যদি না সত্য গোপন করি বা অসত্য প্রচার করি। মানবিকবাদ যাঁদের কাছে ধর্মের মতো জীবন্ত তাঁরা যুদ্ধকালেও জীবন্ত হতে সাহস পাবেন না। তার চেয়ে বলা ভালো আমি ধর্মের জন্যে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু মানবিকবাদের জন্যে প্রাণ দিতে ডরাই। আপনারাও ভেবে দেখবেন, হিউমানিজম কি আপনাদের কাছে ভাইটাল? ধার্মিক যিনি তিনি বলেন, আমি সারা দুনিয়া পেলেও কী করব, যদি নিজের আত্মাকেই হারিয়ে ফেলি? মানবিকবাদী যিনি তিনিও কি তাই বলতে পারেন? যদি না পারেন তো অমন কোনো মতবাদের দায় মাথায় না নিয়ে যেটুকু স্বাধীনতা পাচ্ছি তার সদ্‌ব্যবহার করাই শ্রেয়।"

"অর্থাৎ চাচা, আপনা বাঁচা!" আদিত্য বর্মণ বিদ্রূপ করেন।

সবাই হেসে ওঠেন। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করেন না।

মীর সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, "আমরা প্রত্যেকেই মনে প্রাণে যা বিশ্বাস করি সেটাকে যত হাস্যকর ভাবছেন তত হাস্যকর নয়। আপনাদের বরাত ভালো যে এই গভর্নমেণ্ট এদেশের কন্‌স্‌ক্রিপশন জারি করছে না। সত্যাগ্রহের ভয়ে করবেও না। নইলে আপনাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যেত ও যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিত। তখন আপনারা কোন্ ইষ্টমন্ত্র জপ করতেন? চাচা, আপনা বাঁচা?"

এবার কারো মুখে হাসি ফোটে না। রাহা আমতা আমতা করে বলেন, "মীর সাহেব, আমরা কি তবে কন্‌স্‌ক্রিপশনের জন্যে প্রস্তুত থাকব, যদি পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়?"

"আমি তো প্রথম বোমাবর্ষণের দিন মোটা অঙ্কের লাইফ ইনশিওরান্স করে রেখেছি। লাইফ ইনশিওরান্স বলে বটে, আসলে কিন্তু ওয়াইফ ইনশিওরান্স। তাঁকে তো সান্ত্বনা দেবার কিছু থাকবে না, যদি পটল তুলি। ওই মোটা অঙ্কটাই সান্ত্বনা। যুদ্ধে যদি মরতেই হয় তবে ঘরে বসে বোমা খেয়ে মরা যা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে গোলা খেয়ে মরাও তাই। তবে আমাকে ধরে নিয়ে না গেলে আমি যাচ্ছিনে। যেতুম, যদি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হতো। বলা যায় না দু'মাস পরে কী ঘটবে। জাপানীরা যদি গোটা দুই প্রদেশ কেড়ে নেয় ইংরেজকে বাধ্য হয়ে কন্‌স্‌ক্রিপশন জারি করতে হবে। সেটা তারা করিয়ে নেবে কংগ্রেসকে

দিয়ে। মৌলানা আজাদ তো প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন যে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট হলে ও সামরিক ক্ষমতা হাতে পেলে তিনি কন্‌স্‌ক্রিপশন করবেন। তা যদি হয় তবে আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকাই সুবুদ্ধি। কংগ্রেস যদি গদীতে বসে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আপনি থেমে যাবে। আর জিন্না সাহেবের পাকিস্তানও জাপান অধিকৃত বাংলার মাঠে মারা যাবে।" মীর সাহেব জবাব দেন।

"জাপানীরা বাংলা কেড়ে নেবে এটা যে আমি ভাবতেই পারিনে, মীর সাহেব। এটা কি সম্ভবপর?" বর্মণ প্রশ্ন করেন।

"পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরাও ভাবতে পারতেন না যে ইংরেজ বাংলা, বিহার, ওড়িশা কেড়ে নেবে। যাঁরা অপ্রস্তুত তাঁরা ইতিহাসের কাছেও অপ্রস্তুত হন। ওঁরা বাস করতেন মূর্খের স্বর্গে। ওঁদের ধারণা ছিল দিল্লীর বাদশা থাকতে ভাবনা কিসের? তিনিই রক্ষা করবেন। মালুম ছিল না যে বাদশাহী ফৌজও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেকালের মতো একালের বাদশাহী ফৌজও দুর্বল হয়ে পড়ে। নইলে সিঙ্গাপুর, মালয়, বার্মা রাখতে পারে না কেন? জাপানীরা একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। পরে একদিন বিপুল বেগে আক্রমণ করবে। ও তোমার পাঞ্জাবী সেনার কর্ম নয়। ওদের জারিজুরি ধরা পড়ে গেছে। আর ইংরেজ তো এখন ঘরমুখো। তার মন পড়ে আছে নিজের দেশে। যে দেশ এখনো বিপদমুক্ত হয়নি। যে কোনো দিন আক্রান্ত হতে পারে। বাঙালীকে বাঙালী না বাঁচালে কে বাঁচাবে?" মীর সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করেন।

"ওটা লাখ কথার এক কথা।" স্বপনদা উত্তর দেন। "কিন্তু বাঙালী যে পরিমাণে ধর্মসচেতন সে পরিমাণে জাতিসচেতন নয়। জাতি বলতে সে বোঝে ধর্মভিত্তিক জাতি। হিন্দু বা মুসলিম। দ্বিজাতিতত্ত্ব তার মজ্জাগত। তারা যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এটা কোনো পক্ষই অন্তর থেকে মানে না। সুতরাং আমাদের প্রথম কাজ হবে দু'পক্ষকেই হিউমানিস্ট করা আর ধর্মের মোহ থেকে মুক্ত করা।"

"গুপ্ত সাহেব, আপনি চান প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সীন্থেসিস। সে সাধনায় আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে নিযুক্ত রয়েছেন। হিউমানিজমকে আপনি অত্যাবশ্যক মনে করেন। কিন্তু একালের হিউমানিস্টদের একভাগ ডিভাইনকে অগ্রাহ্য করেছেন। যেন হিউমান আর ডিভাইন পরস্পরবিরোধী। হিউমানকে তাঁরা জন্মমৃত্যুর গণ্ডীর ভিতর পুরে তার অমরত্ব অস্বীকার করেছেন। এতটুকু সময়ের মধ্যে একজন মানুষ কীই বা জানতে পারে, বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে, দিয়ে যেতে পারে, রেখে যেতে পারে! তা হলে ব্যক্তিকে ছেড়ে বংশপরম্পরার কথা ভাবতে হয়। আমরা যা পারলুম না আমাদের বংশধররা তা পারবে। একালে যা সম্ভব হলো না ভাবীকালে তা সম্ভব হবে। এযুগে যার উপর অবিচার হলো আগামী যুগে তার উপর সুবিচার হবে। কিন্তু ভাবীকাল বা ভাবী যুগের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নেও পরিণত হতে পারে। যেমন হয়েছে জার্মানীতে ও ইটালীতে। হিউমানিস্টদের আরেকদল ডিভাইনকে বাদ দেননি। অমরত্বে বিশ্বাস হারাননি। দুই ভাগের মধ্যে মতভেদ তীব্র ও গভীর। এই দ্বন্দ্ব ভারতেও এসে উপস্থিত হয়েছে বা হবে। আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ি কেন? আমিও একটা সাধনায় নিযুক্ত রয়েছি। সেটা হিন্দু মুসলমানের সীন্থেসিস। ভারতবর্ষকে এর জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে। বেছে নিয়েছে বিশ্বের ইতিহাস। মুসলিম বিজেতারা এককালে ভেবেছিলেন তাঁরা ইরানের মতো ভারতবর্ষকেও পুরোপুরি ইসলামের দেশ বানাবেন। তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদেরি একভাগ হিন্দুদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন, তাদের আদর অভ্যর্থনা করেন। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করিয়ে নেন। দারা শিকোহ্ করেন উপনিষদের অনুবাদ। আকবর তাঁর রাজপুত পত্নীর মহলে হিন্দু দেবদেবীর পূজা আর্চার আয়োজন করেন। হিন্দু রাজন্যদের অন্তঃপুরে মুসলিম খোজারাই হন রানীদের রক্ষক। হিন্দু আচার ব্যবহার মুসলিম পরিবারে ঢোকে। মুসলিম পোশাক আসাক হিন্দুদের গায়ে ওঠে। নানক কবীর আরো গভীরে গিয়ে সীন্থেসিসের সূত্রপাত করেন। নানক তো মক্কায় গেছলেন বলে শোনা যায়। গ্রন্থসাহেবের কতক অংশ ইসলাম থেকে

নেওয়া হয়েছে। আওরংজেবের রাজত্বে একটা সেট-ব্যাক হয়। ফলে সীন্থেসিস ব্যাহত হয়। সীন্থেসিস কার সঙ্গে কার হয়? থীসিসের সঙ্গে অ্যান্টিথীসিসের। দেখা গেল শিবাজী হয়েছেন থীসিস, আওরংজেব তাঁর অ্যান্টিথীসিস। মরাঠা মোগলের দ্বন্দ্বে ভারতের স্বাধীনতা নিহত হয়। উড়ে এসে জুড়ে বসে ইংরেজ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলমানে একটা আঁতাত হয়। সেটা গভীরতর স্তরে নয়। শিবাজী-আওরংজেবের স্পিরিট এখনো প্রবল। গান্ধীজী তাঁর মুসলিম সহকর্মীদের নিয়ে দেশকে আবার স্বাধীন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁর একদিকে শিবাজী, আরেকদিকে আওরংজেব। ইংরেজ ভারত ছাড়লে সিভিল ওয়ার। কেউ কাউকে হারাতে সেকালেও পারেননি, একালেও পারবেন না। নীট ফল দেশভাগ। আমি কিন্তু যতদিন বাঁচি সীন্থেসিসের সাধনা করে যাব। আমি দারা শিকোহ্‌র অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপন করছি। সমাপ্ত করে যেতে পারব না, জানি। তবে লোকে একদিন এর প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করবে।" মীর সাহেব আশাবাদী।

মানস বলে, "আমিও আমার সাধ্যমতো আপনার সহায়তা করব। তবে আমার প্রবণতাটা প্রাচ্য পাশ্চাত্য সীন্থেসিসের দিকে। এটা রাজনীতির চেয়ে গভীরতর স্তরের ব্যাপার। স্বপনদার সঙ্গে আমিও আছি। এটাও ভারতবর্ষের ইতিহাসবিধাতার নির্বন্ধ। ইংরেজ চলে গেলেও এর প্রয়োজন থাকবে।"

"প্রাচ্য পাশ্চাত্য সীন্থেসিস এখন অথই জলে।" তালুকদার মন্তব্য করেন। "দেশের অধিকাংশ লোক এখন ইংরেজবিরোধী, সেইজন্যে আমেরিকাবিরোধী তথা পাশ্চাত্যবিরোধী। ইংরেজ যদি সত্যি সত্যি চলে যায় আবার সতীদাহ ফিরে আসবে। হিন্দুরা ফিরে যাবে গুপ্ত সম্রাটদের যুগে আর মুসলমানরা খলিফাদের যুগে। রেনেসাঁস মিলিয়ে যাবে হাওয়ার সঙ্গে। রিভাইভালিজম হবে হিউমানিজমের যম। বেঁচে থাকলে হতাশ হব আমরা। মীর সাহেব একটা লস্ট কাজ নিয়ে লড়ছেন। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক দিন দিন তিক্ততর হচ্ছে। সীন্থেসিসের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ভারতবর্ষ গ্রীকদের হজম করেছে, শক হুন কুশানদের হজম করেছে, কিন্তু মোগল পাঠানদের হজম করেনি। উল্টে ওরাই হিন্দু সমাজের একাংশকে হজম করেছে। পারলে পূর্ণ গ্রাস করত। হিন্দুরা এতকাল ডিফেন্সিভে ছিল। এখন অফেন্সিভ নিচ্ছে। ওদের নিবৃত্ত করতে গেলে মার খেতে হবে। আমরা কেউ সে ঝুঁকি নিতে রাজী হব না। অন্তত আমি তো নয়ই।"

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের উপর যবনিকা পড়ে যখন মহিলারা প্রবেশ করেন। তখন মীর সাহেব বিদায় নেন। তাঁর কাজ আছে। মানসও কিছুক্ষণ পরে বর্ধনের ওখানে ডিনার বলে মাফ চায়।

মানস ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই পাকড়াশী ওকে পাকড়ায়। "এই যে, স্বামী মানসানন্দ। তোমার কেন অমন দুর্মতি হলো? কেউটে সাপের গর্তে হাত দিতে গেলে? জানতে না সুলতান খান্ কেমন লোক? মেদিনীপুরের রাজদ্রোহীদের জব্দ করার জন্যে সাইক্লোন রিলিফ বন্ধ রেখেছেন। যাক না ওরা ওদের জাতীয় সরকারের দরবারে। দেখা যাবে কার সাধ্য দেয়।"

বর্ধন জানতে চান কী ব্যাপার। মানস বলে, "সমুদ্রের জল এসে দশ মাইল কি বিশ মাইল দূরের গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গ্রামের লোক নিরাশ্রয়। একজন ডাক্তারি ছাত্রের অনুরোধে যূথিকা একটি মেডিকাল রিলিফ টীম পাঠিয়েছে। আমি সুলতানকে একখানা চিঠি লিখে অনুমতি দিতে বলেছি। পর পর আরো কয়েকটি টীম যাবে। ওষুধ পথ্য নিয়ে।"

"তুমি নও, তোমার মাতাজী?" পাকড়াশী হাসে। "তিনি কি জানতেন না যে ওদের কর্তব্য রিলিফের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের পায়ে ধরে সাধা? দেখছেন না কি বে অভ্ বেঙ্গল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের মিত্রপক্ষে। নইলে এমন সময় সাইক্লোন হবে কেন? সমুদ্রের জল এসে রাজদ্রোহীদের ঘরবাড়ী গোরুবাছুর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কেন? ক্ষেতখামার ডুবিয়ে দিয়ে যাবে কেন? যেমন কর্ম তেমন ফল। মাতাজীকে সতর্ক করে দিয়ো। নইলে নোয়াখালী।"

নোয়াখালী বদলীকে সবাই ডরায়। ইংরেজরাও। গত শতাব্দীতে ইংরেজ সিভিলিয়ান পেনেলকে মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে নোয়াখালীর জেলা জজ করে পাঠানো হয়েছিল। পেনেল তার প্রতিশোধ নেন ইংরেজ পুলিশ সাহেবকে পরোয়ানা দিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে, তার রায়ে মুসলিম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া সমালোচনা করে আর বেঙ্গল গভর্নমেণ্টকে এক হাত নিয়ে। জজ তাঁর রায়ে কী লিখবেন তা নিয়ে শাস্তিবিধানের কোনো রাস্তা নেই। বরখাস্ত করা যায় না। বদলী করলে কোথায়ই বা করা হবে? রায়টা কাগজে কাগজে ছাপা হয়ে যায়। সরকার ফাঁপরে পড়েন। ছুটি না চাইলে ছুটি নিতে বাধ্য করাও যায় না। শেষে গেলেন তিনি বিলেত। নির্বাচন জিতে হলেন পার্লামেন্টের মেম্বর। সরকারের শ্রাদ্ধ করলেন।"

।। তেইশ ।।

মানসের টেনিস খেলার সাথী এক প্রতিবেশী কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাবার সময় তাঁর রেডিওটা মানসের কাছে রেখে যান। ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে সে একদিন হঠাৎ শুনতে পায়, "আমি সুভাষ, বার্লিন থেকে বলছি।"

শুনে চমকে ওঠে। বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আরেকটু শোনার পর বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। "আমি ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে যেমন করে চলে এসেছি তেমনি করেই একদিন ফিরে যাব।"

"জুঁই! জুঁই! শীগগির! শীগগির!" কিন্তু মানসের ডাক শুনে জুঁই ছুটে আসার আগেই কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে যায়।

"সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর কেউ নয়। তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ। কৌতুকমিশ্রিত। একটা বেপরোয়া ফুর্তির ভাব। যেন জীবনমরণ পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" মানস আবেগের সঙ্গে বলে।

"তারুণ্যের প্রতিমূর্তি!" হতচকিত ভাবটা কেটে গেলে যূথিকা বলে।

"মূর্তিমান বিদ্রোহ! কিন্তু কথা হচ্ছে উনি এ দেশ থেকে পালাবার পথ পেলেন কী করে? আমি তো ভেবে পাইনে কোন্ পথে আর কোন্ যানে। পালিয়ে যদি বা গেলেন ফিরে আসবেন কোন্ পথে আর কোন্ যানে? কোনো গতিকে বার্মায় যদি পৌঁছতে পারেন তা হলে অবশ্য সাম্পানে করে আকিয়াব থেকে চট্টগ্রামে আসা যায়।" মানস স্বীকার করে।

"আলনস্করের স্বপ্ন।" যূথিকা হেসে উড়িয়ে দেয়। "ওঁকে না চেনে এমন লোক ভারতে নেই। কেউ না কেউ চিনতে পেরে ধরিয়ে দেবে। তখন সর্বনাশ। মিলিটারি ট্রাইবিউনাল। বিচারের প্রহসন। ফায়ারিং স্কোয়াড। চিতাভস্ম ওঁর আত্মীয়দের হাতে সমর্পণ। খবরের কাগজে ঘুণাক্ষরেও বেরোবে না। তা সত্ত্বেও যদি জানাজানি হয়ে যায় নিষ্ফল আন্দোলন। বড়ো জোর আর কিছু ভাঙচুর হবে। আবো কিছু আগুন লাগানো। তাতে কি মানুষটাকে ফিরে পাওয়া যাবে? সুভাষচন্দ্র যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন। এখন আমার এই বার্তা আমি তাঁর কাছে পাঠাই কেমন করে?" যূথিকা প্রশ্ন করে।

"কোনো উপায় নেই। কেউ তাঁর ঠিকানা জানে না। সে ঝুঁকি তিনি নেবেন কেন? তা নয়। তিনি বোধহয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সদলবলে আসবেন। দু'পক্ষেই গুলী চলবে। আর একটা পলাশীর যুদ্ধ। এবার ক্লাইভের হার। সিরাজের জিৎ। সিরাজের পদেই সুভাষ। দেশশুদ্ধ ভেঙে পড়বে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। ইংরেজই পালাবার পথ পাবে না। কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি ভাবছ এটা আমার কবিকল্পনা। আমি তো মনে করি সুভাষচন্দ্রের জন্ম পলাশীর কলঙ্ক মোচন করতে। ওই যে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ ওটা সেইদিকেই প্রথম পদক্ষেপ। দেখবে মুসলমানরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে যাবে কাতারে কাতারে। পাকিস্তানের আকাশকুসুম আকাশে মিলিয়ে যাবে।" মানস স্বপ্ন দেখে।

"তুমিই একালের আলনস্কর!" যূথিকা হেসে কুটি কুটি হয়।

রেডিওটা যথাকালে যথাস্থানে ফেরৎ যায়। কথাটা চাপা থাকে।

এর পরে একদিন লণ্ডন থেকে দত্তবিশ্বাসের চিঠি আসে। মানসের নামে। তার খামের ভিতর এক টুকরো চিরকুট। সেটা মিলির লেখা। যূথিকার নামে। সুকুমার লিখেছে, "এখানে গান্ধীজীর নাম এখন কাদা। জনমত তাঁর উপর বিষম ক্ষিপ্ত। অমন বিশ্বাসঘাতকের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। কেউ বা বলে, 'পরম ভণ্ড মহা যণ্ড জপে হরির মালা।' কেউ বা বলে, 'ব্যাটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' যাঁরা অতটা উগ্র নন তাঁদের মতে গান্ধী লোকটা শতকরা পনেরো ভাগ সন্ত, পনেরো ভাগ বুজরুক, সত্তর ভাগ তুখোড় রাজনীতিক। কংগ্রেস নেতারা তো পথে আসছিলেনই, ওঁদের বিপথগামী করেছে কে? ওই তথাকথিত মহাত্মা। যাঁরা আদৌ উগ্র নন তাঁরা মনে করেন গত মহাযুদ্ধে লেনিনের যে ভূমিকা ছিল এই মহাযুদ্ধে গান্ধীরও সেই ভূমিকা। তিনি ক্ষমতা হাতে পেলে জাপানের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি করবেন। তিনি ভারতের জন্যে চান শান্তি। এদেশে একদল প্যাসিফিস্টও আছেন। তাঁরা বলেন, শুধু ভারতের জন্যে শান্তি কেন? বিশ্বের জন্যে শান্তি। যুদ্ধের মতো শান্তিও অবিভাজ্য। ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বাকী পৃথিবীতেও শান্তি প্রসারিত হবে। তবে এঁরা মুষ্টিমেয়। কেই বা শোনে এঁদের কথা। খবরের কাগজগুলো একধার থেকে যুদ্ধবাদী। ব্যতিক্রম যে দুটি একটি তারা এই যুদ্ধের গর্ভ থেকে সমাজবিপ্লব ভূমিষ্ঠ হবে বলে এর সমর্থক। ইউরোপের অন্যান্য দেশে তো বটেই। এমন কী, শিব ঠাকুরের আপন দেশেও বিপ্লব না হোক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে। রক্ষণশীলরা ভোটে হারবে। শ্রমিকরা জিতবে। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না, মল্লিক। চার্চিলের প্রেস্টিজ ডিউক অভ মার্লবরার চেয়ে কম কিসে? একই বংশ, একই রক্ত। চার্চিল অবশ্য কমন্স সভার সদস্যপদ ছাড়বেন না। নইলে তাঁকে ডিউক করতে রাজা সহজেই রাজী হতেন। আজকাল লর্ডস সভার সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেওয়া হয় না। নইলে তিনি ডিউক অভ ওয়েলিংটনের মতো ডিউকও হতেন, প্রধানমন্ত্রীও হতেন। এক শতাব্দীর মধ্যে চার্চিলের মতো প্রতাপশালী তথা জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী আর হননি। যুদ্ধোত্তর সাধারণ নির্বাচনে তিনিই তাঁর দলটিকে জিতিয়ে দেবেন, নিজেও জিতবেন, তার পর আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। তা হলে ভারতের কী আশা? আমি শুধু নই, ভারতপ্রেমিক ইংরেজরাও সবাই হতাশ। স্বাধীনতা নৈব নৈব চ। তবে মুসলিম লীগ তথা রাজন্যবর্গ যদি সম্মত হন তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারেও স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হবে। স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা নয়। ইংরেজরা শব্দের উপর অশেষ গুরুত্ব দেয়।"

মিলি তার সংসারের সমাচার ও পুত্রের বর্ণনা দিয়েছে। আর লিখেছে, "জানো, চন্দ্র বোসের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি এখন বার্লিনে। বেতারে তাঁর ভাষণ মনিটর করা গেছে। কর্তারা আগে থেকে টের পেলে জ্যাম করতেন। ওটা কোনো নাম করা স্টেশন থেকে নয়। সুভাষচন্দ্রের ঘোষণা থেকে মনে হয় তিনি বেশীদিন সবুর করবেন না। গান্ধী, নেহরু প্রভৃতির অনুপস্থিতির দরুন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেটা পূরণ করতে ছুটে যাবেন। সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্যদল। রাজনীতি একদম নয়া মোড় নেবে। এবার আসছে নয়া জর্জ ওয়াশিংটনের সেনাপতিত্বে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ। যেটা হওয়া উচিত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আমেরিকানরা যদি ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে থাকে তো ভারতীয়রাই বা জাপানীদের সাহায্য নেবে না কেন? প্রকারান্তরে ইংরেজরা কি রাশিয়ানদের মদত নিচ্ছে না জার্মানদের বিরুদ্ধে আজকের এই যুদ্ধে? স্টালিন কমিউনিস্ট বলে যদি মহা বাইবেল অশুদ্ধ না হয় তবে তোজো ফাসিস্ট বলে কেন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?"

চিঠিখানা পড়তে দেওয়া হয় ভবতোষবাবুকে। ইতিমধ্যেই তিনি যূথিকাকে দিয়ে লিখিয়েছেন ও সে লেখা ছাপিয়েছেন। সেটা তার হাতে খড়ি। আর মানসের বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে অগ্রিম সমালোচনা করেছেন। ওরা মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তত্ত্ব নেয়।

চিঠিখানা পড়ে তিনি ভেবে চিন্তে মত দেন। "গান্ধীজীর নৈতিক জয় সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। বিবেকচালিত আপত্তিকারীরা নানা দেশে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলেও গান্ধী নেতৃত্বে ভারতের মতো আর কোনো দেশে হাজারে হাজারে ও কাতারে কাতারে নয়। এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড। সারা বিশ্বের সব মানুষ এর জন্যে গর্ব অনুভব করতে পারে। ভারতীয় হিসাবে আমারও উচ্চতা এক ইঞ্চি বেড়ে গেছে। নিরস্ত্র পরাধীন দেশ এর চেয়ে উচ্চ হতে পারত না, সেদিক থেকে এটা একটা কীর্তি। কিন্তু আমার মনে কোথায় খটকা বাধছে, বলব? কংগ্রেসকর্মীদের বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেননি, রেল লাইন ভাঙতে, টেলিগ্রাফের তার কাটতে, সাঁকো উড়িয়ে দিতে, থানা চড়াও হতে জনতাকে শিক্ষা দিয়েছেন। জনতাও উত্তেজনার জোয়ারে ভেসে গিয়ে খুন খারাপি করেছে। রেল স্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে। অস্ত্র শস্ত্র লুট করেছে। এতে অহিংসার মহিমা রাহুগ্রস্ত হয়েছে। হিংসার সম্মোহন দুর্বার হয়েছে। আবার সেই এণ্ডস জাস্টিফাই মীন্স। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে সাত খুন মাফ। সেদিক থেকে আমরা গান্ধীপূর্ব যুগে ফিরে গেলুম। এটা একটা সুলক্ষণ নয়। একদিন হয়তো এরাই গৃহযুদ্ধ লড়বে আপনার লোকের সঙ্গে অহিংস উপায়ে নয়, সহিংস উপায়ে। কে শুনবে গান্ধীজীর বাণী, অনুসরণ করবে মহাত্মার আদর্শ? জিন্না এখন পর্যন্ত আসরে নামেননি। অপেক্ষা করছেন। তিনি ভায়োলেণ্টও নন ননভায়োলেণ্টও নন। তিনি কনস্টিটিউশন সম্মত উপায়ে বিশ্বাসী। তিনি যদি একদিন হতাশ হয়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে বিপরীত উপায় অবলম্বন করেন তবে তাঁর অনুগামীরা উত্তেজনার জোয়ারে ভেসে গিয়ে হিংসায় উন্মত্ত হতে পারে। ইংরেজ না থামালে কে তাদের থামাবে? ইংরেজই বা থামাতে যাবে কেন, তাদের যদি ভারত ছাড়তে হয়? আর তাদের যদি ভারতে থাকতে অনুরোধ করা হয় সেটা রাজনৈতিক পরাজয়। আজকের দিনে আমরা যা করছি তার দ্বারা কালকের দিনের ইতিহাস নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে।"

মানস ও যূথিকা স্তব্ধ হয়ে শোনে। তাদের মুখ দেখে সম্পাদক মহাশয় আরো দু'চার কথা বলেন। "আমি ডিটারমিনিজমে বিশ্বাস করিনে। ইতিহাস আপনা হতে কিছু করে দেয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আপনা হতে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায় না। প্রকৃতির থেকে আলাদা করে মানুষের জগতের কথা ভাবলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে মানুষই তার অতীত কর্মের ফল ভোগ করে, বর্তমান কর্মের ফলও ভোগ করবে। তা সে ভালো মন্দ যাই হোক। ভোগ বলতে দুঃখভোগও বোঝায়। স্বরাজ হাতে পেলেই স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল এটা ভ্রম। নরকও হাতে পাওয়া যেতে পারে। ভুলের মাশুল দিতে হবেই। কেউ কেউ মনে করেন ক্রিপ্‌স প্রস্তাব স্বর্গ এনে না দিলেও নরক ডেকে আনত না। তাদের মতে সেটা প্রত্যাখ্যান করা ভুলই হয়েছে। আমি এ বিষয়ে 'হ্যাঁ' কি 'না' বলিনি। আজকেও বলতে পারব না। আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।"

এর পর অন্য প্রসঙ্গ ওঠে। তাঁর কলকাতা প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ।

যূথিকা বিস্মিত হয়ে বলে, "সে কী! আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন কোথায়? যেখানে সন্ধ্যা হলেই বাঘের ভয়। সেই ভয়ে চারদিক অন্ধকার। কে জানে কোন্‌দিন হানা দেবে? শেয়ালের মতো গর্তে ঢুকতে হবে।"

তিনি সহাস্যে বলেন, "একটা কি দুটো বোমা তো কলকাতার মতো মহানগরীর সব ক'টা বাড়ীর উপর পড়বে না। আমার বাড়ীর উপর না-ও পড়তে পারে। শেয়ালের মতো গর্তে ঢুকতে গেলে দেখব সেখানে শেয়ালের ভিড়। এক একটা গর্ত যেন এক একটা অন্ধকূপ। সেই অন্ধকূপ হত্যার মতো ব্যাপার হবে। তার চেয়ে ঘরে বসে মরাই ভালো। বয়স তো হলো বড়ো কম নয়। আমার সহধর্মিণী আমার পূর্বেই স্বর্গে চলে গেছেন। আমিই বা আর কদ্দিন? আমিও স্বর্গের জন্যে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছি।"

"এটাও তো আপনার নিজের বাড়ী। এখানে এমন কী অসুবিধে? আর ওখানে এমন কী সুবিধে?" মানস প্রশ্ন করে।

"আমাকে তো এই বয়সেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজকার রুটি অর্জন করতে হয়। আমি তো পেনসন পাইনে। কলকাতায় আমি কেবল সম্পাদকীয় লিখিনে। সহকারীদের কাজকর্মও দেখি। স্বত্বাধিকারী তো আমিই। ম্যানেজমেন্টও দেখাশুনা করতে হয়। নইলে কাগজ কবে উঠে যেত। তা ছাড়া আমার স্ত্রী না থাকলেও পরিবার আছে। রোজ আমার নাতি নাতনির সঙ্গে খেলা করি। সেটাই আমার একমাত্র বিনোদন। সেটা এখানে কোথায়? বড়ো বৌমা কত যত্ন করে আমার জন্যে রোজ কিছু না কিছু রাঁধেন। তা ছাড়া আমার পারিবারিক ডাক্তার তো এখানে থাকেন না। এখানকার এঁরাও সুচিকিৎসক। কিন্তু আমার শরীরটাকে তো চেনেন না। চিনলে অন্য রকম প্রেসক্রিপশন দিতেন। তারপর আমি একজন সামাজিক মানুষ। সপ্তাহে একদিন সমাজের মন্দিরে গিয়ে উপাসনায় যোগ দিই। মাঝে মাঝে আচার্যের স্থান পূরণ করি। বিবাহসভায় বা শ্রাদ্ধসভায়ও আমার ডাক পড়ে আচার্য হতে। আমি সাড়া না দিয়ে পারিনে। ওটাও আমার আর এক কর্তব্য। এখানে আমি আমার সেইসব কর্তব্য সম্পাদন করতে পারিনে। তেমন উপলক্ষও জোটে না।" তিনি উত্তর দেন।

"কিন্তু সাহিত্যিক কর্তব্যের উপলক্ষও তো জোটে। সাহিত্যসভায় তো ডাক পড়ে। এখানে আপনাকে কে না চায়? পায় না এই যা দুঃখ।" মানস বলে।

কলকাতার মতো নয়। সেখানে বড়ো বড়ো সাহিত্যিকেরা বাস করেন। তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যালাপ হয়। এখানে আমি সভাপতিত্বই করতে যাই, আলাপ করতে নয়। কার সঙ্গে আলাপ করব? মাফ করবেন। আপনাকে বাদ দিয়েই বলছি। দু'জন কি একজন আছেন পুরাতন সাহিত্যিক। তাঁরা সভায় যান না। আমিই তাঁদের বাড়ী যাই। তাঁরা আধুনিক সাহিত্যের হালচাল জানেন না। প্রাচীন সাহিত্যে আমারও তেমন জ্ঞান নেই। প্রবন্ধ পেলে ছাপি। কলকাতায় একটা আধুনিকতার হাওয়া আছে। এখানে তা নেই। দু'দিনে হাঁফ ধরে যায়। আমাকে কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে। তবে এখনো দিনক্ষণ স্থির হয়নি। হলে আপনাদের খবর দেব। বাড়ী গিয়ে বিদায় নেব।" তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

"আপনি একদিন আমাদের সঙ্গে শাকভাত খাবেন। নিমন্ত্রণ রইল। আমি নিজে রান্না করে খাওয়াব।" যূথিকা আমন্ত্রণ করে।

"আচ্ছা, আমি খুশি হয়ে খাব।" তিনি কথা দেন। "আমি কিন্তু মাছমাংস খাইনে। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে খাইনি।"

নৈশভোজনের জন্যে নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে মানসের ওখানে উপস্থিত হন ভবতোষবাবুর পুত্র পরিতোষবাবু। কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর বলেন, "এসেছি বাবার হয়ে ক্ষমা চাইতে। কালকের মধ্যেই তাঁকে কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে, কারণ পরশু সকালেই তাঁর ট্রেন। নিমন্ত্রণরক্ষার জন্যে সময় কোথায়? তবে আপনারা যদি দয়া করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তিনি দু'চার কথা বলার জন্যে সময় করে নেবেন।"

যূথিকা মানসের মুখের দিকে চেয়ে রাজী হয়ে যায়। এরপর পরিতোষবাবুর আপ্যায়ন ও সেইসঙ্গে মানসের সঙ্গে কথোপকথন।

"আপনারা কি মনে করেন কলকাতা এখন নিরাপদ? জাপানীরা আর বোমা বর্ষণ করবে না? ইংরেজরা ওদের খোঁচাবে না?" মানস সুধায়।

"কার মনে কী আছে কেমন করে বলব? তবে যতদূর অনুমান করতে পারছি ওদের লক্ষ্য ভারত নয়, চীন। চীনকে ওরা ভারত থেকে সাহায্য পাঠাতে দেবে না বলেই বার্মা দখল করেছে। বার্মা ভিন্ন আর তো কোনো স্থলপথ নেই। তাই যদি হয়ে থাকে তবে বার্মা রোড পাহারা দেওয়াই তাদের লক্ষ্যভেদের সহায়ক। ভারত আক্রমণ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে যাবে কেন? তা ছাড়া কংগ্রেসই যখন ইংরেজের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত তখন ভারত আক্রমণ করে কংগ্রেসকে ইংরেজের কোলে ঠেলে দেওয়া কেন?

হ্যাঁ, ইংরেজে কংগ্রেসে কোলাকুলি হতে পারে। ক্রিপ্‌স প্রস্তাব যদি সংশোধিত হয়। যদি দেশরক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়দের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। যে কোনো একজন ভারতীয় নাগরিককে যুদ্ধ দফতর পরিচালনার ভার দিলেই চলবে। কংগ্রেস নিজের জন্যে সেটা চাইবে না। জিন্না সাহেবকে যদি দেওয়া হয় তা হলেও কংগ্রেস সহযোগিতা করবে। কংগ্রেস জাপানের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত ছিল। ইংরেজের সঙ্গে নয়। কিন্তু চার্চিলের অনড় মনোভাবের জন্যেই তো মোড় ঘুরে গেল। অপ্রস্তুত অবস্থায় কংগ্রেসকে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে হলো। আর একটা মাস। আর একটা মাস সময় পেলেই রাজশক্তিকে দেখিয়ে দিত ভারতের প্রজাশক্তি কেমন দুর্জয়। এরোপ্লেন থেকে মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করে ভারতীয়দের মেরেছে কারা? জাপানী না ইংরেজ? কংগ্রেস পক্ষের নিরক্ষর জনতা যদি বাড়াবাড়ি করেই থাকে তবু মোটের উপর তারা নিরস্ত্র। তোমরা সশস্ত্র। তোমরাও কি বাড়াবাড়ি করলে না? ফলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা আপস করতে আরো পেছপাও হবে। নয়তো বামপন্থীরা কংগ্রেস থেকে তাদের হটাবে। তাদের মেজরিটি থাকবে না। স্বয়ং গান্ধীজীও তাদের জিতিয়ে দিতে পারবেন না। তেমন করতে গেলে তাঁর নিজের জনপ্রিয়তা হারাবেন। তাঁর এতকালের নেতৃত্ব চলে যাবে। বড়ো আফসোসের কথা সুভাষচন্দ্র এখন আমাদের মধ্যে নেই। থাকলে বিকল্প নেতৃত্বের জন্যে ভাবতে হতো না। হয়তো তিনিই আবার কংগ্রেসে মেজরিটি পেতেন। 'হয়তো' বলছি এইজন্যেই যে সেবারকার মতো এবার বামপন্থীরা সবাই একজোট নন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট তাঁদের কাছে আগে রাশিয়া, তারপরে ভারত। আগে রাশিয়া নাৎসীমুক্ত হবে, তারপরে ভারত ব্রিটিশমুক্ত হবে। এটা মেনে নেওয়া অন্যান্য বামপন্থীদের পক্ষে অসম্ভব। এদের কাছে আগে ভারতের স্বাধীনতা, তারপরে রাশিয়ার বিপ্লবের সহায়তা। বিপ্লবের প্রতি তাদের অনুরাগ কারো চেয়ে কম নয়। তারাও বিপ্লবী। কিন্তু যেদেশ স্বাধীন নয় সেদেশে বিপ্লব হয় না।'' পরিতোষবাবু চা খেতে খেতে বলেন।

''সমাজবিপ্লব হয় না।'' মানস সংশোধন করে। ''কিন্তু অন্যরকম বিপ্লব তো হতে পারে। আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রামকেও আমেরিকান রেভোলিউশন বলা হয়। ওদেশে একটি সংস্থা আছে, তার নাম 'ডটার্স অফ দ্য রেভোল্যিউশন'। নাম শুনেছেন নিশ্চয়।''

''শুনেছি বইকি। ওর মতো প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা ওদেশে আর নেই। ধনতন্ত্রের একটি স্তম্ভ।'' পরিতোষবাবুর মতে।

''এদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম সফল হলে এদেশেও সেইরকম একটি সংস্থার উদ্‌ভব হতে পারে। আমাদের জুলিও হতে পারে তার একজন পাণ্ডা।'' মানস হাসে।

''জুলিটি কে?'' কৌতূহলী হন পরিতোষবাবু।

''কেন, সেদিন তো আরতিদি বলে গেলেন জুলি তাঁর বিনু মাসীর মেয়ে। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকে। শুনছি ধরা পড়ে জেলে গেছে। আপনার কাছেই তো আশা করছি সঠিক খবর।'' মানসও কৌতূহলী।

''আমি অত খোঁজখবর রাখিনে। রাখলে আপনাকে জানাতুম। তবে, হ্যাঁ, ওঁরা ধনতন্ত্রের সমর্থক। জুলি নিজে কি না, বলতে পারবে না। ওর কমিউনিস্ট কমরেডদের সঙ্গে ওর বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। জুলি এখন স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে। অরুণা আসফ আলীর মতো। উনিও এখন কলকাতায়। হ্যাঁ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। পুলিশ ওঁকে কিছুতেই ধরতে পারছে না। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকেই উনি যা আগুন ছড়িয়ে চলেছেন তা নেবানো দমকলের অসাধ্য। এ. আর. পি'র অসাধ্য। কে জানে জুলির সঙ্গে হয়তো ওঁর যোগাযোগ আছে। স্বাধীনতার পর এঁরা কে কোন্ পথে যাবেন এখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীনতা হচ্ছে কী করে, বুঝতে পারছিনে। বামপন্থীরা দলে ভারী ছিল কমিউনিস্টরাও দলের সামিল ছিল বলেই না। নইলে সুভাষচন্দ্র কি ভোটে জিততেন? এখন তো সেই জোটবল নেই, সেই

ভোটবল নেই। দক্ষিণপন্থীরা আপস করলে তাদের ভোটের জোরে হারাবে কে? আপস করে যদি আন্দোলন থামিয়ে দেন একে চালিয়ে নেবার সামর্থ্য কি জয়প্রকাশের কি অরুণার আছে? এই সাড়ে চার মাসের মধ্যেই আন্দোলনের মোমেন্টাম ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কেউ কেউ নেপালে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু সেখান থেকে আন্দোলন চালানো আরো কঠিন হবে। তার চেয়ে জেলের ভিতর থেকে চালানো তত কঠিন নয়। জেলের ভিতর থেকে চিঠি চালাচালি অনবরত চলেছে। ওয়ার্ডারদের যোগসাজশে। ব্যতিক্রম অবশ্য গান্ধীজী যেখানে বন্দী আর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যেখানে বন্দী বা নির্বাসিত বা ভারতের বাইরে প্রেরিত।" পরিতোষবাবু বলেন।

"এখন ওরা কোথায়?" মানস বোকার মতো প্রশ্ন করে।

"দ্যাট ইজ মোর দ্যান আই ক্যান টেল ইউ।" তিনি ইংরেজীতে উত্তর দেন। তারপর বলেন, "প্রত্যেকটি কাগজের উপর নির্দেশ ফাঁস করেছ কি মরেছ। কোনো পত্রিকারই সাহস নেই। না নিউজ এজেন্সীর। নইলে আমেরিকানরা এতদিনে প্রকাশ করে দিত। হ্যাঁ, আমরা আমেরিকা থেকেও পত্রিকা পাই। বিলেত থেকে তো বটেই। ত্রিশ বছর হলো পেয়ে আসছি। আমরাও পত্রিকা পাঠাই। এমন গোপনীয়তা কোনো বারেই দেখা যায়নি। ওঁদের কুৎসা প্রচার সমানে চলেছে, অথচ ওঁদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেওয়া হচ্ছে না। অপরাধ যদি করে থাকেন তো আদালতে বিচার হোক। এমন কি, মিলিটারি ট্রাইবিউনালে। এটা কি রকম ব্রিটিশ জাস্টিস, বলুন তো জজ সাহেব?" পরিতোষবাবু পরিহাস করেন।

মানস লজ্জিত হয়ে বলে, "না, এটা ক্রিকেট নয়।"

'ইংরেজরা কত নিচে নেমে গেছে, দেখুন। ওরা বরং ওদের চিরশত্রু স্টালিনের সঙ্গে ভাব করবে, তবু ওদেরই একজন যিনি, তাঁর সঙ্গে নয়। আমি কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছেন?" তিনি রসিকতা করেন।

"নেহরুর কথা। এটা সহজেই বোঝা যায়। হ্যারো আর কেমব্রিজ। কত ভালো ইংরেজী লেখেন। পড়ে সুখ আছে।" মানস প্রশংসা করেন।

"গান্ধীজী আবার ওঁকেই ওঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। বেচারা উত্তরাধিকারীর একেবারেই ইংরেজের সঙ্গে লড়তে ইচ্ছা ছিল না। তার মহাশত্রু হিটলার মুসোলিনি প্রভৃতি ফাসিস্ট। ওঁকে শুধু ইংরেজ নয়, মার্কসিস্টও বলা যায়। ক্ষমতা হাতে পেলে ওঁর প্রথম কাজই হতো চার্চিলের সাথী হয়ে স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া। দ্বিতীয় কাজ হতো চীনদেশে গিয়ে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে মাও থসে-তুঙ্গের মিলন ঘটানো। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওঁর মতো যোগ্যতা আর কার আছে? বড়লাট তবু পররাষ্ট্র দফতর কিছুতেই ওঁকে দেবেন না। ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব বানচাল করার পেছনে বড়লাটেরও হাত ছিল।" আফসোস করেন পরিতোষবাবু।

মানসও জানত যে জবাহরলাল একান্ত অনিচ্ছুক সত্যাগ্রহী। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন মিত্র হিসাবে যুদ্ধে নামতে, তাঁবেদার হিসাবে নয়। কিন্তু এমনি ইংরেজদের জেদ যে ওরা দাবী করেছে ব্রিটিশ সাবজেক্ট হিসাবে লয়ালটি, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে মিত্রতা নয়। সুতরাং একজন অনারেবল ম্যানের কর্তব্য অসহযোগ করা। আমিও ব্রিটেনে থেকেছি, গত মহাযুদ্ধের সময় ছাত্রহিসাবে। আমিও তখন সাহায্য করেছি। আমিও এই যুদ্ধে ওদের পক্ষে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়। ওদেশের পীপলের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ বা অভিমান নেই। ওরা সত্যিই ভালো। যত দোষ ওদের সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকদের। ওরাই তো এদেশে ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি চালিয়ে হিন্দু মুসলমানের মনে এমন বিষ ঢুকিয়েছে যে ওদের গুরুমারা চেলারা শেষে হাঁকে কিনা 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট'। লক্ষ করেছেন এই আন্দোলনে মুসলমানরা আগের মতো যোগ দেয়নি। ব্যতিক্রম উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশের পাঠান। আন্দোলনের ফলাফল যাই হোক একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়েছে। কংগ্রেস আটটা প্রদেশে আগের মতোই প্রভাবশালী। অধিকন্তু পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব পাঞ্জাবে। বাকী অংশে কংগ্রেস অত্যন্ত দুর্বল। মুসলিম জনতার দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিলে আশ্চর্য হব না। ইংরেজরা করতেও পারে ভাগ আর ত্যাগ।" পরিতোষবাবু শঙ্কিত।

"সেটা তো যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে নয়। তার এখনো ঢের দেরি। যুদ্ধে জয় পরাজয় সমান অনিশ্চিত। কত কী ঘটতে পারে। সুভাষ বোসকে কেউ গণনার মধ্যে ধরছে না। গান্ধীজীর দম ফুরিয়ে আসছে, সুভাষের দম ফুরোয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের সম্ভাবনা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?" মানস তর্ক করে।

"সে রকম কানাঘুষাও শোনা যাচ্ছে। আমি ওটাকে সীরিয়াস মনে করিনে। সিপাহীদের রেজিমেণ্টগুলো সাম্প্রদায়িক নামে নামাঙ্কিত। অসাম্প্রদায়িক রেজিমেণ্ট একটাও নেই। ওরা কি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বে না পরস্পরের বিরুদ্ধে? ইংরেজরা দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে গর্ভের ভিতরেই বিনাশ করে রেখেছে। ওকে ওরা ভূমিষ্ঠ হতে দেবে না। ওটা স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপথগামী করবে। তেমনি বিপথগামী করবে জার্মান বা জাপানীদের সঙ্গে জোট বাঁধা।" পরিতোষবাবুর বিচারে।

পরের দিন মানস ও যূথিকা ভবতোষবাবুকে বিদায় দিতে যায়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। "নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করা একটা সামাজিক অপরাধ। কিন্তু কাল সকালে কলকাতার ট্রেন ধরতে হলে আজ সন্ধ্যাবেলা কোথাও যাওয়া চলে না। অনেকেই আসছেন দেখা করতে।"

যূথিকা কলকাতায় তাঁর নিরাপত্তার জন্যে উদ্বিগ্ন। "এই যে আপনি জাপানী বোমাকে উপেক্ষা করে ফিরে যাচ্ছেন এটা কি ঠিক হচ্ছে?"

তিনি স্নিগ্ধ হেসে বলেন, "আমার তো এমনিতেই যাবার বয়স হলো। মানে পরপারে। দু'দিন আগে গেলে এমন কী তফাৎ? লোকের ধারণা আমি জাপানী বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছি। সেটা অর্ধ-সত্য। বাকী আধখানা হচ্ছে আমি সেই অজুহাতে কিছুদিন নিভৃতে বাস করতে চেয়েছি। আমি সাময়িকপত্র সম্পাদন করি, সাময়িককে নিয়েই আমার কারবার। কিন্তু সাময়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে মানব অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই যে এত লক্ষ মানুষ দেশের নামে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছে এরা কি মৃত্যুর পরেও জার্মান বা জাপানী বা ইংরেজ বা মার্কিন বলে পরিচয় দিতে পারবে? ওপারে কি কেউ চিনতে পারবেন এরা কোন্ দেশের মানুষ? মানুষ বলেই চিনবে কিনা সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। মৃত্যুর পূর্বে তুমি জার্মান, মৃত্যুর পরে তুমি কেউ নও। তুমি যা তোমার শত্রু রাশিয়ানও তাই। আমি চেষ্টা করছি দার্শনিকের চোখে দেখতে। আমার চোখে হারজিৎ দুই সমান। জার্মান ইটালিয়ান জাপানী শিবির জিতলে যে মানবজাতির সর্বনাশ হবে আর ইঙ্গ মার্কিন রুশ শিবির জিতলে যে সর্বলাভ তা আমার বিশ্বাস হয় না। সব যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। এই যুদ্ধেও কোনো এক পক্ষ জিতবে ও কোনো এক পক্ষ হারবে। তাতে সমগ্র মানবজাতির কি এল গেল? একজন ভারতীয় হিসাবে নয়, একজন মানুষ হিসাবে এই আমার জিজ্ঞাসা। সেই যে একটা কথা ছিল পশু যেমন বিবর্তনের সোপান বেয়ে ক্রমে ক্রমে মানুষ হয়ে উঠেছে তেমনি মানুষও ক্রমে ক্রমে দেবতা হয়ে উঠবে, সেই কথাটা কি সত্য? আপনাদের কি মনে হয় একটার পর একটা মহাযুদ্ধে মারতে মারতে ও মরতে মরতে মানুষ ক্রমে ক্রমে দেবতা হয়ে উঠছে? না অসুর হয়ে উঠছে? না নেমে গিয়ে আবার পশু হচ্ছে? শেষে কি ডাইনোসরের মতো নির্বংশ হবে?"

মানস যূথিকার দিকে তাকাতেই সে ফিক করে হাসে। "দেবতা হয়ে উঠছে না তো কী? চার্চিল, রুজভেল্ট, স্টালিন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নন?"

ভবতোষবাবুর মতো গম্ভীর মানুষও হেসে ওঠেন। মানসের দিকে তাকান।

"তা যদি বলো তবে ওডিন, থর, ফ্রিগ এঁরাও তো দেবতা। ফ্রিগ হলেন ওডিনজায়া। টিউটনদের এই তিন দেবতার নাম এখনো বহন করছে ওয়েনসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে। হপ্তার পর হপ্তা আমরাও এঁদের নাম করি। ইদানীং জার্মানীতে এঁদের যুগ ফিরে আসছে। নাৎসীরা প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনছে।" মানস বলে।

ভবতোষবাবু চমকে ওঠেন। "তার মানে কি জার্মানী থেকে খ্রীস্টধর্ম উঠে যাবে? হিটলারের জয় বলতে কি এত বড়ো বিপর্যয় বোঝায়?"

"স্টালিনের জয় হলে জার্মানী থেকে ঈশ্বরবিশ্বাসই উঠে যাবে। যেমন উঠে গেছে রাশিয়া থেকে। যুদ্ধ ব্যাপারটা শুধু মানুষের মরণ বাঁচনের প্রশ্ন নয়। ধর্মেরও, মতবাদেরও, গভীরতম বিশ্বাসেরও ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রশ্ন।" মানস উত্তর দেয়।

ভবতোষবাবু স্বীকার করেন যে যুদ্ধে হার জিৎ মানব জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে।

।। চব্বিশ ।।

এর পরে একদিন সাত সকালে রায় বাহাদুর এসে উপস্থিত। "আপনাকে এত সকালে বেরোতে দেখিনে। ব্যাপার কী, রায় বাহাদুর?"

"কী খাওয়াবেন বলুন।" রায় বাহাদুর আসন নিয়ে বলেন, "বি. বি. সি'র খবর। স্টালিনগ্রাডে জার্মান সেনা আত্মসমর্পণ করেছে। বন্দী হয়েছে সেনাপতি সমেত একানব্বই হাজার সৈনিক।"

"কী আনন্দ! কী আনন্দ!" মানস যূথিকাকে ডেকে শোনায়।

"আপনার তো আনন্দ। আমার যে নিরানন্দ। কালকেই জামাই এসে হানা দেবে। আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে যাবে। নাতি নাতনী সমেত। স্টালিনগ্রাডের পরাজয়ের পর জার্মানীর মিতা জাপান আর এদিকে পা বাড়াবে না। কলকাতা নিরাপদ। কী জানি, বাপু!" তাঁর প্রত্যয় হয় না।

"এই তো সেদিন ভবতোষবাবু কলকাতা ফিরে গেলেন। নিরাপদ না হলে কি যেতেন? তবে কেউ জোর করে বলতে পারবে না যে আর কখনো বোমা পড়বে না। ব্ল্যাক আউট বহাল থাকবে।" মানস যতদূর আন্দাজ করতে পারে।

যূথিকা চা করে এনেছিল। মানস বলে, "আসুন, একটু সেলিব্রেট করা যাক।"

"কেন, আপনি কি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট?" রায় বাহাদুর রসিকতা করেন।

"রুজভেল্ট, চার্চিল কি কমিউনিস্ট? অত বাছবিচার করলে কি যুদ্ধ জেতা যায়? স্টালিনগ্রাডে হিটলারের পরাজয় তাঁদেরও জয় সূচনা করছে। তাঁরা এবার দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার তোড়জোড় করবেন। স্টালিনগ্রাড একটা টার্নিং পয়েন্ট। এই প্রথমবার হিটলারকে হার মানতে হলো। না, আমি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট নই। আমি নন-কনফর্মিস্ট। যেমন ধর্মে, তেমনি সমাজে, তেমনি সাহিত্যে, তেমনি রাজনীতিতে, তেমনি মতবাদে। তবে সরকারী চাকরিতে কনফর্ম করতেই হয়। নয়তো চাকরি ছাড়তে হয়। সেইজন্যেই পালাতে চাই।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

"তা হলে আপনার বিয়ে না করাই উচিত ছিল। পুত্রকন্যার পিতা হওয়া তো একেবারেই অনুচিত।" তিনি সহাস্যে বলেন।

মানসও হাসতে হাসতে বলে, "নারীই হচ্ছে পুরুষের শক্তি। শিবের শক্তি যেমন পার্বতী, নারায়ণের শক্তি যেমন লক্ষ্মী, রামের শক্তি যেমন সীতা, কৃষ্ণের শক্তি যেমন রাধা, মানসের শক্তি তেমনি যূথিকা।"

"শিবপার্বতীর যেমন কার্তিক গণেশ" বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কণ্ঠরোধ হয়। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "কালিদাস একটা মহাকাব্যই লিখে ফেলেন কুমারকে সম্ভব করতে গিয়ে। নইলে সেকালের

স্টালিনগ্রাডে সেকালের নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন সেকালের রুশদেশের কোন্ সেনাপতি?''

''রুশদেশকে আপনি দেখছি মর্ত্যের স্বর্গ বলে কল্পনা করছেন। আমি কিন্তু ভাবছি এক নেপোলিয়নকে হারিয়ে দিয়ে আপনারা আরেক নেপোলিয়নকে জিতিয়ে দিলেন। হিটলারের মতো স্টালিনেরও বাড় বেড়ে যাবে। হিটলারের শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াবে। তখন আবার 'সামাল' 'সামাল' রব উঠবে।'' রায় বাহাদুর বলেন।

''দেখুন, রায় বাহাদুর, অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্য। স্টালিন না থাকলে হিটলারকে কেউ রুখতে পারতেন না। আর চার্চিল, রুজভেল্ট সাহায্য না করলে স্টালিনও কি পারতেন? এক কথায় বলতে পারা যায় কমিউনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট মিলে ফাসিস্টকে রুখেছেন।'' মানস বিচারকের রায় শোনায়। যাঁকে শোনায় তিনিও একজন বিচারক ছিলেন।

''তা যদি বলেন, চার্চিলকে সাহায্য করেছেন অ্যাটলী, লেবার পার্টির নেতা। ক্যাপিটালকে সাহায্য করেছে লেবার। রুজভেল্টের পেছনেও তাঁর দেশের শ্রমিক নেতারা দাঁড়িয়েছেন। নাৎসীদের কেউ দেখতে পারে না। ওরা কি এতই খারাপ! ওরা যে বেকার সমস্যার সমাধান করে এতদিন সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে এসেছে, এটাও কি সত্য নয়?'' রায় বাহাদুর আশ্চর্য হন।

''কিছু মাত্র কৃতিত্ব যে ওদের নেই এমন কথা আমি বলব না। স্টালিনগ্রাডে শুনছি আড়াই লাখ জার্মান প্রাণ দিয়েছে। দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়াও একটা কৃতিত্ব। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে ওরা ওদের টিউটন পূর্বপুরুষদের যুগে ফিরে গেছে। খ্রীস্টীয় মূল্যবোধের ধার ধারে না। গ্রীক রোমান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার স্বীকার করে না। রেনেসাঁস, এনলাইটেনমেন্ট, লিবারল ডেমোক্রাসীর ধারা প্রবহমান রাখতে চায় না। আর কারো সঙ্গে ওদের মিলবে কেন? আবার সেই উইচ হাণ্ট ফিরিয়ে এনেছে। উইচ হয়েছে ইহুদী মাত্রেই। জিপসী মাত্রেই। কৃষ্ণাঙ্গ মাত্রেই। আর্য আর অনার্য এ ভেদবুদ্ধি ওদের মজ্জাগত। অনার্যকে বাঁচতে দেবে না। সুতরাং প্রাণের দায়ে সবাইকে একজোট হতে হচ্ছে। নেপোলিয়নও এত রকম মানুষকে শত্রু করেননি। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল। এরা প্রতিক্রিয়াশীল।'' আবার রায় দেয় মানস।

রায় বাহাদুর ওঠেন। বলেন, ''স্টালিনগ্রাডের খণ্ডযুদ্ধই তো সম্পূর্ণ যুদ্ধ নয়। আরো অনেক জায়গায় লড়তে হবে। এখন থেকেই সেলিব্রেট করা বিজ্ঞ জনের কাজ নয়। আপনি এখনো ছেলেমানুষ রয়েছেন।''

তাঁর প্রস্থানের পর যূথিকা মুখ খোলে। ''চার্চিল আজ হাসছেন না কাঁদছেন তা আমি বাজি রেখে বলতে পারব না। স্টালিনই এখন থেকে সিনিয়র পার্টনার। 'মার্শল স্টালিন', 'মার্শল স্টালিন' বলে খোশামোদ শুরু হয়ে যাবে। লোকটা আগাগোড়া ইস্পাত দিয়ে তৈরি। স্তব স্তুতি নিন্দা কুৎসা কিছুই ওঁকে টলাতে পারবে না। ইউরোপের ভাগ্য উনিই নিয়ন্ত্রণ করবেন। এর পরে আর কোনো শক্তি রাশিয়া আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। ঢুকলে বেরোবার পথ পাবে না। ঘেরাও হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। গোটা রাশিয়াটাই হবে বৃহত্তর স্টালিনগ্রাড। চার্চিল মশায় হাত পা কামড়াবেন। মতলবটা তো জার্মানী দখল করে রাশিয়ার দিকে হাত পা বাড়ানো। শক্তের ভক্ত, নরমের যম। যত হম্বি তম্বি গান্ধীজীর বেলা। সর্বংসহা বসুমতী আর কতদিন এই দাম্ভিক জাতিকে সহ্য করবেন? কবে এর নেতাকে দিয়ে বলিয়ে নেবেন 'মহাত্মা গান্ধী' 'মহাত্মা গান্ধী'? কবে এমন সুদিন হবে যেদিন চার্চিল উড়ে আসবেন সেবাগ্রামে তাঁর নৈতিক সমর্থন প্রার্থনা করতে? পৃথিবীতে নৈতিক শক্তি বলে কি কিছু নেই? তবে এত মানুষ যীশু খ্রীস্টের অনুগামী হতে চায় কেন? খ্রীস্টের অনুশাসনকে কাজে না হোক, মনে মনে অবলম্বন করে কেন?''

মানস এর উত্তরে বলে, ''মনে মনে মানছেই বা ক'জন মানুষ! গির্জাগুলো জনবিরল বা জনশূন্য।

খ্রীস্টানদের মধ্যে খাঁটি খ্রীস্টানরা সংখ্যালঘু। টলস্টয়ের কথা যদি শুনত রুশদেশের চার্চ আত্মসংশোধন করত। তা না করে তাঁকেই করে বহিষ্কার। ফলে জারও গেছেন, প্যাট্রিয়ার্কও গেছেন, চার্চও গেছে। সব সাফ করে দিয়েছেন লেনিন ও তাঁর বিপ্লবী দল। তাঁরাও গড়ে তুলেছেন নতুন এক চার্চ। কমিউনিস্ট পার্টি। নতুন এক রাষ্ট্র, প্রোলিটারিয়ান রাষ্ট্র। তাঁদেরও একপ্রকার নৈতিক শক্তি আছে। আরো এক প্রস্থ নৈতিক অনুশাসন। তাঁদের রাষ্ট্রে বেশ্যাবৃত্তি নেই, বৈশ্যবৃত্তি নেই, প্রফিট মোটিভ নেই। আদি খ্রীস্টানদের সঙ্গে মিলে যায়। তবে তলোয়ারের উপর অগাধ বিশ্বাস। অনেকটা আদি মুসলমানদের মতো। যারা তাদের মতবাদ বিশ্বাস করে না তারা ইনফাইডেল। তাদের কোতল করা হয়। প্রাণে বাঁচবার জন্যে সবাইকে কমিউনিস্ট দীক্ষা নিতে হয়েছে। খাঁটি কমিউনিস্টরা সংখ্যালঘু। তাঁদের মধ্যেও ঝাড়াই বাছাই চলেছে। আদি কমিউনিস্টরাও প্রায় সকলেই নিপাত গেছেন। তাঁরা নাকি প্রতিবিপ্লবী বা অতিবিপ্লবী। স্ট্যালিন এখন কেবল পার্টির পোপ নন, রাষ্ট্রেরও সম্রাট, এখন আবার সৈন্যদলের মহাসেনাপতি, ফীল্ড মার্শল। সর্বপ্রকার র‍্যাঙ্ক তো বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।"

"কিন্তু বিপ্লবটা আদৌ হলো কেন বলতে পারো? অধিকাংশ রাশিয়ানই তো ছিল ধর্মভীরু ও রাজভক্ত?" যূথিকা জিজ্ঞাসা করে।

"প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে। যুদ্ধের সময় সব দেশেই ইনফ্লেশন হয়ে থাকে কিন্তু তাকে অতি যত্নে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হয়। সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জারের শাসনকালে হয়নি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আপনা থেকে ঘটে যায়। জার সিংহাসন ত্যাগ করেন। লেনিন তখন দেশে ছিলেন না। কেরেনস্কি ও তাঁর মেনশেভিকরা বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে গভর্নমেন্ট গঠন করেন। কিন্তু একই ভুল তাঁরাও করেন। যুদ্ধ চালিয়ে যান, যুদ্ধের খরচ ইনফ্লেশন দিয়ে মেটান। একই পরিণাম। আবার বিপ্লব। এটা আপনা থেকে ঘটে না। ঝোপ বুঝে কোপ দেন লেনিন ও তাঁর বোলশেভিক দল। এঁরা যুদ্ধ থামিয়ে দেন। রণক্লান্ত সৈনিকরা এঁদের পক্ষ নেয়। শ্রমিকরা তো নেয়ই, কৃষকরাও জমির স্বত্ব পেয়ে এঁদের পেছনে দাঁড়ায়। ইনফ্লেশনের পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়। অবশ্য প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আবার পরিমাণ বাড়াতে হয়েছিল, তার সুযোগ নিতে চেয়েছিল অতিবিপ্লবীরা কিন্তু লেনিন ছিলেন বহুদর্শী ও প্রাজ্ঞ। সুতরাং তাঁর বিপ্লব আশাতীতভাবে সফল হয়। যদিও বিনা রক্তপাতে নয়। তবে ফরাসী বিপ্লবের মতো সন্ত্রাসের রাজত্ব তাঁর আমলে হয়নি। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ। ন্যায়নিষ্ঠাও মানুষকে মানুষের প্রতি অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করে। নইলে রুশবিপ্লবও ফরাসীবিপ্লবের মতো ব্যর্থ হতো। মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে মন্দ উপায়ও সার্থক এমনতরো নীতিরও একটা মাত্রাবোধ আছে। গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি উপায়কে উদ্দেশ্যের চেয়ে আরো বেশী গুরুত্ব দেন।" মানস ব্যাখ্যা করে।

"আচ্ছা, এখানেও তো ইনফ্লেশন থেকে বিপ্লব হতে পারে। ইনফ্লেশনের উপরে কি গভর্নমেন্টের কন্ট্রোল আছে?" যূথিকা সুধায়।

"এখন পর্যন্ত আছে। এ যুদ্ধ আরো তিন বছর গড়ালে ইনফ্লেশনের তথা বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকবে। গান্ধীজী ততদিন অপেক্ষা করলে তাঁর আন্দোলনই বৈপ্লবিক আকার নিত। অসময়ে গণ আন্দোলন করতে গিয়ে তেমন বেশী সাড়া মেলেনি। শ্রমিকরা ও সৈনিকরা সরকার পক্ষে, মুসলমানরা উদাসীন।" মানস বলে।

দিন কয়েক পরে রায় বাহাদুরের পুনরাগমন। এবার রাত ন'টার পরে।

"শুনেছেন? মহাত্মা গান্ধীর অনশন আরম্ভ হয়ে গেছে। একুশ দিনের মেয়াদ। সরকার তাঁকে সেই একুশ দিন মুক্ত থাকতে দিতেন। তা হলে তিনি কিন্তু অনশন করতেন না। কাজেই তাঁকে বন্দী অবস্থায় অনশন করতে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে তাঁর নিজের ডাক্তার থাকবেন। নিকট আত্মীয়রাও থাকবেন।

ফলাফলের জন্যে সরকার দায়ী নন। বড়লাটের সঙ্গে তাঁর যে পত্রবিনিময় হয় তা প্রকাশ করা হয়েছে। কালকের কাগজে দেখবেন।" রায় বাহাদুর হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন।

যূথিকা বজ্রাহত। মানস যদিও জানত গান্ধীজী অনশন করতে পারেন, তবু ঠিক এই মুহূর্তে প্রত্যাশা করেনি। সেও হতবাক।

"চুয়াত্তর বছর বয়সে একুশদিন অনশন মানে কী, বোঝেন? নির্বাণ। কেউ যদি তাঁকে নিবৃত্ত না করে। সরকার পাষাণের মতো অবিচল। সব চেয়ে খারাপটার জন্যেও প্রস্তুত। দেশবাসীরও তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।" তিনি কাতরভাবে বলেন।

মানস তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসে। তিনি কেবলি আওড়াতে থাকেন, "অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যো র্মা অমৃতংগময়।"

এক ফাঁকে মানস তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি অতবার মৃত্যুর কথা বলছেন কেন? আপনার কি মনে হয় মহাত্মা আর বাঁচবেন না?"

"ওই শরীর নিয়ে এই বয়সে কেউ বাঁচে না। বাঁচলে বাঁচবেন আত্মার জোরে আর ভগবানের কৃপায়। সোল ফোর্স আর ডিভাইন গ্রেস। সেইজন্যেই তো এতবার জপ করছি, অমৃতংগময়।" তিনি উত্তর দেন।

মানস ফিরে এসে যূথিকাকে শোনায়। সে ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছে যে সেও অনশন করবে। সেটা তার অন্তরাত্মার নির্দেশ।

"সে কী! তুমি কেন করতে যাবে! করে কী লাভ হবে? তুমিও কি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাও?" মানস ব্যাকুল হয়ে বলে।

"পাগল! আমি ছেড়ে যাব কোন্ দুঃখে। আত্মার সঙ্গে আত্মার একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে। আমার আত্মার প্রার্থনা তাঁর আত্মাকে শক্তি জোগাতে পারে। অনশনও একপ্রকার অব্যক্ত প্রার্থনা। অসুস্থ সন্তানের আরোগ্যের জন্যে উপবাস কি কোনো মা কখনো করে না? বাপুও তো আমার একটি ছেলে। ছেলের মুখে ভাত নেই, আমার মুখে ভাত রুচবে?" যূথিকা আবেগের সঙ্গে বলে।

"একুশ দিন তুমি পারবে কেন? শরীরেরও তো একটা দাবী আছে। মানুষের সমস্তটাই কি আত্মা?" মানস যুক্তির আশ্রয় নেয়।

"না, একুশ দিন নয়। দিন স্যাতেক।" যূথিকা জানায়।

পরের দিন যূথিকা অনশন শুরু করলে মানসও তাই করে। চা পর্যন্ত ছোঁয় না। পরিজ পড়ে থাকে।

"ও কী! তুমি অনশন করবে! তোমাকে আদালতে যেতে হবে, মামলা শুনতে হবে। পেটে কিছু না পড়লে কাজের ক্ষতি হবে না?" যূথিকা সুধায়।

"বাপুর জন্যে আমারও কিছু করা উচিত। অদৃশ্য একটা ভালোবাসার ডোর যখন আছে। তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রত্যেকটি দেশবাসীর। কেউ মানে না, কেউ মানে। আমি তো মানি। রায় বাহাদুরের মতো আমারও আশঙ্কা এযাত্রা তাঁর প্রাণসংশয়। তিনদিন পর্যন্ত আমার দৌড়। এই তিনদিন আমি আদালতে গিয়ে শক্তিক্ষয় করব না। বাড়ীতে বসেই যা করতে পারি তা করব। অসুখবিসুখ করলে জজেরা তাই করেন ও হাইকোর্টকে জানিয়ে দিয়ে অনুমতি নেন। এ সপ্তাহে আমার কোর্টে দায়রার মামলা নেই। সিভিল ও ক্রিমিনাল আপীল তিনদিন সবুর করতে পারে। মামুলী ফাইল বাড়ীতে বসেও ডিস্‌পোজ করা চলে। ক্লার্করা এসে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।" মানস তার সিদ্ধান্ত জানায়।

সেরেস্তাদারকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি বলেন তিন দিন কোনো মতে চালিয়ে দিতে পারা যাবে। তবে অনশনের কথাটা গোপন রাখতে হবে। বাইরে রটে গেলে কলকাতার কাগজে বেরিয়ে

যাবে। সরকার চেপে ধরবে। অসুখ তো সকলের করে। অসুখটাই হবে প্রকাশ্য কারণ।

"না। আমি মিথ্যা কথা বলব না, লিখব না। তা যদি করি আমার অনশন বৃথা হবে। এটা একটা রিচুয়াল নয়। গান্ধীজী সত্যের উপর জোর দেন। আমিও তাই করব। যদি হাইকোর্ট জানতে চায়। কিন্তু আপাতত কোনো কারণ দর্শাতে হবে না। কার্যবিধিতে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নিজের অসুখ না করলেও স্ত্রীর অসুখ তো করতে পারে।" মানস দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"তা হলে মিথ্যা কথাটা আমিই মুখে আনব, সার। মেমসাহেব অসুস্থ, সাহেব ব্যতিব্যস্ত। এই চারটি শব্দই যথেষ্ট।" তিনি সাহস করে বলেন।

"তা হলে আবার সহানুভূতি জানাতে উকীল বাবুরা ছুটে আসবেন। কী দরকার কোনো কৈফিয়ৎ দেবার? আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি সাব-জজ সাহেবের নামে। পরে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার সাহেবকে লিখব। কারণ কাউকেই জানাব না। সেটা প্রাইভেট।" মানস শেষ করে।

"কারণটা প্রাইভেট। ব্যস্, এই যথেষ্ট।" তিনি বিদায় নেন।

মানস জীবনে একটি বার উপবাস করেছিল। একাদশীর উপবাস। তার মা সেদিন দু'তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর অনুরোধ উপরোধ করে এটা সেটা ওটা খাইয়ে হাস্যাস্পদ করেছিলেন। তার স্ত্রী ও যে তাই করবেন এটা তার অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু সে সত্যি সত্যিই চব্বিশ ঘণ্টা অনশনে কাটিয়ে দেয় মাঝে মাঝে পান করে লেবুর সরবত।

পরের দিন খুব বেশী পীড়াপীড়ি করতে হয় না। এক পেয়ালা চা দিয়েই অনশন শুরু করে। কিন্তু সারাদিন লেবুর সরবত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় না। রাত্রে শোবার আগে আবার এক পেয়ালা দুধ। এই তার দ্বিতীয় দিনের রেকর্ড। তৃতীয় দিন সকালে চা ও রাত্রে দুধ আর মাঝে মাঝে লেবুর সরবত। বিকেলে আরো কিছু পেটে পড়ে। একটা আস্ত কমলালেবু। যূথিকা কিন্তু তার পরেও আরো দু'দিন অনশন চালিয়ে যায়। লেবুর সরবত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় না। তারপরে সেও স্বীকার করে যে আর পারছে না। অক্ষরে অক্ষরে সাতদিন অনশন করলে শরীর সহ্য করবে না।

ইতিমধ্যে ওরা দু'জনেই অন্তরে অনুভব করে যে মহাত্মা এযাত্রা রক্ষা পাবেন। হয় বিশ্বের জনমত সরকারকে বাধ্য করবে তাঁকে একুশদিনের আগে মুক্তি দিতে, আর নয় তো তিনি অক্ষরে অক্ষরে একুশদিন পার করতে সমর্থ হবেন।

মানস বলে, "মালিকান্দায় তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে আমি লক্ষ করেছি তাঁর ভিতরে একটা শক্তির রিজার্ভ। সে রিজার্ভ তাঁকে একুশদিন পার করিয়ে দেবে। আমাদের আর অনশন করতে হবে না। তবে প্রার্থনা সমানে চলবে।"

হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার পত্রপাঠ জবাব দেন। লেখেন, "আপনি তো কারণ দর্শাননি। মহামান্য হাইকোর্ট কারণ জানতে চান।"

তখন মানস উত্তর দেয়, "আমার একজন প্রিয়জনকে অনশন করতে দেখে আমিও অনশন করি। বাড়ীতে বসেই দরকারী কাজ করি। অনুমতি না দিলে ক্যাজুয়াল লীভ দেওয়া হোক।"

রেজিস্ট্রার জানিয়ে দেয় অনুমতি বা ক্যাজুয়াল লীভ কোনোটাই মিলবে না। রেগুলার লীভের জন্যে সরকারের কাছে দরখাস্ত করতে হবে।

রায বাহাদুরকে খুলে বলতে হয়। তিনি শিউরে ওঠেন, "এই সেরেছে। সরকার সব খবর রাখে। ছুটির দরখাস্ত না-মঞ্জুর তো হবেই, তিনদিনের মাইনে তো কাটা যাবেই, চাকরিতে ব্রেক হয়ে যাবে। সে এক গুরুতর ব্যাপার। এতকাল যে চাকরি করলেন পেনসনের সময় এই কার্যকালটা বেঁচে যাবে। আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন না কেন? লিখলেই পারতেন প্রিয়জন মানে সহধর্মিণী। মিসেস মল্লিকের অনশন দেখে আপনিও অনশন করেন তাঁর অনশন ভাঙতে।"

"অশ্বত্থামা হতো ইতি গজঃ। প্রিয়জন বলতে আমি কিন্তু বলতে চেয়েছি বাপু। বাপুর অনশনে ব্যথিত হয়ে আমরা দু'জনেই অনশন করি। কেন মিথ্যা কথা লিখব? তিনি আমার কাছে সত্যভাষণের সাহস প্রত্যাশা করেন। নইলে অনশনের কী মানে? পেনশনের সময় কী হবে না হবে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করব নাকি? তার অনেক আগেই চাকরি ছাড়ব। রাশি রাশি জবানবন্দী আর রায় লিখে লিখে যে সময়টা নষ্ট করছি সেটা আমারই আয়ু আর যৌবন। টাকা দিয়ে আর সব কেনা যায়, আয়ু আর যৌবন কেনা যায় না। আমাকে ঝাঁপ দিতেই হবে। সরস্বতীর কৃপা থাকলে তাঁর সেবককে তিনি সপরিবারে অভুক্ত রাখবেন না। আমিও যে অনশন করতে পারি এটা আবিষ্কার করে আমি ভিতরে জোর পাচ্ছি।" মানস সবিনয়ে বলে।

"ছেলেমানুষ আর কাকে বলে! ছেলের লেখাপড়া বাকী, মেয়ের বিয়ে থা বাকী। স্ত্রীরও তো জামাকাপড়ের প্রয়োজন হবে। তিনি অনশন করতে পারেন, কিন্তু নিরাবরণ থাকতে পারবেন না। যাক, সরকার আপনাকে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেবেন না। ইংরেজরা একটা মহৎ জাতি। সত্যভাষণের মর্যাদা মানে। খুব সম্ভব আপনার কনফিডেনশিয়াল সার্ভিস রেকর্ডে একটা বিরূপ মন্তব্য থাকবে। আপনাকে লীগাল রিমেমব্রান্সার করবে না, সিলেকশন গ্রেড দেবে না, হাইকোর্টের জজ করবে না। আপনার নিচে যাঁদের পোজিশন তাঁরাই প্রমোশন পাবেন, আপনি সারা জীবন জেলা জজ হয়েই কাটাবেন। তবে গঙ্গায় ডুব দিলে সব পাপের স্খালন আছে। পুলিশকে যদি খুশি করে দেন তবে আপনার প্রমোশন আটকায় কে?" রায় বাহাদুর রঙ্গ করেন।

"পুলিশকে খুশি করলে আমাকে তো জজ না করে ম্যাজিস্ট্রেট করা হতো, রায় বাহাদুর।" মানস তার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

গান্ধীজীর অনশন খারাপের দিকে যাচ্ছে, অবস্থা উদ্বেগজনক। বিশ্বের নানা দিক থেকে অনুরোধ আসছে। বড়লাট কর্ণপাত করছেন না। তবে তাঁকে শেষবারের মতো দর্শন করতে তাঁর ভক্তদের জন্যে দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে। যূথিকার ইচ্ছা ছিল, উপায় ছিল না। সে বম্বেতে তার এক বান্ধবীকে চিঠি লেখে বাপুকে দর্শন করে শুভকামনা জানাতে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দার জেলা জজকে আধা-সরকারী ভাবে জানিয়ে রাখেন যে মিস্টার গান্ধীর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। সরকার সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত। হাঙ্গামার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। শান্তিভঙ্গ ঘটলে দৃঢ় হস্তে দমন করতে হবে।

যূথিকা মানসের মুখে শুনে কাঁদতে বসে। বলে, "মহৎ জাতি না শাদা হাতী! শয়তানের জাতি! ওদের অন্তঃপরিবর্তন কি কোনোদিন হবে না? ইংলণ্ডে কি মানুষ নেই? সব বনমানুষ?"

ইতিমধ্যে হোমি মোদী, নলিনীরঞ্জন সরকার ও মাধবরাও অণে বড়লাটের শাসন পরিষদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাতেও বড়লাটের মন গলেনি।

দিনকয়েক পরে যূথিকার বান্ধবী শিরীন বিলিমোরিয়া লেখেন, "বাপু আমাকে দেখে চিনতে পারেন। শুভকামনার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে অতি কষ্টে বলেন, 'তৃষ্ণার্তকে এক চামচ জল দিলে কি তার তৃষ্ণা মেটে?' মনে হলো তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এত কম সাড়া কেন? দেশ কি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে? আমিও তাই ভাবি। আগস্ট মাসের আগুন ফেব্রুয়ারিতে জল হয়ে গেছে?"

যূথিকা রাগ করে বলে, "আমরাও মহৎ জাতি না কালো হাতী! কুম্ভকর্ণের জাতি! ছ'মাসের জন্যে জাগি, দশ বছরের জন্যে ঘুমোই।"

গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টির জন্যে সরকার নাকি যথেষ্ট চন্দনকাঠ জড়ো করে রেখেছিলেন। কিন্তু মরিয়ে না মরে রাম এ কেমন বৈরী! একুশদিন পরেও দেখা গেল তিনি বেঁচে বর্তে আছেন। কস্তুরবার হাত থেকে কমলালেবুর রস নিয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পনেরো দিনের উপর গান্ধীজীকে চোখে চোখে রেখেছিলেন। ওঁর মতে তিনি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন।

"মহাত্মাজী আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছেন।" বলেন ডাক্তার রায়।

প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে গান্ধীজী বেঁচে রইলেন আরেকদিন লড়বার জন্যে। মানস ও যূথিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

এর পরে তাদের ভাবনা সৌম্যদা আর জুলির জন্যে। ওদের কে যে কোন্ কারাগারে, কবে মুক্তি পাবে কেউ জানে না। মিসেস সিন্‌হাও অন্ধকারে। আগের বারের চেয়ে সরকার এবার আরো কড়া হয়েছেন। জেলখানা এখন আর বৈঠকখানা নয়। ওয়ার্ডাররা জেনে গেছে স্বদেশীওয়ালাদের দৌড় কতদূর। তাদের চাকরি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। লোকেও বুঝে গেছে জাপানীদের দৌড় কতদূর। ইংরেজকে হটায় কার সাধ্য!

মানসের দুর্ভাবনা ছিল সরকার হয়তো তার ছুটির দরখাস্ত না-মঞ্জুর করে তাকে জব্দ করবেন। তিনদিনের মাইনে তো কাটা যাবেই, তার মাথা কাটা যাবে। সে চারদিকে অন্ধকার দেখছে, এমন সময় চিঠি আসে ছুটি মঞ্জুর। সরকার থেকে জবাবদিহি চাওয়া হয়নি। সেও দরখাস্ত পেশ করার সময় জবাবদিহি করেনি।

যূথিকা বলে, "একটা ফাঁড়া কেটে গেল। তুমিও পদচ্যুতির খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলে।"

একদিন পুলিশ সাহেবের সঙ্গে দেখা। "একটা বেড়ালের ন'টা জীবন। একজন মহাত্মার ক'টা জীবন? এই নিয়ে ক'বার প্রাণরক্ষা হলো? ফের ক'বার হবে?"

মানস বলে, "আপনারা তো তাঁকে পোড়াবার জন্যে চন্দনকাঠও আনিয়ে রেখেছিলেন বন্দিশালায়। এখন হতাশ।"

"আপনি ভুল বুঝেছেন। এটুকু জ্ঞান আমাদের আছে যে গ্যাণ্ডী ডেড ইজ মোর ডেঞ্জেরাস দ্যান গ্যাণ্ডী লিভিং। তিনি মারা গেলে নতুন করে টেররিজমের ঢেউ আসত। কয়েকটা জেলা থেকে, কয়েকটা প্রদেশ থেকে আমরা ভেসে যেতুম, হয়তো বা মুছে যেতুম। এবারকার টেররিজম মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তের মধ্যে নিবদ্ধ থাকত না, উন্মত্ত জনতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতো। তার জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলুম না। আমরা সিভিল অফিসাররা ভারতময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছি। একজোট হবার সময় পেতুম কখন? ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকত না। রেলপথ বিপর্যস্ত। মোটরের রাস্তায় অবরোধ। প্লেন থাকলেও ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড কোথায়? যাক, এবারকার মতো ফাঁড়া কেটে গেছে। পরের বারের জন্যে সময় থাকতে প্রস্তুত হতে হবে। গ্যাণ্ডী লোকটা বিলকুল নাছোড়বান্দা। কিন্তু ওঁর দাবী মেটাতে গেলে তো সত্যি সত্যি আমাদের ভারত ছাড়তে হয়! তখন চাকরি পাব কোথায়? পেনসন দেবে কে? দেশে ফিরে গিয়ে কি না খেয়ে মরব? তার চেয়ে লড়তে লড়তে মরাই ভালো।" পুলিশ সাহেব উচ্চস্বরে চিন্তা করেন।

মহাত্মার নিধন হলে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হতো তাঁর প্রাণরক্ষার ফলে সেটা আর হয় না। আগস্ট মাসে যে স্বতঃস্ফূর্ত জন জাগরণের জোয়ার এসেছিল মার্চ মাসের মধ্যেই তাতে ভাঁটা পড়ে যায়। সরকারকে আর ধরপাকড় করতে বা গুলী গোলা চালাতে হয় না। গান্ধী মৃত নন, আন্দোলনটাই মৃত। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের পরিদর্শন উপলক্ষে হিতেশ ভৌমিক আবার একদিন আসেন। এবারেও মানসের অতিথি হন। বলেন, "উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। সারা বাংলাই আমি চষে বেড়াচ্ছি। কোথাও একটুকু প্রাণের স্পন্দন নেই। কেউ লড়তে চায় না। না জাপানীদের সঙ্গে, না ইংরেজদের সঙ্গে। ওয়ার ফ্রন্ট এখন নাচ গান প্রোপাগাণ্ডার জায়গা। কবিদেরও আমরা যথেষ্ট সম্মান মর্যাদা দিই। তাঁদের কবিতা শুনি। 'কবিদল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি।' সকলেই ঘোর ফাসিস্টবিরোধী। কংগ্রেসওয়ালারা জেলে যাওয়ায় তাঁদের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাচ্ছে না। যাঁরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গা ঢাকা দিয়েছেন তাঁদের

সাইক্লোস্টাইলে লেখা ইস্‌তাহার মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সরকার গ্রাহ্যই করেন না। তাতে তাঁদের যুদ্ধোদ্যোগের লেশমাত্র ইতরবিশেষ হয় না। যুদ্ধ মানেই বিগ বিজনেস। সে বিজনেসে স্বদেশী বিদেশী সকলেই নিযুক্ত। মুনাফা যা হচ্ছে তা আকাশছোঁয়া। এমনি করেই এদেশে ক্যাপিটাল ফরমেশন হচ্ছে। ক্যাপিটালিজমের বুনিয়াদ আরো শক্ত হচ্ছে। স্বাধীনতা দিতে ইংরেজদের আপত্তি কমে আসছে, কারণ স্বাধীন ভারত হবে ক্যাপিটালিস্ট ভারত। তাতে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শী, বোহ্‌রা ও খোজাদের সঙ্গে ইংরেজদেরও পার্টনারশিপ থাকবে। রতনে রতন চেনে। আমি ক্যালকাটা ক্লাবে থাকি। ওইখানেই আমার ডেরা। ইংরেজ, বাঙালী, মাড়োয়ারী, সিন্ধী সকলেরই লীলাখেলা দেখি। যোগ দিতে পারিনে। সঙ্গে বৌ নেই যে। না, আমি তেমন লোক নই যে স্ত্রীবিয়োগের পর সহধর্মিণীর প্রতি অবিশ্বাসের কাজ করব।" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়।

মানস খাপ্‌পা হয়ে বলে, "ওদিকে বাপু অনশনে মারা যাচ্ছেন, এদিকে এরা মুনাফা লুট আর মজা লুট করছে! বৌ থাকলে আপনিও যোগ দিতেন!"

"দূর! ঠাট্টাও বোঝেন না! বৌ থাকলে আমি ক্লাবেই থাকতুম না। আর সেও ছিল তেমনি পিউরিটান।" ভৌমিক নিজেও মদ খান না।

।। পঁচিশ ।।

মহাত্মার মরদেহের জন্যে সরকার চন্দনকাঠ মজুত করেছেন এই গুজবটা সারা ভারতে রটে যায়। সৌম্য তা শুনে স্থির থাকতে পারে না। সব কাজ ফেলে পুণা ছুটে যায়। পথে ধরা পড়তে পারত, কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারেনি। ধরা পড়লে তার কী দশা হবে ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিল না। বাপু যদি সত্যি সত্যি চলে যান তবে শেষবারের জন্যে তাঁকে দর্শন করে বিদায় দিতে ও নিতে হবে।

আগা খান্ প্রাসাদের সদর দরজা খোলা পেয়ে দলে দলে মানুষ আসাযাওয়া করছিল। কাউকেই দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছিল না। গান্ধী পরিক্রমা করে ফেরবার সময় হঠাৎ সোনাদির সঙ্গে মুখোমুখি। তিনি ছিলেন সেবিকাদের একজন। সেবাগ্রাম থেকে গিয়ে সরকারের অনুমতি নিয়ে কস্তুরবার সহায়িকা মণ্ডলীভুক্ত।

"বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।" বলেন সোনাদি। যাঁর ভালো নাম শোভিনী দেব রায়, বিবাহসূত্রে কেশবন্।

এই রে! চিনতে পেরেছে! সৌম্য ধরা পড়ে গেছে। কী আর করবে? কাষ্ঠ হাসি হাসে। মাথা নেড়ে সায় দেয়।

কিছুক্ষণ পরে সোনাদি এসে তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে যান। বলেন, "এট টু, ব্রুটে? তুমিও, ব্রুটাস!"

সৌম্য ভড়কে যায়। "ও কী বলছেন, সোনাদি? কবে আমি কাকে ছোরা মারলুম? আমি যদি ব্রুটাস হই তো সীজারটি কে?"

"বাপু। ভগবান না করুন, তিনি যদি সত্যি সত্যি এবাত্রা আমাদের ছেড়ে যান তা হলে তুমিও এর জন্যে দায়ী হবে, ভাই। তাঁর অনশন এই কথা জগৎকে জানাতে যে, এটা তাঁর পরিচালিত অন্দোলন নয়। তোমাদের বলা হয়েছিল গণসত্যাগ্রহ চালাতে। তোমরা যা চালিয়েছ তার মধ্যে অহিংসার ভাগ কতটুকু? আর সত্যই বা তার মধ্যে কোথায়? এই যে তুমি বাউল সেজে মহাত্মাকে দর্শন করে এলে এটাও তো তোমার অসত্য পরিচয়। তবে ও বুড়োকে ধাপ্পা দেওয়া অত সহজ নয়। টের পেয়েছেন ঠিকই। যাও, কাল আবার এসো। নিজ বেশে। মাফ চেয়ো। কলকাতা ফিরে গিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে

লালবাজারে ধরা দিয়ো। তোমরাই ধরিত্রীর লবণ। তোমরাই যদি লবণত্ব হারাও তবে তোমাদের লবণাক্ত করবে কে? বাপু এবার বাঁচলেও নতুন কোনো আন্দোলনে নেতৃত্ব করবেন না, যদি না জনগণকে তোমরা অসত্য ও হিংসার চোরাগলি থেকে সত্য ও অহিংসার রাজপথে ফিরে আসতে শেখাও।" এই বলে সোনাদি চলে যান।

সৌম্য জবাবদিহি করার সুযোগ পায় না। সোনাদির সঙ্গে তার আলাপ বছর বারো তেরো আগে লবণ সত্যাগ্রহ উপলক্ষে। পরে তিনি সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজীর সহকর্মীদের একজনকে বিয়ে করেন। দক্ষিণ ভারতীয়। সেবাগ্রামে গেলে সৌম্য তাঁদের কুটিরে অতিথি হয়।

কেশবন্ সুরসিক পুরুষ। বলতেন, "বাপু আমাকে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় বার করার ভার দিয়েছেন। আমি যখন বলি, বাপু, পপুলেশন না কমালে পভার্টি কমবে না তিনি বলেন, পপুলেশন কমালে ম্যান পাওয়ার কমে যাবে, ম্যান পাওয়ার কমে গেলে প্রোডাকশন পড়ে যাবে। আমি যখন অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিই যে যত লোক খায় তত লোক কাজ করে না, এত জমিই নেই, জমির অনুপাতে লোকসংখ্যা বাড়তি তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'ব্রহ্মচর্য'। হা হা হা হা!"

কেশবন্ও বাপুকে দর্শন করতে পুণা এসেছিলেন। তাঁর আস্তানায় গিয়ে সৌম্য বেশ বদল করে। কিন্তু ধুতী পায় না। দক্ষিণী লুঙ্গী পরে।

"আমার তো মনে হয় বাপু এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।" কেশবন্ বলেন। "তবু আরো দু'একদিন দেখে যাওয়াই ভালো। সোল ফোর্স। সোল ফোর্স ছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। সোল ফোর্সই তাঁকে এতদূর নিয়ে এসেছে। এত বড়ো দেশকেও। কিন্তু ক্রমেই ধরা পড়ে যাচ্ছে এর লিমিটেশন। সারা দেশে ওই একজনমাত্র সত্যাগ্রহী। আগেকার দিনে বলতে পারা যেত 'ওয়ান সত্যাগ্রহী ইজ ইনাফ।' এখন কিন্তু ও কথা বলা যায় না। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওয়ান সত্যাগ্রহী ইজ নট ইনাফ। জেলে যেতে রাজী হলেই সত্যাগ্রহী হওয়া যায় না। জেল তো আজকাল মামাবাড়ী। সেখানে কিসের অভাব? হা হা হা। শুধু শয্যাসঙ্গিনীর। সেদিক থেকে বিচার করলে ব্রহ্মচর্য একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব কিংবা বিদ্রোহের দিনে অন্তত শত খানেক সত্যাগ্রহী থাকা চাই যাঁরা গান্ধীজীর মতো শহীদ হতে প্রস্তুত। শতখানেক তো দূরের কথা দশজনও আছেন কিনা সন্দেহ। যাঁরা বার বার জেলে যেতে রাজী তাঁরা একবারও গুলী খেতে বা ফাঁসী যেতে রাজী নন। সাধারণ লোক সন্ত্রাসবাদীদেরই বীর বলে পূজা করে। আর এঁদের করে ত্যাগী বলে শ্রদ্ধা। সন্ত্রাসবাদীদেরও আর সে জলুস নেই। তাঁদেরও ভরসা সিপাহীদের উপরে। সিপাহীরা স্বার্থত্যাগীও নয়, দেশপ্রেমিকও নয়। যার নিমক খায় তার জন্যে লড়ে। জর্জ ওয়াশিংটনের বা গারিবাল্ডির ফৌজ এদেশে নেই। ডি'ভালেরার ফৌজই বা কোথায়? সুশৃঙ্খল সৈন্য যেখানে নেই সেখানে উচ্ছৃঙ্খল জনতা তার শূন্যতা পূরণ করতে পারে না।"

সৌম্য প্রতিবাদ করে না। নীরবে শুনে যায়। তার মনের ভিতর একটা মন্থন চলেছে। সে কি সত্যি ভুল করেছে?

কেশবন্ বলে যান, "ভগবান না করুন, মহাত্মাজী যদি চলে যান তবে তাঁর সঙ্গে রাজনীতিক্ষেত্র থেকে সত্য আর অহিংসাও চলে যাবে। নেতার অভাব হবে না, নীতির অভাব হবে। মরাল লীডারশিপই গান্ধীবাদীদের বৈশিষ্ট্য। সদলবলে জেলযাত্রা নয়। এইবারই শেষবার। পরে আর এর পুনরাবৃত্তি জমবে না। জেলবাজ সত্যাগ্রহী নয়, জানবাজ সত্যাগ্রহীই চাই। কিন্তু কোথায় তাঁরা? তোমাদের এখন কঠোর আত্মপরীক্ষার সময়। আন্দোলন তো আপনা থেকেই থেমে এসেছে। তোমরা ক'জনা মিলে তো জগন্নাথের রথকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। যদি রথের রশি টানবার জন্যে লক্ষ লক্ষ উৎসাহী ভক্ত না থাকে। তুমি ফিরে গিয়ে কী করবে, জানিনে। সেবাগ্রামে বাস করতে চাও তো আমাদের ওখানে স্বাগত।"

সৌম্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে, "আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার মাথার দাম এখন

পাঁচ হাজার টাকা। ছদ্মবেশ পরে এতদিন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছি। নিজ বেশ ধারণ করলে যেখানেই হোক ধরা পড়বই। সোনাদি বলেছেন লালবাজারে গিয়ে ধরা দিতে। সেই কথাই ভাবছি। দ্বীপান্তর তো নিশ্চয়ই, ফাঁসীও অসম্ভব নয়।"

"কী সর্বনাশ! খুন করেছ নাকি?" তিনি আঁতকে ওঠেন।

"না, খুন করিওনি, করাইওনি। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ। সেটা যে আমি করেছি তা কি অস্বীকার করতে পারি? আমি যা করেছি তা অহিংস না হতে পারে, কিন্তু অসত্য নয়। এক হাতে ইংরেজদের, আরেক হাতে জাপানীদের ঠেকিয়ে রাখার জন্যেই রেল লাইন ওপড়ানোর, ব্রিজ কালভার্ট ওড়ানোর, টেলিগ্রাফের তার কাটার হুকুম দিয়েছি। দেশ যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়নি এটা তো সত্য। উপায়টা অবশ্য অশুদ্ধ। ভুল যদি বলেন তো ভুল। আমি দুঃখিত।" সৌম্য শান্তভাবে জানায়।

"কী সর্বনাশ!" অধ্যাপক আঁতকে ওঠেন। "লালবাজারে গিয়ে পুলিশের কাছে তুমি এইসব কবুল করবে নাকি? তা হলেই হয়েছে। তোমাকে ওরা অ্যাপ্রুভার করে বাঁচিয়ে দেবে, কিন্তু তোমার সহকর্মীদের ফাঁসীকাঠে ঝোলাবে। তোমার সোনাদি কি চান যে তোমার সহকর্মীরা ঝুলুক? তুমি আমার পরামর্শ শোন। শহীদ হয়ে তোমার কাজ নেই। তুমি আপাতত বাংলাদেশে ফিরে যেয়ো না। আমরা তোমাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে দিব। আমাদের কোনো একটি আশ্রমে গা ঢাকা দিয়ে গঠনের কাজ করবে। তোমার একটা দক্ষিণী নামকরণ হবে। লালবাজারে তুমি যেতে চাও তো বছর তিনেক পরে যেয়ো। ততদিনে যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকবে। কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করতে ইংরেজদের দিক থেকে আগ্রহ দেখা দেবে। যদি ওরা যুদ্ধে জেতে । আমার কী মনে হয়, জানো? যুদ্ধে ওরা জিতবেই। রাশিয়া ওদের সাথী। আমেরিকা ওদের আত্মীয়। গায়ের জোরেও জার্মানী, ইটালী আর জাপান ওই তিন প্রতিপক্ষের চেয়ে জোরদার নয়। ন্যায়ের জোরে তো নয়ই। যুদ্ধজয়ের লক্ষণও কি স্পষ্ট নয়? স্টালিনগ্রাডে কে জিতেছে? রাশিয়া না জার্মানী? ফলে ইংরেজদের মনের জোরও বেড়ে গেছে। ওরা এবার জার্মানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর বার্মার উপরেও। জাপানীরা হটে যাবেই। হেরে যেতেও পারে। তখন কথা উঠবে তোমরা জাপানের সাহায্য নিতে চেয়েছিলে। ব্রিটেনকে বিব্রত করতে চেয়েছিলে। চাপ দিয়ে স্বাধীনতা পেতে চেয়েছিলে। তুমি তো হিংসাত্মক কার্যকলাপও করেছ —"

"হিংসাত্মক নয়, কেশবনদা। ধ্বংসাত্মক।" সৌম্য শুধরে দেয়।

"হো হো!" কেশবন্ হেসে বলেন, "সেটা তিন বছর পরে আদালতে গিয়ে বোলো। লালবাজারে গিয়ে নয়। লালবাজারে যদি যাও তবে শুধু এইটুকুই বলবে যে, আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছি। আমার যা বক্তব্য তা আমি আদালতে পেশ করব। খবরদার, সৌম্য, যুদ্ধকালে ওসব কবুল কোরো না। তোমাকে ওরা যদি মিলিটারি ট্রাইবিউনালে পাঠায় তো আদালতের এক্তার থাকবে না। আদালতের রায় মোটের উপর নির্ভরযোগ্য। তোমার প্রাণদণ্ড নাও হতে পারে। না, না, তোমাকে আমরা শহীদ দেখতে চাইনে।"

সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনার পর সোনাদি আগা খান্ প্রাসাদ থেকে ফেরেন। রাতে ওঁকে সেখানে থাকতে দেবে না। জেল কোড তো রদ হয়নি। তা ছাড়া কস্তুরবাকে সাহায্য করতে মীরা বেহ্ন তো রয়েছেন।

"শুনেছ সৌম্যর কাণ্ড।" কেশবন্ বলেন, "ওসব কাণ্ড হয়তো অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা, ইতিহাসে নজির আছে। নেপোলিয়নের আক্রমণের মুখে মস্কোর নাগরিকরা নিজেদের শহরে নিজেরাই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তা বলে ওসব ব্যাপার কি গান্ধীজীর অহিংস নীতিসম্মত? সৌম্য যদি গান্ধীবাদী না হতো তবে ওর দিক থেকে ও ঠিক কাজই করেছে। গান্ধীবাদী হয়ে ওসব কাজ করা চলে না। করেই থাকে যদি তো কবুল করে সবান্ধবে ফাঁসীতে ঝুলতে এত তাড়া কিসের? শহীদ হওয়া কি এতই জরুরি? বছর তিনেক সবুর করলে এমন কী ক্ষতি? অন্তত মিলিটারি ট্রাইবিউনালের সরাসরি বিচারের হাত

থেকে তো বাঁচুক। পরে আদালতের বিচারে যা হয় হবে। তোমার ভাইকে তুমি লালবাজারে গিয়ে ধরা দিতে বলেছ। আমি বলেছি দক্ষিণে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে গঠনের কাজ করতে। আচ্ছা, সুন্দরম্ নামটা কেমন?"

সোনাদি ভেবে চিন্তে বলেন, "সুন্দরম্ নাম নিয়ে অসুন্দর কাম করা কি ভালো? গা ঢাকা দেওয়াটা অসুন্দর কাম। লালবাজারে গিয়ে ধরা দিক তো আগে। তার পরিণাম কী তা দেখা যাবে পরে। বিলেতে আমাদেরও বন্ধুজন আছেন। তুমি চিঠি লিখবে হরেস আলেকজাণ্ডারকে। আমি লিখব মুরিয়েল লেস্টারকে। সৌম্যকে যদি চিঠি লিখতে দেয় সেও লিখবে তার প্যাসিফিস্ট বন্ধুদের। আচ্ছা, সৌম্য, পার্লামেণ্টে তোমার চেনাশোনা কেউ আছেন?"

"আমার নেই, আমার বন্ধু সুকুমার দত্তবিশ্বাসের আছেন।" সৌম্য উত্তর দেয়। "কিন্তু কাউকেই আমি চিঠি লিখব না, সোনাদি। আমার কৃতকর্মের ফল আমি ভোগ করতে চাই। ফাঁসী হয় তো ফাঁসী, দ্বীপান্তর হয় তো দ্বীপান্তর, কারাদণ্ড হয় তো কারাদণ্ড। দেশের স্বাধীনতা সেই পরিমাণেই মূল্যবান যে পরিমাণে কষ্টার্জিত। সুলভে যা পাওয়া যায় তা আসল মুক্তা নয়, নকল মুক্তা। সেটা তো আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। তারপরে আবার দত্তবিশ্বাসের মারফৎ সার স্টাফোর্ড ক্রিপসের কাছে দরবার! কিসের জন্যে? না আমার প্রাণরক্ষার জন্যে। দেশের জন্যে লড়ব, অথচ বিদেশের কাছে কৃপা চাইব। আমার দ্বারা ও কাজ হবে না, দিদি। তবে এটাও ঠিক নয় যে আমি পুলিশের কাছে ধরা দিতে গিয়ে আমার সহকর্মীদেরও ধরিয়ে দেব। যদি ওদের নামধাম আমি ফাঁস করি তো ওদের ফাঁসীর জন্যে আমিই দায়ী হব। কিন্তু মারের চোটে ফাঁস করে ফেলা অসম্ভব নয়। টরচার সহ্য করার মতো তপোবল এখনো আমার উপজায়নি। যদিও ব্রহ্মচর্যের ত্রুটি নেই। বাপুকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কী? কিন্তু তাঁর বর্তমান অবস্থায় তাঁকে শান্তিতে বাঁচতে বা শান্তিতে মরতে দেওয়াই শ্রেয়।"

"না, বাপুকে বিরক্ত করা চলবে না। তাঁকে বাঁচতে দিতে হবে। তোমার মনে দ্বিধা থাকে তো লালবাজারে যেয়ো না। তার আগে তোমার সহকর্মীদের অভিমত জানতে চেষ্টা করো।" সোনাদি বলেন।

মহাত্মার মহাপ্রয়াণের আশঙ্কায় নানা দিগ্‌দেশ থেকে দর্শন করতে শত শত যাত্রী এসেছেন। বন্দিশালার দ্বার মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। তাঁর কানে কুলুপ, মুখে কুলুপ। চারদিকে গুপ্তচর গিজগিজ করছে। সৌম্য বুঝতে পারে ও দর্শন করেই ক্ষান্ত থাকে। প্রতিদিনই একবার করে আগা খান্ প্রাসাদে যায়, খোঁজ নেয় তিনি কেমন আছেন। তাঁর অনশনভঙ্গের সময় সেও উপস্থিত থাকে। সেও জয়ধ্বনি দেয়। চন্দ্রের রাহুমুক্তির পর বিশ্বাসী হিন্দুদের মতো।

ইতিমধ্যেই সে মনঃস্থির করেছিল যে নিজের আশ্রমেই ফিরে গিয়ে নিয়মিত গঠনকর্ম শুরু করে দেবে। ছেড়ে দেবে যুদ্ধবিরোধী ক্রিয়াকলাপ। তা সত্ত্বেও যদি তাকে ধরতে আসে সে সানন্দে ধরা দেবে। কিন্তু এমন কিছু বলবে না যাতে আর কেউ বিপন্ন হয়। টরচার করলে সঙ্গে সঙ্গে নির্জলা একাদশী। সেটা সে প্রত্যেক মাসেই দু'দিন পালন করে থাকে। এবার না হয় পূর্ণিমা অমাবস্যা অবধি জের টানবে। তবে পুরোপুরি নির্জলা নয়। গান্ধীজীর অনশনের সময় কিন্তু সে একদিনও অনশন করেনি। ওটা হাতে রেখেছে।

সোনাদিকে বলে, "ওখানে আমাকে কে না চেনে? কী পুলিশ, কী ম্যাজিস্ট্রেট, কী জজ, কী পাবলিক প্রোসিকিউটর। সরকারী বেসরকারী ডাক্তাররাও আমার চেনা। আমাকে ডাক দিচ্ছে আমার নিজের আশ্রম। ধরতে এলে সেইখানেই ধরা দেব। সহকর্মীদের ধরিয়ে দেব না। কিন্তু চায় তো ওরাও ধরা দেবে। এবার হবে আমাদের ত্যাগশক্তির অগ্নিপরীক্ষা।"

জুলির সঙ্গে পথে দেখা করে যায়। কলকাতায়। আন্দোলনে ভাঁটা পড়তে দেখে সেও ভাবছে

মাটির তলা থেকে উপরে উঠবে। ধরা পড়ে তো পড়বে। ওর মনে দুঃখ কেবল এই যে বাবলীটা জিতে গেল। স্টালিনগ্রাডে রাশিয়ার জিৎ মানে কলকাতায় বাবলীদের জিৎ। রেডিওতে নাকি সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। তিনি ফিরবেন। কিন্তু কবে ফিরবেন, কোন্ পথে ফিরবেন, জলপথে না স্থলপথে না আকাশপথে, কেউ তা জানে না। জুলি মনঃস্থির করতে পারছে না। এই ইঙ্গদ্বীপের পঙ্গপালগুলো যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে। ডেকে নিয়ে এসেছে মার্কিনী সাঙ্গোপাঙ্গদের। এদের দাপট দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গান্ধী তো ব্যর্থ। নেহরু তো অপদার্থ। কংগ্রেস তো আপসের ধ্যানে মগ্ন। জুলিরা একা কী করতে পারে?

"তুমি তা হলে ফাঁসী বা দ্বীপান্তরের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ?" জুলির গলা কাঁপে।

"সেও ভালো, কিন্তু এই ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো ভালো নয়। যখন হাতে বিশেষ কোনো কাজ নেই। আমাদের আন্দোলন তো তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছে। মহাত্মার অনশনও গতিবেগ সঞ্চার করতে পারেনি। লোকের মনে কেমন একটা হতাশ ভাব। যেন কিছুতেই কিছু হবার নয়। ইংরেজরা হেরে না গেলে ভারত ছাড়বে না। তাদের হারাবে কে? ভারতীয়রা তো নয়ই।" সৌম্য উত্তর দেয়।

সব চেয়ে খারাপটা ধরে নিয়েই সে স্বস্থানে ফিরে যায়। সেখানে দেখে তার আশ্রম সরকারের দখলে। তার খাদিভাণ্ডারও সীলবন্ধ। কর্মীরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। কাকে নিয়ে সে কী কাজ করবে? কোথায়ই বা উঠবে? পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়।

ক্যাপটেন মুস্তাফী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। "যতদিন খুশি আমার এখানে থাকতে পারো। তুমি নিজের থেকে ধরা না দিলে কেউ তোমাকে ধরতে আসবে না। ইউরোপীয়ান অফিসার একজনও নেই। সব উধাও। এখন সবাই তোমার স্বদেশীয়। হয় হিন্দু, নয় মুসলমান। তুমি দেখবে পুলিশের লোকই এসে তোমাকে বলে যাবে ওরা তোমাকে ধরতে চায় না। তুমি যদি নতুন কিছু না কর তবে তুমি যতদিন খুশি আমার এখানে থাকতে পারো। তুমি ধরা দিলেও ওরা ঝট করে তোমার বিরুদ্ধে চার্জশীট দেবে না। এক বছর ধরে তদন্ত চালাবে। চার্জশীট দিলেও গুরুতর অভিযোগ আনবে না। তোমার ফাঁসী বা দ্বীপান্তর ওরা চায় না। তুমি তো দেশকে মুক্ত করতেই যা কিছু করেছ। দেশের মুক্তি ওদেরও অন্তরের কামনা। পরের গোলামী অসহ্য হয়েছে। সবাই তোমার পক্ষে। তবে তলে তলে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরবিদ্বেষ চায়ের কেটলীর মতো ফুঁসছে। কখন যে ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসবে কে জানে!"

মুস্তাফী কি জানতেন না যে সৌম্য একজন ঘোষিত অপরাধী, যার মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা? তাকে আশ্রয় দেওয়াটাও একটা অপরাধ। এর জন্যে তার আশ্রয়দাতারও হাতে হাতকড়া পড়তে পারে। সে সবিনয়ে বলে, "আপনি যে নির্ভীক তা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু আমার সমস্যাটা আশ্রয়ঘটিত নয়। আশ্রমঘটিত। আশ্রম যদি বাজেয়াপ্ত থাকে, ভাণ্ডার যদি বন্ধ থাকে, তবে আমার মুক্ত থাকাটা নিরর্থক। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু কাউকে একমুঠো চালও জোগাতে পারছিনে, এমন মুক্তি কি একটা আশীর্বাদ, না একটা অভিশাপ? আমার মুক্তি জেলখানায়, আমার মুক্তি দ্বীপান্তরে, আমার মুক্তি ফাঁসীকাঠে। আপনার পেসেন্টদের মধ্যে এমন গরিব কি কেউ নেই, যার জীবন নির্ভর করছে পাঁচহাজার টাকা দামের যন্ত্রপাতির উপর? তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। সে আমাকে ধরিয়ে দিক।"

মুস্তাফী 'তোবা' 'তোবা' করে ওঠেন। "বলো কী হে, সৌম্য? আমার পেসেন্ট কি জুডাস যে ত্রিশটা রৌপ্যমুদ্রার জন্যে যীশুকে ধরিয়ে দেবে? না, বাবা, তেমন অপকর্ম কেউ করবে না। আমিই বা তার নিমিত্ত হতে যাই কেন? আমার কি পাঁচহাজার টাকা খয়রাত করার সামর্থ্য নেই? যাও, যাও, তুমি যেখানে খুশি যাও। মনে রেখো, গরিব হলেই কেউ অমানুষ হয় না। তোমারই এটা জানা উচিত, কারণ

তুমি গান্ধীবাদী। আর গান্ধী তো গরিবের বন্ধু।"

সৌম্য মাফ চায়। "কথাটা আমি না ভেবে চিন্তে বলেছি। আমার বলার উদ্দেশ্য টাকাটা যেন কোনো একজনের জীবনদায়ী হয়। অহিংসাবাদীর ধর্মই হচ্ছে মানুষকে প্রাণ দেওয়া, তার প্রাণ নেওয়া নয়। দুর্ভিক্ষের দিন ও টাকা ত্রাণকার্যেও লাগতে পারে, যদি রামকৃষ্ণ মিশনে দেওয়া হয়। তেমন প্রস্তাব কি নতুন পুলিশ সাহেব শুনবেন? জাফর হোসেন তো নেই।"

"দূর, পাগল! রামকৃষ্ণ মিশন কি তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে যে রামকৃষ্ণ মিশন ও টাকা পাবে? ওটা কোনো কাজের কথা নয়। পুলিশ সাহেব গোলাম নবী আমার পেসেন্ট। যাচ্ছি ওঁর চিকিৎসাসূত্রে। তোমার সমস্যাটার কথা খুলে বলব। দেখা যাক তিনি কী করতে পারেন।" মুস্তাফী আশ্বাস দেন।

পুলিশ সাহেব ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছিলেন যে সৌম্য চৌধুরী ক্যাপটেন মুস্তাফীর আশ্রয়ে। তিনি চুপি চুপি বলেন, "আপনি কি জানেন না যে এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনটেলিজেন্স অফিসার আছেন? তিনি সরাসরি দিল্লীতে খবর পাঠান। সৌম্যবাবুর খবর কি এতক্ষণে দিল্লীতে পৌঁছয়নি? কেস্‌টা যদি মিলিটারির নজরে পড়ে তবে ওদের হাতেই তাঁর জীবনমরণ। ও ব্যাটারা সবাই গোরা। কংগ্রেস যে যুদ্ধকালে যুদ্ধ দফতর চেয়েছিল সেটা অযথা নয়। তবে কেস্‌টা শুরু করতে ওদের সময় লাগবে। তার আগেই যদি সৌম্যবাবু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও সাহেব তাঁর কেস্‌টাকে নিজের কোর্টে রাখেন তা হলে মিলিটারি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তার আগেই বিচারপর্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে। সাজা অবশ্য হবেই, কিন্তু সেটা দারুণ কিছু নয়। তার পরে সরকার হয়তো হাইকোর্টে আপীল করবেন, কিন্তু হাইকোর্ট আরো বেশী উদারতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। ততদিনে যুদ্ধও খতম হয়ে থাকবে।"

নতুন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মীরচন্দানী। সিন্ধী। মুস্তাফী সৌম্যকে নিয়ে হাজির করে দেন তাঁর আপিসঘরে। পরিচয় দেন, বৃত্তান্ত বলেন। সৌম্য একটা লিখিত বিবৃতি পেশ করে। সাহেব বলেন, "আচ্ছা, চৌধুরীজী, আপনি ইচ্ছে করলে আরো দু'তিন বছর আত্মগোপন করতে পারতেন। ভারত দেশটা তো ছোট নয়। কে আপনাকে ধরতে যাচ্ছিল? কাগজে তো ফোটোও ছাপা হয়নি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। আপনি বলছেন আপনার মনে গভীর অনুতাপ জন্মেছে। আপনি ভেবেছিলেন ধ্বংসাত্মক কাজ হিংসাত্মক কাজ নয়। এখন বুঝতে পেরেছেন যে ধ্বংসাত্মক কাজও হিংসাত্মক কাজ। হোয়াট ননসেন্স! আরে মশায়, করেছেন তো করেছেন। তাতে হয়েছেটা কী? ওসব ব্রিজ কালভার্ট এর মধ্যেই সারানো হয়েছে। টেলিগ্রাফের তারও জোড়া লেগেছে। আপনি যদি জাপানী এজেণ্ট হতেন তা হলে নিশ্চয়ই মিলিটারি ট্রাইবিউনালের পাল্লায় পড়তেন। তেমন কোনো রিপোর্ট আপনার বিরুদ্ধে নেই। রেকর্ড তো আপনার বরাবর ভালোই। এটা আপনার বুদ্ধিভ্রম। আপনার সাজা হবে বইকি। কোন্ ধারায় সাজা, কী রকম সাজা, এসব আমি পাবলিক প্রোসিকিউটরের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করব। আপাতত আপনাকে জেলখানায় বিচারাধীন বন্দী হিসাবে থাকতে হবে। প্রথম শ্রেণীতেই স্থান পাবেন। তারিখ পড়ছে দুই সপ্তাহ পরে।"

সৌম্য কী বলে ধন্যবাদ দেবে ভেবে পায় না। শুধু বলে, "চরম দণ্ডের জন্যেও আমি প্রস্তুত। বার্মায় যেমনটি ঘটেছে বাংলায়ও তেমনটি ঘটত, ইংরেজরা আমাদের জাপানীদের হাতে সঁপে দিয়ে যেত, তা কি কখনো সহ্য করা যায়, সার? অসামরিক জাতি বলে আমাদের অপবাদ আছে। সে অপবাদ আমি খণ্ডাতে চেয়েছি। তবু তো কারো প্রাণ নিইনি। নিলে এমন কী অন্যায় হতো? যদি সেটা দেশরক্ষার জন্যে হতো। আমাদের দেশরক্ষা আমাদেরই দায়। সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে আসা ইংরেজের নয়। পেরেছে কি ওরা বার্মা রক্ষা করতে? পারত কি ওরা পূর্ব বাংলা রক্ষা করতে, আসাম রক্ষা করতে? ছিল তো ওরা পালাবার তালে। পালাত আর পোড়ামাটি করত। আমাদের নৌকা ডোবাত,

ধানচাল পোড়াত, বন্দর ভাঙত, রেল লাইন ওড়াত, ব্রিজ কালভার্ট ধ্বংস করত। ওরা করলে এসব হতো মিলিটারি নেসেসিটি। আমরা করলে স্যাবোটাশ। যাক্, জাপান আসছে না। আনন্দের কথা। কিন্তু ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন কোনো কোনো ঐতিহাসিক আমাদের সাধুবাদ দেবেন। লিখবেন জাপানীরা যে এল না তার কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে আমরা তাদের হাতের পুতুল না হয়ে পায়ের কুড়ুল হতুম। ইংরেজের শূন্যতা পূরণ করতুম আমরাই। জাপানীরা নয়। এখন ইংরেজরা বাহবা নিচ্ছে নিক্। আমরা বাহবার জন্যে দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করিনি, আমাদের ওটা অ্যাডভেঞ্চারও নয়। বুদ্ধিভ্রম কেন বলছেন, সার? আমরা কি কম বুদ্ধি এঁটেছি? আমাদেরও একটা ইন্টেলিজেন্স বিভাগ ছিল। কিন্তু থাক ওসব কথা। আমি কারো নাম ফাঁস করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের হাতে ক্ষমতা যেদিন আসবে— যদি কখনো আসে— তা হলে ওদের সোনার পদক দিতে বলব। তবে এটাও আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি যে আমরা যেটা অনুসরণ করেছি সেটা গান্ধীপন্থা নয়। বাপুর নামে কলঙ্ক রটেছে বলে আমি নিরতিশয় দুঃখিত। তাঁর অনশনের জন্যে আমিও দায়ী। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। একভাবে না একভাবে। আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেও আমি নিজেকে ছাড়ব না। ব্রুমফীল্ড সাহেবকে গান্ধীজী যা বলেছিলেন আপনাকেও আমি তাই বলছি। দিন আমাকে আপনার ক্ষমতায় যেটা কঠোরতম শাস্তি। কিন্তু আমার সাথীদের যেন রেহাই দেন।''

মীরচন্দানী শুনে অভিভূত হন। বলেন, ''আপনার কর্তব্য আপনি করেছেন। আমার কর্তব্য আমি করব।'' এর পর মুস্তাফীর দিকে ফিরে বলেন, ''এবার আপনার পালা। ওই পাঁচহাজার টাকা পুরস্কারটা আপনারই পাওনা, ক্যাপটেন মুস্তাফী।''

''আরে, না, না। আমি ও টাকা স্পর্শ করতে পারিনে। লোকে বলবে অত বড়ো দেশপ্রেমিককে ধরিয়ে দিয়েছি আমি, দেশদ্রোহী অর্থপিশাচ। না, না, ও টাকা হারাম। ও টাকা আপনারা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ত্রাণ তহবিলে দিন। যারা খেতে পাচ্ছে না তারা খেতে পাবে।'' মুস্তাফী মিনতি করেন।

''দুর্ভিক্ষ। কোথায় দুর্ভিক্ষ। ওটা সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। চাল কম পড়েছে। আমরা চাল আনিয়ে নিয়ে বাজারে ডাম্প করব। বাজার ভাসিয়ে দেব। খেতে না পেয়ে একটিও মানুষ মরবে না।'' মীরচন্দানী দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পান না।

যথাকালে সৌম্যর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রথম শ্রেণীতে ওর আপত্তি এত তীব্র যে ওটাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিণত করা হয়। তাতেও ওর আপত্তি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, ''একজন বিলেতফের্তা বাঙালী ভদ্রলোককে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করতে আমাব হাত উঠবে না।''

খবরটা কলকাতাব কাগজে বেরিয়ে যায়। জুলি তা পড়ে কেঁদে ফেলে। তারপরে সামলে নিয়ে বলে, ''ভারী তো তিন বছর! দেখতে দেখতে কেটে যাবে।''

একদিন ইলিসিয়াম রো থেকে এক বাঙালী পুলিশ অফিসার আসেন মিসেস সিন্হার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ''আইচ আমার নাম। শুনে দুঃখিত হবেন যে আপনার মেয়ে মঞ্জু আমাদেব ওখানে গিয়ে স্বেচ্ছায় সারেণ্ডার করেছে। আমরাও দুঃখিত। ওর হাতে বোমা নেই, রিভলভার নেই, কিন্তু যা আছে তা আরো মারাত্মক। কলম! ইংরেজ সৈনিকদের সম্বোধন কবে ও লিখেছে, 'তোমাদের মাতৃভূমি বিপন্ন, মাতৃজাতি বিপন্ন, এদেশে এসেছ তোমরা কী করতে? আমাদের মাতৃভূমিকে ও মাতৃজাতিকে বিপন্ন করতে? তোমরা এসেছ বলেই জাপানীরা আসছে, তোমাদেব তাড়াতে। তাব আগেই তোমরাও সরে পড়ো না কেন? কুইট ইণ্ডিয়া।' আমেরিকান সৈনিকদের সম্বোধন করে লিখেছে, 'ওয়াশিংটন ও লিংকনের বংশধর! লিবার্টি মূর্তির উপাসক! তোমরাও শেষকালে কন্‌স্ক্রিপ্ট হলে! কোন্ মহান আদর্শ সাধন করতে? ভারতের মাটিতে জাপানীদের সঙ্গে লড়তে? ভেবেছ আমরা উলুখড়? দুই আগুনের মাঝখানে পড়ে প্রাণ হারাব? শাদা মানুষের সঙ্গে হলদে মানুষেব যুদ্ধে কালো মানুষেব টান কাব দিকে তা অনুমান

করতে পারো। নিগ্রোদের সঙ্গে ব্যবহারটা যদি একটু ভালো করতে তা হলে না হয় আমাদের সহানুভূতি আশা করতে। তবে আমরা কেউ জাপানীদের অগ্রগতি চাইনে। তার আগেই তোমাদের পশ্চাদ্‌গতি চাই।' ভারতীয় সৈনিকদের সম্বোধন করে লিখেছে, 'তোমাদের দেশরক্ষার জন্যে তোমরাই তো যথেষ্ট। তোমাদের কেন পাঠানো হচ্ছে ইউরোপে, আফ্রিকায়, পশ্চিম এশিয়ায়? ইঙ্গ-মার্কিনদের কেন ডেকে আনা হচ্ছে তোমাদের জায়গায়? ওদের জন্যে কত গোমাংস আর কত নারীমাংস রোজ সরবরাহ করতে হচ্ছে, জানো? হয় চাকরি ছেড়ে দাও, নয় ওদের ওসব খোরাক বন্ধ করো। যে যার নিজের দেশ থেকে আনিয়ে নিক ওসব খোরাক।' দেখুন, মিসেস সিন্‌হা, এ সমস্তই আমাদের প্রাণের কথা। ওকে আমরা প্রাণ ধরে মিলিটারি ট্রাইবিউনালের খপ্‌পরে ঠেলে দেব না। কিন্তু বেকসুর ছেড়ে দিই বা কী করে? বড়ো সাহেবকে বুঝিয়েছি যে ওর ভগ্নীপতি স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল। তাঁর মানরক্ষা করতে হবে। হোম ইণ্টার্ন করাই শ্রেয়। আপনি যদি ওঁকে বাজী করাতে পারেন তা হলে আমরাও মনস্তাপ থেকে বেঁচে যাই।''

জুলির সঙ্গে কথা বলে ওর মা মিস্টার রবার্টসনকে বলেন, ''ওর ফিয়াঁসে সৌম্য চৌধুরীর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মধ্যে স্থান হয়েছে। সমতা রক্ষার জন্যে ওকেও দিতে হবে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মধ্যে স্থান। অবুঝ, একগুঁয়ে মেয়ে। আমার কণ্ট্রোলের বাইরে। আমার মেজ জামাতার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনারাই যা করবার করবেন। আমি তাতেই রাজী।''

তাই হলো। পর পর দু'দুটো খারাপ খবর পড়ে যূথিকার মন খারাপ বলে খারাপ। মানস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ''যারা চড়া স্টেকে খেলতে যায় তারা চড়া স্টেকে জেতে বা চড়া স্টেকে হারে। আর একটু হলে ওরাই তো জিতত। প্রোভিজনাল গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করে দেশের একাংশের স্বাধীনতা ঘোষণা করত। হয়তো বেশীদিনের জন্যে নয়, তবু ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা লাল অক্ষরে ছাপা হতো। মহাত্মার একুশ দিনের অনশনও চড়া স্টেকের খেলা। শিবদার তো সরদার। মরতে মরতে বেঁচে গেলেন।''

গান্ধীজীর অনশন সারা হতে না হতে তাঁর দেশবাসীর অনশন শুরু হয়। মানস ও যূথিকার মন আরো খারাপ। ছুটি নিয়ে মানসসরোবর অভিমুখে যাত্রা করে মানস ও তার হংসবলাকা। থামে আলমোড়ায়। অত দূর থেকে শুনতে পায় না বাংলাদেশের রাজধানীর রাজপথে কারা সব কেঁদে বলছে, ''একটু ফ্যান দাও, মা। একমুঠো ভাত দাও, বাবা।'' বিপ্লবীরা কর্ণপাত করে না। বিপ্লবের লগ্ন বয়ে যায়।

পরিশিষ্ট

ক্রান্তদর্শী/প্রথম পর্ব

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক - শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি
কলকাতা - ৬
প্রচ্ছদপট ঃ প্রণবেশ মাইতি
মূল্য ঃ ৩০ টাকা

উৎসর্গ — শতরূপা রায়
স্মরণে

রচনাবলীতে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে, সেই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত লেখকের ভূমিকা ছাপা হয়েছে মূল গ্রন্থের সঙ্গে।

ক্রান্তদর্শী/ দ্বিতীয় পর্ব

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক - শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি
কলকাতা - ৬
প্রচ্ছদপট ঃ প্রণবেশ মাইতি
মূল্য ঃ ৩০ টাকা

উৎসর্গ — স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী
স্মরণে

রচনাবলীতে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে, সেই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত লেখকের ভূমিকা ছাপা হয়েছে মূল গ্রন্থের সঙ্গে।

একনজরে আমাদের কিছু বই

ভ্রমণকাহিনী প্রবন্ধ ছড়া কবিতা গল্প উপন্যাস

- ভ্রমণকাহিনী সমগ্র — অন্নদাশঙ্কর রায়
- পথে প্রবাসে — অন্নদাশঙ্কর রায়
- শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ — অন্নদাশঙ্কর রায়
- বিনুর বই — অন্নদাশঙ্কর রায়
- সংস্কৃতির বিবর্তন — অন্নদাশঙ্কর রায়
- বাংলার রেনেসাঁস — অন্নদাশঙ্কর রায়
- রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গ — ড ভবতোষ দত্ত
- শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ — শিশিরকুমার দাস
- সুবিমলের বিরুদ্ধে সুবিমল এবং উস্কানিমূলক অনেককিছু আপাতভাবে — সুবিমল মিশ্র
- বিজ্ঞানী চরিতাভিধান — ধীমান দাশগুপ্ত
- ছড়া-সমগ্র — অন্নদাশঙ্কর রায়
- সাত ভাই চম্পা — অন্নদাশঙ্কর রায়
- দোল দোল দুলুনি — অন্নদাশঙ্কর রায়
- শ্রেষ্ঠ কবিতা — অন্নদাশঙ্কর রায়
- শ্রেষ্ঠ কবিতা — জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
- গল্পসমগ্র — অন্নদাশঙ্কর রায়
- বনফুলের নূতন গল্প — বনফুল
- শ্রেষ্ঠ গল্প — অন্নদাশঙ্কর রায়
- শ্রেষ্ঠ গল্প — রমানাথ রায়
- শ্রেষ্ঠ গল্প — সুবিমল মিশ্র
- জেন গল্প — বীতশোক ভট্টাচার্য
- রত্ন ও শ্রীমতী — অন্নদাশঙ্কর রায়
- না — অন্নদাশঙ্কর রায়
- মধু সাধুখাঁ — অমিয়ভূষণ মজুমদার

সিনেমা ফোটোগ্রাফি শিল্পকলা নাটক

- চলচ্চিত্রের অভিধান — সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত
- সিনেমার কথা — গার্স্ত রোবের্জ
- নতুন সিনেমার সন্ধানে — গার্স্ত রোবের্জ
- স্বপ্ন, সময় ও সিনেমা — বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
- ভারতীয় চলচ্চিত্রের রূপরেখা — সম্পাদনা : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়
- আফ্রিকার চলচ্চিত্র — ধ্রুব গুপ্ত
- চলচ্চিত্র সমালোচনা ৪০ — সম্পাদনা : উত্তম চৌধুরী
- চলচ্চিত্রের টেকনিক ও টেকনোলজি — সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত
- তাহাদের কথা : চিত্রনাট্য — বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
- কম্পোজিশন — ধীমান দাশগুপ্ত
- সিনেমার আঙ্গিক — ধীমান দাশগুপ্ত
- চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ — ধীমান দাশগুপ্ত
- নিজের কথা — সম্পাদনা : অতনু পাল
- আইজেনস্টাইন — মারী সীটন উৎপল দত্ত গার্স্ত রোবের্জ প্রমুখ
- সত্যজিৎ — দিলীপ মুখোপাধ্যায়
- মৃণাল সেন — সম্পাদনা : প্রলয় শূর
- ফোটোগ্রাফি-অভিধান — রবি দত্ত
- রঙ — ধীমান দাশগুপ্ত
- শ্রীমধুসূদন — বনফুল
- বিদ্যাসাগর — বনফুল